CUK-H06937-95-P7292

পরিচয়

95

756.3
017/3

বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত গ্রন্থ

প্রেমচন্দ : নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ

একখণ্ডে ৭৪টি নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ সংকলন। তৎসহ লেখকপুত্র অমৃত রায় লিখিত জীবন পরিচয়। সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার বই, রয়াল সাইজ।

গ্রাহক মূল্য ৩৫ টাকা । সাধারণ মূল্য ৪৫ টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : কবিতা সংগ্রহ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ১৮৬টি কবিতার সর্ববৃহৎ সংগ্রহ তৎসহ কবিকৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা, সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপরিচয়।

রয়াল সাইজ । ৪২৫ পৃষ্ঠা

গ্রাহক মূল্য ৪০ টাকা । সাধারণ মূল্য ৫০ টাকা

আকাদেমি পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : অন্নদাশঙ্কর রায়। এই সংখ্যার লেখকসূচি : সুকুমার সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, গোপাল হালদার, দেবীপদ ভট্টাচার্য, রথীন মৈত্র, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার বসু, পবিত্র সরকার, সুমিতা চক্রবর্তী, রফিকুল ইসলাম, সুবোধকুমার বসুরায় প্রমুখ।

মূল্য ১০ টাকা

প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা

মূল্য ১০ টাকা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

গ্রাহক মূল্য : ৪০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ৪৩ জন লেখকের প্রবন্ধ সংকলন

প্রাপ্তিস্থান

১) ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হল কাউন্টার
৭, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ (বেলা ১১টা থেকে ৭টা)

২) কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, রবীন্দ্রসদনের পাশে (বেলা ২টা থেকে ৭টা)

৩) পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি গিরিশ মঞ্চ, বাগবাজার
(বেলা ১টা থেকে ৭টা)

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৩২৫৩/৮৮

১ টাকাও আপনার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর টিকিট কিনুন

সাপ্তাহিক পুরস্কারের নতুন প্রকল্প

৬৩৭ তম খেলা থেকে প্রযোজ্য

খেলা কেবলমাত্র বিক্রিত টিকিটে

১ টাকার বিনিময়ে সপ্তাহের

প্রতি বুধবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

আপনাকে দিচ্ছে প্রথম পুরস্কার

১,৫০,০০০ টাকা

প্রথম পুরস্কারে এজেন্ট পাবেন ৬০০০৲, বিক্রেতার ২৫০৲

প্রথম পুরস্কার ছাড়া সান্ত্বনা পুরস্কার ২টি প্রতিটি ১০০০৲

এজেন্টের পুরস্কার ১০০৲, বিক্রেতার ১০০৲

দ্বিতীয় পুরস্কার ৬টি, প্রতি সিরিজে ২টি প্রতিটি ৫০০০৲

এজেন্টের পুরস্কার ৬০০৲, বিক্রেতার ২৫০৲

তৃতীয় পুরস্কার ১৫০টি, প্রতিটি ৫০০৲

এজেন্টের পুরস্কার ১০০৲, বিক্রেতার ১০০৲

চতুর্থ পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ৫০৲

পঞ্চম পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ২০৲

এজেন্টের পুরস্কার ১০৲ বিক্রেতার ১০৲

ষষ্ঠ পুরস্কার ১৫০০০টি, প্রতিটি ১০৲

বিক্রেতার পুরস্কার ৫৲

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

(সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ন্ত্রিত)

৬৯ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ

কলকাতা-৭০০ ০১৩

ফোন : ২৬ ৪৬৮৮/২৬ ৪৬৮৯

পরিচয়

৫৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা জুলাই ১৯৮৮ আষাঢ় ১৩৯৫

পাঠকগোষ্ঠী

অমৃত রায় ১০০

প্রচ্ছদ

নেলসন ম্যাণ্ডেলার প্রতিকৃতি

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

P, 7292

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

উড়ে উড়ে আসছে আলবেয়ার্তো রোয়াস হিমেনেৎস্

পাবলো নেরুদা

১৯৩১ সালে চিলি-র তরুণ কবি ও সমালোচক আলবেয়ার্তো রোয়াস হিমেনেৎস-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাবলো নেরুদার এই অনবদ্য কবিতা। শবযাত্রার এক বস্তুনিষ্ঠ চিত্রের মাধ্যমে নেরুদা প্রয়াত কবির উড্ডীন আগমনের এক স্বপ্নময় পরিবেশের অবতারণা করেছেন। জল, সোয়ালো পাখি, মাছ যেমন মৃত্যুর প্রতীক, তেমনই পপিফুল. মৌমাছি, শর্করা, গোলাপবিতান, জীবন, প্রাণের দ্যোতক। এই দুয়ের সুনিপুন বুনুনীতে নেরুদার এই কবিতা এক অভিনব সাঙ্কেতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। নেরুদা-র এই কবিতাটি সেদিক থেকে অনন্যতার দাবী করতে পারে। কবিতাটির কোন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ এই প্রথম।

সম্পাদক, পরিচয়

(১)

ভয়াল পাখসাট ভেদ করে,
রাত্রি মন্থন করে,
ম্যাগনোলিয়া, তারবার্তা।
দক্ষিণী বাতাস, আর পশ্চিমের
[illegible]দ্রিক হাওয়া কেটে কেটে।
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(২)

সমাধি আর ভস্মস্তুপের মাঝখান দিয়ে,
হিমায়িত শামুক, ঝিনুকের তলদেশ পেরিয়ে,
সমুদ্র!
এই বিরাট পার্থিব জলরাশির
অন্তহীন অতল ছুঁয়ে,
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(৩)

তোমার যাত্রা পথে,
নীচে দেখা যায়

নিমজ্জিত কণ্যকা,
দৃষ্টিহীন তরুশিশু,
আর আহত মাছ ;
আরো নীচে,
এবার তুমি মেঘের সীমানায়
সেই মেঘের-ই সওয়ার হয়ে,
উড়ে উড়ে আসছ তুমি ।

(৪)

দূরে রেখে,
শোণিত, অস্থি,
খাদ্য, পানীয়,
উত্তাপ, আগুন,
আসছ তুমি উড়ে উড়ে ।

(৫)

সুরা আর মৃত্যু দূরে হটিয়ে,
পঙ্কিলতা আর পেলব ভায়োলেটের পরিবেশে ।
তোমার কিন্নর কণ্ঠ,
আর সিক্ত পাদুকায় ।
তুমি আসছ উড়ে উড়ে ।

(৬)

মিছিল, জুলুম, ডাক্তারখানা ।
গাড়িঘোড়া, উকিল মক্কেল, সামুদ্রিক জাহাজ,
সদ্য ওপড়ানো রক্তঝরা দাঁত,
এ সব কিছু তুচ্ছ করে ।
তুমি আসছ উড়ে উড়ে ।

(৭)

আসছ শহর পেরিয়ে,
যেখানে ঘরের ছাদ-ছাউনিগুলো
প্রায় বেমালুম ।

যেখানে পৃথুলা রমণীরা
কাঁকই খুঁজে না পেয়ে,
চ্যাটালো, পরুষ হাতের আঙুলেই
বিলি কাটে চুলে,
চুল আঁচড়ায়।
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(৮)

মদ রাখার
ঠাণ্ডা কুঠ্‌রীর কোণ ঘেঁষে,
যেখানে,
নিঃসাড়ে,
মৃত্তিকাময় হাতে।
কঠিন দারুময় হাতে,
রক্তাভ সুরা জারিত হয়,
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(৯)

পৃথিবী থেকে অপসরণ-করা
সব বিমানচালকদের তুড়ি মেরে,
পরিখা আর ছায়া লগ্ন হয়ে
প্রোথিত, শ্বেত শুভ্র লিলিফুলের পাশ দিয়ে,
আসছ তুমি।
আসছ উড়ে উড়ে।

(১০)

কষায় কটু সব আরকের বোতলের
মাঝখান দিয়ে,
মৌরী বীজের মেখলা,
আর দুর্ভাগ্যের বলয় পেরিয়ে,
কান্না-বিহ্বল, উর্দ্ধবাহু তুমি,
আসছ উড়ে উড়ে।

(১১)

দন্ত চিকিৎসক আর ধর্মীয় জমায়েত
পিছনে ফেলে,
ছবিঘর,
আকাশবানী,
আর দূরদর্শনের
তোয়াক্কা না করে,
ঝলমলে নতুন পোষাকে,
নিমীলিত চোখে,
উড়ে উড়ে আসছ তুমি।

(১২)

তোমার বেষ্টনী-বিহীন সমাধিক্ষেত্রের উপর দিয়ে,
যেখানে নাবিকেরা মাতে প্রেলাপনায়,
তোমার মৃত্যুর ঝর ঝর ধারায়,
তুমি আসছ।
আসছ উড়ে উড়ে।

(১৩)

সেই মৃত্যুর ধারাসারে,
আঙুল ঝরাতে ঝরাতে,
অস্থি খসাতে খসাতে,
মজ্জা আর হাসির ঢল নামাতে নামাতে,
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(১৪)

সেই সব উপলখণ্ডের উপর দিয়ে,
যেখানে—
গলে গলে পড়ছ তুমি,
ভেসে যাচ্ছ,
শীত পেরিয়ে, সময় পেরিয়ে,
যেখানে—
তোমার হৃদপিণ্ড

ঝরে ঝরে পড়ছে
অজস্র বিন্দুর ধারায়,
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(১৫)

বেদরদী নকলনবিশ,
বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার,
সিমেন্ট-বাঁধাই শক্তপোক্ত সমাধিক্ষেত্র,
তুমি তো সেখানকার নও,
তুমি অন্য দুনিয়ার,
অন্য জগতের।
তাই তুমি উড়ে উড়ে আসছ।

(১৬)

ওগো সামুদ্রিক পপিফুল!
আমার স্বজন, বান্ধব আমার!!
মৌমাছি-পোষাক-পরা
ওগো আমার গিটার-শিল্পী,
এসব ছায়া উপছায়া স্পর্শ করছে
তোমার কেশরাজি,
এ কি বাস্তব?
না, এ সত্য নয়
তুমি যে আসছ উড়ে উড়ে।

(১৭)

কে বলেছে
এ সব ছায়ারা অনুসরণ করে তোমায়?
কে বলেছে
এরা সব নিষ্প্রাণ সোয়ালো পাখি,
আর শোকের ধূপছায়া জগৎ?
না এ সত্য নয়।
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(১৮)

ভালপারাইসোর কালো কালো হাওয়া
তার সফেন শুভ্র পাখা মেলে
সাফ স্থতরো করে
আকাশে তোমার আসার পথ
তুমি উড়ে উড়ে আস !

(১৯)

চতুর্দি[illegible]
[illegible]কে প্রকীর্ণ,
[illegible]সমুদ্রযান, মৃত সমুদ্রের হিমানী,
জাহাজের ভেঁপু,
বহমান কাল,
বৃষ্টি-ভেজা সকালের সৌরভ,
নোংরা মাছের কটুগন্ধ,
এ সবের মধ্য দিয়েই
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(২০)

এই তো রেখেছি "রাম" পানীয়,
এই যে তুমি আর আমি,
আমার সত্তার গভীরে
কান্না-আকুল আমার আমি,
আর কেউ নয়,
কিছু নয়,
শুধু একটা ভাঙা সিড়ির ধাপ
আর
নড়বড়ে ছাতা এক,
জানি তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(২১)

ঐ যে দূরে সমুদ্র !
রাত্রি হলে,

ওখানে অবতরণ করি আমি,
শুনি,
পরিত্যক্ত সমুদ্রের অতল থেকে।
আমার সত্তার গহনে বেঁচে থাকা
সাগরের গভীর থেকে,
নিঃসাড়ে,
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(২২)

আমি শুনতে পাচ্ছি তোমার পাখার শব্দ,
তোমার মন্থর উড়ালের আওয়াজ।
মৃতের সমুদ্র আমাকে আঘাত করে
জল-ভেজা, অন্ধ পারাবতের
আর্দ্রতায়।
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

(২৩)

একক, নিঃসঙ্গ তুমি
উড়ে উড়ে আসছ ;
অজস্র শবের মিছিলে তুমি একা,
চিরকালের একা, সঙ্গীহীন তুমি।
তুমি আসছ উড়ে উড়ে ;
নামহীন তুমি,
ছায়া পড়েনা তোমার,
শর্করাহীন,
আস্থহীন,
গোলাপবিতানহীন,
দগ্ধ পরিবেশ,
এর মাঝখান দিয়েই
তুমি আসছ উড়ে উড়ে।

ভাষান্তর [illegible]

হাইন্‌ৎস্ মোডে

অনিমেষকান্তি পাল

বাংলা রূপকথা সম্বন্ধে একটি চমৎকার বই রচনা করবার জন্যে অধ্যাপক ডঃ হাইন্‌ৎস্ মোডেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রপুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সেটা ছিল ১৯৭৪ সালের ঘটনা। তাঁর সারা জীবনের গবেষণা এবং পড়াশোনার বিষয় যে ভারত-সংস্কৃতি সে কথাও অনেকেই জানেন। এবছর জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (পূর্ব জার্মানীতে) ডঃ মোডের ৭৫ বছরের জন্মদিন পালন করা হবে বলে আমাদের কাছে খবর এসেছে। জানিয়েছেন অধ্যাপক ডঃ ব্রেন্ট্ ইয়েস্। ইনি পূর্ব জার্মানীর হালে শহরে অবস্থিত মার্টিনলুথার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদেশীয় প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক।

ডঃ ব্রেন্ট্ ইয়েস্ লিখেছেন —১৯৮৮ সালের ১৫ই আগষ্ট ডঃ মোডের ৭৫তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি চিঠি লিখবার জন্যে আপনাকে আমরা অনুরোধ করছি। তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে এইসব চিঠি একটি সম্বর্ধনা-গ্রন্থে সংগ্রহ করে আমরা তাঁকে উপহার দেব। আমাদের এই পরিকল্পনা আপনার সমর্থন পেলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ডঃ মোডের একটি চমৎকার ফোটোগ্রাফ সহ একটি ছোট প্রচার-পত্রও পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে ডঃ ব্রেন্ট্ ইয়েস্। এই প্রচারপত্রে রয়েছে ডঃ মোডের জীবনের একটি কালপঞ্জী এবং তাঁর রচনাসমূহের একটি গ্রন্থপঞ্জী। দুটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ডঃ মোডের জীবন ও কাজকে বুঝবার পক্ষে অত্যন্ত দরকারী তথ্য। তাই আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সংক্ষিপ্ত আকারে ঐ দুটি পঞ্জী এখানে তুলে দেওয়া গেল।

রচনাবলী

শ্রীলঙ্কার ভাস্কর্য : বাসেল, ১৯৪২।

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি : বাসেল, ১৯৪৪।

প্রাচীন ভারত : স্টুটগার্ট : ১৯৫৯।

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ শিল্পকলা : লাইপৎসিগ, ১৯৬৪।

ব্রতকথা : অরুণ রায় সঙ্কলিত ও হাইন্‌ৎস্ মোডের ভূমিকা সম্বলিত : লাইপ্‌ৎসিগ, ১৯৬৪।

বৌদ্ধবর্ষপঞ্জী, ১৯৬৬—৭০ : হাইনৎস্ মোডে ও হান্স-ইয়োআকিম্ পয়কে সম্পাদিত ; হালে : ১৯৬৬, ৬৭, ৭০।

বাংলার রূপকথা : হাইনৎস্ মোডে ও অরুণ রায় সঙ্কলিত : লাইপৎসিগ্ : ১৯৬৭।

জিপসি : হাইনৎস্ মোডে ও সিগ্ ফ্রিড্ ভল্ফ্ ক্লিংগ্ : লাইপ্ৎসিগ্ : ১৯৬৮।

ভারত শিল্পে নারী : লাইপ্ৎসিগ্ : ১৯৭০।

ক'লকাতা : লাইপ্ৎসিগ্ : ১৯৭৩।

পুরাণোক্ত প্রাণী ও দানব : লাইপ্ৎসিগ্ : ১৯৭৩।

ভারতীয় মিনিয়েচার (ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা) : হাইনৎস্ মোডে, রেহিনা হিক্মান্ এবং সিগ্ ফ্রিড্ মান : লাইপৎসিগ্ : ১৯৭৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বার্লিন : ১৯৭৬।

বাংলা লোকগীতিকা : হাইনৎস্ মোডে ও দুশান্ জবাভিতেল্ : লাইপৎসিগ্ : ১৯৭৬।

শ্রীলঙ্কা : লাইপৎসিগ, ভাইমার : ১৯৭৭।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শিল্পকলা : ড্রেসডেন এবং মস্কো : ১৯৭৯।

জিপ্সি লোককথা : চারখণ্ড : লাইপৎসিগ্ : ১৯৮৩-১৯৮৫।

ভারতীয় লোকশিল্প : হাইনৎস্ মোডে ও সুবোধচন্দ্র : লাইপৎসিগ : ১৯৮৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লাইপ্ৎসিগ্ : ১৯৮৬।

মথুরা : লাইপ্ৎসিগ, ভাইমার। ১৯৮৬।

এই সব বই বাদে ডঃ মোডের প্রবন্ধের সংখ্যা দুই শতাধিক। তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে—পূর্ব জার্মানীতে, ভারতে, শ্রীলঙ্কায়, বাংলাদেশে, সুইজারল্যাণ্ডে, সোভিয়েৎ ইউনিয়নে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্রান্সে, ইতালিতে, মেক্সিকোতে, হাঙ্গারিতে, পোল্যাণ্ডে, গ্রেট ব্রিটেনে এবং পশ্চিম জার্মানীতে।

ঘটনাবলী

১৯১৩ : ১৫ আগষ্ট তারিখে বার্লিন শহরে জন্ম।

১৯১৯-৩১ : স্কুলে পড়াশোনা।

১৯৩১ : বার্লিনের ফ্রিড্রিশ্ ভিল্হেলম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ।

(বিষয়—শিল্পকলার ইতিহাস, ক্লাসিক্যাল আর্কিওলজি, নৃবিজ্ঞান, প্রত্নইতিহাস, ভারতীয় ভাষা, এবং ভারতীয় শিল্পকলা।)

১৯৩২ : উচ্চতর গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য শ্রীলঙ্কার কলম্বো কলেজে যোগদান।

১৯৩৪ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা। বার্মায় গমন।

১৯৩৪-এর শেষে কলম্বো হয়ে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩৫ : বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা।

১৯৩৭ : শ্রীলঙ্কায় অধ্যয়ন এবং গবেষণা।

১৯৩৯ : বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শ্রীলঙ্কার ভাস্কর্য' বিষয়ে থিসিস গৃহীত।

১৯৩৯/৪০ : 'প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং তার পাশ্চাত্য সংশ্রব' —বিষয়ে বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা।

১৯৪১/৪৫ : সুইজারল্যাণ্ডে অন্তরীণ।

১৯৪৫ : জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন।

১৯৪৫/৪৮ : সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মীরূপে মিউনিকে সক্রিয়তা।

১৯৪৮ : পূর্ব জার্মানীর হালে শহরের মার্টিনলুথার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য-দেশীয় প্রত্নতত্ত্বের প্রোফেসর পদে যোগ-দান।

১৯৫২/৫৯ : শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ক ইনস্টিটিউটের জন্য গঠিত কমিশন পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ।

১৯৫৭ : ভারত ভ্রমণ।

১৯৫৭/৫৮ : সোভিয়েত ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মানী এবং গ্রেট ব্রিটেন ভ্রমণ।

১৯৫৮/৫৯ : শ্রীলঙ্কা ও ভারত ভ্রমণ।

১৯৬০/৬১ : দুবছরের জন্যে ভারতে অবস্থান।

১৯৬৩/৬৪ : ভারত ভ্রমণ।

১৯৬৬ : হালেতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন।

১৯৬৬/৬৭ : শ্রীলঙ্কা, ভারত ও নেপাল ভ্রমণ।

১৯৬৯ : শ্রীলঙ্কা, ভারত ও কম্বোডিয়া ভ্রমণ।

১৯৭০ : "ফাশিজমের বিরুদ্ধে যোদ্ধা"-র পদক প্রাপ্তি।

১৯৭১ ৭২ : ভারত ভ্রমণ।

১৯৭৩ : পিতৃভূমি-পুরস্কারে সম্মানিত।

১৯৭৪ : রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত।

১৯৭৭ : ভারত ভ্রমণ।

১৯৭৮ : জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত।

১৯৭৮/৭৯ : ভারত ভ্রমণ।

১৯৮২ : ভারত ভ্রমণ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

এরপর থেকে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় শয্যাগত অবস্থায় তাঁকে দিন কাটাতে হয়। এই সময় মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। তারপর প্রায় বছর পাঁচেক তার কোন সংবাদ পাইনি। কাজেই অধ্যাপক ডঃ ব্রেন্টইয়েসের আমন্ত্রণ এবং প্রচারপত্রটি পেয়ে খুবই ভালো লেগেছে। ডঃ মোডের মত একজন ভারতপ্রেমীর জন্মদিন যে ভারতের স্বাধীনতা দিবসে এ যোগাযোগও ভারি আশ্চর্যের।

ডঃ ব্রেন্টইয়েসের অনুরোধে ডঃ মোডেকে যে চিঠিটি লিখেছিলুম তাতে দুটি-চারটি ব্যক্তিগত কথা থাকলেও তাতে মানুষ হিসাবে ডঃ মোডের যে পরিচয় তার কিছুটা ধরবার চেষ্টা আছে। কোন কোন পাঠকের তা হয়তো ভাল লাগতেও পারে এই আশায় এখানে সেই চিঠির অনুবাদটি দেওয়া গেল।

২৯শে মার্চ, ১৯৮৮

প্রিয় অধ্যাপক মোডে,

প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়ে থাকে। এ বছর ঐ দিনেই আপনার ছাত্র, সহকর্মী, বন্ধু এবং গুণগ্রাহীরা আপনার ৭৫তম জন্মদিন পালন করবেন—এটা আমার খুবই ভাল লাগছে। যাঁরা আপনার পাণ্ডিত্যকে মূল্য দেয় এবং আপনার উষ্ণ, সহৃদয় মনুষ্যত্বের মর্যাদা অনুভব করতে পারে তাঁরা সকলে আপনাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে হাতে হাত মেলাবে দক্ষিণ এশিয়ায়, ইউরোপে এবং পৃথিবীর আরো নানা জায়গায়। আপনার প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের এই বহুজাতিক আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আমি গর্বিত।

আপনার উদ্দীপনাময় সান্নিধ্যে আমার যে দিনগুলি, যে ঘণ্টাগুলি কেটেছে তা সর্বদাই আমার মনে থাকবে। স্পষ্ট মনে পড়ে, কেমন করে আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল অধ্যাপক সুশোভন সরকারের বাড়িতে। মস্কোতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন অধ্যাপক

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। জনাকয়েক শ্রোতার মধ্যে আপনিও উপস্থিত ছিলেন। তারপর তো আমরা দক্ষিণ কলকাতায় আপনার কেয়াতলার বাসাবাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে দিলুম।

আশা করি আমাদের দলটির কথা আপনার মনে আছে—মিহির, অলক, অরুণ রায়, প্রণবরঞ্জন, স্নিগ্ধা এবং আরো অনেকে। ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়ের কানাইবাবুর কাছ থেকে। ব্র্যাড্‌লি-বার্টের লেখা এবং অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশোভিত 'ফেয়ারী টেলস্ অফ বেঙ্গল' বইটির একটি পুরোনো কপি সংগ্রহ করে আপনি এত খুশী হয়েছিলেন যে সে সন্ধ্যায় উপস্থিত সকলকে ইতালীয় দ্রাক্ষাসব পরিবেশন করেছিলেন। অবশ্য, এখন বুঝতে পারছি যে হয়তো সেই সময়ই আপনার মনের মধ্যে 'বাংলার রূপকথা' বইটি আকার নিচ্ছিল একটু একটু করে।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে নয়াদিল্লীতে ২৬তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনে আপনি যখন 'বাঘ ও সিংহ' সম্বন্ধীয় আপনার গবেষণা-পত্রটি পাঠ করছিলেন তখন তো আমি আপনার সঙ্গেই ছিলুম। সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে তা কিভাবে গৃহীত হয়েছিল, আমি তো তার একজন নগণ্য সাক্ষী। বলাই বাহুল্য যে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আপনার রচনাগুলি কলকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো আলোচিত হয় এবং পড়া হয়। বর্তমানে আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যাই। সেখানে দেখছি,—বাংলা লোকসাহিত্যের পাঠ্যবস্তুর মধ্যে বাংলা লোককথা সম্বন্ধীয় আপনার রচনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই সব লিখতে লিখতে মনে আসছে নানা ছোটখাট কথা। যা তথ্য এবং সাক্ষ্য পাওয়া যাবে তার সবকিছুই পরীক্ষা করে দেখার আগ্রহে, এমনকি আমার অপটু হাতের তোলা ভারতীয় নারীর কয়েকটি আলোকচিত্রও আপনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। বদলে, আমাকে দিয়েছিলেন ৎজাইস কোম্পানীর একটি ছোট জুয়েল গ্লাস। আজও আমি সেটি সযত্নে রেখে দিয়েছি। একদিন আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলুম পার্ক স্ট্রীটের একটি ছোট্ট কিউরিয়োর দোকানে। সেখানে আপনি ছোট একজোড়া পেঁচা কিনেছিলেন। ও দুটো আপনার ভাল লেগেছিল কারণ ওগুলো ছিল আমাদের ঢোকরা কামারদের তৈরী। আপনার কাছে তখন যথেষ্ট টাকাকড়িও ছিল না। পেঁচা দুটো কিনবার জন্যে হয়তো আপনাকে দুএকবেলা না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।

আপনার কেয়াতলার বাসাবাড়িতে আমাদের সকলের জন্যে ছিল সাদর আমন্ত্রণ। ফ্রাউ মোডে আমাদের কফি না খাইয়ে ছাড়তেন না। মাঝে-মাঝে, দুপুরে কিংবা রাতে খাওয়ার জন্যেও থেকে যেতুম। ফ্রাউ মোডে একদিন হালকা স্বরে বলেছিলেন—আমাকে তো উনি দুটি ভালো জামা-কাপড়ও কিনে দেন না, এদিকে দেখো, বই কেনার ব্যাপারে টাকার কোন অভাব নেই। মনের পর্দায় এখনো দেখতে পাই ছোট্ট জেটি একটি আটহাতি শাড়ি পরে ঘুর ঘুর করছে আর মারকুস্ দুষ্টুমি আর লাফালাফি করছে। আমি অবশ্য জানি যে মারকুস এখন একজন কৃতবিদ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং জেটি ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছে পুরো দস্তুর এক জার্মান ভদ্রমহিলা। কিন্তু মনের গতি বিচিত্র,—আপনিও নিশ্চয় সে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটের মহাবোধি সোসাইটিতে আপনি এসেছিলেন। সূর্য তখন মাথার উপরে। ফোটো তোলার পক্ষে সময়টা সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু যা হোক, আমি শাটার টিপলুম। ছবিটা খুব একটা ভালো হয়নি কিন্তু আমি সেটা সযত্নে রেখে দিয়েছি। নৃ-বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে আমাদের দুজনেরই যোগদানের ঘটনাটি মনে করে আমি খুবই আনন্দ পাই। অনেক তর্কবিতর্ক এবং উত্তপ্ত মত বিনিময়ের মধ্যে আমরা ডুবে ছিলুম। এক বিকেলে একজন পটুয়া এল 'দাতাকর্ণ' পট নিয়ে। ওটা আপনার জন্য কেনা হল। আপনার খরচ করার মত যা টাকাপয়সা ছিল সবই তাতে খরচ হয়ে গেল। এক নম্বর ফাউলমানস স্ট্রাসের বাড়িতে সেটা নিশ্চয়ই এখনো আপনার ধারে কাছেই আছে। কোন সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারতুম! কিন্তু তাতো হবার নয়। আমরা এখন দুই আলাদা জগতের বাসিন্দা।

দশবছর আগে কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে বসে আপনার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। আমার প্রশ্নগুলিতে একটু বেয়াড়াপানা ছিল কিন্তু আপনি ছিলেন খোসমেজাজে। দুএকটা কথা এখানে মনে করার জন্যে আপনার অনুমতি চাইছি।—"আপনি কি কখনো কোন ভারতীয় মহিলাকে ভালবেসেছিলেন?"—আমি জানতে চেয়েছিলুম। লাজুক ভঙ্গীতে আপনি বলেছিলেন—'হ্যাঁ'।—'কখন'?—আমি নাছোড়বান্দা। আপনি হেসে ফেললেন—"দেখো আমার বয়স তখন মোটে বাইশ বছর।"—"তো কি হয়েছিল?"—আমি জানতে চাইলুম। আপনি মিনমিনে গলায় জবাব দিয়েছিলেন—"মাত্র এক সপ্তাহেই ব্যাপারটা মিটে গিয়েছিল।"

প্রিয় অধ্যাপক মোডে, আমরা সবাই জানি যে—ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনার ভালবাসার সম্পর্কটি অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে বজায় আছে, তা এখনো মিটে যায়নি।

বলা হয়, ভালবাসা মানুষকে তরুণ করে। আপনি সেটা মানেন?

আপনার ৭৫তম জন্মদিনে আমার স্ত্রী স্নিগ্ধাও আমার সঙ্গে আপনাকে অভিনন্দিত করছে।

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ হাইন্‌ৎস্ মোডের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচনাটি প্রকাশিত হল।

ক্রোড়পত্র

সমরেশ বসু

খণ্ড নয়, ফাঁকি নয়

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

এখন, সমরেশ বসুর মৃত্যুর ঠিক পরে, স্থির মানসিক অবস্থা নেই। তাঁর, তাঁর সাহিত্যের, আলোচনা বা মূল্যায়ন এই মুহূর্তে খুবই অসুবিধের। এমনিতেই সমরেশকে বোঝা বেশ মুস্কিলের। এই মুহূর্তে আরোই। বিপুল অভিজ্ঞতার অধিকারী তিনি, কিন্তু কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি সেগুলিকে যাচাই করেছেন? খোলা মনের লোক, আবার জটিলও। আবেগময়, কিন্তু হিসেবী। প্রচণ্ড আসক্ত, নিদারুণ রকমের উদাসীন। মমতাময় এবং নির্মম। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বাসহন্তা। মার্কসিস্ট এবং অ-মার্কসিস্ট। মধ্যবিত্ত মানসিকতার ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে মুক্ত এবং বহু বিষয়ে বদ্ধ। প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন এবং চূড়ান্তভাবে নিন্দিত। কৈশোর বয়সেই বিবাহিত এবং চিরকুমার। আর বিতর্কিত, বিতর্কিত, বিতর্কিত। এই সব কিছু নিয়ে এবং এই সব ছাড়িয়ে এক আশ্চর্য শক্তিশালী লেখক। কয়েকটা শুকনো পাতায় কালির আসরে—কোথায় পাব তারে! অনেক মানুষ অনেক দিন খুঁজে হয়ত তাঁকে কিছুটা পাবে। এবং সে-পাওয়াতেও থাকবে বহু ফাঁক, বহু মতভেদ। সমরেশের আবাল্য সুহৃদ সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশকে কখনো ডাকতেন 'সমশের' (অর্থ, তরবারি), কখনো বলতেন 'সোমরস'। হয়ত দুটোই সত্য। কিন্তু কোন্‌টার অনুপাত কতটা? অথবা এ সব ছাড়াও হয়ত অন্যান্য সত্তা আছে তাঁর।

ব্যক্তি-স্মৃতি দিয়েই সুরু করি। সমরেশের সঙ্গে আলাপ না ছিল কার! আমারও ছিল। কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ করিয়ে দেয় নি, দিতে হয় নি। তখন তাঁর 'আদাব' বেরিয়ে গেছে, 'নয়নপুরের মাটি' পরিচয় পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে হতে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তে বন্ধ হয়ে গেল। কেন যে বন্ধ হল, তা আমরা ঠিক বুঝতেও পারি নি। পরে, অনেক পরে সব শুনেছি। 'উত্তরঙ্গ' বেরল। রোহীন্দ্র চক্রবর্তী, রাম বসু, সনৎ বসু, জ্যোতি রায় বার করেছেন 'ডাক' পত্রিকা। সেখানে সমরেশ লিখেছেন "অকালবৃষ্টি'। ঝড়ের গতিতে সমরেশের উত্থান সুরু—সেই সুরুর মুখেই তাঁর পরিচয়। একটা লেখার তরঙ্গ মেলাতে না মেলাতেই নতুন তরঙ্গ আসে।

আমরা উত্তাল হই। শুধু লেখেন না সমরেশ। গল্প বলেন, দারুণ বলেন। বানানো গল্প নয়। বলেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। সমরেশও বলতে ভালবাসেন। তাঁর লেখার খসড়াও তৈরি হয় মুখে মুখে। বলার মধ্যে তাঁর হৃৎস্পন্দন শোনা যায়, চরিত্রগুলির রক্তমাংসের দপ্‌দপানিও। পরে লেখাতেও তা চলে আসে।

গ্রে স্ট্রীট থেকে বেরোলো তিনখানা কাগজ—বিংশ শতাব্দী, প্রবন্ধ পত্রিকা, কথামালা। পরিচালক হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের ছাত্রজীবনের বন্ধু। সময়টা ষাটের দশক। গ্রে স্ট্রীটে প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডা ছিল আমাদের। সমরেশ সারা বছর এখানে অনিয়মিত আসতেন। পুজোর সময় কয়েক মাস তিনি হরপ্রসাদের এই গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতেই থাকতেন। সারা দিন লেখা, সন্ধ্যার পরে আড্ডা। এই সময় অনেক দিন, অনেক বছর, দেখা গেল সমরেশকে খুব কাছ থেকে। সমরেশের সূত্রে এখানে আসতেন তাঁর বন্ধুরা, নানা বয়সের বান্ধবীরা, আত্মীয়েরা কেউ কেউ, সাহিত্য জগতের কেউ কেউ। হরপ্রসাদের ছিল কোষ্ঠী-গণনার নেশা। দিকপাল জ্যোতিষীরা আসতেন। আসতেন দেবনাথবাবু, পেশায় চিকিৎসক, গড়পারের ক্যাপিটল নার্সিং হোমের মালিক, তিনি যে চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেন, সমরেশ একটি বই প্রযোজনা করছেন তা জানতাম না। চলচ্চিত্র-পরিচালক সলিল দত্ত ও জগন্নাথবাবু খুবই আসতেন। সমরেশকে নিয়ে রোজই যেন একটা মেলা। এই বিচিত্র মানুষের মেলায় ঝল্‌সে উঠত তাঁর দীপ্তি, অফুরন্ত ছিল তাঁর প্রাণ। এই সময়ে সমরেশের বড় মেয়ে বুলবুলের বিয়ে হয়—আমরা গেলাম নৈহাটিতে। সেখানে তিনি সেদিন মেয়ের বাপের ভূমিকায়। যেন অবিশ্বাস্য। তবে সমরেশের ক্ষেত্রে কোন্‌টা বিশ্বাস্য আর কোন্‌টা অবিশ্বাস্য তার তো কোন সীমারেখা নেই। গোর্কির দীর্ঘ উপন্যাস 'মাতেভি কোজেমিয়াকিনের জীবন' আমার অনুবাদে প্রকাশিত হয়। তার একটি কপি দিই সমরেশকে। এতে গোর্কির একটা স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। সমরেশ গোর্কির এই অন্য পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ। নিতাই বসুর 'কালকূট সমরেশ' বইতেও সম্প্রতি দেখলাম, সমরেশ গোর্কির এ বইটির কথা নিতাইবাবুকেও বলেছেন। মদ্যপানে সমরেশের আসক্তি ছিল এ কথা সবাই জানেন। এই মদকে তিনি দু-এক সময় বেশ কাজেও লাগিয়েছেন দেখেছি। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। একজন কনট্র্যাকটর নানা কাজের সূত্রে হরপ্রসাদের কাছে আসত, সেই সূত্রে সমরেশ এবং আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় হয়ে যায়। ভদ্রলোকের ব্যবহারে এমন কতগুলি দিক ছিল যেগুলি

সমরেশ একেবারে পছন্দ করতেন না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতেও পারতেন না। একদিন সমরেশ মদ খেয়ে 'মাতাল' হয়ে ভদ্রলোককে তুলো ধোনা করে দিয়েছিলেন এবং ভদ্রলোকও 'মাতালের' এই ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝে ওখানে আসা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ষাটের দশকেই চীন-ভারত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বাম রাজনৈতিক কর্মীদের বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন অন্য অনেক সাহিত্যিকের মতো তাঁকে 'দেশ' পত্রিকা 'শিল্পীর স্বাধীনতা' বিষয়ে লিখতে বলে। যতদূর মনে পড়ছে, নারায়ণ গাঙ্গুলিও লিখেছিলেন। মনোজ বসু 'চীন দেখে এলাম' প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু সমরেশ যথেষ্ট বিপদ ও দারিদ্র্যের ঝুঁকি নিয়েও 'শিল্পীর স্বাধীনতা' লেখেন নি।

বেরল 'জলসা' পত্রিকা। মূলত সিনেমার কাগজ। সাহিত্যও সামান্য থাকত, শারদীয়তে বেশিই থাকত। এ কাগজের মালিক ছিলেন চিত্ত সরকার। কর্ণধার ছিলেন ক্ষিতীশ সরকার। দুজনের সঙ্গেই আমাদের দীর্ঘ কালের পরিচয়। ক্ষিতীশ সরকার আবার সমরেশের দারুণ দোস্ত। সুতরাং শারদীয়ের নিয়মিত লেখক। আমিও 'জলসা'য় সাহিত্যসংবাদ ও হাস্যরসাত্মক 'টিপ্পনি' এই দুটি ফিচার লিখতাম, ফলে 'জলসা'র অফিসে দেখা হয়ে যেত মাঝে মাঝে সমরেশের সঙ্গে।

'বিবর' প্রকাশিত হল ১৯৬৫-এর শারদীয় 'দেশে'। সমরেশ ভীষণভাবে নিন্দিত—বাম রাজনৈতিক মহলে এবং গোঁড়া রক্ষণশীলদের কাছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'পরিচয়ে'র এবং কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী কর্মী। সে সমরেশের লেখা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে। কিন্তু 'বিবর'-এ এসে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। দিনের পর দিন বিষয়টা আলোচনা করবার জন্যে কফিহাউসে সে আমাদের সঙ্গে বসেছে। আমাদের 'বিবর' সম্পর্কে মত ছিল: 'শক্তিশালী লেখকের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ রচনা।' সে আমাদের মত খোলা গলায় কিছু বলতে পারত না, দ্বিধা পুরো কাটাতে পারত না। বেশ কিছুদিন পরে শোনা গেল, মুজাফ্‌ফর আহমেদ 'বিবর' পড়েছেন এবং তাঁর তেমন খারাপ কিছু মনে হয় নি। দীপেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু দীপেন এবং সমরেশের সঙ্গে আলোচনায় এ কথাটাও উঠে পড়েছে: যদি মুজাফ্‌ফর আহমেদের খারাপ লাগতো? একজন বা দুজন নেতার কথাতেই শিল্প-সাহিত্যের শেষ বিচারের ভার থাকবে? থাকা উচিত?

কয়েক বছর বাদে একদিন সমরেশকে বলি, 'এ আপনি কী করছেন? সোনার কলম হাতে নিয়ে আপনি জন্মেছেন। কিন্তু অনেক সময় নিজেই সেটাকে নষ্ট করছেন।' সমরেশ এক মুহূর্ত কোন কথা কইলেন না। তারপর সেই অতিপরিচিত মোহন হাসি-টি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বললেন, 'সব জানি। আপনার অভিযোগ খানিকটা মানি। কিন্তু সামলাতে পারি না, আমি সব জানি। আমি একটি জ্ঞানপাপী।' পরে বুঝেছি, ঐ ধরনেরই মানুষ কেউ কেউ থাকে। অপচয়ের ও বিশৃঙ্খলার বীজ তাদের স্বভাবের মধ্যে। কিছু তারা ফেলবে, ছড়াবে, নষ্ট করবে। কিন্তু তার পরেও গোলায় যা তুলবে তার পরিমাণ ও গুণ কম নয়, এই নষ্ট-টা করতে না পারলে তাদের সৃষ্টিশীলতাও বুঝি রুদ্ধ হয়ে যায়, শ্মশানের আগুন ও ছাই থেকেই বুঝি উঠে আসে কোন কোন নটরাজ।

বিংশ শতাব্দী, প্রবন্ধ পত্রিকা, কথামালা উঠে গেছে। হরপ্রসাদ গ্রে ষ্ট্রীট ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে চলে গেছে। 'জলসা' বন্ধ হয়ে গেছে। সমরেশের কর্মের ক্ষেত্র বেড়েছে। সমরেশের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেছে। এখানে-ওখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যেত। থিয়েটার দেখতে গিয়ে বেশ কয়েক দিন দেখা হয়েছে। শম্ভু মিত্রের গল্প পাঠের আসর হয়েছিল কলামন্দির বেসমেণ্টে, সেখানে সমরেশ এসেছিলেন। শম্ভু মিত্রের পঠিত গল্পের মধ্যে একটি ছিল সমরেশের 'স্বীকারোক্তি'। 'শাম্ব' যখন অ্যাকাডেমি পুরস্কার পায় তখন আমরা সমরেশকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গীতাদির স্কুলবাড়িতে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে। 'মহানগরে' চাকরি নেবার পরে একদিন দেখা। বললাম: 'এখন তো আর আপনি অভাবের মধ্যে নেই। কেন বৃথা এই চাকরি-টা নিলেন।' অপরাধী-অপরাধী হাসলেন। বললেন: 'দেখি দুদিন করে।' আমি বললাম, 'কিন্তু দেখতে দেখতে ত সময় ও শরীর চলে যাবে।' পরে সমরেশ তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে তিনি মহানগরের চাকরি দ্বারা 'পিষ্ট' হচ্ছেন। তবে ভাল কথা, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সময় ও শরীর তো কিছুটা গেলই।

অভিনেতা-বন্ধু নির্মলকুমার এবং মাধবী আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা' প্রযোজনা করেছিল। ওদের ইচ্ছে ছিল প্রথম দিন কিছু বিশিষ্ট লোককে ছবি-টা দেখায়। আমি আর নির্মল বিশিষ্ট লোকদের আমন্ত্রণ জানাতে লিষ্ট হাতে বেরোই। গেলাম সমরেশের সার্কাস রেঞ্জের ফ্ল্যাটে। প্রসন্ন

অভ্যর্থনা। তখন তাঁর শরীর একটা মৃদু চোট খেয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন ?' সমরেশ হেসে বললেন, 'ভাল।' পাশেই ছিলেন গৃহিণী টুনি। তিনি আরো হেসে বললেন, 'ও ভালই থাকে—যদি বদগায়েসী না করে।' সমরেশ কথাটা গায়ে না মেখে নির্মল ও আমার সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলেন।

একটি হঠাৎ-দেখার সময় তাঁকে বলি, "আনন্দবাজারে আপনার 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'-র সমালোচনা করেছি। তাতে একটু বিরূপ কথা বলেছি।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর: 'পড়েছি। ঠিকই লিখেছেন, ওটা ঠিক শারদীয়তে লেখবার বিষয় নয়। ওটা আরো সময় নিয়ে, আরো ধীরে সুস্থে লেখা উচিত ছিল। সেটা করতে পারলে মূল কথাটা ঠিকই থাকত, কিন্তু আর একটু রক্ত-মাংস-প্রাণ দিয়ে দাঁড় করানো যেত।'

১৯৮০-তে একদিন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বক্তৃতার বিষয়—'আমার উপন্যাস লেখা।' শঙ্খ ঘোষ বললেন আমাকে, 'আপনি মিটিং কনডাক্ট করুন। গোলমাল হতে পারে।' তখন বাম রাজনীতির তরঙ্গ সমরেশের বিরুদ্ধে উত্তাল। প্রবল বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়াতে হল সমরেশকে। আমরা নানাভাবে মধ্যখানে দাঁড়িয়েছি। তাও বিরুদ্ধতার সেই প্রবল তরঙ্গ ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না, কিন্তু সমরেশ অকম্পিত ছিল তার বক্তব্যে, তার সিদ্ধান্তে।

P 7292

ব্যক্তি-প্রসঙ্গ ছেড়ে চলে আসি সাহিত্য-প্রসঙ্গে। এত বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর এতগুলি লেখা বাংলা সাহিত্যে আর কে লিখেছেন ? আখ্যান ও চরিত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য তাঁর। বাংলা সাহিত্যের সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত পরিধিকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন। সাহিত্য-প্রাঙ্গণে নিয়ে এসেছেন নানা অঞ্চলের নানা জীবিকার মানুষ, গ্রামীণ মানুষ, শহরতলীর কারখানা-কেন্দ্রিক বাঙালী-অবাঙালী মানুষ, শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত, ইতিহাসের মানুষ, পুরাণের মানুষ, মেলার মানুষ, পথের মানুষ—মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকের চোখে পরিস্রুত হয়ে এরা আসে নি। এসেছে আকাঁড়া, অপরিস্রুত, কাঁচা-কাঁচা, খাঁটি, র, অথেনটিক। এদের তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন সমরেশ।

রচনারও হাজার রীতি, কোথাও লেখক-কথন, কোথাও চরিত্রের আত্মকথন। কোথাও বৃত্তাকার আঁটো বাঁধুনি, কোথাও প্রতি ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে যাওয়ার শিথিল রৈখিক ধারাবাহিকতা। কোথাও মাধ্যম বিবৃতি,

কোথাও চিঠি (যেমন, ফেরাই), কোথাও কথকতার ভঙ্গী (যেমন, ভানুমতী)—যা মনে পড়ায় হাঁসুলিবাঁকের কথক বুড়িকে। 'স্বীকারোক্তি' উপন্যাসের সব ঘটনা ঘটে গেছে বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু পরে দেখা যায় যে এমন কিছুই ঘটেনি। সবটাই নায়ক ঘটিয়েছে মনে মনে। কোথাও এপিক ব্যাপ্তি, কোথাও তীব্র ঘন খণ্ডচিত্র। আবার স্বতন্ত্র রীতি কালকূটের ভ্রাম্যমানতার; সে শুধু দেশ-ভ্রমণ নয়, সাক্ষাৎ-প্রাপ্ত মানুষের মনের কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ। তাছাড়াও আছে পৌরাণিক কালে মানস-ভ্রমণ।

ভাষাও তাঁর বিচিত্র। মধ্যবিত্তের শিক্ষিত ভাষা, কালকূটের সরল-গভীর কথ্য ভাষা, পৌরাণিক-আখ্যানে কখনো কখনো গম্ভীর ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা—এ সব তো লেখকের ভাষা, আর চরিত্রের ভাষা! তার মুখের কথা, মনের কথা, তার চিন্তাভঙ্গি—যা ভাষায় বিধৃত। চরিত্র ভাষায় বৈচিত্র্যের, বলা যায়, যেন শেষ নেই। নানা অঞ্চলের নানা জীবিকার মানুষ তাদের নিজেদের ভাষায় কথা কয়ে উঠেছে, ভেবেছে। সমরেশ সর্বদাই বলতেন, তিনি রিপিট্ করতে চান না। বিষয়ে, চরিত্রে, গঠনে, ভাষায়—কোথাও তিনি বিশেষ রিপিট করেন নি। তাঁর ইচ্ছা-টা অনেকখানিই রক্ষা করতে পেরেছেন তিনি।

সব মিলিয়ে এক বিশাল জটিল প্রাণবন্ত প্রবাহ—যা নানা আঘাতে-প্রত্যাঘাতে আবর্তিত হয়, উদ্‌ঘাটিত করে সমসাময়িক জীবনকে ও কালকে এই সময় ও তিনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বুঝতে চেয়েছেন এই কালকে, নিজেকে, নিজেদের।

এ সব সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে দুটো অভিযোগ খুব বড় হয়ে ওঠে। একটা অভিযোগ নৈতিক, অন্যটি রাজনৈতিক। নৈতিক প্রশ্নটার মধ্যে দুটো ভাগ আছে। একটা তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা হয়েছে। তিনি এ সব বিষয়ে খোলাখুলিই কথা বলতেন। বিশেষ বিশেষ নারী, তাঁর নানা নারী-সংসর্গ,—এ সব নিয়ে কথা হয়েছে। কোনো কোনো ঘটনা আমাদের সামনেই ঘটেছে। তাঁর মদ্যপান বিষয়েও কথা হয়েছে। একবার একটা কথা বলেছিলেন, 'আমি মাকে ভাল করে পাইনি। একটা গভীর অতৃপ্তি রয়ে গেছে। সব মেয়ের মধ্যে আমি বোধহয় সেই মাকেই খুঁজি। এমন কি মদ খাওয়ার মূলেও বোধহয় এটা।'

এ কথাগুলো ষাটের দশকে বলা। অনেক পরে সমরেশ একটি প্রবন্ধ লেখেন 'নিজেকে জানার জন্যে' (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২)। এখানে

আমাকে-বলা ঐ কথাগুলি গভীরতর তাৎপর্য লাভ করে, তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মিশে যায় চেতন ও অবচেতন, শৈশব ও যৌবন। সমরেশ লিখেছেন, 'অভ্যন্তরে জট পাকিয়েছে বিবিধ বহুতর জটিলতা। তথাপি মনে হয়, এখনো অবিরাম ছুটে ছুটে যাই শৈশবে, রসের সন্ধানে সেই মূলে। এক্ষেত্রে সাবালকত্বের কী সংজ্ঞা? সাবালক কি নাবালকের প্রতিমাটিকেই নানারূপে ভাঙে এবং গড়ে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত? সাবালক চির-অতৃপ্ত, নাবালক নাবালক না। নাবালক অতি শৈশবে, শিশু বয়সে, একবার কেঁদে উঠে মাতৃবক্ষে আপনার মহাপ্রাণীটিকে যুক্ত করে দিতে পারলেই তার তৃপ্তি এবং প্রাক্-কৈশোরের দিনগুলোকে নানান শাসন ভর্ৎসনার মধ্যেও, অতি সামান্যতা, অসামান্য তৃপ্তি বিধান করতে পারে এবং তারপরে নতুনতর বীক্ষণের আলো কে ছুঁইয়ে দিয়ে যায় দৃষ্টিতে, অন্তরের অনুভূতিকে করে তোলে সুগভীর। তৃপ্তি আর সেখানে থৈ পায় না। মাতৃবক্ষের অভাব পূর্ণতায় যত নারীবক্ষেই আপনার মহাপ্রাণীকে সঁপে দি, যত অসামান্যরূপেই আসুক সংসারের বহুবিধ দান, 'তবু ভরিল না চিত্ত'-এর যাত্রা সেই শুরু। ইতিমধ্যে নাবালকত্বের প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা শেষ, আর সাবালক চিরদিন ধরে সেই প্রতিমাটিকে সার্থক রূপ দেবার অবিরাম চেষ্টা করে চলে।'

সমরেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী টুনিও তাঁর মতো করে এ কথাটা বলেছেন। কিছুদিন আগে নিতাই বসুর বই বেরিয়েছে 'কালকূট সমরেশ'। তার ১৫০ পৃষ্ঠায় টুনি নিতাই বসুকে বলেছেন, 'ও চিরকালই নারীর মধ্যে মাকে খোঁজে—এটা বড়দির ব্যাপারেও ছিল। আমার ব্যাপারেও ঠিক তাই। আমার কাছে বাটিন যেমন নানারকম—আমি জানি কোনো ব্যাপারে ও বেশি দিন টিকে থাকবে না। এই এখন একটা ব্যাপার চলছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে অশান্তিও আছে। কিন্তু কতদিন! ছ মাস? এক বছর? ও ত আবার ফিরে আসবেই।'

হতে পারে, এই কারণেই সুরু। ক্রমে হয়ত তা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমি যতটুকু তাঁকে দেখেছি, তাতে জানি সবগুলি নারী-সম্পর্ক তাঁর এক রকমের নয়। শারীরিক ও মানসিক বিষয়ের নানা স্তর, নানা মাত্রা। ঘটনাগুলির ভিতরে তিনি ডুবে যেতেন তার সুখ, দুঃখ, আঘাত, বেদনা, উদ্বেগ এগুলিকে আকণ্ঠ নেওয়ারই বাসনা থাকত তাঁর। নীতির সাধারণ নিয়মকে না মেনে জীবনটাকে উলটে পালটে দেখবারই তৃষ্ণা তার, এই সব অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে ব্যাপকভাবে। নারী চোখে পড়ে বেশি।

কিন্তু শুধু নারী নয়, পৃথিবীর সব কিছুর দিকেই হাত বাড়ানো ছিল তাঁর। আজ এই জন্যেই হাত দুটোকে বাঁধা দেন নি তিনি কারো কাছে—না চাকরির কাছে, না কোনো সংগঠনের কাছে। গোটা জীবন-সমুদ্রই মন্থন করে সেই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে নিয়ে আসতে চেয়েছেন তিনি এই মন্থনে। জীবন-সমুদ্রের অতলে যা যা থাকে সবই উঠেছে—বিষ, অমৃত। তবে তাঁর লক্ষ্য ছিল অমৃত। মধ্যবিত্ত-সুলভ শুচিবাই তাঁর ছিল না। শ্লীলতা-অশ্লীলতার নকল বেড়া তিনি মানতেন না। মধ্যবিত্ত সংস্কারের কাছে বণ্ড্ লিখে দিতে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি ধরতে চাইছিলেন মানুষ, জীবন, এদের ভেতরটা, এদের শাঁস। আর শাঁসে পৌঁছতে গেলে আঁস বা খোসা তো পেরতেই হয়। তবে তাঁর জোর ছিল, তিনি ফাঁকি দেন নি। এই জীবন-মন্থনের দণ্ড ও রজ্জু ছিল তাঁর জীবন, তাঁর শরীর। এই মন্থনে তিনি নিজেও ক্ষয়েছেন, ছিড়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। তাঁর অকালমৃত্যুর অনেক কারণ আছে। একটা কারণ এটাও। নিজেকে দান ধরে তিনি সাহিত্য করতে নেমেছিলেন।

পরের প্রসঙ্গ—রাজনৈতিক। একথা সকলেরই জানা যে তিনি এক সময় অখণ্ড কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। জেল থেকে বেরবার পর তিনি সদস্য পদ রিনিউ করেন নি। শেষ জীবনে কয়েকটি লেখায় তিনি পার্টির একাংশের স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্র বিষয়ে স্পষ্টভাবেই লিখেছেন। এই সময়ের নানা আতিশয্য ও ভ্রান্তির কথা পার্টি নিজেই পরবর্তী কালে স্বীকার করেছে। শেষ জীবনে গান্ধীবাদ সম্পর্কে তাঁর কিছু আগ্রহ দেখা গিয়েছে কয়েকটি লেখায়। তাতে কেউ কেউ তাঁকে বলেছেন—গান্ধীবাদী। কিন্তু গান্ধীবাদ সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ করে জানবার চেষ্টা এবং গান্ধীবাদী হওয়া এক কথা নয়। তাঁকে আমার কখনই গান্ধীবাদী মনে হয় নি। গান্ধীজীর নীতিবাদ প্রভৃতি এমন কতগুলি দিক আছে, যা সমরেশের স্বভাবের ও সাহিত্যসাধনার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার মনে হয়েছে, তিনি সাম্যমূলক শোষণহীন সমাজে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের শৃঙ্খলা বহু সময় ব্যক্তির কাছে শৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে এই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নতুন করে তিনি দলীয় শৃঙ্খলার মধ্যে ঢুকতে চান নি। জেল থেকে বেরিয়ে খুব দারিদ্র্যের মধ্যে যখন তিনি, একটা বণ্ড লিখে দিলে চাকরি তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলা হয়। তিনি কঠিন দারিদ্র্য ও আর্থিক অনিশ্চয়তার জীবন বেছে নেন, কিন্তু বণ্ড দেন না। নিয়মিত সাহিত্য-জীবন সুরু হওয়ার পরে আনন্দবাজার থেকে তাঁকে চাকরি

দিতে চাওয়া হয়। তা তিনি নেন নি—স্বাধীনতা খর্ব হবে বলে। 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার পরে দেশ পত্রিকা থেকে তাঁকে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' বিষয়ে লিখতে বলা হয়। তিনি লেখেন নি। তাঁর নিজের মনে হয়েছিল, এতে বিপদ হতে পারে, তাও লেখেন নি। না লেখার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আবার খাদ্য আন্দোলনের সময় বামপন্থীদের সঙ্গে অর্থসংগ্রহে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের কাছে নতুন করে মুচলেকা দেবার ইচ্ছেও তার ছিল না। এখানেও নিজের স্বাধীনতা রক্ষায় আগ্রহী। এর ফলে বহু রাজনৈতিক দল সমরেশের নিন্দা করেছে, তাঁর অবমূল্যায়নের চেষ্টা করেছে, চরিত্রহনন করেছে। কিন্তু সমরেশ জন-মনে পূর্ণগৌরবে অধিষ্ঠিত। এমনিতেও জানা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে অনেক বড় করে তা জানা গেল। এইখানেই তাঁর জয়। এইজন্যেই জনগণের চাপেই, রাজনৈতিক দলের একদিন সমরেশকে মেনে নিতে হবে। তাছাড়া, তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি কারো অনুগ্রহের দান নয়, এ তাঁর অর্জন। বণ্ড দেন নি, কিন্তু ফাঁকিও দেননি।

সমরেশ বসু ঃ জোয়ান কোটাল মরা কোটাল

বিজিতকুমার দত্ত

সমরেশ বসুর লেখকজীবনের ছুটো চেহারা আছে। এক যেখানে তিনি স্বনামে লেখেন, ছুই যেখানে কালকূট নামে তিনি প্রকাশিত হন। কেউ কেউ সমরেশের দ্বৈতসত্তার কথা বলেছেন। একই মানুষের মধ্যে কি এই দ্বৈতরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে? অথবা, কেবলমাত্র দ্বৈতসত্তার পরিচয় পেলেই কি সমরেশ বসুর পূর্ণ পরিচয়লাভ সম্ভব? প্রশ্ন ছুটির মধ্যে আমাদের গতানুগতিক জিজ্ঞাসা ব্যক্ত। এই ভাবেই ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়ালে আমরা কতগুলি সত্তার পরিচয় পাব? এক না ছুই? নাকি বহুবিধ? সনেটকার এবং নাট্যকার শেক্সপীয়রের রচনার বিচার করবার সময় আমরা শেক্সপীয়রের কবি সত্তার পরিচয় পাব? সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক জিজ্ঞাসার অবতারণা করার মত অধিকার আমাদের নেই। সাধারণ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝি মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সরল পথে ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে। না ঘটার দৃষ্টান্তই বেশি। একজন লেখক যখন মানুষ, তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুধা বিস্তৃত হবে এতে সন্দেহের স্থান নেই। সমরেশ বসুর দ্বৈত সত্তা পৃথক কোনো শ্রেণী নয়—এদের মধ্যে জল-অচল ভাগও নেই। জগৎ ও জীবনকে একই মানুষ ছুদিক থেকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। ঠিকমত চর্চা করলে এবং প্রতিভার স্ফুরণ হলে হয়ত সমরেশ চিত্রকর এবং অভিনেতার রূপেও এই জগৎ ও জীবনকে স্পর্শ করতে চাইতেন। তখন কি আমরা বলতাম সমরেশ চতুরঙ্গ সত্তার অধিকারী। ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি যেমন জটিল, তেমনি তার কথকতার পাত্র বা আধারও বিচিত্র। কালকূটের ছদ্মনামে আমরা সমরেশ বসুকেই পাচ্ছি। সমরেশও তো সুরথ বসুর ছদ্মনাম। ডানপিটে, বেকার, উচ্ছৃঙ্খল, দারিদ্রক্লিষ্ট, সংগ্রামী সুরথ তো সমরেশের মধ্যেই মিশে আছে যেমন মিশে আছে কালকূট। সমরেশ যখন 'গাহে অচিন পাখি' নিবন্ধে কালকূটের পরিচয় দেন এবং তিনি যখন তাঁর 'নিজেকে জানার জন্যে' লেখকজীবনের প্রাক্কথন উপস্থাপন করেন আমরা কি এ ছুয়ের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান দেখতে পাই। কেউ কেউ বলেছেন সমরেশ খোঁজেন বাস্তব জীবনকে আর কালকূট বাস্তবকে অতিক্রম করে অনুসন্ধান করেন কোনো অধ্যাত্ম-

জীবনকে। লৌকিক-অলৌকিকের ব্যবধান আমরা মানি, কিন্তু শিল্পের জগতে এ দুইয়ের ভেদরেখা লুপ্ত হয়ে যায়। অনায়াসে সমরেশের বিটি রোডের ধারের ফোর টুয়েনটি অথবা শ্রীমতী কাফের ভজু লাট কালকূটের কলমে সৃষ্টি হতে পারত। তেমনি শাম্ব উপন্যাস লিখতে পারতেন সমরেশ বসু।

গঙ্গা উপন্যাস পড়লেই উপযুক্ত সত্যের পরিচয় পাব। বি. টি. রোডের ধারে অথবা শ্রীমতী কাফে'র চরিত্র দুটি ত কালকূটের সেই আরশিনগরের মানুষ। এবং আমরা যত সমরেশের লেখকজীবনের পরিণতির দিকে এগব তত দেখতে পাব কালকূট এবং সমরেশ বারে বারেই ঘরবদল করছেন। গঙ্গা উপন্যাসে সমরেশের দুই চেহারা আরও স্পষ্ট। অভিজ্ঞতা যত বিস্তৃত হচ্ছে সমরেশের অস্থিরতা যেন আরও বাড়ছে। সব কিছুকে মেলাতে গিয়েও যেন মেলাতে পারছেন না তিনি। তার ফলে যন্ত্রণা জন্ম নিচ্ছে। আর এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সমরেশ কেবলই ঘাট থেকে অন্য ঘাটে বিচরণ করছেন।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' তিনি যেতে পেরেছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র উৎসাহে। দু একটি জায়গায় ব্যর্থ হয়ে সমরেশ যখন আনন্দবাজারের উৎসাহ পেলেন তখন থেকে তিনি ঐ পত্রিকার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আনন্দবাজারে সমরেশ চাকরি নেননি। এখানেও তাঁর দ্বিধা লক্ষণীয়। ব্যক্তিত্বের দ্বৈতরূপের পরিচয় ফুটে উঠছে সমরেশের এই সিদ্ধান্তে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ভ্রমণ কাহিনী আবার ভ্রমণকাহিনী নয়। কালকূট নামগ্রহণের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে সমরেশ উল্লেখ করেছেন তাঁর 'গাহে অচিন পাখি' নিবন্ধে। সে উল্লেখ কৌতূহলোদ্দীপক। সমরেশ ভোটরঙ্গের রাজনীতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন 'কংগ্রেসের জোড়া বলদের এক বিরাট মিছিলের' বীভৎস তাণ্ডবে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছিলেন লিখে। সেই লেখায় তিনি জওহরলাল নেহেরুকেও অভিযুক্ত করেছিলেন। লেখাটি কালকূট ছদ্মনামে বার হয়েছিল। কালকূটের জন্ম সেদিনই। সমরেশ তখন লড়াকু রাজনীতিবিদ্। সমরেশ বলেছেন 'কালকূটের উদ্ভব সেই প্রথম রাজনৈতিক রচনায় আর সেই শেষ। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।' কিন্তু সেই সময়ে গৃহবাসী সমরেশ জানতেন তার প্রতিভাস্ফুরণের ক্ষেত্র এই জগৎ ও জীবন। যে জগৎ ও জীবন 'রাজনীতি দিয়ে ঘেরা'। আবার বলেছেন 'শরত আকাশের মতোই, রাজনীতির মেঘ উধাও হয়ে যাচ্ছে।...পার্টি নামে একটা বদ্ধ জলা থেকে যতোই মুক্তি ঘটছিল ততোই

বুকের মধ্যে এক ধ্বনি "তবু ভরিল না চিত্ত"।' এই অশান্ত চিত্ত নিয়ে তিনি যখন প্রয়াগে গেলেন তখন ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু দেখে তার কাছে ফুটে উঠল 'মহাশ্মশানের ছবি'। তারপর ফিরে যখন এলেন তখন তাঁর 'মনে হল, অশৌচ নিয়ে ফিরে এলাম নিজের দেশে'। সেই থেকে তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল 'আমার আরশীনগর যদি হয় জগত ও জগতজন, তাদের মধ্যে আমার পড়শী সত্তাটিকে সন্ধানই নামের (কালকূট) আড়ালে ঘুরে ফেরা। ইংরেজিতে একে আইডেন্টিফিকেশন বলে নাকি? যা খুশি বলুক গিয়ে ওতে আমি নেই। যা বলেছি তা-ই, আড়াল দিয়ে খুঁজে ফিরি বোধহয় নিজেকেই। তারই নাম কালকূট।' লীলা রায়ের প্রশ্নে 'নিজেকে জানবার জন্য নয় কেন?' —সমরেশ বিচলিত হয়েছিলেন। গঙ্গা লেখবার বেশ কিছুদিন পরে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলছিলেন 'সেই মুহূর্তে আমার লেখক সত্তার ক্ষেত্রে তা এক অভূতপূর্ব ক্রিয়া করেছিল,...মস্তিষ্ক জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল নিজেকে জানবার জন্য নয় কেন?' আমাদের মেনে নিতে হয় সমরেশ ও কালকূটের একটাই কথা নিজেকে জানবার জন্যেই লেখকের পিপাসা। অতএব সমরেশের 'দ্বৈতসত্তা' দুই মেরুর ব্যাপার নয়। এই দুই-য়ে মিলে সমরেশের জীবন। কিছুদিন আগে সমরেশ যখন দ্বিতীয় বারে কুম্ভমেলায় যান একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'দেখবেন এবারেও বহু লোক মরবে'। কথার ফাঁকে ফাঁকেই তিনি এই কথাটা বলে যাচ্ছিলেন। এত জোর দিয়ে বলছিলেন যে আমি প্রতিবাদ করবার সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। অনেকটা মৃত্যুকে তিনি স্বাভাবিক, অমোঘ বলে ধরে নিয়েছিলেন। গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার মতোই। সমরেশ যেন মহাত্মা গান্ধীর মত বিহারের ভূমিকম্পের সর্বনাশা রূপ দেখে দৈবের ওপর আস্থা স্থাপন করতে চাইছিলেন। কালকূটের কলমে যে লেখাগুলি বার হয়েছে সেখানেও যেন মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটেছে। প্রয়াগের স্মৃতি সমরেশের লেখায় হানা দেয় এই সূত্রেই।

এই স্মৃতির সামনে দাঁড়িয়ে 'গঙ্গা' লিখতে গিয়েই পাঁচুকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। দাদা নিবারণের মৃত্যুস্মৃতি পাঁচুকে গ্রাস করে আছে। সমগ্র উপন্যাসটিই এই স্মৃতিচারণা। স্মৃতিচারণার ফলে উপন্যাসের গতি মন্থর, শ্লথ। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, সেকথা পরে বলছি। সমরেশ যখন উপন্যাসটি আরম্ভ করেন তখনই নোনা জল আর মিঠে জলের প্রসঙ্গ এসে যায়। নোনা জলে মাছেরা আসে না। মিঠে জলে তারা ছুটে যায়। ছুটে যায় মরবার জন্যে।

মাছমারারা এই মিঠে জলের আশায় বসে থাকে। সমরেশ জলের এই রূপ এবং রূপান্তরের মধ্যে দেখতে পান সুদিন এবং দুর্দিনের চেহারা। আর এই দুর্দিনের এবং সুদিন জন্মমৃত্যুর চক্রকে উদ্ভাসিত করে। সৃষ্টির একান্ত বাস্তবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাত বছর আগে শাইদার নিবারণ মালো সমুদ্রযাত্রা করেছিল, আর সেখানেই প্রকৃতির হাতে তার মৃত্যু। সঙ্গে ছোটভাই পাঁচুও ছিল। সমরেশ নিবারণের চরিত্রের দুরন্ত রূপকে পরিস্ফুট করেছেন পাঁচুর স্মৃতিচারণে। সেই দুর্দান্ত নিবারণ সমুদ্রের টানে ভেসে যায়। মাছেরা তাকে হাতছানি দেয়। শিকারী শিকারের সন্ধান পায়। সেই সন্ধান তৎপরতা তার মৃত্যু ডেকে আনে। 'এখন যেন ঝাঁপাই ঝুড়ছে গঙ্গা। তার সঙ্গে আছে দক্ষিণা বাতাস। বাতাসে ঠিক সেই গন্ধটি পায় পাঁচু, সেই ডাক শুনতে পায়। দক্ষিণের ডাক। যেন বুকে বান ডাকে,...যেন মীনচক্ষুর হাসি। বলছে, এইটাই সংসারের খেলা। মাছমারা, এবার তোমার পালা এসেছে। মরণের ভয় তো মাছমারার নেই। মরণ ও মারণ, ঐ যে তার প্রত্যক্ষ জীবনের পথ।' পাঁচুর স্বগতচিন্তা আমাদের সেই 'মহাশ্মশানে'র যথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। একটু পার্থক্য আছে ; সমরেশ যেন চিনে নিতে চাইছেন, 'তার প্রত্যক্ষ জীবনের পথ'। শেষবারেও যখন হরিদ্বারে যাচ্ছেন তখন তাকে এই মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অমৃত অর্থাৎ জীবনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। পাঁচুর এই স্বগতোক্তি অবশ্য বাস্তবতাবর্জিত কোন অধ্যাত্ম বাসনাকে মেলে ধরে নি। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা যে পাঁচুকে বারে বারে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল তার উদাহরণ উপন্যাসটিতে অজস্র। বিষয়টিকে স্পষ্ট করবার জন্যে কিছু উদ্ধৃতি দিই : নিবারণের সমুদ্রে মৃত্যুর পরে পাঁচুর বিশ্লেষণ 'এ তো এমনি মাছ মারার মরণ নয়। গুনীন লোপাটের ষড়যন্ত্র হতে পারে মহা দানোর। কে বলতে পারে, চকভাঙা মাছের লোভানি দিয়ে ডেকে আনে নি সে। কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই।... মানুষটা নেই।' এর পরও এই মহা দানোর তাণ্ডবের সমরেশ বর্ণনা করেছেন আর তাও বিস্তৃতভাবে তাঁর উপন্যাসে। পাঁচু যখন নিবারণের মৃত্যুকে ঘিরে মাছমারাদের জীবনের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করে তখনও ভয় ও আশঙ্কার কথাই স্থান পায় বেশি। প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় নিবারণই প্রধান। উপন্যাসের গতিমুখ কোন দিকে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না। সমরেশ উজানের দিকে হাল ধরেছেন। অবশ্য সমাপ্তিতে লেখক যেন সুপ্তি থেকে জেগে উঠলেন। নৌকোর গতিকে তখন মোহানা অভিমুখী করলেন। উজানে যখন ভাসছেন

তখন মাছ মারাদের বক্তব্য এইরকম 'তুমি মারো মাছ, তোমাকে মারেন আর একজন। সংসারের নিয়ম।…যার সঙ্গে তোমার বাস, যে তোমার শ্বাস, সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সুতো গাঁথা হয়। বাইরে মর আর ঘরেই মর। নিদেনকালে একবার রক্তমাখা মীনচক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হবে তোমার।' একটু পরেই পাঁচু ভাবছে 'অনাচার করলে মরণ। ওই একটি জিনিস, মরণ। জীবনের শেষ আর প্রথম, এইখানে পদে পদে ফেরে। জীবন মরণের পাশাপাশি বাস যে!' ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত পরপর কতকগুলি লাইন এবারে তুলে দিই 'গহীন আশ্রয়ে ওত পেতে থাকে তোমার মরণ।' (৩৪), 'যেখানে জীবনকে আড়াল করে মরণ সব সময় হাত বাড়িয়ে আছে।' (৩৪), 'মন ভালো না থাকলে বলবে, "দক্ষিণে।" অর্থাৎ মরতে। যমের দোর ওই দিকে যে।' (৩৬', 'হু' আসলে মরণ তোমার পায়ে পায়ে ঘোরে তখন। মরণকেই বাঁচার চোখে দেখ।' (৭৬), 'এই গঙ্গা। দেখতে বড়ো শান্ত। কোলে তার সবাই মরতে চায়। মরণের সময়ে মরতে চায়। যখন নিদেন আসবে।' (১৪০), 'ভাটা ঠেলে সে আসে সমুদ্র থেকে, জোয়ার ঠেলে যায় সমুদ্রে। উজান তার বাঁচা। সে তখন একটানা ভাসবে, যখন মরবে। এই মাছমারার মতন।' (১৪২)। মাছমারারা মাছ মারে। শিকার ও শিকারীর সম্পর্কটি কেমন? 'সে (মাছ) উজানে আসে পেটে বাচ্চা নিয়ে। তাকে মারতে এসেছ তুমি।…মরবার সময় সে তোমাকে দেখে যায়।' (১৪২)। এইসব দৃষ্টান্ত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় সমরেশ মৃত্যুকে জীবনের পটভূমিকায় যত না স্থান দিয়েছেন তার চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন মৃত্যুর সর্বগ্রাসী রূপকে।

এরই ফলে উপন্যাসের প্যাটার্নটিও নির্ধারিত হয়েছে এমন একটি চরিত্রকে নিয়ে যার মধ্যে জেগে রয়েছে হতাশা, মৃত্যুর বিভীষিকা। পাঁচু চরিত্রটি গোড়া থেকেই হালছাড়া। শিল্পীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মীনচক্ষুকে বিদ্ধ করবার একাগ্রতা যত না প্রকাশ করেছে তার চাইতে নিজেকে নিয়ে সে বেশি বিব্রত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পাঁচু সংগ্রামী নয় একধরনের সংগ্রামবিমুখও বটে। সেজন্যে চরিত্রটি সাবালকত্বে পৌঁছতে পারছে না। সমরেশ পাঁচুকে কেন্দ্র করে মাছমারার কথকতা করেছেন। সে কথকতায় ব্রতীর ভক্তি আছে, আবেগ আছে কিন্তু পৌরুষের একান্ত অভাব। এইটিই স্বাভাবিক। আর তারই ফলে এসেছে পাঁচুর মধ্যে একজাতীয় জীবনবিমুখ দার্শনিকতা। আমাদের প্রতিক্ষণই স্মরণ করতে হচ্ছে লেখককে। পাঁচু আর সমরেশের মেলামেশামেশি লক্ষণীয়। এখানে তারাশঙ্করীয় কৌশল সমরেশ গ্রহণ করেছেন। পাঁচুর

জবানিতে সমরেশকেই আমরা পাই। কালকূট যেভাবে জন্মমৃত্যু রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে চান, একটু দূরে থেকে জগৎ ও জীবনকে তিনি যেভাবে লক্ষ করেছেন পাঁচুর রোমন্থন সেইভাবেই চলেছে। সমরেশ পাঁচুকে অনেকসময়েই নেপথ্যে ঠেলে দিয়েছে। সর্বজ্ঞ স্রষ্টা সৃষ্টিকে পুতুলখেলা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সেজন্যে জন্মমৃত্যুর রহস্যের উদ্‌ঘাটনে এই মায়াময় সংসারের সুখদুঃখ পাপপুণ্যের কথা এসে যায় এই উপন্যাসে। লক্ষণীয়, তিনটি মৃত্যুর বর্ণনা আছে গঙ্গা উপন্যাসে। নিবারণ, ঠাণ্ডারাম এবং পাঁচু।

পাপ-পুণ্য? সমাজজিজ্ঞাসা এ-দুটি আইডিয়া নিয়ে ক্ষতবিক্ষত। এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুখ আর দুঃখ। গঙ্গা উপন্যাসে পাপ-পুণ্য, সুখদুঃখের জোয়ার ভাঁটা। গঙ্গায় যেমন জোয়াল কোটাল আর মরা কোটাল। এই পাপ-পুণ্যের স্বরূপও বদলায়। পাঁচুর কাছে পাপ-পুণ্যের যে মূল্যবোধ, বিলাসের কাছে তা নয়। পাঁচুর জগৎ ও বিলাসের জগতে ব্যবধান বিস্তর। সুখদুঃখ বোধেরও। পাঁচু চায় নিরাপত্তা, আশ্রয়—বিলাস অল্পসুখে স্বস্তি পায় না, সে আরও আরও চায়। যেহেতু উপন্যাসটি পাঁচুর দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবৃত সেইহেতু সুখদুঃখের কথা প্রায় একঘেয়েভাবে আসে যায় 'গঙ্গা'য়। 'সংসারে দুঃখের ভাগ বেশী। সুখ কম। দুঃখ আসবে। তাতে দিশেহারা হলে, দুঃখ তোমার বাড়বে বেশী। চেয়ে দেখ, সেইজন্যে সংসারে অনাচার বেশী, বেশী মনের পাগলামি। প্রাণে তোমার লাগবে, কিন্তু এই অসময়টা সবধানে পার হও। এই এক একটি টোটা তোমার এক-একটি সংক্রান্তি।' (৭৩)। মাছমারারা দূরদূরান্ত থেকে আসে গঙ্গায় মাছ মারতে। প্রতি বছরই যে তাদের সুদিন হয় এরকম নয়। কখনও মাছ পায় কখনও পায় না। এই পাওয়া না-পাওয়া জলের এবং মাছের মর্জির ওপর নির্ভর করে। আরও পাঁচটা ব্যাপারও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মাছমারারা সবই জানে। পাঁচুর একেই দৈবের বিধান বলে মনে হয়। তার সংসারের শেকড় যেখানে জড়িয়ে গেছে সেখান থেকে তার মত মানুষের উঠে আসা সম্ভব নয়। জালে মাছ না পড়লে পাঁচু চেঁচিয়ে ওঠে। 'পাপ, পাপ ঢুকেছে এই নৌকায়। ওই শোরের নাতি তিনটি মৃত্যু পাঁচু, সয়ারামের ভাই। 'অমর্তের বউয়ের বিষ নিয়ে তোর এত পরাণ-দগদগানি' পৃ ১৪৩ পাপ মন নিয়ে এসেছে। (১৪৮)।' অথবা পাঁচুর (লেখকের?) স্বগতোক্তি 'মাছও তোমার মতোই এসেছে ঘোলা মিঠেন জলের আশায়।' (১৪২)। 'যদি পাপ করে ঘরে ফেরে, ছোঁড়া।' (১৩১)।

'বড়ো ভীষণ পাপ, যে যায়, সে তো বলে যায় না।' 'পাপ দোকাহ সাইয়ে। রক্তের মধ্যে বিষ নিয়ে আসছ। সারা গায়ে নিয়ে ফিরছ ছাপকা ছাপকা ঘা। ...তোমার পাপ। ভুগবে সবাই। পাপ এমনি করেই আসে।' (১৩০)। "গঙ্গায় এসেছ তুমি সুদিনের আশায়।...কূলে গিয়ে ভরা ডুবি হতে পারে।' (১২৪)। 'সুদিনে গঙ্গা সে দেবে আসল জিনিস।' (১২২)। 'জলেঙ্গা জল ।...নামে অনেকক্ষণ ধরে। এই জীবনের মতো। যদি দুদণ্ড তোমার সুখ হয়, চার দণ্ড তোমাকে দুঃখ পোহাতে হয়। চার দণ্ডের সুখে, আট দণ্ড দুঃখ। সংসারের নিয়মে এমনি বাঁধা পড়ে আছ তুমি।' (১১৫)। 'মনের ফাটলের মতো। অটুট মনের যে ফাটল দিয়ে পাপ ঢোকে, নিপাত দেয়, সেইরকম।' (৮৬)। এই পাপ-পুণ্য সুখদুঃখবোধ মাছমারাদের সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পাপ-পুণ্যের চিন্তা উপন্যাসে এতটা স্থান জুড়ে থাকায় উপন্যাসটির গতি শ্লথ হতে বাধ্য।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে 'প্রজা'রা 'রাজা'র শাসনে শোষিত। শোষক ও শোষিতের চেহারাটা তাঁর উপন্যাসে সংস্কার, ধর্মজিজ্ঞাসা, স্বার্থপরতা সবকিছুর সঙ্গে অঙ্কিত হয়ে ফুটে ওঠে। সমরেশের রচনাশৈলীও সেইরকম। তিনিও শোষক পাল মশাইদের নিয়ে আসেন উপন্যাসে। এই পাল মশাই দাদন দেয়, নৌকা ভাড়া দেয়, অভাবের দিনে মাছমারাদের ঋণ দেয়। পাঁচুর অতীত চারণায় সে সংবাদ পাই। পাল মশাইকে চকিত একবার দেখতেও পাই। মাছমারাদের দুঃখের শোচনীয়তা পরিস্ফুট হয় চৈত-টোটায়। যখন অভাবে অনটনে মাছমারারা গাজনের সন্ন্যাসীর ভেক নেয়। এই ক্ষণিক সন্ন্যাসব্রত আসলে তাদের পরাজয়ের করুণ দিক। মাছমারাদের কুলনাশ, জাতিনাশ ঘটে তখন। গঙ্গাযাত্রা যখন করে তখনও সঞ্চিত খাদ্য যখন ফুরিয়ে আসতে থাকে তখন মাছমারাদের উদ্বেগ লক্ষ করি আমরা। জাল টেনে টেনে হাতে যখন ঘা হয়ে যায় এবং সেই হাতে পোকা কিলবিল করে তখন এই মানুষগুলির শ্রমের ক্ষয়ের দিকটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সমরেশ যখন এইসব উল্লেখ করেন তখন আমরা পাপপুণ্যের সুখদুঃখের আর একটা মাত্রা এই উপন্যাসে প্রত্যাশা করি। কিন্তু সমরেশ বসু সেই আবর্তের দিকে আমাদের নিয়ে যান নি। সমরেশের সহানুভূতি জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায় না। জীবনকে তিনি ভালোবাসেন কিন্তু সৃষ্টির স্বেচ্ছাচারিতায় তিনি ফুঁসে ওঠেন না। অদৃশ্য নিয়ন্তার খেয়ালখুশিতে সমরেশ ক্লান্ত দৃষ্টিপাত করেন। এমন কি কেদমে পাঁচু, পাঁচু এবং অনন্তের সুখদুঃখের আলাপচারির মধ্যেও পাঁচুর

প্রতিক্রিয়া নেই। কালকূটের মেদুর ভাবনা উপন্যাসটিতে বিস্তৃত হয়ে যায়।

এই মেনে নেওয়ার অবশ চিন্তা লেখকের রচনার দিক থেকে ভয়ংকর বিপদকে ডেকে আনতে পারে। পাঁচুর রোমন্থনে যে বৈরাগ্যের স্বর ধ্বনিত হচ্ছে তা অমৃতকুম্ভ থেকে উদ্গীত। একধরনের আধ্যাত্মিকতা জন্মে যায় তখন। এরই ফলে উপন্যাসের শৈলীতে আসে সরলীকরণ। সরলীকরণের ফলে জীবনের ভাঙচুর সমরেশ দেখেন ঠিক-ই, কিন্তু এলাহাবাদে গুপ্ত সরস্বতী নদীর মতোই এই ভাঙচুরের আড়ালে তিনি অধ্যাত্মলীলার প্রবাহ আবিষ্কার করেন। সেজন্যে পাপপুণ্যের মতো সুখদুঃখ, সুদিন-দুর্দিন, মরা কোটাল জোয়ান কোটাল (অন্য ব্যঙ্গ্যার্থও আছে) নিদেন কাল ইত্যাদি জলের তলায় মীনদের মতই পাঁচুর ভাবনায় ঘুরে ফিরে আসে। আপাতদৃষ্টিতে এ তো সত্য যে মানুষ সুখদুঃখের 'সোমসারে' (সংসার) বাস করে। মাছমারার বউদের সুখদুঃখের কথা সমরেশ অনর্গল বলে যান। নিরারণ মাছ চুরি করতে যাবে। ক্যাঁচাবিদ্ধ হবার [illegible] ভাবনা। বউয়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। নিবারণ সমুদ্রে যাবে, অন্তঃসত্ত্বা বউর প্রসবযন্ত্রণা উঠেছে কিন্তু নিবারণের অবসর নেই, ঘরে চাল নেই, উপোসী বউ অনাহারে দিন কাটায়। স্বামী ব্যাভিচারী তবু তাকে নিয়েই সংসারে বাস করতে হয়। বহুচর স্বামীকে আগলে রাখার গ্লানি বউদের অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যে ফুটে ওঠে। পাঁচুর চিন্তাজালে এইসব ভাবনা যখন ধরা পড়ে তখন সে উদাসীন ব্যক্তির মতো ভাবে। জীবনের এই পাঁচপাঁচির গভীরে সে যেতে পারে না।

'গঙ্গা' উপন্যাস নিয়ে যাঁরা অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন তাঁদের সকলেই বিলাস-হিমির কাহিনীকে রোমান্টিক বলেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেমভাবনা বিলাস-হিমির প্রেমের উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিণতিতে বিস্তৃত হয়েছে। চরিত্র হিসাবে বিলাস রোমান্টিক চরিত্র। প্রথম দর্শনেই হিমির মুগ্ধ মনোভাব রোমান্সের জগতের ব্যাপার। বিলাসের রাত্রে অন্ধকারে জল আনতে যাওয়া, হিমির ঘরে রাত্রিযাপন এবং আত্মসমর্পণে দ্বিধার মধ্যে যে মার্জিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বাস্তবতাবোধের অভাব আমরা লক্ষ্য করি। দুজনে ধলতিতায় রওনা হবার আগে নৌকাবিহার এবং উত্তাল গঙ্গার বুকে দুটি হৃদয়ের ঘনশ্বাস কাব্যধর্মিতার লক্ষণ। বিলাসের সমুদ্রে যাত্রার ইঙ্গিত

উপন্যাসটিকে খুবই উঁচু স্বরে বেঁধে দিয়েছে। বলা বাহুল্য এই স্বর পাঠককে উত্তেজিত এবং অনুপ্রাণিত করে।

কিন্তু বিলাসের কাহিনীকে আমরা অন্য আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাই। বিলাসের কাহিনীনির্মাণে এবং চরিত্রগঠনে সমরেশ বসু তারাশঙ্করের রচনার দ্বারা প্রভাবিত একথা কেউ কেউ বলেছেন। তারাশঙ্করের অনিরুদ্ধ (গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম) এবং করালী (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা) চরিত্র দুটি বিলাসের পূর্বসূরী। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশের জীবনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের তুলনা করেছেন। সেই জীবনই বিলাসচরিত্র গঠনে গোপনে কাজ করেছে কিনা কে জানে? কিন্তু তারাশঙ্করের অনিরুদ্ধ প্রথাবদ্ধ, বশমানা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেও শেষ পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। লক্ষ্যহারা এই চরিত্রটিতে যে সম্ভাবনা ছিল তা পরিস্ফুট হল না। তুলনায় করালী অনেক বলিষ্ঠ এবং পূর্ণ। কিন্তু আগামীকালের মানুষের যে সম্ভাবনা ছিল করালীচরণের দৃপ্তভঙ্গিতে তাকে তারাশঙ্কর সরলরৈখিক না করে একটি পূর্ণ- [illegible] আবদ্ধ করে দিলেন। কারখানার শ্রমিক যে হতে পারত গোণকের [illegible] ...লীচরণের তাকে তারাশঙ্কর কৃষিজীবীতে পরিণত করে সান্ত্বনা পেলেন। কর[illegible] পরিকল্পনা আমাদের আরম্ভে যতটা উৎসাহিত করেছিল, পরিণামে ততটাই হতাশ করেছে। সমরেশ ঠিক এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাঁসুলীবাঁকের উপকথার করালীচরণকে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক ঐ উপন্যাসের উপসংহার তাঁর ভালো লাগে নি। বিলাস খুড়ো পাঁচুকে মান্য করেছে কিন্তু পোষমানা সুখী জীবনকে গ্রহণ করতে সমরেশ পারেননি। সংগ্রাম করেছেন, সংগ্রামের করুণ-মধুর দিক তাঁর জানা। তাছাড়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন যোদ্ধা হিসেবে সমরেশ জীবন সম্বন্ধে ঐ গতানুগতিক ধারাকে গ্রহণও করতে পারেন না। চল্লিশের পঞ্চাশের কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সমরেশ শিক্ষিত হয়েছেন। মধ্যবিত্তের ক্লিশে কাটিয়ে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছেন তিনি। রক্তের মধ্যে উত্তেজনাও অনুভব করেন। বহুকাল পরে ত্রিদিবেশের ('যুগ যুগ জীয়ে') কাহিনীতে সেকথা বলেছেন। গঙ্গায় তিনি পুরনো মূল্যবোধের নায়ককে বিদায় করে নবীন নায়কের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। একজন সৎ কমিউনিস্ট হতাশা-নৈরাশ্যকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর সামনে জ্বলতে থাকে সৌরজগৎ। সেই জগতের সন্ধানেই বিলাসের যাত্রা। অথচ সমরেশ যা বলতে চেয়েছেন, ফিরে ফিরেই বলতে চেয়েছেন, পার্টির সকলে তাকে বুঝতে চেষ্টা করেননি। কিছু বিশ্বাসঘাতকতা

তাঁর বুকে রেজেছিল। সেজন্যে তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। বলেছেনও পার্টি উধাও হয়ে যাচ্ছিল তাঁর মন থেকে। তাহলে সমরেশ কোনো নূতন ছকে আসতে চাইছেন। তারাশঙ্করও ছিটকে একবার পার্টির কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁর মনে হয়েছিল এ-পথ তাঁর নয়। সমরেশ নূতন ছকে আসতে চাইছেন কিন্তু তাঁর রক্তে খেলা করছে মার্কসবাদ। এই সমরেশের জীবনের ট্র্যাজেডি। সেজন্যেই শেষের দিকে মহাকালের রথের ঘোড়াতেও সেই ট্র্যাজেডির বেদনা। মহাকালের রথের ঘোড়া নায়কের কোণা চোখে তীব্র রেষ আর ঘৃণা, কিন্তু তাকে নূতন কোনো পথে নিয়ে যেতে পারেনি। সমরেশ নূতন প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন না সত্য কথা; তবু ইঙ্গিত দেন। তার গোড়াপত্তন গঙ্গা উপন্যাসে। আমার এই উক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে চমক আছে। কিন্তু ভেবে দেখতে বলি গঙ্গা উপন্যাসে বিলাসের সমুদ্রযাত্রা সমরেশের কাছে স্বপ্ন ছাড়া আর কি? যে নূতন ছকটা তিনি তৈরি করতে চাইছেন তার সীমাসহরদ্দ তাঁর জানা নেই। কিন্তু এখন থেকে তিনি সেই স্বপ্নেরই বাস্তবরূপ খুঁজেছেন, খুঁজবেনও। আর সংগ্রাম চলবে তাঁর কমিউনিস্ট জীবনের সঙ্গে নূতন উপলব্ধ জগতের। এখানে সমরেশ প্রায় একা। সমরেশের ভেতরে এই একাকীত্বের যন্ত্রণা বড়ো মর্মান্তিক ছিল। কোনো একটা দার্শনিক বিশ্বাসে তিনি স্থিত হতে পারেন নি। সেজন্যেই ভাঙাস্বরে উচ্চারিত হয় 'কোথায় পাবো তারে'।

বিলাসের স্বাতন্ত্র্য সমরেশ দুটি ঘটনার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। সে তার বাবা নিবারণ সাইয়ের মতোই দুরন্ত। তার রক্তে বাবার দুঃসাহসিক জীবনের টান। খুড়োর সঙ্গে গঙ্গায় এসে দক্ষিণের দিকেই সে দৃষ্টি মেলে ধরে। আর গঙ্গা যখন মাছ না দিয়ে চাবুক মারে তখন দক্ষিণ তাকে লোভায়। বাপের সংস্কার সে রক্তে বয়ে বেড়াচ্ছে। সেই সংস্কারকে লেখকের দেখাতে হবে। এবং তার প্রকাশ ঘটে তার বাছাড় হওয়ার মধ্যে। গ্রামের শ্রেষ্ঠ সে। শক্তিতে সে সকলকেই হারায়। রসিককে সে জলে চেপে ধরে। শারীরিকী ব্যাপার তার মানসিক শক্তিকেও প্রবল করে তোলে। করালী চরণের মতোই বিলাস প্রবীণদের নিঃশর্ত শ্রদ্ধা করে না। বড়ো নৌকো যখন কেদমে পাঁচুর নৌকা এবং জালকে উপেক্ষা করে ঢেউ তোলে তখন কেদমে হাহুতাস করে কিন্তু বিলাসই এগিয়ে গিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। পাঁচুও মাঝে মাঝে উদ্ধত বিলাসের দুর্বিনীত রূপের পরিচয় পায়।

কিন্তু এহো বাহ্য। বিলাস বয়ে বেড়াচ্ছে বিষ। পাঁচু যখন গামলী পাঁচীর সঙ্গে বিলাসের বিবাহের কথা ভাবছিল তার আগেই বিলাসের জীবনে এক গুরুতর ঘটনা ঘটে যায়। অমর্তের বউ বিলাসকে প্রলোভিত করেছিল। বিলাস সে প্রলোভন ঠেকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ভেঙে পড়ে। অমর্তের বউয়ের সঙ্গে তার যৌনমিলন হয়। এই মিলনের তীব্র স্বাদকে সে অস্বীকার করবে কি করে। অন্যদিকে সেই যৌনসংস্কারে এসেছে ঘৃণা। একে কি সে পৌরুষের পরাজয় মনে করেছে? এই জিজ্ঞাসা আমাদের আক্রান্ত করে কিন্তু ঠিক সদুত্তর পাই না। নৌকোর কাঁড়ারে বসে সে যে গান গায় তা হল, 'টানাছাঁদি টেনে চলি, পাথালি লৌকোর বুক,—হে / ওই আওড়ের ঘূর্ণি-জলে দেখব তোমার মুখ॥ / বড় উথালি পাথালি আমার বুক॥' এই গানের ধুয়াপদটি 'বড় উথালি পাথালি আমার বুক' বিলাসের অস্থিরতার দিকটিকে পরিস্ফুট করে। একেই সমরেশ বলেছেন 'বিলাস যে থেকে থেকে আচমকা গুম হয়ে যায়, তার কারণ ওর প্রাণে বিষ রয়েছে' (১২৩)। পাঁচু রোষে বলেছে 'অমর্তের বউয়ের বিষ নিয়ে তোর এত পরান-দগদগানি। বুকে তোর বিঁধে রইল কী? না ধিক্কার। বুক ভরে চাইলি তুই অমৃত। সেই অমৃতের ধারা হল তোর দামিনী ফড়েনীর নাতনী' (১৪৩)। অথবা 'কাউকে ছোবলালে, তার বিষক্রিয়া হবেই। তাই হয়েছে বিলাসের' (৫৯)। অন্যত্র পাঁচু বলেছে 'সাপে মানুষকে ছোবলালে, বেশীদূর যেতে পারে না। মানুষের বিষক্রিয়া হয় তার প্রাণে।···সেই দুপুরে অমর্তের বউকে ছুবলে এল বিলাস। কিন্তু বিষ নিয়ে এল। সবটাই এ সংসারের বড় বিস্ময়ের ব্যাপার।' আমরা দেখেছি পাঁচুর দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মিশে আছে সমরেশের জীবনভাবনা। মাঝে মাঝে এই দুই একাত্ম হয়ে যায়। এখন বিলাসের কি প্রতিক্রিয়া এই বিষক্রিয়া সম্বন্ধে? বিলাস বলেছে অমর্তের বউয়ের ঘটনার জন্যে তার নিজেকেই ঘেন্না করতে ইচ্ছা করছে। সে অমর্তের বউয়ের ভিটের দিকেও আর ফিরে চায় না। কিন্তু সে ভুলবে কেমন করে? 'আমার শরীলের কী য্যানো গইড়ে বেড়াচ্ছে। ওই যেমন পদ্মপাতার জল টলমল করে, তেমনি। ···আমার মন, আমার শরীল যেন কে বেঁধে রেখেছে।···আমি ছাড়ান চাই। ছাড়ান অর্থাৎ মুক্তি চাই' (৫৭)। এই মুক্তি সে চেয়েছিল হিমির কাছে। তার অশান্ত মন শান্ত হয়েছিল হিমির নীলাম্বরীর অঞ্চলে। কিন্তু প্রৌঢ় হিমি বুঝেছিল বিলাস একদিন তাকে ছেড়ে যাবে। বিলাসের মোহ ভেঙে যাবে। এই মুক্তির ডাকই বিলাস শুনতে পেয়েছিল দক্ষিণে, সমুদ্রে 'আমার

কিছুতে নাই মন / আমি ভাসব অকুল পাথারে হে / এই আমার মতি বিলক্ষণ।' (১৫৮) / অথবা, 'আমার ডাক পড়েছে সাগরে, / ঠাকুর আমার যেতে মন করে' (১৩৭)। পাঁচুর বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এই বিষ মানুষ বহন করে অমৃতের আশায়। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় একঘেয়ে গতানুগতিক জীবন থেকে নবীন জীবনের প্রত্যাশায়। এই বিষ আছে বলেই সে মুক্তির সন্ধান করে। গঙ্গা উপন্যাসে সমরেশের অস্থিরতা ধরা পড়ে এইখানে। সমরেশ কালকূট নাম গ্রহণ করেছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে। যে-অবিচার সমাজে চলছে, মনুষ্যত্বের যে বিকৃতি তিনি লক্ষ করেছিলেন সেদিনের মিছিলে, তারই বিষ বহন করছি আমরা। সেই বিষ-ই একদিন বজ্রকঠোর প্রতিবাদে অমৃতের স্বাদ এনে দেবে। এই বিষ আছে বলেই তো মুক্তির পিপাসা জাগে। আর সেই পিপাসাই সংগ্রামের জন্ম দেয়। এই বিষয়টাই তিনি বিলাসের জীবনে লক্ষ করতে চেয়েছেন। বিলাসও এক অর্থে কালকূট। পাঁচু বিলাসকে কেউটে বলেছে, বিষদাঁত ভেঙে দেবার কথা বলেছে। বিলাস তখন ফণা তুলেছিল। বিষদাঁত আছে বলেই বিলাস সমুদ্রে যেতে চায়। সমরেশ বিলাসের অস্তিত্বের চাবিকাঠিটি আমাদের হাতে তুলে দেন। কিন্তু সমরেশ যেই সূত্রে কালকূট বিলাস সেই সূত্রে নয়। বিলাসের সূত্র অনেকটা অমর্তের বউয়ের ঘটনার মধ্যে বাঁধা আছে। সমরেশ কি এইকথা বলতে চান যৌনসংস্কার মানুষকে সাব্লিমেট করে? এই সংস্কারের পাকে মানুষ বাঁধা। সমরেশের প্রথম উপন্যাসেই কেউ কেউ যৌনবোধের পরিচয় পেয়েছিলেন। সে নিয়ে কিছু বাদপ্রতিবাদও হয়েছিল। কিন্তু যৌনতাড়না আর যৌবনকে সমরেশ একই সূত্রে দেখা থেকে কখনও বিরত হন নি। গঙ্গার পূর্বে আর পরে লিখিত উপন্যাসগুলিতে এই যৌনবোধকে সমরেশ নানাভাবে দেখেছেন। এমন কি যৌনবোধকে সমরেশ দার্শনিকের দৃষ্টিতেও আঁকতে চেয়েছেন। সমরেশ বাংলা উপন্যাসে যৌনচর্চার নূতন দিগন্ত খুলতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' অথবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বিবাহের চেয়ে বড়' রচনায় যৌনবোধের পরিচয় আছে। নরেশ সেনগুপ্ত তো এই রোচক সাহিত্য সৃষ্টি করছেন বলে একসময়ে খুবই নিন্দা কুড়িয়েছিলেন। সমরেশের 'বই' দায়রায় সোর্পদ্দ হয়। কিন্তু লরেন্স, নুট হ্যামসুন, ইত্যাদি ইউরোপীয় গুরুর কাছ থেকে কল্লোলের লেখকরা যা পেয়েছিল তার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে উঁচুদরের সাহিত্য কিছু সৃষ্টি হয় নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ব্যতিক্রম। সমরেশ মানিক-ভক্ত।

কিন্তু তিনি যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পরিত্যাগ করেন। তাঁর উপন্যাসে উঠে আসে এমন এক জগৎ যা ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যাসে খুব সুলভ ছিল না। এর ভালো-মন্দ বিচারের স্থান এ নয়। তবে বাস্তবতার দিক থেকে সমরেশের যৌনচর্চার আত্যন্তিকতা পাঠকচিত্তে কিছুটা বিরূপতা জাগাবেই। গঙ্গার তীর দিয়ে পাঁচুর নৌকা যখন ভেসে যায় তখন তীরের বাসিন্দাদের খোঁজ নেন লেখক। সমরেশ অন্যান্য বসতি অপেক্ষা বেশ্যাপাড়ার বর্ণনা কিঞ্চিৎ বেশি করেই দেন। এবং এখানে যৌনতা বাস্তবতার খাতিরে কতটা আর পাঠক-মনোরঞ্জনের জন্য কতটা সে বিষয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। দেহপসারিণীদের বিবরণ বিস্তৃতভাবেই দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা লক্ষ করি সমরেশ পাঁচুর জবানিতে এই বিবরণ দিচ্ছেন। মেয়ের বাজারে মেয়েরা কি বলে? লেখক / পাঁচু ভাবছে 'আমার জিনিস এই নাও, সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছি, এখন তোমার পছন্দ। মাছের বাজারে এসেও তুমি তাই কর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ। দরদস্তুর কর। আমার কলজের কথা তুমি বুঝবে না। তুমি কিনিয়ে আমি বিকিয়ে। তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমার ওপরে আমার কথা চলে না।···মেয়েমানুষ নিজের অঙ্গ বিকোচ্ছে ওখানে। মানুষের অঙ্গ। তোমারো মানুষের অঙ্গ। একজন বিকোয় পেটের দায়ে। তুমি কেন মাছের মতো। ঘরে যার বউ নেই, তার রক্তে ধরে বেশী।···যে কেনে তার এটা স্বপ্নের তৃষ্ণা। স্বপ্নে যখন তোমার তৃষ্ণা পায়, তখন তুমি কত জল খাও। তবু তোমার তৃষ্ণা মেটে না। তোমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, বেরিয়ে যেতে চায় প্রাণটা। কত জল খাও, কত জল। তবু তৃষ্ণা মেটে না। তারপর স্বপ্ন ভাঙলে, কলসী থেকে জল গড়িয়ে ঘটি ভরে জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাও' (১০০)। ঋতুমতী গঙ্গার ঈষৎ ঝাঁঝানো বিবরণ দিতেও সমরেশ উৎসাহ বোধ করেন। একজন লেখকের বারবার এই যৌনবৃত্তান্তস্মরণ আমাদের চিনিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় লেখকের জীবন সম্পর্কে ধারণা। আগে বলেছি যৌনবোধকে কেন্দ্র করে সমরেশ যে জগৎ তৈরি করেছেন তাতে আণ্ডার ওয়ার্লড এবং আপার ওয়ার্লড দুই-ই উদ্ভাসিত হয়। আর এই উদ্ভাবনের সূত্রে আসে মিথ, ইতিহাস, গল্প, সংস্কার এবং বিচিত্র উপমালোক। উপরের উদ্ধৃতিটি জীবনের বিকৃতির দিক, ক্ষয়ের দিক। কিন্তু যৌনবোধের বর্ণনায় কেমন একটা মসৃণ আস্তরণ বিছিয়ে দেবার চেষ্টা আছে।

আর এই যৌনবোধের সাব্লিমেশনের রূপ সমরেশ দেখান বিলাসের যৌবনের মধ্যে। হিমি বিলাসকে ছুঁয়ে বলেছিল 'কী ভারী গন্ গো আপনার

মুখে! সে যে প্রলয়ের বান হয়ে আসে ছুটে। বুকের মধ্যে বড়ো পুবে সাঁওটার ঝড়' (১৮১)। 'বিলাসের জোয়ান কোটালের টানে আওড় দেখা যায়। সেখানে পাক দেয় ঘূর্ণী, ফুলে ফেঁপে ওঠে' (১৪৪)। সমরেশ এইভাবে যৌনবোধ এবং যৌবনকে মেলাতে চান। কখনও কখনও জীবনতৃষ্ণা ও যৌনবোধ প্রায় সমার্থক হয়ে উঠতে চায় তাঁর উপন্যাসে। এ এক ধরনের আচ্ছন্নতা। গঙ্গা উপন্যাসেও এই আচ্ছন্ন মনোভাবের পরিচয় সুলভ। এর জন্যেই হিমির উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বিলাসের যে যৌবনকে আমরা ছুঁই তার তাপ এত তীব্র। কিন্তু সমরেশ একদিকে যেমন আচ্ছন্ন তেমনি এই আচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে বড়ো মাপের জগতেও পৌছতে চান। সমরেশের উপন্যাসে এই তৃষ্ণার দ্বন্দ্ব জোয়ার ভাঁটার মতো উত্তাল আর ভেঙে-পড়া। এই টানাপোড়েনে অমৃত হারিয়ে যায়।

আমরা সকলেই জানি সমরেশ এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করেছেন। তাঁর বিষয়টা এমন ছিল যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দিতে পারত। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে সমরেশ যথাযোগ্যভাবে মেনে নিয়েও সেই পথে উপন্যাসটাকে বিন্যস্ত করেননি। কেন এমন ঘটল তার উত্তর দেওয়া শক্ত। তারাশঙ্করের উপন্যাসে অবক্ষয়ের চিত্র খুবই স্পষ্ট। জমিদারের পতনদশা আঁকতে তারাশঙ্কর সিদ্ধ। বেদেবেদেনী জীবনের গৌরবকে তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেন তেমনি সেই সমাজের বিলয় কীভাবে ঘটে যায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতেও তিনি নিপুণ শিল্পী। বনোয়ারির সংগ্রামের মহত্ব যেমন তাঁর উপন্যাসে পরিস্ফুট হয় তেমনি সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি মানুষের তথা সমাজের ক্ষয়ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সমরেশ পাঁচুর চিত্রটিকে সেই প্যাটার্নের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। নিবারণের উত্তরাধিকার পাঁচুর মধ্যে নেই। কিন্তু পাঁচুর জীবনবৃত্তান্তে নৈরাশ্য বড়ো বেশি উতলা করে পাঠককে। তার মৃত্যুও একটা অধ্যায়ের শেষ বলে মনে হয়। সমরেশের তারাশঙ্করের প্রতি টান এই কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসে ইতিহাসের অমোঘবোধ কাজ করে। ইতিহাসের গতি সামনের দিকে আর তাঁর চিত্র চরিত্র বিপরীত গতিতে চলতে চায়। এর ফলে উপন্যাসে গতির সঞ্চার হয়। এবং আমরা লক্ষ করি এই সংগ্রামে মানুষের শক্তির বিকাশ আর তার অসহায় করুণ আর্তনাদ। সমরেশ গঙ্গা উপন্যাসে সেই সাফল্য পাননি।

কিন্তু গঙ্গা উপন্যাসে সমরেশ তারাশঙ্করের মতোই তথ্যচিত্রনির্মাণে দক্ষ শিল্পী। গঙ্গার জলের গতি যেন তিনি অনুভব করেন। জলের রঙ পরিবর্তনের বর্ণনায় গঙ্গার চরিত্র উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। জেলেদের মাছধরার বাস্তব বর্ণনায় আমরা মুগ্ধ হই। মাছধরার জালের কত মাপ-পরিমাপ, কোন্ জালে কোন মাছ পড়বে, নৌকোর বিভিন্ন অংশের নামধাম, জেলেদের সাময়িক নৌজীবন, কড়েনীদের সঙ্গে জেলেদের সম্পর্ক, ইত্যাদির খুঁটিনাটি বর্ণনায় সমরেশ অনর্গল। আমরা জেলে জীবনের কাছাকাছি আসি এবং সমরেশ আমাদের বিস্মিত করে দেন তার অভিজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ঔপন্যাসিকের বড়ো সম্পদ তাঁর অভিজ্ঞতা। সমরেশ সেই সম্পদের অধিকারী। বি. টি. রোডের ধারে উপন্যাসে এই তথ্যচিত্র উদ্ঘাটনের প্রয়াস নেই। কিন্তু গঙ্গা উপন্যাস থেকে সমরেশের উপন্যাস রচনার প্রকরণে এই তথ্যচিত্রনির্মাণ গুরুত্ব পেতে থাকল। উপন্যাসে এই প্রাকরণিক কতটা গ্রাহ্য সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। কেননা উপন্যাস তো তথ্যচিত্রনির্মাণ নয়। তথ্যের সত্যকে সে চায়। সত্য তখনই পাওয়া সম্ভব যখন সে তথ্য জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। গঙ্গা উপন্যাসে গঙ্গার জল (মুকড়া, চলন্তা, জোয়ান, মরা, মেকো-র আবির্ভাব এবং মৃত্যু), বিভিন্ন প্রকারের জাল (টানাছাদি, সাংলো, কঁ্যাচা (মাছ ধরার অস্ত্রবিশেষ) এসব যখন পাই তখন পাঠক কেবল বিবরণই পায় না, তার সঙ্গে জীবন সংগ্রামকেও পায়।

একদা সমরেশ আমাকে বলেছিলেন তিনি একই জীবনের মধ্যে বারে বারে ফিরে আসতে চান না। এখানে আমরা একজন সৎ লেখকের পরিচয় পাই। তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি যখন ফুরিয়ে যায় তখন তিনি কলম তুলে নেন সেখান থেকে। আর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত বলে সমরেশ অনায়াসে বিষয়ান্তরে চলে যেতে পারেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের দিকে তাকালেই এই সত্য ধরা পড়বে। গঙ্গা উপন্যাসে সমরেশের এই প্রয়াস। জীবনের বাঁকে বাঁকে তিনি রহস্যের সন্ধান পান। এইরকম একটি বাঁক গঙ্গা উপন্যাস। এইভাবেই তিনি জগৎ ও জীবনের মধ্যে বিষ ও অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। কালকূট এবং সমরেশ সেই জীবনরহস্যের কাছে নিবেদিত প্রাণ।

সম্পর্ক

কালিদাস রক্ষিত

কালি-পড়া হ্যারিকেনের আলো নিবু নিবু করে কমিয়ে দিয়ে ইউসুফ সবেমাত্র মশারির ধারগুলো বিছানার তলায় গুঁজতে শুরু করেছে, দরজায় মৃদুশব্দে টোকা শুনে চমকে তাকাল।

যদিও পরাণডাঙ্গার জীবনে একটু তাড়াতাড়ি মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নেমে আসে, তবুও বেশ কিছুকাল যাবৎ এ বাড়িতে সে স্তব্ধতা প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে বেশ দেরি করে। এ বাড়ির একমাত্র ছেলে ইউসুফের মনে শান্তি নেই। ভীষণ বিচলিত তার মন-মেজাজ। অফিস থেকে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। মাঝে-মধ্যে ঝাঁঝালো গন্ধও তাঁর মুখ থেকে বেরয়। রাত-বিরেতে কোথায় যায়, কি করে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর কোনদিন পায়নি তার দজ্জাল বুড়ি আম্মা। কেবল গোমড়া-মুখে থ মেরে থেকেছে ছেলে। কখনো-সখনো অগ্নিমূর্তি-মায়ের ধমকের উত্তরে এমনই দুর্বোধ্য জটিল দু'একটা কথা বলেছে—যা বিষণ্ণ, কি করুণ, কি যন্ত্রণাদগ্ধ কি উদাসীন কিংবা ক্রুদ্ধ—কিছুই ঠাহর করতে না পেরে বুড়ির জ্বালা আর দুশ্চিন্তা হয়েছে দ্বিগুণতর।

তাই ইউসুফ না ফেরা পর্যন্ত বুড়ি হ্যারিকেন হাতে নিয়ে ঘর-বার করেছে শতবার। আপন মনে বকবক করে। খাঁচায় পাখা-ঝাপটানো মুরগীগুলোকে গলা কাটিয়ে গালমন্দ করে। কখনো মশা তাড়াবার জন্য গোয়ালের ধিকি-ধিকি আগুন অকারণে উস্কে দিতে দিতে, সেই সাত সকালেই ঘুমিয়ে পড়ার জন্য বৃদ্ধ চাকর কাশেম মিঞাকে গালমন্দ করতে করতে কিংবা বাড়ির আসপাশ দিয়ে ছোটাছুটি করা শেয়াল-কুকুরকে হৈ হৈ করে তাড়াতে তাড়াতে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে-আসা স্তব্ধতার শরীরে এলো-মেলো আঁচড় কেটে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

ইউসুফের সেই দজ্জাল আম্মা আজ বাড়িতে নেই। দাওয়াত করতে গেছে আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ি।

সুতরাং এই সুযোগে স্তব্ধতা বরং আজ একটু তাড়াতাড়িই জাঁকিয়ে বসেছিল এ-বাড়িতে। তার ওপর সকাল থেকে আকাশটা মেঘে মেঘে ঠাসা। গুমগুম শব্দে মেঘে হাঁক-ডাক আর আকাশ-চেরা বিদ্যুতের ঝলকানের সঙ্গে

বিকেলের দিকে দু'এক পশলা হাল্কা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাসও বয়ে যাচ্ছে হুসহাস শব্দে।

প্রকৃতির এহেন আদর্শ-অনুসঙ্গে ইউসুফের রক্তের মধ্যে আজ তার সেই মাঝে-মধ্যে অসহায় অভ্যাসটাকেই গনগনে আগুনের মত তাতিয়ে ছিল। সে পেট পুরে কষা মাংস-পরোটা আর দিশি মদ খেয়ে যথারীতি বেশি রাতেই বাড়ি ফিরেছে।

বুড়ো কাশেম চাচা ঘুমে আঁটা চোখ কচলাতে কচলাতে গলায় বিরক্তি ফুটিয়ে বলেছিল, "ঘরে ভাত ঢাকা আছে।"

ইউসুফের সে ভাত ছোঁবারও দরকার হয়নি।

এক ইটের গাঁথনি-দেয়া দেয়াল, টালির ছাদ, মাঝখানে পার্টিশান দিয়ে দুখানা ঘর। বারো বাই চৌদ্দ মাপের ঘরখানা ইউসুফের। পাশের ঘরখানা কিছুটা ছোট, আম্মা থাকে। মাটির দেয়াল আর বিচালি-ছাওয়া পৈত্রিক বাড়ির জায়গায় এই নতুন ঘর। হাউস-বিল্ডিং লোন নিয়ে বছর দুয়েক হল ইউসুফ বাড়িটা করেছে। ঘরের একধারে কোকো কাঠে তৈরি একটা টেবিলের ওপর অন্যান্য অনেক টুকি-টাকি জিনিস-পত্রের মধ্যে থালায় ঢাকা-দেয়া ভাত ও সবজি ছিল। সেই ভাতের দিকে তাকিয়ে দিলখুশ ইউসুফ বলেছিল, "তোকে সেলাম আজ। কাল রোববার। সাটাব পান্তা। আর বেশি গেজিয়ে যাও তো শালা যাবে গরু আর মুরগীর পেটে।"

বেশ মৌজ করে পর পর দুটো বিড়ি টেনে একটু একটু ঠাণ্ডা আমেজে একটা যন্ত্রণাহীন ঘুম-ঘোর রাত কাটানোর আবেশ-বিহ্বলতায় ইউসুফ শুতে যাবে, তখনই দরজায় সতর্ক হাতের টকটক শব্দ!

ইউসুফ মশারির মধ্য থেকেই বোঝার চেষ্টা করল। এই ঝড়-বাদলের গভীর রাত্রিতে কে হতে পারে? মানুষ, না অন্য কিছু? ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে তার বিশ্বাস নেই। হাওয়ার শব্দও ওটা নয়। কালুচাচা দরকার হলে হেঁড়ে-গলায় চেঁচায়। তবে? তবে কি কোন ছিঁচকে চোর? দরজায় টোকা দিয়ে গৃহস্থকে কেনই বা জাগাতে যাবে সে বেটা বুদ্ধু! তবে কি··· তবে কি···খালি পেটে এক চুমুক ধেনো পড়লে সারা শরীরটায় যেমন একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ ঝলকে ওঠে, কথাটা মনে আসতেই তেমনি একটা চকিত অনুভূতি ইউসুফের শরীরে খেলে গেল।

না, না। সে হতেই পারে না। এ অবাস্তব কল্পনা। এত রাতে চোরের

মত লুকিয়ে সে আসবে কেন! ঘৃণা ক্রোধ যন্ত্রণার আগুন বুকে নিয়ে সে চলে গেছে। হয়ত ওটা হাওয়ার শব্দ।

আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ইউসুফ শুতে যাচ্ছে, আবার টোকা দেবার শব্দ। এবার বেশ জোরে জোরে, দ্রুত আর ত্রস্ত।

ইউসুফ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল।

কে? এত রাতে দরজা ধাক্কায় কে? সাড়া দাও।

হুসহাস শব্দে দমকা বাতাস আর ঝিরঝিরে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে ইউসুফের উৎকণ্ঠিত কানে যে কণ্ঠস্বর এসে পৌঁছোল, তা মুহূর্তে যেন একটা আচম্কা ধাক্কায় ছিটকে ফেলল নিয়ে দরজায়।

কিন্তু—ছিটকিনিতে হাত দিয়েও ইউসুফ থমকে দাঁড়াল। এই ঝড়-বাদলার গভীর রাতে দরজায় টোকা দিচ্ছে হাসিনা! কেন? কি ওর অভিসন্ধি? সে আজ ঘরে একা। বদলা নিতে চায়? ওর হাতে হয়ত উদ্ধত ধারালো অস্ত্র।

হ্যারিকেনের আলো চড়িয়ে দিয়ে বলল, এত রাতে—এই ঝড়-বাদলের রাতে কেন এসেছিস? ইউসুফের গলা কঠিন, গম্ভীর। সঙ্গে আর কে আছে?

আঃ! মিছিমিছি তক্ক না করে দরজাটা খোলই না বাপু। সেই পরিচিত ভঙ্গি, কথা বলার ধরন-ধারণ জোরালো হয়ে ফুটে ওঠে হাসিনার অসহিষ্ণু গলায়। বৃষ্টির ছাটে খোকা ভিজে যাচ্ছে যে!

খোকা! এ-সব কী বলছে হাসিনা! ইউসুফের মাথার ভেতর তোলপাড় আর এক বিপন্ন ঝড়। সে দরজায় কান পাতে। সহসা একটি শিশুর কান্না ভেসে এল। ঝড়-বৃষ্টির সমস্ত পার্থিব শব্দ ছাপিয়ে-আসা ঐ ক্ষীণ আর্তস্বর যে একটি মানবশিশুর তা বুঝতে ইউসুফের এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না।

সে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল।

হাওয়ার বেগ আর হাতের ধাক্কায় দড়াম করে দরজা খুলে ঘরের ভেতরে হাসিনা প্রায় ছিটকে এসে পড়ে।

ইউসুফ বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে যা দেখল তাতে সে জেগে আছে, না ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন চেতনায় এক অসম্ভব স্বপ্নের অভাবিত দৃশ্যের প্রতি স্থির চোখে তাকিয়ে আছে প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না।

হাসিনার সমস্ত শরীর প্রায় জবজবে ভেজা, দুহাত দিয়ে ভেজা বুকের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে ধরে আছে একটি ছোট্ট শিশু। ভাঁজ-করা কাপড়ের মধ্যে তার সারা শরীর ঢাকা, শুধু কচি মুখটা দেখা যাচ্ছে। ঈষৎ নীলচে আভা-ছড়ানো

ঠোঁট, লাল রং-ধরা সেই মুখে ফুটে আছে কষ্ট আর যন্ত্রণা। সে মৃদু শব্দে কঁকাচ্ছে। ঢাকা কাপড়ের নিচে ছুঁড়ছে নরম কচি হাত-পা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাবলার মত হাঁ করে কি দেখছ? মশারিটা খোল না। খোকা ভিজে গেছে, দেখছ না?

হাসিনার কণ্ঠস্বরে আর ভঙ্গিমায় ছিল এমনই এক অমোঘ শাসন আর নির্দেশের স্বর, ইউসুফ যেন নিজের অজ্ঞাতেই তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

হাত থেকে ঝোলানো জালি-ব্যাগটা মাটিতে রেখে হাসিনা শিশুটিকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল। আলনার অগোছাল কাপড়-চোপড় থেকে একটা লুঙ্গি টেনে আনল। ভিজে কাপড় সরিয়ে শিশুটির মুখ আর মাথা মুছে লুঙ্গিটা দিয়ে তাকে ঢেকে দিল। তারপর কোন কথা না বলে সে তার জালি ব্যাগ থেকে বের করে আনল একটা ল্যাকটোজেনের কৌটো। টেবিলের ওপর থেকে দেশলাইটা তুলে মাঝের দরজাটা খুলে পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল, খোকাকে দেখো। আমি একটু দুধ করে নিয়ে আসি। বাছার বড্ড খিদে পেয়েছে গো।

দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ইউসুফ এতক্ষণ নিঃশব্দে যেন একটা চমকে-ওঠা সিনেমা দেখছিল। সে এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বিছানার সামনে।

তিন-চার মাসের একটা বাচ্চা। একটু রোগাটে দুস্থ চেহারা। ওর চোখে-মুখে তখন আর সেই কষ্টের চিহ্নটা তীব্র হয়ে ফুটে নেই। বরং সেখানে এখন একটু আরামের, তৃপ্তির আভাস। মুখের ভাব-সাব দেখে সেও বুঝতে পারে বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে।

গল্পের মত এই আকস্মিক দৃশ্যটা ইউসুফের বুকের ভেতর রিণরিণে ব্যথার মত একটা সুখের অনুভূতি বাজিয়ে তুলল। সে, যেমন করে কোমল মানুষ কোমল ফুল ধরে, তেমনি ভাবে শিশুটির মুখ স্পর্শ করতে গিয়েই চমকে সরে এল।

অনেকগুলো প্রশ্ন উন্মত্ত ঝড়ের মত ঝাপটা মেরেছে তার বুকে। কে এই মানবশিশু? হাসিনা একে কোথায় পেল? একে নিয়ে কেনই বা সে চোরের মত লুকিয়ে মাঝরাতে তাদের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করল?

অনধিকার প্রবেশ! ইউসুফ ভাবনায় হোঁচট খেল পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে। হ্যাঁ, তাইত। সে যেন ঐ শিশুটির সঙ্গেই কথা বলছে, এমনভাবে বিড়বিড় করল। কয়েকদিন পরেই তো সে হাসিনাকে তালাক দিতে যাচ্ছে। তালাক দেবার পরমুহূর্ত থেকেই তো এ-বাড়ির সঙ্গে ওর সমস্ত সম্পর্ক শেষ।

ইউসুফ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে বসল।

বাইরে ঝড়-বৃষ্টি সমানে চলছে। বৃষ্টির দাপট তখন ঝড়ের চেয়েও বেশি। অঝোরে-ঝরা বৃষ্টির শব্দ যেন দমকে দমকে বাতাসের সঙ্গে কোন দুঃখিনী মেয়ে-মানুষের বুক-ফাটা করুণ কান্নার মত বেজে চলেছে।

অথচ সেদিন হাসিনা কি আশ্চর্য নীরবতায় মেনে নিয়েছিল ওকে তালাক দেবার সিদ্ধান্তের সংবাদটা। সংবাদটা শুনে তার মাথায় বাজ পড়েনি। সে কোন প্রতিবাদ করেনি। কান্নাকাটি করেনি। এমনকি স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকায়নি একবার। আগের মতই বাড়ির সমস্ত কাজ করে গেছে নীরবে। রাতে শুয়েছিল মাটিতে। পরদিন ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে সামান্য কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে যেন তাকে অমোঘ অনিবার্য কপালের লিখন রূপে মেনে নিয়েই হাসিনা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

কিন্তু ইউসুফের বিচারে হাসিনা অপরাধী ছিল না। সন্তানধারণের অক্ষমতার জন্য শুধু তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। তার জন্য হাসিনার শরীরের যন্ত্রপাতিই দায়ী। আর সে-সব যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা তো স্বয়ং খোদাতাল্লা। এ-সব যদি সত্যি সত্যিই বুঝে থাকো তবে কেন তাকে তালাক দিতে সম্মত হয়েছো চাঁদু।

প্রশ্নটা দিয়ে যেন নিজেকেই তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মত বিদ্ধ করল ইউসুফ। সে উত্তরের জন্য হাতড়ে বেড়াল! ছটফট করতে করতে টেবিলের ওপর থেকে একটা বিড়ি তুলে নিল। দেশলাই না পেয়ে হারিকেনের আলোতেই বিড়িটা ধরাল। কার্বনে বিড়িটা কালিময়। ভ্রূক্ষেপ না করে সে ঘন ঘন টানতে লাগল।

সাদির চার বছর পেরিয়ে যাবার পরেও যখন তাদের কোন সন্তান হল না, তাদের চেয়েও অনেক বেশি ছটফটানি দেখা দিল আম্মার। উঠতে বসতে গঞ্জনাঃ "এ কিরম মেয়েমানুষ গো, হায় আল্লা! মা হ'তে জানে না। বাঁজা নাকি!"

হাসিনা একদিন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ভয়ে আতঙ্কে কম্পমান তার গলা, "আমাকে ডাক্তার দেখাও না গো।"

হেলথ সেণ্টারে দেখানো হল, কাজ হল না। কবিরাজ, ওঝা, বদ্যি, তুকতাক, সকলেরই দ্বারস্থ হল আম্মা, ফল হল না।

সবশেষে এল, মৌলভী সর্বনাশা বিধান। সাজ পরামর্শ চাইতে গিয়েছিল তাঁর কাছে। নির্দেশ এল—"তালাক দাও।" সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই যে নারীর, সে তো নারী নয়—সাক্ষাৎ ইবলিশ, ইসলামের চোখে বাঁজা নারী ঘোর পাপিষ্ঠা। শরিয়তের বিধানে 'তালাকই' হচ্ছে তার একমাত্র শাস্তি।

ইসলামের চোখে পাপিষ্ঠা সেই বন্ধ্যা হাসিনাকে 'তালাক' দেবার মজলিশ বসবে তাদেরই বাড়ির অঙ্গনে। আল্লার প্রতিনিধি মৌলভী সাহেব আসবেন, আসবেন পাড়ার আরো গণ্যমান্য ব্যক্তি। আম্মা আত্মীয়কুটুমের বাড়ি গেছে মৌলভী নির্দেশিত সেই বিধান সভায়। উপস্থিত থাকার দাওয়াত করতে।

ঐ সর্বনাশা নির্দেশের বিরুদ্ধে কেন দাঁড়াতে পারনি? ঘন ঘন বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে নিজেকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারল। মনে মনে ক্ষেপে উঠলেও কেন মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারেনি ইউসুফ? ভয়ে? নাকি আভাসে ইঙ্গিতে শোনা, বোঝা কিছু জমিজমা সহ মৌলভী সাহেবের খোঁড়া কিন্তু ডবকা মেয়েটাকে নিকা করার লোভের চমক ছিল তার মনে? কোন্‌টা?

না না, এটাই সব নয়। ছটফট করতে করতে ইউসুফ উঠে দাঁড়াল। মুখের নিবু নিবু বিড়িটা থুঃ করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। আসলে হাসিনা, হাসিনাই তাকে বাধ্য করেছে। ও যেন কোন রক্তমাংসের রহস্যময় নারীর শরীর নয়। ওর মন কেমন যেন যন্ত্রের মত সচল কিন্তু নিষ্প্রাণ, অনুভূতিহীন, পাংশে। দিবারাত্র মুখ বুজে ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম করা আর রাতে তার বিছানায় এসে তার সেই রহস্যহীন মেদমাংসের স্থবির শরীরটা ছেড়ে দেয়া। ব্যাস। হাসিনা যে তাকে ভালবাসে, একটি নারীর লীলাচপল যে দুর্জ্ঞেয় ভালবাসা পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত বাসনায় প্রতীক্ষিত, সে ভালবাসা কোনদিন ক্ষণিকের জন্যও উপলব্ধি করেনি ইউসুফ।

সেই হাসিনাই আজ আবার এভাবে ফিরে এল একটা অচেনা শিশু কোলে করে! এর কী মানে! হা খোদা, কী রহস্য জমে আছে এই তাজ্জব ঘটনার পেছনে?

ইউসুফ অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তাঁর মাথার চুল বজ্রমুঠিতে খামচে ধরে।

হাসিনা এ-ঘরে ঢুকছে। হাতের তালুর ওপর কাপড় জড়ো করে একটা দুধের বাটি রাখা। বাটিতে চামচ।

হাসিনা শিশুটিকে তুলে এনে মাটিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসল। বাচ্চাটাকে কোলের ওপর চিৎ করে শুইয়ে চামচ দিয়ে বাটি থেকে দুধ তুলে ফুঃ দিয়ে ঠাণ্ডা করে তার হা-করা মুখে ঢেলে দিল।

চুকচুক শব্দ উঠল ক্ষুধার্ত শিশুটির চঞ্চল মুখে। সে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, আনন্দে, আহ্লাদে।

ইউসুফের দিকে তাকিয়ে হাসিনা হাসল। যেন মেঘগর্ভ আকাশের বুক চিরে এক ঝলক বিদ্যুতের নিঃশব্দ চমক।

বুকের ভেতরটা কেন যেন ছলকে ওঠে ইউসুফের। সে চোখ ফেরাল ভয়ে।

দেখলে? কি খিদেটাই না পেয়েছিল গো বাছার। আহা রে!

আহার-শেষে হাসিনা শিশুটিকে ফের বিছানায় শুইয়ে দিল। পরিতৃপ্ত মানবশিশুটি ঘুমিয়ে পড়ল নিমেষে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। বাতাসের শব্দ নেই। ঘরের ভেতরে সমস্ত শব্দ এখন স্পষ্ট, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যেন ঘুমে আচ্ছন্ন শিশুটির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

হাসিনা ইউসুফের দিকে পেছন ফিরে কাপড় বদলাল।

এই বাচ্চাটা কার? একে কোথায় পেলি? ইউসুফই প্রথমে কথা বলল। তার গলা কাঁপা কাঁপা ভয়ে, উত্তেজনায়, আশংকায়।

হাসিনা সরাসরি তাকাল তার দিকে। সে চোখে উকি দিচ্ছে দুর্বোধ্য রহস্য। একটু পরে সহজভাবে বলল, ধর আমার বাচ্চা। আনমদের বাপের বু[illegible] ছিল, নিয়ে এলাম।

অবান্তর রূঢ় স্বরে ধমকে উঠল ইউসুফ, তুই বাচ্চাটাকে চুরি করেছিস?

আঁতকে উঠল না হাসিনা। সে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। একটু বাদে আস্তে আস্তে মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল সে। মুক্ত চোখে একটুও লজ্জা নেই, নেই অপরাধবোধের সামান্যতম গ্লানি। যেন শত সহস্র বঞ্চিতা মায়ের মূক যন্ত্রণা বাঙ্ময় হয়ে ফুটে উঠেছে সে চোখে।

হ্যাঁ, চুরি করেছি। স্পষ্ট, দ্বিধাহীন কণ্ঠে সে বলতে লাগল, রাস্তার ধারে একটা ঝুপড়িতে ছিল। ওদের আরো কয়েকটা ছেলে-মেয়ে আছে। খুব গরিব গো, খেতে পরতে দিতে পারে না। বললাম, বাচ্চাটা আমাকে দাও। ভালভাবে মানুষ করব। রাজি হল না। আমার গায়ের গয়নাগুলি দিতে চাইলাম। বললে, সন্তান বেচবে না। তাই রাতে—ওরা ঘুমিয়ে পড়লে—

চুরি করলি! হাসিনার কথা কেড়ে নিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল ইউসুফ। কিন্তু তুই কেন বুঝতে পারছিস না—

কথা শেষ করতে পারে না সে। অসহ্য যন্ত্রণায় ঘরময় পায়চারি করে। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়।

তুই কেন বুঝতে পারছিস না হাসিনা পরের সন্তান চুরি করে এনে মা হওয়া যায় না। এতে গৌরব নেই। এতে সুখ নেই।
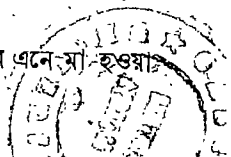
জানি। সে কথা আমি জানি গো জানি। বলতে বলতে হাসিনা ইউসুফের খুব কাছে আসে। তার কথায় কান্নার পদধ্বনি। মা হবার স্বাদ মেটাবার জন্য বাচ্চা চুরি করিনি। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না গো। আমাকে তুমি তালাক দিও না।

হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল হাসিনা, দুহাত বাড়িয়ে ইউসুফ তাকে ধরে ফেলে।

বুকের ভেতর আদিগন্ত আলোড়িত ও কিসের থরথর কম্পিত আলিঙ্গনে তপ্ত শিহরিত এই তো সেই লীলাচপল কোমল কাঙ্ক্ষিত নারী, যার প্রতীক্ষায় যুগযুগ ধরে অধীর অপেক্ষায় বসে থাকে পরাক্রান্ত পুরুষ।

ইউসুফ হাসিনাকে প্রমত্ত আবেগে পিষতে থাকে বুকে॥

পাখির কিচির মিচির আর মুরগীগুলোর গলা ছাড়া ডাকে সদরে সংবিৎ ফিরে আসে।

ইউসুফ মৃদু ধাক্কা দেয় হাসিনাকে, এই, ওঠ, হাসিনা ওঠ। ভোর হয়ে গেছে। আমাদের এক্ষুণি বেরোতে হবে।

শরীরে রেণু রেণু হয়ে মিশে থাকা সুখের [illegible]

[illegible] ঝেড়ে আতঙ্কে ও[illegible]

[illegible], কেন? আমাদের বেরোতে হবে কেন?

থানা-পুলিশ হবার আগে মায়ের সন্তান মায়ের কোলেই দিয়ে আসি। বলতে বলতে ইউসুফ দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

হাসিনার বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে ওঠে। ভয়ে আতঙ্কে গলা বুজে আসে, তাহলে—তাহলে তুমি কি—

শহরে নিয়ে গিয়ে তোকে বড় ডাক্তার দেখাব।

ইউসুফ ততক্ষণে দরজা খুলে ফেলেছে॥ বাইরেটা ফর্সা ফর্সা। হয়ত সূর্য ধীরে ধীরে লাল পাপড়ি মেলছে পুব দিগন্তে। বাচ্চা যদি না হয় তো হবে না। অনেকেরই তো হয় না। তা বলে কি তালাক দিতে হবে!

ঘুমন্ত শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাসিনা বাইরে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু মৌলভীর বিধান? তার কী হবে? হাসিনা সভয়ে, যেন ভোর হয়ে আসা লাল লাল আকাশের কোলে ওড়াউড়ি করা পাখিরাও শুনতে না পায় এমনভাবে চুপি স্বরে বলল।

ধেত্তেরি তোমার মৌলভী। অসীম বিরক্তিতে ঝাঁপিয়ে উঠল ইউসুফ। রুখে দাঁড়াব। বেশি ঝুট-ঝামেলা করলে লাথি মেরে চলে যাব শালা এ-হারামি জায়গার মুখে।

হাসিনা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

দ্রুত পায়ে চলতে চলতে ইউসুফ তার বাহুতে হাসিনার উষ্ণ সমাগত হাতের প্রগাঢ় চাপ অনুভব করে।

বিকাশ গায়েন-এর কবিতা

ঝড়ের পর বৃষ্টি

মনে করুন ঝড়ের আগে শুনশান বাতাস
আকাশ ঢেকে ফেলেছে মেঘ
মাথার উপর গনগনে আঁচ এতকাল যা কিছু শুষেছে
কালোয় কালো কুণ্ডলি পাকাচ্ছে ক্ষোভ
দু'একটি শুকনো পাতার মৃদু ফিসফাস
শুধু শোনা আর অবিচল দিন গোনা।

প্রখর জ্যৈষ্ঠের পাতা
কোথা যাও ভাঙাচালা, কুন্দ-কোরাপুট
উঁচানো লাঙল ছোটে কানসারা কেনেস্ত্রা পেটাল
ফুলে ওঠে ছেঁড়া পাল—পর্যুদস্ত কানি
ধুলোয় ধুলো চারদিক চমকে উঠছে দিক
কোথায় ব্রহ্মর্ষি সাজ কোথায় লোরিক!

মনে করুন ঝড়ের পর নিরপেক্ষ শ্রাবণ
আর স্নানের আরামে ভরে যাচ্ছে চরাচর
দৈনিকের সংলগ্ন আড়ালে ঝড়কাতুরে আমাদের
দরজাবন্ধ কেঁপে ওঠা নয় নেমে পড়া ছপছপ উঠোনে।

ভিজে ফসফরাস

কান পাতলেই চমকে ওঠার ধ্বনি
চোখ মেললেই শিউরে ওঠার আলো
দুদিকে কাচের মুখ মাঝখানে দ্বিধার আড়াল।

চাঁদ তুলে নিয়েছে তার পরমেশ্বরী আলো
গাছ তার ওঁ-তৎ-সৎ হাওয়া
আত্মীয়-স্বজন সমেত বেড়াতে বেরিয়ে
এমন একা হয়ে পড়ছে কেউ
যে, নিজস্ব ভাষাকেও ছুঁতে পারছে না সঠিক অক্ষরে
আর মানুষের
এই ছোঁয়া না-ছোঁয়ার অস্বস্তিকর মুহূর্তকে
বেদনা দিয়ে বুঝে নেওয়ার মত
লোক নেই বলেই আমাদের বন্ধু নেই।

হাজার হাজার মাইল পড়ে থাকে
পরিচয়ের ল্যাম্পপোস্টহীন সেতু
তোমার আহ্বানে কোন উচ্ছ্বাসের জোনাকি ছিলনা যে,
বাবুই দেখাবে তার পাখার উৎসাহ।

'জ্বলে ওঠা' কিংবা 'ঘুরে দাঁড়ানো'
আপাত-সিরিয়াস এই শব্দদুটিকে
আটপৌরে নাড়তে নাড়তেই ভিজে গেল
হাতের কসফরাস, ভিতর শুনশান।

রোবটপাড়া

মিত্রতার নাম নাট-বল্টু
লাল নীল টুনি বাল্ব জ্বালাও দুচোখে
তোমার চাকার নিচে পড়ে আছে পথ
'দৌড়' বলে কপিকল ঘোরানোর বেশী মত্ততা নেই

'কে হে যাও বন্ধুমিঞা' সেতুময় সংলাপ
একদিন হে নিশা ভরেছ খদ্যোতে
অন্ধকার কুকরির আকারে জাগিয়ে
বাঁকাগলি দাঁড়িয়েছে আজ

ভরল অসুখ নিয়ে যন্ত্রের সমাজ
মেতে ওঠে তেল ও মোবিল বিপণনে
অলীক লোহার পাশে অনুগত ক্রেন
একুশ শতকী রাজপথ আমাদের পাড়া দিয়ে যাবে !

ঘর্ঘর থেমে গেলে হে প্রজন্ম যোনিজ-রোবট
দেখে নিও মরিচায় ভরে গেছে দেশ ।

চৈতন্য

ছিল সে মস্তকে সূর্য অধোমুখে ধায়
এ কি তীব্র ধারা স্রোত কৃষ্ণবর্ণ কালো
সর্বব্যাপী অগ্নি ছোটে দারুণ পিপাসা
মেরুদেশ ছুঁয়ে শিখা স্নায়ুতে জড়ালে
পতঙ্গসমান ঝাঁপে সর্বস্ব পোড়াবে

খাবে দশ হাতে খাবে মেধার টিয়াটি
আগলিয়ে ছিলে বেশ একবার নিজেকে
আগলাও দেখি মাঝি স্রোতে কত দড়
সোজা স্রোতে ভেসে যাবে উল্টোটাই ধর
জেগেছে বেয়াড়া অশ্ব ধর তার রাশ

ফেরাও হেঁচকা টানে উৎসের মিনারে
ভাঁটাতে যা শ্বেতবর্ণ উজানে সে পীত
আনন্দ-আঁধার-গঙ্গা চৈতন্যপ্রয়াসী
হলে কবি ডেকে নিয়ে দীর্ণ জনে জনে
তোমার প্রেমের ভাষ্য সহজ শুনিও ।

রূপ

রূপের আগুন থাকা ভাল তবে কানোয়ার নয়
হাজার কৃতঘ্ন হাত মিলেমিশে করে দিলি ছাই!

তোরা না পোড়ালে তোদের গাঁ-শুদ্ধু পোড়াত ছিল ভয়
রূপের আগুন নিয়ে কেননা সে বাঁচত না একাই
সিঁধেল চোখের দিব্যি ধর্মের লক্ষ্মণ তোর কাঠি
কখনো করেনি দৃষ্টি চুরি বল সত্যি করে বল
ধর্মত অন্যায় নয় সকলি বয়স-বাধ্য-লাঠি
তেমন ছিল না গাঁয়ে দাহবান যুবাও সম্বল !

যে দাঁড়াত শক্ত পায়ে ভেঙে দিয়ে ভ্রষ্ট চবুতরা
'আগুন তোমাকে নেব আমার শরীরে খুব শীত
মানিনা যৌবন গায়ে অন্ধ-অনুশাসনের জরা
বাঁচাই ব্রাহ্মণ্য জানি তুলে নেব সত্য উপবীত'

বাঁচতে এলি না কাছে অঙ্গের অঙ্গারে ঢেলে জল
দেখাস বীরত্ব আজ তত্ত্বভারি লেজের কৌশল ।

যাবতীয় সরীসৃপ

সুদর্শন সেনশর্মা

ট্রেনের জানালা দিয়ে নেহাৎ-ই মাথা গলানো যায় না, পারলে বোধহয় তপতী তাই করত—তের নম্বর প্লাটফর্মের প্রান্তিক সিগনাল তখনও লাল, ট্রেন ছাড়তে এখনও নিশ্চিত কিছু দেরি আছে ; সুরঞ্জন ঘড়ি দেখে—তপতী হঠাৎই খুব দূরে যে চলে যাচ্ছে তা নয়—অবশ্য দূরত্বের মাপজোক 'মাইলেজ' এ প্রায়শই নিছক মূর্খামি মনে হবে। সুরঞ্জন ত সঙ্গেই যেতে চেয়েছিল—হয়না হাওড়া স্টেশন থেকে ছুটে হাসপাতালে পৌঁছে কলিগকে রিলিজ করা আছে—ছুটি ত মেলেনি—দরকারের সময় সুরঞ্জনকে আজ অব্দি কেউ ওবলাইজ করল না—নিতান্ত অসুখ বাঁধিয়ে না ফেললে। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সুরঞ্জন শরীরটা খেলিয়ে নিল একবার, তপতী জানলায় ঝুঁকে আসছে, মমতায় চোখেমুখে তপতীর হিরণ্যদ্যুতি, তপতী যেমন ; জানলার সমান্তরাল শিকে থুতনি ঠেকল তার, অস্ফুটে বলে 'তারপর ?'

সুরঞ্জন একটু আগেই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পদ্যের লেবু চটকেছিল। শল্য চিকিৎসকও ফাঁপরে পড়লে পদ্য আওড়ায় !

> 'মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
> বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে
> লেভেল ক্রশিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
> এখন তুমি পড়ছো কি হার্ট ক্রেন ?'

'এটা ত শুনেছি, তারপর ?' উৎসুক তপতী বলছে, 'কবিতা কি এত ছোট ?'

সুরঞ্জন মাথা দোলায় 'উঁহু কবিতা নয় পদ্য। লেখক শুনলে রাগ করবেন।'

তপতী হাসে 'তারপর ?' পরেরটুকু নিশ্চয়ই তখনও সুরঞ্জনদা আগে শুনিয়েছে। অপারেশন করতে করতে !

> 'দেড়শো মাইল পেরিয়ে গেলাম কাছে
> বললে তুমি, এমন করলে বাঁচে
> ঐ সামান্য বিদ্যাদানের টাকা !
> সত্যি, পকেট—ইঁদুর বাদে ফাঁকা।'

তপতী যেন প্রবোধ দেওয়ার মত করে বলে 'অত নয়। একশ মাইলও হবেনা, এই ত একঘণ্টা পনের মিনিটে বাগনান। তারপর শ্যামপুরের বাসে 'শান্তিকল্যাণ'।' অন্যসময় তপতী হয়ত হেসে উঠে বলত 'সত্যি সুরঞ্জনদা আপনি না!—অঞ্জনের বিয়েতে কি কি যেন নিয়ে গেছিলেন?'

'বেশি কিছু নয়' সুরঞ্জনও হাসত তখন 'বইপত্তর ছিল, আর ইঁদুর যাতে বই না কাটে সেইজন্য র‍্যাট-কিলার।'

'সুরঞ্জনদা বয়স বাড়ছে যে—'

'বুঝতে পারছি—'

'কই! মনে ত হয় না—'

'পারছি ত, পারছি।'

'কী করে?'

'বয়েস বেড়েছে বুঝবে কীসে। চোখ এঁটে যায় উনিশ বিশে।'

তপতী পেসেণ্টের হেড-এণ্ডে ব্যাগ টিপতে টিপতে খলখলিয়ে হেসে বলল—'এরোগেও ধরেছে আপনাকে?'

'তোর কি কুড়ি পেরিয়েছে? দেখিস না, তুই, অ্যানাসথেসিয়া দিলে আমার অপারেশন শেষ করতে কত দেরি হয়।'

ওটি স্টাফ নার্স রুবি, ক্লোজারের সময় কাউণ্ট মেলাচ্ছিল। হাসতে হাসতেই বলল, 'কাউণ্ট ঠিক আছে,' তারপর তপতীকে 'আপনিও তেমনি পাগলকে উসকে দিচ্ছেন বাবুর ত মুখের দেখুন না, সুরঞ্জনদা পেসেণ্ট জাগিয়ে দেব কিন্তু এবার। দেখি সামলান তখন!'

'তুইত তখন থেকে সাবোটাজ করছিস। একদম রিলাক্সেশন দিসনি আজ, এরকম ফ্যাটি পেসেণ্ট হাত ব্যথা করে দিলি ত। তপতী প্রায় ভেংচি কাটল, 'রিলাক্সেশন দেই নি, অপারেশন এমনি এমনি হল বুঝি? আর রিলাক্স্যাণ্ট দিলে পেসেণ্ট জাগবেনা কিন্তু—'

সুরঞ্জন স্কিন ক্লোজ করতে করতে বলল 'তাড়া কীসের না হয় একটু পরে জাগবে। তোর সঙ্গে আমার কত কথা আছে। সেগুলো সেরেনি।' রুবিকে খেপিয়ে বলল 'বুড়ি বহুৎ ফালতু বলে, ওর কথা ছাড়!' 'ও রুবিদি আপনাকে বুড়ি বলছে'—তপতী বলে।

রুবি নন্দী 'বলুক। বুড়ো নিজে ত, এদ্দিনে একটা বুড়িও জোটাতে পারল না।'

গ্লাভস খুলতে খুলতে স্বরঞ্জন বিড়বিড় করে—'তুমি আছ কী করতে!' তারপর অস্ফুটে 'কী করে বুঝবে হয়েছ বুড়ি? একটাই রোগ সুড় সুড়ি।'

তপতী শুনতে পেয়ে খলবলিয়ে হাসে—'আপনি না যা তা! লরিওয়ালা প্রেম বোঝে না। বোঝে? হয়েছিল কি জানিস তপতী, প্রেমিকপ্রবর সদ্য যুবকটি রাত দশটা নাগাদ পাঁচটি কিশোরীকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হ্যারিসন রোডের মুখ থেকে একটা ট্রামে তুলে দেয়। দিয়েও, বুঝলি কিনা, প্রেমিক মন ত আশা মেটেনি; ছেলেটি ট্রামের গেটে উঠে আবার ঝোলা শুরু করেছিল···খেয়াল নেই ট্রামে বাদুর ঝোলা একবগ্‌গা অবস্থাতেই কপোতীদের সঙ্গে ফের গল্প ফাঁদতে গিয়ে—নিজে ডাক্কু লরিওয়ালার মরণ ফাঁদে পড়েছে···ভাগ্যিস স্বরঞ্জন শর্মার হাতে পড়ে এ-যাত্রা বেঁচে গেল।'

টেলিফোনের ও-প্রান্তে যে, মানে তপতী খুব হাসছিল। 'এত বানিয়ে বানিয়ে আপনি মিথ্যে বলেন না! তা আপনার সেই প্রেমিকপ্রবরটি কেমন আছে? ডিসচার্জের আগেই পুরো কৃতিত্ব নিজে বাগাচ্ছেন, অ্যানাসথেটিস্টকে অন্তত টেন পার্সেন্ট রয়ালটি দিন···'

'তোকে ত আমি পুরো রয়ালটি দিয়ে রেখেছি···'

'দাতাকর্ণ, কই বক্তৃতায় ত তা মালুম হয় না—'

টেলিফোনের ওধারে হাসি 'যাক ছেলেটা তবে বেঁচে গেল। আজ আপনাদের রাজত্ব কেমন? রমরমা নাকি, আগের ইমার্জেন্সি সার্জন আপনার জন্য আর কিছু রেখে যায়নি?'

'এ বাড়িতে একটা হেমিকোলেকটমি আছে। বেড়িয়াম প্রুভড সিকাল গ্রোথ। প্লানড অপারেশন ঠিক ছিল। অবস্ট্রাকটিভ ফিচার ডেভেলপ করছে। আসবি নাকি? গাইনি বাড়িতে তোর কেস না থাকলে চলে আয়। ওহ্, হ্যাঁ বাই দি বাই তোকে আজ খুব ডিলাইটেড লাগছে, ভাল খবর আছে নাকিরে!' টেলিফোনের ওধারে এবার নীরবতা 'হ্যাই হ্যাই ফোন রেখে দিলি নাকিরে।'

'আমার আর খবর'—তপতী বলে 'ওরা আবার ডেট পিছিয়েছে জানেন, আপনারা ত এক একটি মূর্তিমান···'

'গৌরবে বহুবচন হয়ে গেল? তুই আসছিস কিনা বললি না ত! সিস্টার ট্রলি লে আউট করবেন।'

'যাচ্ছি'। ফোনটা রেখে দেবে তপতী।

স্বরঞ্জন হাসল। ট্রেনের জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরল, 'দে, টাকা দে।'

তপতী হাসি চেপে বিস্ময়ের তকমা এঁটে বলল 'কীসের টাকা?' তারপর শাসনের ভঙ্গিতেই যেন, 'কি তুলে-বাগ্দীদের মত তুই-তোকারি করছেন সুরঞ্জনবাবু! কলেজের কেউ ধারে কাছে নেই, আপনি নির্ভয়ে 'তুমি' তে উঠে আসতে পারেন।' কপট গাম্ভীর্যে সুরঞ্জন বলে 'অ্যাই মেয়ে তোর সঙ্গে আমি প্রেম করি নাকি?'

তপতী হাসতে-হাসতেই বলল 'একটু একটু করেন মশাই, পেত্যয় হয়—' তারপর চাদ্দিক দেখে গিয়ে (দুপুর হয় নি কিন্তু এত ফাঁকা হওয়ার কথা নয়, মেচেদার লোকেরা কি সব বাসে যায়?) ফিসফিস করে বলল সুরঞ্জনদা 'ডেয়ারিং সার্জনের মধ্যে কিন্তু আকাট প্রেমিকের একটা ভ্যাদভেদে ভাব এসে গেছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি,—লারছ!'

তপতীকেও ছড়ায় পায় 'এমনি কি আর এতটা দূর আসা! সঙ্গে ছিল নিপাট ভালবাসা—'

সুরঞ্জন হাসে 'তুমি ওই আনন্দেই থাক। দাও। টাকা দাও দেখি সোনামণি।'

'কীসের টাকা?'

'মনে নেই?'

'উঁহু।'

'সেই যে আপনি একটাকায় চব্বিশ টাকা দর দিয়ে ছিলেন। ইস দশ টাকা দিলে দুশোচল্লিশ হত বল।'

'আবার তুই!'

'থুড়ি, আমি, পাঁচটাকা রেখেছিলাম কেন ইস্‌স! তুমি আমায় পাঁচ চব্বিশে একশো কুড়ি টাকা দেবে!'

'বাজী জেতা প্রথম টাকা নিতে নেই। সেটা ইনভেস্ট করতে হয়। আর ও টাকা কাটাকুটি হয়ে গেছে। তুমি থুড়ি, আপনি কিছু পান না আর?'

'মানে?'

'বা রে! ছ-ঘণ্টা ধরে অপারেশন করলেন। আমি অ্যানাসথেসিয়া দিলাম না? আমার কন্ট্রিবিউশন নেই? আর ভাল কাজ আদায় করতে ইনসেনটিভ দিতে হয় না! আপনি যাতে তেতে ওঠেন। তাই অতবার করে বলেছিলাম রোগী বাঁচবে না।'

'কী সাংঘাতিক কেস ছিল বল।'

'তেমনি সাংঘাতিক সার্জন'—তপতী ঝলমলিয়ে হাসে। সিগারেট

ধরাল সুরঞ্জন। পর পর দু-চারটে ধুম্র গোলক ছাড়ল অধর গহ্বর থেকে। তপতী ভ্রুকুটি করল 'ডাক্তারদের না সিগারেট খাওয়া বারণ?'

'এটা হাসপাতাল ক্যাম্পাস?'

তপতী বলল 'বাঁশিদি কাল বলছিল এরপর নিয়ম হবে বিড়িখেকো ডাক্তারদের সঙ্গে তাদের বৌদের' তপতী শেষ করতে না পেরে হেসে ফেলে।

সুরঞ্জন হাত নাড়িয়ে ছু-চ্ছাই করে বলল—'দাঁড়াও আগে জি, ও বেরোক। হাসপাতালের পাগলাটা ঠিক যেন বিবেক রঞ্জন সাতসকাল থেকে চেল্লাতে থাকবে, ওরে মামদো ভূত পুঙ্গির পুত ডাক্তার মন্ত্রীকে তোর অ্যাত ভয় কেনে? তপতীর শাসন—'ওহ্, সুরঞ্জনদা ফের স্ল্যাং—'

সুরঞ্জনের ভাবনার বৃত্ত হঠাৎ টাল খেল। চোখের সামনের চরাচর এ সময় ধেই ধেই নাচে। সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। দুটো টান মেরে ফেলেদিল সে। পরশুই ত ইউরোসার্জারির গণেশ দশটায় কলেজে ঢুকছে প্রাউড পিজিয়নের মত। ব্যাটা দেরি করে এলেই গাড়িটা কলেজ অফিসের সামনে রাখে। তারপর চাবি দোলাতে দোলাতে—ইউরো অ্যানেক্সের দিকে যাবে গাইনি বাড়ির দিক থেকে। তপতী ওকে দেখতে পারে না। সংগত কারণ আছে। এর মধ্যে তপতীকে বাইরে কেসে ডেকেছিল ও, তপতী যায়নি। প্রবলেম হয়েছে কি সেদিনই তপতী বাইরে, সুরঞ্জনের একটা কেসে অ্যানাসথেসিয়া দিয়েছে—এবং সেটা রিপোর্টার গণেশ (তপতী বলে) জেনে ফেলেছে।

'এই যে স্যার' সুরঞ্জন হাসল; 'বাইরে কেস ছিল?'

গণেশ মাথা দোলায়—'ছোট্ট কেস।'

'তোমার একটা খোলতাই ভাব এসেছে, একটা ছড়া শুনবে?'

গণেশ বলল 'বলুন'—'কাটিয়া পোতা বাহির করিয়া জল। ডাক্তারবাবু আজ হইল সচ্ছল।'

গণেশ হাসল বেড়ে বলেছিস ত। তবে আমি হাইড্রোসিল কাটিনি ত। প্রস্টেট ছিল।'

'তবে যে বললি ছোট কেস।'

আচমকা গণেশ তারপর ঘুঘুর মত বলে 'ডেপুটি এসেছিল। তোর খোঁজ করছিল। সুরঞ্জনদার সঙ্গে নাকি ওর জরুরী দরকার আছে।' সুরঞ্জন গণেশদের থেকে তিন বছরের জুনিয়র কাঞ্চন এক ই. এস. আই হাসপাতালের ডেপুটি-

হয়েছে। গণেশ বলেছে 'তোর সেই ছড়াটা সেই যে হেপুটি / ডেপুটি / তালেতালে দিওতাল / বাজাইও স্যারের ভেঁপুটি / গুড়ের গাত্রে পিপীলিকা সম সদাই থাকিও লেপুটি—ওকে বলাতে ও ফোঁস করে উঠল। কাঞ্চন বলছে, "সুরঞ্জন তুই নাকি ওর হাঁড়িতে মাছি হয়ে বসছিস'—বলে গণেশ চোখ মটকায়।

সুরঞ্জন রাগ করে না; 'এটা কি তোর কথা? না কাঞ্চনের না কি দুজনেরই তোদের! কাঞ্চন ত জানে আমার কবে কখন ডিউটি থাকে—পাঠিয়ে দিস।'

'আহা, চটছিস কেন? আমার অ্যানাসথেটিস্ট ভাগিয়ে অপারেশন করলে—আমি ত আতান্তরে…'

'অ্যানাসথেটিস্টের সীলমোহর আছে বলে আমি ত জানতাম না।'

গণেশ ফিচেল হাসি হাসে—'আমিও ত তাই জানতাম। আমাকে সেদিন রিফিউজ করল কেন?'

'ওহ তাই রাগ, আমি বলে দেখব।' সুরঞ্জন গাইনি ওয়ার্ডে ঢুকে গেল, পেছন থেকে সার্জারিতে একটা সর্টকাট হয় 'যাইরে।'

জানলার ওপারে প্লাটফর্মে দাঁড়াল সুরঞ্জন, সুরঞ্জনের চোখের সামনের একটা ছবি আস্তে আস্তে স্নায়ুতে ছড়িয়ে যায়, বোধের সীমায় পৌঁছে সুরঞ্জনকে চমকায়—ট্রেন তার জানলায় চিত্রার্পিতের মত তপতীকে বসিয়ে সুস্থির হয়ে আছে—এইমাত্র ঘোষক ঘোষণা করছেন, অনিবার্য কারণ বশত আপ মেচেদা লোকাল ছাড়তে বিলম্ব হবে। সুরঞ্জনের মস্তিষ্কে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ। অ্যাটেনশন! গাড়ি যে প্লাটফর্মে সুস্থির, সেই প্লাটফর্ম গাড়ি রেখে সুরঞ্জনকে নিয়ে স্মৃতির তাড়নায় ছুটছে। চোখের সামনের চরাচরে একটা ছবিই দুলছে। দুলে যায়। সুরঞ্জন ইমার্জেন্সি ওটি পৌঁছে গেল। যার, সেণ্ট্রাল টেবল্‌টায় বছর পনেরর নজরানা বিবির ধ্বস্ত শরীরটা পড়ে আছে।

এক রোববার রাতে, রাতটা বেশ তাৎপর্যহীন ভাবেই কাটবে ভেবে সুরঞ্জন যখন ঘুমিয়ে পড়ার তাল করছিল, তখনই আপদকালীন শল্য-চিকিৎসকের ঘরের পাশের টেলিফোনটায় সাইক্লোনের আওয়াজ হয়। ইমার্জেন্সী মেডিক্যাল অফিসার ক্যাজুয়ার্ণ্টি থেকে বলছে, সরি সুরঞ্জন, সেণ্ডিং এ ব্যাডলি ইনজিওরড উওমান, থুড়ি, গার্ল, উইথ্ ইমার্জেন্সী স্লিপ। বেড হেড় টিকেট টু ফলো। অ্যাটেমপ্‌টেড মার্ডার। মালটিপল ইঞ্জুরি। গাট ইজ হ্যাঙ্গিং আউটসাইড অ্যাবডোমেন নজরানা বিবি। ফিফটিন ইয়ারস। ওয়াস লায়িং হাফডেড ইন এ প্যাডি ফিল্ড নিয়ার বারাসাত হসপিটাল।

ব্রট বাই টু কান্টিভেটরস পাসিং নিয়ার বাই, টু বারাসাত এস. ডি—দেন্স টু দিস হসপিটাল।'

তড়িৎ আর দিগন্ত দুই হাউস সার্জন ঝটিতি দুই হাতেই ড্রিপ চালায়। ব্লাড রিকুইজিশন করে। যে দুজন আধাসম্পন্ন চাষি মেয়েটিকে তুলে বারাসত হাসপাতালে নিয়েছিল তারাই পুলিসের খোঁচাখুঁচির তোয়াক্কা না করে স্বপ্নোত্থিত কলকাতার হাসপাতালেও এসছে। একজন রক্ত দিতেও চাইল। দিগন্ত, লোকটার আন্তরিকতায় মুভড্। ব্লাড ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিল। কি কপাল লোকাল ব্যাঙ্ক তিন বোতল সাপ্লাই করতে পারল। সকালেই কালেকশন ছিল ওদের। অবশ্য আরও তো লাগবে…'

'এই অ্যাত ইঞ্জুরি নিয়ে পেসেণ্ট যে কি করে কথা বলে! রক্তে কাপড় চোপড় মাখামাখি। গোঙানির আওয়াজও সে করছে থেকে থেকে…তপতী অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে প্রিমেডিকেশন দিয়ে দিল।' সুরঞ্জন অধৃত আততায়ীকে যেন শুনিয়েই বলতে চাইল 'বাস্টার্ড।' তারপর স্ক্রাবরুমে হাত ধুতে যেতে যেতে বলল 'তড়িৎ দিগন্ত কুইক।' হাত ধুতে ধুতে সুরঞ্জন শুনছিল রুবি নন্দী বলছে 'বাঁচবে না! দিগন্ত বিষাদগ্রস্তের মত বলল— 'সবই ভস্মে ঘি ঢালা হবে? তপতীদি বাঁচবে?'

তপতী রহস্য করে বলল 'আমি বাঁচব কিনা জিজ্ঞেস করছ? আমাদের বাঁচামরা সার্জনের ওপর ডিপেণ্ড করে ত। বলে ফের হাসল নিশ্চয়ই। ঠোঁটের কোনায় ম্লান হাসি। বলল 'আমি বলছি, বাঁচতে পারে তাই ত আজ দর দিলুম এক, চব্বিশ।'

'মানে?'

'আমায় একটাকা দিলে, পেসেণ্ট বাঁচলে চব্বিশ টাকা দেব।'

সুরঞ্জনের গাউন পরা হয়ে গিয়েছিল, গ্লাভস পরতে পরতে স্ক্রাব রুম থেকেই তপতীকে শুনিয়ে বলল 'সিস্টার, আমার পার্স থেকে এখুনি অজ্ঞানদিকে পাঁচটাকা দিয়ে দিন ত।' তপতী পেসেণ্টকে এণ্ডোট্রাকিয়াল টিউব পরাতে পরাতে বলল, পাঁচটাকা একটা স্টাণ্ডার্ড খেলা হল, দশটাকা খেলুন কমসে কম্—পেসেণ্ট বেঁচে গেলে দুশো চল্লিশ পাবেন। কি বলেন সিস্টার' সুরঞ্জন হাসে 'জুয়োর প্রথম পাঠটা অজ্ঞানদির কাছ থেকে নিয়ে নেই।'

রুবি নন্দী গোবেচারা মুখ করে বলল—'এখনও নেননি! সেকি! তড়িৎ দিগন্ত রেডি হয়ে, ড্রেপিং করছিল পেসেণ্টকে। তপতী একবার বলল 'সারা পেটই ত কুপিয়ে ফালা করেছে, কি অ্যাপ্রোচ হবে সুরঞ্জনদা—'

'দেখি' সুরঞ্জন বলে, বিষণ্ণ হাসি তার ঠোঁটের কোনায় 'অ্যাপ্রোচ বাই ওয়ান পোচ্।'

নাইট্রাস কম ছিল। সিলিণ্ডার চেঞ্জ করে মেসিনে আটকে দিল তপতীর কথায় ওটি বয়, তপতীর মুখে যেন কিসের গ্লানিমা, 'সুরঞ্জনদা জুয়োর পাঠ প্রথম নয় আমার। সবসময় টাকা নয়। জুয়োয় জীবনও যায়। এই ত দেখুন, নজরানা বিবির নজরানায় তার মরদের পোষায় নি।'

'স্কাউণ্ড্রেল ইজ এ স্যাডিস্ট।'

তপতী মাথা নাড়ায়। 'ইয়েস এদের নানা সাবফাইলাম আছে।'

'বলছিস?'

বিষণ্ণ তপতী মাথানাড়ায়,'আমার অভিজ্ঞতার কি কানাকড়িও মূল্য নেই!'

ব্যাপারটা ইমোশনাল টার্ন নিচ্ছিল প্রায়। সুরঞ্জন ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলে 'তুমি আমায় কতটা সময় দিতে পার।'

'হুঁ', তপতীর ঘোর কাটছে!

'মানে পেসেন্টের জন্য তুমি আমায় কত সময় অ্যালাউ করবে!'

তপতীর সম্বিৎ 'ওহ্ করুন না। ব্লাড আছে তিন বোতল।'

'রিসেকশন লাগবে?'

'আগে ভেতরে ঢুকি। ওয়েল, ইট উইল বি এ কুইক ইন।'

'কুইক আউট হবে কিনা আগে বলা যাবে না।'

'লেটস স্টার্ট—'

'মেয়েটির মাথায় মিটচপার দিয়ে মারা হয়েছে। খুলির ওপর মাংস আর চামড়ার আস্তরণ কিমা বিশারদ! খুনে স্বামীটি সাত আটটি টুকরো করে ফেলেছে। চুল রক্তে মাখামাখি। খুলিতেও চপারের দাগ খানিকটা বসেছে। মাথাটিতে একটা আর্থোডক্স স্ক্যাল্প ব্যাণ্ডেজ করে রাখা হয়েছে। পরে দেখা যাবে।'

'উই আর এনটারিং কি অ্যাবডোমেন বাই এ মিডলাইন ভার্টিকাল ইনসিশন, অ্যামিডস্ট মেনি ইরেগুলার ভার্টিকাল অ্যাণ্ড ট্রানসভার্স কাটস মেড বাই দি কিলার হিমসেল্ফ। দিগন্ত হট মপ দিয়ে এই ঝুলন্ত অন্ত্র ঢেকে রাখ।' দিগন্ত হঠাৎ গোদা বাংলা শুনে ফিক করে হাসল। নতুন ইন্টার্ণটি তপতীর পাশে বিমূঢ়, তড়িতাহতের মত দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, খুনের কর্মকাণ্ডে বাকরোধ হয়ে যাচ্ছিল বোধহয় তার—কোনক্রমে সে বলল 'স্যর এটা কি রেপ-কেস?'

'নাউ উই আর ইন' সুরঞ্জন মুখ না তুলেই ইণ্টার্নটিকে বলে 'হোয়াট ফেলা ইজ আ স্যাডিস্ট !'

'স্যাডিস্ট কাকে বলে স্যার ঠিক !'

'ওরে দিগন্ত সাক কর। সাক কর। উই ফার্স্ট সার্ভে সলিড অর্গানস, ওকে, বাট দেয়ার ইজ অবভিয়াস স্প্লেনিক ইনজুরি !'

তারপর ইনটার্নটিকে 'যারা এরকম করে।'

'এটা একটা ডেফিনেশন হল ?' তপতী।

'ওয়েট ওয়েট তড়িৎ। প্লিজ রিট্রাক্ট প্রপারলি। ওকে কাল ফরেনসিকে যেতে বল তপতী। নয় ত তুমিই বলে দাও প্রায়ই ত ঐসব কি বলে যেন নারী নির্যাতন, বধূ নির্যাতন জাতীয় সেমিনার গুলো আপনিই অ্যাটেণ্ড করেন—!'

তপতী একবার সুরঞ্জনকে জরিপ করার চেষ্টা করে। মাস্কে মুখটা পুরো প্রায় ঢেকে আছে। ক্যাপটা ঠিক চোখের ওপরে আঁচ করার উপায় নেই।

সুরঞ্জন রানিং কমেন্ট্রিও দিচ্ছিল। 'স্প্লিন ইজ পাল্পড্। মোস্ট অফ অল ব্লাড ইজ ইন লেফট আপার অ্যাবডোমেন। দি ইনজুরি ইনফ্লিকটেড অনটু লেফট্ লোয়ার চেষ্ট লাকিলি ডিড নট ইনজিয়োর লাং এণ্ড প্লুরা বাট হ্যাজ ড্যামেজড ডায়াফ্রাম অ্যাণ্ড স্প্লিন।'

'ওকে। ক্ল্যাম্প প্লিজ। আহ দিগন্ত রাইট অ্যাঙ্গেলড্ ফরসেপস্ প্লিজ। সিল্ক রেডি কর। ঝটপট। দিস ইজ স্প্লেনিক আরটারি। সি। সেফলি টায়েড নাউ। কাট ইনবিটুইন, লিগেচারস। তপতী ইউ ক্যান নাউ স্টার্ট ব্লাড ইন জেট ইফ ইউ লাইক।'

ঠিক এসময়েই হঠাৎ ভোল্টেজ ড্রপ হল। গেল গেল রব উঠল একটা। স্পট লাইট নিভে গিয়ে আবার জ্বলল। সিস্টার আট ব্যাটারির টর্চটা নিয়ে পেটের ওপর ধরলেন।

'আমাদের অজিত বুঝলে তপতী, ফরেনসিক ভাল লাগত না বলে প্রায় পড়েইনি। পরীক্ষা দিতে হবে মেডিক্যাল কলেজে গ্রেট প্রফেসর মুখার্জীর কাছে। মুখার্জী আমাদের কলেজের ছেলেদের ফেল করাচ্ছেন ত আমাদের প্রফেসর মল্লিক মেটিয়া কলেজের ছোড়াদের দুরমুশ করছেন। তা অজিতের মামা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তালেবর এক। সে প্রফেসরকে বলে রেখেছিল। মুখার্জী স্যার অজিতকে প্রায় পাখি পড়িয়েছিলেন, তোকে আমি বলব হোয়াট ইজ দিস ? তুই বলবি পপি ক্যাপসুল। তারপর জিজ্ঞেস করব ওপিয়ামে কী কী আছে তুই তখন এই এই বলবি। তারপর তোকে

বলব মরফিনের অ্যান্টিডোট কী ? তুই বলবি ন্যালরফিন। যেই বলবি তোকে অনার্স নম্বর দিয়ে দেব বাপ। যাহ্, তা অজিত নেচে নেচে ওয়াল দিতে গেল। মুখার্জী চুক্তি ভুলে বলে ফেললেন—পিক আপ পপি ক্যাপস্যুল, গ্রেট অজিতদা ট্রে থেকে ধুতরো তুলে ফেলল। মুখার্জী বলল হায়রে তোকে পাখি পড়িয়ে আমিই ভুল করলাম। যাকগে ওই বাইরের এক্‌জামিনার আসছে। তুই কি পড়েছিস বল আর। অজিতদা গর্বিত হুঙ্কারে বলল 'রেপ' পড়েছি স্যার। এক্সটারনাল এসে প্রায় মুখার্জীর চেয়ারের পাশে বসছে, মুখার্জী স্যার বললেন ওয়েল মাই বয় টিল নাউ ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল—টেল মি দি ডেফিনেশন অব রেপ—'

অজিত অস্ফুটে বলে তখন 'পুরোটা বলব স্যার।' স্যারের বই-এ বিরাট বড় যে সংজ্ঞাটা। মুখার্জী একটা গাল দেবেন : চৈতন্যদেবের (প্রফঃ মল্লিক) বই পড়বে! 'এখন বল বাপ!' অজিত এক্সটারনালকে ঠারে দেখে নিয়ে বলল 'রেপ ইজ ডিফাইণ্ড···উহু মানে স্যার ওই জড়িয়ে ধরে একটু টিপে টুপে দেয় আর কি!···'

মনিপুরি এক্সটারনাল বললেন 'হোয়াট।' মুখার্জী সাহেবেরও ভূত দেখার অবস্থা—তার চোয়াল তখন হা হয়ে গেছে। কোনক্রমে বললেন 'প্লিজ কাম আফটার সিক্সমানথ্‌স।' সবাই হেসে উঠেছিল। মুখ তুলে সুরঞ্জন ইণ্টার্নকে দেখল : 'কী বুঝলে।'

তপতী ঝামরে উঠে বলল 'বাচ্চা ছেলেটার লেগপুল হচ্ছে।' ইণ্টার্ন ছেলেটি মুখ লুকিয়ে ফেলেছে।

তপতী বলল 'হারি প্লিজ।' সুরঞ্জন স্পিুন ট্রেতে রাখল। সাক্, প্লিজ দিগন্ত। নাউ উই আর রিপেয়ারিং ডায়াফ্রাম উইথ সিল্ক স্টিচেস। দিগন্ত রিট্রাক্ট প্লিজ। তপতী প্লিজ ইনফ্লেট দি লাঙস্। দি লাঙ ইজ এক্সপাণ্ডিং। ক্যাণ্টসি থ্রু দি ডায়াফ্রাম? ওহ্ ম্যান। সি ইট। ওকে। ওহ্ নো। সিস্টার লাইট! দেখতে পাচ্ছি না। লাইটটা ফোকাসে নেই। 'তাপস সেনকে ডাকুন। মা মন্দাকিনী আলো দাও। ইয়েস দ্যাটস রাইট। লিটল মোর। সাক। হিয়ার উই আর।'

'হাউ ইজ ইওর পেসেণ্ট তপতী' সুরঞ্জন—'প্রেসার স্টেবল তো এখন?'

'মামাবাড়ি? এখুনি স্টেবল হবে? নব্বুই একশোর মধ্যে সিস্টোলিক রেখেছি। দ্বিতীয় বোতল রক্ত চলছে। একটা আরও আছে। একটু হাত চালিয়ে। রিসেকশন লাগবে?'

'দেখছি।'

'নাউ উই আর একজামিনিং দি জি. আই. সিস্টেম। দিগন্ত জেন্টলি পুল অন দি স্টমাক উইথ এ ওয়ার্ম ময়েস্ট মপ। ইয়েস ছ্যাটস্, ওকে ইটস অ্যাবডোমিনাল ইসোফেগাস। অলরাইট মপ ইট। হিয়ার ইজ স্টমাক, দিগন্ত ছেড়ে দাও আমি একটু গ্রেটার কার্ভটা দেখে নেই। ওকে স্টমাক ইজ ইনট্যাক্ট। উই হ্যাভ অলরেডি স্ক্রুটিনাইজড্ আদার সলিড অরগ্যানস। অলরাইট। সাক হেপাটোরেনাল পাউচ। ওকে সি নো মোর উজিং। নান ফ্রম লেসার স্যাক। দিস ইজ ফোরামেন অব উইনসলো। গল ব্লাডার ওকে—এই ফ্রি মারজিন—নো ইনজুরি ইন ডাক্টস্—ওকে।'

পেসেন্ট কেঁপে উঠল এ-সময়।

'অ্যাই তপতী পেসেন্ট স্ট্রেইন করছে—'

তপতী নির্বিকার—'এতেও স্ট্রেইন করবে না পতি দেবতার নিগ্রহের পর শল্য দেবতার অতি আগ্রহ'

'বেড়ে বলেছ তো অজ্ঞান দিদি'

'পেসেন্ট কিন্তু আনস্টেবল হচ্ছে আবার'

'সে কিরে?'

'প্রেসারটা ড্রপ ডাউন করছে। একটিভ ব্লিডিং নেই তো আর?'

'এই দিগন্ত এই এক্সট্রুডেড গাটে একটু নরমাল স্যালাইন ওয়াস দিয়ে নি। কুইক কুইক।'

'ওকে ছ্যাটস ফাইন' তপসী কের ভরসা ছায়, 'পেসেন্ট একটু লাইট হয়ে গেছিল, রিলাক্স্যান্ট কম দিয়েছি'

'সে তো দিদিমনির অভ্যাস।'

'কাজ চটপট।'

'স্টার্ট উইথ লার্জ গাট। দিস ইজ সিকাম। ওকে। অ্যাসেণ্ডিং কোলন ফাইন। সি নো হিমাটোমা। দিস ইজ হেপাটিক ফ্লেক্সার, ওকে। ট্রানসভার্স কোলন ইজ অলরাইট। স্প্লেনিক ফ্লেক্সার অলরেডি একজামিনড় ডিউরিং স্প্লেনেকটমি। দিস ইজ ডিসেণ্ডিং কোল, দিস ইজ সিগময়ড অ্যাণ্ড ছ্যাট লো ডাউন ইস রেক্টাম।'

'অল রাইট।...স্যাটিসফাইড তড়িৎ?'

'নাউ স্মল গাট। স্টার্ট উইথ ডিউডিনো জেজুনাল ফ্লেক্সার।'

'হিয়ার উই আর, এই তপতী স্মল সেগমেণ্ট অব জেজুনামে তুটো বড় টিয়ার আছে। ঝটপট বাদ দিয়ে দিচ্ছি। স্মল সেগমেণ্ট।'

'সেই রিসেকশন করবেন। আপনাকে সামলায় কার সাধ্যি।'

সুরঞ্জন হাসল, 'শুধু রিপেয়ারে হবে না এই ছাখ। মেসেন্টিতেও ট্রানসভার্স ল্যাসারেশন আছে'

'তাড়াতাড়ি! এরপর মাথা কাঁধ হাত বাকি। ডানব্রেস্টেও একটা ইঞ্জুরি আছে। সেগুলোর কী হবে। পেসেণ্ট জাগবে না কিন্তু। একটু হাত চালিয়ে দাদা'

প্লাটফর্মের মাইক সুরঞ্জনকে ফের হাওড়ায় ফিরিয়ে আনে। ঘোষকের নির্ঘাৎ গলায় কিছু হয়েছে। 'এগারোটা তেইশের মেচেদা লোকাল ছাড়তে বিলম্ব হবে। মৌড়িগ্রাম স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভের কারণে…'

'হয়ে গেল'

'আজ আর যাবে? এগারোটা চল্লিশ হতে চলল।'

'অনেকক্ষণ এসেছি না!'

তপতী প্লাটফর্মে নেমে আয়। 'ওই চোদ্দ নম্বরের দিকে আলো-আঁধারিতে চল একটু হেঁটে আসি।' চোদ্দ নম্বরের ন্যাড়াদিকটার ওপাশটায়, শেড যেখানে এখনই এক চিলতে ছায়া পেড়েছে—সেদিকটা সুরঞ্জন হাত তুলে দেখাল।

তপতী ম্লান হাসে 'ফের তুই তোকারি।'

'সারবেনা। আমি মিঃ ইনকরিজিবল্। তুমি না বলেছ! নেমে এস তপতী দেবী।' কী যেন বলছিলে তখন এমনি কি আর এতটা দূর…জানলায় থুতনি রেখে হাসল তপতী 'ঢের হয়েছে।'

'আসুন, সুরঞ্জনদা আপনিই উঠে আসুন।'

'আহ্, তপতী নেমে এস। যেতে হবে না। কাল গিয়ে জয়েন কোরবে। আমরা একটু হাঁটি। ঘোরাফেরা করি, সামনের ওই ছায়াটে দিকটায়।'

তপতী জানলার থেকে উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। নামল না। কপাল থেকে চুলের কুচি সরাতে সরাতে বলল মুচকি হেসে 'প্রেতচ্ছায়ে ঘোরা ফেরা'! আবার? একটা ভূতকে বহু কষ্টে ঘাড় থেকে নামানো গেছে!'

সুরঞ্জন মাথা দোলাল তুদিকে—'ইজ ইট?'

তপতী আর হাসে না তখন। তার চোখের কোনায়…বলল 'ইয়েজ। আপনাকে বলিনি! ওরা বিস্তর ঘুরিয়ে শেষে মেনে নিয়েছে ফ্রিড।' মেয়েটাকে

হঠাৎই কেমন বিবর্ণ ফ্যাকাশে মনে হয় সুরঞ্জনের হোলির আনন্দের পর বহু কষ্টে রঙ ঘষে ঘষে তোলা যেন। তাই ত তপতীর মুখে মাথায় একটুও রঙ লেগে নেই।

'ইটস অল ইন দি গেম ডিয়ার।' বলতে পেরে হাল্কা হয় সে। ছোটবেলার খেলার সেই একজন কুমীর। একটু দূরে একপা ডাঙায় একপা জলে দিয়ে আর-একজন যেন ধন্দে ঢুলছে। 'কুমীর তোমার জলকে নেমেছি'।

হাত বাড়িয়ে তপতীকে নামিয়ে নিল সে। তপতী এখন প্লাটফর্মে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ সে বসেছে এবার একটু সে দাঁড়াক—দাঁড়িয়ে থাক।

সেদিন দুপুরে তো হঠাৎ গবার সঙ্গে দেখা। সুরঞ্জন হসপিটাল অফিসের দিকে যাচ্ছিল, পুকুরপারে শেডের নীচের পথটায় গবার হঠাৎ পথ আগলে ভূমিকাবর্জিত সংলাপ—অ্যাই তপতী চ্যাটার্জীকে চিনিস। ওই অজ্ঞান টজ্ঞান করে।

জানা গেল গবাই-এর ভাইঝি এবং তপতী এক স্কুলের বন্ধু। সেই ভাইঝির এক জা-এর সঙ্গে সেই দেওরের বনিবনা নেই। হঠাৎ কি একটা বিভ্রাট হয়েছে, ভাইঝি ইজ নাউ সিকিং ফ্রেণ্ডস হেল্প ভায়া কমন গবা কাকু। গবা আবার সুরঞ্জনের অশোকনগরের স্কুলের বন্ধু। কোথাকার আঠি কোথায় গাছ তৈরী করে!

মোদ্দাকথা তার জা-এর লাইফ ইন ডেনজার। বেশীদিন বিয়েও হয়নি।

তপতীর নতুন পোস্টিং এর ব্যাপারে সুরঞ্জন রাইটার্স যাবে বলেছিল তপতীর সঙ্গে। অর্ডারে কি একটা গেরো আছে। সেটা খুলতে হবে। তপতী আর এক গেরো-য় ফেঁসে গেল। তপতীকে পাওয়া গেল এবং তপতী খানিকটা গবাই কাকু গবাই কাকু করল, তারপর সব শুনে বলল 'চল এখুনি চল।' তপতীর বন্ধুর সেই নচ্ছার দেওরটি ওদের পাড়াতেই থাকে। গবাকে তপতী বলল 'আপনাকে বর্ণা কোন ফোন নাম্বার দেয়নি?' গবা পকেট হাতড়ায় 'হাঁ হাঁ। বর্ণার জা-এর বাপের বাড়ির ফোন তো? এই নে। ঝটিতি সেই একটা নাম্বার সুরঞ্জনকে ধরিয়ে তপতী করুণভাবে বলল 'প্লীজ, ট্রাই কর সুরঞ্জনদা। আইডেনটিটি ডিসক্লোজ করার দরকার নেই, বলবেন আপনাদের মেয়েকে শিগগির শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে আসুন হার লাইফ ইজ অ্যাট রিস্ক—'

তিন-তিনবার ফোন করে একটা নাম্বার মিলল। গার্ডেনরিচে মেয়েটির দাদার অফিসের ফোন বোধহয়। লাইনে ঝঞ্ঝাট। ডক্করস ক্লাবে বসে ওধারের লোকটিকে শোনাতে সুরঞ্জনকে প্রায় চেঁচাতে হচ্ছিল। টেলিফোনের ওপ্রান্তে

যিনি খানিকবাদে হঠাৎই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন—সুরঞ্জন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে—টেলিফোনের ওধারে তখন অপ্রত্যাশিত হুঙ্কার। ভদ্রলোক নির্ঘাৎ কেউকেটা হবেন। 'ওয়েল। লেট্‌স সি। আ'ল টিচ হিম। দ্যাটস এ নোটোরিয়াস ফা—বা—ব্লাডি ডিচড্‌ আস।' ফোনটা কেটে গেল। ফোনটা রাখতেই দু'চারজন 'ব্যাপারটা কী দাদা। সোমাজ সোংস্কার টোংস্কার হচ্ছে বুঝি। তা ভাল ছোঁয়া লেগেছে। রামমোহন রায়ের পরেই সুরঞ্জন রায়।' সুরঞ্জন ডক্তরস ক্লাব থেকে উঠে এল, চরাচর ফের দোদুল্যমান। আর এক নজরানা বিবির এপিসোড হতে চলেছে কি?···তের নম্বর প্লাটফর্মের এগারটা তেইশের মেচেদা লোকাল বাতিল করা হল। পরবর্তী ট্রেন আপ খড়্গপুর লোকাল চোদ্দ নম্বর প্লাটফর্মে আসছে। ঘোষক এবারে জানাচ্ছেন অবরোধ উঠে গেলেও ট্রেন বিলম্বে চলাচল করবে।

প্লাটফর্মে হৈ চৈ।

ট্রেন থেকে নেমে সবাই হুদ্দাড় দৌড়তে শুরু করেছে। চোদ্দ নম্বর প্লাটফর্মে খানিকটা ঘুরে যেতে হয়। পারলে ট্রেনের ভেতর থেকে সব ওদিকে লাফিয়ে পড়ে। মানুষের কত তাড়া। তবু ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে কখনই পৌছনো হয় না।

সুরঞ্জন অনুনয়ের গলায় বলে যেন 'আজ আর যাবেন তপতী? এত বাধা পড়ছে···'

'না গেলেই-বা ব্যস্ত-শল্যবিদের কি! তিনি ত দুটো থেকে ফের সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে···'

'ডুব মারি যদি!'

—ডুব মারবেন ত, আপনার গার্লফ্রেণ্ড নজরানা বিবির কি হবে! তাকে ভিজিট করতে হবে না' তপতী হাসল।

'সি ইজ অলরাইট। সোমবার ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।'

'সত্যি?'

'ইন ফ্যাক্ট স্যার ত শুক্রবারই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। নজরানা বলেছে আমার সঙ্গে দেখা না করে সে নাকি যাবে না।'

'আই সি। তপতী চোখ মটকায় তলে তলে এত।'

'মনে আছে তপতী, তুই থুড়ি আপনি ত তাড়া দিয়ে অপারেশন শেষ করালেন তখন প্রায় তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে। তখনও স্ক্যাল্প ফ্ল্যাপ রিপেয়ার বাকি। আমি বললাম তড়িৎ মর্গের ডোমেদের মত মাথাটায় একেবারে

কনটিনিউয়াস রানিং স্টিচ মারছি। খুলতে তোদের কষ্ট হবে অবশ্য। পেসেণ্ট বেঁচে গেলে জিমিস কিচেনে খাওয়াব তোদের—'

পুচকে দিগন্ত ফুট কাটল 'স্যার আগের পাওনাগুলো মিলিয়ে ওয়ান্ডারফ হোক না!'

তপতী তখন পেসেণ্টকে জাগানর চেষ্টা করছিল। বলল 'চব্বিশ এক রেটিংটা আমি একটু কমিয়ে দিলুম এইবার কুড়ি এক তোমাদের স্যার ত গ্রাণ্ডে খাওয়াবেন ও বলতে পারেন—'

'তোমাদের খাওয়া কি জুটবে শেষ মেষ!'

স্বরঞ্জন ওদের উসকে দেওয়ার মত করে বলে 'এই ছেলেরা অজ্ঞানদিদিকে তোদের পারফরমেন্সটা দেখিয়ে দেত।'

তপতী হাসল 'অজ্ঞান দিদিকে অজ্ঞান করে দিওনা। দেখ আবার। স্বরঞ্জন হাসল, তারও অবশ্য রেকর্ড আছে। তড়িৎ সোৎসাহে বলল 'হ্যাঃ হ্যা— ছন্দাদির সেই গত গ্রীষ্মে ওটিতে ঢোকার মুখে ভেসো ভেগাল হল, ওটি বয় চন্দ্রভান সবাইকে ধমকে বলছিল 'ওটি আর কি করে হবে অ্যাঁ! অজ্ঞান দিদিমনিই এই গরমে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পেসেণ্ট বাঁচবে!'

তপতী হাসতে হাসতেই বলল 'যা খেলবনা। এত মিথ্যে বলেনা তোদের এই দাদাটা!' সবাই তখন হাসছে।

নজরানা বিবিকে ওটি টেব্‌ল থেকে ট্রলিতে তোলা হল। তপতী সাফ করে দিল এয়ার ওয়ে। 'এই যে দেখুন স্বরঞ্জনদা আপনার পেসেণ্ট চোখ খুলছে। এই জিভ বার করত! দেখেছেন নাইস। জিভ বার করছে। মাথা তোল। কে মেরেছে, অ্যাই অ্যাই কে মেরেছে তোমাকে?'

'ডাকু!'

'তোমার স্বামী!'

'স্বামী না ছাই, সেই তো ডাকু। আর যাবুনি গো…আর যাবুনি… আর যাবু…আর যা…আ…র…আ…মুখে ফের ফ্রদ। তপতী অসীম মমতায় ফের সাকশন করে। তড়িৎ 'নো সেডেশন নাউ। অক্সিজেন দেবে ঘণ্টা দেড়েক। আর দু বোতল ব্লাড পেলে তোফা। না পেলে এক বোতল…'

'থ্যাঙ্ক ইউ তপতী, থ্যাঙ্ক ইউ সিস্টার, তড়িৎ দিগন্ত' স্বরঞ্জন গ্লাভস্ খুলতে খুলতে বলল। রুবি নন্দী ইনস্ট্রুমেণ্ট সরিয়ে রাখছিল, হাসল, 'শুধু শুকনো থ্যাঙ্কস এ কী হবে! আমার তো শুধু দেখার নেমন্তন্ন…'

তপতী উস্কে দেওয়ার মত 'দ্যাটস ফাইন রাইটলি সার্ভড।'

'পেসেণ্ট কামরাউও করুক। অ্যাম্বুলেণ্ট হোক। পার্টি হবে। তখন ত বলবেন বাইরে যাই না। ডলিদি বকবে···'

তপতী হাসে 'কেবল ফাঁকি, আলবাৎ যাবেন কি সিস্টার যাবেন তো!'

সিস্টার এবার তপতীকে নিয়ে 'আপনার বাজীরদর কি এখনও কুড়ি এক।' তপতী হাসল সুরঞ্জনদার জন্য এবার আর একটু শস্তা করে দিলুম পনেরো-এক।'

সুরঞ্জন 'দাদার শস্তা করে দিলুম। খুব শস্তা করেছ! হেরো হারার ভয়ে চোট্টামি। পথে এসো···'

পরেরদিন রিকভারির লিফ্‌টের কাছে প্রফেসর গুপ্তর সঙ্গে দেখা। সুরঞ্জন-এর ডে অফ্। কিন্তু নজরানার টান—দেখতে এসেছিল। স্যার হাসলেন 'খুব খেটে অপারেশন করেছ, থ্যাঙ্কস। বেঁচে যাবেই মনে হল ত। সোকের্জ মিনিমাম।' হাসলেন; 'গাট সুচার কি দিয়ে করেছ?'

'ডাবল লেয়ার সিল্ক স্টিচেস্। স্যাট্‌স্ ফাইন!' প্রফেসর গুপ্ত তারপর হাউস স্টাফদের 'ড্রেন টু বি রিমুভড আফটার সেভেনথ্ ডে। একটু দেরি করে খাইও। হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাণ্টিবায়োটিক!'

'স্যার অ্যাম্পিসিলিন, জেণ্টিসিন চলছে সঙ্গে মেট্রোনিডাজলও আই ভি এইট আওয়ারলি পাচ্ছে।'

'পুলিস এসেছিল?'

'হ্যা। ডিক্লারেশন নিয়ে গেছে।'

'বলতে পেরেছিল! যাই হোক খাতাপত্র ঠিক রেখ।'

'ধরা পড়েছে?'

'খোঁজ চলছে স্যার।'

এসব মেয়েদের যেমন হয়! বিধবার এক মেয়ে নজরানা পনেরো বছরের বালিকা বইতো নয়! এখনও সেকেণ্ডারি সেক্স ক্যারেকটার ডেভেলপ করেনি! বুকের খাঁচায় সদ্য জাগরুক ডানস্তনের অর্ধস্ফুট কুঁড়িটিও উৎপাটনের চেষ্টায় ধ্বস্ত। সিস্টাররা রাতে গাউন না পেয়ে একখান গজ জড়িয়ে রেখেছিল নজরানার শরীরে। পাশের বেডের সেই সুদূর সংক্রামিত কর্কট রোগের পুণ্য লোভাতুর রোগিনীটিও নজরানার জন্য রাত জাগছেন, তার সর্বশরীরে ক্যানসারের বিষ ব্যথ্যা সত্ত্বেও। অস্ফুটে সেই জিড়িএদের ডাকছে। নজরানার অ্যাটেনডেণ্ট রাখার পয়সা কোথায়? সিস্টাররাও খুব ইনভলভড। সুরঞ্জন ইভিনিং রাউণ্ডে

তাজ্জব হল ব্রহ্মচারী ব্লকের সবচাইতে ফাঁকিবাজ জমাদারনীকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে। মরদের সঙ্গে অবশ্য তারও বনেনা—সেই যে ক্যাজুয়াল মাতাল পাগল অ্যাটেনডেণ্টটি—'মামদোভূত পুঙ্গির পুত ডাক্তার মন্ত্রীর লেগ্যে এত ভয় কেনে? আর এক-জমাদারনি বলছে, সুরঞ্জন শুনল 'হ্যাই মতিয়া দেখনা অ্যাই দেখ দেখ সরাব পিকে দেবাজ্ঞা কেয়া হাল কিয়া। বিল্ডিং কা গোদ মে পড়ে হুঁয়ে হ্যায়—'

'মরদকো মরনে দো'—মতিয়ার গলায় ঝাঝ। মতিয়া বেডসিট পাণ্টায় নজরানার। না বলতেই নজরানার পেচ্ছাবের বোতল পাণ্টায়।

তারপর ডাকুর জেল হল কিনা জানা যায়নি। পুলিশ অবশ্য আদিসপ্ত গ্রামের দিক থেকে নজরানার মাকে এ-কদিন নিয়ে এসছিল। নজরানা তিনদিনের দিনই বিছানার কোনায় বসল, চারদিনে হাঁটলও। সাতদিনের দিন মধ্যবয়স্কা কর্কট রোগাতুরা তার পরমায়ু নজরানাকে দিয়ে বুঝি হাসপাতালের মুল্যবান শয্যা ছেড়ে চলে গেল। নজরানা খুব কাঁদল সেদিন। এই নিয়ে…জীবনে মানুষ কতবার কাঁদে?

নজরানার জ্বর হয়নি। সেলাই পাকেনি, বুকে কফ বসেনি। সেলাই কাটার পর পেট ফাটেনি। ড্রেন রিমুভ করে তড়িৎ মনে করিয়ে দিল।

'দাদা খাওয়াটা?'

'হবে রে হবে।'

জুনিয়র অ্যানাসথেটিস্ট এর চাকরি ছেড়ে হেল্‌থ সার্ভিসে জয়েন করছে তপতী। তার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম 'শান্তিকল্যান'। আগামীকাল সে চার্জ নিয়ে কাউকে রিলিজ করবে নিশ্চয়ই। সে হয়ত বহুদিন বাদে কলকেতায় বেড়ু করতে আসবে। চোদ্দনম্বর প্লাটফর্মের ট্রেনে তপতী উঠে বসল আবার। তের থেকে চোদ্দতে আসতেই ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে ঠেলাওয়ালায়, পথ আটকানো লটবহরের হার্ডলে প্রাণান্ত হয়েছে। সাড়ে বারটায় ট্রেন। বাগনান স্টেশন রোডে ওর এক আত্মীয় আছেন। জেঠামশাই বোধহয়। সেখানে আজ ওঠার কথা। কাল সকালে ও সেণ্টারে যাবে। ওখানে ইনডোরে কটা বেড তপতীর গিয়ে চালু করার কথা। অজ্ঞানদিদের কিছুদিন গিয়ে শুধু ভেদবমির, হাগার ওষুধ লিখতে হবে।

'তপতী একটু সাবধানে। কোয়ার্টারে কার্বলিক অ্যাসিড রাখিস কিন্তু। বাগনানে বড্ড সাপ রে। দাঁড়া, এখানে কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবেনা?'

'তপতী হাসল, 'বলল সাপ? সুরঞ্জনদার সাপের এত ভয় জানা ছিল না তো!'

'সাপের কার না ভয় নেই? তোর নেই তপতী?'

'উহু! ভয় কীসের সরীসৃপদের এনভায়রনমেণ্টে থেকে অ্যাণ্টিবডি তৈরি করে ফেলেছি। ইয়েজ ডায়রেক্ট ইমিউনিটি! তারপর ওর সুন্দর ঠোঁটে পদ্মের বুড়বুড়ি 'চৌমাথাও সরীসৃপজাতীয়, এই ছাখ আমাদের চলাচল / সরীসৃপ জগতে সরীসৃপের মতই॥'

জানালায় থুতনি রেখে তপতীর চোখ দুটি কোথায় হারিয়ে গেল—উন্মনা সে উন্মনা।

'তপতী পালিয়ে যাচ্ছিস?'

'কই, তুমি এস দূর ত নয়...'

'হঠাৎ এ চাকরি...'

'এমনই। ভাল লাগছে না'

'বেরিয়ে এলে পারতি কোথাও'

'এই ভাল!'

নজরানার গল্প নিছক টাকা পয়সার নয়। কিন্তু তার? তপতীর চোখ এখন আকাশের নীলে ফোকাস করা। সে কেবল ভাবছিল কত জল ঘোলা কাদা ছোঁড়াছুড়ি। তপতী কি ক্লান্ত! খু-উব? এখনও স্মৃতি কি তাকে তাড়না করবে? সে ত যা চাইছিল...এখন সে ফের ন্যায় সিদ্ধ অসংযুক্তা। কাঞ্চনের সঙ্গে এমন হতে পারে! সে কি চেয়েছিল—তপতী...দেখেছ তপতীর চোখে জল।

গাড়ি ছাড়বে এবার। ঘোষক জানালেন। 'মেইন লাইনের ট্রেন রেগুলার হতে আরও বিলম্ব হবে।' হাওড়া স্টেশন এখন জনসমুদ্র। সাউথ ইস্টার্ণ এবার মোটামুটি সময়ে চলবে—

ডিস্টাণ্ট সিগনাল সে মুহূর্তেই পাণ্ডুর হলুদ হয়ে ওঠে। তারপর সবুজ —ট্রেন হুইশল দেয়।

তপতী হাসে। ম্লানিমা সে লুকোতে পারে না কিন্তু। জানলায় তপতীর একটা হাত। সুরঞ্জন খুব সন্তর্পণে হাতটা রাখে সেখানে, হাল্কা হওয়ার জন্য বলে 'এই যে গবা কাকার তপু ভাইঝি। চিঠি দেবেন।' তপতী হাত সরিয়ে নেয় না, এবার সে হাসতে চেষ্টা করে অস্ফুটে বলে 'দূর ত নয় যেয়ো সুরঞ্জন।' তারপর ভারমুক্ত হাসে, হাসে...ট্রেন চলতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

পরিশিষ্ট

হাওড়ার জটে আটকে পড়ে একটু দেরি করে ফেলেছিল সে। হাসপাতালে পৌঁছে সে দেখল সামনের দোকান টোকানগুলো ভো ভা। পুলিসের গাড়ি। চাদ্দিক ঝকঝকে তকতকে। তার মানে মন্ত্রী এসেছেন। সে হাসে; লাল ট্যারা পরেনি তো! প্রফেসরকে সে বলেই বেরিয়েছিল। স্বরঞ্জনকে দেখে স্যার হাসলেন—যাও মিটিংএ যাও, মন্ত্রী ধূমপান নিরোধ সেমিনার ডেকেছেন। স্যার আপনি? স্যার হাসলেন হাঃ হাঃ আমার দুমিনিট বাদে বাদে পাইপ ধরাতে হয়। স্বরঞ্জন ডক্তর ক্লাবে গিয়ে বসল। একটু বাদেই ইউনিট থ্রিঃ আর. এম, ও রাধানাথ ঘোষ ছুটতে ছুটতে এসে বলল গুরু দেড়ঘণ্টা সেমিনার করে পেট ফুলে উঠেছে—একটা সিগারেট দে? মেডিসিনের চক্রবর্তীদা নমস্কোর। রাধানাথকে একটু দেখে স্বরঞ্জনকে বললঃ রঞ্জু দে ওকে একটু কল্কে টা দে মন্ত্রীর পেছনে ঘুরে ঘুরে ওর ঘানিতে আর একটুও তেল নেই।

মৃন্ময় কলস

আহ্‌মেদ সফ্রিউই

"যাহাতে, শ্বেতপত্র, কৃষ্ণকায় চরিত্রগণ কর্তৃক আবৃত হয়।"

তৈরি করার জন্যই আবদাল্লার বেঁচে থাকা। পেশায় ঘরামী, জন্ম থেকে স্বভাব কবি। শহরের লোকেরা তা জানত, তাই কাজে তাকে ডাকেনি কখনোই। কেউ কি কোন কবিকে নিজের বাড়ি বানাতে দিতে পারে?

আবদাল্লার সাথে এক ঘরে আমি থাকতাম, আর সম্প্রীতি ছিল আমাদের মধ্যে। ঐকজন কার্পেট নির্মাতা ভাগবৎ দার্শনিক এবং একজন কবির পক্ষেই একমাত্র সম্ভব পরস্পরকে বিরক্ত না করে একছাদের তলায় থাকা, একই পাত্র থেকে খাবার তুলে খাওয়া এবং একই ঈশ্বরকে দিনে পাঁচবার স্মরণ করা। আমাদের কোন বড়লোকী চাল ছিলো না, শতচ্ছিন্ন বস্ত্রই ছিলো পরিধেয়। একই মাদুরের উপর আমরা খেতাম, ঘুমোতাম, সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিতাম। আমার অলসবেলায় একটা মোটা 'গজলী' ছিলো উপদেশ, টীকা টিপ্পনীতে ভরা; উল্টোতাম বসে বসে। কবিতার এই বিশাল সংকলনটি আমার আত্মাকে ভরিয়ে তুলতো ঐশ্বর্যে এবং কবরে যাওয়া পর্যন্ত টিকে থাকার পুণ্য মনকে দিতো অপরিসীম প্রশান্তি।

আবদাল্লা পড়েনা কিছুই, কেবল কালো সুনির্মিত চরিত্রদের দিয়ে ভরিয়ে যায় পাতার পাতা। দুটো বাদামী কার্ডবোর্ডের মাঝখানে ঘুরিয়ে থাকে পাতাগুলো। সমস্ত পরিবেশকে বিস্মৃত হয়ে আবদাল্লার নিঃঝুম হয়ে থাকার ফল এরা। যাই হোক্, এই লেখার স্তূপের মধ্যেকার একটি গল্পই আমি জানি। তবে গল্পটা বলার ক্ষেত্রে আমার একটু ইতস্তত ভাব আছে, কেননা বলার পর মনে হতে পারে, গল্পটা খুব সাধারণ ফলে আমার পরিশ্রম করাটা হবে অহেতুক। যাকৃগে, আমার দোস্ত যেভাবে এটা লিখেছিলো, দীর্ঘ ধ্যানস্থ অবস্থায়, ওর সাদা পাতায় কালো চরিত্রদের নিয়ে, সেভাবেই বলবো।

ছ'দিন আবদাল্লা পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে থেকেছিলো মাদুরে, চন্দ্রাহত চোখে শুন্যের দিকে তাকিয়ে। খাবার মুখে দিয়েছিলো অল্প, কথা বলেছিলো আরো কম আর ঘরের কোণটা থেকে নড়েনি একবার। তিন দিনের দিন সকালে ও উঠে বসে, ছ'হাটুর উপর একটা বোর্ড রেখে তার ওপর মেলে ধরে ভীষণ মসৃণ সাদা একটা কাগজ, কাগজটা এ্যাতো সাদা যে আলো হয়ে ওঠে আমাদের আঁধার ঘর, ঠিক যেন তারা ভরা রাত। কালো কালিতে খাগের কলম ডুবিয়ে জ্বরগ্রস্থের মতো কাগজের বুক ভরিয়ে দিতে থাকে অক্ষরে অক্ষরে। তীব্র নগ্নতায় ওরা ভাসতে থাকে, পরস্পরের ঘাড়ে উঠে পড়ে, আলাদা হয়, আবার জোড়া লেগে যায়, পিরামিডের আকার ধারণ করে, আবার ছড়িয়ে পড়ে। সার বেধে ওঠে লাইনের পর লাইন, শূন্যস্থান ছোট হয়। রাত শেষেও, আবদাল্লা তেলের আলোয় লিখে যেতে থাকে। চরিত্ররা ভরিয়ে তোলে কাগজ। আবদাল্লা ওর বিছানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর কাগজরাশি আমায় পড়ার জন্য বাড়িয়ে দেয়। কিছু সময় আমার লাগলো ও কি লিখেছে পড়ার জন্য, পড়া শেষ হলে আমি চোখ তুলি, বলি, "ভীষণ সুন্দর গল্পটা, কুমোরকে নিয়ে।"

"গল্পটায় কুমোরদের কোন জায়গাই নেই।"

আবার গল্পটা পড়লাম, তারপর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠি : "এবার বুঝেছি। গল্পটা মালীকে নিয়ে।"

"গল্পটায় মালীদের কোন ব্যাপারই নেই।"

গল্পটা কপি করে নিয়েছি, মধ্যে মধ্যেই বন্ধুদের পড়ে শোনাই। কিন্তু কেউই বলতে পারেনি, গল্পটা কি বলতে চায়।

গল্পটা হলো এরকম :

"কুম্ভকার যে নিজ মৃৎপাত্রদের ভালোবাসিত।"

কি পরিশ্রমেই না সে নিজের জন্য মাটি বেছে নিতো, কি ভালোবাসাতেই না সে জল ছড়িয়ে দিতো এর ওপর, কি শ্রদ্ধাতেই না সে গড়ে তুলতো মূল কাঠামো! শুধুমাত্র আনন্দের জন্যই মানুষ সৃষ্টি করে। এ আনন্দ যন্ত্রণার সাথে মিশে থাকে, যা থেকে নির্গত হয় জীবন, যার ফলে কুমোরের আঙুল পবিত্র এক উল্লাসে কাঁপতে থাকে। কলসীরা প্রাণবন্ত, একই সঙ্গে সাদৃশ্যময় এবং সাদৃশ্যহীন, বহুবিধ সম্ভাবনাসহ দৃশ্যমানতার প্রতিমূর্তি ; মাটি, জল,

বাতাস আর আগুন থেকে জন্ম নেয় এরা। কেইই বা জানে, ঈশ্বর সৃষ্টির পেছনে ঘূর্ণমানতার যে সূত্র, তার রহস্য! কুমোর, একি তোমারই ইচ্ছা যার ফলে অস্তিত্ব গ্রহণ করবে এই মাটির ফুল, যা রূপ গ্রহণ করতে চলেছে তোমার হাতের মধ্যে? তাহলে তুমি আর সেই মানুষ থাকবে না যারা ভুরুর ঘাম ঝরিয়ে রুটির জোগাড় করে। নাঃ, ওহে ক্ষুদ্র কীট, কোন অহংকার নয়। তোমার ইচ্ছা আসলে তাঁর ইচ্ছার অস্বচ্ছ প্রতিক্রিয়া। যে মানুষ এ সম্পর্কে থাকে সচেতন, সেইই পায় পরিশ্রমের আনন্দ।

যাই হোক্, বা দ্রিস্ সমস্ত রহস্য জানে আর তার আছে প্রভূত উৎসাহ। কিন্তু ধূর্ততায় জাল লুকিয়ে রাখে শয়তান।

সে সকালে বা দ্রিসের উঠতে দেরি হয়। ঠাণ্ডা কাজের ঘরে, সমস্ত অপরিচ্ছন্নতা দ্রবীভূত, স্নসমৃস কাদামাটিরা তার অপেক্ষায় ছিলো সার বেধে। বা দ্রিস্ 'জেলাবা' খুলে ফেলে, গর্তে নামে, চাক্ গুণগুণিয়ে ওঠে। গরম হয়ে ওঠা বুড়ো আঙুলে নীলচে আভা দেখা যায়। সন্ধে পর্যন্ত বা দ্রিস্ বড়ো পেট কলসী তৈরি করতে থাকে, ঈশ্বরের মতো আঙুল চেপে ধরে মাটির গায়, চোখের সামনে তারা আকার নেয়। সার সার কলসী জমে ওঠে, ডজনের পর ডজন। সেদিনের কাজ শেষ, এবার ওঠার পালা। এমন সময় দরজায় এক ভিখারীর অবয়ব জ্বলতে থাকে। অস্তমিত সূর্য ওর কাঁধকে করে তুলেছে তামাটে, ছেড়া টুপিতে ছড়িয়ে দিয়েছে বহুমূল্য পাউডার।

কুমোরের দিকে সে হাত বাড়িয়ে দেয়, বলে ওঠে :

"তোমার হৃদয়ের কাছে আমার অনুরোধ, ভিখারীকে খাদ্য দাও।"

হরবোলার গলায় যেন সে কথা বলে, শান্ত, নৈর্ব্যক্তিক।

কুমোর তার 'চেকারা' হাতড়ায়, একটা মুদ্রা হাতে উঠে আসে, বিনা কথায় ভিখারীকে দিয়ে দেয়। সে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে সেখানেই, মুদ্রাটা গুঁজে ফেলে কোন্ ভাঁজে, আবার বলে :

"তোমার হৃদয়ের কাছে আমার অনুরোধ, ভিখারীকে খাদ্য দাও।"

স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর প্রতিধ্বনিত হয় : "ঈশ্বর ইহা সম্ভবপর করুন।"

তৃতীয়বার, তোতা পাখির মতো, মৃত কণ্ঠস্বর বলে ওঠে আবার :

"তোমার হৃদয়ের কাছে আমার অনুরোধ, ভিখারীকে খাদ্য দাও।"

বা দ্রিস্, গলা শুকনো আর ভুরুতে ঠাণ্ডা ঘাম, ছাদের দিকে চোখ তোলার শক্তিটুকু ছাড়া আর কিছু নেই, চেঁচিয়ে ওঠে :

"হে সর্বময় ঈশ্বর! প্রভু! শয়তান, জাদুকরদের প্রভাব এবং ঈর্ষান্বিতদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমি তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি।"

কৃষ্ণমূর্তিটি সামনে ঝুঁকে পড়ে, থুথু ছিটিয়ে দেয় কলসী সারির উপর, তারপর অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির সাথে গলে গলে পড়ে।

* * *

ছায়ায় ছায়ায় কলসী শুকোয়। উনুনের মধ্যে সাবধানে বসানো হয়, প্রচণ্ড উত্তাপ ওদের গ্রাস করে। আগুন শিখায় পুড়ে যায় সমস্ত ময়লা, বের করার পর, মোজেসের হাত যেন, সমস্ত মলিনতা থেকে ওরা মুক্ত।

বা দ্রিস্ বাছতে বসে। পরীক্ষার সময় দেখা গেল, প্রথম কলসীটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিরাট ফাটল। এক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে ওটা সরিয়ে রাখে। কিন্তু দু'নম্বরটাও তাই, তৃতীয়টাও, সবকটাই, হ্যাঁ, সবকটাই, একই ক্ষতে ব্যবহারের অযোগ্য।

পরিশ্রম আর আর্দ্র সতর্কতার এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বা দ্রিস্ মাথা নিচু করে বসে থাকে শব্দহীনতায়। মাটির মৃতদেহগুলির বর্তুলাকারতায় হাত বোলাতে থাকে সে। চিন্তার অসংলগ্নতার মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক তাকিয়ে থাকে, এইমাত্র যে কলসীটি সে ছুয়েছে, তার নিখুঁত বাঁকের দিকে। হঠাৎ, তার চোখ পরিস্কার হয়, সে দেখে, ওটা পুরোপুরি আ-ফাঁটা। এক আনন্দময় চিৎকার ছুড়ে সমস্ত কলসীগুলো সে পরীক্ষা করতে শুরু করে, কিন্তু হায়! এ অভিশাপ থেকে মাত্র একটা কলসীই মুক্ত। বুকের মধ্যে ওটাকে শ্রদ্ধায় চেপে ধরে 'পরম বিস্ময়' এরদিকে চোখ তোলে সে, বিড়বিড়িয়ে বলে ঃ

"হে সর্বময় ঈশ্বর! প্রভু! শয়তান, জাদুকরদের প্রভাব এবং ঈর্ষান্বিতদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমি তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি।"

"এক মালাকর যে তাহার পুষ্পরাজি ভালোবাসিত।"

এক বন্ধু ছিলো কুমোরের। 'রাশ সেরাটিন' এর এক ছোট্ট ঘরে সে ফুল বেঁচতো। ফুল বিক্রেতাদের জন্য ঠিকঠাক জায়গা এটা। পাশেই একটা ঝর্ণা গান গেয়ে চলেছে। গোলাপ ফোঁটার মরশুমে, কাছের মাদ্রাসার ছাত্ররা নিয়ে যায় গোছা গোছা ফুল আর উল্টোদিকে বসা নাপিতটা নিতো প্রচুর

ভেষজ লতাপাতা। শহরের অন্যপ্রান্ত থেকে লোকেরা আসতো কবরে দেবার এবং বাগান সাজাবার জন্য থাম্ কিনতে। পথিকরা প্রশংসা করে 'এই ছোট্ট সাজানো ঘরটার কেননা রাস্তার রঙ বাড়িয়ে দিয়েছিলো এটা।

বসন্ত এবং গ্রীষ্মে, শীতে কিংবা বর্ষায়; সদ্য জল খাওয়া সতেজ পাঁপড়িদের রঙ আর সমাহারের মধ্যে ধব্‌ধবে পোষাকে একজন বুদ্ধিদীপ্ত বৃদ্ধকে এই পুষ্পদল পরিচর্যায় দেখা যেতো।

সারা শহর বা সিদিকে চেনে। কোন এক অজানা কবি তাকে নিয়ে গান লিখেছিলো, এখনো তার টুকরো টাকরা লোকের মুখে মুখে ফেরে ঃ

বা সিদি! বা সিদি!
তোমার দাড়ি যেন রেশম গোছা!
বা সিদি! বা সিদি!
তোমার অলিখাল্লা রাজার জন্য!

কোন এক মঙ্গলবারে বা সিদির সাথে কুমোর দেখা করতে গেল ওর বাগানে, এটাকে সে পরিত্যক্ত কবরখানা বলেই ভাবতে চাইতো। স্বাভাবিক ভাবেই, কোন একটা কানাগলির শেষে এর অবস্থান। এখানে বা সিদি জড়ো করতো নানা মাপ আর গড়নের কলসী, নানা রঙের এনামেল বাটি, ফাটা ফুলদান, ফেলে দেওয়া কড়াই ও মরচে ধরা পুরোন পাত্র। এই সমস্ত বাতিলদের মধ্যে ফুঁটে থাকতো গোলাপের রূপচ্ছটা, ডাবল কার্নেশানের উল্লাস-মুখর ভঙ্গিমা কিংবা বাটারকাপের ঔজ্জ্বল্য। সোনালি পোকা আর সূর্যস্নাত প্রজাপতিদের আক্রমণের জন্য বা সিদিকে এই স্বর্গের ওপর নজর রাখতে হতো কঠিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ছোট্ট স্বর্গ সে সতর্ক নিরীক্ষণে কাটিয়ে দেয়, রেশমী ভুরুর তলায় গভীরে বসা চোখ হেসে ওঠে খুশীতে, মাঝেমাঝেই নরম হাতে চাপড়ে নেয় দাড়ি, যে হাতের উল্টো পিঠ সাদাটে লোম আর শিরায় শিরায় ভরা। এরকম এক অবসরে যখন সে মগ্ন, তখনই আসে কুমোর, এই মধুর নৈঃশব্দ থেকে তাকে জাগিয়ে তোলে। পরস্পর চেনা তারা বহুদিন থেকে, কুমোর পায় উষ্ণ অভ্যর্থনা।

"তোমার জন্য একটা নতুন কলসী নিয়ে বসেছি" সে বলে।

"ভগবানের ইচ্ছে হলে ভারী সুন্দর একটা ফুল ফুটবে ওতে।"

"সমস্ত ফুলই সুন্দর," বৃদ্ধের উত্তর। "ফুলেরা সুখপ্রদ, সঙ্গ দেয় মধুর। বহুবছর ধরে আমি দেখছি কিভাবে ওরা ফুটে ওঠে, বেঁচে থাকে, মরে যায়। অল্পস্বল্প বুঝে উঠতে আরম্ভ করেছি ওদের। জীবন ক্ষণস্থায়ী, হায়, ওদের এই

অতল রহস্য উদ্ঘাটনের আগেই আমায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। সৃষ্টির এই রহস্য আমার কাছ থেকে ওরা লুকিয়ে রাখবে চিরকাল। দেখো, আমার এই বিধর্মী উক্তি কাউকে যেন জানিও না কখনো। দাও, কলসীটা দেখি।"

গোল কলসীটাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেয় বা দ্রিস্, দু'জনে দেখতে থাকে চুপচাপ।

কুমোর প্রথম কথা বলে। "আমি দেখতে পাচ্ছি, ফুলদানটা থেকে বেয়ে উঠছে মরকৎ শাখা প্রশাখা, রুবির ফলে পরিপূর্ণ। নাকি চোখ বাঁধানো সূর্যালোকের বলয়, কোন্‌টা চাও তুমি?"

"বোধহয় এটাই," বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়।

কয়েক মুহূর্ত নিজের চিন্তায় জড়িয়ে থাকে সে, তারপর কুমোরের দিকে ঝুঁকে পড়ে রহস্যময়তায়, তার কানে কানে বলে:

"আমি এটায় হাজার পাপড়ির ফুল ফোঁটাতে চাই, তবে তার জন্য এটাকে হতে হবে পুরোপুরি শুদ্ধ।"

আত্মগত, মাথা নেড়ে সে নিজেই নিজেকে বলে আবার, "এটাকে হতে হবে পুরোপুরি বিশুদ্ধ।"

"মহাপুরুষটি।"

শুক্রবার, যখন বিশ্বাসীরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসে, ভিখারীদের দ্বারা বিরক্ত হয়, সেইসময় শোনা গেল গান গাইছে কেউ:

'ঈশ্বরকে মুক্ত করো আঁধার থেকে,
হচ্ছেন তিনি শ্বাসরুদ্ধ,
তোমার প্রেমের ছায়ায় ছায়ায়
ফুটবেই সেখানে ফুল।'

সেই বৃদ্ধ মালী, এক মাটির কলসীতে চোখ রেখে, এই অদ্ভুত গানের কলিগুলো গেয়ে যায়। সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে—বা সিদির 'ভর' উঠেছে। ওর ছোট্ট দোকান সশ্রদ্ধ পুজোপকরণে ভরে ওঠে।

অবিশ্রান্ততায় সে একই মন্ত্র বারবার উচ্চারণ করে যায়, মাথা নীচু, চোখ নীচু।

ভক্তদের ঢেউ যখন স্তিমিত, বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে আসে একজন। আগে একে দেখেনি কেউ; পরণে ওর সাদা জোব্বা, স্বর্গের গন্ধ মাখা। ডান কিংবা বাঁ—কোন দিকে না তাকিয়ে সে মাপা পায়ে হেঁটে আসে। কারোর সাথে একটা কথাও বলেনা। বা সিদি, মাথা নীচু তখনো, থামিয়ে দেয় ধীর মন্ত্রোচারণ। আগন্তুক ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, ঋজু, দীর্ঘ। বা সিদি নড়ে না। আগন্তুক ধীরে নীচু হয় তখন, একচিমটি ধুলো তুলে নেয়, মসজিদ থেকে দলে দলে আসা ধর্মপ্রাণদের পায়ের ধুলো, আঙুলি থেকে ধুলো উড়ে পড়ে মাটির কলসীটার উপর। মাতালের মতো নড়ে ওঠে বা সিদি, কলসীটা আঁকড়ে ধরে, গড়িয়ে পড়ে যায়।

দিন দুই বাদে, বন্ধু কুমোর ওকে মৃত আবিষ্কার করে ওরই বাগানে, গোলাপ আর নার্সিসিদের মধ্যে। ওর দু' হাতের মধ্যে মাটির কলসীটা ধরা ছিলো। ওটার মধ্যে থেকে আলো বেরোচ্ছিলো, মাঝখানটায় ফুটেছিলো অদ্ভুত এক ফুল যার অভূতপূর্ব বর্ণচ্ছটা ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো চোখ। প্রত্যেকেই এই জাদুকরীতে হতবাক হয়ে থাকে।

বা সিদিকে তার কলসীসমেত গোর দেওয়া হয়। আর কোথা থেকে উড়ে আসে দু'টো পায়রা, কবরে বসে, কেঁদে ওঠে।

অনুবাদ ঃ সৌমিত্র সরকার

পঁচিশ বছর পেরিয়ে

(নেলসন ম্যাণ্ডেলা-কে)

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সেলের গরাদে জলে সূর্যাস্তের অহঙ্কারী লাল।
কফির গুঁড়োর মত মুঠো মুঠো চূর্ণ অন্ধকারে
কবি না কয়েদি বসে থাকে।
মানুষের ঠোঁট থেকে ঠোঁটে
চুমোর আবেগে ফেরে তার প্রিয় নাম।
সে-নামের গাঢ় ঘ্রাণে
প্রতিদিন কেঁপে ওঠে মহাদেশ, জনপদ, গ্রাম।
পঁচিশ বছরময়
লোহার শীতল হাহাকার
শরীর পেয়েছে শুধু,
কখনো পারে নি ছুঁতে নীল স্বপ্ন তার।

ভারতবর্ষের প্রতি

নেলসন ম্যাণ্ডেলা

[১৯৭৯ সালে নেলসন ম্যাণ্ডেলা আন্তর্জাতিক মৈত্রীর জন্য জহরলাল নেহরু পুরস্কার পান। সেই উপলক্ষে ৩ আগস্ট ১৯৮০ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন-এর সম্পাদিকা শ্রীমতী মনোরমা ভাল্লাকে তিনি এক চিঠি লেখেন। চিঠি কারাগার কর্তৃপক্ষ আটকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ২৬শে আগষ্ট ১৯৮১ চিঠিটি কারাগারের বাইরে আসে ও প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে দঃ আফ্রিকা সরকার শ্রীমতী ম্যাণ্ডেলাকে তাঁর স্বামীর হয়ে পুরস্কার গ্রহণের অনুমতি দেন নি। ১৯৮০ নভেম্বর মাসে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস অফ সাউথ আফ্রিকার সভাপতি শ্রীযুক্ত অলিভার তাম্বো তা গ্রহণ করেন দিল্লির এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে। চিঠিটির বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশিত হল।

সম্পাদক, পরিচয়]

প্রিয় শ্রীমতী ভাল্লা,

আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাকে ১৯৭৯ সালের আন্তর্জাতিক মৈত্রীর জন্য জহরলাল নেহরু পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। যদিও এটা একমাত্র আমাকেই দেওয়া হয়েছে তবুও এই পুরস্কারের মাধ্যমে দঃ আফ্রিকার সমগ্র দেশবাসীকেই সম্মান দেখানো হয়েছে। আমাদের দেশের জনগণ যেমন একদিকে দ্বিধাগ্রস্ত, তেমনি এই ভেবে গর্বিতও যে অতীতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁদেরই একজনকে বসানো হয়েছে একই আসনে।

আমি ঐ সমস্ত নাম এই কারণেই স্মরণ করতে চাই, যে, তাঁরা শুধু মাত্র পুরস্কারই পান নি, তাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে সম্মান জানাতে পেরেছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত করতে পেরেছেন পণ্ডিত নেহরুর বহুমুখী প্রতিভাকে। নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিক মাদার টেরেসা, আন্তর্জাতিকতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা জোসেফ টিটো, প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জুলিয়াস নিয়েরেরে ও কেনেথ কুয়াণ্ডা, সামাজিক অধিকার রক্ষার অগ্রগণ্য নেতা মার্টিন লুথার কিং সকলকেই।

পণ্ডিত নেহরু ছিলেন এমন একজন মহান ব্যক্তি, যাঁর মধ্যে বহুমুখী গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। একাধারে তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনৈতিক নেতা, আন্তর্জাতিক বক্তা, অন্যধারে ইংরেজী সাহিত্যের সুপণ্ডিত, আইনজীবী

ও ঐতিহাসিক। তিনিই ছিলেন আন্তর্জাতিক জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তাই বিশ্বশান্তি আন্দোলনে মানুষের ভ্রাতৃত্ব বোধের, উন্মেষের ক্ষেত্রে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন কোনো উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামী জাতীয় নেতা নেই, যিনি নেহরুর কাজের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। রাজনৈতিক জীবনে অনেকই তাঁকে উদাহরণ হিসাবে স্মরণ করেন। আমি যদি নিজের রাজনৈতিক শিক্ষার পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাবো তাঁর কাজ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা আমিও প্রভাবিত, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, রাজনীতির অতি নগণ্য ছাত্র, তখনই তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হই। আমি প্রথম তাঁর বই 'Unity of India' পড়ি, তখন থেকেই তাঁর সম্পর্কে আমার মনে উঁচু ধারণার সৃষ্টি হয়। আমি তাঁর লেখাপত্র পড়ার জন্য আগ্রহী হই, তাঁকে জানার চেষ্টা করি।

যখন তাঁর আত্মজীবনী পাঠ করি তাঁর চিন্তার ধারার সঙ্গে আমার একটা সাযূজ্য লক্ষ্য করি। তিনি যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, কোনো কিছুর সঙ্গেই কোন মুল্যে তিনি আপোষ করেননি। সেখানেই বন্দী অবস্থাতেও সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে নিয়োজিত ছিলেন। ঐ লেখা স্বাধীনতা-প্রেমী পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আজও শিক্ষনীয়।

বেশীর ভাগ যুবকই যাঁরা রাজনীতিগত ভাবে প্রাজ্ঞ, গভীর ভাবে ভাবনা চিন্তা করেন, তাঁদের মধ্যেও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়। নেহরুর ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁরা ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উদার হলেন এবং পৃথিবী সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবতে শুরু করলেন।

আজকের দিনে যেখানে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংযোগ ব্যবস্থা গোটা দুনিয়াকে ছোট করে দিয়েছে, মানুষের পুরনো ধ্যানধারনা ও কল্পনার দূরত্বকে ক্রমশঃ নিকটতর করেছে, যেখানে একের সঙ্গে অপরের সংযোগ, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানেও আমরা নিজেদের মহৎ করেছি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দিয়ে নতুন বাস্তবকে গ্রহণের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন জাতীয় আন্দোলন দেখে আমরাও এই গোলার্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থান জেনে নিলাম। দ্রুত শিক্ষা নিলাম এই আন্দোলনের আলোকে। মহান রাজনৈতিক দ্রষ্টা ও শিক্ষকের মত ভারতের ঘটনাবলী আমরা লক্ষ্য করলাম। বুঝলাম, পৃথিবীর কোন মানুষই সার্বিক ভাবে মুক্তি পেতে পারে না যদি পৃথিবীর যে কোনো কোণে তাদেরই কোন ভাই বিদেশি শাষণে আবদ্ধ থাকে।

আমাদের দেশের মানুষ ভারতের এই মহত্বকে লক্ষ্য করে। আমরা লক্ষ্য করি যখন তাঁরা ফ্যাসিষ্ট ইতালির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল জনমত সংগ্রহের মাধ্যমে, আমরা সপ্রশংসভাবে লক্ষ্য করি স্পেনের জনগণের প্রতি ভারতের সমবেদনা প্রদর্শনে, আমরা উৎসাহিত হই চীনে মেডিকেল মিশন পাঠানোর উদাহরণ সৃষ্টিতে, আমরা গর্বিত হই সোভিয়েত ইউনিয়নকে লক্ষ্য করে নাৎসি হুঙ্কারের সময় মুসোলিনির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের ঘটনায়। জার্মাণীর আমন্ত্রণ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে চেকোস্লোভিয়া সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের কাছে নতুন তাৎপর্য বহন করে।

আমাদের দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ দীর্ঘদিনের। আমরা তাদের কাছে প্রেরণা পেয়েছি, আমাদের আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। তাদের কাছে আমরা বাস্তব সহযোগিতা অর্জন করেছি, ফলে একটা স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মধ্যে।

১৮৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচীনতম সংগঠন (নাটলি-ভারতীয় কংগ্রেস) মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ঐ সংগঠনের প্রথম সম্পাদক। দীর্ঘ একুশ বছর তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। আমরা তাঁর চিন্তার উৎস এবং প্রতিবাদ সংগঠিত করার পদ্ধতির প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর মত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ভারতের ও দঃ আফ্রিকার ইতিহাসে বিরল। এই মাটিতেই তাঁর 'সত্যাগ্রহ' চিন্তাভাবনার জন্ম। ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর দঃ আফ্রিকার এই অভিজ্ঞতা সারা ভারত কংগ্রেস-এর জন্মের ক্ষেত্রে কাজে লাগান।

আন্তর্জাতিক বিষয়ে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের কাজকর্মে আমরা একাত্মতা অনুভব করি। আমাদের মনে এই আত্মবিশ্বাস জন্মে যে আমাদের সমস্যা যতোই কঠিন ও নগণ্য হোক না কেন এটা একটা মানবিক সমস্যা। পৃথিবীর কোনো মানুষই এটাকে উপেক্ষা করতে পারবে না যতদিন না মানুষের তৈরি এই বিভেদ পৃথিবীর মাটি থেকে সমূলে উৎখাত হচ্ছে। আমাদের দেশ থেকে বিনষ্ট হচ্ছে।

এই বিশ্বাস আমাদের যন্ত্রণাকে লাঘব করে, আমাদের মানবিক বিবেককে জাগ্রত করে। গোটা দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের দায়িত্বের কথা, আমাদের সম্পর্কে গোটা দুনিয়ার কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটা আমাদের জয়ের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী করে। এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা অগ্রসর হতে পারি আগামী দিনের পথে।

আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাই, ভারতের মানুষের মিছিলে, পৃথিবীর মিছিলে। যে-মিছিল আগামী দিনের উজ্জ্বল আলোকধারার দিকে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে এই পৃথিবী হবে সমস্ত মানুষের জন্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীরই স্বপ্ন দেখেছিলেন কবিতায়—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য
উচ্চ যেথা শির···।"

অনুবাদ—পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

বিরাটনগর

অনীক রুদ্র

কস্টিক মিশে থাকে বাতাসে, পোড়া গন্ধক
এলোচুল কে দাঁড়িয়ে, চুল নয় জটা
তবু প্রতিমার মুখ যেন এসপ্ল্যানেড শুরু করে
পার্ক স্ট্রীট বরাবর ছড়ানো সন্ধ্যায়
হয়ত প্রতিমা ছিল, সন্ধ্যামণি সকলেই, আজ
নিকষ নামার আগে বিদ্যুতের খরশান ভাগ করে দিয়েছে এলাকা
তুমিও যে খুব একা বন্ধুবান্ধবহীন সেইকথা বলে দেয়
দ্রুতলয় বদলে যাওয়া বাসের নাম্বার
মিনিবাসে চ্যাঁচামেচি
শেয়ার ট্যাক্সির হল্লাকার
এ হেন বিরাট গ্রাম
যার কোন অবিমিশ্র সংস্কৃতি নেই
ময়দানে বিকেলের ধর্মআলোচনা হতে একে একে
ভরে যায় অফিস-ফেরৎ সমকামী
ফুটপাথে পুলিশের সঙ্গে ক্রমে জমে ওঠে
গড়াপেটা লুকোচুরি খেলা
কস্টিক মিশেছিল বিষাদের মুখে
যদিও মুখের কোন প্রকৃতই বিষণ্ণতা নেই
চোর-বাজার হতে কেউ ছাতা কেনে
মরা-সাহেবের শার্ট, ক্যামেরা ও হাতঘড়ি, ফুলকাটা অন্তর্বাস
বৌমার ছেলের ক্যাডবেরি
মাখনের পুতুলেরা লিমুজিন চড়ে এসে কিনে যায় ফরেন মাস্কারা
শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঘাড় উঁচু করে থাকে বাঁকুড়ার ঘোড়া

দোল খায় মধুবনী, মুখোশের ছৌ
প্রত্যন্তপ্রদেশ ঢুঁড়ে-আনা—ব্রোঞ্জ ও কাঠের কাজ অথবা মাটির
তাছাড়া নিত্য যত প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমাণ শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরি

২

তুমি কী ম্যাক্সিমে যাবে, মণ্টে কার্লো অথবা শ-বারে
দেখ কত মস্তির উপাদান খোলা আছে মিছিল নগরে
আমি জানি তবু আমি কিছুতে বলব না
মফস্বল থেকে আসা দুঃস্থ বাড়ির বৌ শেষ ট্রেনে চলেছে কিভাবে—
হেনরি মুরের কাজ, ফিদা হুসেনের আঁকিবুকি
অ্যাকাডেমি আর্ট গ্যালারিতে
আমরা রেখেছি যারা বিবিধ মঞ্চ জুড়ে
মাঝে মাঝে নাট্যোৎসব-চলচ্চিত্র-তথ্যসংস্কৃতি
যুবকেন্দ্রে, গর্বের মহাজাতিসদনে ব্যাপ্ত সেমিনার
কলামন্দিরে কালোয়াতি
থিয়েটার পাড়ার বৌ, জামাইবাবু, কচিকাঁচা শালী
তিলোত্তমা টালা থেকে টলিগঞ্জ উত্তর দক্ষিণে এজমালি
মেট্রো রেলের পাশে আমাদের প্রত্নশালা
আমি তার চার-অক্ষর কী করে যে ভালোবাসি
বাগজলা খালের দুপাশে
মেটিয়াবুরুজ আর তারাতলা হাইড রোড ছুঁয়ে
ওদিকে ব্যারাকপুর, গৌরীপুর নদীর দুধারে
প্রেসিডেন্সি, বালি জুট বন্ধ হলে শ্রমিকেরা আঙুল চুষেছে
এবং বি-বা-দী বাগ উঠে আসে সেইমত চেম্বার কমার্সে
'শিল্পে শান্তি চাই, শৃঙ্খলা চাই' ধ্বনি ওঠে
শান্তির দৌড় হয়, মানব শৃঙ্খল বেজে যায়
বঙ্গোপসাগর হতে দার্জিলিং নামক পাহাড়ে

৩

এখানে অ্যাসিড-বৃষ্টি ঝরে গেলে টানা সাতদিন
তিলজলা, কসবা ডোবে বেহালা বা নিউ আলিপুর

শুধু বহুতল বাড়ি জাগে দ্বীপ হয়ে বর্ষা-বিভ্রমে
অথচ এমন করে কার সাথে ঘর করা
কীসেরই-বা চুম্বক ক্রিয়া
নতুন বিদেশি লগ্নি এন-আর-আই প্রবেশের পথে
সাম্রাজ্যবাদের দাসী পটিয়সী রক্ষিতার ঢঙে হাই তোলে
মেদবতী স্ত্রীলোকের চর্বি কমে স্লিমিং সেণ্টারে—
জোব চার্ণকের কথা, রাজেন মল্লিকের কথা, হালদারের পার্বণের কথা
আমি আর কতটুকু জানি
উৎসব এলে কারা জোড়াসাঁকো গিয়ে কেন দিয়ে আসে
বেলপাতা, ফুল ও প্রণামি
উত্তাল সত্তরে জেনোসাইডের সঙ্গে কী করে ঢোকানো হল
নার্কোটিকস শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে
আনন্দনগরে যারা বসে আছে ফোমের কুশনে
এবং যৌন ব্যাধি অবিচ্ছিন্ন প্রতাপ ছড়ায়
চাঁদসীর ক্ষত নিরাময়ে হাতুড়ে ডাক্তার বাড়ে ব্যাঙের ছাতার মত
ধীরেন গাঙ্গুলি, বসে থাকে শ্যামবাজারে ঘুপচির দোতলা কোনায়
যখন অসম চাল, বিষম প্রক্ষোভ জেগে থাকে
শ্যামলেন্দু ভটচাজে'রা কী যেন প্রিজার্ভ করে প্রেমে
ভুপ্র কার্জন, কী সম্পদ রেখে গেছ তুমি এই উর্বর বিছনে!

৪

কস্টিক মিশে থাকে বিবিক্ত বাতাসে পোড়া গন্ধক
তারপর দূষণ নগরী
নয়া টার্মিনাস হতে আই-এম-এফ গেঞ্জি পরে
বেরিয়েছে ট্রামসুন্দরী
অষ্টাবক্র চক্ররেল কে যে চড়ে, কারা চড়ে, কেন
ট্রাফিকের সংখ্যা বাড়ে—কর্মের সুবিধা কমে যায়
বাইপাসে ধারাবি জাগে
এদিকে ধাপার মাঠ উঁচু হয়ে স্টেডিয়াম, তার পাশে
সল্টলেক সিটি
বেলাভূমি বসে যায় হাড়-হাভাতি চোরানি গঙ্গায়

শীতের বিদেশি হাঁস দূর হতে উড়ে আসে চিড়িয়াখানায়
ফোর্ট বিলিয়াম থেকে একবার ছুটে আসি শহিদ মিনারে
একবার বেতারে যাই, একবার গলফ গ্রীন টি-ভি সেণ্টারে
ট্যাংরার বস্তি-বাড়ি দেখব বলে, চামড়ার উৎপাদন পার্কসার্কাসে
চকমিলান বালিগঞ্জ এবং বস্পাস লেক, লেক গার্ডেন্স
সাদার্ন এভিন্যু, সফদরজঙ হয়ে যতদূর চোখ যায়
জুহু ও মারিনা বীচে
তারপর দৃষ্টি পড়ে ছাটা
ভেতরে তুমুল শব্দে ভেঙে পড়ে অসমাপ্ত সাঁকো
ডিফেন্স কলোনি চুরমার
ভেসে ওঠে কালীঘাট মন্তাজে
ওয়াটগঞ্জ রেডলাইট বাঁয়ে, যেভাবে অনেক ছবি :
বন্দরে জাহাজ এলে কলুসিত মুখ
কবিতা-নাম্নীর বাড়ি এখানেই পনের নম্বরে
ঐ তার দুর্নিবার খোলা চুল আর আছে
মেঘলিপ্ত মাংসের ঠমক…
আসলে তেমন জরা আনা হবে
বহুদিন বলে গেছে ভিক্টোরিয়া মন্দিরের পরী
ক্যাথিড্রালে, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ, চার্চ গেটে—
আমরা সেই রস-কষ-বিষ সব নিংড়ে পান করে ধান্দায় থাকি
কবে যে উত্তরীয় ওড়াব আকাশে, পার্গেটরি
ততদিন তীব্র তমসায়
যদি পূর্ণ হয় হোক আরও বারো সন
এ্যাহস্পর্শ বিরাট নগর-এ।

ভারতে বস্তুবাদ ঃ প্রসার্যমাণ দিগন্ত

আজ থেকে একাত্তর বছর আগে, ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের বাংলা অনুবাদ বেরতে শুরু করে। পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশের এই মহান প্রয়াসকে সবাই কিন্তু ভালো চোখে দেখেন নি। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমহলে আপত্তি উঠেছিল: প্রাকৃতজনের ভাষায় ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা কেন? তার বাইশ বছর বাদে, 'ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) ভূমিকায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ আত্মপক্ষ-সমর্থনে বিস্তৃত বক্তব্য রাখলেন। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ' ও রঘুনন্দনের 'ব্যবহারতত্ত্ব' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালেন, "…প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা গদ্যভাষার দ্বারা অধ্যাপনা করিতেন। বস্তুতঃ অনেক বিষয়ে অনেক বিদ্যার্থীর পক্ষেই সংস্কৃত ভাষার দ্বারা অধ্যাপনা সফল হয় না। আর অন্যদেশীয় ভাষার প্রয়োগ একেবারেই ব্যর্থ হয়।" এর পরে তিনি সবিস্তারে 'দেশভাষায় পুরাণ ব্যাখ্যার প্রমাণ' দেন, যুক্তি দিয়ে দেখান যে 'দেশভাষায় গ্রন্থরচনাও অকর্তব্য নহে', 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণেরও বঙ্গ-ভাষায় নানা গ্রন্থরচনা'র নিদর্শন আছে।

'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' বইটা হাতে নিয়ে এই সব কথা মনে পড়ে। দু পুরুষ ধরে বাঙালী পাঠককে বস্তুবাদী দর্শনে হাতেখড়ি করিয়েছেন দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (এই একই নামে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একজন বিধায়ক আছেন। তিনিও দর্শনের লোক, অতীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। দয়া করে কেউ তাঁর সঙ্গে এই লেখককে গুলিয়ে ফেলবেন না)। 'লোকায়ত দর্শন' (১৯৫৬) দিয়ে তার সূচনা। তারপর 'ভারতীয় দর্শন'—আদিপর্ব (১৯৬০)। যতদূর জানি, তারপরে বাংলায় এ বিষয়ে তাঁর আর কোন বই বেরয় নি—'দার্শনিক লেনিন' (১৯৮০) ও মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে 'ন্যায়সূত্র' (১৯৮২) ছাড়া। ইংরিজিতে অবশ্য একের পর এক বই বেরিয়েছে, জিজ্ঞাসা ও গবেষণার ক্ষেত্রও ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালী পাঠকের পক্ষে সুসংবাদ: এতকাল পরে ভারতে বস্তুবাদ নিয়ে তাঁর নতুন বই বেরল।

'লোকায়ত' (ইংরিজি) পড়ে জার্মান ভারততত্ত্ববিদ্ ভাল্টের রুবেন দেবীপ্রসাদকে বলেছিলেন, এই বইতে বস্তুবাদের উৎস নিয়ে তিনি একাগ্র সন্ধান করেছেন ঠিকই, কিন্তু দার্শনিক মত হিসেবে চার্বাক / লোকায়ত মতের মূল্যায়ন তুলনায়-উপেক্ষিত হয়েছে। কেন? লেখক জানিয়েছেন, "রুবেন-এর প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে আমার মাথায় ঘুরেছে। নানা লেখায় দেখাবার চেষ্টা করেছি, দার্শনিক মত হিসেবে প্রাচীনকালের অনিবার্য অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মতটির স্বকীয় গুরুত্ব কম নয়। বর্তমান বইতে কথাটা ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি।"

এ বই কিন্তু শুধু চার্বাক / লোকায়ত নিয়ে নয়। অবশ্যই গোড়ার তিনটি অধ্যায়ে চার্বাকমতের স্বরূপ, প্রত্যক্ষ ছাড়া চার্বাকরা আর কোন প্রমাণ মানেন কিনা, দেহ ও আত্মা নিয়ে ভাববাদ-বস্তুবাদের বিতর্ক—এ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান্ ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা আছে। সেই সূত্রে অনেক নতুন প্রসঙ্গও এসেছে। যেমন, এযাবৎ আমরা লোকায়তকেই একমাত্র বস্তুবাদী দর্শন বলে মনে করতুম। লেখক দেখিয়েছেন, সেটিই ভারতের সবচেয়ে প্রখর, আপসহীন বস্তুবাদী মত হলেও, একমাত্র ধারা নয়। "ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে চার্বাকদের বিরুদ্ধে অজস্র গালমন্দর নজির থাকলেও বস্তুবাদের প্রতিনিধি হিসেবে আসলে তাঁরা একান্তই নিঃসঙ্গ ছিলেন না" (পৃঃ ১২৪)।

এ এক নতুন কথা। বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ, আদি সাঙ্খ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, এমনকি 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' উদ্দালক আরুণির মধ্যেও তিনি বস্তুবাদের প্রভাব দেখিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও খুব চমকদার: "আরও বড় কথা হলো, উদ্দালক পরীক্ষামূলকভাবে যুক্তিটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে পরীক্ষামূলক কোন বিষয় প্রমাণ করার এর চেয়ে প্রাচীন কোনো নিদর্শন আর কোথাও আছে বলে জানা নেই" (পৃঃ ১২৬)।

দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কটা ঠিক কী? প্রসঙ্গটা অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে অরুচিকর, অনেক দার্শনিকের কাছে অবান্তর। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো অত বড় মাপের লোকও দেখি প্রসঙ্গটায় অস্বস্তিবোধ করেছেন ('রচনা সঙ্কলন', পৃ ৭০ ও ২৮৫ দ্রষ্টব্য)। আসলে গোলমাল বাধে সংজ্ঞার্থ নিয়ে। দর্শন বলতে অনেক বিজ্ঞানীই বোঝেন হরেক কিসিমের ভাববাদ: কর্মফল, জন্মান্তর থেকে আরম্ভ করে পরব্রহ্মের স্বরূপ অবধি নানান মায়ার খেলা। সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে তার নিঃসম্পর্কের দূরত্ব বজায় থাকাই ভালো। কিন্তু দর্শনের বস্তুবাদী ধারায়—এমনকি বিষয়গত ভাববাদী ধারাতেও—জগৎ-সংসার তো

মায়া নয়, বাস্তবই। তাকে জানার জন্যই বিজ্ঞান, তাকে বোঝার জন্যই দর্শন। প্রত্যক্ষকে বাদ দিয়ে এর কোনটাই হতে পারে না। এইভাবেই বস্তুবাদ ও প্রকৃতিবিজ্ঞানকে এক বঁড়শিতে গেঁথে নেওয়া যায়। প্রত্যেক বিজ্ঞানীই অচেতন বস্তুবাদী। উদাহরণ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, বস্তুবাদ ও স্বভাববাদের মূল কথাগুলোই 'চরক-' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।

স্বভাববাদ নিয়ে লেখকের আলোচনা অনেক কারণেই আমাদের চমৎকৃত করে। ভারতীয় চিন্তায় স্বভাববাদই কি 'প্রকৃতির নিয়ম' সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে যুক্ত? লেখকের উত্তর: হ্যাঁ। বহুমানভাজন চীন-বিশেষজ্ঞ যোসেফ নীডহ্যাম সে কথা মানতে পারেন নি। তাঁর মতে, ইওরোপের চিন্তায় 'প্রকৃতির নিয়ম' বিষয়ক ধারণা এসেছিল খৃস্টীয় একেশ্বরবাদ থেকে। ভারতে তা কোথায়? লেখক কিন্তু নীডহ্যাম-এর বক্তব্য স্বীকার করেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল: "অন্তত এদেশে প্রাচীনকাল থেকে 'প্রকৃতির নিয়ম' সংক্রান্ত একটি ধারণা যেন দর্শনের আঙিনায় অন্তত প্রবেশের পথ খুঁজছিলো। কিন্তু তা একেশ্বরবাদের অঙ্গ হিসেবে নয়, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে" (পৃঃ ১৪৫)। সম্প্রতি নীডহ্যাম লেখকের এই মত 'গঠনমূলকভাবে পুনর্বিবেচনা' করেছেন— একথা জেনে আমরা আনন্দিত।

এর থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়: কোন তৈরি ছকে ফেলে কাজ করা কত ভুল! ভারত ও চীনের মতো প্রাচীন ও ধারাবাহী সভ্যতার ভাবজগৎ বোঝার যোগ্য কোন ছক ভূ-ভারতে কোথাও নেই, থাকতে পারে না। আরোহী পদ্ধতিতে, খোলা মনে অনুসন্ধান চালিয়ে তবেই তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।

'লোকায়ত দর্শন' বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে রাধারমণ মিত্র এই 'পরিচয়'-এর পাতাতেই (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) একদা লিখেছিলেন, "গ্রন্থখানির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিকতা, যার সাহায্যে লেখক ভারততত্ত্বের বহু খণ্ড বিচ্ছিন্ন সমস্যাকে একসূত্রে গ্রথিত করে একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও সমাধান দিতে পেরেছেন। তিনি এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছেন নিঃসন্দেহে মার্কসবাদ থেকে। কিন্তু মার্কসবাদ জানা বা পড়া এক কথা, এবং তাকে এমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারা আর এক কথা। একেই বলে মার্কসবাদকে আয়ত্ত করে, তাকে আরো বিকশিত করা।" আমাদের সমালোচ্য বইটি সম্পর্কেও কথাগুলো সমান প্রযোজ্য। ভাবতে মজা লাগে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এখনও সেই সাবেকী মার্কসবাদীই রয়ে গেলেন! "পশ্চিমী

মার্কসবাদে”র হাল ফ্যাশনের কোন ধারাই তাঁকে স্পর্শ করল না। তথ্য ও তথ্যনির্ভর যুক্তিই তাঁর প্রধান অস্ত্র।

বইটির আরেক সম্পদ এর ভাষা। আশ্চর্য এক ঘরোয়া ভঙ্গিতে, হালকা চালে (আবার দরকার মতো ভারিক্কি চালেও) ঝরঝরে প্রাকৃত বাংলায় তিনি দিব্যি লিখে চলেন। কোথাও কোন ফিরিঙ্গিয়ানার নামগন্ধ নেই। এ বোধহয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পড়ার সুফল।

মাত্রি দুশ পাতার এই বই-এ এত প্রসঙ্গ এসেছে যে কোন সমালোচকের পক্ষেই তার সবকটির প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। তবু বইটির শেষ অধ্যায়, “দর্শন ও রাজনীতি”র কথা বলতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের ‘পারস্যে’ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে: ‘ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে’ কথাটার মানে কী। এই সূত্রেই এসেছে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকারদের কথা। দ্বিজশূদ্রের ভেদ বজায় রাখার জন্যে তাঁরা ‘আন্বীক্ষিকী’ (যুক্তিতর্কমূলক) বুদ্ধির নিন্দা করেছেন একবাক্যে। সেই মতকে জনমানসে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে ‘রামায়ণ’-‘মহাভারত’-পুরাণে হেতুবিদ্যার যথেচ্ছ অপবাদ রটানো হয়েছে। নৈয়ায়িকরা পড়লেন বিপদে। তাঁদের বিদ্যাকে এই দুর্নামের হাত থেকে বাঁচানো যায় কী করে? তাঁরা তাই বড় গলা করে বেদের প্রামাণ্য মেনে নিলেন, যদিও বেদের সঙ্গে ন্যায়সূত্রের কোন যোগ নেই। এই মুক্তিপণ দিয়ে তবে তাঁদের বিদ্যাচর্চা রক্ষা পেল। কিন্তু চার্বাকরা ছিলেন বেদবিরোধী, পুর্নজন্ম কর্মফল ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী। তাঁরা কোন আপসে গেলেন না। তাই সব দিক দিয়ে তাঁরা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়লেন।

লেখকের এই মুক্তিপণ-তত্ত্বও অনেক ভাবনার পথ খুলে দেয়।

বইটির জ্যাকেটে প্রকাশক বলেছেন, ‘আমরা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত।’ নিশ্চয়ই এর জন্য তাঁরা বাঙালী পাঠকদের ধন্যবাদভাজন। কিন্তু কিছু অভিযোগও আছে। “কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি” থেকে “লেখকের কৈফিয়ৎ” পর্যন্ত প্রথম বারো পাতার কোন পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া নেই। এর থেকে কেউ উদ্ধৃতি দিলে বার করতে অসুবিধা হবে। লেখকের গ্রন্থের নামের মধ্যে তাঁর অন্যতম প্রধান গ্রন্থ ‘লোকায়ত’ (ইংরিজি)-র নাম বাদ পড়ে গেছে (যদিও উপনামটুকু আছে!)। “তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ ইংরেজি ও বাংলায়, অসংখ্য”—এ কথা পড়ে অবাক হতে হয়। ‘অনেক’, ‘বহু’, ‘বিস্তর’—

বুঝি, কিন্তু 'অসংখ্য' ?! লেখক-পরিচিতিতে এমন আলঙ্কারিক অতিশয়োক্তি কি ভালো ? আধ পৃষ্ঠার মধ্যে 'ইংরাজী' ও 'ইংরেজি' এই দুরকম বানানই বা কেন ? বোধহয় অত্যধিক তাড়াহুড়োর ফলেই এমন ঘটেছে।

বাংলা বই-এর যা চিরশত্রু সেই ছাপার ভুলও কিছু আছে। তবে খুব মারাত্মক নয়, সহজেই ধরা যায়। পৃঃ ৪৯-এ 'ডারউনর-এর মত'টাই গোলমাল করবে। ওটা নিশ্চয়ই 'ডারউইন-এর মত' হবে।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ভারতে বস্তুবাদ-প্রসঙ্গে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯। পৃঃ-কুড়ি+২০০। ডিসেম্বর ১৯৮৭। দাম: পঁয়ত্রিশ টাকা।

দায়বদ্ধ গল্পের নমুনা

ব্রজেন মজুমদার অনেক বছর ধরে গল্প লিখে আসছেন বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়, সেই সব গল্পের সংকলন এই 'খোদহাটির ডাক'। গল্পগুলো পড়তে পড়তে মনে হল তিনি শুধু গল্পের খাতিরে গল্প লেখেন না, সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন। তাছাড়া গল্প বলার কৌশল, ভাষা ও আঙ্গিকের গুনে অধিকাংশ গল্প পাঠককে আবিষ্ট ক'রে রাখতে সক্ষম। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য গল্পকারের পরিমিতিবোধ, ছোটগল্পের সাফল্যের ক্ষেত্রে যা একটি বিশেষ গুণ। এই সংযম গল্পগুলিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

মোট ষোলটি গল্প নিয়ে এই সংকলন। বস্তুনিষ্ঠভাবে বিগত তিন দশকের সংঘাতময় সময়কে ধরা হয়েছে বিভিন্ন গল্পে। অধিকাংশ গল্পের পাত্র-পাত্রীগণ সাধারণ মানুষ—তারা ছড়িয়ে রয়েছে উদ্বাস্তু কলোনীর পাড়ায়-পাড়ায়, শহরতলীর বস্তীতে আর গ্রামেগঞ্জে, কঠিন দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করেও তারা মানবিক চেতনাবোধ বিসর্জন দেয় না, এমনি এক আশ্চর্য মেয়ে পারুল। অভাব-অনটন তাকে ভাঙতে পারেনা। সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে সে সর্বদা প্রতিবেশীর ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের অংশীদার, নিজের খাবার উপবাসী প্রতিবেশীর ঘরে পৌছে দিয়ে সে অনায়াসে উপোস করে। পাড়ার তালাবন্দী কারখানার শ্রমিকদের দুর্দশায় বিচলিত হয়ে সে তাদের

সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়, এই জন্য সন্দেহপ্রবন আত্মকেন্দ্রিক স্বামীর বাধা ও নির্যাতন তাকে নিরস্ত করতে পারে না, কারণ ততদিনে জীবনের আর একটা অর্থ সে খুঁজে পেয়েছে, এই নতুন সমাজচেতনায় উত্তরনের মধ্যেই পারুলের পক্ষে সম্ভব হয় সংগ্রামী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া। এমনি আর একটি মেয়ে উমাশশী—শহীদ চাষির বউ, দু'টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে সর্বগ্রাসী অভাব আর ক্ষুধার জ্বালায় পর্যুদস্ত হয়ে বেঁচে থাকার জন্য দেহ বিক্রয়ের পথে পা বাড়ায় রাত্রির অন্ধকারে, কিন্তু বড় রাস্তার মোড়ে এসে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। সামনেই রয়েছে একটি শহীদ বেদী, তার মৃত স্বামীর স্মারক। এ বাধা অতিক্রম করে সে যেতে পারে না, তার পাগলের মত চিৎকার—'পথ ছাড় আমার। বাঁচতে দাও। বাঁচতে দাও আমাকে!' তার সেই আর্ত চিৎকার তখন আর তার নিজের থাকে না, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার শিকার অসহায় নারীজাতির সর্বজনীন বেদনায় পরিণত হয়।

সত্তর দশকের সেই ভয়াবহ দিনগুলি—'এবাড়ী ওবাড়ীকে ভয় করে, এপাড়া ওপাড়াকে ভয় করে, একদল আর একদলকে ভয় করে।' এমনি সময়ের এক রাত্রিতে হঠাৎ 'মুখোমুখি ওরা'—দুই ভাই, দুই শিবিরের যোদ্ধা, দু'জনের হাতের পিস্তল পরস্পরের বুক নিশানা করে আছে। অভিশপ্ত দশকের এক চরম নাটকীয় মুহূর্ত।

প্রতিটি গল্প নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। সবকটি গল্প উৎরে গেছে এমন কথাও বলা চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচারধর্মিতা সাহিত্যের রসকে ক্ষুন্ন করেছে। তবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পথ,' 'ফুটপাথের রং', 'নামল ঘুম,' 'নেপথ্য পট', 'সর্বজনের একজন', 'শেষ নহে', 'হারানো দিনের খোঁজে' ইত্যাদি গল্প। এই সংকলনটি পাঠকের ভাল লাগবে নিঃসন্দেহে।

রঞ্জন ধর

খোদহাটির ডাক। ব্রজেন মজুমদার। শুকসারী প্রকাশক। কুড়ি টাকা।

গল্পের সংকলন ও গ্রন্থ

নামকরণেই সংকলনের বিষয়বস্তু ও ভাবনার স্পর্শ একটা নিশানার সন্ধান দেয়। মূলত বীরেন চন্দ তাঁর ছোটগল্পের এই সংকলনে বাছাই করেছেন সেই রকম আটটি গল্প যার মধ্যে ছড়িয়ে আছে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের চিরন্তন বঞ্চনা আর তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিরোধের সূত্র। সংকলনের 'পূর্বসূরীদের গল্প' অংশে আছেন প্রেম চন্দ, সোমেন চন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমনাথ লাহিড়ী। আর উত্তরসূরীদের গল্পে আছেন স্বল্প পরিচিত একালের শ্যামল জানা, সরোজ দাস, কল্যাণ দে ও পল্লবকান্তি রাজগুরু।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের অবদান নতুন করে' উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে প্রেম চন্দের অসামান্য বিষয়বস্তু ও লেখন শৈলী এবং লেখকের ভাবনা ও বিচারবোধের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা দীর্ঘকালের। এই সংকলনে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'সওয়া সের গম' অনুবাদ করেছেএ কৃষ্ণা গুহ। তুলনামূলকভাবে সোমেন চন্দের গল্প 'বনস্পতি' বিষয়বস্তুর দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলেও লেখকের ক্ষমতা ও প্রতিভার বিচারে প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। বরং সেদিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছেঁড়া' ও সোমনাথ লাহিড়ীর 'ভগবানের চেয়ে বড়' গল্প ছুটি সুনির্বাচিত।

এ কালের অপেক্ষাকৃত নবীন লেখকরাও তাঁদের গল্পে বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন মাটি ও মানুষকে। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য গল্প—শ্যামল জানার 'অন্নপ্রাশন / অন্নপ্রাসন'। এই গল্পে চৌধুরী বাড়ির নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সোনার থালায় ষোল ব্যঞ্জন প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্নপ্রাশনের অন্ন পুরোহিত নিয়ে গিয়ে পাঁচিলের কোণে পুঁতে দিয়ে আসে। কেননা 'অন্নপ্রাশনের অন্নে মামা ছাড়া অন্য কারো অধিকার নেই।' চৌধুরী নাতি এ ক্ষেত্রে ভাগ্যহীন। তার কোনো মামা নেই। এই ঘটনা অলক্ষ্যে দেখে ফুটপাথের এক শিশুর মা। মাঝ রাত্রে সবার অজান্তে সন্তর্পণে সেই পুঁতে রাখা অন্নপূর্ণ মাটির সরা চুরি করে এনে ফুটপাথের ছেলেকে খাওয়ায় তার মা। আসলে এই শিশুর কাছে সেটা চৌধুরী বাড়ির নাতির মত অন্নপ্রাশন নয়, তার কাছে সেটা নেহাৎই ক্ষুধার খাদ্য, কেবলই অন্নপ্রাশন।

ঠিক এমনই তাৎপর্যবাহী গল্প সরোজ দাসের 'মোরগ'। অত্যন্ত চেনা পরিবেশে আটপৌরে ভাষায় লেখা এই গল্পে নির্যাতিত অসহায় মানুষের অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার কাহিনী স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে, কল্যাণ দে'র গল্প 'পেয়ার আলির গলাজল' এর বিষয়বস্তু আমাদের অতি পরিচিত। খুবই সাদামাটা গল্প বলা যায় একে। বরং পল্লবকান্তি রাজগুরুর 'আলোর মানুষ' এর ভংগীটি স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন স্বাদের।

সাতটি গল্প নিয়ে দেবর্ষি সারগীর 'রাজার জ্ঞানতৃষ্ণা'. 'মৃগনাভি' গল্পে চার ডাকাতের ভয় ভাবনা, ক্রোধ আর ভালো হয়ে ওঠার চেষ্টা মনকে স্পর্শ করে। একদা সঙ্গী সনাতন যে ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে তাকেই সন্দেহবশে বাকি তিন ডাকাত বন্ধু কাটারি দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে কিন্তু তার পরেও তারা পরাজিত থেকে যায়, সুখের মৃগনাভি'র স্পর্শ তারা পায় না। এই গ্রন্থে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হিসেবে গ্রাহ্য।

দেবর্ষির গল্পগুলিতে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পট পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষণীয়। সময় কালও ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে তাঁর গল্প নিজস্ব ভাবনায় এগিয়ে যায়। গল্পের নামকরণের মধ্যেও প্রায়শ লেখকের স্বাতন্ত্র্যতা নজরে পড়ে। যেমন—'কমিউনিস্ট দেশের নটরাজ'। যারা ভিন্ন ধরনের রসের অনুসন্ধিৎসু তারা এই সব গল্পে স্বাদ বদলের সুযোগ পাবেন। ভাষা বা গল্প বলার ভঙ্গীতেও লেখকের নিজস্বতার ছাপ সুস্পষ্ট। এই সব গুণের ফলে এই গল্পকার আরও পরিণত হবার পথে এগিয়ে যাবেন বলে মনে হয়। কেননা, এই গল্পগুলিতে ভবিষ্য- সম্ভাবনার সেই চিহ্ন বর্তমান।

---

* মাটি ও মানুষের গল্প—সম্পাদনা, বীরেন চন্দ উত্তরধ্বনি প্রকাশনী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং। ১২ টাকা।

* রাজার জ্ঞানতৃষ্ণা—দেবর্ষি সারগী। সুবর্ণরেখা, কলকাতা / শান্তিনিকেতন। ১৯.০০।

বাঁধন সেনগুপ্ত

রূপকথার পুনর্জন্ম

মাধব মালঞ্চী কইন্যা।
প্রযোজনা : অন্য থিয়েটার।
পরিচালনা : বিভাস চক্রবর্তী।
আলোচিত অভিনয় : ২০ জুন, ৮৮ একাডেমী অফ ফাইন আর্টস।

দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন দৃশ্যের পর দৃশ্যে উন্মোচিত হয়ে চলেছে আমাদের বহুকালের তীব্র এক প্রত্যাশারই পরিপূর্ণতা।

গত প্রায় দুটি দশকে কলকাতার অপেশাদার মঞ্চে প্রযোজনামানের ক্রমাবনমনের অভিযোগ আমাদের মত দর্শকের মনে অভিমানে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষত গত কয়েক বছর ধরে নান্দীকার আয়োজিত নাট্যোৎসব-গুলির সূত্রে, যখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নাটকের পাশে কলকাতার হাল আমলের প্রযোজনাগুলির আপেক্ষিক ম্লানতা আমাদের কাছে ক্রমগতই বেদনাবহ হয়ে উঠছিল, তখন সে অভিমান হয়ে উঠত অনিবার্য, যেহেতু সক্ষম পরিচালকদের উদ্যমের অভাবকেই আমাদের এজন্য মনে হত দায়ী।

জাতীয় নাট্যোৎসবসূত্রেই আর একটি বিষয়ও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল—লোকায়তকে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনার দাবি। 'চরণদাস চোর' 'বাহাদুর কালারীন', 'করিমকুট্টী', 'যশমা ওড়ান', 'লক্ষপতি-রাজন কথের'-মত প্রযোজনাগুলি যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল নাট্যমঞ্চে আমাদের আত্মআবিষ্কারের দায়। এই সঙ্গে খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল এ প্রশ্নও যে, ইংরেজ শাসনের সূত্রে পাওয়া অনুকরণ-নির্ভর নাট্যৈতিহ্যের কোনো বিকল্প জুটতে পারে কিনা আমাদের লোকায়ত আঙ্গিকগুলির চর্চা ও উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে।

ফলে, বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'অন্য থিয়েটার' যখন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে চলে যান 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র কাছে, আমাদের হারানো নাট্যআঙ্গিকের টুকরো টাকরাকে পুণরাবিষ্কার করতে চান আধুনিক প্রযোজনা-

রীতির সঙ্গে সমন্বিত করে, তখন তা দেখতে দেখতে যেন দৃশ্যের পর দৃশ্যে আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায় হারিয়ে যাওয়া রহস্যময় এক জগৎ, যার কাছে ফিরে যাওয়া আমাদের আজকের শিকড়সন্ধানেরই দায়। অনভ্যাসবশত খানিকটা আকস্মিক চমকের মত লাগলেও আমরা রোমাঞ্চিত হই এ কথা অনুভব করে যে, ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী, মনপবনের নাও আর রাক্ষস-এর সঙ্গে লড়াই-এর এই আদি বাঙলার মুখকে আমাদের মঞ্চে রূপায়িত দেখার বাসনা আমাদের মনের ভেতর কতকাল গোপন হয়ে ছিল।

অভিনয় ও মঞ্চের আঙ্গিকে একেবারে হুবহু রূপকথাটিকেই যেন শোনাতে চান বিভাস চক্রবর্তী। আমাদের পালাগান ও কথকতার আঙ্গিককেও এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে চান। মঞ্চের একপাশে বসেন গায়ন বাজনাদারদের দল, যাদের কেউ কেউ আবার নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ভূমিকাটিতে অভিনয় করতে চলে যান ও তা শেষ হলে আবার ফিরে আসেন গায়নে।

গান এখানে অলঙ্কার হয়ে থাকে না। কেবল গত কয়েকবছরে আমাদের দেখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সবচেয়ে নন্দনসফল নাটকগুলির মত তা এখানে হয়ে ওঠে আমাদের দেশজ নাটকীয়তারই অন্যতম অবলম্বন। ফলে, পাত্র-পাত্রীর সংলাপে, বিশেষত আবেগের মুহূর্তে যখন সুরের ছোঁয়া লাগে, তখন তা আমাদের পুরনো পালার উত্তরাধিকারেরই কথাই মনে করিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে দিনেন্দ্র চৌধুরী নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদ ভাজন। সেইসঙ্গে অবশ্য দেবাশিস দাশগুপ্তের সফল আবহরচনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

বৃদ্ধ রাজার কনিষ্ঠতম সন্তান মাধব যখন প্রায় শিশু তখনই দৈববিপাকে ও মাতৃসমা বড় বৌদির সহায়তায় তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। কারণ রাজার দেহাবসানের পর গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণীতে তারই রাজত্ব লাভের সম্ভাবনা ঘোষিত হওয়ায় বিবদমান ও লুব্ধ অগ্রজদের হাতে তার মৃত্যু সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। বড়বৌদি চন্দ্রকলার দেওয়া অলৌকিক স্বর্ণহার-এর সহায়তায় সে শেষ পর্যন্ত এক রাজার আশ্রয় পায়, যেখানে নানা বিদ্যা অর্জনের পর তার সঙ্গে যথারীতি দেখা হয় রাজকন্যা মালঞ্চীর। তার বিয়ের মাত্র একদিন আগে তাদের সাক্ষাৎ ও প্রেমের রূপকথা কাহিনীকে নূতন গতিদান করে।

তারপর কীভাবে মাধব মনপবণের নাও সংগ্রহ করে, কীভাবে মালঞ্চী বিয়ের আসর থেকে পালায় ও ঘটনাচক্রে মাধবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও সহায়সম্বলহীন অবস্থাতেও রূপকথার উপযুক্ত প্রায় অলৌকিক বুদ্ধি ও শৌর্য

প্রদর্শন করে এবং শেষ পর্যন্ত ভয়ানক এক রাক্ষসের মৃত্যু ঘটিয়ে আশ্রয়দাতা রাজার ধন্যবাদভাজন হয় ও সমাপ্তিতে দৈবক্রমেই সেখানে এসে-পড়া মাধবের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, সেই কাহিনীই দৃশ্যপরম্পরার প্রায় অনবদ্য নন্দনমাধুর্যে রূপায়িত হয়ে যায়।

নাটকীয় উপাদান রূপকথার যতই সহজাত হোক, তার বিন্যাসের আপাত-শিথিলতার ভেতর থেকে মঞ্চোপযোগী ঘনপিনদ্ধ রূপটি ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ কাজ নয়। বিভাস চক্রবর্তী সে কাজটি সম্পন্ন করেছেন অত্যন্ত সাবলীল দক্ষতায়। লোকায়ত-নির্ভর আধুনিক নাট্য-আঙ্গিক ব্যবহারের সাথে সাথে সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে একের পর এক নাট্যপরিস্থিতির সার্থক রমণীয়তা যেমন একদিকে আমাদের রোমাঞ্চিত করেছে তেমনি সামগ্রিকভাবে পরনকথার নাট্যবিন্যাসটিও হয়ে উঠেছে সংহতিময়।

এ ব্যাপারে সঙ্গীত এবং সুর ছাড়াও তাঁকে সহায়তা করেছে আলো, মঞ্চপরিকল্পনা ও বিশেষত মঞ্চোপকরণ। একটিমাত্র কাঠের পাটাতনই রূপকথার ব্যাপ্ত ভূগোলের বিচিত্র পরিবেশকে রূপায়িত করেছে—কখনো তা রাজবাড়ি, কখনো নদীতীর, কখনো বাজার আবার কখনো রাক্ষসের সঙ্গে লড়াইএর অঙ্গন। এরই সঙ্গে যখন মঞ্চে উঠে আসে অরণ্য, অদ্ভুত রঙ আর আকারের গাছপালার সঙ্গে দেখতে পাই রূপকথার জগতের ফুল তখন সমস্ত মঞ্চটাকেই রূপকথার দেশ বলে মনে হতে থাকে আমাদের।

সেই দেশে একেকটি অসামান্য নাট্যমুহূর্ত রচনার কল্পনাশক্তি ও নাট্যবোধ আমাদের মনে রোমাঞ্চিত আর স্থায়ী রেখাপাত ঘটিয়ে যেতে পারে। কান্তারের পর কান্তার পেরিয়ে বালক মাধবের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, পাঁচ রাজকুমারের হাতাহাতি লড়াই-এ প্রায় নাচের ছন্দ, দুর্গপ্রাকারের সামনে দিয়ে মালঞ্চীর দ্রুতধাবমান অশ্বচালনা, জমে-ওঠা গ্রামীন বাজারের বিচিত্র প্রাণচঞ্চলতা, রাক্ষস আর মালঞ্চীর যুদ্ধ—এইসব দৃশ্যরচনার রূপকথাসম্ভব সকল অনবদ্যতা আমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে আরো বহু বহুদিন। বিশেষত মালঞ্চী আর মাধবের প্রথম দেখা-হওয়া আর প্রেমের যে দৃশ্যটি আমাদের উপহার দেন পরিচালক, তার জন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকবে। সেইসঙ্গে গভীর রাত্রে ঘোর অরণ্যে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর সংলাপের দৃশ্যটিও।

বলা বাহুল্য, তাপস সেনের আলোকসম্পাতের মাত্রাময়তা ছাড়া এ কাজ সম্ভবই হোত না। বিশেষত রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ আর ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর আলাপের

দৃশ্য দুটিতে পরিবেশ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রায় অতুলনীয়। সমস্ত নাটকটি জুড়েই আলো এক মায়াময় আবহ রচনা করে রাখে, যা রূপকথার।

...অভিনয়ের ব্যাপারে তরুণ অভিনেত্রী সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত নিশ্চয় বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনাড়ষ্ট সাবলীল তীক্ষ্ণতার পাশাপাশি সে অভিনয়ের বিশেষ সম্পদ প্রতিটি অভিব্যক্তির তীব্র স্বচ্ছতা। রোম্যান্টিক দৃশ্য থেকে বীররসাত্মক দৃশ্য পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

কিন্তু সমষ্টিগত অভিনয়-নির্ভর এমন কোনো প্রযোজনায় এভাবে আলাদা আলাদা করে ব্যক্তিক অভিনয়-কুশলতার উল্লেখ খানিকটা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। বস্তুত বিভাস চক্রবর্তীর অভিজ্ঞ নায়কতায় প্রতিটি নাট্যপরিস্থিতি যে যথার্থ অভিনয়শৈলী আর নিখুঁত অভিব্যক্তির গুণে আমাদের কাছে নন্দনময় ও প্রত্যয়গম্য হয়ে ওঠে তার কৃতিত্ব কমবেশি প্রায় প্রতিটি অভিনেতারই ওপর বর্তায়।

প্রযোজনাটির অর্জিত সফলতার একটি অন্যতম প্রধান উপাদান ময়মনসিংহ অঞ্চলে লোকসমাজে প্রচলিত উপভাষা ব্যবহারে সার্থকতা। প্রধানত এ কারণেই সম্ভবত আমাদের কাছে সমগ্র অভিজ্ঞতাটি হয়ে ওঠে মাটি ও জন-জীবনের অনুষঙ্গে মুগ্ধকর। অনেক অভিনেতাই তাকে নিজের মাতৃভাষার দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন। তবে, কোথাও কোথাও অবশ্য মনে হতে পারে এ ধরনের উপভাষায় বক্তা যে সুর বা টানের প্রয়োগ করেন, যা উক্ত ভাষার চরিত্রলক্ষণটি তুলে ধরে, সে সম্পর্কে আর একটু যত্নবান হওয়ার সুযোগ ছিল।

সব মিলিয়ে মাধব মালঞ্চী কইন্যা' হয়ে ওঠে কলকাতার সাম্প্রতিক নাট্যপ্রযোজনার ইতিহাসে এক অভিজ্ঞতা। অনেকের হয়ত মনে হবে, রূপকথার এমন প্রায় অনাহত মঞ্চরূপায়ণে কি খানিকটা অস্বীকৃত হচ্ছে না আধুনিকীকরণের দায়? এ দাবি যাঁদের, তাঁরা নিশ্চয় মঞ্চে নিরন্তর সাম্প্রতিক অস্তিত্ব সংকটেরই রূপায়ণ দেখতে চান, আর তাই রূপকথা বা পুরাণকে কেবলমাত্র রূপকার্থে স্বীকার করতেই রাজি থাকেন।

কিন্তু অব্যবহিত প্রাসঙ্গিকতার বাইরে এমন চিরন্তন লোকায়তের প্রত্যক্ষতায় কি আমাদের আত্মাবিষ্কারেরই আর এক অবকাশ জুটে যায় না? অরণ্যলালিত রাত্রির জোনাকজ্বলা অন্ধকারে আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতার চিহ্ন না থাকলেও, তাকি আমাদের ভেতর আদি মানবিক তৃষ্ণার শুদ্ধতা সঞ্চার করে, আমাদের দৈনন্দিনকেই অন্যমাত্রা দান করে না?

তাছাড়া এখানে প্রায় অনিবার্যভাবে ধরা পড়েছে বাংলার লোকজীবনের মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতির সত্যরূপ। আল্লার কাছে যারা দোয়া মানে তাদেরই ঘরের ছেলে মাধব। এই মিশ্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জনজীবনের পরিচয় ছড়িয়ে থাকে নাটকটির প্রায় সর্বাঙ্গ জুড়ে। আমাদের একেবারে সাম্প্রতিক সংকটে এই সত্যের দিকে এমন শিল্পসংগতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা খুব কম কাজ নয়।

শুভ বসু

গোলামকুদ্দুস ও বঙ্কিম পুরস্কার

পরিচয় এবং গোলামকুদ্দুস এই নাম দুটি একসঙ্গেই উচ্চারিত হওয়ার কথা। তিনি দীর্ঘকাল পরিচয়ের একদেশকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কেবলমাত্র এই পরিচয়ে গোলামকুদ্দুস নিজেও বোধহয় সন্তুষ্ট হবেন না। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিচয়ের সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাসের তিনিও অংশীদার এবং প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। সেই কবে থেকে কুদ্দুস সাহেব অবিভক্ত বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে একসঙ্গে হেঁটে আসছেন। আর সেই হাঁটা থামানোর ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। বাংলাদেশের মাঠে ময়দানে যে সাধারণ মানুষ অস্তিত্বরক্ষার এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত চিরকালই তিনি তাঁর সতর্কদ্রষ্টা থেকে গেছেন। তাঁর কলমে তাই একদিকে যেমন এদের প্রতি সহানুভূতি ঝরে পড়ে, তেমনি অপরদিকে তাদেরই সঙ্গে যেন তিনি সংগ্রামের হাতিয়ারটি তুলে ধরেন। তবে তাঁর ক্ষেত্রে হাতিয়ারটি হল লেখনী, লেখনীই সেখানে ধারালো তলোয়ার হয়ে যায়, তা প্রতিপক্ষকে প্রবল আঘাত হানে আর সহযাত্রী যোদ্ধারা তাতে শক্তিশালী হয়। রানীগঞ্জের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি কেবল পথ হাঁটাই সুরু করেন নি, আর তাঁর জীবন্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ বের হয় 'একসঙ্গে' নামক অবিস্মরণীয় রিপোর্টাজে। নাচোলের কৃষক সংগ্রামের নায়িকা ইলা মিত্র অবিস্মরণীয় কবিতার বিষয় হয়ে ওঠেন। আর শম্ভু মিত্রের স্বর্ণকণ্ঠে এটি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রচারের মারাত্মক অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

প্রধানত যিনি বড়ো মানের কবি, তিনি যখন রিপোর্টাজ লেখাকে কর্তব্য বলে মনে করেন, যখন কবিতার রোমান্টিক জগতে অনায়াস যাতায়াত সত্ত্বেও রাজনীতির প্রয়োজনে অনায়াসে কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন, রাজনৈতিক বা সামাজিক দায়িত্বপালনেই তাঁর যে অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়ে যায় এটা সকলেরই জানা। অথচ এর জন্যই কুদ্দুসসাহেব গর্বিত বোধ করেন আর আমরা তাঁর অনুরাগীরাও তার জন্য গর্বিত হই। তাই তিনি যখন এবারের বঙ্কিম পুরস্কার পান তখন তাঁর এই সংগ্রামী সত্তাই যেন আর একবার জনমানসে স্বীকৃতি পায় এবং শ্রদ্ধাপ্রকাশের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ বোধকরি।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

চিন্মোহন সেহানবীশ স্মরণ সংখ্যা সম্পর্কে অমৃত রায়

বন্ধুগণ,

'পরিচয়' আমি নিয়মিত পাঠক। সুতরাং আপনাদের অনুকম্পায় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। ধন্যবাদ।

চিনুদার স্মরণ সংখ্যাও পেলাম। খুব ভাল বেরিয়েছে, সর্বথা ওঁর যোগ্য। লোকেরা খুব মন দিয়ে লিখেছেন। আমিও একদা চিনুদাকে ভাল করে জানতাম। ওঁর মত সৎ লোক, খাঁটি মানুষ খুব বেশি পাওয়া যায় না। ভাল মানুষ, অবিচল পার্টি কর্মী।

আশা করি সকলে ভাল আছেন।

ভবদীয়,

অমৃত রায়

পরিচয়

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—৩০ টাকা (নিজে সংগ্রহ করলে)

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (সডাক)—৩৫ টাকা

মনি অর্ডার / চেক / ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা :—

পরিচয়

৩০/৬ ঝাউতলা রোড

কলকাতা-৭০০০১৭

মনীষা এবং পরিচয় অফিসেও গ্রাহক হওয়া যায়।

PARICHAYA JULY 1988 Reg. No. 13732
WB/EC—265

প্রকাশিত হয়েছে

নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর

ব্রতকথায় / পল্লী কবিতায় / প্রাচীন সাহিত্যে
শিল্পে ও পুরাবৃত্তে

বঙ্গরমণীর বিস্মৃত ইতিহাস

19 AUG 1988

দাম : ২৫·০০

মনীষা গ্রন্থালয় / ৪-৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

সম্পাদনা দপ্তর । ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩৯/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : তিন টাকা

শারদোৎসবে বাংলার তাঁতের কাপড়

এই উৎসবের

মরসুমে কেনাকাটায়

বিষয়ে একটু

অন্যরকম ভাবুন না।

বাংলার হস্তচালিত তাঁতের কাপড় আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। রঙে, বুননে, নকশায় অনন্য। যন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক উৎপাদন নয়, মানুষের সহৃদয় ছোঁয়ায় উজ্জ্বল।

বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার থেকে বেছে নিতে পারবেন নিজের পছন্দসই জিনিসটি। আছে বালুচরী, জামদানী, টাঙ্গাইল, ধনেখালি ও অন্যান্য শাড়ির সমারোহ। তাছাড়া মর্যাদাপূর্ণ খদ্দরের শাড়ি। আছে সালোয়ার ও কুর্তার হরেকরকম কাপড় এবং পুরুষদের জন্য রুচিসম্মত পলিয়েস্টার স্যুটিং ও শার্টিং। আর রয়েছে বেডশিট, বেডকভার ও পর্দার কাপড়। ঘর সাজানোর জন্য পাবেন চর্ম, ধাতু ও মৃৎশিল্পের আশ্চর্য সুন্দর নিদর্শন।

হস্তশিল্পজাত সামগ্রী কেনবার সিদ্ধান্ত নেওয়া মানেই আপনি আপনার বিশিষ্ট রুচির পরিচয় দিতে চলেছেন। আর সেই সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অগণিত শিল্পীদের দিকে, আপনার সিদ্ধান্ত তাকে স্বনির্ভরতার পথে আরো একটু এগিয়ে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৫১৮/৮৮
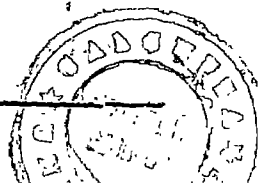
বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য
সরকারী প্রতিষ্ঠান

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ-তল) কলিকাতা—৭০০০০১

চাষীভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

(ক) এইচ, এম, টি, ইণ্টার ন্যাশানাল। এসকর্টস। মিৎসুবিশি ট্রাকটরস্।
(খ) কুবোটা। মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।
(গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।
(ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।
(ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের, তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং ২০-২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস ঃ

২৪-পরগণা (দক্ষিণ)	১৪, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮
,, (উত্তর)	৪২ই কে, এন, সি, রোড, বারাসাত
হুগলী	সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, পরসুরা, চুঁচুড়া
বর্ধমান	সদর ঘাট রোড, জি টি, রোড, মেমারি, বর্ধমান, ১, বি, সি, রোড
বাঁকুড়া	লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট)	সুভাষনগর, মেদিনীপুর
মেদিনীপুর (ইষ্ট)	পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া
বীরভূম	সিউড়ি
মালদা	মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ	১৬, শহীদ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি	'সবারি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি
দার্জিলিং	বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া
কুচবিহার	এন, এন, রোড, কোচবিহার, দিনহাটা
পুরুলিয়া	নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া
নদীয়া	১/১ এম এম, ঘোষ ষ্ট্রীট, নদীয়া

সংসদ অনবদ্য প্রকাশনার কয়েকটি

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

* তে হি নো দিবসাঃ ৪৩·০০

* Keats : From Theory To Poetry ৩০·০০

* Swami Vivekananda and Indian Nationalism ৪৫·০০

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

* ঠাকুরবাড়ীর কথা ২৫·০০

* উপনিষদের দর্শন ২০·০০

* The Challenge Tolndia ৪৫·০০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

* ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৩৭·৫০

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

* বৈষ্ণব পদাবলী ৭৫·০০

* রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত ৩০·০০

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

* তন্ত্রের কথা ১০·০০

* উপনিষদের কথা ১০·০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

* রাজনীতি ১৫·০০

॥ সাহিত্য যেখানে মর্যাদায় গৃহীত ॥

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯

ফোন ৩৪-৭৬৬৯ ও ৩৫-৩১৯৫

আমাদের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও জীবন ধারণের মান-উন্নয়ণের উদ্দেশ্যে

আমাদের জীবনে বিদ্যুৎ এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আজ বিদ্যুতের যা চাহিদা এবং গুরুত্ব ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে। আমাদের প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রে, বহু বিস্তৃত বণ্টন ও সঞ্চালন ব্যবস্থা-অন্তর্গত প্রতিটি শহর এবং গ্রাম গ্রাম্যাঞ্চলে চলছে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই কর্মযজ্ঞ হয়েছে সুদূর প্রসারী। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে ন'লক্ষ গ্রাহকের স্বার্থে প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রে আমরা এনেছি সর্বাধুনিক কারিগরির প্রয়োগ, প্রতিটি গ্রাহকের স্বার্থে আজ আমাদের সেবা হয়েছে আরো নির্ভরযোগ্য। আমাদের কর্মোদ্যম পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতিটি এলাকায় আজ বিস্তৃত। আমাদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট এবং সেই লক্ষ্যে সত্বর পৌছবার জন্য আমরা আমাদের কাজ ত্বরান্বিত করেছি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

পশ্চিমবাংলার জীবনের অংশীদার

*** *** ***

LALIT KALA AKADEMI

NEW DELHI

OFFERS

PRESENTIGIOUS ART PUBLICATIONS

Books

Eastern Indian Bronzes : Nihar Ranjan Ray And Karl J. Khandalawala

The Kingdom That was Kotah : Brij Raj Singh

Indian Paintings In The British Library : J. P. Losty

Portfolios :

J. P. Goenka Collection : Mewar Paintisng

Kishangarh Paintings (Hindi & English) : Deogarh Paintings (English & Hindi)

Basholi Ke Ragamala Chitra (English & Hindi)

Rabindra Nath Tagore Nos, I. II. III (12 Colour Plates each)

AND

Art Journals (ancient & Contemporary), Monographs on Artists (English & Hindi), Catalogrues, other Art Books Multicolour Reproductions over Sixty.

Monograph :

R. S. Bhist

Ram Kumar (English & Hindi)

Y. K. Shukla (English & Hindi)

K. S. Kulkarni (Hindi & English)

For details, please write to :

The Secretary

LALIT KALA AKADEMI

Rabindra Bhawan,

New Delhi-110 001.

WHEN YOU THINK OF
TELECOMMUNICATION—THINK OF US

Today Man Communicate To Man Through HEL

* Pioneers in the manufacture of widest range of Telecommunication Cables in INDIA and geared up with optic Fibre Cables

** Meeting the needs of the Department of Telecommunication, Indian Railway, Defence and other Public & Private Sector organisation.

HINDUDTAN CABLES LIMITED
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
P. O. Hindustan Cables, Dist. Burdwan
(West Bengal) Pin Code 713 345,

Factories at :
1) Rupnarainpur, Dist. Burdwan (West Bengal)
2) Moula Ali Industrial Estata, Hyderabad
(Andhra Pradesh)

অস্তিবাদ : জাঁ-পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য	মৃণাল কান্তি ভদ্র	৪০·০০
বিতর্কিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	সত্যব্রত দে	৩৫·০০
রামায়ণের উৎস কৃষি	জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫·০০
দর্শন জিজ্ঞাসা	সুধীরকুমার নন্দী	৫০·০০
উপনিষৎ-প্রসঙ্গ (৪র্থ খণ্ড) কঠোপনিষৎ	শ্রীমৎ অনির্বাণ	(যন্ত্রস্থ)
ব্যাস-দর্শন	স্বামী বিদ্যারণ্য	„
ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানে বৈষ্ণব সাধনার ধারা	সুধীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩৫·০০
পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা	পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য	৩৫·০০
পদাবলীর অভিসার : গানের শ্রীক্ষেত্রে	শ্রীসুকুমার সেন	১০·০০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (প্রকাশন শাখা) বর্ধমান ৭১৩১০৪

West Bengal State Cooperative Housing Federation Limited

P-15, India Exchange Place Extention
TODI MANSON, 3rd Floor
Calcutta-700 073

* Provides long term house building loan on liberal terms at low rate of interest to different income groups through Primary Cooperatives.

* Provides facility of rebate @ 1% on interest for timely repayment of loan. The loan liabilities of the borrowers are covered by a Master Policy under Insurance Scheme of the L. I. C. I.

দুশো বছর হয়ে গেল ধীরে ধীরে হাওড়া শহর গড়ে উঠেছে। পৌরসভার জন্মে ১৮৬২ সালে। ১৯৮৪ সালের শেষে পৌরসভা করপোরেশনের মর্য্যাদা পেল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত করপোরেশনগুলির মধ্যে হাওড়া সবচেয়ে অবহেলিত।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর উন্নয়নের কাজ চলছে—প্রয়োজন কিন্তু অনেক বেশী।

তিন বছর আগে হাওড়া করপোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী পেশ করেছে পাঁচশত কোটি টাকার এবং তার পরিকল্পনাও দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাওড়া সহরবাসীর **পাঁচশত কোটি** টাকা দাবীর সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে আসুন।

হাওড়া পুরসভা

WE INSURE TO REMEADY YOUR HEADACHES
AND DEMAND NO PREMIUM FOR OUR
SERVICES OF TWO IN ONE PACKAGE

THERMO—MENTS

26, Dr. Sudhir Basu Road, Calcutta-700023
Ph. No. 45-8136/4567/8067

For

Al Alloy M S Furniture & Fitting, W T Doors & Hatches, Superstructure, Hot/Cold Deck Insulation, Al Gangway Ladders, Brows, Cable Trays, Bends, Cross-Bearers :

Offices :

26, Dr Sudhir Basu Road, Cal-23
Ph. No 45/8136/4567/8067

16/6, Tarun Bharat Society
Chakla Sahar Road, Andheri
East, Bombay-99. Ph. No.
634-1876

543, New Vaddem,
Vasco Da Gama, Goa
403,802,

Works :

25. Dr Sudhir Basu Road,
Calcutta-23.

35/2, Chanditoal Main
Road, Calcutta-700053-

108, Sancoale Industrial
Estate. Sancoale, Goa.

For

Magnum Marine (Pvt) Ltd

26, Dr. Sudhir Basu Road, Calcutta-700023
Ph. No. 45-8136--4567-8067

For

Marine Electrical Fittings, Search Lights, Control Panels, Cooking Range rs, Patternised Light Fittings, Switch Sockets, Plugs. Fuse Panel s, D. E. 'S' J. B 'S, Galley Equip nents and Emergency Supp ly Equipments,

তিনশ বছরের কলকাতা চায়

আপনার সহযোগিতা আর

কেন্দ্রের কাছে ১৮২৭ কোটি টাকা—

Calcutta Municipal Corporation

The People at Work

ছুটি কাটাতে বাইরে যাবেন কি? কি করে?

ছুটিতে বেড়াবার মত পশ্চিমবঙ্গে কত জায়গাই তো আছে।— রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা দূর-পাল্লা বাস-সার্ভিসের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা রেখেছে অল্প সময়ে ও কম খরচে।

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, চিত্তরঞ্জন, পুরুলিয়া, দীঘা, ডায়মণ্ডহারবার, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম, জয়রামবাটী, কেওনঝাড়, কাকদ্বীপ, কামারপুকুর, নামখানা, পলাশী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, রামপুরহাট, নবদ্বীপ, রায়দীঘি, রায়চক্, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, শান্তিনিকেতন, রাঁচী, সাঁওতালডিহি, কৃষ্ণনগর, ফারাক্কা, বাসন্তী, ইটিণ্ডাঘাট, মুট-কু মণিপুর।

এসব জায়গায় এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূর-পাল্লার সার্ভিস চালু আছে।

টিকিট প্রাপ্তিস্থান—দূর-পাল্লার বাসস্টেশন

এসপ্ল্যানেড—ফোন নং — ২৮১৯১৬ / উল্টোডাঙ্গা—ফোন নং—৩৫-৪৭৬৬

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা

৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩

উষ্ণ প্রস্রবণে

স্নানের আরাম উপভোগ করুন

বক্রেশ্বরে

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ আরোগ্য নিকেতন বক্রেশ্বরে।

কলকাতা থেকে মাত্র ২২৯ কিলোমিটার দূরে

সীতাপীঠ বক্রেশ্বর।

এখানকার টুরিস্ট লজে উঠুন। পছন্দসই ঘর এবং খাবার

পাবেন স্বল্প খরচে। ডর্মিটারির ব্যবস্থাও আছে।

এখান থেকে শান্তিনিকেতন, তারাপীঠ মশানজোড়

এবং নান্নুর ঘুরে আসতে পারেন।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :—

টুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বি বি দী বাগ (ইস্ট) কলকাতা-৭০০০০১

ফোন : ২৮-৫১৬৮, ২৮-৫৯১৭

গ্রাম : TRAVEL TIPS

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সিএ ৪৫১৮

With Best Compliments From :

N ava Bharat Enterprises Limited

NILHAT HOUSE ANNEXE
11, R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-700 001

Regd Office :

NAVA BHARAT HOUSE
6-3-654 SOMAJIGUDA
HYDERA L AD-500 004

Other Branches :

BOMBAY * COCHIN * DELHI
GUNTER * MADRAS

॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥

Chief Editor ; Prof. Amaresh Datta

Encyclopaedia of Indian literature Vol. I — Rs. 400.00
Encyclopaedia of Indian literature Vol. II — Rs. 400·00

Ketaki Kushari Dyson

In your Blossoming Flower-Garden — Rs. 100·00
[Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo]

জাঁ পল সার্ত্র

শব্দ / অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য — Rs. 20·00

ভলত্যার

কাঁদিদ / অনুবাদ : অরুণ মিত্র — Rs. 12·00

সুকুমার সেন

বাংলার সাহিত্য ইতিহাস — Rs. 30·00

A Centenary Volume

Rabindranath Tagore [1861-1941]

Reprint Rs. 200·00

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ্ রোড, নয়াদিল্লী-১
ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯ (৪৬-১৩৯১)

অধিক জমিতে

সেচের ব্যবস্থা করে

আপনার ফসল বাড়ান

নিম্নোক্ত মুখ্য লক্ষ্যগুলি হাতে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগম ১৯৭৪ সাল থেকে তার যাত্রা শুরু করেছে ঃ

(১) গভীর নলকূপ, নদীজল উত্তোলন প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নির্মাণ, সংস্থাপন, নির্বাহ এবং তা যথাযথভাবে কার্য্যকরী ও পরিচালনের ব্যবস্থা করা।

(৪) গভীর নলকূপ, নদীজল উত্তোলন প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সংস্থাপন যরা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ শিল্প

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৫, মুস্তাক আহমেদ স্ট্রীট (পূর্বতন মার্কুইস স্ট্রীট)

কলিকাতা-৭০০ ০১৬

ফোন ঃ ২৪-৫৮০৬, ২৪-০০৮১, ২৪-৬২০৬

With best compliments from :

The Sibpur Cooperative Bank Ltd

173 & 174 Shibpur Road

Shibpur, Howrah-711102

Phone : 67-2058

History of English Press in Bengal : 1780-1857

M. K, Chanda 168.000

Three View, of Europe from Nineteenth Century Bengal—Tapan Raychaudhury 15.00

The Mauryas Revisited—Romila Thapan 25·00

An Indian Historiography of India : A Nineteenth Century Agenda and its Rimplications —Ranajit Guha 30·00

The Indian Nation in 1942 Gyanendra Paney (Editor) 130·00

K P Bagchi & Company

286 B. B. Ganguli Street, Calcutta-700012

১৭ই অক্টোবর, ১৯৭৮ পর্য্যন্ত

গ্রামীণ এনেছে অপরূপ রুচিসম্মত বস্ত্রসম্ভার।

—বিশেষ রিবেট—

সূতি খাদি—৩৫% রীল্ড সিল্ক—২০%

স্পান সিল্ক—৩০% পলিবস্ত্র—৪০%

আদি ও অকৃত্রিম বালুচরী, মুর্শিদাবাদ শিল্ক শাড়ি, আধুনিক পলিবস্ত্র এবং ঐতিহ্যপূর্ণ সূতি, রেশম ও পশম খাদির রঙ, রুচি ও ডিজাইনের মনোরম পসরা।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

(পঃ বঃ সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

২, মুজাফ্‌ফর আহমেদ ষ্ট্রীট, কলিকাতাঃ-১৬

প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।

আমাদের সদ্যপ্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই

দেশ কাল সমাজ

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে লেখক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গভীর সমস্যাসংকুল বর্তমান দেশ, কাল ও সমাজের মানুষকে সতর্ক করেছেন নির্ভীক কণ্ঠে ২৫.০০

ইতিহাস অনুসন্ধান ৩—গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী) ১১০.০০

উনিশশতক—ভাব- সংঘাত ও সমন্বয় রাখালচন্দ্র নাথ ৩৫.০০

মধ্যযুগের ভারত—অনিরুদ্ধ রায় সম্পাদিত

লেখকগণ: সৈয়দ নুরুল হাসান, গৌতম ভদ্র, অশীন দাশগুপ্ত ও অনিরুদ্ধ রায় ১৫০.০০

বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)
—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ৪০.০০

ভারতের সামন্ততন্ত্র (চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)
—রামশরণ শর্মা ৩৫.০০

আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ—বিপিন চন্দ্র (যন্ত্রস্থ)

পরিচয় পড়ুন

পড়ান ও

গ্রাহক হোন

৫৮ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৮ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৫

স্মৃতিকথা

প্রবন্ধ

ব্যক্তিগত রচনা

পেরেস্ত্রোইকা : ক্রোড়পত্র

গল্প

একাঙ্ক নাটক

কবিতাগুচ্ছ—১

কবিতাগুচ্ছ—২

সিদ্ধেশ্বর সেন। কৃষ্ণ ধর। সুনীলকুমার নন্দী। অতীন্দ্র মজুমদার। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। মানস রায়চৌধুরী। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামসুন্দর দে। আবুবকর সিদ্দিক। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। শিবশম্ভু পাল। প্রণব চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ সেন। সাগর চক্রবর্তী। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। মৃণাল দত্ত। সামসুল হক। রত্নেশ্বর হাজরা। শুভ বসু। কালীকৃষ্ণ গুহ। শামশের আনোয়ার। তুলসী মুখোপাধ্যায়। ভাস্কর চক্রবর্তী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। রবীন সুর। সত্য গুহ। বাসুদেব দেব। অনন্ত দাশ। কমলেশ সেন। রাণা চট্টোপাধ্যায়। অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। গোবিন্দ ভট্টাচার্য। আনন্দ ঘোষহাজরা। অশোক দত্তচৌধুরী। তুষার চৌধুরী। কৃষ্ণা বসু ২৪৪-২৭২

কবিতাগুচ্ছ—৩

অমিতাভ গুপ্ত। রণজিৎ দাশ। ব্রত চক্রবর্তী। প্রভাত চৌধুরী। বিজয়া মুখোপাধ্যায়। সুরজিৎ ঘোষ। অনন্য রায়। অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। সমরেন্দ্র দাস। অনির্বাণ দত্ত। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। নীরদ রায়। নন্দদুলাল আচার্য। শ্যামল সেন। অভিজিৎ সেনগুপ্ত। গৌতম দাশগুপ্ত। সুবোধ সরকার। পার্থ রাহা। প্রদীপ পাল। অলকেশ ভট্টাচার্য। অভী সেনগুপ্ত। মল্লিকা সেনগুপ্ত। জয়দেব বসু। শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়। সুব্রত সরকার ৩০৩-৩১৮

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা ও চিত্রণ

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত

অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

শ্রমিকরাও চাইলেন আপসহীন স্বাধীনতা

ধরণী গোস্বামী

[ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) যশোদল গ্রামে জন্মেছিলেন ধরণীকান্ত গোস্বামী (১৮৯৮)। নিতান্ত বাল্যকালে রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে দেখতে গিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর তরুণ সহকর্মী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের। কৈশোরে তিনি যোগ দেন অনুশীলন সমিতিতে। কুড়ির দশকে তাঁকে আকর্ষণ করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যার জন্ম। ব্যক্তিসন্ত্রাস ও আবেগসর্বস্ব জাতীয়তাবাদ থেকে তাঁর মন যায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে। অনুশীলনেরই কিছু তরুণের সঙ্গে গড়ে তোলেন ইয়ং কমরেডস লীগ, যোগাযোগ স্থাপন করেন বার্লিনে স্থিত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। তাঁর নির্দেশে তাঁরা সবাই যোগ দিলেন পেজান্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টিতে, পরে যার নাম পাল্টে করা হলো ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে শ্রমিক-আন্দোলনে যে নতুন জোয়ার এল, তাতে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি গড়ে উঠল বিপ্লবী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ট্রেড ইউনিয়ন। ধরণী গোস্বামী ছিলেন তারই অগ্রণী সংগঠক। পরবর্তীকালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমরণ তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ তাঁর দেহাবসান ঘটে।

১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় পার্ক সার্কাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিল গিয়ে পূর্ণ, আপসহীন স্বাধীনতার দাবি রাখেন। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তথা শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি এক দিকচিহ্ন হয়ে আছে। সেই মিছিল ও তার পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ধরণী গোস্বামীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখেন নীলোৎপল দত্ত ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮ জুলাই ১৯৮৬)। এখানে সেই সাক্ষাৎকার অবিকল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সম্পাদক, পরিচয়]

আপনারা জানতে চান ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যে 'অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস'-এর অধিবেশন হয়েছিল, সেই অধিবেশনের সময়ে একটা শ্রমিক মিছিল কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে গিয়েছিল, সেই সম্পর্কে আমার কী বক্তব্য এবং সম্পর্ক কী ছিল।

এই শ্রমিক-শ্রেণীর কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তখন একটা খুব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরেও অনেকে তার অনেক বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। মূল ঘটনাটা হল এই : ঐ সময়ে বিখ্যাত ই. আই. রেলওয়ে স্ট্রাইক, যেটা লিলুয়া স্ট্রাইক নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। অর্থাৎ লিলুয়ার ওয়ার্কশপ থেকেই এই স্ট্রাইক শুরু হয় এবং পরে তা সমস্ত লাইনে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই স্ট্রাইক চলেছিল প্রায় চারমাস, পরে সেই স্ট্রাইক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন যে স্ট্রাইক কমিটি সংগঠিত হয়েছিল তার অপিস ছিল লিলুয়াতেই এবং নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন কে. সি. মিত্র নামে একজন। এইসময় তিনি বিশেষভাবে জটাধারী বাবা নামেই পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন : এমন নামকরণের তাৎপর্য ?

উত্তর : তিনি জটাধারীই ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রেলওয়ে কর্মচারী। লখনউ বা ওইদিকে, ইউ. পি-তে [বর্তমান উত্তর প্রদেশ] তিনি এ. এস এম [অ্যাসিটেন্ট স্টেশন মাস্টার] গোছের ছিলেন। তার সেই চাকরি যাওয়ার পর থেকেই তিনি আন্দোলন শুরু করেন। জটা না হলেও তিনি চুল রাখা সন্ন্যাসীর বেশে থাকতেন। তার থেকে তাঁর নাম জটাধারী বাবা হয়ে যায়। এখন বোধহয় হাওড়ায় তাঁর নামে একটা পার্কও হয়েছে—'জটাধারী বাবা পার্ক'। যাই হোক সেটা কিছু না।

প্রশ্ন : ঐ স্ট্রাইক কমিটির সঙ্গে আর কারা জড়িত ছিলেন ?

উত্তর : তখন ঐ স্ট্রাইক কমিটির সঙ্গে এবং স্ট্রাইক পরিচালনায় আর যাঁরা জড়িত ছিলেন তার মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। রাধারমণ মিত্র (আমাদের কেসের সঙ্গে পরে জড়িত হয়েছিলেন) একজন ছিলেন। গোপেন চক্রবর্তী, যিনি স্ট্রাইক পরিচালনায় আগাগোড়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন। কালীকুমার সেন বলেও একজন ছিলেন।

এইরকম কতিপয় নেতা তখন বসে আমরা স্ট্রাইকের বিফলতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করি যে কংগ্রেসের অধিবেশন এখন হচ্ছে ১৯২৮ সালের শেষের দিকটা, বোধহয় ডিসেম্বরের শেষে ২৯ কি ৩০, সেই সময়ে শ্রমিক-

শ্রেণীর মধ্যে একটা যাতে চেতনা এবং জাগরণ আসতে পারে তার সম্পর্কে কী করা যায়। ভেবে আমরা স্থির করেছিলাম যে অন্তত শ্রমিক শ্রেণী এখন যেরকম একটা বিমর্ষতার মধ্যে এসে গেছে লিলুয়া স্ট্রাইকের ফেলিওর (ব্যর্থতা)-এর ফলে, একটা চেতনা সৃষ্টি করা যায় কিসে? স্থির হয় এই কংগ্রেস অধিবেশনের সময়, কলিকাতার আশেপাশে যে সমস্ত কারখানা আছে সে সমস্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করে একটা প্রসেশন বা শোভাযাত্রা করে সেখানে নিয়ে যাওয়া। সেই অনুসারে মেটিয়াব্রুজ থেকে আরম্ভ করে হাওড়া লিলুয়া ইত্যাদির ছোট বড় রেলওয়ে এবং অন্যান্য কারখানার সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার অভিযান চালানো হয়। মাত্র স্বল্প সময় ছিল হাতে, ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে—এখন যেটাকে শহীদ মিনার বলা হয়—সেখানে তাদের সমবেত করা হয়। এই শ্রমিকদের সমবেত করার মধ্যে কমরেড মণি সিং—যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান—তাঁর ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। কারণ সমস্ত মেটিয়াব্রুজ শ্রমিক অঞ্চলে তাঁর নেতৃত্ব ছিল প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় নেতা। ওই অঞ্চলের বিরাট জনতার মিছিল নিয়ে যখন আমরা ময়দান থেকে রওনা হই তখন আমাদের কাছে খবর আসে যে এই মিছিলকে পথে পুলিশ বাধা দেবে। যাই হোক্ প্রসেশন চলছে, চলার পথে পুলিশ অবশ্য বাধা দেয় নি। কিন্তু পুলিশ কমিশনার উপস্থিত হয়ে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি দিলাম কোনো আইন অমান্য বা কোনোরকম বিরোধিতার জন্য এই প্রসেশন নয়। এই শ্রমিকরা, তারা কংগ্রেস কী এইটা জানবার জন্যে, দেখবার জন্যে সেখানে ওই কংগ্রেস মণ্ডপে যাবে। এবং আপনাদের আমরা এই এসিওরেন্স (আশ্বাস) দিই যে কোনোরকম অশান্তিকর কিছু সৃষ্টি করা হবে না বা তা [হওয়ার] কথা নয়। যাই হোক এই বিরাট প্রসেশন, প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার [লোক] হবে। অনেকে অবশ্য exaggerate (অতিরঞ্জন) করে একলক্ষ, দুইলক্ষ, পঞ্চাশ হাজার নানারকম বলেন, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এই কুড়ি থেকে পঁচিশ বা বড় জোর ত্রিশ হাজার হতে পারে।

প্রশ্ন: এই প্রসেশনের রুট (পথ) কী ছিল? মনুমেণ্ট থেকে কোন্ পথে পার্ক-সার্কাস গিয়েছিল?

উত্তর: সোজা মনুমেণ্ট থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী দিয়ে বেঁকে পার্ক স্ট্রীট ধরে গিয়েছিল—কারণ এটা তো পার্ক স্ট্রীটের পাশেই। কংগ্রেস মণ্ডপটা পার্ক-সার্কাসে পার্ক-স্ট্রীটের পাশেই যে স্কোয়ার, যেটার এখন পার্ক-সার্কাস

ময়দান নাম হয়েছে সেখানে ছিল। এই অনেকটা রাস্তা আমরা হেঁটে এলাম। 'তখন কংগ্রেসের একটা অংশের নেতৃত্ব থেকে বলা হয়েছিল যে এরকম আসছে, এরা প্যাণ্ডেল ভেঙে দেবে এরকম একটা রিউমার (গুজব) ছিল। পুলিশও সেই রিউমারটাকে ব্যবহার করে, যাতে জনগণ এটার বিরুদ্ধে যায় তার চেষ্টা করে। যাই হোক গেটের সম্মুখে যখন আমরা উপস্থিত হলাম এবং এই বিশ-তিরিশ হাজার শ্রমিক যখন উচ্চকণ্ঠে আকাশভেদী স্লোগান দিতে লাগল—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', তখন কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে—ভেতরে যাঁরা ছিলেন—একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যে এরা তছনছ করে দেবে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে—সুভাষবাবু [সুভাষচন্দ্র বসু] তখন ছিলেন ভলেন্টিয়ারদের সর্বোচ্চ অধিপতি যাকে বলে G. O. C. [General Officer Commanding]—তিনি সেই ভলেন্টিয়ারদের আদেশ দিলেন গেটে আটকে দেওয়ার জন্যে। আমাদের অনুরোধ-উপরোধ কিছুই তাঁরা শুনতে চাইলেন না—ভলেন্টিয়াররা। সুভাষবাবু নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। থাকলে হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগতভাবে এবং আরো অন্যান্যের যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তাতে হয়তো সেই ভুল ধারণা সেখানেই দূর হতো। কিন্তু কংগ্রেস ভলেন্টিয়ার্সদের মধ্যে একদল ছিলেন উগ্রপন্থী অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন আগেকার 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' এই সমস্ত বিপ্লবী পার্টির নেতা। সকলেই আমার বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁরা বাধা দিলেন। লাটি-সোঁটা নিয়ে বাধা দিতে গেলেন। তখন গেট ভেঙে শ্রমিকরা ভিতরে ঢুকে পড়েছে। আর এঁরা লাঠি নিয়ে গিয়ে ভেতরে আটকা পড়ে গেলেন। কারণ এতবড় বিরাট একটা শ্রমিক-শ্রেণীর শোভাযাত্রা সেটিকে তো লাঠি দিয়ে দমন করা সম্ভব নয় অন্তত। আমার জ্যেষ্ঠ ভাই স্থানীয়—আমরা দাদা বলেই ডাকতাম—সেই রবি সেন প্রমুখ—অন্যান্য পার্টি নেতারা বললেন, 'কী হচ্ছে?' দেখিয়ে দিলাম যে লিলুয়ার এই যে শ্রমিক (আমি নামটা ভুলে গেছি) মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। 'এটা কাদের কাজ এইটা আপনারা উপলব্ধি করুন। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু শ্রমিকরা একটু দেখবে, আলোচনা করবে, চলে যাবে।' এমন সময় আমাদের সামনে এলেন পণ্ডিত নেহরু। ঘোড়ায় চড়ে তিনি এলেন। সেই বছর পণ্ডিত নেহরু অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ঝরিয়া অধিবেশনে। সুতরাং শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থে তাঁকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। শ্রমিকরা গগনভেদী কণ্ঠে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', পণ্ডিত নেহরু জিন্দাবাদ' ধ্বনি ওঠাল। ঘোড়া চমকে লাফ দিয়ে উঠল।

নেহরু ঘোড়ার ওপর থেকে পড়ে গেলেন মাটিতে। আমি এবং আরো কয়েকজন ছুটে গিয়ে নেহরুকে তুলে নিলাম। কংগ্রেসের আরো দু-একজন নেতাও ছিলেন। তাঁরা আমাদের কথা শুনলেন। আমরা বললাম, 'কিছু না, মিছিমিছি একটা ঘটনার সৃষ্টি করা হচ্ছে ভুল ধারণার থেকে। শ্রমিকরা কোনো অশান্তি সৃষ্টি করার জন্যে এখানে আসে নি। আমরা পারমিশন [অনুমতি] চাই।' মতিলাল নেহরু ছিলেন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। জে. এম সেনগুপ্ত ছিলেন রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি এই কথা শুনে আমাদের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন। সেই প্রতিনিধিদের মধ্যে আমি ছিলাম। রাধারমণ মিত্রও বোধহয় ছিলেন এবং আমার অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে অনেকে ছিলেন। জে এম. সেনগুপ্ত আমাকে দেখেই বললেন,—'ওঃ! আই নো দিস্ জেন্ট্‌ল্‌ম্যান' (ওঃ, আমি এই ভদ্রলোককে চিনি), কারণ ওই বছরে ১৯২৮ সালেই কলকাতায় ঝাড়ুদারদের যে ধর্মঘট হয়েছিল, সেই ধর্মঘটের মীমাংসায় জে. এম সেনগুপ্তই ছিলেন মূল—তখন মেয়র হিসাবে তার মীমাংসার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সে মীমাংসা হলেও তার প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস রাখে নি। যাই হোক, সে কথা আসছে না। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই—আপনারা কী চান?' আমরা বললাম; 'আমরা কিছুই চাই না। শ্রমিকরা একটু বসবে। কংগ্রেস কী তারা কিছুই জানে না, একটা আলোচনা করবে এই স্বাধীনতা সম্পর্কে।' [তিনি বললেন], 'হ্যাঁ কথা কন তাহলে। কিন্তু আপনারা একঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেবেন। না হলে আমাদের অধিবেশনে দেরী হয়ে যাবে।' আমরা প্রতিশ্রুতি দিলাম। শ্রমিকরা আবার উচ্চারণ করলে—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'ভারতের স্বাধীনতা জিন্দাবাদ'।

একটি কথা এখানে বলা দরকার যে ওই সেশনেই সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতা, আনকম্‌প্রোমাইজিং (আপসহীন) পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন পুনরায়, গান্ধীর সঙ্গে সেটার বিরোধ হয়েছিল এবং সেই দাবির আলোচনা পরে স্থগিত হয় পরবর্তী সেশন কংগ্রেসের অনুষ্ঠান পর্যন্ত। যাই হোক, ঘন ঘন স্লোগান শ্রমিকরা দিতে থাকে। তারপর শেষে একটা ছোটো-খাটো সভা হয়। সেখানে কে প্রিজাইড্ (সভাপতিত্ব) করেছিলেন মনে নেই। আমি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করি এবং কমরেড জোগলেকর—আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা এবং তখনকার কংগ্রেসের একজন মেম্বার (সদস্য) আর একজন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, তিনিও ছিলেন

এ আই. সি. সি-র একজন সদস্য, তাঁরা সেই আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। আমার সেই প্রস্তাব ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আপসহীন স্বাধীনতা এই দাবি যাতে কংগ্রেস সম্মানের সাথে গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। এটাই হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর কংগ্রেসের কাছে অনুরোধ। তারপর ঠিক আধঘণ্টা কি ৪৫ মিনিটের মধ্যেই আমাদের এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এবং আমরা আবার সেই শৃঙ্খলার সহিত কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে, ঠিক যে সময় তাঁরা দিয়েছিলেন সেই সময়ের মধ্যেই কিম্বা তার পূর্বেই আমরা বেরিয়ে আসি। এই সম্পর্কে মতিলাল নেহরু সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলি-তে পরে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন (তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল), যে-প্রসেশন কংগ্রেস মণ্ডপে এসেছিল তারা কোনোরকম শান্তি ভঙ্গ করে নাই, তারা স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এবং আমাদের নির্দেশ অনুসারে ঠিক সময়মতো তাদের অধিবেশন শেষ করে অদ্ভুত শৃঙ্খলার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এবং সেই প্রসেশনে, মতিলাল নেহরু বলেছিলেন যে প্রায় তিরিশ হাজার শ্রমিক এসেছিল, সুতরাং এ সম্পর্কে যে-সব ধারণা ছিল সেগুলো বিকৃত বা ভুল।

প্রশ্ন : অধিবেশন কী কংগ্রেসের মঞ্চেই হয়েছিল ?

উত্তর : হ্যাঁ কংগ্রেসের ডায়াসে (মঞ্চে) এই অধিবেশন হয়।

প্রশ্ন : কংগ্রেস থেকে কেউ অ্যাড্রেস (বক্তৃতা) করেছিল ?

উত্তর : কংগ্রেস থেকে কেউ অ্যাড্রেস করে নি, কিন্তু মাঝখানে যখন একবার গান্ধীকে তারা তাদের ক্যাম্প থেকে নিয়ে এসেছিল (তখন) গান্ধীজী একটা মটোর গাড়ির হুডে উঠে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শ্রমিক-শ্রেণী সেই বক্তৃতা শুনেছিল কিন্তু 'ইনকিলাব জিন্দাবাদে'র যে উচ্চ ধ্বনি তার মধ্যে [সে বক্তৃতা] ডুবেই গিয়েছিল।

প্রশ্ন : মিছিলটা কী ওপেন সেশনের দিনে হয়েছিল না অধিবেশন চলাকালীন কোনো দিনে ?

উত্তর : সেই দিনটা ছিল ২৯শে ডিসেম্বর, ওপেন সেশনের দিন।

প্রশ্ন : গান্ধীজীকে নিয়ে তখনকার শ্রমিকরা কি—'মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ'—এ ধরনের স্লোগান দিত ?

উত্তর : না, 'গান্ধীজী জিন্দাবাদ' বা 'মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ' এ-ধরনের কিছু বলে নি, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এবং 'ভারতের স্বাধীনতা জিন্দাবাদ'—

এই দুটিমাত্র মূল স্লোগান ছিল। আর কোনো স্লোগান প্রসেশনে ছিল না, ভেতরেও ছিল না।

প্রশ্ন: পরে সুভাষবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছিল এই মিছিল নিয়ে?

উত্তর: সুভাষবাবু আর আসেন নি। তাঁর চেহারাও দেখতে পাই নি।

প্রশ্ন: পরে আর কথা হয়েছিল, এই ভলেন্টিয়ারদের সঙ্গে মারপিট নিয়ে?

উত্তর: না, তারপরে আর কথা হয় নি।

প্রশ্ন: আপনাদেরই তো বন্ধুবান্ধব ছিলেন?

উত্তর: হ্যাঁ আমাদের বন্ধুবান্ধব, আমাদের আগেকার পার্টির বন্ধুবান্ধব, তারাই প্রধান।

প্রশ্ন: গণেশ ঘোষও ছিলেন বোধহয়?

উত্তর: জানি না, 'অনুশীলন'-'যুগান্তর'-এর সবাই ছিলেন। তার ভিত্তিতেই পরে 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' তৈরি হয়। ১৯২৮-এর ভলেন্টিয়ার্স ফোর্সই পরে 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' করে। হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী মিলে 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' করেন। হেমন্ত বসু, মেজর সত্য গুপ্তও ছিলেন।

প্রশ্ন: আপনার আরো কয়েকজনের নাম মনে থাকলে বলে রাখুন তো, এঁদের কথা তো সর্বদাই শুনি। শ্রমিক-নেতাদের মধ্যে কেউ?

উত্তর: প্রতুল ভট্টাচার্য বলে একজন ছিলেন অনুশীলন পার্টির। এঁরা কংগ্রেসে ছিলেন।

প্রশ্ন: শ্রমিক মিছিলের আর কার কার কথা মনে পড়ে?

উত্তর: আমি ছিলাম, গোপেন চক্রবর্তী ছিলেন, রাধারমণ মিত্র ছিলেন, মণি মুখার্জী, মণি সিং, কালী সেন, জটাধারী বাবা ছিলেন।

প্রশ্ন: 'ক্যালক্যাটা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর কেউ ছিলেন?

উত্তর: না, তাঁরা ছিলেন না।

প্রশ্ন: তাহলে মূলত এটা কা চটকল শ্রমিকদের মিছিল ছিল?

উত্তর: না মেইনলি (প্রধানত) রেলওয়ে, লিলুয়ার মেজরিটি (অধিকাংশ), মেটিয়াব্রুজের চটকল, সুতাকল, কেশোরাম কটন মিল্‌স এগুলোর।

প্রশ্ন: এগুলো কী তখন বি. পি. টি. ইউ সি-র মধ্যে চলে এসেছে?

উত্তর: হ্যাঁ, এরা সবাই অ্যাফিলিয়েটেড্ অনুমতি প্রাপ্ত) ছিল না, তবে এসেছিল।

প্রশ্ন: তাহলে আপনারা যে এতগুলো ইউনিয়ন মিলিয়ে মিছিলটা করলেন, তার ভিত্তি কী ছিল—মার্কসবাদ-লেনিনবাদ?

উত্তর ঃ না, কোনো ইডিওলজির (মতাদর্শ) ব্যাপার নয়, ইউনিয়ন-ভিত্তিক সংগঠন হয়েছে। কতকগুলোর অ্যাফিলিয়েশন হয়েছে, কারণ তখন বি. পি. টি. ইউ. সি খুব শক্তিশালী ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আপনারা যেটা করলেন এটা তো সে অর্থে শ্রমিক-শ্রেণীকে প্রথম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা ?

উত্তর ঃ আমি আগেই বলেছি না, যে তাদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে এই মিছিল করা হয়েছিল। ওটার হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স (ঐতিহাসিক গুরুত্ব) এখানেই।

টীকা ও মন্তব্য

১। শ্রমিক মিছিলের অন্যতম উদ্যোক্তা 'জটাধারী বাবা'র পুরো নাম কিরণচন্দ্র মিত্র। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাঁকে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেন মতিলাল নেহরু।

২। মিছিলটি দেশবন্ধুনগরে গিয়েছিল ৩০ ডিসেম্বর, রবিবার, দুপুরে। স্মৃতি থেকে বলতে গিয়ে ধরণী গোস্বামী ভুল করে ২৯ ডিসেম্বর বলেছেন। মিছিল ও শ্রমিক-সভার কারণে কংগ্রেস অধিবেশন বেলা দুটোর বদলে চারটেয় শুরু হয়।

৩। জোগলেকর ছাড়া এ. আই. সি. সি-র আরেকজন কমিউনিস্ট সদস্যের নাম ধরণী গোস্বামীর মনে পড়ে নি। তিনি কমরেড নিম্বকার।

৪। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি-র পাবলিক সেফ্‌টি বিল বিতর্কে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে মতিলাল নেহরু এই শ্রমিক মিছিলের কথা সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছিলেন (কার্যবিবরণী, ১৯২৯, পৃ. ৫৩৮ দ্র.)।

৫। কংগ্রেস প্যাণ্ডালে আরও যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আরও দুজন শ্রমিক নেতা, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ্য। এঁরা মিছিলে ছিলেন কিনা তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। অন্যান্য সূত্রে প্রভাবতী দাশগুপ্তা-র নামও পাওয়া যায়।

তানসেন—ইতিবৃত্তে ও গল্পে

অমিয়নাথ সান্যাল

[পরিচয়-এর শারদীয় ৮৭ সংখ্যায় বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যালের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটির নাম ছিল 'তানসেন—ইতিবৃত্তে ও গল্পে'। এই লেখাটি তার দ্বিতীয় অংশ। আগ্রহী পাঠকেরা লেখাটির প্রথম অংশ পড়ে নিতে পারেন। লেখাটি পাওয়ার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ লেখক-কন্যা ও সুগায়িকা রেবা মুহুরীর কাছে। মূল লেখার বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে।

সম্পাদক, পরিচয়]

রেবা রাজ্যের অধিপতি রাজা রাম তানসেনকে রেবায় নিয়ে গেলেন এবং আশ্রয় দান করলেন। শান্তিপূর্ণ আব্-হাওয়ার মধ্যে তানসেনের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল; গান-অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে, আর ধ্রুবপদ গান রচনার ব্যপদেশে। অনুমান মাত্র করা যায়, তানসেনের যৌবনারম্ভেই এই সৌভাগ্য ঘটেছিল। এই ঘটনার একটি ঐতিহাসিক সার্থকতা দেখা দিয়েছিল, তানসেনের মৃত্যুর পরে।

সর্বসম্মত ইতিবৃত্ত এই যে—তানসেনের মৃত্যুর পরেই পুত্রবংশীয় ধুরন্ধরবর্গ সরাসরি চলে গেলেন, দিল্লী থেকে পশ্চিমে রাজপুতানা অঞ্চলে। অথচ—দৌহিত্র-বংশের গুণীরা পুত্রবংশের অনুগমন না করে, দিল্লী ছেড়ে দিয়ে পূর্বে লক্ষ্ণৌ ও কাশী অঞ্চলে, কেউ বা উত্তরে রামপুরের দিকে চলে গেলেন। উভয় পক্ষেই সমীচীন কারণ এই যে—আকবরের মৃত্যুর পরে, জহাঙ্গীর, সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দিল্লীতে সঙ্গীতের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বাদশাহ

বংশের পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত, কাড়াকাড়ি ও হানাহানির মধ্যে কণ্ঠ ও বীণার ধ্বনি নিরুদ্ধ হয়ে গেল ; ধ্রুবপদ ও বীণার শিল্পীরা প্রাণ ও পরিবার রক্ষা করার নিমিত্তই দিল্লী থেকে উধাও হলেন। ঔরংজেব খোলাখুলি ভাবে সঙ্গীত-বিদ্বেষী ছিলেন। তবে, অনুমান হয়, ঔরংজেব সিংহাসনে উপবেশন করার সময়ে—নেহাৎ অনুরোধ-উপরোধের বশে দু' পাঁচখান প্রশস্তিসূচক ধ্রুবপদ গান সহ্য করেছিলেন। এ ধরণের দু'পাঁচখান ধ্রুবপদ গান পাওয়া যায় বলেই অনুমান সম্ভব। অধিকন্তু তানসেন বংশের রক্তের অতিরিক্ত দু'একটি শিষ্য-ঘরানা আগ্রা অঞ্চলে চলে গিয়ে বাস করেছিলেন। এঁদের আধুনিক সন্তানেরা এখনও পূর্বতন খানদানী সম্বন্ধের গৌরবময় ইতিবৃত্ত পোষণ করেন।

ফল কথা,—তানসেনের জীবন-রেখা ঘুরে রেবা রাজ্যে চলে গিয়েছিল বলে, এবং রাজা রামের ও অন্য রাজোয়াড়ার সম্ভ্রান্ত সঙ্গীত-প্রিয় জনের সঙ্গে শুভ সম্বন্ধ ঘটে গিয়েছিল বলেই তানসেনের মৃত্যুর পরে পুত্র বংশজ গুণী-বিশেষজ্ঞেরা পশ্চিমে রাজপুতানার স্থানে চলে গিয়ে সুস্থির আসন লাভ করেন। অর্থাৎ—তানসেনই পুত্রবংশের জন্য আসর বিছিয়ে রাখলেন, যদিও তিনি জানতেন না আকবরের মৃত্যুর পরে দিল্লীতে দুর্দৈব দেখা দেবে।

ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গ ধরে নেওয়া যাক।

পশ্চিমা ইতিবৃত্তকারেরা তানসেনের দিল্লীগমন প্রসঙ্গে যা বলেন তার সংক্ষিপ্তসার এই যে, বাদশাহ্ আকবর তানসেনের খ্যাতির কথা শুনে রাজা রামকে ফরমান পাঠিয়েছিলেন, যথা—তানসেন নামে গায়ককে বাদশাহের দরবারে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ক। এবং রাজা রাম নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর বরেণ্য গুরুদেব তানসেনকে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লীতে। প্রসঙ্গত, বলতে হয়, তানসেন রেবা রাজ্যে আর ফিরে আসেন নি।

কিন্তু—ফুলের ডালির মধ্যে যেমন মোহর দেওয়া যায় উপঢৌকনের ছলে, পশ্চিমা-শাখার বিশেষজ্ঞ ইতিবৃত্তকারেরা একটা সম্ভব অথচ চমৎকার গল্পের ডালির মধ্যে ইতিবৃত্তটি সাজিয়ে উপহার রেখে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতের অনুশীলকদের জন্য। যথার্থত, ওই গল্পটি ইতিবৃত্তের পরিপোষক রক্ত-মাংস সম্বলিত একটা বিবরণ, যা ইতিবৃত্তকে নষ্ট করেনি উদ্‌ভট কল্পনা দিয়ে। গল্প বলার লোভ সম্বরণ করা এ প্রসঙ্গে উচিত হবে না। ফলিতভাবে এর মধ্যে রাজা রাম, তানসেন ত' আছেনই ; তার উপরে আছেন, বাদশাহ্ আকবর ও বীরবল, এবং রায়-প্রবীণ নামে মহিলা কবি। একটি সুদৃশ্য শ্বেত হস্তীও এসে

পড়েছে। এই শ্বেতহস্তীকে সম্মান করতে বাধ্য হয়েছি। ইতিবৃত্তকারেরা একে মর্যাদা করেছেন কারণ, হাতিটি তানসেন ও রাজা রামকে এমনকি রায় প্রবীণকেও পিঠে নিয়ে রাজ্যের মধ্যে ও বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে। যে হাতি একজন অনন্য-সাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভা, একজন প্রখ্যাতনামা মহিলা কবি, এবং একজন গীত-প্রিয় গুরুভক্ত রাজাকে বহন করেছে, সেই হাতির নামটি যদি ইতিহাসে না পাওয়া যায় এবং ইতিবৃত্তকারেরাও যদি বলতে না পারেন, তাহ'লেও ক্ষতি নেই। আমরা এই অনামিক হস্তীর সৌভাগ্যকে সম্মান করতে বাধ্য।

বাদশাহ আকবরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সকলের চেয়ে লোকপ্রসিদ্ধ ছিলেন বীরবল বা বীরমল্। রাজপুতানাবাসী এই বীরবল ইতিহাসে স্বীকৃত হননি, কিন্তু ইতিবৃত্ত ও গল্পের বাহনে ইনি চিরজীবী। বীরবল নানাদেশের নানারকমের চমৎকারজনক খবর রাখতেন। অদ্ভুত রকমের ব্যবহারিক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও সৌজন্য এঁকে বিশিষ্ট করে রেখেছে কাহিনীর মধ্যে।

একদিন আকবর জিজ্ঞাসা করেছিলেন বীরবলকে—বাদশাহী দরবার বা রত্নসভাটি কেমন মনে হচ্ছে। বীরবল তৎক্ষণাৎ বললেন—আপনি তিনটি জিনিষ এখনও সংগ্রহ করতে পারেন নি। আকবর আবার জিজ্ঞাসা করলে বীরবল বললেন—সেই তিনটি রত্ন রয়েছে রেবায় রাজা-রামের তাল্লুকে। এক তানসেন, দুই রায়-প্রবীণ এবং একটি শ্বেতহস্তী—যার তুলনা নেই।

প্রসঙ্গক্রমে—বীরবল জানিয়ে দিলেন তানসেনের কীর্তি-কাহিনী। রায়-প্রবীণের কিছু চরিত্র বাদশাহ আকবর জানতেন। কারণ—বাদশাহ এই তেজস্বিনী মহিলাকে অনেক বৎসর আগে দরবারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সেই মহিলা-কবি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে' আকবর রুষ্টও হয়েছিলেন। তখনকার তখন সে আক্রোশটা আকবর হজম করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাছে,—একটা মহিলাকে উপলক্ষ্য করে রাজপুতানার তলবার একসঙ্গে ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে, এবং এরকম উপলক্ষ্য তখন বিপজ্জনক ছিল আকবরের পক্ষে। অবশ্য যে সময়ের কাহিনী বলা হচ্ছে, সে সময়ে আকবরের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তখন রাজপুতানার জাতীয় জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকবর এমন ধর্ম-মহাসম্মেলন করেন, বাদশাহী নওরোজার উৎসবে সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদানও করেন, আবার দরবারী গায়কেরা 'নওরোজা ভইলবা' বলে পদ তৈরী করে ধ্রুবপদ গানও করেন।

রাজা রামের কাছে আকবর ফরমান্ পাঠিয়ে দিলেন—যথা, অবিলম্বে তানসেন, রায়-প্রবীণ ও শ্বেতহস্তীটিকে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ক। কোনও ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। ফরমান চলে গেল রেবা-রাজ্যে।

তানসেন যে সময়ে রেবা-দরবারে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন, তার অনেক আগে থেকেই মহিলা-কবি রায়-প্রবীণ রেবার রাজ-সভায় বিখ্যাত ও আসন-ধারী বলে গণ্য হয়ে এসেছিলেন। ইনি সারা রাজপুতানা টহল্ দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন আর মাঝে মাঝে রেবায় এসে বিশ্রাম নিতেন, রাজ-সভায় প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। এঁর হৃদয়ে ছিল দেশ-প্রেমিক-চারণদের উন্মাদনা, কণ্ঠে ছিল সরস্বতীর বাঙ্-মাধুর্য, জিহ্বায় ছিল যোদ্ধার হাতে তলবারের ছন্দ আর ছটা। এঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতি ছিল যে একটি লেবু আকাশের দিকে ছুড়ে দিলে, সেটা মাটিতে পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে, তার মধ্যেই ইনি একটি শ্লোক রচনা করতে পারতেন। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে এই কবি যৌবনের পারে গিয়ে প্রৌঢ় হয়েছেন, কিন্তু এঁর তেজ, রচনা-শক্তি ও প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয়নি বরং আরও পরিষ্কার, উজ্জ্বল ও শ্রদ্ধেয় হয়েছিল। তানসেনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে ইনি তানসেনকে যথেষ্ট সমাদরের চক্ষে দেখতেন।

ফরমান্ পেয়ে রাজা রামের রক্ত গরম হয়ে উঠল। সভাস্থ সকলকে পড়ে শোনান হ'ল। অনেকেই রুখে দাঁড়ালেন ফরমানের বিরুদ্ধে। কিন্তু—বুদ্ধিমতী রায়-প্রবীণ রায় দিলেন, আদেশের বিরুদ্ধতা করে লড়াইয়ের উদ্যোগ করা শুধু নিষ্ফল নয়, অযথা রক্তক্ষয় হবে। রাজা রাম ফরমান্ অনুযায়ী কাজ করুন, হাতির পিঠে চড়ে তিনি আর তানসেন রওয়ানা হয়ে যাবেন দিল্লীর রাস্তায়। ভয় নেই, উপস্থিত বুদ্ধি করে তাঁরা অবশ্যই ফিরে আসবেন দেশে।

উপস্থিত বুদ্ধি হ'ল—কবি আর তানসেনের মধ্যে গোপনে। বাদশাহকে খুশী করতেই হবে কবিতা শুনিয়ে আর গান শুনিয়ে। তারপর যখন বাদশাহ ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হবেন, তখন টাকা-কড়ি হীরে-জহরাত্ না চেয়ে বলতে হবে—আমাদের ফিরত্ পাঠিয়ে দেন, রেবায়; ঐ হাতিটির পিঠে করে'। এরকম করে' হাতটিকেও ফিরত্ আনা যাবে। আকবর আর যাই করুন, না করুন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেনই; না হ'লে—তাঁর সুনামে কলঙ্ক লাগবে।

ইতিবৃত্তকারেরা বলেন—রাজ্যের শেষ-সীমা পর্যন্ত তানসেন ও রায়-প্রবীণ দু'জনে দু'টি দোলায় চেপে রওনা হ'লেন। এবং রাজা রাম চোখের জল মুছতে মুছতে তানসেনের দোলায় নিজের কাঁধ লাগিয়েছিলেন আর কাঁদতে

কাঁদতে ফিরে এলেন নিজ আবাসে। রাজ্যের সীমা পার হ'য়ে রায় প্রবীণ ও তানসেন হাতির পিঠে চড়লেন।

দিল্লীতে দরবারে প্রথম পেশ হ'লেন রায়-প্রবীণ। যিনি কখনও মাথা নামিয়ে সামনে ঝুঁকে হাটেন নি, সেই প্রৌঢ়া মহিলাকে কায়দার খাতিরে তাও করতে হ'ল—বাদশাহের সম্মুখে, সভাস্থ সকলের সাক্ষাতে! বাদশাহ আকবর তাঁর দুর্দশা দেখে সহানুভূতির ভাণ করে বললেন—আপনি অনেক দূর থেকে আসছেন। হাতির পিঠে হয়ত চড়া অভ্যস্ত নয়। তার ওপর আপনার বয়সও হয়েছে দেখছি। আপনার নজর নিচের দিকেই দিতে হচ্ছে, ঘাড় নীচু হয়েছে, বুকও সামনের দিকে ঝুকে পড়েছে, পা-ও ভেঙ্গে পড়ছে বোধহয়! আপনি আসন গ্রহণ করুন, আপনার কষ্ট আমি দেখতে পারছিনে।

আকবরের মুখে ব্যঙ্গ-কথা শুনতে না শুনতেই তেজস্বিনী মহিলার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল, মাথা উঁচু হয়ে উঠল, মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অন্তরের আবেগে। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তিন জোড়া শ্লোকে; যার ভাবার্থ হ'ল—

অনেক বৎসর গত হয়েছে, যে সময়ে আমি কিশোরী ছিলাম; দেবতুল্য পিতা-মাতার মুখের দিকে নজর করতে করতে আমার দৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল উর্দ্ধে, রাজপুতানার নীল আকাশের দিকে; সূর্য-চন্দ্র-তারা দেবতাদের সঙ্গে আমি তখন কথা বলতাম; মুখ আর বুক উঁচু করে টহল্ দিয়েছি।

পরে, যখন আমি যৌবন কাটিয়েছি, তখন সম-বয়স্ক মানুষের দিকে সোজা নজর করতে করতে আমার দৃষ্টি চলে যেত রাজপুতানার মরু-পারে দিগন্তের সন্ধানে, যেখানে দেখেছি হৃদয়বান বীর পুরুষ আর স্ত্রীলোকের চিতা-ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে স্তব্ধ দেবতার রূপধারণ করেছে। তখনও আমার শির-দাঁড়া সোজা ছিল, বুক ফুলে উঠত গর্বে। আমি তখন রাজপুতানার মানুষের খবর নিয়েছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি।

সম্প্রতি, আমাদের হাতি দিল্লী এলাকায় ঢুকে যখন মাটির নীচে কবরের ওপরে চাপ দিতে দিতে এসেছে, তখন আমি প্রেত পিশাচদের কলরব শুনেছি, আমার নজর চলে গিয়েছে মাটির দিকে, কবন্ধদের ছিন্ন মুণ্ড থেকে আর্তনাদ শুনে আমার বুক ভারি হয়েছে। দিল্লীর মাটির ওপরে আমার পা স্থির থাকছে না। আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

কবিতা শেষ করলেন, রায়-প্রবীণ। বাদশাহ আকবর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন রায়-প্রবীণের জবাব শুনে। সভাস্থ লোক চিত্রার্পিতের মতো

তাকিয়েছিল কবির উজ্জ্বল মুখের দিকে। বীরবল আগেই আকবরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—রায়-প্রবীণের সঙ্গে বিনীত হয়ে, সম্ভ্রম করে কথা বলবেন; নয়ত' আপনি নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়বেন। বাস্তবিক, তাই হ'ল।

বাদশাহ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রায়-প্রবীণকে সম্ভ্রম করলেন, বললেন—আপনার জন্য রক্ষিত এই আসনে বসে সভাকে অলঙ্কৃত করুন।

আকবরের কথা শুনেই রায়-প্রবীণ ওড়না সরিয়ে আপন বেণীটি ধরে নিলেন। বেণীর আগায় একটি ছোট্ট পুঁটলিবাঁধা ছিল; সেটা খুলে ফেললেন এবং তা থেকে কিছু ধুলো-বালি বা'র করে' হাতে নিয়ে তাঁর জন্য নির্দ্দেশ করা আসনের নিকটে গেলেন। সপ্রতিভ দৃষ্টিতে আকবরের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার একটা পুরান অভ্যাস এই যে—রাজপুতানার বাইরে যাওয়ার আগে আমি দেশের কিছু বালি আর ধুলো সঙ্গে করে নেই। বিদেশী কোন আসনে বসতে হ'লে আমি আগে তার ওপরে আমার দেশের ধুলো-বালি ছিটিয়ে দেই; না হ'লে আমার বস্‌তে ইচ্ছাই করে না। বলে' উৎকৃষ্ট মখমলের আসনের ওপরে ধুলো-বালি ছিটিয়ে দিলেন। এবং আসন গ্রহণ করলেন, নির্ব্বিকারচিত্তে!

আকবর বুঝলেন, এঁর সঙ্গে কথা বলাই চলবে না; বললেই মোলায়েম চাবুক খেতে হবে। অথচ—সম্মানিত অতিথিকে শাসন করাও চলে না। রাজপুতানার এই বিচিত্র পাখিটি খাঁচায় কয়েদ করে যাবে না, দরবারী দাঁড়ে বসালেও এর চরিত্র বদলাবে না। মানে মানে একে বিদায় দেওয়াই ভাল—এই ভেবে পাশে বীরবলের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করলেন চুপে চুপে। বীরবল উঠে দাঁড়ালেন। রায়-প্রবীণের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে জানিয়ে দিলেন, বাদশাহ আপনার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। আপনাকে তাঁর আন্তরিক সম্মান জানাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা, এখানকার নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে পুরস্কৃত করেন। আপনি যা চাইবেন বাদশাহ আপনাকে তাই দেবেন।

রায়-প্রবীণ আসন থেকে উঠে বললেন—আমি আর কিছুই চাইনে, বাদশাহ আমাকে আমাদের হাতীর পিঠে চড়ে রেবায় ফিরে যেতে অনুমতি দেন, এই অনুমতিকেই বাদশাহের গুণগ্রাহিতা ও পুরস্কার মনে করব।

বাদশাহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। এর পরেই তানসেন সভায় আহুত হ'লেন। সভায় সমবেত সকলের প্রত্যক্ষে তানসেন এক-পা এক-পা করে বাদশাহের সম্মুখে অগ্রসর হ'লেন। কিন্তু সকলেই ত্রস্ত

হয়ে উঠলেন তানসেনের কোরনিষ, করা দেখে! বাঁ-হাত দিয়ে কোরনিষ করতে করতে তানসেন এগিয়ে চলেছেন!

এ থেকে অভদ্রতা হ'তে পারে না, বাদশাহের অপমান এ থেকে বেশী হ'তে পারে না। অবশ্যই তানসেন ভদ্রতা ও আদব-কায়দা জানতেন। কিন্তু—মহাচতুরা রায়-প্রবীণই তানসেনকে এরকম অভিনয় করতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

একটা শোরগোল হওয়ার উপক্রম দেখেই বীরবল বাদশাহের অনুমতি নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সভাকে শিষ্ট হ'তে বললেন। আর—তানসেন নিকটে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাজা রামের সভায় যিনি উঠেছেন বসেছেন, তিনি কি ক'রে দরবারী কায়দা ভুলে গেলেন?

তানসেন বিনীত হয়ে উত্তর দিলেন—আমার ডান হাত আমার শিষ্য রাজা রাম কিনে নিয়েছেন! এ হাতে বাদশাহকে সেলাম জানাব কি ক'রে! এই দেখুন—বলে আস্তিন সরিয়ে নিয়ে ডান হাতের একটি সোণার কবচ-বন্ধনী দেখিয়ে দিলেন; তার ওপরে রাজা রামের নাম মুদ্রিত ছিল, হীরে-মতিও বসান ছিল।

বীরবলও প্রত্যুৎপন্নমতি হয়ে বাদশাহকে বললেন—আপনি এখনই তানসেনের বাঁ-হাতটি কিনে নিন, নইলে মান থাকে না। আকবর ব্যাপারটি বুঝে নিলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম হয়ে গেল তানসেনের বাঁ-হাতের একখানি কবচ লাগিয়ে দেওয়া হ'ক। কোষাগারে পুরস্কার দেওয়ার উপযোগী নানা রকম সামগ্রী প্রস্তুত থাকত, কবচ নিয়ে আসা হ'ল, তানসেনের বাঁ হাতটিও বন্ধন-দশা লাভ করল সকলের সম্মুখে। সভাজনেরা প্রকাশ্যে গুঞ্জন ধ্বনি করলেন—বললেন বাদশাহী করামত্ আর তানসেনের কিস্‌মত্! নয়ত, এমন অদ্‌ভুত ঘটনা হবে কি করে!

কিন্তু—অন্তরে অন্তরে সকলেই বুঝল—বুদ্ধি-চাতুরী হ'ল রায়-প্রবীণের।

আসরে গান করার আগেই, তানসেন ইনাম পেলেন, বন্ধন-দশার মধ্যে পড়ে গেলেন। রায়-প্রবীণ কিন্তু আগে বুঝতে পারেন নি যে ঘটনা-চক্র ঘুরে চলে যাবে বীরবলের বুদ্ধির এলাকায় এবং তানসেনের বাঁ-হাতে একখানি কবচ গিয়ে চড়বে এত শীঘ্র! তানসেনের ভবিতব্য রায়-প্রবীণের ও রাজা-রামের হাতের বাইরে চলে গেল। এই আগন্তুক অলক্ষ্য ভবিতব্য দেখা দিল বাঁ-হাতের কবচের রূপে। তানসেন এই ভবিতব্যকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

তিনি নিজেই বলেছেন—ডান-হাতটি কেনা-বেচা হয়ে গিয়েছে। এখন বাঁ-হাতের বেলায় কেনা-বেচা আটকাবে কি করে!

ইতিবৃত্তকারেরা বলেন,—আকবর তানসেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু—কখনও বলেন না আকবর ধ্রুবপদ গান শিক্ষা বা অভ্যাস করতে মনোযোগী হয়েছিলেন। যাই হ'ক—কথার মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই। উত্তর ভারতের সাঙ্গীতিক ইতিহাস বা ইতিবৃত্তের আলোচনা করলে দেখা যায়—বহু রাজা নবাব বাহাদুরেরা মাত্র শ্রদ্ধা ও সম্মান করে গায়ক-বাদক এমন কি নৃত্যের গুণীদের শিষ্য হয়েছেন।

ব্রহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্ত

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রথমেই আলোচনার লক্ষ্যটা পরিষ্কার করে বলে নেওয়া ভালো। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯০৭) প্রধান পরিচয়—আপসহীন জাতীয়তাবাদী। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তিনিই প্রকাশ্যে প্রথম তুলেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় দৈনিক 'সন্ধ্যা' সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিল বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে। সমাজের নীচুতলার মানুষ ও অন্তঃপুরের মেয়েরা জানতে পেরেছিলেন স্বদেশী ও স্বরাজের কথা। বাঙালী তরুণকে তিনি শুনিয়েছিলেন অভয়ের বাণী। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও সবার বুকে তিনি বল জুগিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ধর্মমত কী ছিল—সে নিয়ে আলোচনা করে কী হবে? আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তার কি কোন যোগ আছে?

আছে। অনেক দিক থেকেই ব্রহ্মবান্ধব অদ্বিতীয় পুরুষ। এত অশান্ত, এত দ্রুতপরিবর্তনশীল মানুষ বাঙালীর মধ্যে বড় একটা চোখে পড়ে না (বাংলার বাইরেও একজনের কথাই মনে আসে—রাহুল স্যাংকৃত্যায়ন)। মাত্র ছেচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি এতবার এত মত পাল্টেছেন যে তার হদিশ রাখা শক্ত। সর্বদাই যে এই পরিবর্তন নতুন থেকে আরেক নতুনের দিকে—এমন নয়। কখনো বা তিনি পুরনো মতেই ফিরে যান, কিন্তু সেই পুরনোই আবার নতুন হয়ে ওঠে। এর ভেতর দিয়েই ধরা পড়ে আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ দিক: ধর্ম ও রাজনীতির ওতপ্রোত সম্বন্ধ। ব্রহ্মবান্ধবের ক্ষেত্রে এ আলোচনা তাই খুবই প্রাসঙ্গিক। তাঁর প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে নানা মত ও তর্ক আছে। পুরো ঘটনাটা আবার খতিয়ে দেখলে তাঁকে, ও তাঁর সমকালীন অনেক মানুষকে, বোঝার একটা সূত্র পাওয়া যাবে।

অশান্ত ব্রাহ্মণ

অশান্ত ব্রাহ্মণ—এই অভিধা, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চেয়ে ব্রহ্মবান্ধবের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিশোর বয়সে, দেশে যখন স্বাধীনতার দাবিতে কোন আন্দোলন নেই, প্রথম মহাবিদ্রোহের আগুন একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেছে, জাতীয় কংগ্রেসও যখন তৈরি হয়নি—তখন তিনি ভেবেছিলেন সশস্ত্র

অভ্যুত্থান করে দেশ স্বাধীন করার কথা। মনে হয়েছিল, 'সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে ভারত উদ্ধার করা—কিছুতেই পোষাইবে না।' বাড়ি থেকে পালিয়ে দুবার গিয়েছিলেন গোয়ালিয়রে। উদ্দেশ্য: 'সৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, ফিরিঙ্গি তাড়াইব।'[১] সে-ইচ্ছা সফল হয়নি। তখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে শুরু করলেন সাধুসঙ্গ আর ধর্মচর্চা। কিছুদিন যাতায়াত করলেন দক্ষিণেশ্বরে, তারপর দীক্ষা নিলেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজে (১৮৮৭)। মাস্টারি নিয়ে পাড়ি দিলেন হায়দ্রাবাদ। সেখানে যোগ দিলেন অ্যাংলিকান খৃস্টমণ্ডলে (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। তার ছ মাস পরেই (১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১) চলে গেলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলে। ১৮৯৪-এ ঐ মতেই গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস। পৈতৃক নাম (ভবানীচরণ) পাল্টে নতুন নাম নিলেন: ব্রহ্মবন্ধু (পরে লিখতেন ব্রহ্মবান্ধব; এটি তাঁর ব্যাপ্টিজ্‌ম্‌-এর নাম থিওফিলুস-এর তর্জমা মাত্র), আর 'বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র 'বন্দ্য' বাদ দিয়ে উপাধি নিলেন 'উপাধ্যায়'। তার পরের বারো বছর আনুষ্ঠানিকভাবে আর নতুন কিছু করেননি। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে গঙ্গাস্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করে আবার নতুন করে উপবীত ধারণ করলেন!

প্রায়শ্চিত্তের স্থান কাল পাত্র

এই প্রায়শ্চিত্ত কবে, কোথায়, কার পৌরোহিত্যে হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। বি. অণিমানন্দ ও ফাদার পিয়ের ফার্লোঁ এস. জে. বলেছেন, মৃত্যুর দু মাস আগে ব্রহ্মবান্ধব এই প্রায়শ্চিত্ত করেন।[২] ফাদার পি. টুম্‌স্‌ এস. জে.-র মতে, তিন মাস আগে।[৩] তার মানে জুলাই বা অগস্ট ১৯০৭ (ব্রহ্মবান্ধব মারা যান ২৭ অক্টোবর ১৯০৭)। অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র সিংহ প্রায়শ্চিত্তের তারিখ দিয়েছেন, মহালয়া, ২০ আশ্বিন ১৩১৪।[৪] ইংরিজি ক্যালেণ্ডারে সেটা হয় ৭ অক্টোবর ১৯০৭, অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র কুড়িদিন আগে। আবার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র লেখা থেকে মনে হয়, প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল জুলাই-এরও আগে। 'যুগান্তর' পত্রিকার কাজে পূর্ববঙ্গ থেকে ঘুরে এসে তিনি দেখেন, ব্রহ্মবান্ধবের মাথায় শিখা! সেই নিয়ে ঠাট্টা করে তিনি জিগেস করেন, এ আপনি কী করলেন? ব্রহ্মবান্ধব বললেন, দরকার হে দরকার।[৫]

প্রায়শ্চিত্ত হলো কোথায়? ফাদার পি. টুম্‌স্‌ এস. জে. বলেছেন, হুগলী নদীর তীরে, নিমতলা ঘাটের কাছে, গঙ্গাজলে আচমন করে ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।[৬] প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ কিন্তু অন্য কথা বলে। অতীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় হিন্দু হন, কালীঘাটে

এই ক্রিয়া হয়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যে, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির পরামর্শে তিনি হিন্দু হন। আমি সেইদিন তথায় ছিলাম ; রাত্রিতে তথায় বক্তৃতা হয়। পঞ্চানন তর্করত্ন 'শুদ্ধি' বা 'পুনঃ হিন্দুকরণ' ব্যাপার সম্পাদন করেন।'[৭]

দুর্ভাগ্যবশত এই বিবরণও পুরোটা ঠিক নয়। অণিমানন্দের সঙ্গে পঞ্চানন তর্করত্নের সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে জানা যায়, ঐ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন অন্য কোন পণ্ডিত, পঞ্চানন তর্করত্ন নন—যদিও তার ব্যবস্থাপত্রটি তাঁরই দেওয়া। অণিমানন্দ সেই পণ্ডিতের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর নামটি কোথাও লিখে যাননি।[৮]

প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য

স্থান কাল পাত্র নিয়ে মতভেদ থাকলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান যে হয়েছিল সে বিষয়ে সবাই একমত। কিন্তু তার কার্যকারণ নিয়ে দুটি বিরোধী মত চালু আছে। ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর ঠিক পরেই 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় (২ নভেম্বর ১৯০৭) লেখা হয়েছিল, 'সন্ধ্যায় উপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুধর্মের সনাতন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি হিন্দু হইলেন, শেষে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তেজনায় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থানুসারে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব আবার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেন। ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিলেন।...'[৯]

'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদকীয়-তেও (২৮ অক্টোবর ১৯০৭) তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছিল 'হিন্দু সন্ন্যাসী' বলে।[১০]

'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও ১৯১০ সালে লিখেছিলেন, '...আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকে যে যাহা বলুক ব্রহ্মবান্ধব কখনই খ্রীষ্টান নহেন, পরন্তু হিন্দুবুদ্ধিসম্পন্ন, চিরকুমার, সন্ন্যাসীমাত্র। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন—মৃত্যুকালে তিনি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী রূপেই দেহত্যাগ করেন।'[১১]

অন্যদিকে ফাদার ফালোঁ মনে করেন, 'তাঁর মৃত্যুর দু মাস আগে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর বর্ণাশ্রমবিধিলঙ্ঘনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। সেই প্রায়শ্চিত্ত-সাধনের ব্যাপারে তাঁর অনেক খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁর অনেক হিন্দু বন্ধু ভুল করে ভেবেছিলেন যে তিনি খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছেন। ব্রহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্ত ছিল একটি নিছক সমাজগত কর্তব্যপালন ;...

'ব্রহ্মবান্ধব তাঁর জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর খ্রীষ্টবিশ্বাস অম্লান ও অবিচলিতভাবে রক্ষা করেছেন।'[১২]

গোড়ায় অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও (বিশেষত দক্ষিণ ভারতের ক্যাথলিকদের মধ্যে)[১৩] এটাই বোধহয় এখন ভারতের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত মত।

বিষয়টি নিয়ে অনেক খোঁজখবর করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধবের সিন্ধী শিষ্য বি. অণিমানন্দ (কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে অনেকেই যাঁকে চিনতেন 'রেবাচাঁদ মাস্টার' বলে)। ব্রহ্মবান্ধবই তাঁকে ক্যাথলিক মতে নিয়ে আসেন। ১৯০৪-এ সারস্বত আয়তনে ছাত্রদের সরস্বতী পুজো করা নিয়ে গুরুর সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। ক্যাথলিক হয়ে এই হিন্দু পৌত্তলিকতা তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। আমরণ তিনি ক্যাথলিকই ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, বিলেত যাওয়ার অনেক আগেই, ১৯০১ সালে ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে গোময় খেয়ে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছিলেন।[১৪] অগস্ট ১৯০১ সংখ্যার 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি'তে প্রায়শ্চিত্তের সপক্ষে ব্রহ্মবান্ধব একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব শুধু নিজের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবেননি, ১৯০৩ সালে এক ব্রাহ্মণ ক্যাথলিককে দিয়ে তা করাতেও চেয়েছিলেন।[১৫] ফাদার টুম্‌স্ এস. জে. বলেছেন, পণ্ডিতরা ব্রহ্মবান্ধবকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, এ-প্রায়শ্চিত্ত একেবারেই 'সিভিল' বা সামাজিক,[১৬] অর্থাৎ এর কোন ধর্মীয় তাৎপর্য নেই। ফাদার কালোঁ এস জে.-ও লিখেছেন, ব্রহ্মবান্ধব 'পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নকে প্রায়শ্চিত্তক্রিয়ার আগে জানিয়েছিলেন যে, যীশুখ্রীষ্টে পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই তাঁর বিলাত যাত্রার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন।'[১৭] কিন্তু বি. অণিমানন্দ ও 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি'র সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায়, বিলেত যাত্রার (১৯০২) আগে থেকেই ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবছিলেন।

ফাদার কালোঁ যে-চিঠির কথা বলেছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ অবধি তার সন্ধান মেলেনি। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী অবশ্য অণিমানন্দকে বলেছিলেন, যে-যে পাপের জন্য ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন সেগুলো নির্দেশ করেই তিনি (ব্রহ্মবান্ধব) পঞ্চানন তর্করত্নকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তর্করত্ন কিন্তু অণিমানন্দকে বলেন, উপাধ্যায় তাঁর পাপের বিবরণ-সম্বলিত কোন চিঠি তাঁকে দেননি। বিলেত যাওয়ার অনেক আগেই প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। তার অনেক পরে, বিলেত থেকে ফেরার পর, আবার প্রায়শ্চিত্তের কথা ওঠে। তর্করত্ন আরও বলেন, 'আমি যতদূর জানি, উপাধ্যায় কখনো খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, তাঁর ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করার

কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না আর আমরাও এই আচার পালনের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে তা দাবি করি না।'[১৮]

প্রবোধচন্দ্র সিংহও লিখেছেন, ব্রহ্মবান্ধব 'প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেন। তবে যে তিনি খৃষ্টীয় ধর্মবিদ্বেষী হইলেন তাহা নহে—কারণ সকল ধর্মের উদ্দেশ্য সেই এক। দেশের প্রকৃতি-অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে মাত্র। হিন্দু অন্য কোন ধর্মকে নিন্দা করে না।'[১৯]

তাহলে ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলেন কেন? মনোরঞ্জন গুহও শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, 'ব্রহ্মবান্ধবের দেশপ্রেম প্রচারের ভাষা উত্তরোত্তর শাক্তভাবের উপমাবহুল হয়ে উঠছিল। শেষের কয়েকবছর খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা খুব কমে গিয়েছিল। চার্চেও যেতেন না। এইসব কারণে অনেকে মনে করেন যে ক্যাথলিক ধর্মে তাঁর আর বিশ্বাস ছিল না। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে শেষের দিকে এমন সব ভাবের কথা বলতেন যার সঙ্গে প্রচলিত খ্রীষ্টান মতে গ্রাহ্য ও মান্য কোন কোন বিশ্বাস বা ডগ্‌মার সামঞ্জস্য হয় না। তবে ধর্মের অন্তরে ডগ্‌মার অতীত যদি কিছু থাকে তাহলে ক্যাথলিক ধর্মের সেই অন্তরের বস্তু বৈদান্তিকের মস্তিষ্কে কোন্ নবরূপ নিয়েছিল কে জানে। সে যাই হক, ব্রহ্মবান্ধবের প্রকৃতি যেরূপ ছিল তাতে মনে হয় তাঁর জীবনে আর একটা বড় পরিবর্তন আসন্ন হয়ে এসেছিল যার প্রকাশ দেখা যেত যদি তিনি আরও কিছুকাল বাঁচতেন। কিন্তু কোন্ রূপে সেই পরিবর্তন দেখা দিত তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। কেবল এইটুকু বলা যায় যে, যে-রূপেই আসুক, বলতে হত—অপূর্ব!'[২০]

প্রায়শ্চিত্ত কোন্ মতে?

সমস্যা এখনও শেষ হয়নি। হিন্দুসন্তান প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে দু মতে। 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব'-কার রঘুনন্দন একরকম ব্যবস্থা দিয়েছেন, 'মিতাক্ষরা' ('যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা'র টীকা)-কার বিজ্ঞানেশ্বর আবার অন্য কথা বলেছেন। দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌ধৃত করে রঘুনন্দন বলেছেন, 'অজ্ঞানকৃত পাপ-সমূহই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়। এবং প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যবহার্যাও হয়, জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকারী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে বটে, কিন্তু ব্যবহার্য্য হইবে না, যেহেতু বচন দ্বারা ঐরূপই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে।'[২১] রঘুনন্দন যে-পাঠ ধরেছেন তাতে অবশ্য এই অর্থই হবে ('কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদেব জায়তে')। 'মিতাক্ষরা'-ধৃত পাঠ একটু আলাদা ('কামতো-

ব্যবহার্যস্তু বচনাদেব জায়তে'), তাতে অর্থ দাঁড়ায় : 'কাম অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পাপ কৃত হয় তাহা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত-বিধায়ক বচনবলে ইহলোকে ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে।'[২২]

সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'মিতাক্ষরা'-মতে প্রায়শ্চিত্তের ফলে পাপীর পাপক্ষয় হবে না, তবে সমাজে ব্যবহার্য হবে। রঘুনন্দনের মত ঠিক উল্টো : পাপক্ষয় হবে, কিন্তু ব্যবহার্য হবে না। রঘুনন্দন আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'পাপের দুই শক্তি—নরক-উৎপাদিকা ও ব্যবহার-বিরোধিকা। (প্রায়শ্চিত্ত করে) এক শক্তি বিনাশ হলেও ব্যবহার-বিরোধিকা শক্তি থেকে যায়।'[২৩]

'মিতাক্ষরা'-মত বাংলায় চলে না। রাঢ়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে রঘুনন্দন-মতে প্রায়শ্চিত্ত করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কারও কারও মনে হয়েছিল, ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন 'মিতাক্ষরা'-মতে। পঞ্চানন তর্করত্নের জনৈক পুত্র অণিমানন্দকে সে-কথাই বলেছিলেন।[২৪] অন্য পুত্র 'সুজীব দেবশর্মা' (শ্রীজীব দেবশর্মা ?) প্রথমে তা-ই বলেন। তিনি জানান, 'নায়ক' পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন, পঞ্চানন তর্করত্ন তার উত্তরও দিয়েছিলেন। শেষে তিনিই আবার বলেন, ব্রহ্মবান্ধব আসলে কোন্ মতে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন—রঘুনন্দন না 'মিতাক্ষরা'—তা তিনি জানেন না।[২৫]

পঞ্চানন তর্করত্ন স্বয়ং অণিমানন্দকে বলেন, বাঁকুড়ার এক উকিলের ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের ব্যবস্থাপত্রের সঙ্গে তাঁর ছেলে উপাধ্যায়ের বিষয়টি গুলিয়ে ফেলেছেন। বাঁকুড়ায় 'মিতাক্ষরা'-মতে প্রায়শ্চিত্ত চলে।[২৬] এর থেকে অনুমান করা যায়, উপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল রঘুনন্দন-মতে।

মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী অণিমানন্দকে বলেন, উপাধ্যায় রঘুনন্দন-মতেই প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। অণিমানন্দ প্রশ্ন করেন, সমাজে পুনঃপ্রবেশই যদি উপাধ্যায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তিনি রঘুনন্দন-মতে প্রায়শ্চিত্ত করতে গেলেন কেন? সামাধ্যায়ী, অণিমানন্দের মতে, তার কোন নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারেননি।[২৭]

অণিমানন্দের প্রশ্নটা খুবই যুক্তিযুক্ত। সমাজে ব্যবহার্য হতে চাইলে 'মিতাক্ষরা'-মতেই প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার ছিল, রঘুনন্দন-মতে তার কোন সুবিধাই হবে না। ১৯১৪ সালেও বাংলার ব্রাহ্মণসভা এই সিদ্ধান্তে অটল ছিল : যাঁরা সমুদ্র-যাত্রা করেন তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত করলেও সমাজে অচল হয়েই থাকবেন। রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সে নিয়ে 'ভারতবর্ষে' (আষাঢ়

১৩২১ বঙ্গাব্দ) এক কড়া প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আমি যতদূর জানি, ইহাতে হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।···ব্রাহ্মণ-সমাজের এতগুলি 'পণ্ডিত' আপনাদিগকে উপহাসাস্পদ করিতেছেন,—ইহা হিন্দুসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তিরই সন্তোষের কারণ হইতে পারে না।'[২৮]

পঞ্চানন তর্করত্ন অণিমানন্দকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'হিন্দুসমাজে ঢোকার কোন ইচ্ছাই উপাধ্যায়ের ছিল না।'[২৯] অণিমানন্দ এই কথায় কোন গুরুত্ব দেননি। ফাদার টুম্স্-ও গোটা ব্যাপারটাকে সামাজিক অপরাধক্ষালন ('সোশ্যাল পেন্যান্স') বলে ধরে নিয়ে প্রায়শ্চিত্তরত ব্রহ্মবান্ধবের মুখে এক কাল্পনিক সংলাপ বসিয়েছেন। '···তিনি (মন্ত্র) পড়লেন: 'স্বধর্মত্যাগং'—"কেন? আমার আবেদনপত্রে ও কথা ছিল না। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণের জন্য সামাজিক অপরাধক্ষালন হিসেবে আমি এটা করছি, হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশের উদ্দেশ্যে।" '[৩০] ব্রহ্মবান্ধব একথা বলে থাকতে পারেন (কার মুখ থেকে ফাদার টুম্স্ এই বিবরণ শুনেছিলেন তার নাম তিনি দেননি), কিন্তু রঘুনন্দন-মতে প্রায়শ্চিত্ত করে যে হিন্দুসমাজে ফেরা যায় না—সেটা, আর কেউ না জানুন, ব্রহ্মবান্ধব নিশ্চয়ই জানতেন। তাঁর পক্ষে এ কথা বলা অর্থহীন।

সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য ও পরিণাম নিয়ে হিন্দু ও ক্যাথলিক—দুপক্ষেরই সংশয় থেকে যায়।

প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র

পঞ্চানন তর্করত্নকে ব্রহ্মবান্ধব যে-চিঠি দিয়েছিলেন আজও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী অণিমানন্দকে মোটামুটি বলেই দিয়েছিলেন, তিনি সেটি হারিয়ে ফেলেছেন।[৩১] সৌভাগ্যবশত পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থাপত্রটি প্রবোধচন্দ্র সিংহের বইতে ছাপা আছে। সেটি সংস্কৃতে লেখা, সঙ্গে একটি বাংলা চিঠিও ছিল (দুর্ভাগ্যবশত কোন তারিখ দেওয়া নেই)। ভালো করে পড়লে বোঝা যায়: ব্রহ্মবান্ধব ব্যবহার্যতা ফিরে পেতে চাননি, চেয়েছিলেন পাপক্ষয় করতে। আর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও রঘুনন্দন-অনুসারী। এ নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করা যাক।

ব্যবস্থাপত্রটি অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়:

'সজ্ঞানে স্বধর্মত্যাগ, ধর্মান্তর গ্রহণ, ম্লেচ্ছ দেশ গমন, নিয়ত নিষিদ্ধ অভোজ্য অন্ন ভোজন ইত্যাদি জনিত পাপ ক্ষয় করতে ইচ্ছুক হয়ে যিনি (সে-কথা)

লিখে জানিয়েছেন, স্বরূপবান্ ব্রাহ্মণকে দিয়ে বৈধ ভক্তিপূর্বক গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁর আবার উপনয়ন (গ্রহণ করা উচিত)। তা না পারলে তার অনুকল্প চান্দ্রায়ণ, তা না পারলে আটটি ধেনু দান, তা না পারলে তার মূল্য (স্বরূপ) সাড়ে বাইশ কার্ষাপণ বা সমান মূল্যের রূপো ইত্যাদি দক্ষিণা সমেত দান করা কর্তব্য। এই প্রায়শ্চিত্তের আগেও তাঁর (প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির) সন্ধ্যাবন্দনা ইত্যাদি নিত্যকর্মে অধিকার আছে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের পরেও (থাকবে)—বিদ্বানদের এই পরামর্শ।'[৩২]

পঞ্চানন তর্করত্ন এটিকে ব্রহ্মবান্ধবের চিঠির উত্তর ('অস্যোত্তরম্') বলেই উল্লেখ করেছেন। এর সঙ্গে পঞ্চানন তর্করত্ন একটি বাংলা চিঠি দিয়েছিলেন। সেটি আরও চিত্তাকর্ষক :

শ্রীরাম।

শুভাশীর্ব্বিজ্ঞাপনম্।

ব্যবস্থা-শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও বিনামুল্যে এরূপ ব্যবস্থা দিতে কাপুরুষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিবে না; পূর্ব্বে কেহ কেহ স্বীকার করিলেও কার্য্যকালে পশ্চাৎপদ হইতেছে। তা হউক, আমি শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াই আপনাকে এই ব্যবস্থা নিঃশঙ্কচিত্তে প্রদান করিতেছি; আপনি ভক্তিসহকারে পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া শিখাসহ মস্তকাদি মুণ্ডন করিবেন, পরদিন প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পর গায়ত্রীজপ ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া গঙ্গা যে পতিতপাবনী ইহা মনে মনে বিশ্বাস করতঃ ভক্তিভরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিবেন। অনন্তর পুনরুপনয়ন বা চান্দ্রায়ণ, অভাবে ২২॥০ কাহন কড়ি বা পাঁচ টাকা দশ আনা মূল্যের খাঁটিরূপা উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ্যর্থ পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবেন, পরে গোগ্রাস প্রদান করিবেন। একটী সদ্ ব্রাহ্মণ পুরোহিত আবশ্যক। ইতি

(স্বাক্ষর) আশী—

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ।

এইরূপ করিলে আপনি বিশুদ্ধ হইবেন। যতদিন প্রায়শ্চিত্ত না করেন, ততদিন ত্রিসন্ধ্যা করিবেন, প্রায়শ্চিত্তান্তে ত করিবেনই। ঐরূপ অকার্য্য আর কখন করিব না, ইহা স্থির রাখিবেন। ইতি

ব্যবস্থাপত্রের বিশেষত্ব

অর্থলোভী কাপুরুষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সম্পর্কে পঞ্চানন তর্করত্ন যে-কটাক্ষ করেছেন তা একেবারে অকারণ নয়। স্মার্তদের হাতে পড়ে 'সনাতন ধর্মে'র

অবস্থা দাঁড়িয়েছিল বিপরীত-চক্রব্যূহের মতো : বেরোনোর পথ খোলা আছে কিন্তু ঢোকার বা ফিরে আসার উপায় নেই। এখনও অনেক গোঁড়া হিন্দু এই ব্যবস্থাপত্র পড়ে কোন মতামত দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। স্বয়ং পঞ্চানন তর্করত্ন এই ব্যবস্থা দিয়েছেন, সুতরাং মুখ ফুটে 'না' বলতে পারেন না। কিন্তু সমস্ত সংস্কার ও শাস্ত্রবুদ্ধি তার বিরোধিতা করতে চায়।

পঞ্চানন তর্করত্ন যে-ব্যবস্থা দিয়েছেন সেটি তর্করত্নেরই উপযুক্ত। ব্রহ্মবান্ধবের ঘটনাটি এমনই অনন্য যে প্রাচীন বা নব্যস্মৃতির কোথাও তার কোন উল্লেখ নেই। তর্করত্ন তাই তাঁর ব্যবস্থার ভিত্তি করলেন রঘুনন্দনের গঙ্গামাহাত্ম্য-কীর্তনকে। 'মহাভারত' থেকে উদ্ধৃত করে সেখানে বলা হয়েছে, শত অকার্য করেও কেউ যদি গঙ্গাস্নান করে, তুলোর পেঁজার ওপর আগুনের মতো গঙ্গাজল সবকিছু দহন (নাশ) করে।[৩৩] এর থেকে তর্করত্নের সিদ্ধান্ত : 'সর্বং দহতি' মানে স্বধর্মত্যাগ, পরধর্মগ্রহণ ইত্যাদি সব পাপই গঙ্গাস্নানে ক্ষয় হবে। আপস্তম্ব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রঘুনন্দন বলেছেন, অন্ত্যজের উচ্ছিষ্ট খেয়ে থাকলে ব্রাহ্মণকে চান্দ্রায়ণ করতে হবে।[৩৪] অন্যত্রও তিনি বলেছেন, জ্ঞানত চণ্ডাল ইত্যাদির অন্ন খেলে চান্দ্রায়ণ কর্তব্য, 'তাহাতে অশক্ত ব্যক্তি ৮টী ধেনুদান করিবে, যাহার অনুকল্প ২২॥০ কাহন কড়ি দান।'[৩৫] আবার, 'চাণ্ডালান্ন ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে, মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি "উপনয়ন, চান্দ্রায়ণের তুল্য" এই বাক্যদ্বারা উপনয়নকে চান্দ্রায়ণের তুল্যরূপে সঙ্কলন করায়, যে ব্যক্তি পুনর্ব্বার উপনয়ন সংস্কার করিতে অসমর্থ হইবে, সে চান্দ্রায়ণের অনুকল্প আটটি ধেনু, অথবা তাহার মূল্য সাড়ে বাইশ কাহন কড়ি দান করিবে।'[৩৬]

দেখাই যাচ্ছে, গঙ্গাস্নান, উপনয়ন বা তার অনুকল্পের ক্ষেত্রে তর্করত্ন পদে পদে অনুসরণ করেছেন রঘুনন্দনকেই। ব্রহ্মবান্ধব আবার উপবীত ধারণ করেছিলেন (খালি গায়ে উপবীত সুদ্ধু তাঁর ছবিও আছে), সুতরাং কোন অনুকল্পের আশ্রয় নিতে হয়নি।

প্রায়শ্চিত্তের পরিণাম

আশা করি ওপরের আলোচনা থেকে অন্তত এই ব্যাপারটুকু পরিষ্কার হয়েছে যে, ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন রঘুনন্দন-মতেই। তাতে পাপক্ষয় হলেও সামাজিক ব্যবহার্যতা আসে না। সামাজিক ব্যবহার্যতা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথাও ছিল না—থাকার কথাও নয়। তাঁকে তো আর ছেলের পৈতে বা মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না। অণিমানন্দকে পঞ্চানন তর্করত্ন সে-

কথা বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, ব্রহ্মবান্ধবের পাপ হয়েছিল ব্রাহ্মণের কর্তব্য লঙ্ঘন করায়, যেমন উপবীত ত্যাগ, সন্ধ্যাহ্নিক বর্জন, ম্লেচ্ছদের সঙ্গে মেলামেশা ও আহার। 'স্বধর্মত্যাগ' বলতে তিনি এগুলোই বুঝিয়েছিলেন।[৩৭] শুধু খৃস্টধর্ম গ্রহণের জন্য ব্রহ্মবান্ধবের কোন প্রায়শ্চিত্ত করার দরকারই ছিল না। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পূজ্যপাদ পিতৃদেবের [পঞ্চানন তর্করত্নের] ব্যবস্থানুসারে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন—বিলাতযাত্রা ও ম্লেচ্ছান্নভোজনের জন্য। খৃষ্টান ধর্মগ্রহণের জন্য, প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন ছিল না। জাতি বা ধর্ম হইল জন্মগত, জাতি=জন্ ধাতু+ক্তি। সুতরাং জর্ডন নদীর জল মাথায় দিলে বা কোরাণের দুই চারিটি বয়েদ পাঠ করিলে হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না। জাতি—নিত্য, হিন্দুত্বও নিত্য। হিন্দুধর্মও জন্মগত সনাতন। হিন্দু যদি খৃষ্টান বা মুসলমান বিবাহ করে, তবেই তাহার সন্তান অহিন্দু হইবে। এই হিন্দুভাব ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় পিতৃদেবের নিকট শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করার পর তিনি সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

'আমাদের বাটীতে ৺অন্নপূর্ণাপূজার সময়ে তিনি দালানে বসিয়া উক্ত মূর্তি দর্শন করিতে করিতে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন—আমারও এখনও সে দৃশ্য পূর্ণ ভাবে স্মরণ আছে।'[৩৮]

জন্মগত হিন্দুত্ব সম্পর্কে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের এই মত সব স্মার্ত মানবেন কিনা জানি না (অনুমান করি, মানবেন না), কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব এ কথা জেনেই প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। আসলে এটি ছিল অন্য এক উত্তরণের প্রস্তুতি।

অণিমানন্দকে পঞ্চানন তর্করত্ন আরেকটি কথা বলেছিলেন: 'উপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল সন্ন্যাসী হওয়া। আমি তাঁকে তাই বলেছিলাম, উপবীত ফেলে দিয়ে তারপর সন্ন্যাসী হওয়া একেবারেই স্বেচ্ছাচারিতা হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁর প্রথমে ব্রাহ্মণ হওয়া চাই, তারপরে যথাবিধি আচার-অনুষ্ঠান করে সন্ন্যাসী হবেন।'[৩৯] এ বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সিংহের সাক্ষ্যও একই কথা বলে। 'তাঁহার এই প্রায়শ্চিত্তের আর একটি কারণ তিনি সন্ন্যাসীর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কখন বিধি অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তিনি একবার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিব, পরে বিধি অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।

'ভারতী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইবার তাঁহার অত্যন্ত অভিলাষ ছিল।

অভিলাষ কতকটা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—সম্পূর্ণ করিবার অবসর পান নাই।

'ভারতী সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত। শঙ্কর তাঁহার দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রদায়কে সমাজের মধ্যে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিবার অধিকার দিয়াছেন।'[৪০]

ভারতের ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী যদি মনে করেন, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত নিয়ে, নিত্য সন্ধ্যাহ্নিক করে, কৃষ্ণকে অবতার জ্ঞান করে, কালী ও অন্নপূর্ণার বিগ্রহ ভক্তিভরে দর্শন করেও ব্রহ্মবান্ধব 'তাঁর জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর খ্রীষ্টবিশ্বাস অম্লান ও অবিচলিতভাবে রক্ষা করেছেন'—তাঁদের যদি এসবে কোন আপত্তি না থাকে—তাহলে আমাদেরও কোন আপত্তি নেই। ধর্মমতের প্রশ্নটা, গোড়াতেই বলেছি, আমাদের কাছে গৌণ। কিন্তু ক্যাথলিক সন্ন্যাসে সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রহ্মবান্ধব হঠাৎ হিন্দুমতে সন্ন্যাস নিতে এত আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন? ক্যাথলিক হয়েও তিনি তো হিন্দু সন্ন্যাসীর আচারই মেনে চলতেন। গেরুয়া কাপড় আর চাদর পরতেন, খালি পায়ে ঘুরতেন। এই নিয়ে ফাদার স্ক্যালিঞ্জার-এর সঙ্গে প্রথম দিনেই তাঁর ঠোকাঠুকি লাগে। হায়দ্রাবাদের ধর্মমণ্ডলী তাঁকে অনুমতি না দেওয়ায় বোম্বাই-এর আর্কবিশপ-এর কাছে তিনি গেরুয়া পরার অনুমতি চান (লাহোরের বিশপ অবশ্য তাঁকে আগেই সে-অনুমতি দিয়েছিলেন)।[৪১] আবার গোটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গেরুয়া গায়ে কাটানোর পর 'সন্ধ্যা'র মামলার সময়ে তিনি গেরুয়া ছেড়ে সাদা ধুতি-চাদর পরে আদালতে হাজিরা দিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়: এ ছিল পুরোহিতের বেশ, 'সন্ধ্যা'র মুদ্রাকর হরিচরণ দাস গিয়েছিলেন বর সেজে![৪২] ফিরিঙ্গির সাধ্য নেই আমাকে জেলে পোরে—এই ছিল তাঁর গর্বিত উক্তি।

প্রায়শ্চিত্তের অব্যবহিত কারণ

সমসাময়িক অন্যান্য সাক্ষ্য মিলিয়ে বরং মনে হয়—'সন্ধ্যা'র মামলা ছিল ব্রহ্মবান্ধবের কাছে এক অগ্নিপরীক্ষা। 'বন্দে মাতরম্' বেরোবার কিছুদিন পরেই অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। আড়ালে বলা হতো, 'সন্ধ্যা'য় অত কড়াভাবে ও কাঁচা ভাষায় বৃটিশ শাসকদের গালমন্দ ও বিদ্রূপ করা হয়, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা থাকে, তবু রাজদ্রোহিতার দায়ে কাগজ কেন বন্ধ হয় না, সম্পাদক গ্রেপ্তার হয় না (যেমন হয়েছিল 'যুগান্তর'

ও 'বন্দে মাতরম্'-এর ক্ষেত্রে)! কেউ কেউ তাঁকে 'জেসুইট' বলে সন্দেহ করতেন ('ম্যাকবেথ'-পড়া বাঙালীর কাছে তার অর্থ দাঁড়িয়েছিল—দুমুখো লোক, শপথ করেও যে দিব্যি মিথ্যেকথা বলতে পারে)। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই প্রায়শ্চিত্ত-ঘটিত গোলকধাঁধায় অনেকখানি বিভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও[৪৩] এ-কথাটা ঠিকই বলেছেন, দেশের লোকের অবিশ্বাস ও সন্দেহ তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। 'আমার বোধহয় এই সব কারণ তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি ঘোর জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

'দেশের জন্য প্রায়শ্চিত্তে প্রস্তুত! অথচ কেউ কেউ তাঁকে সন্দেহ করে। এই সন্দেহ আমাদের কোন বৈপ্লবিক নেতার মুখেও শুনিয়াছি।...তাঁর স্বাদেশিকতাই তাঁকে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রবেশে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা তাঁকে খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক এবং ভারতের স্বাধীনতাকামী বলিয়াই জানিয়াছিলাম।—তিনি বাংলার এবং ভারতের একজন মহান্ পুরুষ ছিলেন।'[৪৪]

হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশের প্রশ্নটা অবান্তর—আগেই আমরা সে নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের অব্যবহিত কারণ হিসেবে এই সন্দেহভঞ্জনের প্রশ্নটিই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। বিলেত যাওয়ার আগে থেকেই তিনি প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবছিলেন। কিন্তু করেননি। বিলেত থেকে ফিরে আসার পরেও না। ১৯০৭-এর ৩০ অগস্ট থেকে ২৭ অক্টোবর ব্রহ্মবান্ধবের মনের মধ্যে কত কথা উঠেছিল তা আর আমাদের জানার উপায় নেই। অবশেষে প্রায়শ্চিত্ত করে, এবং ফিরিঙ্গির আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে ব্রহ্মবান্ধব আবার তাঁর দেশবাসীর পূর্ণ আস্থা ফিরে পেলেন। হিন্দুমতেই তাঁর দেহ নিমতলা শ্মশানে দাহ করা হলো। যে বিরাট শোভাযাত্রা তাঁর শবানুগমন করেছিল, চিতাভস্মের জন্যে কাড়াকাড়ি করেছিল, 'বন্দে মাতরম্'-এর ভাষায়, 'রাজারাও তা ঈর্ষা করতে পারেন'।[৪৫]

প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে দিয়েই ব্রহ্মবান্ধব তাঁর দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিয়ে গেলেন। আমাদের কাছে আজ তা যতই অদ্ভুত লাগুক, ব্রহ্মবান্ধবের মনে হয়েছিল, এর দরকার আছে। সে দরকারটা ধর্মীয় নয়, সামাজিকও নয়, রাজনৈতিক। 'সন্ধ্যা'র অনুষ্ঠানপত্রে (১৯০৪) তিনি লিখেছিলেন, 'যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাকিও।'[৪৬] প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি সেই হিন্দুত্বে ফিরে এলেন।

টীকা

১. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, 'আমার ভারত উদ্ধার' ('স্বরাজ', ১২ ও ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪)। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১, পৃ. ৯-১০-এ উদ্ধৃত।

২. বি. অণিমানন্দ, 'দ ব্লেড', কলকাতা : রয় অ্যাণ্ড সন, [১৯৪৯], পৃ ১৮৩ ; ফাদার পিয়ের ফার্লোঁ, "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১-১৯০৭", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮, পৃ: ১৯১। যোগেশচন্দ্র বাগল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-এ বলেছেন, 'সন্ধ্যা'র মামলা শুরু হওয়ার (২৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) 'দুই মাস পূর্বে'।

৩. 'দ ব্লেড', পৃ. (সাত)।

৪. প্রবোধচন্দ্র সিংহ, 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব', উত্তরপাড়া : অমরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তারিখ নেই, পৃ. ৯৯। এটাই ঠিক বলে মনে হয়। হয়তো তার প্রস্তুতি চলছিল আরও আগে থেকে।

৫. হরিদাস মুখোপাধ্যায়-উমা মুখোপাধ্যায়, 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ', কলকাতা : ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র ভূমিকা, পৃ. [ষোল] ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম', কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৩, পৃ. ১৩৮ (ঘটনার সময় হিসেবে '১৯০৮' ছাপা আছে, হবে ১৯০৭)।—শিখা থাকার অর্থ অবশ্য এই : তখনও উপনয়ন সংস্কার হয় নি।

৬. 'দ ব্লেড', পৃ. (সাত)।

৭. 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম', পরিশিষ্ট—ঙ, পৃ. ২১১।

৮. 'দ ব্লেড', পৃ. ১৬৫-৬৬, ১৮৩।

৯. বাগল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-য় উদ্ধৃত।

১০ ঐ, পৃ ৫৪-য় উদ্ধৃত।

১১. 'সমাজ-তত্ত্ব' (১৯১০)-এর ভূমিকা। বাগল, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৯-৬০-এ উদ্ধৃত।

১২. ফার্লোঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯১।

১৩ 'দ ব্লেড', পৃ. ১৬২ দ্র.।

১৪. ঐ, পৃ ১৫৯।

১৫. ঐ, পৃ (ছয়)-(সাত)।

১৬ ঐ, পৃ. (সাত)।

১৭. ফার্লোঁ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১।

১৮ 'দ ব্লেড', পৃ. ১৬৬।

১৯. সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

২০. মনোরঞ্জন গুহ, 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', বর্ধমান : শিক্ষা-নিকেতন, [১৩৮৩], পৃ. ৮১।

২১. রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্', হৃষীকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত ও অনূদিত, কলকাতা : [বঙ্গবাসী], ১৩৩৫, 'স্ত্রিয়া অপি তুল্যপ্রায়শ্চিত্তম্'-অংশ, পৃ. ৩৫৫।

২২. 'মিতাক্ষরা', প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-অনুবাদিত ও পরিশোধিত, বর্ধমান, ১৮১০ শক (১৮৮৮ খৃ.), যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩।২২৬-এর ভাষ্য, পৃ ১৮০।

২৩. রঘুনন্দন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬।

২৪. 'দ ব্লেড', পৃ. ১৬৩।

২৫. ঐ, পৃ. ১৬৪।

২৬. ঐ, পৃ ১৬৬।

২৭. ঐ, পৃ. ১৬৭।

২৮. রামমোহন রায়ের বিলেত যাওয়া নিয়ে এই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিশদ আলোচনার জন্য, বটুকনাথ ভট্টাচার্য, 'দ কলিবর্জ্য-স অর প্রোহিবিশন্‌স্ ইন দ 'কলি' এজ', কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩, পৃ ১০০-১০২ ও ১৮৫-১৮৬ দ্র.।

২৯. 'দ ব্লেড', পৃ. ১৬৬।

৩০. ঐ, পৃ. (সাত)।

৩১. ঐ, পৃ ১৬৭।

৩২. মূল ব্যবস্থাপত্রটি এই : জ্ঞানকৃত-স্বধর্মত্যাগ-ধর্মান্তরগ্রহণ-ম্লেচ্ছ-দেশগমন-নিয়তবারাভোজ্যান্ন-ভোজনাদি-জনিত-পাপক্ষয়ার্থিনা লিপিবিজ্ঞাপিত-স্বরূপবান্-ব্রাহ্মণেন বৈধভক্তিপূর্ব্বক-গঙ্গাস্নানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা পুনরুপনয়নং —তদশক্তৌ তদনুকল্প—চান্দ্রায়ণং—তদশক্তৌ ধেন্বষ্টকদানং—তদশক্তৌ তন্মূল্যং সার্ধদ্বাবিংশতি-কার্ষাপণী—লভ্যরজতাদিদানং বা সদক্ষিণকং কর্ত্তব্যং। এতৎ প্রায়শ্চিত্তাৎ প্রাগপি তস্য সন্ধ্যাবন্দনাদৌ নিত্যকর্মস্বধিকারোঽস্তি কৃত-প্রায়শ্চিত্তাযুত সুতরামেবেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

(স্বাক্ষর) ভট্টপল্লীবাসি-তর্করত্নোপাধিক-
শ্রীপঞ্চানন দেবশর্মণাম্।

—সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২-১১৩।

৩৩. রঘুনন্দন, পূর্বোক্ত, অথ চান্দ্রায়ণাদৌ ভোজনপরিসঙ্খ্যা-অংশ, পৃ. ১২৮।

৩৪. ঐ, স্ত্রিয়া অপি তুল্যপ্রায়শ্চিত্তম্-অংশ, পৃ. ৩৭৩।

৩৫. ঐ, প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থাসঙ্ক্ষেপঃ-অংশ, পৃ. ৩৯১।

৩৬. ঐ, অথ গোমাংসাদিভক্ষণ প্রায়শ্চিত্তম্-অংশ, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

৩৭. 'দ ব্লেড', পৃ. ১৬৫-১৬৬।

৩৮. ব্যক্তিগত পত্র, ২৮।২।১৯৮৬।—ব্রহ্মবান্ধবকে দেখেছেন বলে মনে করতে পারেন এমন আর কেউ বোধহয় জীবিত নেই। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের বয়স এখন ৯৬।

৩৯. 'দ ব্লেড', পৃ. ১৬৫।

৪০ সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

৪১. 'দ ব্লেড', পৃ. ৫৯।

৪২. উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়', কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৬৯, পৃ ১০৯ দ্র.।—যোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আত্মসমর্পণের দিন তিনি [ব্রহ্মবান্ধব] চেলির কাপড় ও টোপর পরিয়া গিয়াছিলেন' ("আমার দেখা লোক", 'প্রবাসী' ভাদ্র ১৩৪২, পৃ. ৬২৩)।

৪৩ ভূপেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ব্রহ্মবান্ধব 'মিতাক্ষরা'-মতে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। 'বাঙ্গলার ইতিহাস', কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২০৩ দ্র.। (অজস্র ছাপার ভুলে অনেক জায়গায় মানে করা শক্ত!)

৪৪. হরিদাস মুখোপাধ্যায়-উমা মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের (সূত্র ৫ দ্র.) ভূমিকা, পৃ. [আঠার]-[উনিশ]।

৪৫. বাগল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-য় উদ্ধৃত।

৪৬. ঐ, পৃ. ৩৪-এ উদ্ধৃত।

প্রবন্ধটির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন শ্রীমধুসূদন বেদান্ততীর্থ, শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ও অধ্যাপিকা সুব্রতা সেন। পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থাপত্রের সপক্ষে লিখিত মন্তব্য জানিয়েছেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ বেদস্মৃতিতীর্থ, শ্রীভূতেশচন্দ্র তর্কস্মৃতিতীর্থ, শ্রীরক্ষাকর স্মৃতিতীর্থ, শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীহিমাংশুকুমার স্মৃতিতীর্থ। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব অবশ্য তাঁদের নয়, লেখকের।

জাগার রাত

কার্তিক লাহড়ী

শীতের সময় নদী শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়

দু-ধারের বালি, মাটি চুপচাপ স্রোতের টুটি চেপে ধরে, ভরা বর্ষার পাল্টা শোধ নেয় যেন এখন পৌষের মাঝামাঝি; দিনের বেলা তাপমাত্রা উনিশ-বিশের কাছাকাছি থাকে, রাতে আট ডিগ্রি সেল্সিয়াসে নামে, ভোরের দিকে আরো নীচে

তখন কুয়াশা আরো নড়ে চড়ে বেড়াতে পায় না, জমাট বেঁধে গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, নদী-নালা একাকার করে দেয়, আর পশলা বৃষ্টির মতো আলতো ভাবে ভেজায় সব কিছু ফোঁটা-ফোঁটা শিশির

পরী এসবের কিছু জানে না

গভীর খুব রাতে ঘুমের মধ্যে এলোপাতাড়ি কিল চড় লাথি খেয়ে জেগে ওঠে মাত্র; ঘুম থেকে উঠলে যেমন হয়—প্রথমে বিশ্বাস হতে চায় না, স্বপ্ন বলেই মনে হয় তবু এইসব···

সে চোখ কচলিয়ে ঘুম তাড়াতে চাওয়ার আগে, কিয়েরে খুই সতীরে শাসায় আইচস্, সঙ্গে সঙ্গে চুলের মুঠি ধরে মুখে ঘুষি কয়েকটা খেতে বুঝতে পারে—এ এক বাস্তব ঘটনা, রোজই ঘটে থাকে। কখনো ঘুমের আগে, ঘুমের মধ্যে কোনোদিনওবা স্বামী বাড়ি ফিরে এলে তবে

পরী আগে হাউমাউ করে উঠত, দুলালের গায়ে হাত না ওঠালেও তার চিৎকারের সমান তালে সে-ও চিৎকার করতে থাকত, কিন্তু দিনের পর দিন ঘটনা একই ঘটতে থাকলে করার কিছু থাকে না আর, কারণ দুলাল মদ খাবেই, বাড়ি এসে তাকে পিটবেই হৈ-চৈ করে, তাই সে সরব প্রতিবাদের বদলে চুপচাপ হয়ে যায়, সোয়ামি তো ইডা করবোই, মিছে ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে লাভ কী অতএব

পরী দেখেছে, তার মা-কে সহ্য করতে, দেখেছে পাড়ার অন্যান্য বৌ-ঝিদের, কেউ কেউ তাদের মধ্যে এখনো হাউমাউ করে, সময় সময় স্বামীকে বাধা দিতে আঁচড়-টাচড়ও দেয়, চুপচাপ হয়ে যায় শেষে অবশ্য, স্বামীর দৌরাত্ম্য মেনে নেওয়াই নিয়তি যখন, মেয়ে হয়ে জন্ম হয়েছে তাদের তাই

হাঁ, পরী আজ গিয়েছিল সতীর কাছে, কিছু বলার জন্য নয়, দেখার জন্যই—হয়ত তাতে ঈর্ষার ভাগ জুড়েছিল সবখানি, কারণ এই মেয়েটি-ই তার কপাল ভাঙছে, কীকরে কেন ভাঙছে—এসব পরখ করতে পরী যায় নি অবশ্য, দেখতেই গিয়েছিল কেবল, ফিরেও আসছিল চুপচাপ, কিন্তু সতীর কথায় জ্বালা ধরানো খোঁচাখানায় সে নিজেকে সামলে রাখতে পারে নি আর, আচ্ছাসে শুনিয়ে এসেছিল কথা, হাতও তুলেছিল কয়েকবার যদিও সে-হাত সতীর শরীর ছোঁয় নি কখনো

কিয়েরে তুই সতীর গাও হাত তুইলচস্ ?

আজ দুলাল মদ খেয়ে আসে নি, তার মুখ থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে না, অথচ এখন তার রাগ চণ্ডালের চেয়েও চূড়ান্ত, সে পরীকে শরীরের যেখানে সেখানে কিল, চড়, ঘুষি, লাথি মেরে চলছে ; আর পরী কেবল তার পেটকে আগলে টাগলে রাখছে, সেখানে আর একজন বাড়ছে আস্তে আস্তে তার শরীর শুষে শুষে তার শরীরের অংশ হয়ে খুব। সে কখনো ডান হাত কখনো বাঁ হাত পেটের উপর রাখছে, কখনো বা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে দিচ্ছে শরীরের উত্তমাঙ্গ পেটের উপর খুব

আর দুলাল কিল চড় লাথির সঙ্গে সঙ্গে কি যেন খুঁজে চলেছে, আইজ তরে কাইট্যালামু, সতীরে আমি বিয়া করমুই করমু, তরে আমি···

পরী বুঝতে পারছে, সে দা খুঁজছে, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত জানে—দা দুলাল খুঁজে পাবে না এই মুহূর্তে এখন

তর্ কিতা আসে (আছে), না রূপ না জৈবন, সতীর যুগ্য নি তুই, আমি বিয়ায় বইমু তার লগে, তর কিতা রে হারামজাদি···কথার সঙ্গে সঙ্গে দুলালের হাত-পা চলার বিরাম নেই কোনো। সে পরীর চোখে মুখে নাকে দুমদাম মারতে থাকে ঘুষি, বাইর হ, অহনই বাইর হ···

পরী মুখ বুজে সেই এলোপাতাড়ি মার সহ্য করে যাচ্ছে তবু, আর দেখে অবাক হচ্ছে—এর মধ্যেও তার তিন বছরের আবু নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে চলেছে কেমন

অন্যদিন সে জেগে ওঠে, বাবার হৈ-হৈ মূর্তি দেখে বোবা কালা হয়ে মা-র শরীর জাপটে ধরে, কখনো ঐ শরীরে লীন হয়ে গিয়ে বাবা-র চড়-চাপট থেকে মা-কে রক্ষা করে, আর ভয়ে ভয়ে বাবাকে দেখতে থাকে ঐ অন্ধকারের মধ্যে

পরী কোনো প্রতিবাদই করছে না এখন, শুধু কুঁজো হয়ে হয়ে গলা ঘাড় পেটের উপর চাপিয়ে দিয়ে পেট-টা বাঁচাতে চাইছে, অন্য কোথাও কিল চড়

লাগলে ক্ষতি তেমন নেই, কিন্তু এখানে ঘা লাগলেই সে আর বাঁচাতে পারবে না তাকে, যে আসবে কিছুদিন পরে এবার

পরী মুখ বুজে আছে, আর ওদিকে পায়ে পাছায় লাথি মারতে মারতে দুলাল বাইর হ, বাইর হ বলতে বলতে যখন তাকে ঘরের বাইরে ঠেলে দেবে দেবে, সে দৌড়ে চলে আসে আবুর কাছে ঠিক তখন

আবু-রে লৈতে চাস ?

মুখে একটা দারুণ ঘুষি ও তলপেটে বেমক্কা লাথি ঝাড়ে সেও, মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পরী ভয়ে শিটিয়ে যায়, আর সে বাঁচাতে পারবে না বোধহয় তাকে, সে টের পাচ্ছে দুলাল তাকে লাফাতে লাফাতে ঘরের বার করে দিচ্ছে

প্যাটে মাইরেন না, হে বেডা বাঁচতো না তৈলে, পাও পড়তাসি আপনের, প্যাটে মাইরেন না…, সে কেঁদে ওঠে এবার

মারবো না, সুহাগ করতাম তরে…

আবার লাথি কষাতে পরী জোরে কেঁদে ওঠে আরো, এ কান্না হচ্ছে আবুকে জানান দেবার, তাকে জাগাবার

অথচ আবু জাগে না, সে অঢেল ঘুমের অঘোরেই থেকে যায় তবু এবার সত্যি সত্যি পরীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ে, এতক্ষণে টের পায়—সে খুব অসহায়, আবু যদি সাড়া না দেয় তার বিপদে, তবে সে কার আশায় বেঁচে থাকবে কার মুখ চেয়ে ? পেটে যে আছে, সে কী বেঁচে আছে !

কী ভাবে কান পাতবে পেটে, শুনবে তার চলাফেরা ? নুয়ে পড়ে চেষ্টা করে, পারে না কিছুতেই আর

শীত তাকে জাপটে জাপটে ধরেছে তখন, কারণ সে ঘরে নেই আর…

ঝাঁপ বন্ধ, শীতকে কীভাবে কাবু করবে ভেবে পায় না খুব। শাড়ির আঁচল ঘন আরো করে জড়িয়ে নিলেও হাড়ের মধ্যে থেকে কাঁপুনি উঠে আসতে থাকে, সে দেখে—

চারদিক দুর্ভেদ্য নাকের ডগার জিনিশও এখন দৃশ্যগ্রাহ্য নয়, চারপাশ একই রকম, এমন কী তার উদরের স্ফীতিও বোঝা যায় না

পরী কুয়াশার গভীরে হাতড়াতে থাকে

অন্ধর হাতে তবু লাঠি থাকে, সে লাঠি ঠুকে ঠুকে আন্দাজ করে নেয় রাস্তা, অথচ তার চোখ থেকেও এখন সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না পৌষের জমাট

কুয়াশায়, কেবল একটা হিমেল হাওয়া থিরথিরিয়ে গায়ে ঝাপটা মেরে তার হাড়ের ভিতরকার কাঁপুনি তুলে আনছে কেমন অবলীলায় রোমে রোমে।

পরা কাঁপছে আশরীর, হাতড়ে ফিরছে তবু

অহন কিতা করতাম ?

সে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলে।

কোথায় যাবে, কোথায় যাচ্ছে—তা সে জানে না, এটুকু বোঝে যে তাকে যেতে হবে তবু

শীত জড়িয়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে, কাঁপতে কাঁপতে সে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে মিশে যাবে যেন কুয়াশায়, এ-সময় পায়ের আঙুল শীতল আরো এক বস্তুর স্পর্শ পেলে সে লাফিয়ে ওঠে ভয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সুখে—

আর বাইচ্যা থাইক্কা কিতা ঐ তো

সে দ্রুত ঠিক করে ফেলে, নদীর অতলতায় হারিয়ে যাবে

পরী নামছে, সমস্ত শরীর হিম হয়ে উঠছে, কিন্তু কেবল পায়ের পাতাই মাত্র ভিজছে, আর ওদিকে শরীরের অনুভূতি সব ঐ ঠাণ্ডা হিমেল স্রোতে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, তারপর একেবারে বোবা

পরী হাতড়াচ্ছে পা দিয়ে এখন

এগুচ্ছে পিছুচ্ছে বাঁ দিকে যাচ্ছে কখনো ডানে, নাহ্, কেবল পায়ের পাতাই মাত্র ভিজছে, ঠিক তার উপরের কোনো অংশই ডুবছে না নদীর জলে

অহন আমি কিতা করতাম ··

সে ঝপ করে বসে পড়ে জলে উবু হয়ে, তার শায়া-শাড়ির আরো খানিকটা ভেজে মাত্র, সেই অতলতা খুঁজে পাচ্ছে না তবু, যাতে সে হারিয়ে যাবে একেবারে সেই মাত্র

পরী এবার হাত দিয়ে হাতড়াতে থকে

নদীর বুকে কোথায় সেই খোঁদল—যা অতল যা তার শরীরকে পুরো ডুবিয়ে দেবে, সে হাতড়াতে থাকে খুব, কেবলই তল পেয়ে যায় অথচ—মাটি বালি নুড়ি

শীতের হিমেল বোধ এখন তাকে ছুঁতে পারছে না আর, কাবু করতে পারছে না কোনোভাবে। এ নদী, হাওড়া নদী যে তার চেনা ভীষণ, এর ধারেই তো মানুষ হয়েছে খুব

আমার মরণে কেয়ুর কুনো তুক্ষু ঐবো না···

কান্না ঠেলে ঠেলে অভিমান বিরাট বিশাল ঝুরি নামাতে থাকলে

পরী কেবলই সেই অতলতা খোঁজে যাতে সে হারিয়ে যেতে পারে অবলীলায়।

চেনা, খুব চেনা হাওড়া নদী সেই খোঁদলের খোঁজ নিচ্ছে না তাকে কিছুতেই তবু

তৈলে কিতা করমু?

এই জিজ্ঞাসা তার কুয়াশার গভীরে হারিয়ে যায়, সে অসহায়ের মতো চারদিকে তাকায় পৌষের কুয়াশার মধ্যে, কুয়াশায় অনড় অটল; সে হাত দিয়ে সরাতে পারে না তার এক ফোঁটাও!

এ কুয়াশা-ও যে তার চেনা খুব।

খোঁজে তবু, আর এখন সামান্য এক খোঁদল পেয়ে শরীর শিউরে ওঠে তার পাইসি, ভগমান আমারে সুযোগ দিসেন অহন···

বলতে বলতে পরী উপুড় হয়ে পড়তে চায় সেই খোঁদলের মধ্যে, কিন্তু তখুনি যেন মন্ত্রবলে তার পেট তলপেট মোচড়ে মোচড়ে সংকুচিত প্রসারিত হতে থাকে দারুণ, কী একটা নেমে পড়তে চাইছে তখন তখুনি, নাকি উঠে আসতে?

তৈলে হে বাইচ্যা আসে? পরী পেটে হাত দিয়ে অনুভব করতে চায় সেই নড়াচড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়

আর সেই কুয়াশার মধ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় যেন, মরুম কিয়েরে?

পরী তরতরিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে উঠে আসে পারে; আর ভুল কোনো নয়, দ্রুত থেকে দ্রুততর পায়ে দৌড়ে সে আছাড় খেয়ে পড়ে ঘরের বন্ধ ঝাঁপের উপর, হুড়মুড়িয়ে ঝাঁপ টলে পড়ে ঘরের মধ্যে তখন

আর সে ছুটে যায় সেখানে, যেখানে দা আছে, আছে তার স্বামী—

অহন আপনেরে ছাড়তাম না, বলতে বলতে সে একের পর এক কোপ দিয়ে যেতে থাকে, ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস পড়ে ঘরের নীরব অন্ধকারে, তার হাত ওঠে নামে কেবল তখন

আর হঠাৎ অন্ধকার ভেঙে আবু চিৎকার করে ওঠে, আমারে কেডা মারতাসে মা, আমারে কেডা যেন···

কেডা···কেডা, দুলালের স্বর কানে যেতেই পরী চিৎকার করে ওঠে, আবু আবুরে···ততক্ষণে সে বুঝে ফেলেছে···

পরী আবুকে জড়িয়ে ধরছে, তার হাত গাল শরীরে অনাবৃত অংশ চটচট করছে।

হা ভগমান! ইডা আমি কি করলাম···আবুকে আরো জড়িয়ে ধরে পরী, হা ভগমান!···

বাইর হ, বাইর হ, হারামজাদি···

দুলাল লাথি ছুঁড়ে মারতে পরী ছিটকে পড়ে মাটিতে, আবু নিথর হয়ে গেছে তখন দূরে কিন্তু হাত তার গিয়ে ঠেকে দা-য়ের ওপর, পরী ধরে ফেলে দা-টা আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর ওপর, আপনের লাইগ্যা আর আইজ, আপনেরে ছাড়তাম না আমি···

বলতে বলতে সে একের পর এক কোপ দিয়ে চলে দা-য়ের। আমাকে মাইর‍্যা লাইলো, বাচাও, বাচাও, আমারে···

দুলাল দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়

তার সেই পালানো দেখে পরী পাগলের মত হেসে ওঠে, তৈলে আমি পারসি তৈলে শুদ (শোধ)?

আর হাসতে হাসতে আবুকে কোলে তুলে নিয়ে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে, মিশে যায় পৌষের কুয়াশার ভিতরে খুব···তখন

চারণভূমি

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

'রিভার ট্রেনিং সেণ্টার'—এই বোর্ডটা পুতে দেওয়ার পর রাস্তার চেহারাটা হঠাৎ পালটে গেল। আধলা ইটের খোয়া ফেলা রাস্তা। কবে যে রোলার টেনেছিল তার ঠিক নেই। রোদ বর্ষায় দাঁত ওঠা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো! মাঝে মাঝে মোষের বড় বড় খুরের চাপে খানা খন্দ। প্রমথনাথ আজ সকালে দিঘির মতো বড়ো পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, রাস্তাটায় পাথরের কুঁচো খোয়া পিচ পড়ে একদম ঝকঝকে। শুধু গাঙপাড় অব্দি···পারলে গাঙ ডিঙিয়ে ওপারে হলদিয়া গিয়ে থামতো। নিজের মনে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চওড়া পাড়ে হাঁটে প্রমথ। পাড়ের অনেকখানি বকচর বাবদ মাটি ছাড় দিয়ে জল। জলে ঘেরা মাছগুলো ক'দিন্ আগে জাল দিয়ে ধরে ঝাঁকা চাকনে বোঝাই হয়ে চলে গেছে বড় আড়তে। পাড়ের মাটিতে স্থানে স্থানে টানা জাল ছাঁকতে কুঁচো শামুক, শামুকে পা পড়তেই কড়মড় শব্দ।

প্রমথ নিচের দিকে তাকিয়ে খালি পায়ের পাতা উল্টে দেখে, কেটেছে? ওপাশের নতুন রাস্তায় ভ্যান রিক্সা হর্ণ দিয়ে বেরিয়ে যায় পয়লা নম্বর ঘাটের দিকে।

সকাল বেলা। গাছপালার ছায়া মনোরম। খেঁজুর ডগ ভেঙে দাঁতে ঘসতে ঘসতে প্রমথ শাসমল নিজের বাস্তু পুকুরের চারদিকটা চোখ বুলিয়ে নেয়। ওদিকে বড় গেঁমুয়া গাছটা বয়েস বেড়ে ভীষণ ঝাঁকড়া এদিকের বুক-চড়া মাঠ—পুব পশ্চিমে সবসুদ্ধু বিঘে সাতেক বাস্তু। যদি বাপটা আর একটু জঙ্গল বেশি হাসিল করে যেত···তাহলে বাস্তুটার সঙ্গে এপুকুরটাও দু-পাঁচ বিঘে বেড়ে যেত তো! এই পুকুরেরই মাছ বেচে সংসারের কাপড়-চোপড় ওষুধ পথ্যির নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা থাকতো—।

বাড়ির বছর মাইনের মুনিশ পরাণকেষ্ট পুকুরপাড়ে এসে হাঁক দেয়, কই গো-ও বড়বাবু উলেমান ডাকে যে—

প্রমথ দাঁতন থামিয়ে একটু তাকিয়ে থাকে প্রাণকৃষ্ণর দিকে। যে এখন ডাকাডাকি নামানামিতে ভাঙাচোরা হয়ে পরাণকেষ্ট। যার পরণে আট হাতি ধুতি মালকোচা মেরে কালো উরু কাঁটা খোঁচায় ছুড়ে কেটে শৈশব থেকে কত বচ্ছরের যে দাগ বয়ে বেড়াচ্ছে!

প্রমথ একটু হিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে!

পরাণকেষ্ট থমকে দাঁড়িয়ে বলে, তাহলে কি এখেনে পাঠিয়ে দুবো— ?

প্রমথ বলে, উলেমা···

—আগো ঘোড়াদলের তারা···

বিভ্রান্ত স্মৃতি উসকে যেতেই আঁকুড়-পাঁকুড় হয়ে বলে, এক্ষুণি ডেকে দে তাকে—, আবার দাঁতনটা ঘসে। দাঁতে কিচ্ কিচ্ শব্দ হয়। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ দাঁতের গোড়া চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত আসে প্রমথর। বাবার এমন রোগের ধারা কি ছিল! প্রমথর বিশেষ জানতে ইচ্ছে করে, মায়ের ও? এই সকালে ছায়াশীতল বাতাসে মনটা খানিক বশে আসে। আর নিজেকে উদার করে তোলে, কিইবা করার আছে! বিষয় সম্পত্তি তাদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাবো, রোগটার বেলায় নিতে চাইবো না, সেটা কি হয়!

—বড়বাবু, বেশ জোরে সম্বোধনটা কানে আসে। প্রমথ সজাগ হয়।

উলেমান কাছাকাছি এলে বলে, তোমার দরখাস্তটা দাখিল করেছ?

—দাখিল মানে? একেবারে চিঠির কপি নিয়ে এসেছি, বলে সরকারি অফিস কাছারির ধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষের গরবের হাসি হাসে উলেমান।

প্রমথ কাগজটা হাতে পেয়ে বাসি দাঁতে দাঁতনটা কামড়ে রেখে মেলে ধরে। চিঠির মধ্যে সার বস্তুটা নিজে ধরে ফেলে। গাছপালার ছায়ার মধ্যে রোদ্দুরের দু-একটা রেখা লম্বালম্বি পাড়ের উপর। বেশ গম্ভীরভাবে বলে, হুম্। তুমি বলেই এমন কাগজ হাতে হাতেই নিয়ে আসতে পারলে—

—পাকা কাজ করেছি তো বড়বাবু? লেখাপড়া জানা মাস্টারবাবু আপনি তায় নামকরা চকদারের ছেলে—আপনাদের পরামর্শ না হলে আমি এ্যাদ্দিন পেটে দানাপানি পেতুম···

মুখের সামনে এত প্রশস্তি। বিগত অতীতচারণা না করে সম্মান জানাচ্ছে মানুষটা। কাছাকাছি পাশ গাঁয়ের লোক তো নয় উলেমান। দুটো থানার সীমা পার হয়ে আরও দূরের অধিবাসী। সেখানেও তার বাবার খ্যাতি মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে, উলেমান লোকটার জন্যে কিছু করা উচিত—এরকম ভেবে বলে, এক্ষুণি বাসরাস্তা পারিয়ে হাটে যাও। প্রিয়নাথ প্রেসকে বলবে, আমার কাজটায় এই চিঠির তারিখ আর নম্বরটা যেন ছেপে দেয়—

উলেমান যেন বয়েস কমিয়ে ফেলেছে। দ্রুত হাঁটে। শুখনো পালা খোঁচা পায়ের চাপে মট মট ভাঙে। কাঁচা ঘাসে ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ তোলে। এখন শব্দ

আসে প্রমথর দু-কানে···জলস্রোতের ভীষণ শব্দ। লম্বায় প্রায় চার মাইল চওড়ায় দেড় দু-মাইল আঁকা-বাঁকা চর। চরটায় চারপাশ দিয়ে নোনা জল ছুটছে। চরটার বুকে গেঁমুয়া- বাইন আর কেঁটকি ঝোপের কাঁটায় হাওয়ার গা ছিঁড়ে কেটে যাচ্ছে। সমুদ্র বেয়ে আসা খরখরের নোনা জলের দাঁতে ঘাসের চাবড়া কাটছে ঝুপ্‌ঝাপ্‌। ঘুলিয়ে কাদা হয়ে যাচ্ছে ভূমি খণ্ডটুকুর চৌপাশ। লম্বা ঠোঁটে বক সিরল টুকুস-টাকুস খুঁটে নেয় চেঙো চাঁদা।

রোঁয়া-ওঠা কালো চামড়ার পিঠে সপাং করে ছড়ির ঘা পড়ে।

হ্যাট্‌—হা—হা—হা—

বড় বড় খুরে পিচ রাস্তায় খট্‌ খট্‌ শব্দ। জন্তুগুলোর ঢ্যাঙা পায়ে ছড়ির গুঁতো লাগতেই সারিবদ্ধ হাঁটে। বাঁকা শিং। চোখ ঝামরে কালো পাতা। কষের লালা জিবে ঝরিয়ে পাশের সবুজ ঝোপ-ঝাপ অক্ষত রেখে এগিয়ে যায়। কাঁধের ব্যাগে ক'দিনের সংসার নিয়ে কোমর সেঁটে ছড়িদার লোকগুলো জন্তুকটাকে জপায়, চল্‌না যমরা রা—। আর এট্টু গেলে তো গাঙ পাড়। চরে গেলে যত পারিস ঘাস পাতা গিলবি খুন—

জলস্রোতের শব্দ হাওয়ার দমক হটে গিয়ে ছড়িদারদের কথাগুলো প্রমথর দু-কানে সেঁধোয়। সারা গা চিড়বিড় করে ওঠে। নিজের মনে ফুসে ওঠে,- ওই যাহ্‌। ফাঁকি কলে মোষগুলো পার হচ্ছে রে—

২

একখানা বড় আটচালার মতো দোকানঘর। তেল ডাল নুন চেলা কাঠ বিড়ি পেট খারাপের ট্যাবলেট আলকাতরা পেরেক—হরেক কিসিমের জিনিশ পত্‌তরের সঙ্গে গরম চায়ের ব্যবস্থা নিয়ে শ্রীধর মাইতির দোকানঘর। গাঙের ধারি রক্ষে করতে বৃটিশ আমলের তৈরি বাঁধ। বাঁধের এপাশে মানুষজনের বসবাস। জোতজমি গাছপালা বুনিয়াদী বিদ্যালয়। বাঁধের ওপাশে উঁচু ঢিপি বানিয়ে দোকানঘরগুলোর পত্তন। এপাশের বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে ওপাশে ছায়া। এ্যাজবেস্টারের টানা ছাউনি দিয়ে পোর্টট্রাস্টের লম্বা দৌড় অফিসঘর। বটগাছের গোড়ায় সিমেণ্ট বাঁধিয়ে তাসের আড্ডা। জমজমাট পয়লা নম্বরের ঘাট।

বাঁধের ঢালে খানিক খানিক জায়গা ঝোপঝাপ মুলিয়ে পরিষ্কার। গায়ে গায়ে খান চল্লিশের বাবলা ডালের খোঁটা পোঁতা। গোবরনাদা আর বাসি চনার বোটকা গন্ধ। এক একটা খোঁটাতলা এক একজনের দখলে।

তদারকিতে কলুমে বলাই বাঁ-হাতে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে ক'দিনের খড় গোবর যতটা পারে সরিয়ে ঝারাখালের ধারে ডাঁই করে রাখছে। ওপাশে হরিসাধন খাঁড়ার বিধবা বউটা ঝাঁটাচ্ছিলো গতদিনের বাসি জঞ্জাল। মোষেদের তলতলে চেরানি গোবর। দু-চারটে খড় নাড়াও পড়ে নেই। গোবর টানতেও বড্ড অসুবিধে—তাই মুখ খারাপ করে বলে, ও বলাই শালার মোষবাবুরা কি জন্তুগুলোকে খেতে দেয় নে নাকি বল দিখি? শুধু চরের কাঁচা ঘাসের লোভ দেখিয়ে হাল চষে দেয় মাঠকে মাঠ জমি। হাল চষবে প্রাণীগুলো, ভাত খাবে বাবুরা—? কাল ক'আঁটি খড় কিনেছিল ছড়িদার। একেবারে চেটে খেয়েছে মোষগুলো? একটাও পড়ে নেই গো? থাকলে তবু গোবরটা মাখিয়ে দু-চাবড়া ঘুঁটে দিতুম—

গাঁয়ের লোকের টালির চালে কাজ করতে গিয়ে বলাই পা-হড়কে একদম নিচে। ভেঙে গেল ডান হাত। কুল্পীর হাসপাতালের ডাক্তার দিয়েছিল প্লাসটার করে। জোড়ে নি ভাঙা হাড়। বরং ফুলে পচে গ্যাংগ্রিণ। দাবনা থেকে কলম কাটা করে দিলে সদর হাসপাতালের বড় ডাক্তার। সেই থেকে তো নাম হয়ে গেল কলুমে বলাই। বলাই বললো, ও বউদি মুখ করে দেরি করোনি। খবর পেলুম নতুন রাস্তায় অনেক মোষ লেবেছে গো—

—কোন লাটের বল দিনি?

—ঢোলার মোল্লা বাবুদের।

হাতের কাজ থামিয়ে কলুমে বলাইকে বলে, হ্যাঁরে, গজেন পাত্র কাল রাত দুপুরে খড় বেচলো, তড়পা আট টাকা। আমাদের খোঁটায় মোষ বাঁধলে দাম বাড়াতে বলবি নি?

বলাই চুপ করে বউদির কথা শোনে।

বউদি আবার বলে, খোঁটা-তলা পোষ্কার করতেও তো কষ্ট?

—থামো না। সবে তো চাষ উঠলো। আশ্বিনে মোষ পারাবে বেশি। তখন রেট চড়ালে কথা উঠবে নি—

বউদি, হরি খাঁড়ার বউ আরও কাছে এসে ফিস ফিস করে বলে, হ্যাঁরে বলাই বড় দোকানী শ্রীধর মাইতি কি চরের মালিক? মোষ ওলাদের কাছ থিকে টাকা নিচ্ছেরে—

দুস্। শ্রীধরের দোকানে অনেকগুলো বেঞ্চি। চরানী লোকগুলো মোষ ধরাবার জন্যে শুয়ে বসে থাকে। মোষ মালিকরা হয়তো মোষ বুঝিয়ে দিয়ে মাসের টাকা ধরে দিচ্ছিলো শ্রীধরকে মুখোবালা করে—

বউদির মন থেকে সায় আসে না। এতদিন তো দেখে এসেছে মাঝ গাঙে চরটা ডেকে নেয় ঘোড়া দলের রহিম উলেমা নয়তো সাগরের ফকির শী। খোদ গরমেণ্টকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে এক বচ্ছরের জন্যে। তারাই তখন চরদার, ইজারাদার। তার লোকজন বটি আদায় করে তোলা তোলে। শ্রীধর তো কোন কালে এমন কত্তা হয়ে ওঠেনি। ফাঁকা চর···বেওয়ারিশ হয়ে গেছে। দেশে গরমেণ্ট পুলিশ নেই নাকি? পয়লা নম্বর ঘাটে বউ হয়ে আসা ইস্তক দেখে আসছে কত নিয়মকানুন। চরে যেতে গেলেও ইজারাদের বলে যেতে হ'ত, দায় দায়িত্ব তার। হরি খাঁড়াও তো কতবার চরে ডিঙি নিয়ে গেছে, মাছ ধরেছে। বেড়ানীবাবুদের সঙ্গে পাখি মারতে গেছে। সারাদিনের বন্দোবস্তে ভাড়া ডিঙি। নিজেই মাঝি। বাবুদের জন্যে রেধে দিয়েছে। চরের ঝোপ জঙ্গলে ওৎ পেতে ফটাস ফটাস গুলি ছুঁড়েছে বাবুরা। ছুটে ছুটে জখম পাখিগুলো কুড়িয়ে এনেছে হরি খাঁড়া। বেঁচে থাকতে বলতো, বুঝলি বউ চরের মার্কা খালে দেখলুম এই বড়ো বোয়াল মাছ ছটকাচ্ছে। আমরা বলি কি কুমীর টুমির ধরলো নাকি? ও হরি এইসা বড়ো একটা গাঙ ট্যাংরা গিলতে যেয়ে বোয়ালের টাকৃরাজাম···। সেই বউয়ের সঙ্গে খট্‌কা লাগে। কতদিন তো শ্রীধরকে দেখে আসতিছি। এট্টু এট্টু কয়ে দোকানটা বাড়ালো, পোর্ট ট্রাস্টের অফিস ঘর হল। ছোকরা শ্রীধরের চুল দাড়ি পাকলো। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বলাইকে—হ্যাঁরে? শ্রীধর দোকানে নতুন লোক রেখেছে কেন রে? শুধু একলা দোকানদারি করতে করতে কোন ফটকে মোষের ইনকাম বেরিয়ে যাবে তাই?

—কথাটা মন্দ বলো নি, বলাই বাঁ-হাতের কাজ থামিয়ে সমর্থন জানায়। তখন দাবনার অবশিষ্ট হাড় মাস টুকু নড়ে ওঠে। পুরো হাতটা থাকলে, তর্জনী দেখিয়ে নিজেও সায় দিতো!

৩

মাটির দেওয়ালে টালির ছাউনিতে "শিশুপুষ্টি" কেন্দ্র ফেলে এক পাল্লার লকগেট পেরিয়ে ঘুরপথে একেবারে গাঙ পাড়ে প্রমথ। ইস্কুলে সারাদিন বুকের ভেতর ছম্ ছম্ করছে। গাঙটা ভীষণ টানছে। পথ হাঁটতে হাঁটতে ছাতাটা বাঁ বগল থেকে ডান বগলে। ডান বগল থেকে বাঁ বগলে পালটাই করতে করতে প্রমথ ভেবেছে, গাঙ টানছে, না গাঙের মাঝে চরটা...! চরটা তো গরমেণ্টের তাতে আমার বুক হাঁচ ফাঁচের কী আছে! ফাঁকা মাঠ···

অনাবাদী ঝোপজঙ্গল, বেওয়ারিশ বিল ফিশারি দেখলে কেন যে বুকের ভেতরটা অমন করে! এমন ঝোপ ঝাড় অনাবাসী চক লাট হাসিল সাফাই করে তো বাপটা…আমাদের ভাত কাপড়ের সংস্থান করে গেছে!

গাঙধারের এদিকটা ভাঙতে ভাঙতে একেবারে ঘোর। ঢালু হয়ে অনেকখানি নিচে, বাবা বলতো, গাঙের ওপারে মেদিনীপুর…এপারে দাঁড়ালে ওপারের ঢোল কাঁসির শব্দ স্পষ্ট শোনা যেত। ওপারের লোকেরা গাজনের মহড়া দিলে এপারে বোঝা যেত। গাঙ তখন এত ছোট। আর এখন! শুধু জল। ধুধু জল। ওপারের গাছপালা চোখে মাত্র সবুজ…সবুজের ধোঁয়া। কবে যে চরটা এত বড় সড় হয়ে গেল। গাঙের মাঝে যেন দশ বিশটা গ্রাম বসতে পারে। নেহাৎ ভর কোটালে আর সাঁড়াসাঁড়িতে চরের মাটি ডুবুডুবু। ঝোপ জঙ্গল গলা জেগে বেশ চকচকে। উঁচুউঁচু ঢিপিতে দাঁড়ালে যেন দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ। শুধু ঘাস কাঁচালতাপাতা…এপার থেকে ঘাস খাওয়াতে পাঠানো মোষ, মোষের বাচ্চাগুলো ওই ঢিপিতে দাঁড়িয়ে তো বাঁচে। তারপর জল সরে গেলে হামলে পড়ে নোনা ঘাস চিবোয় পাটি ডুবিয়ে মসমসিয়ে।

এহেন চরটা…জন্তুগুলোর…প্রাণীগুলোর খাদ্য বস্তু। তা সে এমন দামি নয়, সেটুকুও খেতে দিতে বাধা গরমেণ্টের বাবুদের। দিচ্ছিলিস বাবা বছর বছর ডাক দিয়ে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকায় লিজ। তা না বছর দুয়েক কি… কি ছাই লুথেরান না কি ওয়ার্ল্ড লুথেরান চরটাকে উন্নতি করাবে। হা-ঘরেদের হা-ভেতেদের ঘর বাড়ি করে দেবে। বাচ্চাদের খেলা বেড়ানোর জায়গা করে দেবে। তার নাম গন্ধ কই…!

হাঁটতে হাঁটতে হাওয়া, ফাঁকা গাঙের হাওয়া, ঘোলা জল। ভাঁটার টানে নিম্নমুখি, এপার ওপার বিশাল। মাঝখানে, ঘোলা জলের মাঝখানে কালচে সবুজ। চরটার পুরো চেহারা। দু-এক পা যেতেই শুখনো পাড়ে নরম কাদায় খুরের চাপে অসংখ্য খানা খোঁদল! প্রথম আঁৎকে ওঠে, তাহলে বেশ কিছু মোষ গাঙ সাঁতরে ওই চরে পার হয়ে গেছে! শালার দোকানি ছ্যাচ্চড় শ্রীধর মাইতি…। সব মেরে খাচ্ছো তুমি একলা। চরানি লোকজনদের ওই জন্যে তোমার ওখানে আড্ডা? মোষ পিছু কত পয়সা কামালে হারামজাদা? গাঙ ডাকাতের মাল গছিয়ে জমি কিনলে বাইশ বিঘে এবার গরমেণ্টকে ধোঁকা দিয়ে আর এগারো বিঘে কিনলে তো আমাকে ডিঙিয়ে যাবে। কেউ আর মানবে আমাকে? শুধু নাম মাত্র বলতে হয়

লোকে বলবে, প্রমথ মাস্টার চকদারের ছেলে। জঙ্গল সাফাই করে বসবাসের জায়গা, চাষবাসের জমি...বুনো গেঁয়ো ক্যাওড়ার গায়ে প্রথম কোঁপ বসানোর—সে অতীত! বাপটার মর্যাদা—। পঞ্চায়েত পরিষদ থাকলেও—এখনও তো বিচার আচারে ডেকে নিয়ে গিয়ে যেটুকু খাতির—সেটা! দু-চার কথা বললে যে মানসম্মান···সেটা!

টিনের চোঙা ফুকিয়ে হঠাৎ চিৎকার, চরে মোষ চরানি ভাইয়েরা মোষ-মালিক বাবুরা আপনাদের জানাচ্ছি যে—এখন থেকে চরে মোষ পাঠাতে গেলে আমার কাছ থেকে টিকিট লিখিয়ে নেবেন। আমি উলেমান সাহেব সাং ঘোড়াদল এই চরের জন্যে সরকারি পাওনা দিয়া যথাযথ আজ্ঞা প্রাপ্ত—

ঠিক শ্রীধর মাইতির দোকানের গড়ানে তে-মাথানি। লোকজনের সমাগম। সেখানেই আর একবার চোঙ ফুকোয় উলেমা—মোষ চরানি ভাইয়েরা মোষ মালিক বাবুরা—কথা শেষ করে ব্যাগ থেকে এক পাঁজা হ্যাণ্ডবিল বের করে উলেমান। হাতে হাতে পৌঁছে যায়। চরানি বিজলী উল্টে পাল্টে দেখে, কোন দিক থেকে শুরু সেটা বুঝতে পারে না। দোকানের ক্যাশ বাক্সের কাছে বসে রোগাটে চেহারা শ্রীধর মাইতি। চুলগুলো হঠাৎ পেকে খোঁচা খোঁচা। পানের কষে দাঁতগুলো কালো। আট পকেটি ফতুয়া গায়ে, বুক পকেটে ভরে আছে দোকানের ফর্দ। বিজলীর অবস্থা দেখে দাবড়ি মারে শ্রীধর,—শালা, তুই নয় একবার মোষ বুঝে নিলে হাজার মোষের মধ্যে তোরটা চিনে নিতে পারিস। তাই বলে হ্যাণ্ডবিলে কী আছে সেটাও বুঝবি?

বিজলী সে কথার ধারে না গিয়ে ক্যাশ বাক্সের কাছে এসে হ্যাণ্ডবিলটা দিয়ে বলে, হ্যাঁ শ্রীধরদা—কী কথা শুনছি গো উলেমার মুখে?

শ্রীধর মাইতি হ্যাণ্ডবিলটা ধরে দেখে, 'আনন্দ সংবাদ', তারপরেই মুখ ঝামটায়, শালা চড়ায় মোষ চরিয়ে গোরু হয়ে গেছিস—। আগে পড়তে দে কাগজটা। চড়ায় বাঘ এলো, না গণ্ডার এলো দেখি—"গত কয়েক বৎসর বিনা ডাকে চরটা পড়ে থাকায় সরকারের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। সেজন্য এবছর স্বল্প মেয়াদে চরটি অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে সরকার বাহাদুর গ্রেজিং পারপাসে ব্যবহারের জন্যে উলেমান সেখকে দিতেছেন। উক্ত নথি ১৮০৪ তাং ২।৪।৮৬ মেমোতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরের জন্য গিয়াছে"—, ব্যস হয়ে গেল।

এপার থেকে মোষ বুঝে নিয়ে ডিঙির সঙ্গে কাছি বেঁধে মুখোস পরিয়ে মোষগুলোকে বিজলী যত সহজে গাঙ সাঁতরে নিয়ে যায়, সেটুকুতে যত না কষ্ট

তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় এমন প্যাঁচের ভাষা বুঝতে। আতঙ্কে শ্রীধরকে বলে, চরে মোষ নিয়ে ঢুকতে পারবো তো?

শ্রীধর জ্বলে উঠে, শুধু মোষ? কটা মেয়েমানুষ নিয়ে চড়ায় ওঠ না। টঙ বেঁধে থাক না সেখেনে—

কথা সহজ করতে গিয়ে যেন চরের ঘন জঙ্গলে আটকে গেল বিজলী। বিজলী হাঁ—করে দাঁড়িয়ে থাকে।

টিনের চোঙে আওয়াজ ওঠে, তাই মোষ মালিকদের জানিয়ে দিচ্ছি চরে ঘাস খাওয়াতে গেলে মোষ পিছু পনের টাকা তিন মাসের জন্যে। মোষের বাছুরের জন্যে সাত টাকা—আমার কাছে জমা দিয়ে টিকিট নিতে হবে—চরানিদের জন্যে চরানি খরচ আলাদা—

নিজের অভিজ্ঞতা আর মস্তিষ্ক খুঁড়ে আনা ভাষাগুলো চোঙ ফুকোলে যে এত তেজ পায় মনোরম হয়ে ওঠে—সেটা জানা ছিল না প্রমথর। হ্যাণ্ডবিলটা হাতে পেয়ে সারা শরীর পুলকিত। ছাপা অক্ষরে নিজের তৈরি চিন্তাটা এমন দেখায়! হ্যাণ্ডবিলটা পড়ায় মগ্ন রোগা শ্রীধর মাইতির মুখটা দেখতে পায় প্রমথ। নোনাজলের তোড়ে যেন এগারবিঘের একলপ্তের ধানজমি ধসে গাঙের জলে চলে গেছে। তাই ভীষণ ভাঙা চোরা মুখ শ্রীধর মাইতির। দোকানী ফতুয়ার বুক পকেটটা যেন ধুয়ে যাওয়া জমির শেষ ধসটি।

প্রমথকে দেখতে পেয়ে উলেমা ঘোষণা থামিয়ে দু-হাত জোড় করে গড় জানায়,—বাবু। চিনতে পারছেন? এবারে চরটা পেলুম—

একটু দূরে বউদি কলুমে বল্লাইয়ের খোঁটাতলায় খান পঁচিশেক মোষ বাঁধা। এক আঁটিও খড় দেয়নি ছড়িদার। কিনবে কি করে ছড়িদার? মোষ মালিকের যে বাসে আসার কথা। তখনওতো এসে পৌঁছও নি। ছড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে মোষগুলোকে হাঁটিয়ে এনে ছড়িদার এখন বে-হাল। গামছায় বাঁধা মনিব বাড়ির মুড়ি চিবোয়। শুখনো মুড়ি চিবোতে গিয়ে গলা কাঠ।

ছড়িদার শ্রীধর মাইতির কর্মচারি ছোকরাটাকে বললো, এক মগ জল দাও না ভাই। গলাটা ভেজাই—

ক্যাশবাক্স ফেলে হুঁ করে ওঠে, মগ কেন? গোটা জালা ধরে নিয়ে যাও গাঙ পাড়ে। গাঙের জল যতো পারো গেলো। না হলে চাও ওই উলেমার কাছে—

এবার প্রমথ মুখ খোলে, ছিঃ। এটা কী বললে শ্রীধর, এরা তো বিদেশী মানুষ?

শ্রীধর ঝাঁঝরে ওঠে, ও। উলেমান বুঝি এদেশের লোক ?

—তা আমি বলেছি ?

—সেই রকম তো কথা।

বিজলী চমকে উঠে শ্রীধর মাইতিকে দেখে। লোকটা কেমন খেপে গুমসে মনমরা। চালু দোকানপাট সব আছে। তবুও যেন ওর সব নদীগত···ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে—মুখে এমন ভঙ্গি। বিজলী মনের মধ্যে গাবজায়, কেন আর মিছি মিছি ঘুষ গুঁজি মোষ পিছু দু-তিন টাকা শ্রীধরকে। ওর দোকানের সামনে থেকেই মোষ পার করালেই মুজরো দিতে হয়, বলে—এ্যাঁ। মোষের ঠ্যাং খোঁড়া করে দোবো। আমার দোকানের ফেলা মাটির রাস্তা ড্যামেজ করে দিচ্ছে। খরচ দিয়ে যাও—। এই শালার চরাণিরা মোষ ফোসের মালিক টালিক বুঝি নি। তোদের ঘাড় পয়সা দিয়ে যাবে—। সেই থেকে তো দু-বছর ধরে এ-এক নতুন বটি চালু হল। শ্রীধর মাইতির চাঁদা—। ঘাস খাওয়াব আমরা। বানে ভেসে গেলে খুঁজে আনবো, চরে অসুখ বিসুখ করলে মনিবকে খবর দেবো—আর তুমি বসে বসে পয়সা মারবে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে ?

উলেমান হেঁকে বলে, এখেনেই আমার টিকিট ঘর করবো—

ক্যাশবাক্স ফেলে তড়াক করে উঠে আসে, কি···আমার দোকানের গায়ে ? এটা কি কারুর বাপকেলে জায়গা ?

প্রমথ ধমক দেয়, যে বলছে তারও কি বাপকেলে ?

শ্রীধর-একটু তড়পে ওঠার মুখে বিজলী বলে, থামো তো শ্রীধরদা।

ভিনদেশি ছড়িদার, মোষমালিক দু-চারজন ডিঙি নৌকোর দাঁড়ি মাঝি ঘিরে দাঁড়ায় জায়গাটায়। বটতলায় খড় টাল দিয়েছে গজেন পাত্র। মোষওলাদের কাছে বিকোয় বেশি দামে। সেও বললো,—কী দরকার মিছে কেচা কিচি করে ? জায়গাটা···চরটা···তো গরমেণ্টের—

শ্রীধর মাইতি দেখতে পায়, এতদিন যারা শলাপরামর্শ করে চলতো···তারা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে চোঙ ফুকোনো কথায় !

দোকানের কর্মচারিটা হ্যাসাকে পিন মেরে টাঙিয়ে দিতেই আলো। তখন সকলের খেয়াল হয়, চারদিকে অন্ধকার। এক দঙ্গল মোষের পিঠের মতো কালো অন্ধকার। অন্ধকারে গাঙের মাঝে চরটাও একাকার।

৪

খড়ওলা গজেন পাত্রের দাওয়ায় লম্ফোটা শিস কেটে আলো। স্বল্প আলোয় একধারে উলেমান ওপাশে গজেন পাত্র। কলাই করা ডিশে ভাত খেতে খেতে গজেন পাত্র বললো, ও উলেমাদা—

আঙুলের গালাসিতে ডাল চাটতে চাটতে বলে, উঁ।

মাস্টার যে বলে গেল, খুব ভোরে জোয়ার। সাবধান—ডিঙিতে বেঁধে মোষগুলো যেন ফাঁকি কলে পার করিয়ে দেয় নে ঘাটের লোকেরা—

বিদেশ বিভুঁই জায়গা। হাওয়ায় লম্ফোর আলো কাঁপে। বুকের মধ্যেও কাঁপ ধরে উলেমার,…আমাকে এবছর চরটা লিজ দেওয়া হোক—গত কয়েকবারও আমি লিজপ্রাপ্ত হইয়া সরকারি পাওনা যথাযথ আদায় দিয়াছি। শুধু এই দরখাস্ত মেরে এতখানি চর ভূমি আটক করতে পারবো! যদি শেষ অব্দি গরমেণ্ট না অনুমতি দেয়…!

চারদিকে অন্ধকার। অন্ধকার আরও চরের ঘাসে জঙ্গলের গোড়ায়। গজেন পাত্র বললো, শুয়ে পড়ো। জোয়ারের আগেই ডেকে দিলে হ'লো তো? ভরপেটে সুখ। হুট করে উঠে পড়তেও আলস্য। বসে বসে ভাবে উলেমা, প্রথম মাস্টার এতখানি এগিয়ে দিলে। দিয়ে তার লাভ…! বছর কাবারে সিজিন ফুরোলে কিছু দস্তুরি? সে আর কতটুকু…! কিন্তু এত ঝক্কি পোয়ানোয় সুখটা কিসে!

ভাতের থালার পাশে সকড়ি খুঁটে নেয় গজেন।—এবার অগ্রিম বর্ষা। চাষ টেনে এনেছে দেশের লোক। দলে দলে মোষ পারাবে—, বললো থালা সরিয়ে। গজেনের কথা কানে ঢুকতেই বুকে একটু বল পায়। প্রমথ মানুষটার এমন ঝুঁকিতে কৃতজ্ঞতার মজে গিয়ে নিজের মতো করে মেলাবার চেষ্টা করে, কত বড় চকদারের ছেলে…ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতো বড় ঘেসো জঙ্গুলে চরটার কত্তাই তো সে…!

ভাবের গান

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

নাগরদোলা ঘুরছে। হাতা খুন্তি বেলুনচাকি প্লাস্টিকের এটা-ওটা, আর মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। চটের দেয়াল, ত্রিপলের ছাউনি।

ভাই ফোঁটার মেলা বসেছে বিরহীতে।

যাদের ভাই দূরে রয়েছে তারা মন্দিরের দুয়ারে বা থামের গায়ে ফোঁটা দিচ্ছে আর যমদুয়ারে কাঁটা পড়ে যাচ্ছে। ভাই মরা বোনের কবে আঙুলের ফোঁটা থামের গায়ে নয়। মৃত ভাইয়ের কপালে গিয়ে পড়ছে আর যাদের ভাই নেই, সেই সব বোনেরা ঐ মন্দিরের দেবতা মদনখোপালকেই ভাই পাতাচ্ছে।

মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের আজকের দিনের এস্‌পেশাল—'ভাই ফোঁটা' সন্দেশ। সন্দেশের গায়ে লেখা আছে 'ভাইকে দিলাম'।

একটা বউ লক্ষ্মীঠাকুরণের মত তার মুখ, সেরকম টানাটানা চোখ নাকে নথ, দোকানে এল। সঙ্গে বুড়িমত একজন।

টেবিল বয় দুলালচাঁদ অর্ডার নিতে আসে। বলুন ঠাকুমা, দোবো।

ল্যাংচা, বোঁদে, লেডিকিনি, সন্দেশ, রাজভোগ, রসগোল্লা, মিহিদানা দরবেশ, সরপুরিয়া, সরের নাড়ু সরভাজা, নিমকি সিঙারা বালুসাই গজা···

বৌটার মুখ থেকে হাসি ছলকে উঠতেই দুলাল থামে!

বুড়িটা বলে অতো কি হবে, উপোস ভাঙা মেঠাই ভাল যা আছে, দুটো করে দাও।

ক'টা সরপুরিয়া দিয়ে দুলালচাঁদ বলে ভাল ল্যাংচা আছে, এস্‌পেশাল সন্দেশ আছে, দুটো খান না ঠাকমা, এই ভাইফোঁটার দিনে।

'ভাই ফোঁটায় আমাদের কি, ভাইফোঁটা তো তোদের।'

দুলালচাঁদের মুখখানার দিকে তাকিয়ে বুড়িটা বলে—

—'তোর ভাই ফোঁটা হবেনি?'

—আমার কপালে কে ফোঁটা দিবে? আমার হ'ল পোড়া কপাল।

—কেন? তোর বুন নাই বুঝি?

—বুন নাই, মা নাই, বাপ নাই···

এবার ঐ বৌটা কথা বলল। কত কথা বলল। জল নিয়ে কথা, চা নিয়ে কথা, ভাই নিয়ে কথা। বৌটারও ভাই নেই। ক'বছর আগে ছুরি খেয়ে মরেছে নবদ্বীপে। এই বিরহীতে ওর মামার বাড়ি। বৌমার কত বড় বংশ। নবদ্বীপের অদ্বৈতাচার্যের বংশ ওরা···বুড়িমা বলেছিল।

ঐ টেবিলটার সামনে এতসময় দাঁড়িয়ে থাকছিল বলে মালিক দীনবন্ধু মোদক কতবার হাঁক দিয়েছে, তবু ছল করে জল নিয়ে কতবার ঐ টেবিলে গেল দুলালচাঁদ। ঐ বৌটা জিজ্ঞাসা করল মার কথা, বাপের কথা, দুলাল সংক্ষেপ সময়ে শুধু বলেছিল—বাপ-মা হারায়ে গেছে।

দু-টাকায় ভাইফোঁটা সন্দেশ আনালো বৌটা। কলাপাতায় সাপটানো তেল-হলুদে কড়ে আঙুল ঘসে আঙুলটা দুলালচাঁদের কপালের দিকে নিয়ে যায়, বলে বোস একটু, এই বেঞ্চিতে। কড়ে আঙুল কপাল ছোঁয়, দুলাল চোখ বন্ধ করে আর ওমনি চেয়ার টেবিল, জলের ড্রাম সব্বাই উলুধ্বনি করে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে—বোঁচকা, গ্যাড়া, মালিক সবাই দেখছে ওকে। ভীষণ লজ্জা করে। দুলাল পালায়।

দুলাল বড় আনমনা। খদ্দের চাইছে পান্তুয়া, দিচ্ছে রসগোল্লা।

দীনবন্ধু মোদক মাথায় নরম টোকা মেরে বলে একটু হুঁশ লাগিয়ে কাজ করবে দুলাল···থিতি দিলনা।

ভোগের পাড়ার ঘোষেরা এল। দোকানে ছটোপুটি, কড়াতে নতুন তেল চাপল। পাঁচুদা হেড কারিগর। নিজেই ময়দা বেলতে বসে গেছে।

ঘোষেদের একজন গান শুরু করে দেয়।

তারপর মদনগোপাল—

তারপর মদনগোপাল কলির রাখাল ঘুরিতে ঘুরিতে চুপি চুপি ঢুকে পড়ে ঘোষেদের বাড়িতে। ত্যাখন গা ধুচ্ছে বৌ—

ত্যাখন গা ধুচ্ছে বৌ, মাচায় ঝুলছে বড় বড় লাউ—আর রাখালরূপী মদন বলে লাউকি খেতে পাঁউ। লাজের মাথা খেল···

লাজের মাথা খেল বৌ ওগুলো গামছা ঢাকা দিয়ে বলে বে-আক্কেলে ঢ্যামনা ছেলে বলগে মাকে গিয়ে, ত্যাখন রাখাল ছেলে···

অনেকে তাল দিচ্ছে। দোকানে বসা বৌ-ঝিরা আঁচল মুখে জড়িয়েছে। হাসির শব্দ আসে।

গানের মধ্যে দুলাল জানতে পারল রাখালরূপী মদনগোপাল সত্যি সত্যি

লাউ আর লাউশাক খেতে চেয়েছিল, ঘোষ বৌ বোঝেনি। সেই রাতে ঘোষেদের লাউমাচা ছত্রাখান, মদনগোপালের গায়ের চাদরটা পড়ে আছে সেখানে। সেই থেকে ঘোষেরা মদনগোপালকে লাউ আর লাউশাকের ভোগ দেয়।

মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এখন ভোগের গ্রামের ঘোষেদের আমোদ-আহ্লাদ।—ওরে দেরে—আরও গরম গরম কচুরি দে…

বাঁশের খুঁটিতে লাগানো চটে সাঁটানো ছড়াগুলো পড়তে থাকে ওরা, আর বেড়ে, ব্বাহা এইসব প্রশংসার শব্দ করে। একজন ঐ ছড়াটাতে সুর দিয়ে গেয়ে ফেলে—

সব দই কি ভাল হয়
এমনটিতো কভু নয়
মহামায়ার দই-এর হাঁড়ির
সবকটা দই ভাল হয়।

লোকটা বলে—বারেব্বা, দেখেছো। কর্তাভজাদের ভাবের গানের প্যারোটি হয়েছে—বলেই মূল গানটা গাইল—সব ফল কি মিঠে হয় / এমনটিতো কভু নয় / কতক গেল রৌদ্রে পুড়ে / কতকগুলি পচে যায়…বলে এ গান কে বেঁধেছে?

দুলালচাঁদ কনে বৌয়ের মত নত মাথায় বলে—আমি।

—অন্যগুলি?

—আমি।

—হ্যাঁরে, তুইতো বেশ বড় বাঁধনদার রে, নাম কি তোর?

—দুলালচাঁদ।

—দুলালচাঁদ? বাব্বা, সতীমায়ের ছেলে? তুই নিজে দুলালচাঁদ হয়ে দুলালচাঁদের গানের প্যারোটি করিস? তোর মা জানলে প্যাঁদাবে।

দুলাল বলে মাকে দাওনা এনে, মায়ের হাতের প্যাঁদানীও মিঠা।

—তা যা না, কাছেই তো, সতীমায়ের সঙ্গে দেখা করে আয়, মদনপুর ইস্টিশন থেকে রেলে চেপে কল্যাণী, তারপরেই ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের থান।

—কতক্ষণ লাগে!

—আর কতক্ষণ? একঘণ্টাও নয়, তুই কি সত্যিসত্যিই যাবি না কি রে পাগলী?

—মালিক কি ছাড়বে, আজ মেলার দিন।

—তোর বাবা মদনগোপালকে বল, মালিকের মতি ফেরাতে, তোর মা তো আবার আমাদের বাবার প্রথম পক্ষ।

—সে আবার কি?

তখন এক গপ্‌পো শুনল দুলালচাঁদ। মদনগোপালের প্রথমপক্ষটিকে ডাকাতে কলঙ্ক করে। এ নিয়ে বাবা মদনগোপাল ঠেস্ মেরে কথা কয়েছিলেন তাঁর পরিবারকে। উনি তখন অভিমান করে যমুনা পেরোয়ে চলে গেলেন ঘোষপাড়া। রামশরণের পরিবারে সতীমা হলেন। আর তারই ছেলে দুলালচাঁদ। হাজার হাজার লাখ লাখ লোক তেঁনাকে মাগে…আর এদিকে মদনগোপাল বিরহে দিন কাটাতে লাগলেন। তাইতে এই গাঁয়ের নাম হল বিরহী।

সবতো ভুলেই ছিল ও। তার ঢ্যাঙাপানা বাপের চেহারাটা ক্রমশ আবছা হয়ে এসেছে। আর মায়ের কথা মনে হলেই সতীমার ডালিমতলায় ভীষণ ভিড়ের মধ্যে আলতা-সিঁদুর আর রক্তে ল্যাপটানো মায়ের ছবি ভাসে। ও তখন দুলালচাঁদ ছিল না। ওর নাম ছিল দয়াময়। দয়াময়রা কর্তাভজা। ওর বাপ মায়ের গলায় কণ্ঠি। ওরা একসঙ্গে গান করত—ভাবের গান। একদিন খুব ঝগড়া-চেঁচামেচি হল মা-বাবায়। তবে চল্লাম বলে চলে গিয়ে আর এল না দয়ার বাপ।

দয়ার মা কত কাঁদল, চাঁদপীরের থানে গোলকচাঁপা গাছে ঢিল বাঁধল। গণকঠাকুরকে হাত দেখাল। তারপর একদিন—দোলের দিনে দয়ার মা দয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেল সতীমায়ের থানে। মায়ের দয়া হলে সব হয়।

সেদিন দয়ার এক হাতে মুড়ির পুঁটলি আর অন্যহাতে মায়ের আঙুল। লোকজন-নাগরদোলা-জিলিপি-পাঁপড়ভাজার ঐ কোলাহলের মধ্যেও মায়ের হাতের নীল শিরাটা নিজঝুম রাস্তার মত এঁকেবেঁকে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

ওর মনটা কিরকম হু-হু করতে থাকে। দুপুরের দিকে একটু ছুটি চায় ও। মালিক ভিরমি খায়। এই মেলার দিনে কেউ ছুটি চায়? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মেলার মাঠের পিছনে পড়ে থাকা মরা যমুনার সোঁতায় দমকা বাতাসে পাতা ওড়ে।

মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দুলালকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দুই

ঘোষপাড়ার আমবাগানের ছায়ায় দুলালচাঁদ ঘোরে, সামনে দুঃখিনী মাঠ, ওধারে কর্তাবাবাদের বাড়ি। কোথায় গেয়েছিল দুলালের মা, কোন আমগাছ তলায় বসে 'এক ডালেতে দুলছে দুটি ফুল ফুলের রং চিনে ফুল বেছে তোল…'

এই তো সেই পুকুরটা, এর চার পাশেই ঘুরেছে নাগরদোলা, বেজেছে বেলুনবাঁশী।

পুকুরেই চান করেছিল মা। ভেজা কাপড়ে হত্যে দিতে দিতে ডালিমতলার দিকে গিয়েছে দুলালের মা, হাওয়ায় দুহাত, আঁচল লুটায়…জয় সতী মায়ের জয়—শব্দ ঝড়ের মধ্যে কচি গলার কান্নাটা হারিয়ে গিয়েছিল।

ডালিম গছে সতীমায়ের উত্থান হয় দোলের দিনে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দুলালের মা মুঠোর মধ্যে লোহা-সিঁদুর নিয়ে জয় জয় গো সতীমা—বলে হাজার লোকের হাউ হাউ ভিড়ের মধ্যে চুলে গেলে ভিড় ওর মাকে নিয়ে নেয়।

ডালিম গাছ সেদিন কল্পতরু। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দুলালের মা কি ডালিম গাছকে মনোবাঞ্ছা জানাতে পেরেছিল? কেননা কোলাহলের মধ্যে চিৎকার, চিৎকার ভীষণ হল, তুমুল হল, তারপর কোমল হল। ভিড় ছিত্তিছান হল, ভিড়ের মধ্যে অন্য একটা ভিড় ওর রক্তমাখা মাকে নিয়ে এল। কল্পতরু ডালিমগাছের গোড়ায় গিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল ওর মা, তারপর হাজার মানুষের মা ঐ পোয়াতী শরীরে পড়েছে। কাদামাখা শাড়ী করমচা লাল, মায়ের মুখের কষ বেয়ে লাল, নাক বেয়ে লাল।

এই রক্তিম শরীরটা ঘিরে এবার অন্যরকম ভিড়। ইনি যে সাক্ষাৎ সতী। ডালিম থানে দেহ রাখলেন। সতী মায়ের কৃপা আছে নির্ঘাৎ।

মায়ের থাংলা চুল ক্রমশ সিঁদুরে সিঁদুর পায়ে আলতা, শরীরে ফুল। দয়াময় তখন ভীষণ শব্দে মা বলে আর্তচিৎকার করেছিল।

—এই বুঝি এঁনার ছেলে, আহারে কী সুন্দর দ্যাখো…সাক্ষাৎ দুলালচাঁদ।

—ওগো সতীমায়ের ছেলে, একটু দাঁড়াও পেন্নাম করি।

—কোথায় গেল মা?

—তোর মা সগ্‌গে গেল বাছা, সগ্‌গে। ওর মা মর্গে চলে গেলে দয়াময়কে মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক কাছে ডেকে নেয়। নাম রাখে দুলালচাঁদ।

সমস্ত মাঠটা এখন থম্ মেরে পড়ে থাকা মায়ের হাতের নীল শিরাটার মত নিঝ্‌ঝুম। থুক করে থুতু ছিটোয় দয়াময়।

তিন

খুব ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে বিরহীর মেলার মাঠে ঢোকে দুলাল। মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হ্যাজাক জ্বলছে। সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল দুলাল, হেড কারিগর পাঁচুদা বলে—বাইরে ডাঁড়া দুলাল, সেই দুক্কুর বেলা দোকান পালিয়ে এখন এই এখন এলি! মালিক মানা করেছে। বাহ্যি ফিরে আসুক উনি, কথা কয়ে নিস।

দুলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নখ খোটে। একজন খদ্দের অন্য খদ্দেরকে বলে—মালিক কেমন রসিক দেখেছেন—কেমন ছড়া লিখে রেখেছে 'রাম ভজে কৃষ্ণ-হরি রহিম ভজে আল্লা। রাম রহিম মিলেমিশে ভজরে রসগোল্লা।' দারুণ লিখেছে। ব্বাঃ। বাঃ শব্দটা বুলবুলি পাখি হয়ে দুলালচাঁদের কাঁধে দোল খায়। দুলাল নখ খোঁটা বন্ধ করে। দুলাল এক গামলা টগবগানো লেডিকেনীর অনুভূতিতে বলে—ঐটা পড়ুনতো, ঐটা,—লোকটা পড়ে—

আসল দুধের না হলে কি
সরপুরিয়া গরম হয়
পাউডার দুধ দিলে পরে
আসল স্বাদটি নাহি রয়।

চমৎকার। তোমাদের মালিক তো সত্যিই বড় রসিক লোক হে। দুলাল মাথা নিচু করে, আঙুল কামড়ায়। কিছু বলেনা, শুধু খুশী হয়, বড় খুশী হয়।

—কিরে উল্লুক। ফিরলি যে বড়, যা—যেথা গেছিলি যা—

দুলালের মাথা নিচু।

—কিরে শোরের বাচ্চা, কথা কইছিস না যে···

—মা তুলবেন না।

ঠাস করে চড় পড়ে দুলালের গালে। আবার বড় গলা? কুচ্‌কি-কণ্ঠা সমান হয়েছে দেক্‌চি। খুব আস্পদদা। তোর কাজের দরকার নেই এখানে। নাই দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছিল···ভাগ। তুই তোর মালপত্র নিয়ে এখনি ভাগ।

দুলালচাঁদ টেরা তাকায়।

—বেতন ? তিনমাসের ?

—বেতন ?—নেঃ

ছুটে গিয়ে ক্যাশ বাকশো থেকে কয়েকটা দশটাকার নোট নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দীনবন্ধু। তুলাল কুড়িয়ে নেয়। চারটে।

—আর!

—হিসেব করে কেশনগরের দোকান থেকে নিয়ে নিবি।

—আর আমার গান গুলান ?

—মানে ? গান গুলান মানে।

—আমি যে গানগুলান বেঁধেছি ?—'আমার কাগজ, আমার আটিস্, বলেঁকিনা আমার গান! যাঃ তাই নেঃ' এই শব্দক'টা উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক ততটুকু সময়ের মধ্যে দীনবন্ধু ছুটে গিয়ে পিছনের চটের উপর সাঁটানো আসল তুধের না হলেকি সরপুরিয়া নরম হয় ছিঁড়ে ফেলে। চটের দেয়াল থির থির করে কাঁপে। তুলালচাঁদ তুহাত তুলে আর্তনাদ করে, বলে থাক! থাক!

ততক্ষণে ওটা ছেঁড়া এবং দলাপাকানো হয়ে গেছে। তুলালচাঁদ চটের দেয়ালের ফাঁকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—গানটা তবু থেকে গেল কিন্তুক।

দীনবন্ধু পিছনে তাকায়। চটের গায়ে কয়েকটা সাদা চল্টা ছাড়া কিছু দেখতে পায়না। দীনবন্ধু তখন আরও তিন চারটে পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলে। হাঁপায়।—যা—নিয়ে যা…

গান একবার দিলে আর নেয়া যায় না। তুলাল বিড়বিড় করে। চোখে জল। তুলাল ফিরে যায়।

চার

মা মরা দয়াময়টা যখন ঘোষপাড়ায় মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এসে পড়েছিল, ও তখন নেহাৎ বাচ্চা, বা হাতের চেটো শিক্নীমোছার কারণে খড়-খড়ে, গা চুলকোলে হাতের মাত্বলি বাজতো ঝনঝন। মালিক ওর নাম রেখেছিল তুলালচাঁদ। ও জানতো ও তুলালচাঁদ নয়। তুলালচাঁদ শুধু একটা ইয়ারকী। ওর গানের গলা ভাল ছিল। ওর মায়ের কাছে শোনা ভাবের গানগুলি আবছা মনেছিল তুলালের। গাইত তু-এক কলি। আর ইয়ারকী করে গান বাঁধতো পন্তুয়া নিয়ে, সিঙ্গারা নিয়ে, দরবেশ নিয়ে, রসগোল্লা নিয়ে।

মালিকের বড় ছেলে সুধাবিন্দু গত বছর বি কম পাশ দিল। এখন ব্যবসাপত্র দেখতে শুরু করেছে একটু একটু করে। ছেলে এসে দোকানে নতুন লাইট লাগিয়েছে; নতুন আলমারী। সুধাবিন্দু একদিন, দুলালচাঁদকে ডাকে। বলে হ্যারে, তুই নাকি গান বাঁধিস? দুলাল বোঝেনা গান বাঁধা ব্যাপারটা ভাল না খারাপ। ও চুপ করে থাকে। পাঁচুদা বলে চুম্‌মেরে আছিস কেন? দাদাবাবুকে বলনা রসগোল্লার গানট দুলাল প্রাণে বল পেয়ে বলে।

রাম ভজে কৃষ্ণহরি রহিম ভজে আল্লা
রাম রহিম দুজনাতে ভজে রসগোল্লা।

সুধাবিন্দু বলে বাহ্। আর একটা—

সুধাবিন্দু দুলালকে বাড়ি ডেকে নিয়ে গেল একদিন। পা জামা পরা গালে চাপদাড়ি একজন লোক ওখানে বসে চা খাচ্ছিল। দুলালকে বলা হ'ল দোকানের খাবারটাবার নিয়ে ও যত গান বেঁধেছে সবগুলো বলে যেতে। দুলাল তখন 'হরি চিত্ত হরি বিত্ত হয়ি নিত্য গানের মত করে সবের নাড়ু, সরপুরিয়া সরভাজা ও সন্দেশ গানটা বলল, সব ফল কি মিটে হয় গানটার মত করে সব দই কি মিঠে হয় বলল, 'সুধা ফেলে বিষপানে মত্ত অতিশয়' গানটার মতন করে 'ঘি ফেলে রেপসীডে ভাজা খাও মহাশয়' গাইল 'আপন হতে না পাকিলে গাছের ফল কি মিঠা হয়' গেয়ে নিয়ে দুলাল গাইল 'আসল দুধের না হলেকি সরপুরিয়া নরম হয়, পাউডার দুধ দিলিপরে আসল স্বাদটি নাহি রয়' আর দাড়িওয়ালা লোকটা কি সুন্দর কাগজে কত রকমের রং-এ ওর গানগুলো আঁকলো, দুলাল তো ভালকরে পড়তে পারে না, তাই—জানলনা কোনটা ওর সরপুরিয়ার গান, কোনটা রসগোল্লার, শুধু ওর সেবেলার পড়ে পাওয়া ছুটিটা ওর' গানের কথার ছবি হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে একরকম ভালই কেটে গেল।

আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকানো পোষ্টার গুলো এই মেলাতেই প্রথম লাগানো হয়েছে। প্রথম দিন সুধাবিন্দু এসে লাগিয়ে দিয়ে গেছেন। দুলাল কিন্তু জেনে গেছে—কোনটা ওর রসগোল্লার গান, কোনটা সরপুরিয়ার, মেনুলিস্টির পাশে কোন গানটা লাগানো আছে।

ঐ সব কিছু ছেড়ে, দুলালের চলে যেতে হয়। বেলুন বাঁশির শব্দ আর পাঁপড় ভাজার গন্ধ আবছা হয়। পীচ রাস্তায় বাঁক নেয় দুলালচাঁদ।

পাঁচ

বিরহী বাজারের বাস রাস্তায় সকালবেলায় দিদির সঙ্গে দেখা। দুলাল

অনেকটা হেসে বল্ল কীগো দিদি! দিদি মুচকি হাসলেন। দুলাল পেন্নাম করার জন্য নিচু হতেই লাল চটি সরে গেল। দিদির সঙ্গে একজন লোক। ফুলপ্যান্ট-গেঞ্জী। কপালে তেল হলুদের ফোঁটা। উনিই বোধ হয় দিদির মামাতো ভাই। সারাদিন দিদি তবে এখানেই ছিল। এখন বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

দুলালচাঁদ দিদির চোখের কাজল রেখার দিকে সোজা তাকিয়ে বলে—আমার কাজটা আর নাই দিদি, আমার কি হবে?

কাজলরেখা কুঞ্চিত হয়। দুলালের চোখের তলা চিক্ চিক করে ওঠে, জলটাকে কোনমতেই গড়াতে দেয় না। রানাঘাটের বাস চলে আসে—হুড়মুড় করে। দিদি আর সেই বুড়িমা উঠে যায়। দিদি হাত নাড়ায়,… লোকটা হাত নাড়ায়। লোকটা দুলালকে বলে—কাজ করবি তো চল।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর আত্মীয়বংশের ছেলে বাপী গোস্বামীর ব্যাংকলোন পাওয়া জুতোর দোকান গোস্বামী সু হাউসে কাজে লাগল দুলালচাঁদ। ঝাড়ু দাও, জল আনো, হয়ে গেলে দোকানেই থাকো, চা-টা এনে দাও,—এইসব। দুলাল ধীরে ধীরে বাটারফেলাই ৬ নম্বর আছে, মোকাসিন ৭ নম্বর নেই শিখে যায়। কিন্তু কাজে মন লাগেনা। সেই যে মেঠাই দোকানে, উছলানো তেলের মধ্যে কচুরীগুলোর ক্রমশ ফুলে ওঠা, টগবগানো রসে রসগোল্লার নাচ, দলদলে ছানা ফুলে ফেঁপে হয়ে উঠছে রাজভোগ, আর বোঁচকা, ন্যাড়া, পাঁচুদা, আর গান বাঁধা মেঠাইদোকানের মজাই আলাদা। এই গোস্বামী সু হাউসে, একদিন দুলালচাঁদ মালিকগোঁসাইকে বলব বলব করে বলেই ফেলেছিল একটা গান বেন্ধেছি দেয়ালে টাঙগায়ে রাখবেন বাবু?

কি গান? টেপ রেকর্ডের আর ডি বর্মনের ভল্যুম কমে।

ভোলামণ…

পরে নে গোঁসাইয়ের জুতো

পাড়ি দে বৈকুণ্ঠেতে—

পাবি ধন মনের মত…

—থাম্। জুতো পরিয়ে বৈকুণ্ঠ পাঠাতে হবেনা। খালি পাকামি। টেপ রেকর্ডের ভলুম বাড়ে। জিলেলে…জিলেলে…

একদিন কি যেন হাঁক পাড়ছিল মালিক। দোকানের কোণায় বসে থাকা দুলালের তখন অন্যদিকে মন। মালিক দুলালের দিকে তাকিয়ে ধমক দিল জোরে। বল্ল কতদিন বলেছি—কাজের সময় এখানে রামপ্রসাদ গিরি চলবেনা।

টেনে অ্যাইসা থাবড়া দেবোনা তোর গান বাঁধা এক্কেবারে ঢুকিয়ে দেব।
ধুস্ বলে দুলালচাঁদ সেদিনই পালায়!

ছয়

কেষ্টনগরে ফিরল দুলালচাঁদ। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে এগুতে থাকল মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দিকে। ও কান ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবে। দোকানের কাছাকাছি চলে এলে মুখে কাঁচুমাচু ভাব আর একপোঁচ ফ্যাকাসে রং। দূর থেকে দোকানটার দিকে তাকায়। এটাই কি সেই দোকান? চেনাই যায়না। চকচকাচ্ছে টেবিল চেয়ার, ফ্যান ঘুরছে বন্ বন্ বন্, কত আলো ঝলমলায়, দোকানের ভিতরে বাহারী রং, আর ঐতো, ক্যাশে বসে আছেন সুধাবিন্দু দাদা।

দুলাল আরো ছাখে, দেয়ালের গায়ে, নামের গায়ে, মেনু লিস্টের পাশে কাঁচ বাঁধানো কিছু বাহারী লেখা ফ্রেমের গায়ে সাঁটা। অক্ষরগুলির গায়ে জরির ঝিকিমিকি। দুলাল পড়তে পারেনা তাই জানেনা অক্ষরগুলির মর্মকথা।

দোকান থেকে বের হ'ল ন্যাড়া। টাকা ভাঙাতে যাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে ন্যাড়াকে ধরে দুলালচাঁদ। ন্যাড়া ভীষণ অবাক হয়। দুলালচাঁদ—তুই?

ন্যাড়া জানায়—পুরোন কিছু নেই। শুধু ন্যাড়া আর গান গুলান।

কোন গান গুলান? দুলালচাঁদের ব্যাকুল প্রশ্ন। ন্যাড়া হাসে। তোর। দুলাল ছাখে কাঁচ বাঁধানো জরির অক্ষর।

ও তবে ছিল। এতদিন তাহলে এখানেই ছিল দুলালচাঁদ।

গান ফিরোয়ে দিতে পারেনি মালিক। জরির অক্ষর ঝিকিমিকি ডাকে। ঐতো আসল দুধের না হলেকি, ঐতো রসগোল্লার গান, ঐতো পান্তুয়ার গান…

এক গাছ শিউলি ফুল ঝরঝর করল দুলালচাঁদের সর্বাঙ্গে, এক পুকুর শাপলা ফুটল। এক কড়াই রসে টগবগানো রসগোল্লা খিলখিল হেসে উঠল। বহে গেল ভরা জলঙ্গীর স্রোত। ও তবে ছিল। ওর গান এতদিন ছিল। ও এখানেও ছিল।

মালিক সুধাবিন্দু একবার ওর দিকে তাকায়। তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। চিনতে পারল না? নাকি ও কেউ নয় আর। ওর গানগুলো জরির অক্ষর হয়ে খদ্দের ডাকে। ও কেউ নয় আর।

তবু দুলালচাঁদ এগোয়। দোকানের তিভরে আলো, রং আর কাঁচ বাধানো জরির অক্ষর।

দুলাল তবু এগোয়। পেরুল চৌকাঠ। বলে, এলাম গো দাদাবাবু, আবার এলাম। সুধাবিন্দুর কপাল কুঁচকে যায় আর কাঁচ বাঁধানো দুলালচাঁদের গান দেয়ালে দেয়ালে উলু দিয়ে উঠে।

সোহাগ

কেশব দাশ

ট্যারা কালী হঠাৎ সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। অথচ খুবই সাদামাটা সাধারণ মাপের মানুষ ট্যারা কালী। চেহারায় চলনে বলনে এমন কোনো বিস্ফোরক বৈশিষ্ট্য নেই যা অন্যের নজর কাড়ে। কালো পানা বেঁটে খাটো চেহারা, পুরু ঠোঁট, একটা চোখ স্পষ্টত তেরচা।

আসল নাম ওর কালিদাস (জাত কুল-শীল পদবী অজানা)। যেহেতু ওর ডান চোখটা ট্যারা, তাই পাঁচ মুখে ওর সরল পরিচিতি ট্যারা কালী নামে। আসল নামে ডাকে না কেউ ওকে।

এই ট্যারা কালী বস্তি মহলে বিখ্যাত হয়ে উঠল রাতারাতি।

ট্যারা কালী বিয়ে করে বসল দুম করে। বিয়ে সকলেই করে। খঞ্জ খোঁড়া কানাও তার জীবনচারণে একটা যেমন তেমন নারীসঙ্গী খুঁজে নেয়।

আর এই বস্তি মহলের নিম্নবর্গীয় অভাবি জীবনযাত্রায় বিয়েটা দুম করেই হয় সাধারণত। ধুমধাম থাকে না, পঙক্তি ভোজের এলাহি আয়োজন নয়। রিক্সায় চাপিয়ে বউ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকিয়ে নেয়।

ট্যারা কালীও আলটপকা বিয়ে করে একদিন সকালবেলা বউ নিয়ে এলো। কেউ বরণ করল না নতুন বউকে, শঙ্খ ধ্বনি উলু ধ্বনি দিল না কেউ। মধ্যবয়স্ক ময়না মাসী, যে আয়ার কাজ করে হাসপাতালে, আর যার ডাকাবুকো দেমাকি বলে পরিচয় বস্তি মহলে, সে-ই প্রথম দেখতে এলো নতুন বউ।

বউ তখন তক্তাপোশে মুখে ঘোমটা ঢাকা দিয়ে বসে। আর ট্যারা কালী নিজের ঘরেই পরের মতো জড়সড়ো দাঁড়িয়ে এক কোণে। ময়না মাসী চৌকাঠে পা দিয়েই কপট তিরস্কার হানে, 'হ্যাঁরে ট্যারা, তুই বে করলি কাক পক্ষিতেও টের পেল না। এত মতলব তোর পেটে পেটে···', বলে এগিয়ে গেল নতুন বউয়ের দিকে। 'দেখি মেয়ে তোমার মুখ···', বলে নিজেই ঘোমটা সরিয়ে দেয়, আর তৎক্ষণাৎ, চোখ আর মনের সংঘাতে বিস্ময়ে থ হয়ে যায়। যেন ছাই হাতড়াতে এসে হিরের টুকরো দেখে ফেলেছে ময়না মাসী। নতুন বউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তের জন্য হলেও, নিজের মুখের নকল দেমাকি খোলসটা খসে যায়। অবাক স্থির দৃষ্টিতে বউয়ের মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, 'ট্যারা, এ বউ কোথা পেলি রে—এ যে সুন্দরী অপ্সরী···'

ময়না মাসী ট্যারা কালীর ঘর ছেড়ে বেরিয়েই বস্তিময় ঢ্যারা পেটোয়। কথাটা কানাকানি হয় বস্তির মহিলা মহলে। সকলে ছুটে আসে ট্যারা কালীর দোরগোড়ায়। এক লহমায় নতুন বউ দেখার উৎসুক্য উপছে পড়ে। সকলে দেখে, আর সকলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ না করে এক মত হয় যে, বউ দেখতে সুন্দর। যেমন নাক চোখ মুখ, তেমন গায়ের রঙ। এমন সুন্দর বউ আগে বস্তির আর কারো ঘরে আসে নি। খানদান ভদ্র ঘরে খুঁজলেও কম পাওয়া যাবে। আর এ বউয়ের সঙ্গে কালো বেঁটে দেড় চোখো ট্যারা কালীর কোনো তুলনাই চলে না। কথায় আছে, বাঁদরের গলায়…

খবরটা বাত্যা প্রবাহের মতো দ্রুত গতিতে বস্তি সীমানা ছাড়িয়ে বহু দূর পল্লবিত হয়। রাতে শয্যায় স্বামীর সোহাগে নিবিড় হতে হতে গদ গদ স্বরে কোনো বউ বলে, 'একটা লোক, ট্যারা না কি যেন নাম, কালো বাজে দেখতে; থাকে বস্তিতে—বিয়ে করেছে। জানো তো, বউটাকে কি সুন্দর দেখতে। টানা টানা চোখ নাক আর গায়ের রঙও সে রকম। ঠিক প্রতিমার মতো…'

স্বামীর মগ্নতা টুটে যায়। ছেঁড়া বাতিল কাপড়ের পৌটলা পুঁটলি হাটকানোর মতো স্ত্রীর শরীরটা এলোপাথাড়ি হাতড়েই স্বামী আজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শোয় পাশ ফিরে। স্ত্রী অবাক স্বরে বলে, 'কি হল আজ? তোমার?'

বোকা বৌটি বোঝে না, ক্ষণকাল আগে তার পরস্ত্রী প্রশংসা আপাত নিস্পৃহ স্বামীর বুকে কি পরকীয় কামনার আগুন জেলে দিয়েছে!

যে কোনো অসম ঘটনার পেছনে যেমন একটা কারণ সন্ধানের উৎসুক্য জাগে মনে, সে রকম এ ক্ষেত্রেও, এই যে একটি সুন্দরী মহিলার একটি প্রায় কুৎসীৎ পুরুষকে জীবনসঙ্গী মেনে নেওয়া, তার কারণ খোঁজে সকলে। আর জানাজানিও হয়ে যায় মুখে মুখে। এবং যেহেতু কারণটা ছিল যুক্তির সঙ্গে খাপ সই, তাই সকলের বিশ্বাস করতে অসুবিধা হল না। সকলে বলল, 'আসলে বউটা গরিব তো…মা আছে, বাপ-ভাই কেউ নেই, মা ঝিয়ের কাজ করে, তাই এমন একটা আকাটের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।'

কথাটা পুরুষদের কানে পৌছালে তারা হিংসা আর লালসায় আরো জ্বলল। নিজেদের ভাগ্যকে দুয়ো দিল মনে মনে। তাদের স্বার্থপরতা এই পর্যায়ের যে, সোনা কুড়িয়ে পেলেও ভিখিরির আবার নেওয়ার অধিকার কি!

অন্য ভাড়াটে মেয়ে বউদের এখন সর্বক্ষণ লক্ষ্য নতুন বউটির দিকে। নতুন বউ কি বলে কি করে তাই নিয়েই ওদের আলোচনা। বউটি বস্তির আর পাঁচটা বউয়ের মতো খর দাপটে নয়, বরং চলনে বলনে শান্ত। প্রশ্ন করলে

উত্তর দেয় কম, হাসে বেশি। তাও হাসিটা দুই ঠোঁটে ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়।

কেলোর ঠাকুমা, নিন্দুক ঠোঁট কাটা বুড়ি, একদিন শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'আহা গো, পোড়া কপাল মেয়ের, এর চে গলায় কলসি বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিলে পারত…'

বউ শুনে অস্ফুট হাসল শুধু। কথার শ্লেষ কিরিচ হয়ে বউটির মর্মস্থল বিদ্ধ করল কি করল না, বোঝা গেল না।

ট্যারা কালীর দোকান চৌ-রাস্তায়। পান-বিড়ির। ছোট্ট, তিন হাত বাই তিন হাত চৌখোপ। ট্যারা কালীর দোকানে যে বাবুটি প্রতি দিন পাঁচ প্যাকেট ফিল্টার উইলসের বাঁধা খোদ্দের, তিনি সিগ্রেট কিনতে এসে বললেন, 'তুই বিয়ে করলি জানালি না। বউ নাকি হয়েছে সুন্দর। তা একদিন নিয়ে আসিস বাড়িতে, নেমতন্ন রইল…'

কথাগুলো বলতে বলতে বাবুটির চোখে মুখে গোপন লালসার ছাপ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

সেদিন পাড়ার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ট্যারা কালী, ছোট শিবে ডাকল, 'ট্যারাদা, শোনো—'

ট্যারা কালীর বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ছোট শিবে পাড়ার দ্যাম। বি-কেলাশি ফেরেববাজিতে গুরু। ভয়ে ভয়ে ট্যারা কালী ছোট শিবের সামনে এসে দাঁড়ায়। ছোট শিবে বলে, 'তুমি নাকি বে করেচ মাইরি…ডুবে ডুবে জল খাও গুরু! মাল নাকি জম্পেস…'

নিরীহ নিরুপদ্রব ট্যারা কালীর অবদমিত আত্মমর্যাদাবোধও হঠাৎ খোঁচা খায়। এক লহমায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাঁটা দেয়। পেছনে শোনে, ছোট শিবে বিশ্রী রকম হাসতে হাসতে বলছে, 'একদিন যাবো বউ দেখতে, বাড়িতে, বুঝলে তো…'

ঘরের গায়ে ঘর। মাথার ওপর টালির ছাউনি। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া এক ফালি বারান্দায় চাঁচালি ঘেরা রান্নার পরিসর। এমন খোপ খোপ ঘর গায়ে গায়ে আটটা। ঘর থেকে আর এক ঘরে দৃষ্টি চলে যায় অবাধে। একটু কান খাড়া রাখলে অন্য ঘরের ফিসফিসানিও শোনা যায়। গোপনীয়তা বা আব্রু রক্ষার আড়াল নেই কোনো। ঘরগুলোর মাঝখানে উঠান এক টুকরো। এজমালি। চলতে ফিরতে সকলের ব্যবহার্য। ছোট ছেলে

মেয়েরা খেলে, দৌড় ঝাঁপ করে। মায়েরা শিশুদের নড়া ধরে হিসি করায় পায়খানা করায়। বউ-ঝিউড়িরা স্নান করে উঠে কাপড় ছাড়ে উঠানে।

ট্যারা কালীর দোরগোড়ায় ইদানীং উঠতি ছেলে আর বয়স্ক পুরুষদের পদচারণা বেড়ে গেছে। কাজের ছলে তারা উঠানে ঘোরাফেরা করে আর ট্যারা কালীর ঘরের ভেতর আড় চোখে তাকায়। মেয়েদের মতো সমর্থ পুরুষরা নির্দ্বিধায় ঘরে ঢুকে গিয়ে বউ দেখতে পারে না। বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে পারে না। তা হবে লোকাচার বিরোধী। তাই তারা লুকিয়ে চুরিয়ে চোখের তৃষ্ণা মেটানোর ফিকির খোঁজে।

বৃদ্ধ বিষ্টুচরণ, বয়সের ভারে মাজা যার ভাঙা, চোখে চালসে, সারাদিন পাছার নিচে পিড়ি পেতে বসে থাকবে উঠানে। হাতে থাকে তার জপ মালা। যেহেতু বয়সের দাবিতে নির্দোষ তার স্বীকৃত, তাই রাখা ঢাকার ধার ধারে না। ট্যারা কালীর ঘরের দিকে মুখ করে বসে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকবে। তখন স্থির তন্ময়তায় জপ মালা গুণতে ভুলে যায়। অনেকে টিপ্পনি কাটে, দুয়ো দেয়, তাতেও বুড়োর গোদা মর্যাদাবোধে আঁচড় পড়ে না। একদিন তো ময়না মাসী হাত-পা নেড়ে হাট বসায়—'এ্যাই বুড়ো, কি করিস সারাদিন বসে এখানে?'

প্রথমটা বুড়ো শুনতে পায় নি এমন ভান করে। অতঃপর ময়না মাসী বুড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বলতে বুড়ো ফোকলা দাঁতে এক গাল হেসে বলে, 'রোদ পোয়াই। রোদটা পড়ে তো উঠনে...'

'রোদ পোয়াও? হাঁ করে দেখ কি ওদিকে...বেহায়া বুড়ো ভাম। চ্যাঙদোলা করে তুলে ফেলে দিয়ে আসব রাস্তায়...'

একদিন দেখা যায়, ট্যারা কালী দোরগোড়ার সামনে একটা ভারি চটের পর্দা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। ঘর আর রান্না ঘরের মাঝখানে বারান্দার ফাঁকটুকু পর্দায় ঢাকা পড়ে যায়। পর্দা না সরালে বাইরে থেকে ট্যারা কালীর ঘরের ভেতর দৃষ্টি যায় না। অবশ্য এই পর্দা টাঙানো ব্যাপারটা ট্যারা কালীর নিজের বুদ্ধিতে না কি বউয়ের প্ররোচনায়, তা অবশ্য জানা গেল না।

পাড়ার ড্যাম ছোট শিবে একদিন এলো। নিজের ঘরে ঢোকার মতো নির্দ্বিধায় পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ট্যারা কালীর ঘরে। ট্যারা কালী তখন ঘরেই ছিল। ট্যারা কালীর বউয়ের মুখোমুখি হয়েই ছোট শিবে এক মুহূর্তে থমকে যায়। বিস্ময়ে চোখ স্থির। হোঁচট খেয়ে গলার স্বর জড়ানো। '...স স স-ল্লা, কি জিনিস মাইরি।'

এমন অসম অবস্থার মুখোমুখি হয়ে বউটি দ্রুত রান্না ঘরে ঢুকে আড়াল হয়। ছোট শিবে খাটে বসে আয়েশ করে। বলে, 'চা খেয়ে খাই, নাকি, তোমার বউয়ের হাতে ’

যাবার সময় বলে, 'আবার আসব মাঝে মাঝে…'

ইদানীং ট্যারা কালীর ব্যবসায় মতিগতি অস্থির। দুম করে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। কখনো ঝাঁপ তোলেই না সারাদিন। দোকান বন্ধ থাকে। পাশে চা দোকানের বুদো বলে, 'ঘরে মধু, আহা, বেচারার কি মন বসে দোকানে…'

* * *

বউটা চুয়াল্লিশ দিন ঘর করল ট্যারা কালীর সঙ্গে। পঁয়তাল্লিশ দিনের দিন উধাও হল। রাতে দোকান থেকে ফিরে কালী দেখল বউ নেই। রাত ফুরিয়ে সকাল হল বউ এলো না। লোকালয়ে ট্যারা কালীর বিয়ের মৌতাত তিথিয়ে গেছিল, এখন আবার বউ পালানোর ঘটনাটা আলোচনার নতুন খোরাক জোগাল। পাঁচ মুখে খবরটা ছড়িয়ে ভ্যানা মাছির মতো গুঞ্জন তুলল।

ট্যারা কালী গুম খেয়ে বসে থাকল ঘরে। আগের দিন রাতে কিছু মুখে তোলে নি, আজও কিছু খেল না। দোকান খুলতেও গেল না। সমূহ শূন্যতা বুকে নিয়ে বসে রইল শুধু।

বেলায় ময়না মাসী এলো ঘরে। ময়না মাসীকে দেখেই ট্যারা কালী কেঁদে ফেলল। ভেউ ভেউ করে অঝরে। কান্নার ধকলে গলা দিয়ে হিক্কা উঠতে লাগল। খেলনা হারিয়ে শিশু যেমন কাঁদে তেমন অবুঝ অনর্গল কাঁদতে লাগল ট্যারা কালী।

ময়না মাসী বুঝ দেয়, 'কাঁদিস না, ও যাবেই, ও কি ধরে রাখা যায়, ও যে আগুন…তোর ভুল হয়েছে ওকে ঘরে তুলে। যে যেমন তাকে তেমনই মানায়…'

ট্যারা কালী কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ঠিকই মাসী। কি আছে আমার? কেন থাকবে আমার কাছে? আমার জন্মের ঠিক নেই, দেখতে ভূতের মতো… তবু সে থাক যেখানে, ভালো থাক ’

নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করে নিরাশ্রয় মনের একটু আশ্রয় খোঁজে ট্যারা কালী।

ট্যারা কালী জন্মাবধি মা-বাবাকে দেখে নি। কারা যে ওর মা-বাবা

তাও জানে না। হাসপাতালে জন্মের পর ওর মা ওকে বেড়ে শুইয়ে রেখে পালায়। ওকে কোলে তুলে নেয় হাসপাতালের এক ধাঙড় বউ। সেই ওকে পালে। একটু বড় হলে ধাঙড় বউটি ট্যারা কালীকে এক খৃশ্চান মিশনে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হয়। মিশনের অনুশাসন আর ঔদাসীন্যে ট্যারা কালীর শৈশব কেটে যায়। কৈশোরে পৌছালে মিশনের ফাদার একদিন ওকে ওর জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন, এবার তুমি তোমার পৃথিবীকে চিনে নাও।

এমন স্নেহহীন উষর জীবন ট্যারা কালীর। বেহাল নৌকার মতো ভেসে বেড়ানো ঘাটে ঘাটে। চৈত্রে ফুটি ফাটা মাটির মতো মনটা একটু স্নেহ ভালোবাসার জন্য লুলিয়ে উঠেছে কখনো কখনো। তবু বিয়ে সম্পর্কে যে মেয়েছেলেটাকে ঘিরে মনে ভালোবাসার বাগান সাজিয়েছিল ট্যারা কালী, সেও পালিয়ে গেল, ভালোবাসার সমস্ত গিঁট গেরো ছিঁড়ে।

ট্যারা কালীর বউ পালানোর খবর নিয়ে বস্তি এখন তোলপাড়। মেয়ে পুরুষ সকলের মুখে এখন ওই একই আলোচনা। সকলে বলল, বউটা পালিয়েছে ছোট শিবের সঙ্গে। আর এও ঠিক, যেদিন থেকে ট্যারা কালীর বউ উধাও, সেদিন থেকে ছোট শিবেরও কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং, কার্য কারণ বিচারে দুটো ঘটনার মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে, সেটা ধরে নিতে বাধা কোথায়! আর তেমনটা হলে তো ভালোই, ব্যাপারটা আরো স্বাদু মাখো মাখো হয়।

একজন বলল, 'ছোট শিবে জানালা দিয়ে বউটাকে চিঠি দিত, লুকিয়ে লুকিয়ে…'

কথাটা কানাকানিতে তুফান তুলল। এই নিয়ে চলল কদিন জোর জল্পনা। বউটা চিঠির উত্তর দিত কিনা, কি লিখত…দিত নিশ্চয়, ঘর ছেড়ে পালানোর রাস্তা তৈরি তো রাতারাতি হয় নি, ইত্যাদি।

কালাচাঁদ একদিন বলল, ও নাকি বউটাকে দেখেছে দাশনগরে, মায়া টকিজের সামনে। সঙ্গে ছোট শিবেও ছিল। '…মাগীর কি ঢলানি, ফুর্তিতে গড়িয়ে পড়ে রাস্তায়…'

কালাচাঁদ দাশনগরের একটা ঢালাই কারখানায় কাজ করতে যায় প্রত্যেক দিন।

রোয়াকের ছেলেরা ছড়া বাঁধল—

'ট্যারা কালীর সাধের টিয়া
শিবের সাথে ফুড়ুৎ হল
বুক জ্বালিয়ে দিয়া…'

কয়েক দিন পর আবার ট্যারা কালী কাজে মন দেয়। দোকান খোলে। ঘরের টানে ঝপ করে দোকান বন্ধ করে দেবার তাগিদ থাকে না এখন। কোনো টান নেই ঘরের ওপর। নিজের ঘরটাই যেন এখন পরবাস। ঘরে পা দিলে বুক খা খা করে ওঠে।

রাস্তায় অনেকে টিকা-টিপ্পনি কাটে। ঠেস মেরে কথা বলে। অনেকে সমবেদনা জানানোর ছলে চিবিয়ে চিবিয়ে হুল ফোঁটায়। এসব গায়ে মাখে না ট্যারা কালী।

ট্যারা কালীর মনে যখন হঠাৎ নিঃসঙ্গতার ফাঁক ফোকরগুলো একটু ভরাট হয়েছে, এমন সময়, উধাও হওয়ার ঠিক বত্রিশ দিন পর একদিন বিকালে বউটা ফিরল। ট্যারা কালী তখন সবেমাত্র দোকানে বেরোবার উদ্যোগ করছিল।

সকলে ভাবল ট্যারা কালী ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটাবে একটা। ঘর ত্যাগী কুলটা বউকে খিস্তি-খিউড় মার-ধোর করে তাড়াবে। চরম প্রতিশোধ নেবে মেয়ে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার।

কিন্তু সকলে যারপরনায় বিস্মিত ও আশাহত হল, যখন দেখল, তেমন ঘটনা তো ঘটলই না, বরং বউটাকে নিঃশব্দে ডেকে নিল ঘরে।

এই বস্তির অধঃস্তরীয় পরিবারগুলির মেয়েছেলেরা যে সতী সাবিত্রী সব, এমন নয়। তিন-চার সন্তানের মা-ও পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেছে, এবং আবার ফিরে এসে দিব্যি নির্বিকার ঘর সংসার করছে, এমন দৃষ্টান্ত খুঁজলেও কম মিলবে না। অনেক স্বামী স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে শাঁসাল পয়সাওলা পুরুষের কামনার আগুনে নিজের বিয়ে করা স্ত্রীকে ঠেলে দেয়। এখানে অনেকের পরিচয়ের সঙ্গেই লেপটে রয়েছে এমন কেচ্ছা লিলেখেলার কিস্যা।

তবু নিজের মুখ পুড়িয়ে অন্যেরও পোড়া মুখ দেখতেই আনন্দ বেশি।

বউয়ের অনুপস্থিতিতে ট্যারা কালীর ঘর আর রান্না ঘরের মাঝে ঝুলন্ত পর্দাটা উঠে গেছিল। এখন আবার ঝুলল। আজ আর দোকান খুলতে গেল না ট্যারা কালী। বেরল হাতে ব্যাগ নিয়ে। ব্যাগ ভর্তি বাজার নিয়ে ফিরল। অনেক দিন পর আবার চুলোয় আগুন পড়ল। রাত্রি অবধি রান্নার ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ উঠল। ব্যঞ্জনাদির সুগন্ধ। আর সেই সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে ভেসে এলো ওদের নিবিড় ফিসফাস, হাসি আর খুনসুটির ভগ্নাংশ। জীবনের উৎস মুখটা যেন ধুলো ময়লায় সাময়িক রুদ্ধ হয়ে গেছিল, একটু উস্কে দিতেই ফের সহস্র ফোয়ারায় স্বতোৎসারিত। লাগোয়া ঘরের

বউ-ঝিরা এসব দেখে বুকের জ্বালা জুড়োতে বলল, 'ব্যাটা ছেলে? ছিঃ, ভেড়ুয়া খানকির…'

তখন গভীর রাত্রি। দিনমানে গরম তাওয়ায় খই ফোটার মতো টগবগে সমগ্র বস্তিটাও তখন ঘুমে নিথর। এমন সময় একটা বিকট আর্তনাদে অনেকের ঘুম ভেঙে গেল। ট্যারা কালীর লাগোয়া ঘরগুলোর মেয়ে পুরুষরা ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে নেমে এলো উঠনে। সকলে দেখল, ট্যারা কালীর বউ ঝাঁপাচ্ছে সারা উঠন জুড়ে। বউটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লকলকে আগুনের বেষ্টন। সকলে ধরে চাপড়ে চাপড়ে আগুন নেভাল। তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেল হাসপাতালে।

যারা বউটাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছিল, তারা সকালে ফিরে এসে বলল, 'মারা গেছে! বাঁচে! পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছিল সারা শরীল…'

বউটি, উপর্যুপরি আলোচনায় যে মুখ্য হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ তাকে ঘিরে ঘটনার এমন আকস্মিক যবনিকা পতনে সকলে একটু মুষড়ে গেল। হিসাবের বাইরে বড় একটা কিছু ঘটে গেলে যেমনটা হয়।

অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য সকলে ধরল ট্যারা কালীকে, 'কি হয়েছিল, বলত, রাত্রে…'

ট্যারা কালী নিশ্চুপ। চোখের দৃষ্টি ভাসা ভাসা। সাধারণ জ্ঞানগম্মিগুলো যেন একটা কঠিন খোলসে ঢাকা পড়ে গেছে।

'বলো না কি হয়েছিল, বলো…'

ট্যারা কালীর ঘোর আলভোলা ভাব। শুধু আলতো ঠোঁট নেড়ে কি যেন বিড়বিড়ায়।

একজন ট্যারা কালীর শরীরটা সজোরে নাড়া দিয়ে বলে, 'তুমি কিছু করেছ, নাকি বউটাই নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে…'

ট্যারা কালী হঠাৎ ভয়ার্ত করুণ দৃষ্টি মেলে ডুকরে উঠে বলে, 'পুড়ে গেল, পুড়ে গেল—বড় জ্বালা সব্বাঙ্গে…'

সাগ্নিক

চন্দন সেন

চরিত্র ঃ—প্রমিথিউস ॥ পলিমিয়াস ॥ হিফাস্টাস ॥ জিয়াস ॥ কোরাস ॥

দৃশ্য-দূরে ইথিয়া পর্বত ॥ সামনে স্বর্গপ্রান্তর, (পলিমিয়াস ও হিফাস্টাস আলোচনারত)

হিফা ॥ কি অপরূপ এই অপরাহ্নবেলা! স্বর্ণরঙিন সূর্য্যরেণুতে আদিগন্ত উদ্ভাসিত। অগ্নিমেখলা সহস্র ল্যাবারগম উন্মুক্ত প্রান্তরে সান্ধ্য হাওয়ায় নৃত্যরতা। দূরে দূরে স্বর্গের অসংখ্য দেবদেবীর হিরণ্ময় কক্ষগুলির স্বপ্নিল আভাস। এই রমণীয় সন্ধ্যায় কেন, কেন এমন অঘটন ঘটতে চলেছে, কেন শক্তির দেবতা পলিমিয়াস?

পলি ॥ নিয়তির পদক্ষেপ সর্বত্রই অনিশ্চিত বলে মান্য করি আমরা। নচেৎ দিনরাত্রির এই শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত্তগুলিতে প্রকৃতিদেবীর নিস্তব্ধ বাঙ্ময়তাকে কেন আমরা প্রশান্ত হৃদয়ে উপভোগ করতে পারছি না? এক অদ্ভুত আতঙ্কের অশরীরী ছায়াপাত ঘটছে বারবার, এটা হয়তো নিয়তি—নির্দিষ্ট অত্যাচার- অগ্নির দেবতা হিফাস্টাস!

হিফা ॥ আজই হয়তো অনতিদূর মুহূর্তেই-আসছে জিয়াস, হয়তো আজই এই সন্ধ্যার অন্ধকার আরো সংবদ্ধ হবার পূর্ব্বেই প্রমিথিউসের স্কন্ধে ভর করবে নিয়তির নিষ্ঠুরতম দুর্বহ অভিশাপ।

পলি ॥ বিগত এমনই এক সন্ধ্যায় দেবতা অ্যাটলাসের ভাগ্যও হয়ে উঠেছিল অপ্রসন্ন হিফাস্টাস। অ্যাটলাস স্বর্গরাজ্যের ভয়ংকর ক্রোধ কুড়িয়েছিল তার অনমনীয় দৃঢ়তার মূল্যে, অ্যাটলাসও এই প্রমিথিউসের মতই নিশ্চিন্ত সুখী দৈবজীবনকে অস্বীকার করেছিল একের পর এক নিষিদ্ধ প্রশ্নে। মনে পড়ে হিফাস্টাস?

হিফা ॥ বিস্মৃত হওয়া যায়, পলিমিয়াস? না, অ্যাটলাস অবিস্মরণীয় তেজে এখনো এই স্বর্গের প্রতিটি দেব-দেবীর হৃদয়ে দেদীপ্যমান। প্রমিথিউস যেমন জিয়াসকে অগ্রাহ্য করে তোমার গুপ্ত ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যকে অসংকোচে

বিলিয়ে দিয়েছে মর্তের অসংখ্য মানব-মানবীর মধ্যে, ঠিক একই দুঃসাহসে অ্যাটলাস একদিন প্রশ্ন তুলেছিল দুর্লঙ্ঘ্য দেবমহিমার বিরুদ্ধে—

পলি ॥ এবং দেখো নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। অ্যাটলাস আজ আর কোন প্রশ্ন করতে অপারগ, দেবরাজ জিয়াসের অলঙ্ঘ্য বিধানে তার উদ্ধত অভ্রংলিহ মস্তিষ্ক আজ কি বিষন্ন ক্লান্তিতে অবনত! সমস্ত পৃথিবীর দুর্বহ গুরুভার আজ জিয়াসের নির্দেশে অ্যাটলাসের স্কন্ধে অর্পিত। অ্যাটলাস প্রশ্নহীন মৌনতায় আর প্রতিবাদহীন শ্রান্তিতে বহন করে চলেছে বিশাল ভূমণ্ডলকে আপন স্কন্ধে।

হিফা ॥ অর্থাৎ স্বর্গের বিধান শাশ্বত অক্ষয় অব্যয়। আমরা দেবতারা অনাদি অনন্ত কাল থেকে প্রশ্নহীন বশ্যতায় তাকে মান্য করে আসছি, মান্য করে যেতে হবে আগামী অনন্তে।

পলি ॥ অর্থাৎ দেবতা অ্যাটলাসের মত স্বর্গরাজ্যের এই অমলিন আনুগত্যের প্রমোদভূমিতে কোন অকারণ প্রশ্ন তুলে আমাদের অভিশপ্ত হওয়া চলবে না।

হিফা ॥ অর্থাৎ প্রমিথিউসের মতই দেবরাজ জিয়াসের ইচ্ছার বিরোধিতা করে দেবতাদের কোন একান্ত সম্পদকে বণ্টন করা চলবে না।

হিফা+পলি ॥ অর্থাৎ এখানে চাই জিয়াসের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য নির্বিচার ভক্তি আর অন্তরের সমস্ত নিষিদ্ধ প্রশ্নগুলোকে শৃংখলিত করে প্রমোদময় মৃত্যুহীন অস্তিত্ব! (প্রমিথিউস ঢোকে)

প্রমিথিউস ॥ হায় হিফাস্টাস, হায় পলিমিয়াস, আজ স্বর্গের সমস্ত পথে-প্রান্তরে পুষ্পিত কাননে এমন কি নিঃসঙ্গ স্বপ্রচারণেও ঐ এক শব্দ—এক দুঃসহ শব্দ যেন পৌনপুনিক অন্ধ আর্তনাদ—"আনুগত্য—আনুগত্য।" পার না হিফাস্টাস-অগ্নির দেবতা হিফাস্টাস, পারনা শক্তির দেবতা পলিমিয়াস দুর্বার শক্তিতে, অনির্বাণ আত্মপ্রত্যয়ে একবার ঐ "আনুগত্য" শব্দটাকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে? ছাই করে দিতে পারনা, পারনা?

পলি ॥ প্রমিথিউস, তুমি নিজে আজ অভিশপ্ত হতে চলেছ, আমাদেরও টানছ কেন?

হিফা ॥ প্রমিথিউস, তুমি বীর কিন্তু দুঃসাহসী! এক বুদ্ধিহীন উন্মাদনায় তুমি প্রশ্ন তুলেছ দেবরাজ জিয়াসের চিরন্তন আধিপত্যের বিরুদ্ধে! তুমি

আমার সঞ্চিত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছ—এখন আমাদেরও চাইছ ঐ সর্ব্বনাশের অন্ধকারে ঠেলে দিতে ?

প্রমিথিউস ॥ না ? না পলিমিয়াস—না হিফাস্টাস। মিথ্যা-মিথ্যা তোমাদের ধারণা। প্রমিথিউস আজ এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় অন্ততঃ তার বিচারের পূর্ব্ব মুহূর্তে তোমাদের সামনে শপথ করে বলতে পারে— জীবনে অনৃতভাষী হয়নি সে কখনো, কখনো সে ছলনা জানে না। আমার মাতা থেমিস যাঁর প্রজ্ঞা আর ভবিষ্যৎ বাণী ত্রিভুবনবিদিত তিনি জানেন, উন্মত্ত সিংহের সামনে দাঁড়িয়েও আমি যতখানি অবিচলিত— প্রচণ্ড লুব্ধতার হাতছানিতেও ততখানি নিস্পৃহ।

হিফা ॥—আমরা জানি, তুমিই ক্রোনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিয়াসকে সাহায্য করেছিলে।

পলি ॥ —আমরা জানি, তুমি তোমার বিরল বীরত্বে আর সীমাহীন শৌর্যে তোমার বন্ধু জিয়াসকে করেছিলে স্বর্গাধিপতি।

প্রমিথিউস ॥ ঠিক তাই। সেদিন এমনকি এই পবিত্র স্বর্গীয় বাতাস ঐ নির্মল তরঙ্গোচ্ছল ঝর্ণাধারাও এক গভীর গোপন বার্তায় আমার কানে কানে অনেক কিছু বলে গেছে। তোমরা তো জান, রাতের নিবিড় নৈঃশব্দেও সংখ্যাহীন তারকামালা আমায় সহস্র প্রলোভনের ইংগিত সেদিন দিয়েছে। প্রাজ্ঞ হিফাস্টাস, তুমি তো জান, শক্তির দেবতা পলিমিয়াস তুমিও তো জান, সে সব গোপন বার্তা আর ইংগিত হেলায় তুচ্ছ করেছি। তারপর—তারপরে জিয়াস বসেছে স্বর্গের স্বর্ণ-সিংহাসনে।

হিফা ॥ কি—কি চেয়েছিলে সেই নির্লোভ বীরত্বের বিনিময়ে সেইদিন প্রমিথিউস ?

পলি ॥ কিসের গোপনমোহ তোমায় সেদিন, শক্তিমান তোমায় সেদিন, শক্তিধর ক্রোনাসের বিরুদ্ধে সেই অপরূপ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রমিথিউস ?

প্রমিথিউস ॥ (বিসন্ন হাসি) কিছু নয়—। একটা অদ্ভুত চেতনা। তোমরা জান, আবার নিরুদ্দিষ্টা মাতা থেমিস আমার জন্মের পরেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিল নৈঋত—কোণের এক নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে— প্রমিথিউস বিদ্রোহী হবে। প্রমিথিউস স্বর্গ-মর্ত কাঁপিয়ে তুলবে এক দুর্দম চেতনার মন্থনে।

হিফা ॥ তোমার প্রাজ্ঞ মায়ের সেই ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হয়েছে। তবুও তবুও

যে মুহূর্তে তোমায় দেখলে আমাদের অন্তর করুণায় আর দুঃখে কেঁপে ওঠে সেই মুহূর্তে হায়! পিতা জিয়াসের আদেশে তোমায় ঘৃণাও করতে হয়।

প্রমিথিউস॥ এই এক অন্ধ অদৃষ্ট নিয়ে এই স্বর্গরাজ্যের দেবতারা দিনযাপন করে। নীচের দুঃখ-যন্ত্রণা কাতর মানুষের মতই আমাদের—তোমাদের সবার অনুভূতি আছে, তবু প্রকাশের ভাষা নিয়ন্ত্রিত। আমি চেয়েছিলাম শুধু এইটুকুই চেয়েছিলাম আমার বন্ধু দেবতা জিয়াস সিংহাসনে বসে এই নিয়ন্ত্রণের বন্ধনকে চূর্ণ করবে। প্রজ্বলিত সূর্যের সমস্ত করুণা আর ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তির শপথ নিয়ে বলছি, আমি চেয়েছিলাম দেবতাদের রাজ্যেও সবাই সমান অধিকার ভোগ করুক, ভোগ করুক মানুষের সংগেই স্বর্গ-মর্তের সমস্ত সুযোগ, সমস্ত অধিকার।

পলি॥ পাপ, ঐ বাক্য উচ্চারণে নিদারুণ পাপ প্রমিথিউস। স্বর্গের দেবতারাও অলঙ্ঘ্য নিয়মের দাস। আর দেবতার যা একান্তই গোপন অধিকার দেবতার যা নিজস্ব সম্পদ তাতে ক্ষুদ্র মানুষের থাকে না এক বিন্দু অধিকার। পিতা জিয়াস তোমার আবেদনে সাড়া না দিয়ে উপযুক্ত কাজই করেছেন।

প্রমিথিউস॥ অথচ তোমরাই একদিন বলবে এ নিয়ম মানতে নেই, অথচ বিশ্বনিখিলের একনিষ্ঠ নিয়মে তোমরা একদিন এই একমুখী ভোগবিলাস আর দেবমহিমার সংকীর্তন শুনে শুনে আমার মতই ক্লান্ত হবে। অথচ তোমরাই একদিন অনন্ত শূন্যের বুকে পুঞ্জীভূত স্বার্থের মেঘ হয়ে জমে না থেকে একদিন ঝরে পড়বে দহনশেষের বৃষ্টির মত। পড়বেই পলিমিয়াস একদিন পড়বেই—

পলি॥ সেদিন আমরাও হবো তোমার মত অভিশপ্ত।

হিফা॥ —সেইদিন আজকের মত হয়তো আমাদের বিরুদ্ধেও বসবে এই বিচারসভা এই স্বর্গ প্রান্তরে। হয়তো এরকমই বিচার—

প্রমিথিউস॥ কিংবা বিচারের প্রহসন? স্বার্থান্ধ দেবরাজ জিয়াসের বিচারের প্রহসন।

হিফা॥ কারা যেন আসছে এদিকে···

পলি॥ ওরা বিচারসভার দর্শকমণ্ডলী। (কোরাসদল ঢোকে)

কোরাস॥ হায়, হায় প্রমিথিউস। কেন, কেন তোমার, ঐ দেবসুখ বঞ্চিত, তিক্ত জীবনের প্রতি অন্ধ মোহ? কেন তুমি, স্বর্গের একান্ত সম্পদকে, মানুষের মধ্যে বিতরণ করে, কুড়িয়ে নিলে, পিতা জিয়াসর দুঃসহ ক্রোধ?

তুমি কি জান না, জিয়াসের দেহটা পাথরের, আর অন্তরটি লৌহপিণ্ডের? তুমি কি জান না, কি পরিণাম হয়েছিল, দেবতা অ্যাটলাসের? তুমি কি জান না, দেবতা টাইফো এখনো, এটনা পর্বতের তলদেশে, জীবন্ত সমাহিত? তাদের ভাগ্য যে আজ, তোমাকেও গ্রাস করতে আসছে প্রমিথিউস? হায় প্রমিথিউস!

প্রমিথিউস॥ কৃতজ্ঞ আমি আমার দীর্ঘ জীবনের সংগী হে দেবদল। কিন্তু হাহাকার করো না। কেন-না, এই সম্ভাব্য পরিণতি আমার অভাবিত নয়। আমি সজ্ঞানে সচেতন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই সব কিছু করেছি। তাই জিয়াসের ক্রোধও অপ্রত্যাশিত নয়।......বরং আমি চাইবো জিয়াসের প্রমোদের রাতগুলো যেন আরো বেশী নিদ্রাহীন হয়ে ওঠে, আমি চাইবো —তোমাদের সকলের ভালবাসা আর করুণা যেন এক মৃন্ময় মূর্তির মতো তাপে কিংবা শৈত্যে অনড় না থাকে। একদিন যেন এই ভালবাসা আর করুণা তোমাদের জিহ্বায় এক কঠিন সত্যকে উচ্চারণ করতে শেখায়।

কোরাস॥ থেমিসের পুত্র প্রমিথিউস, এই শুক্র সন্ধ্যায়, চরম সর্বনাশের কথা আর বলো না।

পলি॥ ঐ ঐ আসে পিতা জিয়াস। সংঙ্গে তার চিরসঙ্গী প্রহরী হার্মিস।

হিফা॥ এইবার তোমার বিচারের সময় সমাগত। প্রমিথিউস স্বর্গের সমস্ত দেবদেবী তোমার এতদিনের সমস্ত স্বজন-বন্ধুর নামে শপথ, একবার প্রায়শ্চিত্তর কথা উচ্চারণ কর, একবার অনুতপ্ত হও। পিতা জিয়াস হয়তো অনুতপ্তকে মার্জনা করবেন।

প্রমিথিউস॥ (হাসি) বশ্যতায় স্বর্গের দেবতা আর মর্ত্যের মানুষেব মধ্যে পার্থক্য কোথায়? হায়, এরা কি অন্ধ মোহে নিজের জীবন আর সুখের ক্ষুদ্র জলাশয়ের পরিমাপ করে করে সাঁতার কাটে? তীরে ওঠার ইচ্ছে নেই কারণ তীরে ওঠার আদেশ নেই। (হাসি) অথচ দৈর্ঘ-প্রস্থের ক্ষুদ্র সীমায় বন্দী হে দেবতা, মানুষের মতই তীরে দাঁড়িয়ে দেখলে না— হিসাবের তিন পল দণ্ডের ওপারেও একটা বেহিসাবী বিরাট প্রশ্নের জগৎ। হায় মৃত্যুঞ্জয় দেবতা,হায় মরণশীল মানুষ, আনুগত্যের গণ্ডীতে দুজনেই কি অদ্ভুতভাবে বন্দী (হার্মিস ঢোকে)

হার্মিস॥ প্রমিথিউস। তোমার বিচার স্বরু হবে। স্বর্গের সমস্ত দেবতা, সমস্ত কিন্নর-কিন্নরী, সমস্ত গন্ধর্ব ব্যাকুল প্রত্যাশায় পিতা জিয়াসের দণ্ডাদেশ শুনতে সাগ্রহে অপেক্ষারত, তুমি প্রস্তুত হও।

প্রমিথিউস॥ আমি ব্রহ্মাণ্ডের চরমতম সর্বনাশকে বরণ করতে প্রস্তুত জিয়াসের অনুচর হার্মিস। (জিয়াস ঢোকে)

সকলে॥ জয় দেবরাজ জিয়াসের জয়। জয় পিতা জিয়াসের জয়।

জিয়াস॥ ধর্মজ্ঞ-ত্রিকালজ্ঞ দেব দেবীগণ, প্রিয় কিন্নর-কিন্নরী-আজ এই বিচার সভায় দণ্ডাদেশ দেবার প্রাক্কালে আমরা স্বর্গের শাশ্বত শৃংখলা বিধির প্রতি আর সর্বজন গ্রাহ্য আচার রীতংসকে সশ্রদ্ধ সম্মাননা জানাচ্ছি। কেননা, স্বর্গের এই পবিত্র সাম্রাজ্যেও—দুর্ভাগ্য অথচ সত্য—মাঝে মাঝে আসুরিক কণ্ঠস্বর নির্গত হয়। কেন না, দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎই অজ্ঞানতার করাল অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আর কে না জানে, আমি দেবরাজ জিয়াস একান্ত দুঃখিত মনে হয়তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই বারবার দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করি স্বর্গকে প্রশান্ত রাখতে, স্বর্গের পবিত্রতাকে অমলিন রাখতে, স্বর্গের দেবদেবীর একান্ত অধিকার গুলোকে সুরক্ষিত রাখতে। অথচ ঐ প্রমিথিউস, আমার এতদিনের সমস্ত বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের প্রত্যয়কে পদতলে মথিত করে আমাদের একান্ত সম্পদকে তুলে দিয়েছে নিকৃষ্ট মানব জাতির হাতে। বিশ্বাস বড় পবিত্র সম্পদ। এই প্রমিথিউস সেই পবিত্রতাকে বিনষ্ট করেছে।

কোরাস॥ তবু,—তবু দেবরাজ জিয়াস,—পিতা জিয়াস,—আপনি ক্রোধে উন্মাদ হবেন না। কেন না, দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি তো জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ।

জিয়াস॥ প্রজ্ঞার লাঞ্ছনা-কারীর প্রতি আমি সদয় হতে পারি না দেববৃন্দ। আমি আমার অংগীকারের কাছে নিরুপায় ভাবে বন্দী। আমি আমার অনুগত দেববৃন্দের ভালবাসার কাছে নিরুপায়ভাবে বন্দী। আমি আমার দেবদেবীদের একান্ত সম্পদের নিরাপত্তার খাতিরে কঠোর ভাবে বন্দী।

হার্মিস॥ প্রমিথিউস,—শক্তির দেবতা পলিমিয়াস, অগ্নির দেবতা হিফাস্টাস আর সামনের সমস্ত দেবকুল তোমার চারপাশে। তুমি যে পাপ করেছ কোন প্রায়শ্চিত্তে তা স্খলিত হয় না। তুমি যে অপরাধ করেছ সহস্র অনুতাপেও তার অপনোদন হয় না। তবুও পিতা জিয়াস, ক্ষমার একান্ত করুণামূর্তি জিয়াস, তোমার অতীত বীরত্ব ও সখ্যতার কথা মনে করে তোমায় তোমার অন্তরকে উন্মোচন করতে অনুমতি দিচ্ছেন।

হিকা॥ প্রমিথিউস, প্রমিথিউস এই সুযোগ গ্রহন কর। এই স্বর্ণ সুযোগ অভিশপ্তের জীবনে কখনো আসে না।

পলি॥ প্রমিথিউস, সমস্ত দেবকুল, তোমার এতদিনের পরিচিত সমস্ত স্বজন পরিজনরা আকুলভাবে তোমার কাছ থেকে শুনতে চায়—তুমি দুঃখিত—তুমি অনুতপ্ত—তুমি মোহমুক্ত।

কোরাস॥ দেবতাদের সম্মিলিত ভালবাসাকে, অপমান করবে কেন প্রমিথিউস? দেবতাদের সম্মিলিত ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করবে কেন প্রমিথিউস?

জিয়াস॥ —এবং আমি জিয়াস-স্বর্গ-মর্ত—পাতালের একছত্র অধিপতি শপথ করে বলছি—অনুতপ্ত প্রমিথিউসকে আপনাদের সমবেত শুভেচ্ছার আমি যতদূর সম্ভব করুণা দেখাবার প্রয়াসী হব। কারণ পাপিষ্ঠ হলেও আমি বিস্মৃত নই প্রমিথিউস অপরিমেয় শক্তির অধিকারী; বিস্মৃত নই—দুর্ধর্ষ ক্রোনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐ প্রমিথিউস আমাদের অকৃপণ সাহায্য করেছিল।

সকলে॥ প্রমিথিউস—।—প্রমিথিউস॥

প্রমিথিউস॥ ধন্যবাদ দেবরাজ জিয়াস! ধন্যবাদ সহচর দেবকূল। অতীত কীর্তি ভবিষ্যৎকে যতটা আলোকিত করে, আপনাদের শুভেচ্ছা আর ভালবাসায় আমি ততোধিক আলোকিত। আবার এটাও বড় নির্মম সত্য, চলমান বর্তমানই অধিকাংশের কাছে অতি নিশ্চিত সত্য, অতীত বড় তিক্ত! কে, কে আর মনে রাখে অতিক্রান্ত সিড়িগুলোর কথা যখন সে পৌছে যায় সুউচ্চ প্রাসাদ শিখরে? মনে রাখে না—হয়তো মনে রাখতে নেই। কারণ অতীতের ধুলি মলিন স্মৃতিগুলো বড় জ্বালাময়। কুসুমশয্যাকে মুহূর্তেই করে তোলে কণ্টক শয্যা। তবু যখন আমার প্রতি আপনারা এক অমলিন ভালবাসায় বারবার আমায় আপ্লুত করেছেন,-তখন বড় করুণ-বড় বিষন্ন-বড় নির্মম হয়ে এসেছে এই নির্মম সন্ধ্যা। ক্ষমা করবেন আমার আত্মীয় দেবকুল দুঃখিত দেবরাজ জিয়াস—-অতীতকে এত সহজে আমি বিস্মৃত হতে অপারগ। বরং যা স্থির নিশ্চিত—ঐ উজ্জ্বল স্বাতী নক্ষত্রের মতই আমার জীবনে যা অতীতে, বর্তমান আর দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যতে সমান উজ্জ্বল তাকে আমি অস্বীকার করি কি ভাবে? আমি তাই নিরুত্তাপ কণ্ঠেই আমার সমস্ত কর্ম্মের জন্য গর্ব প্রকাশ করছি, কারণ আমার যাবতীয় কর্ম আমার স্থিতধী প্রজ্ঞার দ্বারা অনুমোদিত।

হার্মিস ॥ (চীৎকার) প্রমিথিউস নিজের বক্ষে নিজে ছুকিকাঘাত করো না। প্রমিথিউস তুমি—(জিয়াস হাত ওঠায়—হার্মিস থেমে যায়)

জিয়াস ॥ প্রমিথিউস, দেবতার একান্ত অগ্নি সম্পাদকে চুরি করে নিকৃষ্ট মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, তোমায় প্রজ্ঞায় অনুমোদন পায়?

প্রমিথিউস ॥ —পায়।

সকলে ॥ হায় প্রমিথিউস!

জিয়াস ॥ (ক্রুদ্ধ) এবং এইভাবে তুমি আমাদের সমস্ত গোপন সম্পদকে মর্ত্যভূমিতে বিতরণ করতে চাও?

প্রমিথিউস ॥ যদি ক্ষমতায় কুলোয় তবে তাই চাই।

জিয়াস ॥ (আরো ক্রুদ্ধ) তুমি স্বর্গের সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা, সর্বজন স্বীকৃত আচার-বিচারের কঠোর বিতংসকে পদদলিত করে কি খুবই গর্বিত প্রমিথিউস?

প্রমিথিউস ॥ আমি আমার কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ। আমি আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। আমি আমার একান্ত ইচ্ছার প্রতি অনুতাপহীন ভাবে অনুগত।

সকলে ॥ হায়। হায় প্রমিথিউস।

জিয়াস ॥ (চীৎকার) জানতে পারি কি—মানুষের প্রতি—মর্তের মরণশীল মানুষের প্রতি কেন, কেন তোমার এই অকারণ প্রেম?

প্রমিথিউস ॥ মানুষ সামান্য নয়, অসামান্য, মানুষ নিকৃষ্ট নয়, দেবতার চেয়েও সহস্রগুণ বীর্যময় মানুষ।

জিয়াস ॥ (চীৎকার) ভেঙ্গে যায়, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সমস্ত দেবকুল দেখো, জিয়াস সহনশীলতার পরীক্ষা দিতে এই বিচারসভায় আসেনি। একদল নিকৃষ্ট দৈবনির্ভর মানুষকে—

প্রমিথিউস ॥ (চীৎকার) না, মানুষ দৈবনির্ভর নয়। মানুষ একান্তই স্বনির্ভর। জিয়াস—জিয়াস আমি জানি, সৃষ্টির পর দেবতারা মানুষের প্রতি আর কোন কর্তব্য করেনি। সৃষ্টির প্রথম উষালগ্ন থেকে মানুষ শক্তিমান মৃত্যুহীন দেবতার অনেক ছলনার শিকার। প্রকৃতির করাল রোষ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমুদ্রের উন্মত্ত জলরাশি তাকে গ্রাস করতে চায়। অরণ্যের হিংস্র পশু তাকে হত্যা করে প্রতিমূহূর্তে, ভূমিকম্প আর ঝড়, বৃষ্টি আর প্লাবন ক্ষণে ক্ষণে এই অসহায় মানুষগুলোকে সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকে উন্মত্ত করে তোলে। আর আমরা নই, তোমরা নও, মানুষই

লড়েছে নিজেদের স্বার্থে নিজেদের বাঁচার দুর্মর প্রত্যয়ে। (আস্তে আস্তে মঞ্চ অন্ধকার হয়।)

নেপথ্যে ॥ উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে······সৃষ্টির প্রথম উষায়—(২) (আদিম মানুষের দল আর্ত চীৎকার করছে।)

১। পালা—পালা—ঐ ধেয়ে আসে বন্য সিংহ, মত্ত হস্তী······

২। তার পেছনে অরণ্যে হিংস্র হায়না—ভয়ংকর ডায়নোসেরাস

৩। ঐ—ঐ আসছে ক্ষুধার্ত জন্তুর দল।

১। পাথর ছুড়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

২। পেছনে পালাবার পথ নেই—দুস্তর জলরাশি—ফেনিল ঢেউ

৩। আর সামনে অরণ্যের বিভীষিকা।

১। তবু বাঁচতে—হবে—বাঁচতেই হবে।

২। বুক দিয়ে লড়াই করে বাঁচব। রক্ত ঝরিয়ে বাঁচব—

৩। এগিয়ে আসছে ওরা ক্ষুধার্ত শকুনের দৃষ্টি নিয়ে—

১। এগিয়ে আসছে ওরা হুংকার তুলে গতরাতের বিক্ষুব্ধ প্রলয়ের মত—

সকলে ॥ তবু বাঁচব—বাঁচতে হবে—লড়াই করেই বাঁচব। (ওরা এগিয়ে গিয়ে আহত হয়ে ফিরে আসে। অনুভব করে একসঙ্গে আক্রমণ করতে হবে। "হেই—হেই" শব্দ আস্তে—জোরে হয়—আক্রমণ সূচিত হয়। ফিরে আসে মাঝখানে বিজয়ী হয়ে। শব্দ ওঠে—"জিতেছি"—জিতেছি। এরপর মৃত পশুদের মাঝখানে এনে শুরু হয় অরণ্য। বিজয় নৃত্য—উদ্দাম আনন্দে—চরমে।

প্রমিথিউস ॥ অতএব তুমি নও। সৃষ্টির প্রথম উষাতেই মানুষ নিজের শক্তিতে লড়াই করেছে আর আজও চলছে সেই লড়াই। এই অন্তহীন সংগ্রাম ক্ষেত্রে কোথায়—কোথায় তোমার দেবমহিমা? আমরা অর্থাৎ দেবতারা যখন নিজেদের সংকীর্ণ স্বর্গে বসে অপ্সরা আর কিন্নরীদের নিয়ে প্রমোদসভা বসিয়েছি—চলেছে অমৃতের ভাগাভাগী, চলেছে অফুরন্ত আনন্দের স্রোতে অন্তহীন অবগাহন, তখন ওদিকে একদল মানুষ অরণ্যের অন্ধকারে অসহায়ভাবে লড়ছে, ধুকছে, মরেছে, আবার লড়ছে, ধুকছে, মরছে, আবারও লড়ছে—এতদিনে তাই পরিস্কার হয়েছে তুমি নও জিয়াস, কোন দেবতাই নয়, মানুষই মানুষের মুক্তিদাতা।

জিয়াস ॥ প্রমিথিউস। মনে রেখো এই আত্মক্ষয়ী প্রলাপ সত্ত্বেও তোমার ঐ মানুষগুলোর পেছনে রয়েছে অনিবার্য মৃত্যুর শৃঙ্খল।

প্রমিথিউস ॥ আগুণে যার অধিকার, শৃংখলকে সে একদিন পুড়িয়ে ফেলবেই।

জিয়াস ॥ (ক্রুদ্ধ) মনে রেখো—স্বর্গের দেবতার একান্ত গুপ্তধন মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তুমিও পাবে বীভৎস অভিশাপ।

প্রমিথিউস ॥ স্বেচ্ছায় যে অভিশাপের অরণ্যকে বরণ করে, আশীর্বাদের স্বর্গ তাকে লুব্ধ করতে পারে না।

জিয়াস ॥ (চীৎকার) প্রমিথিউস! তুমি—তুমি চিরনির্বাসিত—চিরবন্দী হয়ে রইলে স্কাইথিয়ার ঐ অরণ্য সংকুল পাহাড়ে··· । দেবতারা তোমায় দেখলে ভয়ে মূর্ছা যাবে—।

প্রমিথিউস ॥ তবু এই বন্ধনকে সহ্য করেই আমি ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে চিরকাল শুনিয়ে যাব মানুষের জয়ের কথা, তবু আমি তোমাদের স্বার্থান্ধ হাত থেকে বার বার কেড়ে আনতে চাইব মধুভাণ্ডের অবশিষ্ট অমূল্য কণাগুলোকে, তবু আমি মানুষকে চিরকাল প্রেরণা দেব দুহাতে আর দু-পায়ে শৃংখলের বেড়ি পরেই—বলব—ছিনিয়ে আনো, কাতর আবেদন নিবেদনের পূজায় নয়, শক্তির দুর্মর দাপটে, সংহত চেতনার দৃপ্ত অধিকারে ছিনিয়ে আনো দেবভোগ্য সমস্ত অধিকারগুলোকে।

জিয়াস ॥ প্রমিথিউস, তুমি বিপজ্জনক তুমি বিধ্বংসী—তুমি স্বর্গদ্রোহী, জাতিদ্রোহী—তুমি ধ্বংস হও—তুমি ধ্বংস হও। শোন শক্তির দেবতা পলিমিয়াস, এই স্বজাতিদ্রোহী মানব প্রেমিক অভিশপ্তকে নিয়ে যাও ঐ স্কাইথিয়ার নির্জর পাহাড়ে, শক্ত করে বাঁধ স্থবির পাথরের সঙ্গে, শোন অগ্নির দেবতা হিফাস্টাস আকাশের বজ্রকে বলে দাও বার বার সঘন বর্ষায় আর বিদ্যুতে ওকে আঘাত করা হবে—ওর ঐ শ্বেতবর্ণ দেহকে আগুনের তাপে কালো করে দিতে হবে। তারপর—তারপর নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষাতেও জিয়াস টলবে না—না, জিয়াস অবাধ্যতাকে কোনদিন ক্ষমা করেনি—করে না। প্রমিথিউস, চিরকাল বন্দী থাক, আকাশের সঙ্গে মেঘের মত, সমুদ্রের সঙ্গে বালুকার মতই– তোমার এই শৃংখল চিরকাল একীভূত হয়ে রইল। যাও—(প্রস্থান)

প্রমিথিউস ॥ ধন্যবাদ জিয়াস। তোমার কাছে যেন মুক্তিভিক্ষা চাওয়ার দুর্ভাগ্য না হয়। একদিন ঐ দুর্বল মানুষই যেন এনে দেয় আপন আপন সংগ্রামী চেতনায় মুক্তির দীপ্ত বহ্নি—

কোরাস ॥ হায় প্রমিথিউস। দেবতা হয়েও চিরকাল রইলে বন্দী। হায় আপন স্ত্রী হেমিওনকেও রক্ষা করতে পারলেনা জিয়াসের অগ্নিদৃষ্টি থেকে,

কেননা হেমিওনকে শৃংখলিতা হতে হবে অনতিবিলম্বে। সুখ আর স্বস্তির প্রতি তোমার এই একান্ত বীতস্পৃহা, দুর্ভাগ্য আর দুর্দৈবের প্রতি তোমার এই দুর্মর অনুরাগ, বিপজ্জনক সত্যের প্রতি তোমার এই আত্মঘাতী প্রেম—আমাদের বুকে হাহাকার তোলে; হায় প্রমিথিউস! হায়!

[প্রস্থান]

[হেমিওন-এর প্রবেশ, হেমিওন উত্তেজিত]

হেমিওন ॥ তুমি শুনেছ প্রমিথিউস—

প্রমিথিউস ॥ শুনেছি। হেমিওন, তোমায় তো বহুবার বলেছি যে প্রমিথিউসের স্ত্রী হওয়াটা বড় যন্ত্রণার! তোমার জন্য আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে হেমিওন। অথচ আমি জানি, এতকালের মত আজও তুমি এই দুর্ভাগ্যকে বরণ করবে অবিকম্পিত সাহসে।

হেমিওন ॥ না, কিছুকাল আগে—এমনকি এই সেদিন আমাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেও তোমার এই প্রত্যয়ের যোগ্য ছিলাম আমি। কিন্তু অভিজ্ঞতা, চারদিকের একমুখী বৈচিত্র্যহীন স্রোতধারার সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমি হঠাৎ উত্তাপহীন, আবেগহীন, আজ আমি পরিণত প্রমিথিউস।

প্রমিথিউস ॥ কি বলছ হেমিওন? তুমিও কি আমায় সেই কথাগুলো শোনাতে এসেছ, যে কথাগুলো গত কয়েকদিন ধরে অন্ধ আনুগত্যের আর যুক্তিহীন বশ্যতার শৃংখলে বন্দী দেবকূল আমায় শুনিয়ে যাচ্ছেন? তুমিও আমায় বলবে—

হেমিওন ॥ আজ আমি তোমায় প্রাজ্ঞ হতে বলব, সাহসী হতে নয়।

প্রমিথিউস ॥ চমৎকার!

হেমিওন ॥ আমি তোমায়, আজ আর স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার নিষ্ফল শ্রম দেখিয়ে অ-সাধারণ হতে বলব না, আমি বলব বীরেরা, দুর্জয় সাহসীরা, দুর্দম মানসিকতার অধিবাসীরাও অভিজ্ঞতায়, অবস্থার মূল্যায়ণে, অভ্রান্ত বিচারবোধে কখনো কখনো অনন্য হবার সেই গোপন লোভটাকে দমন করে।

প্রমিথিউস ॥ অর্থাৎ তাকে সাধারণের মতই জীবনটাকে ভয়ে, সংকোচে, যত্নে আর কুৎসিৎ স্বার্থলিপ্সায় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যাতে করে কোন একদিন সুযোগ পেলে সে আবার অ-সাধারণ হতে পারে।

হেমিওন॥ তোমার অফুরাণ আবেগকে আমি শ্রদ্ধা করি প্রমিথিউস, কিন্তু তোমার জীবন-দর্শনকে নয়।

প্রমিথিউস॥ কবে থেকে, কবে থেকে হেমিওন—

হেমিওন॥ যখন থেকে তোমার বৃত্তের বাইরেও যে বিপুল পৃথিবী তাকে চিনতে শিখেছি অভিজ্ঞতার আলোয়, বাস্তবের কঠিন অভিঘাতে—

প্রমিথিউস॥ তার মানে তুমি আমায় অস্বীকার করবে হেমিওন?

হেমিওন॥ তুমি যদি এত সাহস, তেজ, এত বিপুল মানসিক শক্তি নিয়ে তোমার স্ত্রী, সন্তান, তোমার পরিবারকে অস্বীকার করতে পার, তবে তোমায় অস্বীকার করতে আমি পারবনা কেন?

প্রমিথিউস॥ তোমাদের দিকে শুধু তাকাতে হলে বিপুল জগতের দিকে তাকানো যায় না—

হেমিওন॥ অতএব জিয়াসের ক্রোধ ভস্ম করুক আমায়, আমার সন্তানকে। প্রমিথিউস, বিশ্বনিখিলের প্রশংসা আর শ্রদ্ধার মূল্যে বেচে থাক তুমি ইতিহাস হয়ে। তোমার নিঃস্বার্থ সংগ্রামেও কিন্তু স্বার্থের গন্ধ প্রমিথিউস, বৃহত্তর জগতের প্রতি এই উদার অনুরক্তির মধ্যেও আজ পলায়নের মানসিকতা উঁকি দিচ্ছে প্রমিথিউস।

প্রমিথিউস॥ অর্থাৎ জিয়াসের প্রারম্ভিক জয় সম্পূর্ণ হোল। বেশ, হেমিওন তুমি বাঁচ, তোমার, না আমাদের···আমাদের সন্তানও জিয়াসের ক্রোধবহ্নি থেকে বাঁচুক। স্কাইথিয়ার পর্বতে অমোর নিঃসংগ যন্ত্রণার বন্ধন তোমাদের বেঁচে থাকার,সুখে যেন একটুও আঘাত না করে হেমিওন—

হেমিওন॥ এই মর্মান্তিক হাহাকারে কিম্বা অভিমানদগ্ধ আর্তিতেও আমি নিরুত্তাপ রইব প্রমিথিউস, কারণ তুমি বীর, তুমি সাহসী, তুমি অ-সাধারণ। কিন্তু তবু তুমি এমনই অক্ষম যে নিজের সন্তান কিম্বা স্ত্রীকে রক্ষার উপায় তোমার জানা নেই। আমি যাই প্রমিথিউস, আর যদি কখনো মনে হয় তুমি আমায় কিম্বা আমাদের সন্তানকে সামান্যতম ভালবেসেছ, তবে ফিরিয়ে দিয়ো দেবতার সম্পদ ঐ আগুন, অনুতাপ প্রকাশ কোর কৃতকর্মের জন্য ঐ জিয়াসের কাছে। একক ও অ-সাধারণ হবার যে লোভ তা কিন্তু ততখানিই স্বার্থগন্ধময়, যতখানি স্বার্থগন্ধময় বশ্যতা বা আনুগত্যের স্রোতে গা ভাসানো—। চলি প্রমিথিউস। প্রার্থনা করি, স্কাইথিয়ার পর্বত শিখরে তোমার বন্ধনকাল যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয়।

প্রমিথিউস ॥ না, হেমিওন, আমার জন্য কোন প্রার্থনা নয়, নিজের অধিকতর স্থখের জন্য একটু প্রার্থনা কর।

হেমিওন ॥ (সামনে এগিয়ে আসে) আমি জানি তোমার মত সংগ্রামীরা চিরকাল একক ভাবেই শৃংখলের যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ঐ স্থখেরই চকিত স্বপ্ন দেখে। তবে আমাদের মত সাধারণের চাইতেও তারা অসহায়। আমরা স্থূলভাবেই বিপজ্জনক রাস্তাটা মুহূর্তে ত্যাগ করে নিরাপদ রাস্তায় ঘুরে আত্মরক্ষা করতে পারি, তোমরা তাও পারনা, অ-সাধারণ হবার লোভ তোমাদের বুকে চেপে বসে ভারি পাথরের মতো। —আমি জানি, শৃংখলিত অবস্থাতে তোমাদেরও এক একসময় সাধারণ হতে ইচ্ছে করে কিন্তু—হায় প্রমিথিউস ! [প্রস্থান]

কোরাস ॥ (প্রবেশ করে) প্রমিথিউস, হেমিওনের মতই আত্মরক্ষার প্রবল যুক্তি অগ্রগামী অস্তিত্বকে নাড়া দেয় বারবার, বলে সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চল। কিন্তু সবার থেকে এগিয়ে যাবার লোভও একটা প্রবল লোভ। এ লোভে যে প্রবল একমুখী যন্ত্রণা তার থেকে মুক্তি শুধু অনেককে সঙ্গে নেওয়ার মধ্যেই। যতদিন তা সম্ভব না হবে, ততদিন নিজের সর্বস্বের মূল্যে একটা প্রতারক সর্বহারা স্বপ্নকে নিয়েই তুমি শৃংখলিত থাক, প্রমিথিউস !

প্রমিথিউস ॥ সবাই এমনকি হেমিওনও আমায় ত্যাগ করলেও আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি একদিন ঐ অবহেলিত নির্যাতিত মানবকুলই আনবে আমার মুক্তি। আমরা একক যন্ত্রণাও সেইদিন বাঞ্ছিত মূল্য পাবে। আমি জানি যে দেবভোগ্য সম্পদ আমি মানুষের কাছে এনে দিয়েছি, একদিন···একদিন সব মানুষ তার যোগ্য হয়ে উঠবেই।

কোরাস ॥ যতদিন তা না হয়···যতদিন একা সমস্ত স্বজন বান্ধব পরিত্যক্ত হয়ে স্কাইথিয়ার পর্বতশীর্ষে বন্দী থাকতে হবে তোমায়. ততদিনই তোমার অগ্নিপরীক্ষা প্রমিথিউস ততদিন বড় দুঃসহ সময়। প্রবল একমুখী স্রোতে খড়কুটোর মতই বিলীন হয়ে যায় বিরল প্রতিবাদ। শির নোয়ানোর আর শির বাঁচানোর প্রবল প্রতিযোগিতায় সূর্যের দিকে তাকিয়ে শির সোজা করে রাখাটা বড় নিঃসংগ স্বৈরাচার। যতদিন আরো অনেকে, যাদের জন্য তুমি এত যন্ত্রণা আর সন্তাপ সহ্য করছ, তারা অনেকেই অনেকটা পাথুরে রাস্তা ছুটে এসে তোমার পাশে দাঁড়াচ্ছে, ততদিনই তোমার অগ্নিপরীক্ষা প্রমিথিউস ! ততদিন স্কাইথিয়ার পর্বতশীর্ষে বন্দী থাক প্রমিথিউস, আর তোমার সন্তানকে নিয়ে হেমিওন নিরাপদ স্থখশয্যায় শুয়ে বিদ্রুপের অট্টহাসি শুনিয়ে যাক তোমার শ্রান্ত রক্তাক্ত অন্তরে ! হায় প্রমিথিউস ! হায় !

সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

'ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অর্জুন এতদিনে তাঁর গাণ্ডীব রাখলেন। শত শত শ্রমিকের রক্ত-লাঞ্ছিত লালঝাণ্ডা দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও ওপর সগৌরবে বহন করে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী বিদায় নিলেন'।

[কালান্তর : ২০ অক্টোবর, ১৯৮৪]

মনে পড়ে আমার কৈশোরে এই অসামান্য মানুষটিকে এক ঝলক বিদ্যুতের মতো প্রথম দেখি। ১৯৪৬ সালের শেষাশেষি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত কলকাতা শহর। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উত্তাল জনজাগরণ তখন ছত্রভঙ্গ। একমাত্র আকাশপ্রদীপ তখন ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট। শহরে যেহেতু একশ চুয়াল্লিশ ধারা—তাই ট্রাম ধর্মঘটের সমর্থনে সভাটি ডাকা হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। সভাপতি মৃণালকান্তি বসুর আহ্বানে মাইকের সামনে উঠে দাঁড়ালেন আধময়লা ফুলশার্ট গায়ে এক শীর্ণকায় মানুষ। তারপর গোটা হলঘর স্তব্ধ। কখন যে সমবেত জনমণ্ডলী চলে গিয়েছে সেই শীর্ণকায় মানুষটির কব্জায়। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ ও শাণিত যুক্তিতে ঝলমলে বক্তৃতায় সেদিন এক কিশোরও বিস্ময়ে অভিভূত।

লাহিড়ীর বক্তৃতার প্রকৃত সমঝদার বোধ হয় দেশের শ্রমজীবী মানুষ—যাঁদের তিনি বন্ধু নেতা ও শিক্ষক। তাঁর মৃত্যুতে ইণ্ডিয়ান টিউবের শ্রমিক-কর্মচারীদের শোক প্রস্তাবে তাই বলা হয়েছে : তিনি যখন বক্তৃতা করতেন—শুনে মনে হত একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বক্তৃতা করছেন। আবার যে শব্দগুলি তিনি প্রয়োগ করতেন মনে হত এক একটা বারুদের গোলা আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন শত্রুর মুখের দিকে ছুঁড়ে মারার জন্যে, আবার যখন বক্তৃতার সার্বিক বিষয়বস্তুর কথা ভাবতাম তখন মনে হত যেন একজন শিল্পী তাঁর সুনিপুণ তুলির টানে আমাদের মত সাধারণ মানুষের, মেহনতী মানুষের, শ্রমিক-কৃষক অবহেলিত ও উৎপীড়িতের সুস্থভাবে জীবনযাপনের একটা পরিচ্ছন্ন ছবি এঁকে দিয়েছেন।

যেকথা বলছিলাম—প্রথম দর্শনেই সেদিন মনে হয়েছিল এ এক আলাদা মানুষ। একজন সত্যিকারের নেতা—কিন্তু অন্য নেতাদের মতো নয়।

এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা—কিংবদন্তী-পুরুষ লাহিড়ী। এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের কী আলো! অথচ মানুষটি আটপৌরে মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যেতেন। তাঁর খুবই কাছের লোক সুধারঞ্জন সেনগুপ্ত লিখছেন : তিনি যখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য, আমি তাঁর একান্ত সহকারী ছিলাম, কিন্তু অপরিবর্তনীয় সোমনাথ লাহিড়ী। হাফসার্ট ও ধুতি, ভাঙা চৌকি, হাতলভাঙা মান্ধাতা আমলের চেয়ার, যাতে বড় বড় অফিসারদের বসতে দেওয়া হত, যেমন অন্যদের। দাদা বাজার করতে যেতেন গেঞ্জি গায়ে, লুঙ্গি পরে। শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে একান্ত হওয়ার এ এক ঈর্ষণীয় উদারণ।

[অনুশীলন বার্তা : ৭ম সংখ্যা, ১৯৮৪]

কিন্তু তিনি যে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার লোক নন। এই সত্য বিচক্ষণ সাংবাদিক শিবদাস ব্যানার্জীর নজর এড়ায়নি। তিনি লিখছেন : ব্যক্তিগত জীবনে সোমনাথবাবু ছিলেন মিতাচারী এবং স্বভাব উদাসীন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি কখনও কোনও প্রশ্নে আপোস করেছেন বলে শোনা যায়নি···সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হত তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই হয়ত তাঁকে অনেক সময়েই দলের আর সবার থেকে একটু আলাদা করে রাখতো। সেদিক থেকে হয়ত তিনি একলা ছিলেন। একটা নিঃসঙ্গতার আড়াল ছিল যেন।

[আনন্দবাজার, ২০ অক্টোবর ১৯৮৪]

(২)

তাঁর কাছে পৌছতে আমি অনেক-অনেক দেরী করে ফেলেছি—যদিও সেই কৈশোরের মুগ্ধ আবেশ আমার চিরসঙ্গী। দামী আতরের মৃদু সুগন্ধের মতো। এতদিন তাঁকে আমি শুধু দূর থেকেই দেখেছি—কাছে যাইনি কখনো। আমি ছিলুম তাঁর পরিমণ্ডলের বাইরে। তাছাড়া শুনেছি তিনি অকারণ ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করেন না। কোনরকম উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতা প্রশ্রয় পায় না তাঁর কাছে। লাহিড়ী কন্যা টিকলু বলছে : এটুকু বেশ মনে আছে কোনদিনই বাবাকে সুখে আত্মহারা বা শোকে ভেঙে পড়তে দেখিনি।···বাবার মধ্যে সুখ ও দুঃখকে মানিয়ে নেবার এক অস্বাভাবিক শক্তি ছিল। মানুষ হিসাবে বাবা ছিলেন খুবই উদারচেতা, কিন্তু নীতির বিষয়ে কঠোর।

[সত্যযুগ : ২১ অক্টোবর, ১৯৮৪]

অবশেষে তাঁর জীবন সায়াহ্নে একদিন তাঁর রোগশয্যার পাশে এসে দাঁড়ালাম। সিঙ্গীবাগান সি, আই, টি ফ্ল্যাট-বাড়ি তখন তাঁর আস্তানা।

প্রতিবেশীদের চোখে তিনি একজন আদর্শ স্বামী ও পিতা। তাঁর নাতনি ও ফ্ল্যাটবাড়ির আরো কয়েকটি শিশুর দাদু এবং যুবকদের মেসোমশায়। প্রতি রোববার সকালে তাঁর ঘরে বসে আবাসিক বৃদ্ধদের আসর—লাহিড়ীর ভাষায় old fools' club। বাসিন্দারা সবাই বরণ করে নিয়েছেন স্নিগ্ধ পরিহাস-প্রিয় মার্জিত রুচি সম্পন্ন বাক্‌পটু মানুষটিকে। নিস্তরঙ্গ জীবনের দৈনন্দিন নিজেকে যেন তিনি সঁপে দিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেও একদিন তিনি চমক সৃষ্টি করলেন। তরুণ আবাসিক দত্তাত্রেয় দত্ত লিখছেন: এখনো কানে বাজে আবাসিকদের সাধারণ সভায় তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা—আমি চিরকাল ভাড়াবাড়িতে থেকেছি। আমি ভাড়াবাড়িতে থাকবো এবং ভাড়া বাড়িতেই মরবো। ছাইচাপা আগুন যেন আর একবার জ্বলে উঠল। কমরেড লাহিড়ীকে—আমরা যুবকরা সেদিন নতুন করে চিনলাম।

হ্যাঁ, এধরনের উক্তি এই মানুষটিকেই মানায়। বিত্তহীনের অহঙ্কার তাঁকেই সাজে।

৩১ মার্চ, ১৯৮১। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে আমার সদ্য-প্রকাশিত 'প্যারী কমিউন'-এর এক কপি দিতে গেলুম। শিবুলাল বর্ধন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সেই অনন্য ভঙ্গিতে সম্ভাষণ। যে ভঙ্গি তাঁরই—আর কারো নয়—হতে পারে না। বই হাতে নিয়েই বলে উঠলেন: বা! আপনার বইয়ের মলাট তো পুরু—বইও তাহলে ভাল। বইয়ের কথা তো কাগজে পড়েছি।

কিন্তু তিনি আজকাল বই পড়তে পারেন না। যদি তাঁকে পড়ে শোনাই তবেই একমাত্র তাঁর পড়া হবে। আমি এক কথায় রাজি। এই শুরু এবং তারপর থেকেই চলল একটানা সাপ্তাহিক দেখাসাক্ষাৎ। প্রতি সপ্তাহে একদিন আধঘণ্টা কি বড় জোর এক ঘণ্টা বই পড়ে শোনানো—তারপর নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা। এক একদিন আবার না হত পড়া—না হত আলোচনা। একটু কথা বলার পরই শুরু হত তাঁর শ্বাসকষ্ট। অথচ একটু আগেই তো দেখেছি তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে খুশি—কয়েকটা মজার কথাও বললেন। তারপর কথা বন্ধ। শুয়ে পড়লেন তিনি। কেমন যেন নেতিয়ে পড়লেন 'এমন একটা অসুখ—মৃত্যু ঘটবেনা সহজে কিন্তু যন্ত্রণা দেবে'—লাহিড়ী কথাকটি অতিকষ্টে উচ্চারণ করলেন।

তবুও পড়া আর আলোচনা—দুই-ই চলতে থাকে। ইচ্ছে ছিল তাঁর প্রতিটি কথা টুকে রাখবো। এই মতলবে একটা প্যাড বার করতেই তিনি আঁতকে উঠলেন। 'ওরে বাবা! মরে যাবো। পড়েও শোনাবেন আবার নোটও

করবেন!' তারপর থেকে তাঁর সামনে আর কিছু ঢুকিনি। লাহিড়ীর গতিবিধি তখন অত্যন্ত সীমিত। শরীরের যা হাল—তাতে কলকাতার বাইরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই ছুটিছাটায় আমি যখন বেড়িয়ে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম—তিনি তখন খুঁটিয়ে সব জানতে চাইতেন। একবার পুরুলিয়া ঘুরে এসে তাঁকে ছৌ-নাচের শিল্পী ও ছৌ-মুখোসের কারিগরদের কথা বললাম। সব শুনে তাঁর প্রশ্ন : আপনি কি বলরামপুরের লাক্ষা শ্রমিকদের খবর রাখেন?

বলতে হল—জানি না। পুরুলিয়ার শ্রমিকজীবনের এক নতুন তথ্য তাঁর কাছ থেকে পেলাম। তিনি জানালেন, লাক্ষা শ্রমিকরা গরমপাতলা লাক্ষা হাত দিয়ে টানতে টানতে—হাতের সাড় হারিয়ে বসে।

আর একবার বাঁশপাহাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁকে বললাম, তাজ্জব কাণ্ড! দেখি সেখানকার প্রায়-নিরক্ষর ফরেস্ট গার্ডের মেয়ে দস্তুরমতো মাস্টার রেখে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করছে। শুধু তাই নয়। আশেপাশের গাঁ-ঘরের মেয়েদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ আর নজরুলের গানের দারুণ কদর। তাদের বাবা কাকারাও এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী। সব শুনে লাহিড়ীর মন্তব্য : গ্রাম level-এ পলিটিক্স্ পৌঁছেছে বলে কালচারও পৌঁছেছে। পলিটিক্স্-ও তো কালচার।

পর পর কয়েক সন্ধ্যায় আমার প্রশ্ন করার ধরন দেখে তিনি বলে বসলেন : আপনি ফাঁকি দিয়ে সব জেনে নিচ্ছেন। অবশ্যি এরকম লোক আরো বেরিয়েছে। যেমন সুধাংশু পালিত। তিনি আজকালের পক্ষ থেকে 'সাচ্চা' কমিউনিস্টদের interview নিতে চান। তাঁকে বললাম—মাস্টার! ঐ কাগজে আমি interview দিলে কালই সবাই বলবে আমি সি, আই, এ-র লোক। টাকাও পেলাম না অথচ বদনামও হল।

লাহিড়ী হাসতে লাগলেন। সবাই এবং সব কিছু নিয়ে তাঁর হাসি-ঠাট্টা—এমন কি নিজেকে নিয়েও। একদিন 'গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মী তাঁর কাছে এসেছেন। তাঁরা প্রবীণ গুণীজনদের সম্বর্ধনা দিতে চান। লাহিড়ীর নামও রয়েছে সে তালিকায়। তাঁরা চলে যাবার পর তিনি বললেন—বুঝলেন কিছু?

—বেশ ভালই তো লাগল। তারা আপনাকে সম্মানিত করতে চায়।

—তার মানে ওরা ধরেই নিয়েছে—আমার দ্বারা আর কিছু হবার নয়।

অতএব সম্বর্ধনা দিয়ে বিদেয় করে দাও। আমাকে ওরা নখদন্তহীন বুড়োদের দলে ফেলেছে। one of those booroos.

৩

পার্টির ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে

একদিন তাঁকে বললাম এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একটা ভাল ইতিহাস থাকলে আজকালকার পার্টি কর্মীদের কত কাজে লাগত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাটাকাটা জবাবঃ বিপ্লবলই করল না যে পার্টি—তার আবার ইতিহাস কীসের? বার হাত কাঁকুড়ের সতেরো হাত বিচি! এই পার্টির achievement এত অল্প যে এর ইতিহাস লেখার কোন মানে হয় না। আমি এর ঘোরতর বিরোধী।

আমার পাল্টা প্রশ্নঃ একজনে যদি লিখতে চান—তাহলে সার্থক স্মৃতিকথা কিভাবে লিখলেন?

লাহিড়ী বললেন। প্রথমতঃ পুরনো বিপ্লবীরা শেষ বয়সে যা লেখেন তাতে বিশেষ কোন কাজ হয় না। এ ধরনের লেখায় mass বলে কিছু থাকে না। তবে যদি mas character ও individual character—দুটোই ফুটিয়ে তোলা যায়, আর যদি mass heroism ও individual heroism দেখান যায়—তাহলে জীবন্ত হয়ে উঠবে স্মৃতিকথা—সার্থক হবে লেখা। near-সাহিত্য হওয়া চাই কিন্তু।

পার্টির ইতিহাস লেখা তাঁর অপছন্দসই। কিন্তু পুরনো দিনের কথা বলতে আপত্তি নেই। আবার একদিন যা বল্‌তেন—দ্বিতীয়বার বলতে তিনি রাজি নন। তাঁকে বললাম, পোস্টার টেলিগ্রামের জবাবে কি তার পাঠিয়েছিলেন—আর একবার বলুন তো।

—না, গল্পের ছলে যা বলেছিলুম তা লিখতে নেই।

—কেন? এসব লেখা হয় তো।

—না, আমি চাই না তা—আমাদের পক্ষের লোকদের ক্ষতি হয়, এমন কিছু বার হয়। আপনি যদি লেখেন আর আমি যদি জীবিত থাকি, তাহলে প্রতিবাদ করবো। বলবো, তাঁকে আমি এসব বলিনি। সবই তাঁর বানানো—তাঁর কল্পনা। এভাবে কল্পনা থেকে তিনি 'প্যারী কমিউন' লিখেছেন। 'যুগান্তরের' পাতায় সব ফাঁস হয়ে গেছে। (প্রসঙ্গত 'যুগান্তরে' 'প্যারী কমিউনের' বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়।)

আর একদিনের কথা। লাহিড়ী আজ প্রসন্ন। শরীর একটু ভাল। আমায়দেখে বললেন : আপনি থাকেন শ্যামবাজারে– পড়ান বিষড়ায় আর রিসার্চ করতে যান আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। আচ্ছা, ওদের ওখানে কি পেলেন?

আমি 'স্বাধীনতার' পুরনো সংখ্যাগুলি দেখছি শুনে তিনি তিনটি লেখা দেখতে চাইলেন। (১) রক্তের ডাক; (২) প্রস্তুত হও ৩) শোক নয় ক্রোধ। লেখাগুলো আমি পরের দিন টুকে নিয়ে এলাম। তাঁর শরীর আজ আবার ভাল নেই। তবুও অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে লেখাগুলো শুনলেন। টিকলুকেও ডাকলেন শুনতে। সোনার পর যখন তাজা হয়ে উঠলেন। অযাচিতভাবে কিছু স্মৃতিকথা শোনালেন।

... ...

নকসাল আন্দোলন

একদিন এক বন্ধুকে নিয়ে যাই লাহিড়ীর কাছে। কথ প্রসঙ্গে বন্ধুটি মন্তব্য করেন—নকসালদের কতকগুলি কাজ দেখে তাদের অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হয়। লাহিড়ী মানলেন না একথা। তার উত্তরে বললেন : এই ছবি তো decadence-এর যুগে। প্রথম অধ্যায় তো inspiration-এর—যখন আদিবাসীরা তীর ধনুক নিয়ে লড়েছে। প্রত্যেক আন্দোলনের দুটো স্তর থাকে—একটা rising আর একটা decay। Decay-র Period-এ যখন দেখা যায়, অভিজ্ঞতার সঙ্গে লাইন মিলছে না–তিনটি জিনিস দেখা যায় তখন। এক, নিজের পার্টিতে স্পাই খোঁজা; দুই; নিরীহ target-কে attack করা; তিন, লুটপাট করে কিছু পয়সা কামানো। ব্যর্থতার ধাক্কায় অল্পবয়সীরা বেশি চোট পায়। কারণ, তারা মনে করে যৌবনকালের মধ্যেই বিপ্লব হওয়া চাই। বাকি জীবনটা তাহলে সুখেই কাটবে।

... ...

শ্রমিক বনাম মধ্যবিত্ত

লাহিড়ীকে প্রশ্ন করি—কমিউনিস্ট পার্টি তো শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি—তাহলে এই পার্টি মধ্যবিত্ত প্রধান কেন? তার উত্তরে তিনি বলেন: আমাদের দেশের প্রধান লড়াই তো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম। শ্রমিকের লড়াই secondary। কাজেই এটাই তো স্বাভাবিক—disillusioned terrorist আর nationalistরা আমাদের পার্টিতে চলে আসবে। Spontaneously মধ্যবিত্তরাই তো

পার্টিতে চলে আসবে। কারণ, তারাই তো বিশেষ করে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের প্রধান শক্তি। শ্রমিক তো তা নয়। সুতরাং শ্রমিক তো spontaneously পার্টিতে আসতে পারে না এবং পার্টির প্রধান শক্তি হতে পারে না। special effort দিলে হয়তো আরো শ্রমিক পার্টিতে আসতো—কিন্তু সেটাতো effort-এর প্রশ্ন।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে, petty bourgeois revolutionism অর্থাৎ হঠাৎ গরম আবার ঠাণ্ডা ও হতাশ এবং মোটের উপর গরম—এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কংগ্রেস বিরোধিতা বাংলার মধ্যবিত্ত মানসিকতার মূল আশ্রয়। ভারতের অন্যত্র পেটিবুর্জোয়াদের এই আধিপত্য নেই। সেখানে কৃসাকদের দাপটে এবং কংগ্রেসের base প্রধানত কৃসাকদের মধ্যে—যদিও রাজনীতি capitalist দের।

৪

জাতিসমস্যা ও লেনিন

আসামে তখন নারকীয় কাণ্ড চলছে। গৌহাটি শহরেরই কাছাকাছি এক মুসলমান প্রধান গ্রাম 'নিলি'। সেখানে ঘটল গণহত্যা-শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। 'আনন্দবাজারের' প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিটা দেখার পর আমার কাছে সবই অর্থহীন হয়ে গেল। ফুটফুটে সুন্দর সব বাচ্চা। আমার চেনাজানা বাচ্চাদের মতো সুন্দর। তারা সব যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। তোমরা দেখেছ ছবিটা? একে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি। কেউ দেখেছে—কেউ দেখেনি।

লাহিড়ীকে বললাম—কেন এমন হল। তাঁর জবাব: আমি পুরাতনপন্থী। লেনিনের National question-কে আমরা বুঝিনি। Right of self determination up to the point of secession যদি মেনে নেওয়া যায়—তবেই এই সমস্যার সমাধান। ইংরেজ আমলে গায়ের জোরে ইংরেজরা একধরনের কৃত্রিম শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল—আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে এক ধরনের কৃত্রিম ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বহুজাতির দেশ with uneven development—এই ঐক্য টিকবে কি করে? যদি maximum power to States আর minimum power to Centre এই ফর্মুলায় দেশ চলত—তাহলে এসব ঘটত না।

আমি বললাম—কমিউনিস্টরাও তো chauvnism-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না।

না, পারা যায় না। communal frenzy-র সামনে দাঁড়ানো যায় না। সেজন্যেই national question-এর উদ্ভব। কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও তো এই problem রয়েছে। তার outburst হাঙ্গেরীতে ঘটেছে—চেকোশ্লোভাকিয়ায় একই জিনিস ঘটল—আজ আবার পোল্যাণ্ড।

৫

রঁদা-প্রদর্শনী

রঁদা প্রদর্শনীর গেটে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ যেন ভেঙে পড়েছে। রঁদার সৃষ্টি—মূর্তি ও প্রতিমার নান্দনিক আবেদন এদের কাছে কতটুকু! এই মাতামাতির অর্থ কি? তবে কি রাজনীতি-সমাজনীতিতে লোকের অরুচি ধরে গেছে? মুখ বদলাবার জন্যে এই মত্ততা!

'রঁদার' জন্যে লেখকের এই আগ্রহ দেখলাম, লাহিড়ীরও নজর এড়ায়নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন—Negative দৃষ্টি থেকে বলছেন কেন? আধুনিক জীবন যে বৈচিত্রে ভরা। গতিময় দারুণ fast। মানুষ তাই বিচিত্রমুখী জীবনের স্বাদ নিতে চায়। আপনার মতো আমিও একবার ধাঁধায় পড়েছিলুম। ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন প্রসঙ্গে আমায় তখন পার্টি থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে। দেখি সেখানে master Artist-দের Original-এর exhibition হচ্ছে। লোকে ভেঙে পড়েছে তা দেখতে। পিকাসো, সে জানে ও অনেকের ছবি। আর দেখছে কারা? অত্যন্ত সাধাসিধে মানুষ ঘরের বৌ-মেয়েও বিস্তর তাদের মধ্যে। At once is was a revealation to me। আপনার মতো আমিও ঘটনার নাটকীয়তা উপলব্ধি করতে পারতাম। গিয়ে গোলদীঘিতে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। ভাবলাম —এর মানে কি? হ্যাঁ—এর মানে তো একটাই। এই মানুষগুলো মনে করছে আমাদের বয়স পৃথিবীর সমান। আমরা পৃথিবীর সমকক্ষ এখন। পৃথিবীর সঞ্চিত যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আমায় আয়ত্ব করতে হবে। বুঝতে হবে আমায়—জানতে হবে আমায়। এই বোধই তো স্বাধীনতাবোধ। আমরা যখন 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলতাম—লোকে তাতে সায় দেয়নি। কারণ, তাদের কাছে আজাদী ঝুটা নয়। It is a road open to future progress—আজাদীর weakness গুলো যদিও তাদের অজানা নয়।

সাহিত্যভাবনা

সাহিত্য-সাহিত্যিক ও বিশেষ করে কমিউনিস্ট লেখকদের প্রসঙ্গ উঠল একদিন। লাহিড়ী কাটাকাটা কথায় মন্তব্য করতে থাকেন। স্পষ্ট ঋজু ভাষণ। তাঁর ধারণায় এক ফর্মুলার পাল্লায় পড়ে কমিউনিস্ট লেখকরা universality হারিয়ে বসে। তাঁদের অনেকেই জানেন না সাহিত্যে মানুষকে কি করে চরিত্রায়িত করতে হয়। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব থাকা চাই এবং খুবই দুরূহ ব্যাপার সার্থক চরিত্র আঁকা।

লাহিড়ী বলছেন: দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে গোপালদা triology লিখেছিলেন। পার্টি থেকে আমায় বই খানার পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখতে বলা হয়। পড়ে আমি লিখি—'বইটার মধ্যে কমিউনিস্ট গোপাল হালদারের উপস্থিতি খুব প্রকট। কিন্তু সাহিত্যিক গোপাল হালদারকে খুঁজে পাওয়া ভার'। পার্টিতে যে অল্প কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ রয়েছেন—গোপালদা তাদের মধ্যে একজন। এত wellread মানুষ আর নেই। গোপালদা বেঁচে গেলেন essayist হিসাবে।

মানিকবাবুর সেরা লেখা সব পার্টিতে আসার আগে, শ্রেষ্ঠ রচনা বোধহয় 'পুতুল নাচের ইতিকথা'! 'পদ্মানদীর মাঝি' আসলে আধা ডিটেকটিভ গল্প। লেখা ভাল হচ্ছে না বলে কি তিনি মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন?'

সুকান্ত অল্প বয়সে মারা না গেলে, কবি সুকান্তের মৃত্যু অচিরে ঘটত। সুভায যেমন—যতক্ষণ প্রেমের কবিতা লেখে ততক্ষণ ভালই লেখে। যেই সংগ্রামী কবিতা লেখে সঙ্গে সঙ্গে ফর্মুলায় ঢুকে যায়। আমি না পড়েও বলে দিতে পারি কমিউনিস্ট কবিদের কবিতায় কি থাকে। প্রথমে দুঃখকষ্ট—কিন্তু পরে ঈশান কোণে সূর্য দেখা যাচ্ছে। তারপর নির্ঘাৎ লাল পতকা উড়িয়ে সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে। লেখকরা যখন কমিউনিস্ট হয়, তখন লেখা খারাপ করে ফেলে সাচ্চা কমিউনিস্ট হতে গিয়ে। ফর্মুলায় পড়ে যায়। কমিউনিস্টরা লেখক হলে, তত খারাপ লেখেনা। স্টালিনের আমলে আবার রুশদেশ থেকে positive hero আমদানি করা হল। তখন লেখার মধ্যে এল যান্ত্রিকতার প্রভাব—ফরমায়েশী চরিত্রের ভিড়।

তারাশঙ্করের উপন্যাসের যুগ—অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের যুগ! সে যুগের মহিমা যেই ফিকে হয়ে আসবে তারাশঙ্করের উপন্যাসের কদরও ফুরিয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ থাকবে। কারণ, আমরা যে ভাষায় কথা বলি, লিখি—যত অক্ষম হোক না কেন—সেটা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার পিতা। মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান যত উঁচু হবে রবীন্দ্রনাথ তত বোধগম্য হবে।

শরৎচন্দ্র কিন্তু এখন আপনি পড়তে পারবেন না—তবুও best-seller। পড়ে প্রধানত ঘরের বৌ-রা যারা নানাভাবে suppressed। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের মনস্তত্ত্ব শরৎচন্দ্রের লেখার সারবস্তু।

আলোচনায় এল, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'। লাহিড়ীর মতে 'শেষের কবিতার' বক্তব্য—বিয়ের চেয়ে 'প্লেটনিক লভ' বড়। 'শেষের কবিতা' সিনেমার পর্দায় দেখে তাঁর মনে হয়েছে—it is a farce।

নেহরু ও গান্ধী

আরও একদিন সিনেমা নিয়ে আলোচনা শুরু হল এবং শেষ হল বিষয়ান্তরে গিয়ে। অত্যন্ত গভীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অ্যাটানবরোর 'গান্ধী' ছবিটি দেখে এসে তাঁকে বললাম, নেহরুর ভূমিকায় অভিনেতা নির্বাচন ঠিক হয়নি। মন্তব্য জুড়ে দিলাম—নেহরুর সেই sensitive face আর একটাও পাওয়া কি এত সহজ!

—Sensitive face কাকে বলে? লাহিড়ীর প্রশ্ন।

—এই ধরুন না মুখের উপর আবেগ মানে emotion খেলে যায়···অর্থাৎ আমি তখন তোতলাচ্ছি।

না। লাহিড়ীর নজরে এসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েনি। তিনি শুধু নেহরুর বক্তৃতায় কিঞ্চিৎ আবেগ মাখানো আক্রমণের চেষ্টাই দেখেছেন। নেহরু কখনো ভাল কাজ করেছেন বলে তাঁর জানা নেই। সবসময় বামপন্থী সেজে দক্ষিণ-পন্থীদের কাজ হাসিল করেছেন তিনি? তবে জনপ্রিয় কেন? কারণ অন্য কারো world বলে কিছু ছিল না। নেহরুর একটা world vision ছিল। তখন ফ্যাসিবাদ বিরোধী পপুলার ফ্রন্টের যুগ। স্পেনের গৃহযুদ্ধ থেকে মিউনিখ চুক্তি পর্যন্ত ঘটনার পর ঘটনা। CPGB-র contact-এ আসার ফলে নেহরু সেই পপুলার ফ্রন্টের শরিক। দেশেও কমিউনিস্ট ও অন্যান্যদের সাথে খানিকটা হৃদ্যতা—তাছাড়া গান্ধীর backing।

আর গান্ধী! গান্ধী confuse করতে পারতেন—escape করতে পারতেন। তর্কে হেরে গিয়ে বলতে পারতেন—keep my place in your

heart। গান্ধী দরকার হলে mean হতে পারতেন। সুভাষ বোস ত্রিপুরীতে জিতে যাওয়ায় রাগ চাপতে না পেরে বলে ফেললেন—'After all he is not enemy of the country।' আবার সোদপুরে লাহিড়ী আর ভূপেশ গুপ্ত যখন দেখা করতে যান গান্ধীজীর সঙ্গে—কথাবার্তার সময় লাহিড়ীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল wistful and unreality—I mean wistful and unreal। তখন গান্ধীজী বলে উঠলেন All Bengalees are like that। লাহিড়ী report করলেন—All Gujratis are like that। অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয়কে উপলক্ষ করে খোঁচা দেবার সুযোগও গান্ধী ছাড়তেন না। না God নয়—মানুষ। বড় ধড়িবাজ মানুষ। তবে একটা ব্যাপারে—হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ব্যাপারে sincere।

জনজীবনে অবক্ষয় প্রসঙ্গে

'অবক্ষয়' শব্দটির নির্বিচার প্রয়োগে লাহিড়ীর ঘোরতর আপত্তি। সেদিন দিলীপ বোসের জন্মদিন। দিলীপ বোস এসেছেন এক বাক্স সন্দেশ হাতে। গল্প জমে উঠল। লাহিড়ী-দিলীপ মানেই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে যাওয়া। এককথায় ইতিহাসের পাতা দ্রুত উল্টে যাওয়া। ঠিক সেসময় ঘরে ঢুকলেন সুবোধ দাশগুপ্ত, কালী চৌধুরী ও প্রবীর সেন। তাঁদের আবার বেশি ইতিহাস চর্চা বরদাস্ত হয় না। তাঁরা আলোচনা টেনে একেবারে হেমেন মণ্ডল আর গৌরীবাড়িতে। সুবোধ দাশগুপ্তের হাতে একখানা কাগজ—লাহিড়ীর একটা সই চাই। কাগজের বয়ানে রয়েছে—'চারিদিকে সার্বিক অবক্ষয় ইত্যাদি।'

লাহিড়ী ফেটে পড়লেন! এই অবক্ষয়! অবক্ষয়!! আর অবক্ষয়!!! এই কাঁদুনি গাওয়াতে আমি সেই। তাই যেটা নিয়ে এসেছেন—আমি সই করবো না তাতে। সবাই যদি অবক্ষয়গ্রস্ত হবে—তাহলে আপনি আমার কাছে আসতেন না। আপনার অবক্ষয় হয়নি বলেই তো এসেছেন।

—আমরা মানুষকে জাগাতে চাই—এ সম্বন্ধে সচেতন করতেন চাই। সুবোধ দাশগুপ্তের মৃদু কণ্ঠস্বর।

—আরে এসব শুনলে পর মানুষ জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে নিদ্রিত হবে।

লাহিড়ী বলে চললেন: আমার কথা শুনলে সবাই হাসে। আমি মনে করি, এখন দাবী তোলা উচিত—লোকের হাতে অস্ত্র তুলে দাও। এটা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্লোগান: Right to bear arms।

না, মানুষের উপর আস্থা হারাতে তিনি রাজী নন। ভালমন্দ মিশিয়ে

যে মানুষ—তাকে তিনি ভালবাসেন। তার সবকিছু তিনি জানতে চান—বুঝতে চান।

৬

২১ জুলাই ১৯৮৪।

কেবিনে কোন ভিজিটার নেই। শুধু লাহিড়ী আর পাশের ইজিচেয়ারে শুয়ে প্রবীণা নার্স। আমায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে নার্স ইজিচেয়ার ছেড়ে দিলেন। আমি বসলাম তাতে। লাহিড়ী অস্ফুট ভাষায় কি যেন বলতে চাইলেন। বুঝলাম, কথা বলতে গেলে বুকের মধ্যে Spasm হচ্ছে। Spasm কথাটি স্পষ্ট উচ্চারিত। হাত দুটোর অস্থির নড়াচড়া। একটা হাত আমার দিকে বাড়ানো—কাঁপছে। কিছু না বুঝে, না ভেবে আমার দুই হাতের মুঠোয় লাহিড়ীর রক্তাল্প ঈষৎ ঠাণ্ডা হাত বন্দী করলাম। মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। একটু পরে ঢুকলেন কালী চৌধুরী ও কয়েকজন ট্রাম কমরেড। লাহিড়ী হাত তুলে সেলামের ভঙ্গী করলেন—তারপর ইশারায় তাঁদের চলে যেতে বললেন। এক ফাঁকে কালী চৌধুরী আমায় জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি রোজ আসেন? বললাম, না।

বসে আছি। দেখছি লাহিড়ীকে—পরিচ্ছন্ন স্বাভাবিক ধারালো মুখ। না, মৃত্যুর ছায়া পড়েনি ঘরটাতে। আমি আশ্বস্ত হলাম। জানলার বাইরে তখন একখণ্ড আকাশ ঘরের ভেতরে আসতে চাইছে। সুন্দর আকাশ—তাই ঘুড়ি আর সুতোর অস্থির ওড়াউড়ি। আকাশের কাছে যেতে চাইছে—পৌঁছতে চাইছে ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে বালকের হাতের ঘুড়ি। মর্ত্যের তুচ্ছতা যেন অসহ্য।

নার্স বসে আছেন। অনেক রোগ আরোগ্য জীবন মৃত্যু—প্রিয়জনের রোগমুক্তিতে উপচে পড়া আনন্দ ও প্রিয়জন-বিয়োগে বিষাদে শোকে ভেঙে পড়ার সাক্ষী প্রবীণাটি। কিন্তু তিনি কি জানেন কার শিয়রে আজ তিনি বসে? হয়তো জানেন—হয়তো জানেন না।

মেয়ে জামাই এল, আর আমি উঠে পড়লাম। বললাম, চলি।

—আচ্ছা ভাই।

লাহিড়ীর হাতে আর একবার মৃদু চাপ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আটাশে অক্টোবর কলকাতায় ফিরে বুঝেছি আমার আসাম ভ্রমণের কাহিনী একজনকে শোনানো যাবে না—যাঁকে শোনালে আমার ভাল লাগত। আমার চারপাশে শব্দায়মান কলকাতা—অথচ লাহিড়ী নেই। লাহিড়ী যে এই শহরকে দারুণ ভালবাসতেন।

শূন্যপুরাণ

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বচ্ছ সুতোটির কোথাও ফাৎনা লেগে নেই, তবু ওই সূক্ষ্ম সুতো শিকারের দৃঢ়তা ব্যক্ত করে। অমলকুমার জলের জীব নয়, এতে ভয় যে তাকে রেহাই দেবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়! বিশেষ সে লক্ষ করে দেখেছে, এইখানে আলোবাতাসের গতিপথ কংক্রীট বিভিন্ন আকার ও উচ্চতা দিয়ে বহুদিন যাবৎ ঠেকাবার চেষ্টা করে আসছে। এই জ্যামিতিক নক্সা আঁধারপ্রেমী, সে তার ঘুলঘুলি, আনাচ কানাচ সহ সমস্ত গর্ত ও খোদলে নিকষ কালো এই তরল ধরে রাখবে বলে যেন হাঁ করে থাকে। জ্যামিতিক নক্সা প্রতিদিন সকাল দশটা নাগাদ গো-হারা হলেও, এই হেরো খেলাটিতে সে ক্ষান্তি দেয় নি। এইটিতে তার বড়ই আহ্লাদ।

অমলকুমার ঘুমের থলি হাতড়ে-হাতড়ে নিজের হাড়গোর, মেদমজ্জা একত্রিত করার চেষ্টা করছিল। কয়েকবার পাশ ফেরা, হাত নাড়া, হাই, আঙুল মটকানো ইত্যাদির দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, একসময় মনে হল, না আজও সে পেরেছে। এক অর্ধমৃত অবস্থা থেকে মনের জোরে সে নিজেকে ছিনিয়ে আনতে পারল আজও। এরপর সে বিছানা ছাড়ার কথা ভাবে। চেষ্টা করে নিজের শরীরটি নিজেরই দুটি পায়ের উপর খাড়া করতে।

আলোকরশ্মি ভাঙা জানলার পাল্লাটি দিয়ে সোজা তার দুচোখের মণিতে টিপ হয়ে বসেছিল। নতুন কিছু নয়, টানা দুবছর দশ দিন এইরকমই চলছে। এবং ওই স্পর্শকে আঙুল স্পর্শ বলে সে ভুল করে আসছে ঠিক ততোদিনই। যেন দুটি সমান্তরাল ঘটনা, দুটিই স্বাধীন, কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়, তবু বিভিন্ন সময় বিন্দুতে তাদের আচরণ সুনির্দিষ্ট। আলোকরশ্মির আবির্ভাব হবে আকস্মিক, অমলকুমারও আকস্মিক ঘুমের আশ্রয়টি তলিয়ে যেতে দেখবে। আলো একসময় তার চোখের পাতায় থিতু হবে, অমলকুমার তখনই তার দুচোখে আঙুলের ছোঁয়া পাবে এবং ভাবতে বাধ্য হবে, 'এ কে, এ কার আঙুল'।

শয্যাত্যাগের ঘটনাটির কোনও গুরুত্ব থাকত না এবং সেটি দৈনন্দিনে গুঁজে রাখা একটি ছাতানাতা ছাড়া আর কী-ই বা। বেলা বাড়ত,

অনুপ্রবেশকারী আলো ও ক্রমশ বলিষ্ঠ হওয়া দিন, ধীরে তাকে একপ্রকার তরতাজা ভাব হাতে তুলে দিত প্রসন্ন চিত্তে। ওইটি উপহার। আজ আবহাওয়া অন্যরকম, আলোকরশ্মি একা আসেনি, সঙ্গে ভেজা বাতাসও আছে। স্মৃতি উসকে দিতে এই ভেজা বাতাসের কোনও জুড়ি নেই, সে ভাবে।

এর মধ্যে বাহৃত কিছু কাজ সেরে ফেলেছে অমলকুমার, একসঙ্গে দু-তিনটি কাজ। গ্যাসের উনুনে চায়ের জল চাপানো, টুথব্রাশের লম্বা রোঁয়ার শয্যায় নীলাভ পেস্ট দিয়ে একটি মোটা রেখা আঁকা, দু-টুকরো রুটি গরম করা ইত্যাদি। বস্তুর ছায়ার মতো, এইসব কাজেরও প্রতিবিম্ব থাকে, সেগুলি নানারকম ধ্বনি ও শব্দ। ত, সেই ধ্বনি ও শব্দরা অমলকুমারকে প্রিয়জন ভেবে তার চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। এতে থামা লাগে, সে ভাবতে পারে রূপকথার চরিত্রের মতোই তার নামটি, অমল ও কুমার বিচ্ছিন্ন নয়। তারা দুয়ে মিলে রূপকথার ডালিমকুমারের মতোই। এইটি প্রথম দেখিয়ে দেয় ভারতী। যেন এই তার কাজ ছিল, সম্বিৎ ফিরে পেতে অমলেরও যেন প্রয়োজন ছিল একটি মৃদু ধাক্কার।

আজ তার আসার কথা, অমলকুমার যেন ঘুম ভাঙার আগে, ঘুমের মধ্যেও কথাটা ভুলতে পারেনি। ভারতী আসবে এতে কোনও সাতরঙা ঔজ্জ্বল্য নেই। এক নিরুত্তাপ ঘটনামাত্র। দুবছর দশ দিন সময় এই ঘটনাটির মধ্যে প্রবেশ করেও তাকে কিছু উত্তেজক, নাটকীয় করে তুলতে পারেনি। অমলকুমার তবু যে ভারতীর আগমনের তারিখটি ভুলে যায় নি তার কারণ এতো কম ঘটনা আছে তার মনে রাখার জন্য, তার জীবনে ঘটনার এমন এক মহাদুর্ভিক্ষ আছে যে, ভারতীর আগমনকে ঘিরে মাঝে মধ্যেই সে বহু কাল্পনিক দৃশ্য সাজিয়েছে। যেমন ভারতী হিল জুতোর শব্দ তুলে এল, সে নিঃশব্দে এল, ভারতীর মুখে গাম্ভীর্য ও বিষন্নতা শব্দ দুটি ফুটে উঠল, ভারতী ভাষা হারিয়ে স্থবির, বাচাল ভারতী ডুকরে কেঁদে উঠল, তার শরীর ফুলে ফুলে, শরীরবন্দী ঢেউরেখাকে এই দু-ঘরের খোপটিতে ভয়ঙ্কর মুক্ত করে দিল, নিমেষে বন্যায় ভেসে গেল সব। সে তাকে সচকিত করতে চেয়েছিল. অমল দেখে, সেই ভারতী কেমন গলে যাচ্ছে, নুনের শরীর গলে যাচ্ছে।

দু-কামরার এই বাসস্থানটি তারা সাধ্যমত সাজিয়ে দিল, কখনও, কচিৎ কাজে লাগতে পারে এরকম বেশ কিছু মালপত্রও জড়ো করেছিল তারা। স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বাসস্থান, একটি পূর্ণাঙ্গ সংসার গড়ে তুলতে কম যন্ত্রপাতিও

জোটায়নি। ফল হয়েছে এই, শূন্য ফাঁকা জমি নেই বললেই চলে, মেঝের নব্বুইভাগ জায়গা টেনে নিয়েছে যন্ত্র ও মাল। ঘড়িবাঁধা সময়ে এখানে যেটুকু বাইরের আলো আসে, নানা আকার ও রঙের মালপত্রই তাতে আলোকিত হয়ে ওঠে। তদুপরি বাইরের আলো সেসবে প্রতিফলিত হয়ে এক মিশ্র রঙের সৃষ্টি করে, যেটি না এই আলোর, না সাংসারিক জিনিসপত্রের। অমলকুমার নিজেকে এ দুয়ের মাঝে, আলো ও বস্তুময় সাংসারিকতায় দুটুকরো হতে দেখে। সে একবার গৃহত্যাগের কথাও ভেবেছিল। নিশ্চয়তা, আরাম এবং সাহসের অভাবেই শেষপর্যন্ত ওই প্রকল্পটি কার্যকর হয়নি।

ঘুম ভাঙার পর আজ যে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটেছে তার কোনও বর্ণনা সম্ভব নয়। বর্ণনাতীত সেই ঘটনাটি হল একটি শব্দ 'জাগরণ'। বিছানা থেকে নামাব আগেই শব্দটি তার সামনে প্রসারিত করেছিল উষ্ণ একটি হাত। এভাবে সে আঙুল থেকে হাত পর্যন্ত পৌঁছে, জাগরণ শব্দটি সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে, পূর্ণাবয়ব এক নারীমূর্তি কল্পনা করে ফেলে। কল্পনা এবং তার সমান্তরাল বাস্তব তথ্য আজ ভারতী আসবে, এমন অমোঘ হয়ে ছিল যে অমলকুমার বিমূঢ় হয়ে যায়। এবং সে মনে মনে জাগরণ শব্দটির নিচে আচ্ছা করে দেগে ছিল, অর্থাৎ শব্দটির গুরুত্ব নিয়ে তার কোনওই সংশয় নেই। এরপর হয়ত ঢ্যাড়াচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন ইত্যাদিও শব্দটির পর বসাবে কিনা ভাবছিল, তবে সেই চিন্তা স্থায়ী হয়নি।

ভারতী কখন আসবে কোনও ঠিক নেই, তবে সে যে আসবে এইটি প্রবলভাবে স্থির। যে কোনও মুহূর্তে দরজার কড়া নড়ে উঠবে তখন কি এইরকম শব্দ শোনা যাবে ঃ দ্বার খোল, দ্বার খোল। কী হাস্যকর! কোথায় দ্বার এবং কেইবা তা খুলবে। তাছাড়া খুললে এমন কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। ভারতীর অনুপস্থিতি এবং তার আগমন-সম্ভাবনা এক দারুণ সুযোগ বলা যায়। সেইজন্যই অমলকুমারের পক্ষে কত কী ভাবা সম্ভব হচ্ছে। বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই সেসব ভাবা হচ্ছে, তবু তাতে খেলার কিছু উপকরণ থেকে গিয়েছে। গরহাজির ভারতীর মুখে মর্জিমাফিক সংলাপ বসিয়ে, পছন্দসই আচরণ বিধি দিয়ে, এমন এক ভারতী সে নির্মাণ করছে, বাস্তবের ভারতীর সঙ্গে যার মিল শুধু চেহারায়। এইটি করতে করতে অমলকুমার হঠাৎই শিউরে ওঠে, তাহলে সে কি কখনও ভারতীকে গোপনে গ্রাস করেছিল। একসঙ্গে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে একজন কি অপরজনকে খেয়ে ফেলে। এবং এখন সে যাকে কল্পনা বা ভাবনা বলে মনে করছে আসলে তা বমন ছাড়া কিছু নয়। অন্যত্র,

কোথাও এইভাবে ভারতীও হয়ত তাকে উগরে দিচ্ছে। গ্রাস ও বমন, বমন ও গ্রাসের এক লীলা দেখতে পাচ্ছে অমলকুমার। এই খেলাটি তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, বা মুগ্ধ হওয়ার, বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হওয়ার এক আশ্চর্য প্রতিভা আছে তার। সত্যিই ত এরকম কিছু ঘটেনি, ভাবনা আর ঘটনা, কল্পনা আর ঘটনা পরস্পরের মধ্যে স্থান বিনিময় করেছে এরকম কোনও তথ্য অমলকুমারের জানা নেই।

তথ্য অন্য কথা বলে, শান্ত, করুণাময়ী ভারতী ক্রমে অস্থিরতার দিকে টাল খাচ্ছিল। মোটের উপর পরিতৃপ্ত দুজনের এই সুখী জীবনে ভারতী কেমন ক্ষয়ে আসছিল, ক্রমিক ও অনিবার্য এক অবলুপ্তি যেন। কোণের চেয়ারটিতে পাথুরে ভাস্কর্য হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে, এ-বই সে-বই টেনে খাটটিতে অক্ষর ও শব্দের এক পাহাড় গড়ে খুঁজে পায়নি গতি ও আনন্দের উৎস। পোষ মানা আলো অমলকুমারের পায়ের কাছে গুটিয়ে আছে এখন, সেইদিকে তাকিয়ে সে তৃপ্তি পেল। কিন্তু ভারতীর অস্থিরতা নিয়ে ক্ষণপূর্বের চিন্তা, সে ধরে রাখতে পেরেছিল, এখন সে-প্রসঙ্গে মনে হল, কী করে অতোটা নিশ্চিত হওয়া যায়, এ কেবল অনুমান। ভারতী তাকে অন্য কথা বলত, সে যেনবা এক আধুনিক বেহুলার ভূমিকা স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছিল। অমলকুমারকে জীবন্মৃত অবস্থা ও তার ঘোর থেকে টেনে বের করার দারুণ এক জেদ চেপে ছিল তার।

'—তুমি আলসে।'

'—পড়ে পড়ে ঘুমোও শুধু।'

এইরকম মৃদুভাবেই শুরু হয় সম্পর্ক বিনাশের উপাখ্যানটি। ভারতী খেলাটিতে দম হারিয়ে ফেলল শেষপর্যন্ত, বা সে ভেবেছিল কতদিন এইভাবে টানা যায়, বয়স তাকে আঁচড়াচ্ছে ভারতী টের পেয়েছিল। সে মরে যাবে একদিন, এই গোছানো বাসস্থানটিতে, বৈচিত্র্যহীন এক পুরুষের সান্নিধ্যে সময় সাবলীল ছিল না। তরতর করে ঘটনাস্রোতে, আনন্দ-উত্তেজনায় এগোচ্ছিল না বলেই হয়ত সময়ের চাপ ছিল মারাত্মক। সে একদিন বলে ফেলে, 'মরে যাবো, এভাবে মরে যাবো।'

সিগারেট পুড়তে পুড়তে তাত এখন আঙুলের ডগায়, সতর্ক না হলে মাংস পুড়ে যেত। শূন্য চায়ের কাপটি আর গরম নেই, পরিবেশের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবটি তার উত্তাপ শুষে নিয়েছে। এইসবে সময়ের একটা আন্দাজ পেতে চেষ্টা করছিল অমলকুমার। দেয়ালে নটরাজ মূর্তির ক্যালেণ্ডারটি গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছে দেখে সে কেমন মজা পেয়ে যায়। প্রতীকের ছড়াছড়ি,

সময়-ফাঁস, নটরাজ, কী করে যেন প্রতীক বড় সুলভ হয়ে উঠেছে, যেন সবকিছুই প্রতীকী। রক্তমাংসের মানুষ কেউ নয়, কিছু নয়।

ক্যালেণ্ডার থেকে চব্বিশ এই তারিখটি উঠে এল, ভারতী আসবে বলেই যেন সে এখন তৎপর। চব্বিশ সংখ্যাটি ভারতীর ছায়া যেন, অমলকুমার এতক্ষণ যা যা ভেবেছে ও করেছে সবই ভারতীকে সাক্ষী রেখে। সে ছিল বলেই এই সময় অতিবাহিত হল। ভারতী অমলকে ডেকে বলছে, '…দ্বার খোল, দ্বার খোল।' আর অমল শুনছে 'মাতা দ্বার খোল।' এইরকম ভৌতিক ঘটনা, এইরকম অসম্ভবের সামনে সে জীবনে কখনও পড়ে নি। আজগুবি এক ভয়ঙ্কর দানব হয়ে অমলকে গিলতে আসছে, জোড় বাঁধা নামটি থেকে রূপকথার কুমার এই টানাপোড়েনে খসে পড়ে, সে বোঝে, 'আমি অমল, আমার কোনও দরজা নেই, বা দরজা খুললে কিছুই পাওয়া যাবে না।' তাছাড়া ভারতী কখনওই তাকে 'মাতা' বলে সম্বোধন করবে না, গাঢ় ও প্রাচীন এক নিদ্রার কারসাজিতে এমন এক পৌরানিকতা তাকে ঘিরে ফেলেছে যার ফলে বিচিত্র সব কথা সে শুনতে পাচ্ছে নিজের অতিনিরাপদ ঘরটিতে আধশোয়া হয়ে। আর এইটির হাত থেকে রেহাই পেতেই যেন একজন অমল দুই হয়েছিল, ভারতী সেই অপর অমল। কিন্তু জন্মগ্রহণের পর, সকাল থেকেই সে অমলকে অমান্য করেছে এবং শেষে এক আজগুবি সংলাপ উপহার দিয়ে এখন বেপাত্তা। আজগুবিটির মধ্যে সে ঘুরপাক খেতে থাকে, ভাসতে থাকে খড়কুটোর মতো। সময়হীন ওই অখণ্ড স্রোতে ভীত অমল ডুকরে ওঠে, 'ভারতী! ভারতী!' চব্বিশ এই সংখ্যাটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে। ভারতীর আগমনের জন্য এই তারিখটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ভারতীই জানিয়ে ছিল, '২৪ তারিখে থেকো।'

'তোমার কোনও নিজস্ব চিন্তা নেই'… 'তোমার কোনও কর্মসূচী নেই'… 'তুমি জড় পদার্থ'…অমলের সৃষ্ট ভারতী তাকে চাবকাচ্ছে। অভিযোগ আর প্রশ্ন, প্রশ্ন আর অভিযোগে অমল গুটিয়ে যেতে থাকে, তার মধ্যে আত্মরক্ষার ঝোঁক প্রবল হয়, ততক্ষণে সে হারিয়েছে ভাষার অধিকার। তার আর কোনও ভাষা নেই। অথচ আত্মরক্ষার ত ওই একটিই মাত্র বর্ম। কাল্পনিক পাপ ও শাস্তি, সম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন ও অভিযোগ সংখ্যাতীত সারসার পিঁপড়ের মতো ধেয়ে আসছে। পিঁপড়েরা বিন্দু বিন্দু মাংস ছিঁড়ে নিয়ে অমলকুমারকে লোপাট করে দিতে পারে। তখন হয়ত বিছানার চাদর কুঁচকে থাকবে, কোথাও গভীর ভাঁজ দেখা যাবে, আর কিছুই থাকবে না। লোপাট অমল।

প্রশ্নরা ঘাতকের থেকেও নির্দয়। অথচ দেখো, তাদের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। একদা অমল ভারতী ছিল দিন ও রাতের মতোই, ঘাতকের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা তখন কিছুই জানত না। বোকা আহ্লাদেপনা, নরম-যৌনতা আর অনন্ত সম্ভাবনার বুননের মধ্যে কী অপরিসীম স্বস্তি ছিল। একদিন তারা দুজনে অনাবিষ্কৃত পৃথিবী খুঁজে বে এরকমও ভেবেছিল। উচ্চাভিলাষের এক ধ্বংসস্তূপে এখন চিৎপাত পড়ে আছে তারা। এখন অমল এই ঘরটিতে, ভারতী কোথায় কে জানে।

'—ঢের হয়েছে'

'—কী?'

'—শরীর।'

'—অশরীরী হতে চাও।'

প্রেম প্রসব করেছিল এইরকম সংলাপ। দৃশ্যটির শুরু ও শেষ এখন আর অমলকুমারের মনে নেই। কাহিনী তার অত মনে থাকে না, কিন্তু শব্দ, কথা বড় তেজী হয়ে থাকে, তারা মরার মতো পড়ে থেকে, বিবর্ণ হয়েও ফিরে পেতে পারে পূর্ণযৌবন। অমলের সাধ্য নেই কথা ভুলে যাওয়ার। সে যেন বা রক্তস্রোতে বেঁচে নেই, ব্যক্ত ও অব্যক্ত কথার এক মিশ্র স্রোতেই তার জীবন-নাট্যের উত্থান পতন, রোমাঞ্চ, হর্ষবিষাদ।

ঘরটিতে তখন গ্রীলের নক্সা মুখে নিয়ে আলোক রশ্মি কোনও জাল বিছিয়ে দেয় নি। বাইরের আলো থেকে তাদের ঘরগেরস্থি ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, শরীর সম্পর্ক শেষের দৃশ্যটির এইমাত্র মঞ্চ সজ্জা। আরও আছে, এবং সে সবই আলোবিষয়ক। টিউবটি থেকে, পড়ার টেবিলের ল্যাম্পটি থেকে এবং কিচেনের ভোতা ও ঝুলে মাখা বালবটি থেকে চুঁইয়ে পড়ছিল তার বাহিত ধোঁয়া-ধোঁয়া আলো। ওই আলোয় ভারতীয় খাড়া নাক, তার পাশ মুখ বেয়াড়া রকমের লম্বা দেখাচ্ছিল। দিনটি রবিবার। রক্ত ধোয়া মাংসের খণ্ডগুলি নীল শিখার চমৎকার একটি চিতায় সেজে বসে ছিল। মাংসের চড়া গন্ধের মধ্যেই হয়ত ভারতী এক আশ্চর্য উপায় জেনে ফেলে, উত্তর কলকাতার এই প্রাচীণত্ব, সময়ের সুবিশাল স্তূপ, ফাটল চিহ্নিত দেয়াল ও গুঁড়ি শ্যাওলা এক মারাত্মক জাল বিশেষ। উদ্ভিদবৃত্তিতে শিকড়ের মতোই তা ভারতীকে জাপ্টে ধরছে, অমলকুমারকে এই ষড়যন্ত্রে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অমলের শরীরে সে সম্ভবত শ্যাওলার গন্ধ পেয়েছিল।

ভারতী বন্ধুর মতো, প্রিয়তমা আত্মীয়ের মতো, হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে অন্তিম সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিল।

'—তুমি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ছো।'

'—মানে?'

'—তুমি সব সময় যেন ঘুমিয়ে আছো।'

'—কী করে জানলে?'

'—তোমার শরীরে ঘুম ঘুম গন্ধ।'

ভারতীর মুখে ছিল রক্তের উচ্ছ্বাস, সেও অন্তিম, যেন এখুনি এই ঘর ছেড়ে না গেলে রক্ত অদৃশ্য হবে। ভারতী উদ্ভিদ হয়ে যাবে। বাস্তবে যাদের কোনও বিপদ হয়নি, বিপদের পেশায়, টানে, তারা তখন মরতে বসেছে। ভারতী চামড়ার ব্যাগটি নিপুন ভাবে গোচ্ছাচ্ছে, যেন কিছু হয়নি, যেন এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণের জন্যই যা কিছু যন্ত্রণা এবং টানাপোড়েন। এখন সে শান্ত, অমলের চোখে ভারতী এখন এক শান্তশ্রী···এবং আধজাগা অমল তাতে মুগ্ধ। সত্যি খুব সুন্দর, এক অলৌকিক সৌন্দর্য অর্জন করেছে ভারতী। মৃত মানুষের সঙ্গিনী নয় আর সে, এইটি মুক্তি, ভারতীর তাহলে দ্বিতীয় জীবন শুরু হল এরপর। অমল কল্পনা করার চেষ্টা করে কেমন হবে সেই জীবন, তাতে কত রকমের ঘটনাও উত্তেজনা ভিড় করে আসবে।

প্রতিদিনে, প্রাত্যহিকতায় মজে থাকা অমলকুমার কোনও দিন সেই জীবনটির খোঁজ পাবে না। সত্যিই কি সে ঝিমুনি ও ঘুমের মোড়কে বন্দী? তার শরীর পরতে পরতে জড়িয়ে ধরেছে এক কালঘুম? যেমন ভারতী বলত, 'ঘুমের মধ্যে অনেকে কথা বলে, হাঁটে, তুমি সেইরকম একজন, স্লিপওয়াকার।' কী সাংঘাতিক! অফিস, বন্ধুত্ব, প্রেম ও সফর সবইকি সে ঘুমের মধ্যে, শরীর অভ্যাসে করে চলেছে? আজ ভারতীর এক ঝলকের জন্য আসার কথা, তার এই ক্ষণস্থায়ী আসাটা এক পুনরাগমনও হতে পারত। ভারতী আবার নীল শিখায় মাংস চাপিয়ে, হলুদ মাখা হাত আঁচলে মুছতে মুছতে বলতে পারত, 'কেমন, হল ত!' এইটি এখন পুরাণ কথা, অথচ কত সহজেই না তা হতে পারত। দীর্ঘজীবী প্রেমের জয়ধ্বনি দিতে পারত তারা। অমল এই সম্ভাবনাটি নিয়ে শিকারি বিড়ালের মতোই নাড়াচাড়া করছিল। আর ওই সম্ভাবনা ক্রমেই ভীত ও ছোট হতে হতে একটি ইঁদুরছানা হয়ে যায়।

ভারতী—আয়নায় বিভিন্ন বয়সের অমলের কিছু স্থির ছবি আছে। সেইসব আয়না-ছবি এরকম মধুর সমাপ্তি সমর্থন করবে না। তারা প্রশ্নের ছুরিকা নিক্ষেপ

করে এক দক্ষ ছুরিবাজের মতোই অমলকে একটি কাঠের পাটাতনে বন্দী করে ফেলবে।

দেয়ালের ফাটল, চাপা ও স্যাতসেতে অন্ধকার গলির এক কুণ্ডলীর মধ্যে চিৎপাত পড়ে আছে অমল। ঘটাং ঘটাং শব্দে চলে যাচ্ছে মন্থর ট্রাম। এই স্থানটির কী অপরিসীম ক্ষমতা, অমলকুমার এইখানে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ভাবছে তার ঘুম-ব্যাধি নিয়ে। ঘুমের সিঁড়ি থাকে, একের পর এক সেই সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে এখন সে ঢের সুস্পষ্ট এক বাস্তবের ছোঁয়া পাচ্ছে। একটি শীর্ষ, চূড়ান্ত ন্যাড়া একটি ক্ষেত্র। এখানে কিছু জন্মায় না, এখানে কোনও রঙ নেই, আকার নেই। ঘুম তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। অমল ফিরে পেয়েছে মাতৃগর্ভে থাকার সেই প্রণামভঙ্গি। তার হাত দুটি এখন বুকের কাছে জড়ো করা। নিস্তরঙ্গ শূন্যতায় এই গর্ভ ছিল পূর্ণ-উর্বর। সে অমলকে ছাড়ে না; তার অদৃশ্য, সূক্ষ্ম শিকড় এখন ধীরে প্রবেশ করেছে প্রতিটি রোমকূপে। এই নিষ্ঠুরতা আরাম উৎপন্ন করতে পারে। ঘুম ঝেঁপে এল। আলোকরশ্মি এখন তার ঠোঁট ছুঁয়েছে। ভারতীর আর কোনও অস্তিত্ব নেই, সে স্বপ্নে হানা দিতে অক্ষম, কে বা কারা তার ডানা দুটি কেটে ফেলেছে। ভারতীর জন্য অমলের খুব কষ্ট হল, হায় সে কোনওদিন উড়তে পারবে না। জানতে পারবে না সত্যিকারের জেগে ওঠা কাকে বলে। তার কষ্ট ব্যর্থতা ও অমোঘ টান ওই মাংসপিণ্ড কোনওদিন স্পর্শ করেও দেখবে না! ভেজা দিনটি অমলের ঘুমের উপর ধারাবর্ষণ ঘটাতে তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত, আলসেয় বিঁধে থাকা একটুকরো কালোমেঘ ধীরে সরিয়ে দিতে থাকে স্বচ্ছ আলো।

বড়দের সঙ্গে যাওয়া

মানিক চক্রবর্তী

নিখিলের ঠিকই ধারনা ছিল, উদিত তার ছেলে নয়। ধারণাটা কখন, কিভাবে অথবা কোন্ সূত্র ধরে নিখিলের মধ্যে এসেছিল, সেটা এখন আর একেবারেই বিচার্য নয়, এমনই সঠিক, অমোঘ বা বদ্ধমূল ধারণা। যার জন্যে ইদানিং সে উদিতের পুরো নাম যে আসলে উদিতবিকাশ, এসব ভাবতেও আস্তে আস্তে ভুলে বসছিল। যতোটা না ডেকে বা সাড়ম্বরে নাম ঘোষনা না করে পারা যায়, সেরকমই ব্যাপার যেন অনেকটা। এমনকি, বিজুর সঙ্গেও যে একটা সমান মাপের কিংবা আরো ব্যাপক ধরনের ঘেন্না সেজন্যে, একটা আক্রোশ, বিজাতীয় ক্রোধ বা একটা প্রতিহিংসার মনোভাব, সে-সবও যেন নিখিলের মধ্যে ততটা ছিল না। আশ্চর্যই বলতে হবে। নিজের স্ত্রী বিজুর প্রতি যেন বলতে গেলে তেমন কিছু নয়, শুধুমাত্র ঐ ছেলেটার ওপর, ঐ উদিত, শুধু উদিতের ওপরই যেন নিখিলের সবটুকু বিতৃষ্ণা বা ঐ নাছোড়বান্দা তীব্রতর আক্রোশ, অথবা যেরকম ভাবেই নিখিলের সেই মনোভাব বোঝানো যাক্ না কেন— নিখিল অদ্ভুত একটা অন্তর্নিহিত উপায়ে সেটাকে সংযত, করে তুলতে পেরেছিল এমন, ভুলেও কোনোদিন সেটার মারাত্মক রকমের বর্হিপ্রকাশ নিখিল করে ফেলেনি কোনো। বা তা ঘটবার সমস্ত সম্ভাবনাটুকুও নিখিল এই এতদিন ধরে, যখন ছেলের বয়স প্রায় চার-সাড়ে চার হতে চলল, অনিবার্য এক উপায়ে সেই ভয়ংকর বিতৃষ্ণাটা সামনে রাখতে পেরেছিল। 'বোকামো কোরোনো না নিখিল, একদম বোকামি কোরোনা, একদম না'—এরকম একটা স্বগতোক্তি নিখিল অহরহ তার নিজের মধ্যে লালন করে। লালন করত। কোনোরকম ফাঁকফোকর দিয়ে কিছুমাত্র তারল্য, নিখিলের ঐ ছেলে উদিতের প্রতি, কোনোদিন বেরিয়ে আসেনি। ছেলের অস্তিত্বই অবিশ্বাস বা অস্বীকার করার ভেতরে। যেন উদিত, উদিতেরই বা কি করার আছে, সত্যিই তো সে আমার ছেলে নয়, অন্তত আমার না, কিন্তু এতে কারোর তো কিছু করার নেই, উদিতের না, বিজুর না, নিখিলের নিজের তো নয়-ই। ঘটনা যেটা, অথবা আসল মোদ্দা কথা হলো এটুকুই, উদিত অন্তত আমার ছেলে না। উদিতের বাবা আমি নই, অন্তত নিখিল না। বিজুর সঙ্গে আমার যে সম্পর্কই থাক্। বিজু উদিতের

মা, একশোবার মা, বিজু নিখিলের স্ত্রী সেটাও তো হাজারবার, লক্ষবার, কিন্তু উদিত নিখিলের ছেলে নয়, বিজুর যাই হোক—মরুকগে, বিজু উদিতের কে, তা নিয়ে নিখিলের অন্তত মাথা ঘামানোর কিছু নেই. বিজু ঠিক আছে, কিন্তু উদিত, না, না, ন্ না, নিখিল এসব ভাবনার মধ্যে চোরাবালির মত ডুবতে ডুবতে হঠাৎই চট্ করে সরে আসে। বা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসে অদ্ভুত একটা ক্ষীপ্রতার সঙ্গে।

মনে মনে বোধ হয় দীর্ঘদিনের নিখুঁত একটা ছক হয়েইছিল, সুযোগটা বেশ ভালোভাবে হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়; বিজু যখন দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। নিখিল ভালোভাবে বুঝে নেয় সেই মাহেন্দ্রক্ষণ. যখন শুধু কাগজে-কলমে নয়, স্পষ্টতই বিজুর শরীরের সেই স্ফীতি যা বেশ পাকিয়ে উঠেছে, প্রকাশ্যে দেখা যায় বেশ ভালোভাবে, এবং সেই সঙ্গে আশ্বিনের মাঝামাঝি দুর্গাপূজোর ঐ চারটে দিন, যখন আর উদিতকে নিয়ে নিখিলের একা ছাড়া, অন্তত বিজুকে নিয়ে আর বেরোনোর উপায় নেই। কোনোমতেই বিজুর বেরুনো সম্ভব নয়। নিখিল তার মুড়াগাছার বাড়ি থেকে অষ্টমীর দিন দুপুরে হঠাৎ ধুতিতে মালকোঁচা মেরে এবং সাদা টেরিকটের কাজ করা পাঞ্জাবীটি গলিয়ে আর উদিতকেও নিখুঁত একটা লাল রঙয়ের কাজ-করা এক্রিলন গেঞ্জি আর খুদে ফুলপ্যাণ্ট, চুল পরিপাটি আঁচড়ানো, পরনের নটি-বয় সু-খানাও বেশ চকচকে, বিজুকে জানাল,

'ওকে নিয়ে একটু কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাই, দেখে-টেখে কাল সন্ধ্যের ঝোঁকে ফিরলেই হবে—'

'রাত্তিরে কোথায় থাকবে, ঐটুকুন ছেলে সঙ্গে নিয়ে—'

'রাস্তায়, রাস্তায়, বারে কলকাতার পূজো না?' নিখিল যথারীতি সহজ, সাবলীল ভাবেই বলে, 'পূজোর সময় আবার ওসব থাকাথাকির চিন্তা আছে নাকি? য়্যা?'

নিখিল যেন জানতই, অন্তত বিজুর ক্ষমতা নেই, তার ছেলে উদিতকে নিখিলের সঙ্গে ছেড়ে দেবার। ঐ অতদূর ছেড়ে দেবার মতো ঘোর অমঙ্গলসূচক কোনো ইঙ্গিত থেকে বিন্দুমাত্র নিজের ছেলেকে এতটুকু মুক্ত করার। তবু বিজুকে সুযোগ দেবার মতো করেই যেন হাল্কা গলায় বলল—'কি, তোমার ধারনা, কলকাতায় ঠাকুর দেখতে গিয়ে আমরা হারিয়ে যাব দুই বাপ-ব্যাটাতে মিলে, আর আসব না ফিরে?'

যেন সাংঘাতিক ঝুঁকি-ই একটা নিয়েছিল নিখিল। কিন্তু নিখিলের কাছে সেটা কোনো ঝুঁকিই নয়। এই এতদিনের আগলে রাখা মনোভাব, অপরের

ঔরসজাত নিজের সন্তানের প্রতি যতোটা পারা যায় সহজ, স্বাভাবিক মনোভাব, মনসংযোগ; যা যেন একমাত্র নিখিলের মতোই করা সম্ভব এই পৃথিবীতে, নিখিল জানত, সেই সংযত, সংহত হওয়া এক তিল, এক তিল করে, সেটা বৃথা নয়। না, বৃথা নয়।

হাজার হলেও বিজু নিখিলের বউ। পাঁচ-সাত বছর ধরে। একসঙ্গে ওঠা, বসা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা, দুটো শুধুমাত্র মাটির ঢেলা তো আর এতদিন ধরে সহাবস্থান করে আসেনি, না? দুটো রক্তমাংসের মানব—মানবীইতো? তবে আর নিখিলের মনোভাব বিজুর বুঝে উঠতে না পারার কি আছে, যতোই সংহত, সংযত আর নিরুদ্বেগ থাকার ভান নিখিল দেখাক না কেন? বিজু নিশ্চয়ই ঘাসে মুখ দিয়ে চলে আসেনি এতোটা বছর ধরে, সে আর নিখিলের ক্রিয়াকলাপ বুঝে নিতে পারবে না কেন হে নিখিল—সবই বুঝতে পারছে সে, মোক্ষম পারছে, কিন্তু বুক ফেটে গেলেও বিজুর আর বলার কিছু নেই যে! এটাই মোদ্দা কথা।

'দু একটা বাড়তি জামাকাপড় নে যাও অন্তত ছেলেটার জন্যে, চান-টানও তো করবা নে, কোনোখানে—' [বিজু কি হঠাৎ এবার ডুকরে কেঁদে উঠবে নাকি, তাহলেই তো চিত্তির?]

'আরে দূর্, পাগল নাকি' ছেলে উদিতের সাজ পরিপাটিভাবে আরেকবার লক্ষ্য করে, পায়ে চপ্পল গলাতে-গলাতে নিখিল বিজুর উদ্দেশ্যে আবার বলল, 'কলকাতায় এত আত্মীয়স্বজন, এত পরিচিত ঘরদোর, ও ঠিক ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে, আমি আবার ঢাউস একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে সারারাস্তা বয়ে বেড়াব নাকি, পাগল হয়েচো?'

এমনকি, উদিতের হাত ধরেও যখন নিখিল অনেকটা দুল্কিচালে রিক্সায় গিয়ে উঠল, স্টেশনে গিয়ে লালগোলা ধরল, বিকেল-বিকেল শেয়ালদা স্টেশনে এসে নামল, তখন পর্যন্তও নিখিল ছিল সেই পুরনো নিখিল। আকছার এই চার-সাড়ে চার বছর ধরেই তো বেজন্মা ছেলেটাকে চোখের সামনে দেখছে, হাঁটতে শিখল, এত বড় হলো, নিখিল বারো মাস, তিনশো পয়ষট্টি দিনই সেই অস্তিত্বকে তেমন একটা কোনো আলাদা করেনি। নিখুঁত পুষেছে। কাছে পিঠে স্কুলে ভরতিও করেছে আবার সংবচ্ছুর ভোরবেলা করে নিয়েও পৌঁছে দিয়েছে স্কুলে, ঐ বাজার যাবার পথে, তারপর বাড়ি এসে দাড়ি কামিয়েছে, চান খাওয়া দাওয়া করে অফিস কাচারি যা করবার করেছে, হাই তুলেছে, গম্ভীর হয়েছে, হেসেছে, সিনেমা দেখেছে, শীত-গ্রীষ্ম উপভোগ করেছে, কাগজ

পড়েছে, চায়ের দোকানে আড্ডা মেরেছে, যথারীতি বউকে জড়িয়ে শুয়েছে অনেকক্ষণ ধরে ঘুম না আসা অবধি, মাঝেমাঝে জ্বর হয়েছে, বদহজমের বমি করেছে, পাতলা বাহ্যি, আমাশা ইত্যাদিতে ভুগেছে, অভিমান করেছে, একটু আধটু হতাশও হয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে, সবই তো করেছে—সবরকম খেলাই তো, কৈ কিছু আটকায়নিতো কোথাও?

কিন্তু এখন নিখিলের মধ্যে যেন আর একটা সমান্তরাল নিখিল তৈরি হয়। আস্তে, আস্তে—নিখিল এটাও যেন সন্তর্পণে বুঝতে পারল। সে যেই ছোট্ট জিনিষটা নিয়ে হাত ধরে ধরে হাঁটছে, এইমাত্র স্টেশন-চত্বর পেরুল শেয়ালদার, আর ঢাকের বাদ্যি টের পেলো, অদ্ভুত এক পূজোর বিকেল—স্টেশনের মাথায় আলো দিয়ে বানানো দুর্গামূর্তি, অপরূপ কোলাহলময় তবু কেমন যেন অবোধ নির্জন একটা চওড়া রাস্তা সামনে, বেরিয়েই মাথার ওপর দিয়ে শেয়ালদার ফ্লাইওভার এবং সেইসঙ্গে অদ্ভুত সেই বিকেল, নিখিল চট্ করে যেন ঠাওরও করে নিতে পারছে না, কিভাবে সে দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে। এখন চোখের চারদিকে মুড়াগাছা নেই, বিজুর ঘেরাটোপ নেই, ওদের বাড়ি নেই, দাওয়া নেই, পুকুর, নারকেলগাছ, জবা বা দোপাটির বাগান কিছুই না, শুধু হাতে ধরা নির্জীব ঐ উদিত এবং সে নিজে, এমনকি যেন নিজেও ঠিক নয়; এখন এই মুহূর্তে যেন আরেকটা নিখিল।

হাত কেঁপে উঠল নাকি হঠাৎ? উদিতের মুখ যেন শুকিয়ে গেছে বেশ অনেকখানি, তবু নিখিলের হাত ছাড়ে নি, অথচ তাকাচ্ছে না, কথাও বলছে না তেমন—

'কি রে—?'

'উ?'

'চ, কত ঠাকুর দেখব, এটার নাম হচ্ছে গিয়ে কলকাতা, বুঝলি?'

'বাপি, তেষ্টা লাগে'—যেন ছাগলবাচ্চার মতো ঘাড় দুলিয়ে বলল।

'কোল্ডড্রিংক খাওয়াব চ—'

কতো কিছুই তো করা যেত! দীর্ঘ চার-সাড়ে চার বছরের প্রস্তুতি। তার আগে কচি পাঁঠার মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধড়-মুণ্ডু আলাদা করে দেয়া যেত কবে, ঝোপঝাড়ের অভাব ছিল নাকি মুড়োগাছায়? নয়তো পুকুরে চান করতে নিয়ে গিয়ে মাথাটা মিনিট চার-পাঁচেক জলে ডুবিয়ে রাখলেই হতো, জামাকাপড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া একটু রাত্তিরের ঝোঁকে, বা গভীর রাতে বিজুর পাশ থেকে তুলে নিয়ে, বিজুকে শেকল তুলে দিয়ে সটান একেবারে

রেল লাইনে জোর করে শুইয়ে দাও, ফেলে এসো, রাতে অন্তত তিন-চারটে মালগাড়ি তো কমসে কম যায়ই? তাছাড়াও তো কত শ-য়ে শ-য়ে উপায় ছিল? ঐটুকু একটা পুঁচকে, তার প্রাণ শেষ করতে আর কতটুকুই বা কাঠখড় পোড়ানোর দরকার—কিন্তু ঐ এতদিন ধরে যে নিখিলের সংযম বা সংহতি বা চুপচাপ সবরকম উত্তেজনা আস্তে আস্তে হজম করতে শেখা, ঐ যে বিজু, বিজুর মধ্যে কোনো না কোনো প্রকাশ্য সংঘাতের আকারে নিজেকে উপস্থাপিত করে ফেলা, এইসব যুক্তির ঠিক কোন্‌টা যে ধরে রেখেছিল নিখিল এতদিন ধরে, একটু একটু করে সবটুকু সঞ্চয় করতে যেন অদ্ভুতভাবে নিজস্ব এক প্রক্রিয়ায় শিখেই নিয়েছিল নিখিল, ওসব ফালতু পাঁচমেশালী ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয়নি মোটে।

এমনকি, কোনোদিন এ কটা গালাগালি, সামান্যতম একটুও মারধোর বা মুখবিকৃতি, এমনকি উদাসীন চুপচাপ ব্যবহার একধরনের করা ছেলেটার সঙ্গে, কোনো কারণেই কোনোদিন নিখিল এসব করেনি।

এখন যে একটা কিছু করে ফেলতে হবে, এই সন্ধ্যে কিংবা হয়তো রাত্তিরের দিকেই, এখন এই যে একেবারে অচেনা অজানা পরিবেশে, এই উৎসবের মধ্যে যখন সারা পৃথিবী বুঁদ হয়ে রয়েছে—তার মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলে, হাত পরিষ্কার করে, তারপর গুটিগুটি একা আবার ফিরে যাবে নিখিল, একেবারে নিষ্কণ্টক রাজত্বে—সেটার জন্যেও খুব যে একটা পরিকল্পনা করে ফেলতে পারছে বা সুযোগ পাবার উত্তেজনায় খুব একটা ছটফট করছে, তেমনও বিশেষ কিছু নিখিল বুঝতে পারছিল না।

এক ধরনের নির্বিকার হয়েই যেন উদিতকে হয়ত হাত ধরে ধরে পথ চলছে নিখিল, এবার টুকটুক করে আলোকজ্জ্বল হ্যারিসন রোড ধরে, আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে কলেজ স্ট্রীটের মুখে চলল—

'বাপি, ঘুম পাচ্ছে, গা বমি-বমি দিচ্ছে বড্ডো।'

'ঠিক হয়ে যাবে, বেঞ্চে একটুখানি বসে নিবি, একজায়গায়, নে—খিদে তো সেরেছে, তেষ্টাও পাচ্ছে না, তবে—তবে ঘুম পাচ্ছে কেন?'

আলোয় আলোময় রাস্তার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছিল না মোটে বাচ্চা ছেলেটা। নিখিল মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। নতুন কেনা গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরাল। এমনভাবে হাঁটছিল রাস্তা দিয়ে সোজা, যেন আর কোনোদিকেই সে বাঁকবে না—ছেলেটাকে নিয়ে সোজা একটা গুহা-টুহার মধ্যে এবার আড়াল হয়ে যাবে।

'পেচ্ছাব করবি, কিরে—হিসি পাচ্ছে ?'

'না।'

'তবে ওরকম ঠ্যাং ছড়িয়ে, আলগা-আলগা ভাবে হাঁটছিস কেন ?'

'না, না—'

'ভালো করে ছাখ, কলকাতা শহর, মাকে বাড়ি গিয়ে গল্প বলবি নে ?'

'হু।'

নিখিল আড়চোখে দেখল, কেমন যেন রবারের পুতুলের মতো, অথবা স্প্রিং দেয়া খেলনা গাড়ির মতো কেমন একেবেঁকে অসংলগ্নভাবে উদিত হাঁটছে। ভাবল, আর কলেজ স্কোয়ারের দিকে যাবে না। এতক্ষণে ঘোর সন্ধ্যে নেমে এসেছে। নিখিলের স্থির বিশ্বাস জন্মাল এবং মতবাদখানা আরো জোরদার হলো ভেতরে গিয়ে, যেন, সত্যি সত্যি নিজের ছেলে হলে এতো আলো, লোকজন আর জাঁকজমকের মধ্যে উদিত নিশ্চয়ই উদিতবিকাশের মতো হয়ে থাকত। এরকম অসভ্যের মতো নেতিয়ে পড়ত না। ছোটলোকের মতো দেখাত না।

ধৈর্য অসীম সত্যি-সত্যি, নিখিলের। কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ওরকম ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে, আর কখনো মিনিবাস, কখনো বাস, কখনো অটোর মধ্যে, ওরকম তালগোল পাকানোর মত একটা শিশু, যে কখনো তুমড়ে, মুচড়ে যাচ্ছে, কখনো বেঁকে যাচ্ছে, অথচ একধরণের নিষ্পলক চোখ নিয়ে নিখিল উদিতকে বয়ে-বয়ে বেড়াল। মাঝে মাঝে তার একটু একটু ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল ঠিকই, কিন্তু যেন এতদিনকার তিল তিল করে গড়ে ওঠা কর্মসূচী, যার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই অথচ যা একেবারে এলোমেলোও না, নিখিল জানত না, কোথায় গিয়ে একটা পর্ব অন্তত সে শেষ করে ফেলতে পারবে।

রাত বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ, পূজোর জনাকীর্ণ দক্ষিণ কলকাতার একটা মোড়ে, যার পেছনে একটা পরিত্যক্ত পার্ক আছে, গায়ে একটা বিশাল কলেজ বিল্ডিং আছে, হঠাৎই নিখিল দেখল, উদিত এবার এতো অচৈতন্য আর অসংলগ্ন, বারবারই নিখিলের হাত থেকে যেন নিজের হাত ছাড়িয়ে কেমন যেন খসে পড়তে চাইছে। পুলিস ট্রাফিক ঐ মোড়ে অনেকক্ষণ ধরে বিপুল একটা ভিড়কে আটকে রেখেছিল, প্রায় চার-পাঁচ মিনিট, তারপর যখন আবার পিলপিল করে রাস্তা পার হবার জন্যে সেই বিপুল জনস্রোতকে ছেড়ে দিল, নিখিল একসময় টুপ করে উদিতের হাত ছাড়িয়ে নিল। পাশে

একটা ম্যানহোল ছিল, আধখোলা, ইচ্ছে করলে ওখানটাতেও গুঁজে দিতে পারত উদিতকে, তাহলে টুপ করে পড়ে গিয়ে বেশ কিছুটা নিচে তলিয়ে যেত, কিন্তু অতটা জটিল পদ্ধতির মধ্যে না গিয়ে যেন সোজাসোজিই উদিতকে একেবারে সহজ উপায়ে নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং চকিতে পিছু হটে, পিছু হটে, সেই পরিত্যক্ত পার্কের গা দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা আধভাঙা গেট পেয়েছিল, তা দিয়ে পার্কের মধ্যে বেশ খানিকটা হনহন করে হেঁটে, একেবারে মাঝখানটায় গিয়ে পড়ল। যেন কোনোমতেই ঐ রাস্তার ভীড় থেকে হারিয়ে যাওয়া উদিতের কান্না বা লোকের জটলা, কিছুই নিখিলকে আর বিব্রত বা বিরক্ত না করতে পারে।

কালীঘাটে কতগুলো সারসার ঘর ছিল, নিখিল জানত, একরাত শোবার জন্যে সেগুলো ভাড়া পাওয়া যায়, মাদুর বেছানোই থাকে, জাস্ট গিয়ে একটু হাতমুখ ধুয়ে আর দোকান থেকে খাবার টাবার কিনে, খেয়ে নিয়ে, ওখানে শুয়ে পড়লেই রাত কাবার। নিখিল কখনো একটানা কলকাতা শহরে থাকে নি সত্যি, কিন্তু বারবার এতো অজস্র বার ধরে এসেছে, নিখিলের কাছে তেমন কোনো অসুবিধে হবার কিছু নয়। একরাত শোবার জন্যে কত আর ভাড়া নেবে? দশ-বারো টাকা?

উদিতকে জোর করে ছাড়িয়ে ফেলার পরে ঐ পার্কে নিখিল দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু আবার নিজেকে ঠিকঠাক করে নিতে তার বেশী সময় লাগেনি। ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদেড়েক ওভাবেই পার্কে ছিল, খানিক চিত হয়ে শুয়ে পরিষ্কার আকাশ, তারা, এসবে তাকিয়ে থাকতে একসময় নিখিলের মনে হলো, এবার তার মধ্যে প্রাপ্তি আসছে, যেন আসছেই গুড়গুড় করে। যেন খিদেও পাচ্ছে সামান্য-সামান্য। এখন কিছু পেট পুরে খেয়ে নিতে তার কোনো বিবেকের জালা আসবে না অন্তত, কেননা উদিত যতক্ষণ তার সঙ্গে ছিল, সবসময়ই কিছু না কিছু নিখিল তাকে খাইয়েছে, অন্তত আজকের রাতটা উদিত আর খিদেয় কষ্ট পাবে না। তারপর যা হয় হোক্— । মেরে তো ফেলেনি আর, হারিয়ে দিয়েছে জোর করে, খানিকটা গুলিয়ে দিয়েছে ওকে, এরপর যদি ভাসতে ভাসতে কোনো-রকমে মুড়োগাছায় পৌঁছুতে পারেও বা, তখন নতুন করে আবার দেখা যাবে, নয়তো আবার চার-পাঁচ বছর ধরে ভেবে-ভেবে নতুন আর একটা পথ বার

করা যাবে ওর গুলিয়ে দেবার, সেটাতে যদি শেষ হয় তাহলে তো হলোই, নইলে আবার, আবার—

উদিত আমার ছেলে নয়, আমি জানি। হয়তো বিজুও জানে। সুতরাং ও, কারো কিছু বলার নেই।

খুব ভোরে, অচেনা, অজানা আস্তানায়, ছেঁড়া-গন্ধঅলা একটা মাদুরে নিখিলের ঘুম ভেঙে যায়। রাতে সে কখন, কিভাবে এমন শুয়ে পড়েছিল জানে না, হয়তো ভাবল একটা ঘরের মধ্যে ছিল সে, প্রবল একটা নেশার মধ্যে, যা এতদিন পরে তাকে হঠাৎ অসহায় একজন আধবয়সী মানুষের মতো জাগিয়ে তুলল।

ভোরটা তার কাছে একটা বিভীষিকার মতো লাগছিল! এমন হবার কথা নয় মোটেই নিখিলের। কোনোমতে সে তার কালকের পরা জামাকাপড় সমেতই উঠল এবং যেন টলতে-টলতে আরো প্রবল ঘোরের মধ্যেই সঠিকভাবে সেই মোড়ে উপস্থিত হলো, যেখানে উদিতকে ইচ্ছে করে হাত ছাড়িয়ে নিখিল ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল এবং আস্তে আস্তে একা হতে চেয়েছিল।

ঘোলাটে চশমার মতো রাস্তা, নির্জন এবং ক্লান্ত। ঠাওর করতে পারছে না ঠিক কোন্ জায়গায়, সে উদিতের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল, এবং কেনই বা তাকে নিয়ে ওরকম মুড়োগাছা থেকে বেরুল, কেনই বা এত বোকার মত এসমস্ত করতে গেল।

বেলা যতো কাছে আসতে থাকে, লক্ষ্য করার বিষয়, নিখিলের মধ্যে অভূতপূর্ব একটা অস্থিরতা যেন নিখিলকে গ্রাস করে। তবু খানিকটা যা শুভবুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, সে কাছাকাছি থানায় এবং হাসপাতালগুলোতে ঢু মারতে-মারতে আবার আরেক দিনের পূজোর বিকেলের মধ্যে গিয়ে পড়ল, আর ততক্ষণে নিখিলের এযাবত যাবতীয় সন্দেহ, ঘৃণা, ঈর্ষা বা অশুভবোধ তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নিখিলকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছে।

উৎসবমুখর কলকাতার সন্ধ্যায় নিখিল পরে স্থির করল, সে আর কোথাও ফিরে যেতে পারে না। য্যবার কোনো উপায় নেই। বস্তুত এতদিনকার এতো বুদ্ধিমত্তা, এরকম স্থির সিদ্ধান্ত, উদিতকে যে কোনো উপায়ে হারিয়ে ফেলা এবং সে যে একটা অহংকারের বশে, একটি ফানুশের মতো, মস্তিষ্কের ভেতরে যতটুকু ছক বানিয়েছিল, সেটা তার সামনেই কখন যে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সে টের পায় নি।

নিখিলকে পরবর্তী বছরগুলোতে একদম বদ্ধ উন্মাদের মতো ইতস্তত দেখা গেছে রাস্তার বিভিন্ন পরিবেশে, কলকাতার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত।

অবশ্য নিখিলের সন্তানকে আবার আর একজন নিখিল ঐ চার-সাড়ে চার বছর বয়সে আবার ওরকম মুড়াগাছা থেকে পূজোর সময় বয়ে এনে রাস্তায় ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেলেছিল কিনা এবং পরে আরো একজন উন্মাদ বনে গেল কিনা, তা হয়তো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করলে জানা যেতে পারত।

এবং সব হারিয়ে যাওয়া সন্তানকেই কোনো না কোনো অবস্থায় যে একসময় খুঁজে পাওয়া সম্ভব সেটাও নিশ্চিত বলে দেয়া যায়। যায় না? অথবা বিজুরা জানে, এসব গোলমাল আর কতদিন ধরে চলবে, বা কতদিন এসব, ঠিক-ঠিক চালাতে দেওয়া উচিত!

বিজুরা যদি না জানে, আর কে জানবে?
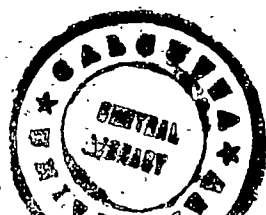
শেঠের ব্যাটা

ভগীরথ মিশ্র

এক : গ্রেপ্তার হলেন শেঠজী

নন্দ দাস ঝড়ো কাকের মতো ঘরে ঢুকল। তখন ঠা-ঠা দুপুর।

হন্তদন্ত হয়ে বললো, 'জলদি খেতে দে।'

'কেন? কোন রাজ্যিটা জিন্‌তে যাবে শুনি?' মালতীর গলায় ঝাঁঝ।

'আহ্‌!' নন্দ বিরক্ত হয়, 'এখন আমার বকবক করবার টাইম নাই। উদিকে থানার বড়বাবু বসে রয়েছেন। উঁয়ার কতো কাজ!'

নন্দর বউ কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারে না। কে যে বড়বাবু! কেন যে তিনি নন্দর জন্য বসে রয়েছেন! উপস্থিত নন্দকে অতো কথা শুধোবার সাহস হোল না মালতীর। সে তাড়াতাড়ি পিঁড়ি পেতে খেতে দিল।

একটি মাত্তর টালির চাল দেওয়া কুঠরী। ইটের ঢিলে-ঢালা গাঁথনি। মেঝেটা মাটির। গঙ্গার ধারে বস্তির একধার ঘেঁষে এই হল নন্দ দাসের ডেরা। নন্দর দেশ বাঁকুড়ায়। চাকরি করে পাটোয়ারিলালের গুদোমে। বস্তির মধ্যে একটি ঘরেই সবকিছু। একদিকে কাঠের চৌকি। সস্তা কাঠের আলনা। কুলুঙ্গীতে ঠাকুর পেতেছে মালতী। রান্নাবান্না সারে বাইরের তোলা আঁচে। রান্নার পর সবকিছু এনে ঘরের কোণে সাজিয়ে রাখে।

হড়্‌হড়ে পাট শাক দিয়ে কোঁৎ কোৎ করে ভাত গিলছিল নন্দ। পেটটা ভরে ওঠার সাথে সাথে মনটাও প্রসন্ন হয়ে উঠছিল।

'পণ্টু কুথা?' নন্দ শুধোল।

'ইস্কুলে। কিন্তু বল না গো, জলদি জলদি ভাত খেয়ে কুথায় যাবে?'

নন্দ দন্ত ছিরকুটি হাসে। চারপাশে চোখ চারায়। বউয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'ভারি গুহ্য কথা। কাউকে বলতে পাবি নাই।' মালতী ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

নন্দ মালতীর কানের কাছটিতে মুখ এনে বলে, 'জেলে।'

শুনেই আঁত্‌কে ওঠে মালতী। দু' কানে হাত চাপে। অ'মা, ই'কি কথা গ'! জেলে ক্যানে? বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মালতী।

'থাম। ফ্যাচ ফ্যাচ কাঁদিস নাই।' ভারি বিরক্ত হয় নন্দ, 'সেই তরেই মেয়া মানুষকে কিছো বলতে নাই। হয়, কেঁদে গোকুল ভাসাবেক। নয়, পাঁড়াময় ঢোল পিটাবেক্।' নন্দ গলা নাবিয়ে বলে, 'ঠিক জেলে লয়— ।'

সে কথায় মালতীর কান্নাটা অল্প থামে। ভেজা চোখে তাকায় সে। গলাটা আরো নাৰিয়ে নন্দ বলে, 'এখন আমাকে কোমরে রশি দিয়ে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে লিয়ে যাবেক সদর রাস্তা দিয়ে। দুধারে খাড়া হয়ে হাজার মানুষ দেখবেক্ সিটা। মাঝে মধ্যে দু'চার ঘা মারবেক পুলিশ। এই করতে করতে থানা। হাজতে রাত্রিবাস। কাল কোর্টে তুলবেক। যদি জামিন হয় ভালো, না হলে উখান্ থিকেই জেল হাজতে। তারপর বিচার শুরু হবেক। বিচার অন্তে জেল।' নিজের ভবিষ্যৎটা পাক্কা গনৎকারের হতো আউড়ে গেল নন্দ।

মালতী ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়েছিল। বোবা মেরে গেছে সে। হাত-পা ক্রমশঃ সেঁধিয়ে যাচ্ছে পেটের মধ্যে। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'ই-সব কি বলসো গো তুমি? বড়বাজারের সামান্য গোলদারী দোকানের দেড়শো টাকার চাকর তুমি। কি অমন করেছো যে তোমাকে কোমরে রশি দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাবেক পুলিশ?'

মালতীর কথাগুলো সত্যি বটে। তবে আংশিক। সামান্য গোলদারী দোকান ওটা নয়। বড়বাজারে পাটোয়ারীলালের বিশাল ব্যবসা। লোহা-লক্কড়, গোলদারী, হোশিয়ারী। সব পাইকারী বিক্রি সেখানে। দোকানে আর কতটুকু থাকে! কলকাতা আর মফস্বল মিলে আটখানা গুদাম আছে পাটোয়ারীলালের। সর্বদা বোঝাই থাকে। তেলকলও রয়েছে একটা। বজ্‌রঙ্‌বলী অয়েল মিল। নন্দ সেখানে ছিল আগে। চাকিতে সরষের সাথে নিষিদ্ধ বস্তু ঢালত। এখন রয়েছে পোস্তাবাজারের গুদামে। গুদামে কত যে আজব কাজ! পাঁকমাটির জিরে, মুগ, কলাই আসে বস্তা বস্তা। সে সব মেশাও আসল মালের সাথে। সরষের গায়ে মাটি মাখাও। ওয়াগনকাটা মালের ওপরে আসল লেবেল ছিঁড়ে পাটোয়ারিলালের লেবেল সাঁটো। কোন কোনও দিন কাজ চলে রাতভর।

'বল না গো, কি দোষ করেছ তুমি?' উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে আসে মালতীর মুখ।

নন্দ দাস দরাজ হাসে। 'মুই করি নাই। বাবু করেছেন। পাটোয়ারিলাল। বাইশ শো টিন ঘি ধরা পড়েছে। অর্ধেকটাই সাপের চর্বি।' বলতে বলতে

নন্দর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে, কুথাকার জল কদ্দুর গড়ায়! বাগবাজারের কুন্ এক রাইস আদমি উয়ার মেয়ার বিয়াতে ঘিয়ের লুচি খাইয়ে ছিল। সে লুচি-খেয়ে সক্কলের নিম্নাঙ্গ অসাড়। হুলস্থূল পড়ে গেছে চৌদিকে। মন্ত্রী তো রেগে টং। হুকুম জারি করেছেন, সাতদিনের মধ্যে এ শহরকে ভেজালমুক্ত করতে হবেক। সব ভেজালদারকে কোমরে রশি দিয়ে জেলে ভেজতে হবেক্। থানার বড়বাবুরা সব পাগ-পেটি বেঁধে নেমে পড়েছেন। দিনের শেষে রিপোর্ট দিতে হচ্ছে উপরওয়ালার পাশ। ধরপাকড় চলছে খোব। খবর কাগজের লোকেরা ফটো-কাম্‌রা লিয়ে ঘুরছে। খ্যাচাখ্যাচ্ ফটো তুলছে ভেজাল-দারদের।' বলতে বলতে নন্দ এমন উচ্ছ্বাসের হাসি হাসলো, যেন কি এক উৎসব বেধেছে দেশে।

'কিন্তু তুমাকে কেন বেঁধে লিয়ে যাবেক? তুমার কি কসুর?'

'কসুরের কথা লয়।' নন্দ ভাতের গ্রাসটা গিলে ফেলে বলে, 'মুই যে ফর্সা বাঁটকুল, আর একটু মোটাসোটা।'

'কি যে আচানক কথা কও তুমি! ফর্সা আর বাঁটকুল বলে ফের জেল হয় কারো?'

'আরে সে জন্যে লয়—।' বলেই আচমকা জিভ কাটে নন্দ। পাটোয়ারী-লালের কথাগুলো মনে পড়ে যায়ঃ স্রেফ যায়েগা আউর লোট্‌কে আনা। জান-পহচান লোগোঁকো বলবি, মুলুকমে যাতা হ্যায়। সাওধান শালা, অপনা জরু কো ভি মৎ বোল্‌না। মাস মাস মাহিনা পাবি। বোনস ভি পাবি। 'জেল এলাউন্স' ভি দিবো। রাজী না হলে দুসরা কেস-এ ফাঁসাবো শালা। 'হ্যাঁ বাওয়া।' পাশ থেকে চোখ পাকিয়ে বলেছেন বড়বাবু, 'বাঁচতো চাও তো রাজী হয়ে যাও। নইলে বিপদে পড়বে। আর একটা কথা জেনে রাখ। এ কথা কাক-পক্ষীতে যদি টের পায়, যে তুমি লোকটি আসল পাটোয়ারীলাল নও, তাহলে আর মায়ের কোলে ফিরতে হবে না যাদু। সোজা ঐ দেশে চলে যাবে তুমি।' আকাশের দিকে আঙুল তাক করেন বড়বাবু।

কিন্তু বউয়ের কাছে কোনও কথা চাপতে পারে না নন্দ। সারা পথ ভেবে এলো এক, আর ঘরে ঢুকেই সব ওলাওঠার ভেদবমির মতো বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

মুখের কথাটা তাই কোঁৎ করে গিলে ফেললো নন্দ। খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'মেয়েমানুষ তুই। তুয়ার অতো কথায় কাজ কি?' বলেই বদনার মুখে ঢকঢকিয়ে জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

একটা বিড়ি ধরাল নন্দ। বিড়িতে টান টান মারতে মারতে দেওয়ালে টাঙানো পল্টুর ফটোখানার সামনে দাঁড়াল সে। এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল পল্টুকে।

এক সময় মালতীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল নন্দ। বলল, 'শুন্। চল্লাম মুই। কেউ শুধালে বলবি, দেশে গেছে। কার যেন অসুখ। পল্টুকেও তাই বলবি। বাবু টাকা পাঠালে সাবধানে রাখবি। দিনকতক বাদে বাবু লোক দিয়ে তুয়াকে দেশে পৌছিয়ে দিবেক্। ঘরে গিয়ে বলবি, মুই রাজস্থান গেছি। বাবুর দেশের বাড়িতে। মাসে মাসে বাবু টাকা পাঠাবেক তুয়াকে। সব টাকা রাখবি সাবধানে।'

চৌকাঠের দিকে পা বাড়াল নন্দ। ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কান কামড়ে বলে দিয়ে যাচ্ছি, আসল কথা যেন কাকপক্ষীতে জানতে নাই পারে। তাইলে আর ফিরে পাবি নাই মোকে।'

ভয়ে-শোকে কেমন পাথর পাথর লাগছিল মালতীকে। তাও বিড়বিড় করে বলল, 'জানতে ফের পারবেক নাই! এই বললে, খবর কাগজে ফটো ছাপবেক।'

আবার দাঁত কেলিয়ে হাসে নন্দ। চালাক চালাক হাসি।

বলে, 'ফটো অবশ্যি ছাপতে পারে। কিন্তু মুখখান তো সারাক্ষণ ঢাকা থাকবেক্।'

'ক্যানে ?' মালতী অবাক হয়ে তাকায়।

'বা-রে!' নন্দ যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'অতবড় ব্যবসাদার মানুষ মুই। পুলিশের হাতে নতি-লাঞ্ছনা হচ্ছি। লজ্জা হবেক নাই মোর ? দু'হাত দিয়ে মুখখান্ ঢেকে রাখবো নাই ?'

খ্যা-খ্যা করে হাসতে থাকে নন্দ।

রবারের চটিখানা অসাড় হাতে এগিয়ে দেয় মালতী।

'ধুশ্, শালী!' নন্দ ক্ষেপে যায়, 'গরম পীচের রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটাবেক ভেজালদারকে। দু'ধারে খাড়া হয়ে হাজারজন দেখবেক সে দৃশ্য। চটি কি হবেক ?'

চৌকাঠখানা পেরিয়েই সহসা চোখমুখ আমূল বদলে গেল নন্দর। কপালের শিরা ফুলে ফুলে ওঠে। চোখদুটো সহসা আঁকোড় ফলের শাঁসের মতো ঘোলাটে হয়ে আসে।

'সাবধানে থাকিস।' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নন্দ বলে, 'রাতে ভালো করে খিল দিস দরজায়। আর—, পল্টুটাকে গাঁ'র ইস্কুলে ভর্তি করো দিস।'

দুই : কবির লড়াই

: ছি, ছি, ছিঃ। এরপরেও তোমরা মানুষের সামনে গিয়ে বড় বড় কথা বল! সততার বড়াই কর! লজ্জা করে না তোমাদের?

: তোমার মুখে লজ্জার প্রসঙ্গ সাজে না হে। যার চোখে তিলমাত্র চামড়া নেই, সে আবার অন্যকে লজ্জা পেতে বলে! মনে নেই, রেশনে চাল দিতে না পেরে মানুষকে গুলি উপহার দিয়েছিলে তুমি? তখন লজ্জাটা ছিল কোথায়?

: ওতে আমার লজ্জা পাওয়ার কিছুই ছিল না। তুমিই ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিকৃত করে ভুল বোঝাতে চেয়েছিলে মানুষকে। কিন্তু মানুষ ভুল বোঝে নি। কারণ তারা তোমাকে তিলমাত্র বিশ্বাস করে না।

: মানুষ আমাকে ঠিকই বিশ্বাস করে। কিন্তু তুমি পুলিশ রাজ-গুণ্ডারাজ কায়েম করে মানুষের মুখ বন্ধ করে রেখেছো। তাই তারা সোচ্চার হতে পারছে না।

: গুণ্ডাবাজী কে করছে, মানুষ তা দেখছে। জনগণকে বোকা ভেবো না। তারা শত্রু-মিত্র চেনে।

: এবার চিনিয়ে দোব। ভেজাল ঘি খেয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতেই আমি শত্রু-মিত্র চিনিয়ে দেব। মিছিল করব। আন্দোলন করব। সারা দেশব্যাপী আইন অমান্য জেলভরো করব। আমরা ধর্ণা দোব। দেশব্যাপী হরতাল বন্দ্ ডাকব। জনজীবন স্তব্ধ করে দোব। রেলের চাকা ঘুরবে না। কল-কারখানা চলবে না। দেখি, ক্ষিপ্ত জনতার রোষ থেকে কে তোমায় বাঁচায়!

: হি, হি! আমি অলরেডি নেমে পড়েছি। সারা দেশ জুড়ে আমার দলের সপ্তাহব্যাপী পাল্টা কর্মসূচী আজ বিকেল থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। র‍্যালি, স্ট্রীট কর্ণারিং, কনভেন্শন, বিপুল সমাবেশ। আমি এবার জনগণকে নিয়ে গর্জে উঠব। তোমার মুখোশ আমি খুলে দোব।

: তা দিও। তবে খেয়াল রেখো, অত দাপাদাপি করতে গিয়ে নিজের মুখোশটাই না খুলে লড়ে। একটু ভালো কোয়ালিটির আঠা নিয়ে সেঁটো।

দুই কবির মধ্যিখানে শুয়েছিল জগন্নাথ। নিজেরই ঘরের বারন্দায়। ভুল

ভুল করে দেখছিল বাবুদের হাত-পা নাড়া। শুনছিল বাবুদের উতোর চাপান। চিন্‌চিন্ ভাবটা ততক্ষণে হাঁটু পেরিয়ে উঠতে শুরু করেছে ওপরে।

'মেলোডি ব্যাণ্ড পার্টি'তে কর্নেট বাজায় জগন্নাথ। গতকাল রাতে সেও ব্যাণ্ড পার্টির সংগে বাজাতে গিয়েছিল বাগবাজারে। ভুরিভোজটা ভালোই হয়েছিল সেখানে। বাড়ি ফিরেছে শেষরাতে। এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল অঘোরে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই পায়ের ডিমে কেমন একটা চিনচিনে ভাব। বিছানায় উঠে বসল জগন্নাথ। চিনচিনে জায়গাগুলোতে হাত বুলোতে গিয়ে অল্প চমক খেল সে। চামড়ায় যেন খুব একটা সাড় নেই। হাত দুটো ধীরে ধীরে নামাতে লাগল তলার দিকে। কোনও অনুভূতিই নেই গোড়ালি এবং পায়ের পাতায়। আলতো চিমটি কাটল। তারপর জোরে। কিন্তু ব্যথা-বেদনা তিলমাত্র বুঝতে পারল না। বুকখানা ভয়ে কেঁপে উঠল জগন্নাথের। তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াতেই গিয়েই বুঝল পায়ের পাতায় তিলমাত্র বল নেই। খপ করে জানলার রেলিংখানা ধরে না ফেললে পড়েই যেত। ভয়ে-আতঙ্কে কাঠ হয়ে আসে জগন্নাথের বুক। একি হল তার! কেন হল? জানলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সতীশ রিক্সওয়ালা। এই বস্তিতেই খানদুয়েক ঘর বাদ দিয়ে থাকে ও। জগন্নাথকে বড় ভালোবাসে। জগন্নাথের ডাকে সতীশ এল। পা টিপে টিপে, চিমটি কেটে কেটে পরখ করল অনেকক্ষন। তারপর বলল, তুই কি কাল বাগবাজারে বর্ধনদের বাড়িতে বাজাতে গেছলি নাকি?

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় জগন্নাথ।

সতীশের মুখ কালো হয়ে আসে। বলে, ঐ বাড়িতে কাল যারাই খেয়েছিল তাদেরই এই অবস্থা। আজকের কাগজে ঘটা করে লিখেছে। 'কি হবে সতীশ দা?' জগন্নাথ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

'কাঁদিস নে। বাইরে চল্।'

জগন্নাথকে ধরে ধরে বাইরের বারান্দায় এনে বসিয়ে দিল সতীশ। বললো, 'বসে থাক্। আমি পাড়ার ছেলেদের খবর দিই। হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আমার কথায় ভর্তি করবে না শালারা। হাজার বাহানা তুলবে।'

জগন্নাথকে বসিয়ে রেখে সতীশ চলে গেল বাইরে। একটু বাদে সতীশের বারান্দায় দাঁড়াল তিনু বটব্যাল। গতবছর কর্পোরেশনের ভোটে হেরে গিয়েছিল। সামনের ভোটে আবার দাঁড়ানোর ইচ্ছে। সেই কারণে কথায় কথায় মিছিল বানিয়ে পাড়া প্রদক্ষিণ করে। কলের জল বন্ধ হলে

হরতাল ডেকে দেয় পাড়ায়। তিনু বটব্যাল জগন্নাথের দখল নিতে না নিতেই হন্তদন্ত হয়ে হাজির হোল প্রতাপ সেন। প্রতাপই গেল ভোটে জিতেছে। সেই সুবাদে তার প্রতাপটা কিঞ্চিৎ বেশী। বারান্দায় উঠে দু জনে পজিশন নিলো জগন্নাথের দু'পাশে। শুরু হোল কবির লড়াই। জগন্নাথ দুজনের মধ্যিখানে বসে রইল তার অসাড় হয়ে আসা পা'দুটো নিয়ে।

'বাবুরা,' মাঝপথে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল জগন্নাথ। 'হাঁটুর ওপরটাও এখন অসাড় হয়ে আসছে। আমাকে জলদি হাসপাতালে নিয়ে চলুন বাবু। নইলে আমি আর বাঁচব না।' বলতে বলতে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল জগন্নাথ।

ঃ দেখ, দেখ। তোমার রাজত্বে মানুষ কেমন কাঁদছে।

ঃ এখন তো তবু কাঁদছে। তোমার রাজত্বে ভয়ে কাঁদতে ও সাহস হয় না এদের। সারাদেশব্যাপী এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতেই তো চাও তুমি।

ঃ কাঁদিস নে জগন্নাথ। তোদের কান্না দেখে এদের কঠিন হৃদয় গলে না।

ঃ আহা রে! তবুও যদি কালাহাণ্ডির মানুষগুলোর ওপর পুলিশ না লেলিয়ে দিতে! তোমার কীর্তির কথা জানতে কারো বাকি নেই।

ঃ আর তুমি? কেনিয়া-উগাণ্ডায় অতো বড় দুর্ভিক্ষ হয়ে গেল। একটা সামান্য বিবৃতি পর্যন্ত দিলে না! অতো দূরে যাওয়ার দরকার কি? এই যে কালবাজারে ভেজালটি খেয়ে অতো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লো, তুমি সে ব্যাপারে এ পর্যন্ত কি করেছো?

ঃ কেন? ভেজালদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের বন্দোবস্ত করেছি। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আদেশ দিয়েছি। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি।

দু'জনেই প্রবল লড়াইয়ে মত্ত। দেখতে দেখতে কান্নাটা থেমে গেল জগন্নাথের। দুহাতে ভর দিয়ে কোমর ঘস্‌টে ঘস্‌টে এক সময় বারান্দা থেকে উঠোনে নামল সে। এখনো আশা আছে। সময়মতো হাসপাতালে পৌছে যেতে পারলে হয়তো বা এ-যাত্রা বেঁচে যাবে জগন্নাথ। বড় রাস্তা অবধি কোনও গতিকে পৌছুতে পারলেই সতীশদার দেখা মিলতে পারে। ওর রিক্সোতে চড়ে হাসপাতাল অবধি যেতে পারবে। আশায় বুক বেঁধে, শরীরের তাবৎ শক্তি দুটি হাত ও কোমরে জড়ো করে সে হেঁচকা টানে এগোতে লাগলো সদর রাস্তার দিকে। বারান্দায় কবির লড়াইয়ে মত্ত দুই নেতা সেটা খেয়ালেই করলেন না।

তিন ঃ জনগন

নন্দ দাসকে নিয়ে পুলিশ বাহিনী এগোচ্ছিল স্ট্রাণ্ড রোড ধরে। সে এক বিপুল শোভাযাত্রা। আগে পুলিশের ভ্যান, পেছনে পুলিশের কালোগাড়ি, ওয়্যারলেস ভ্যান, মধ্যিখানে নন্দ দাস। পরণে সিল্কের ধুতি ও সিল্কের সাদা পাঞ্জাবি। মাথায় জরির টুপি। কোমরে মোটা রশি পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে। দু'দিক থেকে খিঁচে ধরে রয়েছে দু'জন সেপাই। নন্দ দাস খালি পায়ে এগিয়ে চলেছে। নিউসেক্রেটারিয়েট পেরিয়ে বাঁয়ে বাঁক নেবে ওরা। আকাশবাণীর পাশ দিয়ে কার্জন পার্ক হয়ে চলে যাবে এসপ্ল্যানেডের দিকে।

নন্দ দাসের সঙ্গে কেবল পুলিশ বাহিনীই নেই। কৌতুহলী জনতার একটি মাঝারি দল তিন পাশ থেকে ঘিরে ধরেছে তাকে। হাসছে। টিকা-টিপ্পনি কাটছে। মাঝে মাঝে কারো কারো চোখে জলে উঠছে জিঘাংসা। শালা, বাঙালীর শত্রু, জাতির শত্রু, মানব সভ্যতার কলংক!

উৎসাহী ছোকরার দলও পিছু নিয়েছে। তারা কিঞ্চিৎ বল্‌গাহীন। পুলিশের আসল ভাবনা ওদের নিয়েই। তাই চারপাশে লোক যত বাড়ছে, নন্দ দাসের চৌদিকে পুলিশের ব্যারিকেড তত আটো সাঁটো হচ্ছে। কৌতুহলী মানুষ ভীড় করেছে দুদিকের ফুটপাতে। বাড়ির জানলায়। ছাদে। পিলপিল করছে মানুষ। আসলে ভেজালদারকে কোমরে রশি বেঁধে হাঁটানোর দৃশ্য তো বড় একটা চোখে পড়ে না। সেই ছেষট্টিতে এমন গোঁয়াতুর্মিটা একবার দেখেছিল বড়বাজার এলাকার মানুষ। তারপর আবার, এই এখন।

ঃ বলেন কি মশাই? ঘি-তে সাপের চর্বি? কি সর্বনাশ!

ঃ আহা! এমনভাবে আঁতকে উঠলেন যেন ঘি-তে সাপের চর্বি, সরষের তেলে শিয়াল কাঁটা, আটা-ময়দায় তেঁতুলবীচি—এসব আপনি শোনেন্‌ই নি!

ঃ না, না শুনেছি। শুনবো না কেন? অহরহ খাচ্ছি তো। তবুও যত হোক সাপ বলে কথা। শুনলে গা-টা কেমন সির সির করে ওঠে না!

ঃ কি সাপ মশাই? পয়েজিনাস কিছু নয়তো?

ঃ শেঠের শরীর এমন হয় নাকি? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার ওপর বসে আছে। ক্ষীর মালাই খাচ্ছে। শরীরটা তো তেমন লালটুশ লাগছে না।

ঃ সে সব শেঠ আর কলকাতায় নেই হে। ছেলেবেলায় ইতিহাসের বইতে জগৎ শেঠের ছবি দেখেছিলাম। মাথায় একটা ওলটানো চালুনের মতো কিছু চাপানো থাকে। মুখখানা কি বিশাল! বপুখানাও দেখবার মতো!

: সেই স্পেসিমেন আর নেই বললেই চলে মশাই। 'বাঙলায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা' এদের এই শুকনো আলুবোখরার মতো শরীরটি হচ্ছে।

উত্তেজিত জনতা সংখ্যায় বাড়ছে। তাদের আক্রোশ ক্রমশ বাড়ছে। কটু মন্তব্যের পাশাপাশি সংবিধান ও ভারতীয় দণ্ডবিধির অসারতা নিয়ে তর্ক জুড়েছে ছোকরার দল।

: শালা, তোর-আমার তরে কত আইন! সিঁদেল চোয়ের জন্য কত ধারা! প্রসিড্যোর! খাবারে আর ওষুধে যারা বিষ মেশায় তাদের জন্য সব ঢু-ঢু।

: তাদের জন্য আগাম জামিনের ব্যবস্থা।

: তারা নাকি ভি-আই-পি ক্রিমিন্যাল!

: শালা, একটা মানুষকে খুন করলে ফাঁসি হয়। কিন্তু লাখ মানুষকে খুন করলে বা পঙ্গু করে দিলে ফাঁসি হয় না!

: এ শালা আজব দেশ!

: এ শালাকে কতক্ষণ ঘোরাবে পুলিশ?

: কে জানে!

: একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন দাদা?

: এসপ্ল্যানেড ঘুরিয়ে, সেণ্ট্রাল এভেন্যু হয়ে বড়বাজার থানায়।

: বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম আর কালিঘাটটা দেখাবেন না বেচারাকে?

জনতা হ্যা-হ্যা করে হেসে ওঠে।

: থানায় নিয়ে গিয়ে কি করবেন?

: আজ রাতটা লক্-আপে রেখে, কাল কোর্টে তুলব।

: তারপর?

: কোর্ট বিচার করে সাজা দেবে।

: কি সাজা দেবে? ওর তো ফাঁসি হওয়া উচিত।

: ফাঁসি হবে, নাকি দ্বীপান্তর হবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছুই বলবার নেই ভাই। এ ব্যাপারে শেষ কথা বলবে আদালত।

: এই, দাদা কি বলে রে? আদালত শেষ কথা বলবার কে মশাই? শেষ কথা বলবে জনগন।

: জনগনই বা সব সময় শেষ কথাটি বলবে কেন? গরীব বলে কি সব কিছুতেই সবার শেষে তাদের স্থান হবে? এমন কি কথা বলবার ক্ষেত্রেও বেচারারা থাকবে সবার শেষে?

: জনগন প্রথম কথাটিই বলবে। মারো শালাকে!

নন্দ দাস হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকাচ্ছিল ভয়ে ভয়ে। মানুষ যে তাকে দেখে অমন ক্ষেপে উঠবে, তা ভাবে নি। পুলিশ অবশ্যি সঙ্গে আছে। কিন্তু যে হারে লোক বাড়ছে, তাতে করে ঐ ক'টা রোগা-প্যাটকা পুলিশ কি সামাল দিতে পারবে ? বড় ভয় করে। মুখ থেকে হাতের ঢাকনা সরিয়ে সে মাঝে মাঝেই দেখতে থাকে জনতার রুদ্ররূপ।

চার ঃ শেঠের ব্যাটা

আজ ইস্কুলে আচমকা ছুটি হয়ে গেল। কে যেন এক মহাত্মা জন্মেছে, না কি মরেছে আজ। সেই কারণে ছুটি। বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এলো পল্টু।

অতো জলদি ছুটি হলেও বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে কাজল আর গোপীর সাথে পল্টু হাঁটা দেয় গঙ্গার পাড় ধরে। খানিক এগোলেই দম-আটকানো বাড়িঘর, মিল কারখানাগুলো শেষ হয়ে যাবে। এক্কেবারে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে যাবে পল্টুরা, চওড়া-চওড়া রাস্তা। আউটরাম ঘাট। হরেক মজা সেখানে। জোড়ায় জোড়ায় পুতুল ঘুরছে। ফুটবল নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ছেলেরা। ফুচকা-ঝালমুড়ি। পল্টুদের এলাকায় এসব নেই। পুরো এলাকাটা ঘিঞ্জি। বস্তির পর বস্তি। টালির ঘর। খোলা নর্দমা। স্যাঁৎস্যাতে গলি। এদিকটায় চলে এলে দুদণ্ড তাই ভালোই লাগে। কেমন নরম নরম, সবুজ সবুজ পুরো এলাকাটা।

আউটরাম ঘাটে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরেটুরে ওরা এলো আকাশবাণীর দিকে। আর তখনি তাদের নজরে পড়লো দৃশ্যটা। কি ব্যাপার ? অতো লোকজন, পুলিশ, কালো গাড়ী। মিছিল ? তাতো নয়। প্ল্যাকার্ড নেই। স্লোগান নেই।

পল্টুই চেঁচিয়ে বলেছিল 'এ আবার কি নয়া নক্‌সা রে ?'

হৈ-হৈ করে তামাসা দেখতে ছুটলো তিনজনে।

একে ওকে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জেনে নিল ওরা। ঘি-তে সাপের চর্বি মিশিয়ে ধরা পড়েছে এক শেঠ। পুলিশ তাকে কোমরে রশি দিয়ে ঘোরাচ্ছে—এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা। শুনেই উৎসাহ বেড়ে গেল ওদের। ঘুরে বেড়ানো ছেড়ে ওরা ঢুকে পড়লো জমায়েতের মধ্যে।

শেঠদের ওপর পল্টুর আজন্মের রাগ। ওর বাবা কাজ করে পাটোয়ারি লালের গুদামে। যা মাইনে দেয় তাতে পল্টুদের পেট ভরে খাওয়াই জোটে না। তার ওপর বাবাকে ওরা খাটিয়ে মারে দিন রাত। মাঝে মাঝে মারেও।

চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত শেঠকে দেখে পল্টুর ভেতরের রাগটা গনগনে আঁচের মতো জ্বলে উঠল।

নন্দ দাসের চারপাশে জনতার ভীড়টা ক্রমশঃ বাড়ছে। অফিসফেরতা যাত্রীরা এবং ময়দানের রাগী ছোকরারা এসে সামিল হয়েছে জমায়েতে। কেউ বা তামাসা দেখছে। কেউ কেউ অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি-খেউড় করছে শেঠজীর উদ্দেশ্যে। শালারা মানুষের মতো দেখতে বটে, কিন্তু স্পেসিজ একদম আলাদা। নইলে মানুষ মেরে এতো আনন্দ হয় কি করে? শালাদের গ্যায়ের ছাল জ্যান্ত তুলে নিতে হয়! মুখ ঢেকে রেখেছিস কেন বে? শরম লাগছে? চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে মুখে মুতে দিতে হয়। উত্তেজনাটা ক্রমশঃ বাড়ছে। বিশেষ করে রাগী রাগী ছোকরাগুলো মনে মনে দখল নিতে চাইছে নন্দ দাসের। সেটা বুঝতে পেরে পুলিশ বাহিনী নন্দ দাসের চারপাশের ব্যারিকেড শক্ত পোক্ত করে ফেলল। অফিসারটি পাশের একজন পুলিশকে বললো, 'আর রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। প্রিজন্ ভ্যানে তুলে নাও একে।'

পল্টু তক্কে তক্কে ছিল। দু'হাতে ভরে নিয়েছে থান কতক ইটের টুকরো। সহসা তারই একখানা নির্ভুল নিশানায় ছুঁড়ে মারলো নন্দ দাসের মাথা লক্ষ্য করে। 'মা-গো' বলেই নন্দ দাস পলকের মধ্যে মুখের ঢাকনা সরিয়ে চেপে ধরলো মাথা। আর তখনই পল্টু চিনতে পারল তার বাবাকে।

উস্কানি পাওয়া মাত্রই ইট বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে নন্দ দাসের ওপর। হতভম্ব পুলিশের বেষ্টনি মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে খান্ খান্। নন্দ দাসের সারা শরীরে আছড়ে পড়ছে দুমাদুম্ আধলা ইট, ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরঝে মাথায়। পল্টু চক্ষের পলকে ভীড় ঠেলে আছড়ে পড়ল বাবার ওপর। কচি দুহাত দিয়ে জাপটে ধরলো বাবার শরীর। ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা ভারি ইট সজোরে এসে পড়লো ওর মাথায়। তবুও বাবাকে সে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। বারবার 'বাবা-বাবা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে সে। রক্তাক্ত মাথাখানি দিয়ে বাবার বুকখানা আড়াল করতে চায়।

রাগী ছোকরাগুলে এখন বল্গাহীন। সাঁই সাঁই ইট চালাচ্ছে নন্দ দাস এবং পল্টুকে নিশানা করে। শালা, শেঠ-এর ব্যাটা। বেঁচে থাকলে তুইও মানুষ খুনের কারখানা খুলবি। বলতে বলতে সমবেতভাবে ওরা ছুঁড়তে থাকে ইট-পাথর। ঝাঁকে ঝাঁকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ছেলেকে বুকে নিয়ে রাজপথের ওপর লুটিয়ে পড়ে নন্দ দাস।

উন্মত্ত জনতাকে বাগে আনতে একটু সময় লাগে পুলিশের। শুরু হয় বেপরোয়া লাঠি চার্জ। জনতা যে দিকে পারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়।

একটু বাদে বাপ-ছেলের লাশ একসাথে তোলা হয় পুলিসের গাড়ীতে।

ঠাকুরদাদার ঝুলি

কবিতা সিংহ

সকালের টি, ভি ট্রানস্‌মিশনে কিশোরদের প্রোগ্রাম দেখছিল ওরা। সমী, প্রভাত আর শোভা। অর্থাৎ ছেলে বাবা আর মা। সমীর হাতে দুধের গ্লাশ। আর প্রভাত-শোভার হাতে চায়ের কাপ।

হঠাৎ পাখির মধুর কাকলির শব্দ করে কলিং বেল বাজল। এবং সমী তাতেও বিরক্ত হল।

—ধুস্‌, সাতসকাল থেকে এই যে শুরু হল দাদুর। বার বার যে কোথায় যায়।

প্রভাত ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বলল, যাও সমী, দরজাটা খুলে দিয়ে এসো!

শোভা চাপা গলায় বলল, জানো, বাবা আবার বাড়ির চাবিটা নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

প্রভাত চিন্তিত স্বরে বলল, দিলে কেন? আজকাল বাবার চাবির ব্যাপারে তেমন খেয়াল থাকে না। চাবিটা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা বাবা কেন বোঝেন না আজও।

শোভা বলল, আজ ভোরে যখন বাবা তৈরি হয়ে বেরচ্ছেন আমি তখন একবার উঠেছিলাম। বললাম, বাবা আমি দরজা খুলে দেব, আপনি চাবি রেখে যান! বাবা বললেন, না, না, তোমাদের বার বার বিরক্ত করা, আমি খুলে নেব!

সমী দরজা খুলে নিজের 'পুফে'তে এসে বসল। বলল,—বিরক্ত আর করে না! বার বার বিরক্ত। ছাখো না কতবার যায় আসে। সকাল থেকে এই তিনবার হল। ঠাকুরদার ঝুলি যেন আর ভরতেই চায় না।

সমী প্রভাতের গা ঘেঁষে বসেছে। ছেলের নরম পিঠের উষ্ণতা তার বুক স্পর্শ করছে কোথাও কোথাও। শোভার একটু ছোঁয়াও তার গায়ে লেগে আছে। তারা তিনজন। একটা চমৎকার চিকরি কাটা সকাল। আর তাদের ছিমছাম বসার ঘর।

এমন সময় ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়াল বাবা। বাবার মুখে কেমন যেন বশম্বদ হাসি। বাবার হাতে একটা ভিজে ওঠা কাগজের ঠোঙা।

বাবার হাসিটা কেমন যেন তৈলাক্ত। তোষামুদে।—শোভা তুমি মৌরলা মাছ ভালোবাসো, তাই নিয়ে এলাম। ঘুরতে ঘুরতে একটু গড়িয়াহাট বাজারের দিকে গিয়েছিলাম।

শোভা রুদ্ধস্বরে বলল, কিচেনে রাখুন গিয়ে। মাছের জলে ম্যাটিং ভিজে যাচ্ছে।

তারপর মুখ নামিয়ে বলল, ঘরে যাবেন। আমি আপনার চা নিয়ে যাচ্ছি।

বাবা তাড়াতাড়ি কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে সরিয়ে নিল। শোভা তখন থার্মস থেকে গরম চা ঢালছে পেয়ালায়। মেজাজ সামলানোর চেষ্টা করছে। তার চোয়াল রাগে শক্ত আর চৌকো হয়ে গেছে। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বলল, আজ ডাঁটা, কাল কাঁকরোল পরশু মৌরলা। বাবা আমার রান্নার উইক্‌লি প্ল্যানিংটাকেই ভেস্তে দেন। নাও এখন টাট্‌কা মৌরলা মাছকে উদ্ধার করো। কে বাছে, কে ধোয় কে রাঁধে? মৌরলা মাছ টাছ ছুটির দিনে মানায়। কাজের দিনে চলে না।

প্রভাত চুপচাপ কাগজ পড়ে যায়। মুখ খোলে না। সত্যিই তো। শোভা টিচারি করে। তার সঙ্গে রান্না, গোছানো তাণ্ডানো। সব। কেবল একটা ঠিকে ঝি ছাড়া কোনো বাড়্‌তি লোক রাখে না।

এই যে বাইরের ঘর, আজ সকাল সাতটা পর্যন্ত এটাই ছিল সমীরের শোবার ঘর। সমী ডিভানে বিছানা করে শোয়। সমীর কোনো আলাদা ঘর নেই। প্রভাত আর শোভার জন্য এক নম্বর বেড্‌রুম্। বাবা আর মার জন্য দু নম্বর। কয়েকমাস হ'ল মা কমে গেছে। আর বাড়িতে, থুড়ি ফ্ল্যাটে কোনো তিন নম্বর বেডরুম নেই। ওটা ড্রইংরুম। এই তিনখানা ঘর, আর এক চিম্‌টি ডাইনিং স্পেস। এই ফ্ল্যাট এর বেশি আর বাড়বে না। রবারের মত টানলেও না। প্রভাত বুঝতে পারে চোদ্দ বছরের সমীর শোয়ার অসুবিধা হয়। সমীর লেখাপড়া করার অসুবিধা হয়। এখনও বাইরের ঘরে সন্ধ্যেবেলা কেউ এলে সমীকে উঠে যেতে হয়। ডাইনিং স্পেসে বসে পড়তে হয়। সে দাদুর ঘরে কখনও যায় না। মাঝে মাঝে সমী ক্রেসেণ্ট কলোনি বা অন্যত্র তার সমবয়সী বন্ধুদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে তাদের ঘরের বর্ণনা দেয়। সমীর বেশির ভাগ বন্ধুরই নিজস্ব ঘর আছে। নাহ'লে দুই ভাই বা ভাইবোনের শেয়ার-করা ঘর। তার বন্ধু ভূপতির ছেলে টুব্‌লু সমীর প্রাণের বন্ধু। সেই সূত্রে, একবার টুব্‌লুর জন্মদিনে শোভাকে নিয়ে প্রভাতও নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিল। টুব্‌লুর ঘরখানি তার খুব ভালোলেগেছিল। টুব্‌লুর খেলনা,

ব্যাড্মিনটন র‍্যাকেট্, ফুটবল রাখা। তার নীচু বিছানা। আলাদা পড়ার টেবিল বুকর‍্যাক। জাপানী আলো। দেয়ালে প্রিয় ক্রিকেটারদের ব্লো-আপ। একেবারে একটা নিজস্ব জগৎ। এ সবই সমীর আছে। বাক্স বাক্স খেলনা, বই, নানান সরঞ্জাম। কিন্তু সাজাবার জায়গা নেই। প্রভাতের সবচেয়ে মনে লেগেছিল সমীর একটা ছোট্ট কথা। জন্মদিনের নেমতন্ন খেয়ে যাবার সময় সমী বলেছিল, টুব্লুরা বেশ ছিমছাম্ ফ্যামিলি তাই না? গ্যাখো আমাদের আর ওদের, একই টাইপের ফ্ল্যাট। হুবহু এক ডিজাইনের। কিন্তু আমাদের বাড়িটা কেমন জবরজং কেমন ভিড়ভিড় লাগে। আর দেখেছো, বাড়ির দোসরা রেডরুমটা কেমন টুব্লু পেয়ে গেছে! ওকে আর আমার মত উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না। সকালের ট্রান্সমিশন শেষ হতে না হতেই প্রভাতের অফিস যাবার তাড়া। শোভার স্কুলের জন্য তৈরি হওয়া। সমীর এখন পুজোর ছুটি। সমী যাবে বন্ধুর বাড়ি, টেবলটেনিস খেলতে।

ঠিক এমনি ব্যাপ্ত সময়ে বাবা প্রভাতের কাছে এসে বসল,—কবে মৌরলা মাছ এসেছে, কখন কি কথা হয়েছে এবং তা সবাই ভুলেও গেছে, কিন্তু বাবার আর কৈফিয়ৎ দেওয়ার শেষ নেই। একটা চেয়ারের আগায় আড়ষ্ট হয়ে বসে বাবা বলল, পণ্টু, গড়িয়াহাটা বাজারে গেলাম অতুলবাবু খুব অসুস্থ ওঁর জন্যে মাগুর মাছ আনতে। তা শস্তায় টাট্কা মৌরলা পেলাম—তাই! আমি ভেবেছিলুম টাটকামাছ দেখে তোরা খুশি হবি। প্রভাত একটু নিরুপায় হাসল।

বাবার মুখটা এত রঙ চটা, এত জীর্ণ, এত ইট বের করা। তাদের এই ক্রেসেনট্ কমপ্লেক্স-এর মাঝখানের মস্ত পার্কের একদিক ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো ফ্ল্যাটগুলো নানা মাপের, নানা ধরনের, নানা সাইজের। এবং বলাই বাহুল্য নানান দামের। এখানে ছমাস অন্তর বাড়িগুলো রঙ করা হয় বলে সেগুলো সবই নতুন। বারোমাসই আন্কোরা। তার মাঝখানে বাবা বাবা খামোখাই চেয়ারে বসে বসে বকে যাচ্ছে, এই যে গ্যাখনা পণ্টু, এখনো শরীরটাকে কত ফিট রেখেছি! ভোরে পার্কের চারপাশে কতগুলো চক্কর মারি, তারপরে দুধের ডিপোর সামনের বেঞ্চে বসি। তারপর যাই গড়িয়াহাটের দিকে। কখনো কখনো লেকেও চলে যাই। কই শরীর তো দুর্বল লাগে না। ক্লান্তি আসে না। পঞ্চার মাকে দিয়ে দুধ না আনিয়ে আমাকে দিলেই তো পারিস। রেশনটাও তো আমিই এনে দিতে পারি। টুকিটাকি ফাই ফরমায়েশ···

শোভা বোধহয় বাবার কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। সে সাজগোছের ফাঁকে একবার আস্তে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। শোভা সাধারণত কোনো রকম বেশি কথা পছন্দ করে না। আপাদমস্তক বাবাকে জরীপ একবার করে নিল শুধু। তারপর বলল,—বাবা, আপনার জলখাবার দিয়েছি ঘরে। হটকেসে আপনার আর সমীর খাবার রইল। বারোটা নাগাদ খাবেন।

বাবা আরও কিন্তু কিন্তু হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে শোভা, যাই!

শোভা সরে যেতেই বাবা নীচু গলায় বলল, পলটু। আমার কথা তোরা অন্যভাবে নিসসি—প্রভাত বাবার কণ্ঠস্বরে প্রার্থীর আকুতি দেখে বাবার দিকে তাকাল একবার।

বাবার গালের একটি পলিত পেশী আলাদা হয়ে কেঁপে উঠল যেন। বার্ধক্যে মানুষের চোখে বোধহয় সবসময়েই পাত্‌লা একটা জলীয় পরত পড়ে থাকে। বাবা বলল—আমি বলতে চেয়েছিলাম সারাজীবন কাজকর্ম করে এসেছি। এখনও শরীর চালু আছে। আমি সংসারের কাজ যতটা পারি করতে চাই।

শোভা জুতোর র‍্যাক্ থেকে সশব্দে তার হাইহিল শ্লিপার গুলো আছড়ে ফেলল। বাবা সেই শব্দে একটু যেন কেঁপে উঠল।

শোভা বলল, তাহলে আমি যাচ্ছি!

প্রভাতও সামনের ঘরের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মনে হ'ল বাবা যেন আরো কিছু বলতে চায়। সত্যিই তাই। বাবা নীচু গলায় বলল, জানিস পল্টু,—হারু বাবু আজ আর দুধ নিতে আসেন নি। প্রভাত বলল, হারুবাবু কে?

—মাদার ডেয়ারীতে দুধ নিতে আসতেন ভদ্দরলোক। সাতাত্তর বছর বয়স হয়েছিল। শুনলুম কালরাতে প্যারালিটিক্ স্ট্রোক হয়েছে। আমাদের ক্রেসেন্ট কমপ্লেক্স-এই থাকেন।

চাপা গলায় বাবা বলল, আমি রোজ গুনি। মানে মাদার ডেয়ারীতে যেসব বুড়োরা দুধ নিতে আসে আমি তাদের সবাইকে চিনি। গত তিনমাসের মধ্যেই চারজন কমলো। আমাদের ক্রেসেন্ট কম্প্লেক্স এরই সব কজন। সুধীরবাবু আর সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না। তাই তাঁকে ছেলে পুরোণো বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিপুলবাবু আর প্রসন্নবাবুতো মারাই গেলেন। আর বিলাসবাবু শ্বাসকষ্টের জন্য উড়িষ্যায় মেয়ের কাছে চলে গেছেন। মেয়ের

স্বামী ফরেস্ট অফিসার। আর আজ ছাখ, হারুবাবুর এই খবর। প্রভাত স্নানঘরে গিয়ে শাওয়ারের তলায় নিজের গরম মাথাটা পেতে দিল।

কি আশ্চর্য না? তার বাবা রোজ ভোরে মাদার ডেয়ারীর সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো গোণে। আর বুড়োর সংখ্যা কমে গেলে হিশেব রাখে। বাবা এই বুড়ো বয়সে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। মা তেমন বদলায় নি। নতুন ফ্ল্যাটে এসে মা বেশিদিন বাঁচেও নি। মা চুপচাপ বিছানায় বসে থাকত। আয়ার সেবা নিত। তারপর মাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়। জীবনের শেষ কটা মাস হাসপাতালেই কাটে মায়ের। এখন বাবা এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটার মধ্যে যেন প্রয়োজনের বেশি বড় ঘন ঘন ঘোরাঘুরি করে। অথচ বাবা কেমন যেন আলাদা আল্‌গা হয়ে থাকে।

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে হাত পা ধুয়ে, তরতাজা হয়ে শোভা আর প্রভাত তাদের ফ্ল্যাটের ঝুল বারান্দায় বসে। ঝুল বারান্দাটি বড় আরামদায়ক। বাবা টবে নানান গাছপালা করেছে। চমৎকার দক্ষিণ খোলা। রাস্তার ওপারের পার্ক থেকে গাছের গন্ধ আসে। একটা ছুটো গাড়ি যায় রাস্তা দিয়ে। দূরে দূরে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে আলো জ্বলে ওঠে। মনে হয় শান্তির দীপমালা। তুজনে বেতের-ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে। কম কথা বলে। সংসারের কথা বলে না। বড় সুন্দর নিরিবিলি খানিকটা সময়। এ সময়টায় বেশির ভাগ দিনই বাবা পার্কে থাকে। সমী টিউটোরিয়ালে যায়।

শোভা বলছিল ওল্ড বালিগঞ্জের তাদের ছোটবেলার ভাড়া বাড়ির ছোট খাটো স্মৃতির কথা। প্রভাত বলছিল তার যৌবনের প্রথম দিনগুলোর তাদের হিরুমুদ্দি লেনের গলির মুখের একটা মুচকুন্দ গাছের কথা। কথার কোনো মাথা মুণ্ডু নেই। কিন্তু এই অর্থহীন কথাগুলোই যেন সারাদিন ধরে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কের ফাঁকগুলো তৈরি হতে থাকে তা ধীরে ধীরে ভরিয়ে দেয়।

হঠাৎ যেন পিছন দিয়ে ত্বরিত গতিতে একটা ছায়া সরে গেল। সদর দরজা লক্ করা। বাড়িতে কোনো রাত দিনের কাজের লোক নেই। শোভা এই ছোট্ট ফ্ল্যাটে পায়ে পায়ে কোনো কাজের লোক পছন্দ করে না। শোভা ঘাড় ঘুরিয়ে একটু যেন তিরিক্ষে গলায় বলল,—ওঃ বাবা বোধহয়। এত নিঃশব্দে ঘোরেন। যেন অশরীরী!

রাতে খাবার পর, প্রভাত সিগারেট টানছে জেনেও বাবা বারান্দায় এসে

দাঁড়াল। কেমন যেন হরর ছবির সেই বোনাফায়েড, নায়ক বরিস কার্লফের মত দেখাতে লাগল বাবাকে। মুখটা যেন এবড়ো খেবড়ো। চষা মাঠ। কিংবা পুরোণো ঝুরঝুরে একটা বাড়ির মত। যে বাড়ি বহুদিন আগেই তারা হিরু মুদি লেনে ছেড়ে এসেছে।

বাবা কাঁপা কাঁপা মুঠোয় বারান্দার রেলিংটা চেপে ধরে চাপা ফাঁপা গলায় বলল, পন্টু, আজ শোভা কি কোনো ওল্ড হোম-টোমের কথা বলছিল ?

ওল্ড হোম ? প্রভাত আশ্চর্য হল। তারপর তার মনে পড়ল, হ্যাঁ, শোভা ওল্ড বালিগঞ্জ কথাটা অবশ্য বারবার বলেছিল। প্রভাত হেসে বলল, নাতো ! ও অন্যকথা বলছিল। বাবা তুমি বোধহয় ভুল শুনেছ !

প্রভাত দেখল বাবার চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা অবিশ্বাস। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা হঠাৎ বলল—তোর বন্ধু ললিতের কোনো খবর রাখিস ?

প্রভাত বলল, সত্যি একই জায়গায় থাকি, কিন্তু বহুদিন ললিতের বাড়ি যাওয়া হয় না। অবশ্য ফোনে মাঝে মাঝে যোগাযোগ হয়। তাদের অফিসের সঙ্গে আমাদের ট্রান্‌জাকসন আছে তো।

—তো ললিতের কি হয়েছে ? কোনো বিশেষ খবর আছে কি ?

বাবা বলল না ললিতের কিছু হয়নি। পরশু পার্কের উত্তর কোণে আমাদের একটা অন্য মজলিশ আছে সেখানে গিয়েছিলাম। ললিতের বাবা ওখানে রোজ সন্ধ্যায় আসতেন। খুব রসিক মানুষ তো। কাল তাঁকে দেখলাম না জিজ্ঞেস করতে সবাই বলল, আজ তিনদিন হল ললিত তার বাবাকে এল্ড হোমে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বাবার গলার স্বরটা কেমন যেন বাসি আর বিস্বাদ লাগল প্রভাতের।

শোভা ঠিকই বলেছে, যেন বড় অশরীরী বাবা। এমন কোনো একটা দিন প্রভাতের মনে পড়ে না যেদিন বাবাকে বাথরুম আটকে স্নান করতে দেখেছে প্রভাত। বাবার খাওয়া দাওয়া কবেই যেন শোভা বাবার ঘরে করে দিয়েছে। না-কি বাবাই তাদের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসতে অস্বস্তি বোধ করে। বাবা কখন প্রাতঃকৃত্য করে, কখন জামা কাপড় গেঞ্জি শুকোতে দেয় প্রভাত জানে না। বাবার হাঁটা চলায় পর্যন্ত খুব কম শব্দ হয়। প্রভাতের মনে হল বহুদিন সে বাবার ঘরে যায় না। বাবার সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু গল্প করে না। প্রভাত করে না। শোভা করে না। সমীও করে না।

আচ্ছা সমী করে না কেন ?

এক সময় বাবা যখন প্রবল পরাক্রান্ত ছিল, তারা সবাই যমের মত ভয় করত বাবাকে। সন্ধ্যেবেলা মা বলত,—পলটু পড়তে বসো। এখুনি উনি এসে যাবেন। পড়তে না দেখলে ভীষণ রাগ করবেন। ঠাকুমা বলল, আমার বিনুতো পাঁচতরকারী আর মাছ না হ'লে খেতেই পারে না।

পিসি বলত,—দাদাতো আমাদের ফুলবাবু। রোজ কাচা ধুতি জামা চাই, আবার জামায় একটু গন্ধ লাগানো চাই! তখন তার সম্বল ছিল তার ঠাকুরদা। ঠাকুরদার আস্তানা ছিল বড় দালানের মস্ত বড় তক্তপোষে। তখন বাবা কাকারা আর জ্যাঠা একসঙ্গে থাকত। দাদু সেই ক-বে, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর ছিরুমুদি লেনের মস্ত বাড়িটার আধখানা ভাড়া নিয়েছিল। দাদুর পাঁচ নাতি। সবচেয়ে পেয়ারের নাতি ছিল সব ছোট প্রভাত। দাদু তাকে লুকিয়ে নিজের ক্যাশবাক্স থেকে কাঁচ্চিলগুলি কেনার পয়সা দিত। কাঠি বরফ খাওয়াতো। কত গল্প বলত। রামায়ণ মহাভারতের গল্প তো দাদুর কাছ থেকেই শোনা। তাছাড়া রবিনসন্ ক্রুশো, সিন্ধবাদ নাবিকের গল্প। রাতে পাঁচ ভাই বেশির ভাগই দাদুর কাছে শুত। দাদুর গল্প শুনতে শুনতেই সব চোখ জুড়ে আসত। কেবল গল্পই নয়, তাদের পরিবারের নানানা পুরোণো কথা, দেশ-গাঁয়ের কথা পুরোণো দুর্গোৎসব ভাসান যাত্রাপালার গল্প।

প্রভাত ভাবতে ভাবতে অফিসেও তার ভাবনাটাকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

তাহলে সমী রামায়ণ মহাভারতই শুধু নয় দেশের এবং বিদেশের যাবতীয় কাহিনী জানল কি ক'রে?

অফিসে ললিতের ফোন এলো লাঞ্চ টাইমের পর। কাজের কথাবার্তা শেষ হবার পর প্রভাত প্রশ্ন করল,—আচ্ছা ললিত, তুই নাকি মেসোমশাইকে ওল্ড হোমে পাঠিয়ে দিয়েছিস?

—হ্যাঁ দিয়েছি। বাবাকে ওরা একটা আলাদা ঘর দিয়েছে। চমৎকার ব্যবস্থা। হালকা খাওয়া দাওয়া। খরচা বেশি হচ্ছে কিন্তু সব দিক দিয়ে রিলিফ। ছোট ফ্ল্যাট, বাবার হাঁটতে চলতে কষ্ট। খাওয়া দাওয়ার কনট্রোল হত না।

প্রভাত বলল, হ্যাঁ, তোর স্পেস-ও অনেকখানি সেভ হ'ল।

—অবশ্যই। ঐ ফ্ল্যাটে আমার ফ্যামিলিই ঠেসাঠেসি করে মরে। তার ওপর বাবার ঝামেলা ছাখ প্রভাত, স্পেস প্রবলেমটা একটা মেজর প্রবলেম। এবং মোটেই ফেলনা প্রবলেম নয়। এটা তুইও বুঝবি। আর দুদিন পর।

স্পেস প্রবলেম।

প্রভাতের মাথার ভিতর চিন্তাটা কুর কুর করতে লাগল। তার দাদুকে সে অনেকটা জায়গার মধ্যে পেয়েছিল। তাদের দেশের বিকিয়ে যাওয়া বাড়ি জমি ফলবাগানের মাঝখানে পেয়েছিল দারুণ একটা দিলদরিয়া মেজাজে। তারপর ছিরুমুদি লেনের ভাড়া বাড়িতে। সেই পুরোণো কলকাতার রাজ-মিস্ত্রীদের গড়া, পুরোণো, ড্যাম্প, মোটা দেওয়ালের আনপ্ল্যানড বাড়ি। তার রান্নাঘর যেখানে খাবার যায়গা সেখান থেকে অনেকখানি তফাতে। কলঘর যেখানে সেখান থেকে খাবার জায়গা দূর অস্ত। মা ঠাকুমা পিসিমাদের এই জায়গা বাইতে খামোখা একটা অনর্থক খাটুনি পড়ত। তার চেয়ে ফ্ল্যাট অনেক ভালো। অনেক গুছোনো। অনেক প্ল্যানড। কিন্তু এই বাড়তি খোপখাপ অনেকগুলো ঘর, ঠাকুরদার ফলবান বার্ধক্যের আলস্য সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা বড় মাপ।

জায়গা। তাহলে কি জায়গাই একটা সমস্যা? জায়গাই কি মানুষকে এত স্বার্থপর করে তোলে? এত হিশেবি? সমী কি তার দাদুর ঘরটা চায়?

প্রভাত আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে এসে বাবার ঘরটায় যাবে। সে অনেকদিন হল বাবার ঘরটা দেখেনি। অনেকদিন আগে বোধহয় মায়ের মৃত্যুর পরে পরে, শোভা তাকে কতকগুলো ট্রাঙ্ক বাকস বাবার ঘরের খাটের তলায় রাখতে বলেছিল। সেই প্রভাতের, শেষ বাবার ঘরে যাওয়া।

প্রভাতের অফিসের কাজকর্ম এবং বাবাকে নিয়ে এই নতুন ভাবনায় দিন পুইয়ে গেল। নিজের এ্যাটাচি কেস্ গুছিয়ে নিয়ে প্রভাত মিনিবাসের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়িতে এসে প্রভাত দেখলো সমী টিউটোরিয়ালে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

প্রভাত আচমকা বলল, বল্‌তো সমী মন্দোদরী কে?

সমী হাসল। তারপর অবহেলার স্বরে বলল, রাবণের স্ত্রী!

—'ফ্রাইডে' চরিত্রটা কোন গল্পে আছে?

—রবিনসন ক্রুশোয়

—এ সব গল্প কোথা থেকে শুনলি তুই?

—শুনব কেন? পরেছি। দেখেছি। বই কমিকস্ট্রিপ, রেডিও টি, ভি! প্রভাত বলল, প্রভাত খানিকটা অপ্রস্তুত গলায় বলল,—মাস্‌মিডিয়া, হ্যাঁ তাতো বটেই, কিন্তু

—আমার প্রপিতামহের নাম জানিস ?

সমী বলল—মায়ের কাছে লেখা আছে। ঠাকুমার শ্রাদ্ধের সময় দরকার হয়েছিল। এখন মনে নেই। দেখে বলব।

একটু থেকে বুটের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে কেমন একট প্রাপ্তবয়স্ক গলায় সমী বলল, বাবা আমাদের জেনারেশন তোমাদের জেনারেশনের চেয়ে অনেকবেশি জানে। অনেকবেশি বোঝে।

প্রভাত মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, তা জানবি না কেন ? কিন্তু জানবার সোর্স-এর তো শেষ নেই। জ্ঞান বা ইনফরমেশন সবার কাছ থেকেই নিতে হয়। ঠাকুরদার ঝুলিটাও তো একটু নেড়ে বেড়ে দেখতে হয় সমী—

অদ্ভুত খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসল সমী।

বাবা, তুমি দারুণ বলেছ কিন্তু। ঠাকুরদার ঝুলি—ঠাকুরদার ঝুলি—বাবা আমি কি ঠাকুদার ঝুলিতেও কি আছে তা জানি—যা হয়তো তুমি—

ইতিমধ্যে শোভা গরম গরম আলুপকৌড়া নিয়ে বাড়িতে ঢুকলো। চারতলা ভাঙতে একটু যেন হাঁফাচ্ছে। ঢুকতে ঢুকতেই প্রভাতকে বলল —এই প্লিজ চায়ের জল বসিয়ে দাও না।

সমী বলল, মা বৌদির দোকানের এই পকৌড়া কিন্তু দারুণ।

শোভা বলল, হ্যাঁ পড়তে পায় না। লাইন দিয়ে কিনছে লোকে। মহিলা ওই করেই সংসার চালাচ্ছে—প্রভাত এই পারিবারিক গুষ্টি সুখের মধ্যেই বলল, —কই, বাবাকে দেখছি না তো ?

শোভা বলল, হ্যাঁ বলতে ভুলেছি বাবা আজকাল কেমন 'কোয়্যার' হয়ে যাচ্ছেন তা জানো ? এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। সমী তুই যা না। চা-টা বানিয়ে আননা।

সমী বলল, আমি জানি মা। রুবিমাসী যখন তোমায় বলছিল, আমি তখন সব শুনেছি।

সমী চলে যেতে শোভা বলল, জানো, পাশের ফ্ল্যাটের রুবি স্পষ্ট দেখেছে, বাবা ইচ্ছে করে সিঁড়ি ওঠানামা করছেন। একবার ওপরে উঠছেন একবার নীচে যাচ্ছেন। এমন করে চার-পাঁচবার।

শেষপর্যন্ত রুবি থাকতে না পেরে বেরিয়ে এসে বলে বসেছে, মেসোমশাই আপনি এমন করছেন কেন ? বুকে কষ্ট হবে। শরীর খারাপ হবে। আপনি তো হাঁপাচ্ছেন। ঘামছেন !

প্রভাত বলল, উত্তরে কি বলল বাবা ?

—বললেন, দেখছি, আজও আমি কতটা ফিট আছি।

আশ্চর্য। হঠাৎ তার বাবা নিজেকে ফিট রাখার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন? এ ব্যাপারটা তো যৌবনের খেলা। তারা উঠতি বয়সে মেলায় গিয়ে পয়সা ফেলে শক্তি মাপার যন্ত্রে শক্তি মাপত। যৌবনের খেলা? না-কি প্রভাত কেবল যৌবন দেখেছে বলেই যৌবনের খেলা ভাবছে। হয়ত বার্ধক্যেও এই খেলা বুড়োদের খেলতে ইচ্ছে করে। প্রভাত তো এখনো বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছোয় নি। রাতে বাবা নিজের ঘরেই খায়। প্রভাত শোভা আর সমী নটার টি, ভি সিরিয়াল দেখতে দেখতে ডিনার সারে।

বাবা খাওয়া দাওয়া সেরে চাবি চাইল। দরজায় অটোমেটিক লক্। লকের দুটো চাবি! একটা বাড়ির, একটা প্রভাতের। বাড়িরটা মোটামুটি শোভাই রাখে। বাবা বলল, শোভা, চাবিটা নিয়েই যাই। তোমরা শুয়ে পড়ো। আমি নিজেই খুলে ঢুকবো!

প্রভাত বাবার হাতে চাবি দেখলেই নার্ভাস হয়ে যায়। একবার বাবা চাবি মিস্‌প্লেস্ করে ফেলেছিল।

প্রভাত বলল, একটু অপেক্ষা করো না বাবা। খাওয়াটা সেরে নিয়ে আমিও বেরোব।

বাবা কেমন যেন চমকে উঠল। বাবার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। বলল, কেন?

প্রভাত বলল, এমনি। আমারও একটু পার্কের পাশে চক্কর দিতে ইচ্ছে করছে।

বাইরে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুজনে। প্রভাত বলল, বাবা আজ ললিতের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল।

বাবা চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, ললিত কি বলছে? শুনছি ললিত কমপ্লেক্স-এর সবাইকে যুক্তি দিচ্ছে বুড়োগুলোকে ওল্ড হোমে পাঠিয়ে দাও! কিন্তু পলটু আমি তো এখনও ফিট আছি। ওর বাবার মত জবুথবু হয়ে যাইনি।

প্রভাত বলল, ওসব কথা তুমি ভাবছ কেন বাবা।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে দুধের ডিপোটার সামনে গেল। বাবা পার্কের বাইরের একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বলল, বোধহয় আমিই এই কমপ্লেক্স-এর শেষ বুড়ো, যে নিজের ছেলের সঙ্গে ফ্ল্যাটে আছি।

প্রভাত বলল, কেন?

—দেখবি সন্ধ্যেবেলা। যখন সবাই ঝাঁকে বেঁধে বেড়াতে বেরোয়। কেবল ইয়ঙ্ গ্রুপ। বাচ্চা, বালকবালিকা, কিশোর কিশোরী যুবকযুবতী। সুন্দর লাগে। এখানে বুড়োর সংখ্যা খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে।

পার্কের পাশে সারি সারি ইয়ুক্যালিপটাস গাছ। বাবা একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

প্রভাত বলল, কেন বাবা? মহীনবাবু, অতুলবাবু, মৃণালবাবু ওঁরা তো রয়েছেন। ওঁরাও তো বুড়ো।

বাবা অদ্ভুত গলায় বলল, কিন্তু ওরা তো নিজেরাই ফ্ল্যাটের মালিক। ওরাতো মোটা পেনসন পায়। ওদের তো কেউ ওল্ড হোমে পাঠাতে পারবে না।

কথাটা বলে ফেলেই বাবা যেন একটু দমে গেল।

প্রভাত বলল, চলো না বাবা। পার্কের ভিতরে গিয়ে বসি।

কমপ্লেক্স-এর পার্কটা মনোরম। সুন্দরভাবে দেখাশুনো করা হয়। হঠাৎ বাবা বলল,

—কাল থেকে সমী-র টিউটর আসবে, না?

—হ্যাঁ বাবা!

—ম্যাথামেটিকস্ পড়াবে?

—হ্যাঁ!

—পল্টু, সমী ডাইনিঙ টেবিলে পড়ে আমার দেখতে খারাপ লাগে। তুই আমার ঘরের খাটটা বেচে দে। ওটা ঢ্যাপসা আর পুরোনো। ওখানে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা কর। আর আমি বরং ফোল্ডিঙ খাটটা পেতে সবকাজ শেষ হয়ে যাবার পর ডাইনিঙ টেবিলটায় শোবো। তোদের যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না।

প্রভাত বলল, বাবা, তুমি এতবার ওপরনীচ করো কেন? সবাই কি ভাবে?

বাবা উদাস গলায় বলল, জীবনে কে বাতিল হতে চায় পলটু?

প্রভাতের গলার ভিতরে একটা রুদ্ধ কান্নার ডেলা ঘুরতে লাগল। প্রভাত বলল, না বাবা, তুমি বাতিলের দলে পড়বে কেন? এখনও তুমি কত ফিট!

বাবা বলল, না আমি আর একটা কথাও ভাবছি পলটু।

—ভাবছ? কি?

—রোজগারের কথা!

—রোজগার? তুমি এসব কথা ভাবছ কেন?

প্রভাত আস্তে আস্তে বাবার শুকনো খড়ের আটির মত হাতটা ধরল।

বাবা একটু চমকাল যেন। না-কি একটু কেঁপে উঠল। বাবা হঠাৎ ডুকরে উঠে রুদ্ধ গলায় ফিসফিস করে বলল, পলটু, আমাকে ওল্ড হোমে পাঠিয়ে দিবি না-তো?

প্রভাত দূরে ত্রেসেনট কমপ্লেকস-এর আকাশের দিকে মাথা তোলা সোজা সোজা, হাজার হাজার নির্লিপ্ত দৃষ্টির জানালার বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবল তার বাবা এই কমপ্লেকসের হ্যাভনট বুড়োদের একজন শেষ প্রতিভূ।

ওল্ড হোম! ওল্ড হোমের চেয়ে তাদের ফ্ল্যাটটা আর কতটা অন্যরকম? বাবার সঙ্গে তাদের তিনজনের সম্পর্কই বা কতটা? তা সত্বেও বাবা তাদের কাছেই থাকতে চায়। তাদের সঙ্গে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে চায়। এই তো। এর বেশি আর তো কিছু নয়।

কিন্তু কেবল বাবার জন্যেই নয়; এই আটত্রিশ বছর বয়সে প্রভাতের মনের ভিতর আর একটা অজানা আতঙ্ক তৈরী হয়ে উঠছে।

সমী-র হাসিটা সে ভুলতে পারছে না। খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসি। ঠাকুরদাদার ঝুলি বলে সেই হাসি। আজ সবই কি ভয়ানক একটা হিশেবের মধ্যে। ইঞ্চি মিটার সেট স্কোয়ার স্কেল। তাদের হিশেব করা ফ্ল্যাটে ছুটো বেডরুম একটা ড্রইংরুম। এই ফ্ল্যাটই তাদের জীবনের প্যাটার্নের নিয়ামক হয়ে উঠেছে। প্রভাতের মাইনে। ফ্ল্যাট। জীবনযাপনের কায়দা এ সব যেন অদৃশ্য একটা হাতে তাদের ক্ষুদ্র মানুষী পরিবারটার গড়ন পেটন নিয়ন্ত্রণ করে দিচ্ছে। তার বাবা একজন চালচিত্রহীন বিসর্জন বাতিল মানুষ। তার বাবার ঠাকুরদার ঝুলি এখন ভরা কেবল ভিক্ষায়।

বিশাল বিপুল কমপ্লেকসটা যেন একটা কংক্রিটের ইট কাঠের মাপজোকের আঙুল দিয়ে তাদের ঘিরে ধরেছে। প্রভাত আর শোভা যদি এই সব হিশেব অনুযায়ী ঠিকসময়ে, ঠিকমত বুড়ো না বনতে পারে। সমী-র জীবনের মাপের সঙ্গে মিলিয়ে ঠিকসময়ে মরতে না পারে?

তাহলে কি হবে? মহীনবাবু? না ললিত? কোন লোকটার ভূমিকা নিতে হবে তাকে?

কিন্তু সবসময় কি তাই-ই হয়? একটা ব্যবস্থা যে নকসা দেখিয়ে দেয় মানুষ কম্পিউটারের মত সেই বাঁধাধরা নকসার কি পুনরাবৃত্তি করে? মানুষ তবে কেন? যদি না নতুন নিজস্ব প্যাটার্ন বানাতে পারে?

প্রভাত উঠে দাঁড়াল। না, সে শোভার সঙ্গে এনিয়ে কথা বলবে না। সমী-র সঙ্গেও নয়। কংক্রিটের দেয়াল ফাটিয়ে যেভাবে ম্যাজিকের মত অশ্বত্থগাছ বেরিয়ে আসে সেভাবে লড়াকুর মত উঠে দাঁড়াল প্রভাত বলল, বাবা, চলো ফ্ল্যাটে চলো! তার মনের ভিতর কিন্তু তখন ফ্ল্যাট কথাটা ছিল না। আসলে সে বলতে চাইছিল, বাবা চলো, বাড়ি চলো।

সম্পর্ক

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

নির্মলবাবু নেমে আসছেন। তিনতলায় মিটিঙের ঘর থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ করিডর পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, ছ'পাশে এবং পেছনে আরো ছ'জন, মোট সাতজন তাঁরা। সাতজনই হওয়ার কথা, তেরোজনের কমিটিতে সাত-ছয় ভোটে জিত হয়েছে। জিতে সবাই উল্লসিত, দীর্ঘ টানাপোড়েন, সলাপরামর্শ, উত্তেজনার পর জিতে গেলে যেমন হয়। জিত যে হবে সেটা অবশ্য আগেই বোঝা গিয়েছিল, নির্মলবাবু এপক্ষে এসে যাওয়ার পরই, মিটিং-এর ছদিন আগেই। তবে সেটা শুধু ছ'জন জানত, বাকিদের জানানো হয়নি। ফলে তারা বেশি উৎফুল্ল, জয়ের সঙ্গে বিস্ময় মিশে থাকলে যেমন হয়।

উত্তেজিত উল্লাসের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে, নামতে নামতে, নেমে আবার হেঁটে যেতে যেতে, সাতজনের একজনের বাড়িতে বসে চা-সিঙ্গাড়া-সন্দেশ খেতে খেতে, পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতে করতেও নির্মলবাবুর অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। মনটা কেমন ছেড়ে-যাওয়া ছেড়ে-যাওয়া লাগে। লাগে, লাগাটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে যেতে থাকে, গভীর এবং জটিল হতে থাকে, অথচ বুঝতে পারেন না অনুভূতিটা ঠিক কী, কেমন এবং কেন। বোঝার চেষ্টা করেন। কথা শুনতে শুনতে, বলতে বলতে, সন্দেশে কামড় দিতে দিতে, তাঁর নামটাই এবার আসবে, তার জন্যে যা যা করার সবই করা হবে জেনে স্মিত হাসতে হাসতে বোঝার চেষ্টা করেন, কেন মনটা ছাড়া ছাড়া লাগছে, ঠিক কী ঘটছে মনের তলায়। বুঝতে পারেন না। অথচ মনে এমন কাঁটা নিয়ে থাকাও যায় না। জানতে পারলে, বুঝতে পারলে কাঁটাটা তুলে ফেলা যায়। কিন্তু বোঝাই যদি না যায় তখন কী করে মানুষ? যা করে নির্মলবাবুও তাই করেন। মরিয়া হয়ে এমন ভাব করেন, নিজের কাছে, যেন কিছুই হয় নি, তিনিও খুশি, আর ছ'জনের মতোই, শুধুই খুশি, কোনো কাঁটা কোথাও নেই। তার ফলে একটু বেশি কথা বলা হয়ে যায়, হাসি একটু বেশি ঘন ঘন আসে, পাশে বসা সরকারী প্রতিনিধির উরুতে ছ'একবার চাপড়ও দিয়ে ফেলেন উৎসাহ বোঝাতে। ছ'জনই সেটা লক্ষ্য করে, কেউ কিছু না বললেও তাদের চাউনিতে,

ভুরুর কাজে, কথার মোচড়ে বোঝা যায় তারা লক্ষ্য করেছে, লক্ষ্য করছে। তারা যে তাঁর আচরণের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছে, করছে, এটা বুঝতে পেরেই নির্মলবাবুর কেমন মনে হয় ধরা পড়ে গেছেন, এরা ধরে ফেলেছে। ব্যতিক্রমটা বুঝতে পেরে মনে মনে তার কী ব্যাখ্যা করছে এরা? ভাবছে কি, এরা যতো খুশি আমি ততোটা নই, আসলে নই, আর সেই জন্যেই বেশি বেশি করে প্রকাশ করছি খুশিটা? তার মানে আমাকে পুরোপুরি এদের মতো, এদের সঙ্গে একাত্ম বলে মনে করছে না? তা যদি হয় এরাও তো বিশ্বাস করবে না আমাকে, পুরোপুরি করবে না, একেবারে নিজেদের লোককে যেমন করে তেমন করবে না। যদি তাই হয়, যদি আমাকে নিজেদের একজন বলে মনে না করে, বিশ্বাস না করে…

ওপক্ষের ওরা তো আমার বিরুদ্ধেই চলে গেছে, আজকের মিটিঙের পর, আমার বক্তৃতার পর, সত্যকিংকরবাবুর বিরুদ্ধে হাত তোলার পর না যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই। ওরা গেছে, এরাও যদি…

হঠাৎ কেমন একা একা লাগে নির্মলবাবুর। হাসি, কথা, ভালো ভালো কথা, জয়ের উল্লাস, সন্দেশ-সিঙ্গাড়া, উরুতে এবং পিঠে চাপড় সত্ত্বেও তাঁর ভয়ংকর একা লাগে। এবং তখনই তিনি কাঁটাটার স্বরূপ বুঝতে পারেন। ছাড়া ছাড়া, ছেড়ে-যাওয়া মন মানে একলা মন। মিটিঙের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই আসলে তাঁর একলা লাগছে। এতো বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী চারপাশে, এরা সবাই তাকেই সমর্থন করবে, সবাই এতো খুশি আজকের জয়ের পর, এবং সবাই জানে তিনিই এনে দিয়েছেন এই জয়, তিনিই ছিলেন ডিসাইডিং ফ্যাক্টর, যেদিকে তিনি সেদিকেই সাত, অন্যদিকে ছয়, ফলে এ জয় তাঁরই জয়, তাঁর উন্নতির পথই খুলে গেল এই জয়ে। তবু তাঁর একা একা লাগে এবং একা লাগছে বুঝতে পেরেই তাঁর মনে হয় কিংকরদার কেমন লাগছে এখন? খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন কি? ঠিক চার মাস পরে, ষাট পূর্ণ করে একষট্টিতে পা দেওয়ামাত্র মস্ত টেবিলের ওপাশে চেয়ারটা আর তাঁর থাকবে না, চাকরিই থাকবে না জেনে ভেঙে পড়েছেন কি? নাকি হা হা করে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন সমর্থকদের সান্ত্বনা এবং রাগ, যেমন করা তাঁর অভ্যাস?

'দাও হে, আর একটু চা দাও!'

নির্মলবাবু এমন করে চা গেলেন যেন চা দিয়েই ডুবিয়ে দিতে চান নিঃসঙ্গতার অনুভূতি এবং কিংকরদার ভাবনা। বাকি ছ'জন অবাকই হয়।

নির্মলবাবু এমনিতেই চা কম খেতেন, আলসারটা ধরা পড়ার পর একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। তারা ভাবে, এরপর নির্মলবাবু সিগারেটও চাইবেন কিনা।

নির্মলবাবু খুব ভাল লোক। চা-পান-সিগারেট কিছুরই কোনো নেশা নেই তাঁর। ধুতিপাঞ্জাবি ছাড়া কিছু পরেন না, সে ধুতিপাঞ্জাবিও সবসময় এলোমেলো থাকে, যেন হাতে কাচা কিংবা না-কাচাই। কথা কম বলেন, যখন বলেন খুব নীচু গলায়, নম্র ভঙ্গিতে বলেন। সহকর্মীরা, ছাত্রছাত্রীরা, এমনকি কলেজের দারোয়ান-বেয়ারারাও জানে, খুব উত্তেজনার সময়ও সভ্যতা-ভব্যতা-রুচির সীমা ছাড়ান না তিনি। নিজের ওপর তাঁর অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ। তিপ্পান্ন বছরের জীবনে, এই কলেজেই কেটেছে তার পনেরো বছর, তিনি কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছেন এমন ঘটনা মনে করতে পারে না কেউ। সবচেয়ে বড় কথা, সবাই জানে, সজ্ঞানে তিনি কখনো কারো ক্ষতি করেন নি, করেন না, বরং ক্ষমতাই কুলোলে কল্যাণ করার চেষ্টাই করেন। সবাই বলে, এ ব্যাপারে তিনি সত্যকিংকরবাবুর যোগ্য শিষ্য। সত্যকিংকরবাবু যদিও তাঁকে শিষ্য বলে মানেন না, বন্ধু হিসাবেই গণ্য করেন।

বলে না, বলত। সারাজীবন ধরেই বলেছে। আর বলবে না।

কথাটা মনে হতেই নির্মলবাবু যেন মুক্তির জানলা দেখতে পান।

একটু আগে মনে হয়েছিল বুঝতে পারলেই কাঁটাটা তুলে ফেলা যাবে। কিন্তু বাসে যেতে যেতে, বাস বদলে ধর্মতলায় নেমে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করেও একাকীত্বের অনুভূতিটা তাড়াতে পারেন না নির্মলবাবু। ট্রাম ডিপোর ভেতরে নিরিবিলি একটা কোণে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকান তিনি। কোথাও মেঘ নেই। বৃষ্টির লক্ষণই নেই। পরিষ্কার শরতের নীল আকাশ। তবু কেন এতো একা লাগে? তখনই তাঁর মনে হয়, আর বলবে না, শিষ্য বলবে না, ছায়া বলবে না। কেমন মুক্ত অনুভব করেন নির্মলবাবু। মনে হয় বহুদিনের একটা বোঝা হঠাৎ যেন নেমে গেল ঘাড় থেকে। মুক্তির স্বরূপটা ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেই নিজেকে মনে হয় নিঃসঙ্গ, খুব একা।

কেন মনে হয়? তবে কি কিংকরদার সঙ্গে বিচ্ছেদের উৎসেই এই কাঁটার জন্ম? তিনি সঙ্গে থাকলেই কেউ আছে, সব আছে, সবাই আছে, তিনি না থাকলেই একা, কিছুই নেই? আমি এতোটাই নির্ভরশীল তাঁর ওপর? এতোটাই জড়িয়ে আছি? মুক্তি আর একাকীত্ব কি এমনিই একাত্ম, একজন এলে অন্যজন আসবেই?

কিংকরদার কি জানা ছিল এসব কথা? তিনি কি জানতেন একদিন এমন

হবে? নইলে বেলঘরিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগের পর্যায়ে কেন বারবার বলতেন, তুমি তোমার মতো হও। আমি ইংরিজির লোক হলেও ইতিহাসও দেখিয়ে দিতে পারব। ইতিহাসেই দাও। যাতেই দিই, কী তফাৎ হতো? কিংকরদার ছায়া তো ইতিহাসেও পড়ত। ইণ্টারমিডিয়েট থেকেই তো পড়ছিল।

তখন থেকেই শুরু নাকি তার পরে কোনো সময়ে? আমি কি বুঝিনি কিছুই? নাকি আমার মন বুঝেছিল, আমি ধরতে পারি নি? হয়তো তাই; নইলে কিংকরদা কুচবিহারে কলেজের কাজে চলে যাওয়ার আগে স্কুলে তাঁর জায়গায় আমাকে বসাবার জন্যে যখন সবকিছু করছিলেন তখন আমিই কেন সবচেয়ে আপত্তি করেছিলাম? কিংকরদার মর্যাদার প্রশ্ন, তাঁর ইমেজ নষ্ট হওয়ার ভয় এসব কি আসল কথা ছিল না? এসবের আড়ালে আসলে ছিল ছায়ার ভার? তখনই কি লোকের চোখে আমি যোগ্য শিষ্য হয়ে গেছি? ছায়া?

কিংকরদা চিঠিটা হাতে দিয়ে বলেছিলেন, আমার কথা না ভেবে বৌটা আর মেয়েটার কথা ভাবো। বলার মধ্যে কি মায়া ছিল? মায়ার মধ্যে কিছু আত্মশ্লাঘা? নাকি ছায়ার খেলা ছিঁড়ে ফেলার নিষ্ঠুরতাই ছিল কথাগুলোর ভেতরে?

স্কুলেই প্রথম কানে আসে শব্দদুটো। যোগ্য শিষ্য। খুব ভালো লাগত তখন। কী যে ভালো ছিল সেই ভালো লাগা।

হাঁটতে হাঁটতে কে. সি. দাসে যান নির্মলবাবু। রসমালাই কেনেন। কমলা ভালোবাসে। অনুও ভালোবাসে। অনু তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে। বেলঘরিয়া পর্ব শেষ করে বাংলা-বিহারের বর্ডারে একটা কলেজে ঢোকার অল্পদিন পরেই এসেছিল অনু। কিংকরদা তখন কলকাতার বড় কলেজে। লম্বা চিঠি লিখেছিলেন কলেজের কাজ পাওয়ার খবর জেনে। অনু হওয়ার পর সোনার মাকড়ি নিয়ে বাসায় এসেছিলেন।

ট্রামে না মেট্রোতে, এই ভাবনায় খানিকটা সময় যায় নির্মলবাবুর। ট্রামেই চড়েন শেষ পর্যন্ত। তবু একা একা লাগেই। আর কিংকরদার ভাবনাটাও পেছনে পেছনে আসে।

ড্রাইভারের পেছনে জানলার ধারে বসতে পেয়ে মিষ্টির হাঁড়িটা কোলের ওপর রেখে জুৎ করে বসেন নির্মলবাবু, যেন শেষ বোঝাপড়া না করে নামবেন না ট্রাম থেকে।

ছিঁড়ে ফেলাতে মুক্তি। আর কেউ বলবে না যোগ্য শিষ্য, ভাববে না ছায়া। তবে কেন মনে ভার? এ ভারের উৎস কি একাকীত্ব? মুক্তিমাত্রেই নিঃসঙ্গ, পাখির মতো, উর্ধাকাশে? পাখি তো ফেরে, মুক্তি তার খেলা, তার ব্যায়াম। কোথায় ফিরব আমি-এ মুক্তি যদি আমার খেলা হয়, কার কাছে? আসলে আমি তো একা নই, আমার বউ আছে, মেয়ে আছে, জামাই আছে, নাতি আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সহকর্মীরা আছে, কমিটিতে মেজরিটি আছে। তবু কেন একা একা লাগে? সবাই থেকেও যেন নেই কেউ!

তবে কি এতোটাই জুড়ে দিলেন তিনি? এতোটা? নির্মলবাবু যেন শারীরিকভাবেই আহত হন, আবিষ্কারের বিস্ময়ে। এবং মুহূর্তে, অকারণেই, তাঁর চোখে ভেসে ওঠে দুটি মুখ, জানলার শিক ধরে দুটি শিশুর মুখ, শনিবার রাত্রে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ, দু'গালে শুকনো কান্না, উন্মুখে চেয়ে আছে পথের দিকে। সপ্তাহান্তে বাড়ি ফিরতে রাতই হতো তখন। কষ্ট কমলারও হতো। তার অফিসও ছিল। তবু হয়তো অফিস ছিল বলেই সে পেরে যেতো। একা হতেও তো অবসর লাগে। মেয়েদুটো পারত না। ছবিটা পাথরের মতো গলায় ঝুলিয়ে, জানলার শিক ধরে দুটি শিশুর মুখের ছবি, আর ছোটটার 'দেওনা, দেওনা' কানে আর বুকে নিয়ে প্রতি সোমবার ফিরে যেতে হতো। মাসের পর মাস, কয়েক বছর। কিংকরদাই ওদের সারা সপ্তাহের খুঁটি।

ছকটা কি তখন থেকেই গড়ে উঠছিল? আমি বললাম, আপনার কাছে টেনে নিন, আর পারছি না। তিনি বললেন, এখানে নয়, অন্য কোথাও, দেখছি···ততোদিনে থিসিসের কাজটাও প্রায় শেষ। প্রত্যেক চ্যাপটারেই ছায়া থেকে যেতো কিংকরদার। অন্য কোথাও হয় নি, তাঁর কলেজেই হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিংকরদাই করেছিলেন সব, কিন্তু তিনি চান নি। বলেইছিলেন সে কথা। বেলঘরিয়ার মতোই বলেছিলেন, চেষ্টা করো নিজের মতো হতে।

উনি কি তখনই বুঝেছিলেন ছায়া পড়ছে, দীর্ঘ হচ্ছে, ভার বাড়ছে? সে ভার কাটাতে একদিন নির্মল···তবে তো উনি সবই জানতেন। তবে কি আঘাত ওঁকে বিস্মিত করবে না? বিস্ময় না থাকলে তো প্রস্তুতি ছিল। প্রস্তুতি থাকলে ব্যথা থাকে না, থাকলেও কম থাকে। তবে কি লাগে নি তাঁর? একটুও না? কোথাও না? একই আত্মবিশ্বাস নিয়ে হেঁটে যাবেন আজকের মিটিঙের পরও? হা হা করে হেসে উড়িয়ে দেবেন সব?

ট্রামের জানলার বাইরে দ্রুত সরে সরে যাওয়া সবুজে চোখ রেখে নির্মলবাবু আবিষ্কার করেন হতাশার মতো একটা কিছু মেশে যাচ্ছে ভাবনার ছায়াতে।

কেন ? আমি যা করেছি তা কি তাঁকে আঘাত দেওয়ার জন্যেই ? আঘাতে ব্যথা না থাকলে এ করার সব অর্থই ম্লান ? তবে কি আমার মনে কোনো রাগ জমে ছিল, কোনো আক্রোশ ? কেন আক্রোশ ?

নির্মলবাবু জানলায় একটা হাত রেখে চোখ বন্ধ করে মাথাটা নামিয়ে দেন সেই হাতে। কেন আক্রোশ ? কোনো ক্ষতি কি করেছেন উনি যা ভোলা যায় না ? অথবা অসম্মান ? চোখ বুজে দৌড় দেন নির্মলবাবু। সমগ্র অতীত তোলপাড় করেন। কিছুই পান না যা হাতে তুলে দেখাতে পারেন নিজেকে। ছায়ার ভেতরেও হতাশার রেখা স্পষ্টতর হয়।

তবে কেন ? মনের গোপনে চিৎকার করে ওঠেন নির্মলবাবু। আসলে ক্ষতি, অসম্মান, আঘাত, একটা কিছু তিনি খোঁজেন যার আড়ালে আবার শান্তি খোঁজা যায়, অন্ততঃ স্বস্তি কিছু। না পেয়ে মুখটা তুলে নিজের কানের কাছে বিড়বিড় করে বলেন, আমাকে নয়, কিন্তু আমাকে না হলেও নিজেকেই তিনি···অহংকার দিয়ে আগেই তিনি নিজেকে মেরেছেন। ওই হাঁটা, অমন করে হাসা, ওভাবে কথা বলা, আত্মবিশ্বাস নয়, অহংকার। দু'বার বলার পরেও কথাটা কেউ না বুঝলে ডান হাতের দুটো আঙুল কপালের কোণে রেখে, অধৈর্যে বলা, বুঝুন, বুঝুন, বোঝার চেষ্টা করুন, যেন উনি না বলা পর্যন্ত শ্রোতার মস্তিষ্কও কাজ করে না। এ অহংকার মারতই একদিন। এই হাতে বা অন্য কোনো হাতে। আজকের মিটিঙেওঃ আমাকে নিয়ে আলোচনার সময় আমি না থাকাই ভালো, আমি চাই সবাই খোলা মনে কথা বলুক। বেরিয়ে যাওয়ার আগে একবার ফিরেও তাকান নি আমার দিকে, আগে তো বলেনই নি কিছু। একি আত্মবিশ্বাস ? নাকি অহংকার, স্পর্ধার মতো ? যেন ধরেই নেওয়া নির্মল তো আছেই, সাত তো হবেই। সুতরাং ···

মুহূর্তে সন্দেহ জাগে। নাকি উনি কেয়ারই করেন না মিটিঙে কী হয় না হয়। তবে কি আমার ভূমিকা ওঁকে স্পর্শই করে নি ?

তবে কেন ? ঈর্ষাই কি তাড়াচ্ছিল আমাকে ? ওঁর সব ভালো কথা পিঠ চাপড়ানোর মতো হয়ে যাচ্ছিল ? নাকি লোভই চালিয়ে নিয়ে গেল আমাকে ? চেয়ার, বড়সড় টেবিলের ওধারে ঝকঝকে···লোভ ? এমন ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর মনের ভেতরে উচ্চারিত হয় শব্দটা, যেন ঘৃণার সঙ্গে, যেন সম্পূর্ণ অচেনা, বিদেশী শব্দ। মনে হয় মুক্তির যুক্তিটাই বরং···যোগ্য শিষ্য শব্দদুটো থেকে, ছায়া থেকে, ছায়ার ভার থেকে...ভালোই হয়েছে ছায়ার খেলা ছিঁড়ে ফেলে চলে আসা।

অন্যমনস্কভাবে বাড়ির দিকে হেঁটে যান নির্মলবাবু। একা একা লাগার অনুভূতিটা এতোক্ষণ পরেও, এতো ভাবনার পরেও যায় না বরং ছড়িয়ে যায়, তীব্র গভীরই হয়ে ওঠে, কারণ তার ঠিক পেছনেই আসে অন্য কিছু শব্দ—লোভ, ঈর্ষ্যা, মুক্তি, অহংকার এবং শব্দের গাঢ় ছায়ার মতো তাদের অর্থ—তাঁর কাছে, তাঁর নির্দিষ্ট অর্থে। সবকিছু মিলে তাঁর হাঁটা কেমন বদলে যায়, সামনে একটু ঝুঁকে যেন বেঁকে গিয়ে হাঁটেন, যেন পিঠে বোঝা বা কোথাও ব্যথা। পা-ও পড়ে না ঠিক ঠিক; যেন টলেন। মনে হয় জ্বর আসছে অথবা আলসারের ব্যথাই বুঝি···অদ্ভুত কুয়াশা যেন চারপাশে।

অনু দরজা খোলে।

এতো দেরি করলে? আমরা কখন থেকে···

পর্দা সরিয়ে কমলা বেরিয়ে আসেন ওঘর থেকে।

থাম তো তুই, মানুষটা খেটেখুটে···একি, মিষ্টি নিয়েই এসেছ? তার মানে তুমি জানতে?

দু' হাতে মিষ্টির হাঁড়িটা সামনে ধরে ভেতরে ঢোকেন নির্মলবাবু। ওঘরের পর্দা তুলে ধরতে ধরতে অনু বলে,

দেখো, কে এসেছে!

পর্দার কাছে, দরজার কাছে পৌঁছে পাথর হয়ে যান নির্মলবাবু।

এসো এসো নির্মল, কখন থেকে তোমার জন্যে···

আর কিছু শুনতে পান না নির্মলবাবু। মূর্তির মতো অচল দাঁড়িয়ে থাকেন দরজার এপারে, চোখ থেকে চোখ সরাতে পারেন না। অনু তাঁর মুখের কাছে মুখ এনে বলে,

এমন করছ যেন কোনদিন দেখই নি···

যখন চোখ সরাতে পারেন সরিয়ে নির্মলবাবু দেখেন কমলা এবং অনু এমনভাবে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে যেন তিনি অচেনা কোনো লোক, আচম্বিতে ঢুকে পড়েছেন তাদের ঘরে।

দু'হাতে ধরা মিষ্টির হাঁড়িটা ভয়ংকর ভার লাগে।

আরো

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বুড়োর চোখে ভয়ের ছায়া। বলে, 'এত জল কখনো দেখিনি আগে।'

বুড়ীর মুখ দিয়ে দুটো শ্বাস বেরোয়ঃ 'সমুদ্দুর, সমুদ্দুর।'

ওপরের বৃষ্টি এখন থেমেছে। কিন্তু নীচের জল একদম মরছে না। মাটিটা আর শুষে নিতে পারছে না। সমুদ্দুর-টা থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত উঁচু এক টিলার ওপরে পেল্লায় একটা গাছের মগডালে জড়সড় হয়ে বসে আছে এক ঝাঁক পাখি। জল যে এত ভয়ংকর হতে পারে তা এই পাখির দল কোনো দিন জানতো না। এই একটি গাছের ডগা ছাড়া আর ডাঙ্গার চিহ্নমাত্র নজরে পড়ে না। মনে হয়, শক্ত কিছু পৃথিবীতে নেই। শুধু তরল পাথর। পাথরের ওপর পাথর। তার ওপর পাথর। নড়ে না, নামে না। বুকের ওপর চেপে বসে আছে। কিচিরমিচির করতেও পারছে না কেউ। ভয় ওদের সবার গলা টিপে ধরে আছে। জল আর এখন জল নয়, মৃত্যু। দিনের পর দিন দানা এক কণাও জোগাড় হচ্ছে না। একটা শিশু-পাখি, তাকে সবাই ডাকে চিকুখু বলে। সে নিথর হয়ে পড়ে আছে। চোখে শুকনো জলের দাগ। 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও'—চোখের জলে এই কথা-টা লেখা। ডানা ঝটপটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অনেক জোয়ান পাখিরা। কিন্তু এক কণা খাবার জোগাড় করে আনতে পারে নি কেউ। বিশ্বব্যাপী সেই তরল পাথরের ওপর তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরেছিল। একটি গাছের ডগাও তারা দেখতে পায়নি। ওপরে আকাশের বায়বীয় পাথরের চাঁদোয়া। নীচে জলীয় পাথরের গভীর গভীর গভীর আস্তরণ। মাটি নেই, গাছ নেই, খাদ্য নেই। চিকুখু ধীরে ধীরে পাথর হয়ে গেল। তার চোখ দুটো ঐ ভাবে চেয়ে চেয়ে শীতল হয়ে গেল। সবাই ডানা ঝটপটিয়ে হাহাকার করে উঠলো। বুড়ী ককিয়ে ওঠেঃ 'এইবার? এইবার?' বুড়ো বলে, 'সবাইকে চিকুখুর মতো মরতে হবে।' না, না, না। কিন্তু কী করবে? বুড়ো বলে, 'বেরিয়ে পড়। যত দিন না ডাঙ্গা পাস্, গাছ পাস্, খাবার পাস্, ততদিন ফিরবি না। চিকুখুর মড়া শরীরটা ছুঁয়ে তোরা বল, আজ বেরিয়ে পড়।'

'চিকুখু, তুই আমাদের বড় আদরের ছিলি রে। তোকে ছুঁয়ে বলছি—'

এক ঝাঁক পাখি বেরিয়ে পড়ে। দুরন্ত একদল সৈনিক। তীরের মতো ছুটছে তারা। প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুকে কাছে আনছে। দূর, দূর, দূর। অতি দূর। কত দূরে তারা এসেছে হিসেব নেই। হিসেব রাখবার মতো গাছের নিশেন নেই। কিন্তু নীচের তরল গভীর পাথরেরও শেষ নেই। অতল মৃত্যুর মত নিথর হয়ে পড়ে আছে। মৃত্যু সারাটা জগতে ব্যাপ্ত। নীরব অমোঘ তার আহ্বান। কয়েক জন বলে, 'আমাদের ডানা আর নড়তে চাইছে না। আমরা ফিরে যাই।'

'প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলি ডাঙ্গায় খবর নিয়ে ফিরবি। নইলে—'

'পৃথিবীতে ডাঙ্গা না থাকলে আমরা কী করব? যে গাছ থেকে আমরা এসেছি সেটা উঁচু টিলায়। ওখানেই হয়তো ডাঙ্গা জেগে উঠেছে। আমরা জীবন-ডাঙ্গা ছেড়ে দূরে মৃত্যুর পাথরে মাথা কুটে মরতে পারবো না। আমরা ফিরে যাই।'

'বড়কা, তোরা ভাল থাকিস।' বলে মাজলা আর ছোটকু।

বড়কা তার দলবল নিয়ে নিয়ে ফিরে যায়। বুড়ো তাদের কিছু শুধোয় না। তার চোখ শীতল হতে সুরু করেছে—চিকৃখুর মতো। সে বোঝে সবই। তার প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। মাজলা আর ছোটকুর কী হোলো? কী হবে? যারা ফিরে এলো, তাদেরই বা কী হবে? বুড়ীর চোখে জল আর থামে না।

মাজলা আর ছোটকু ছুটছে বাতাস চিরে। ডানাগুলো ভারী হচ্ছে। হয়তো জীবনের খোঁজে মৃত্যুর দিকেই তারা চলেছে। তবু কী করে বোঝা যাবে—কোথায় জীবন আর কোথায় মৃত্যু। ফেরার পথও তো মৃত্যু-বিছানো। তবে কি এই জগতে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই? মাজলা বলে, 'মরলে নিজেদের মধ্যে মরবো। আঘাটায় মরব না।'

ছোটকু বলে, 'মনে হচ্ছে, সামনে ডাঙ্গা পাব। চমৎকার রোদ উঠেছে এখানে। জলে চুমুক দেবে ঐ সূর্যটা। দিচ্ছে।' মাজলার দল কিন্তু আর ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।

ছোটকুর দল বলে, 'ফিরলে অবধারিত মৃত্যু। এগোলে তবু বাঁচতে পারি।'

'বাঁচার আর কোন উপায় নেই।'

হঠাৎ ছোটকু চেঁচিয়ে ওঠে: 'ঐ দ্যাখো। ঐ দূরে কী চিকচিক করছে।'

ডানায় সবার একটু জোর আসে। হ্যাঁ, গাছের একটা ডাল জলের

পাথরের ওপর ভাসছে। ডালের পাতাগুলো সবুজ, তাজা। তাহলে তো কাছেই কোথাও ডাঙ্গা আছে। কিংবা অনেক দূর থেকে ভেসে আসা এ এক সবুজ মরীচিকা? ছোটকু কিছু শুনছে না। শুধু দু ডানায় দুশো ডানার শক্তি নিয়ে ছুটছে। এতদিনে ডাঙ্গার একটা ইশারা পাওয়া গেছে। সেই হাতছানিকে যদিও মাজলা বলে নিশির ডাক, তবু ছোটকু থামে না। মাজলা বলে, 'বড়কা এতক্ষণ আমাদের পুরনো গাছে সবার সঙ্গে কী সুখের জীবন কাটাচ্ছে। ওখানেও সূর্য জল শুকোচ্ছে। ওখানেও ডাঙ্গা মাথা চারা দিচ্ছে। ওখানেও গাছ, ওখানেও খাদ্য, ওখানেও নতুন জীবন।

ও কী? ঐ যে দূরে ঝাপসা একটা ডাল, ভাসছে না। খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। গাছ। নীচে ডাঙ্গা আছে নিশ্চয়ই। ঐ ডালে গা এলিয়ে দিয়ে ওরা বড় শান্তি পায়। গাছ তার মুকুল থেকে কিছু খাদ্যও দিয়েছে। কিন্তু ঐ একটি মাত্র ডাল ছাড়া চারদিকে ধূ ধূ।

মাজলা বলে, 'তাহলে ফিরি। খবর দিই বাপকে, মাকে। তারা কত ভাবছে। বেঁচে আছে কিনা কে জানে এত দিন।'

ছোটকু বলে, 'ঠিক কথা। যাও। তবে দেরী কোরো না। ঠোঁটে করে যতটা পারো খাবার নিয়ে যাও। সকালের আগে এইখানে ফিরে এসো, সকালে আবার আমরা আরো পুবে যাব। এখানে এইটুকুতে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না।'

'আর এগোবার কী দরকার? এখানেই তো ডাঙ্গা আরো জাগবে। টেনেটুনে আমাদের চলে যাবে!'

'না জীবনে—সারাটা জীবনে—এত টান সয় না। আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। সকালে খানিকক্ষণ তোমাদের জন্যে বসে থাকবো, তোমরা না এলে আমরা একারাই এগিয়ে যাব। সেখানেও তোমরা আমাদের ধরতে পারো ইচ্ছে করলে। আমরা যাব পুবের দিকে।'

'বুড়ো বাবা-মাকে ফেলে আবার আমরা ফিরে আসবো? বরং সবাই ফিরে চল ওখানে। সবাই এক সঙ্গে থাকবো।'

'বাবা কী বলেছে মনে আছে তো। ডাঙ্গা না পেলে ফিরবে না।'

'ডাঙ্গা তো পেয়েছি।'

'এর নাম ডাঙ্গা!'

মাজলা ফিরে যায় বুড়ো-বুড়ীর গাছে। সকাল হয়, রোদ জলের পাথরে শুয়ে আছে। না, মাজলা ফেরে না। তাহলে এখন ছোটকু কী করবে।'

ফিরে যাবে বুড়ো বাবা-মার কাছে? ওখানে সবার দেখাশুনোরও তো দায়িত্ব আছে তার। কিন্তু দায় কি শুধু পূর্বপুরুষের জন্যে? উত্তরপুরুষের জন্যে একটা উঁচু সবুজ ডাঙ্গা খুঁজে দিয়ে যেতে হবে না?

ছোটকুরা সবে ডানা মেলেছে, এমন সময় দেখা যায়। মাজলা আসছে। বড় আনন্দ হয় ছোটকুর। মাজলাকে সঙ্গে পেলে বড় ভাল লাগবে তার। মাজলা তার অনেক দিনের সঙ্গী—সেই শৈশব থেকে।

কিন্তু মাজলা উলটো কথা বলে, 'চল ফিরে যাই। বাবা-মা তোমায় দেখতে চাইছেন। কোন রকমে আধপেটাও কি আর জুটবে না? রোদ উঠেছে। জল নামছে। ওখানেও ডাঙ্গা দেখা দেবে। আরো বেশি করে। আর এগোলে বিপদ আছে। ফেরবার জোর থাকবে না ডানার। এখনই ডানা প্রায় অবশ।'

ছোটকুর ডানা অবশ বোধ করে না। রাতে চমৎকার ঘুম হয়েছে। এখন বেশ তাজা লাগছে। আকাশের শেষ প্রান্তটা দেখে আসতে তার ইচ্ছে হচ্ছে। তাহলে এখানেই বিচ্ছেদ মাজলার সঙ্গে? সে আর এগোতে চায় না। সে ফিরে যাবে তার পুরনো কোটরে। মাজলাকে বিদায় দেবার সময় ছোটকুর চোখে জল এসে যায়। অনেক দিন তারা একসঙ্গে উড়েছে মৃত্যুর ওপর দিয়ে।

এবার বিদায় নেবার পালা। এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি মুন্নু। সে ছোটকুর প্রাণের বন্ধু। মুন্নু কি করবে? মুন্নু বড় ক্লান্ত। তবু। বলল, "আমি ছোটকুর সঙ্গে এগিয়ে যাব।'

মাজলা যায় পশ্চিমের দিকে। ছোটকু আর মুন্নু পুবের দিকে যায়। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক চলবার পর মুন্নুর শ্বাসকষ্ট সুরু হয়। কাছেপিঠে কোথায় গাছ নেই, ডাঙ্গা নেই। বসবে কোথায়? সামনে কোথায়—কী আছে সম্পূর্ণ অজানা। পেছনে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক উড়লে বসবার জায়গা পাওয়া যাবে। কিন্তু তা মুন্নু পারবে না। ছোটকু বলে, 'মুন্নু তুই আমার ঘাড়ে আয়।'

'না, তাতে দুজনেই মরবো। আমার ওজনে তুই মরবি।'

'মরবো না। এখনও আমার ডানায় জোর আছে।'

মুন্নু আর পারছিলও না। ছোটকুর ঘাড়ে চাপে সে। হঠাৎ ছোটকু বুঝতে পারে তার ঘাড়ে এত জোর আর অবশিষ্ট নেই। সে ভাল করে উড়তে পারছে না। তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা করে যায়। কিন্তু গতি নেই বিশেষ তার। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তেই ভারবাহী ছোটকু পৃথিবী-ব্যাপ্ত সমুদ্রের কাছে নেমে যাচ্ছে। যেন শূন্যের আকাশ তার ওপরে ক্রমাগত ওজন চাপিয়ে চলেছে।

দুজনে একসঙ্গে সলিল-সমাধির দিকে ছুটে নামছে। দুজনেই মরবে তারা একসঙ্গে? অথবা—

অথবা অন্য চিন্তা-টা যে মনে আনাও পাপ। ছেড়ে দেবে মুন্নুকে? ওকে নামিয়ে দিয়ে, অর্থাৎ মৃত্যু-সলিলে ফেলে দিয়ে নিজে বাঁচবে! কিন্তু বিশ্বস্ত মুন্নু। শেষ পর্যন্ত সে ছোটকুর সঙ্গে নব দিগন্ত আবিষ্কারে, অগ্রণী থেকেছে। অনেকে ফিরে গেছে। মুন্নু ফেরার নামও করেনি। তলা থেকে অতল জলের অতি গভীর স্থিরমৃত্যু নিকটে—খুব নিকটে। ছোটকু, নিজে বাঁচো। দুজনকে বাঁচানো সম্ভব নয়। মুন্নু মরবেই। তার মরা কেউ ঠেকাতে পারবে না। ছোটকুর অকারণ সহমরণ অর্থহীন, ঝপাস্। তরল মৃত্যু ওদের দশ হাতে আলিঙ্গন করছে। না, নিথর নয় জলরাশি। দশ দিক থেকে এগিয়ে আসে তার অসংখ্য বাহু। ওরা দুজনে ডুবছে, আবার একটুখানি ভাসছে। মুন্নু বলে, 'আমায় ছেড়ে তুই বাঁচ।' ছোটকুরও দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এখন নিজেকে বাঁচাতেই হবে। মুন্নর হাত থেকে নিজেকে এবার মুক্ত করতে হবে নিজেকে। হঠাৎ দেখে মুন্নু তাকে জোরে চেপে ধরেছে। মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ চেষ্টা। এখন আর অন্য কোনো চিন্তা নেই তার। শুধু বাঁচা, একটু বাতাস শুধু। আঁকড়ে কামড়ে ধরেছে সে ছোটকুকে। ছোটকু প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে। পারছে না; একটা হাত ছাড়ায় তো অন্যটা চেপে ধরে মুন্নু। হঠাৎ যেন দুই বন্ধু দুই শত্রুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ছোটকু একাই বাঁচতে চায়, মুন্নুকে ছেড়ে দিতে চায় তার অবধারিত মৃত্যুর অতলে। নইলে সে বাঁচবে না। আর মুন্নুর শেষ সম্বল এখন ছোটকু। সে ছাড়বে না তাকে। ছাড়া মানেই মৃত্যু। কঠিন—মৃত্যুর মতো কঠিন এখন তার আলিঙ্গন। সে-বন্ধন কিছুতেই কাটাতে পারে না ছোটকু। হঠাৎ ঠোঁট দিয়ে মুন্নুর চোখ ঠোকরায় সে। তীক্ষ্ণ কঠিন ঠোঁট বিঁধে দেয়। মুন্নুর রক্ত—সামান্য রক্ত অসীম মৃত্যুসাগরে মিশে যায়। রক্তের বহমান ঘন পর্দার মধ্য দিয়ে একবার, শুধু একবার, তাকাতে চেষ্টা করে সে ছোটকুর দিকে! কী রক্তাক্ত দেখায় ছোটকুকে। ছোটকু মুক্ত। মুন্নু মুহূর্তে তলিয়ে যায়, ভেসে যায়, মুছে যায়। ছোটকু কেঁদে ওঠে। 'মুন্নু। মুন্নু।' মুন্নুকে জলের মধ্যে খুঁজে আর লাভ নেই। এইভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ! মরে গেলেও হয়। হঠাৎ দেখে পাশ দিয়ে একটা সবুজ পল্লবিত শাখা ভেসে চলেছে। তাহলে কি কাছে কোথাও ডাল ডাঙ্গা আছে? ডানা দুটো বাতাসে চাপ দেয় জোরে। মুন্নু বিদায়, বিশ্বা

কর তোকে আমি খুন করি নি। এ আমার—আমাদের বাঁচার চেষ্টা। সেই সংগ্রাম সফল করেই আমি তোর মৃত্যুর ঋণ শোধ করব। কাঁদার সময় নেই, ডানা ঝেড়ে জল ঝরিয়ে নেয়। হাল্কা লাগে শরীর। মনের ভার-টা কাটাবার জন্যে ছুটতে থাকে সে পুবে। প্রখর সূর্য, মেঘকে কেটে ফালা ফালা করে ফেলেছে। তার তীক্ষ্ণ ফলা বিদ্ধ করছে জলের অনড় পাথরটাকে। রোদ লেগেছে ডানায়। ডানা দুটো রোদ নিয়ে খেলছে। খেলতে খেলতে কত দূরে ছোটকু এসেছে সে জানে না, এক সময় হঠাৎ খেয়াল হয় সূর্য চলে গেছে পশ্চিম আকাশে, রোদের তেজ কমেছে। এখন একটা ডাঙা চাই। অন্ধকার পুরো ঘনাবার আগে ডাঙা পাবে তো?' সূর্যের অস্ত-আভা রক্তিম হয়ে আসে। ঐ তো একটা গাছের চূড়া। শুধু চূড়া কেন, অনেক ডালপালা। আঃ! বড় সুন্দর জায়গা। সবাইকে এখানে আনতে হবে। কিন্তু রাতের আঁধার নেমেছে। এখন যাওয়া যাবে না অত দূর। একটু বিশ্রামও চাইছে শরীরটা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে, বুড়ো বুড়ী থেকে শিশুরা সকলে এইখানে এসে কলরব করছে।

ঘুম যখন ভাঙে, তখন ভাবে নিয়ে আসবে সবাইকে। এই সুন্দর জায়গাটায়, কিন্তু পূবের সূর্যের হাতছানি দেখে ও। স্পষ্ট অনুভব করতে পারে, আরো এগোলে আরো সুন্দর জায়গা পাওয়া যাবে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে—রোদের ঝলমল। ছোটকু উড়তে সুরু করে। আজই সে শেষ করবে তার এই যাত্রা। আজ সন্ধ্যায় যেখানে থামবে, সেটাই হবে তার শেষ দেশ। পৌঁছেও যায়, কিন্তু রাতে আর পিছু ফিরতে ইচ্ছা করে না। ক্লান্ত থাকে। তাছাড়া নতুন পাখিদের সঙ্গে আলাপ হয়। তারা বলে, আরো পুবে আরো সুন্দর দেশ আছে, সবাই যাই চল। একসঙ্গে। কিন্তু আমার বাড়ী ফেরা। পরে হবে। বাড়ী তো রইলই। এখন তো সব জায়গা থেকেই জল নেমেছে। তারাও সুখে আছে। খাবার পাচ্ছে। কোটরে আশ্রয় পাচ্ছে। পরে ফিরলে ক্ষতি কী। রাতে বিশ্রাম পরে আরো সবুজের দিকে পূবে যাত্রা করে ওরা। প্রতিদিনই ওরা এগিয়ে চলে। একদিন চলা বা ওড়া একটু কম হলে মনে বড় অশান্তি দেখা দেয়। মাঝে মাঝে ওর মনে পড়ে ওর সেই কোটরের কথা। বাসার কথা। বুড়ো, বুড়ী, চিক্‌খু, মুন্নু, বড়কা, মাজলা। আর একজনের কথাও মনে পড়ে। ফিন্‌কি। লাল টুকটুকে দেখতে ছিল পাখিটা। বড় ভাল লাগতো এই কিশোরীটিকে। বিনা ডাকে, বিনা ইশারায় দুজনে দুজনের ভাষা বুঝতো। সেই ভাষা যেন এখন বড় দূর

মনে হয়। প্লাবনে কাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। কোন্ স্রোতে ভাসলো কে? আজ আর ফেরার পথ নেই। কী করে ফিরবে? কোথায় ফিরবে? সে-পথ তো আজ বহু দিন ভুলে গেছে। ফিন্‌কিও হয়তো আর তেমন নেই। তবু তাকে মনে পড়লে ছোটকুর রক্তটা উজানে বইতে চায়। এই বেদনার মধ্যে মনে হয়, ফিন্‌কি খুব ভাল, কিন্তু সেও হয়তো শিকলি পরাতো পায়। নতুন দিগন্তের দরজা খোলাই হোতো না। প্লাবনের সময় ঐ কোটরের মধ্যে জল ঢুকতো, বা আধার পাওয়া যেত না। মরতে হোতো। না বাঁচলে কোটরগত হয়ে বাঁচতে হোতো। তবু এক এক সময় ফিন্‌কির কথা ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। ফিন্‌কি, ফিন্‌কি, ফিন্‌কি। নামটাও সুন্দর। অথবা নামের সঙ্গে সুন্দর পাখিটাকে মনে পড়ে তাই নাম সুন্দর লাগে।

কতদিন হোলো প্লাবন চলে গেছে। জল সরে গেছে। ভাঙাচোরা মৃত এক অবস্থা থেকে আবার সুরু করে বুড়ো বুড়ী। ছেলেমেয়েগুলো হিসেবী, আছে, গুছোনো আছে। কঠিন দিন একটি একটি করে পার হয়েছে ওরা। বড়কা, মাজলা সুখে আছে। ঘরের সুখ বলে কথা। বড় নিশ্চিত। বড় নিরাপদ। হোক দিগন্ত ছোট, হোক গরীব আধার। প্লাবনের দিনগুলির কথা লোকে ভুলতে আরম্ভ করেছে। শুধু বুড়ো বুড়ী ভোলে নি। সে-সব বড় কঠিন দিন ছিল। ভাবলেও তাদের ভয় লাগে। ছানা-পোনাগুলোকে বুকের কাছে আগলে রাখে।

বুড়ী বলে, 'চিক্‌খুর কথা মনে পড়ে?'

'চিক্‌খু। পড়ে। খুব পড়ে।'

'মুনুটার যে কী হোলো? ফিরলো না তো আর।'

'বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে।'

'ছি ছি! ও কী কথা! কোনো কথা আর তোমার মুখে আটকায় না।'

'থাক, তবে বেঁচেই থাক। আমার ঘরে না থাক! তবু বেঁচে থাক।

'যার ঘরেই থাক, বেঁচে আছে আমি জানি।' বলে বুড়ী।

'কী করে জানো?'

স্বপ্ন দেখি তাকে।'

'আর একজন?' যেন ভয়ে ভয়ে বলে বুড়ো। 'ছোটকু।'

'তাকেও স্বপ্ন দেখি। দেখি ফিন্‌কি আর ছোটকু ঘর আলো করে আছে।'

বাচ্চারা মাঝে মাঝে তাদের বুড়ি ঠাকুমাকে ধরে 'গল্প বল।'

বুড়ি বলে, 'এক ছিল বুড়ো, আর এক ছিল বুড়ি। তাদের অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। এক মহাপ্লাবনের সময়ে সবাই বেরিয়েছিল আধারের খোঁজে।'

'তারপর। তারপর?'

'একে একে সবাই ফিরে এলো মুখে খুদকুড়ো কিছু নিয়ে। এলো না ছোটকু মুন্নু এদের দল।'

'কী হোলো? কী হোলো ওদের, ঠাকুমা?'

'ওদের "আরো"য় ধরেছিল।'

'আরো কি ঠাকুমা? আরো কী?'

'আরো ভাল, আরো সুন্দর, আরো বড়—এই রকম সব থায়। আর ছোটে।'

'তারপর? ছুটে ছুটে ঘরে যায়?'

'না না।' বুড়ি চোখের জল মোছে। 'ওরা কোন দিন মরে না। ওরা চিরকাল বেঁচে থাকে। চিরকাল। নতুন আকাশের তলায়, নতুন ডালে। পাখিদের পরাণে, তাদের চোখের জলে।

'ঠাকুমা, তোমার চোখে জল কেন?'

'ঐখানে ওরা সব বেঁচে আছে।'

'আমরাও বাঁচবো ঠাকুমা। আমরাও বাঁচবো। বাঁচবো না ঠাকুমা?'

'বাঁচবি। নিশ্চয়ই বাঁচবি।'

'আমরাও ওদের মতো পরে বাঁচবো।'

বুড়ির গলা চোখের জলে বুঁজে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ওরে, তোরাও বাঁচবি! তোরাও—? তোদেরও "আরো" রোগে ধরলো?'

'আমরাও ঠাকুমা, আমরাও।'

'তোরাও?' বুড়ির চোখের জলে প্লাবন নামে। 'তোরাও? তোরাও?'

'আরো বল, ঠাকুমা। আরো বল।'

'আরো?'

ক্রীং

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

শ্রাবণের আকাশ যেন অবিকল অশ্রুসিক্ত চোখের মত। এই খানিক আগে উপুড়ঝান্তি ঢল হয়ে গেল। ভারমুক্ত আকাশ জুড়ে তবু কৃষ্ণসঞ্চয় এখনও। যদিও মধ্যাহ্ন এখন, চরাচর জুড়ে তবু সায়াহ্নের নিবিড়তা।

বাইরের বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছিলেন রমাপ্রসন্ন। এখান থেকে অনেক দূর অব্দি চোখ পেতে রাখা যায়। কলোনির পুব প্রান্তে তার এই বাড়ি, 'প্রান্তিক'। তারপর খানিকটা নাবাল জমি, রেলপথ, বিস্তৃত ঝিল, ওপারে ঘন নীলের একটি অসমান রেখা।

বৃষ্টি দেখতে দেখতে, সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দেয়, আড়াল করে দেয়, বিস্মৃতি যেন স্মৃতিকে ঢেকে দেয়। ঘন নীলের ওপর কুয়াশা জমে। ঝিল জুড়ে টাপুরটুপুর ঝম্‌ঝম্ শ্রাবণ। রেল লাইন থেকে বৃষ্টিপাতের ধাতব শব্দ বাজে। টেলিগ্রাফের সংবাদবহ তারে বসে সিক্ত হয় চড়াই দম্পতি জবুথবু।

বৃষ্টি এখনও টানে রমাপ্রসন্নকে। এখনও, এই উন-সত্তরেও। কিন্তু এমনি করে বসে থাকতে দেখলে শোভা উতলা হয়ে ওঠেন আজকাল। ভেতরে যাওয়ার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করেন। যেন ওই রেলপথ, ওই ঝিল দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেই স্বস্তি—

এ-কথা অবিশ্যি মানেন রমাপ্রসন্ন যে, সব স্মৃতি ধরে রাখা যায় না, ধরে রাখবার নয়ও হয়তো। সময় অনেক কিছুকে অস্পষ্ট করে দেয়, বড় প্রবল তার পরিপাক ক্রিয়া, বড়ই গ্রহণক্ষম তার জঠর। তবু সব কিছু কী জীর্ণ হয়, জীর্ণ হবার—

একটা ধাতব ধ্বনির সূত্র ধরেই তার চোখ গেটের কাছে চলে গেল অভ্যেশমত। তিন জন যুবক, গেটের ওপারে। চোখাচোখি হতেই একজন বলল, আসব ?

হয়তো প্রত্যাশার বেশি সময় নিয়েছিলেন, হয়তো তার মুখে দ্বিধার পরিচিত রেখাগুলো পড়ে নিতে পেরেছিল তারা। তাই হয়তো, উত্তর দিতে গিয়ে দেখলেন, গেট পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এল তারা।

আমরা কলকাতা থেকে আসছি।—যে বলল দাড়ি-গোঁফের আড়ালে

আসল মুখখানা লুকনো তার। কথাকটি বলেই হাসল সে, মুখের অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকালো যেন।

কথা বলার অবকাশ পেলেন না রমাপ্রসন্ন। তার আগেই পর্দা ঠেলে শোভা বেরিয়ে এলেন, কোন ভূমিকা না করেই বললেন, আমরা কিছু জানিনে। আসুন আপনারা।

রমাপ্রসন্নকে বিব্রত দেখাল। চোখ মেঝেতে রাখলেন তিনি। ঠিক যে রাখলেন তা নয়, নেমে এল আপনা থেকেই।

কিন্তু শোভার কথার দৃশ্যতে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না যেন তাদের। তিনটি মুখেই স্মিত হাসি ছড়ায়। সামনের ছেলেটি বলে, শুভব্রত আপনাদের কথা বলেছে। ও নিজেও আসত। কিন্তু জরুরী একটা কাজে আটকা পড়ে গেল।

মাসিমা, জল খাব।

তাকাতেই দেখলেন, তিনজনের ভেতর কনিষ্ঠতমটি চেয়ে রয়েছে তার দিকে। খুবই ছেলেমানুষ, কচি কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। এ-বয়সে এ-সব বিপজ্জনক কাজে আসা কেন! মনে মনে যেন শাসন করতে চাইলেন। বললেন, বসো তোমরা। বলেই, ভেতরে চলে গেলেন।

অস্বস্তিটা কেটে যায়। বলেন, বসো।

দেয়াল-লাগোয়া বেঞ্চে তিনজনাই বসে। তিনজনাই গড়নই দীর্ঘ, তিনজনার পরনেই প্যান্ট-শার্ট, কাঁধে ঝোলা।

শুভকে নিয়েই কথা এগোয়। যে-ছেলেটির কাঁধে খয়েরি রঙের ঢাকনাদেয়া ব্যাগ, যার মুখ জুড়ে দাড়ি-গোঁফ, মাথা বেয়ে ঘন চুলের ঢল নেমে এসেছে, কথাবার্তায় শান্ত প্রত্যয়, সব কথাই যার শেষ হয় মিষ্টি হাসিতে, সে একসময় বলে, রবীন্দ্রসাহিত্যে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনেছি আমরা।

শুভর কাছে তো?

তিনজনই মাথা নাড়ে।

ওটা ওর মাপের কথাই হয়েছে—

তিনজনাই হেসে ফেলে।

শোভা এলেন ট্রেতে তিনখানা গ্লাস নিয়ে। নিজেই তুলে দিলেন হাতে হাতে। চুমুক দিয়েই কনিষ্ঠতম কলকল করে উঠল, সরবত, ব্বাঃ, ফাইন, মাসিমা।

সরবত, না, মাসিমা—ফাইন কোনটা?—মুচকি হেসে তার দিকে তাকালেন শোভা।

ভুটোই। না, মাসিমা ফাইনেস্ট। কী গো, ইংরেজিটা ঠিক হলো তো?—বলে, পাশের ছেলেটির মুখে তাকাল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলবৎ হলো। মাসিমা বলে কথা, আর তুই যখন সার্টিফিকেট দিচ্ছিস।—তার চশমার অভ্যন্তরে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল।

কী নাম তোমার?

আমার?—যেন যাচাই করে নেয়। শোভা মাথা নাড়তেই বলে, খুব ভারি একখানা নাম—প্রত্যর্থী। মনে হচ্ছে, প্রতিবাদী, যে প্রতিবাদ করে।

ওটা ওর তোলা নাম, মাসিমা।—নিচু হয়ে ট্রেতে গ্লাস নামিয়ে রেখে দাড়ি-গোঁফের অন্ধকারে আলো ছড়িয়ে বয়স্ক ছেলেটি বলে, ওর আসল নাম হলো—

ভাল হচ্ছে না, মিহিরদা—প্রাত্যর্থী হৈ হৈ করে ওঠে।

দুষ্টু।

শোভা হাসেন, বলেন, এ নামটা তোমার সঙ্গে মানিয়ে যায়।

সবাই হেসে ওঠে, প্রত্যর্থী নিজেও।

তোমার নাম তো গেল মিহির। তোমার?—সব চাইতে লম্বা ছেলের দিকে তাকালেন রমাপ্রসন্ন।

সত্য—সত্যব্রত।

তোমার কথা বল।—বলে, ট্রে তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন শোভা।

শোভা বেরিয়ে যেতেই রমাপ্রসন্ন কেমন যেন এক বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, কত দিন বাদে এ-বাড়িতে বাড়তি গ্লাস নামানো হলো।

তার কণ্ঠস্বরের বিস্বাদ ছুঁয়ে যায় সবাইকে।

মিহিরই একসময় বলে, শুনেছি যে একজন মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে আপনাদের একঘরে করে দেয়া হয়েছে—

সবাই মুসলমান কথাটার ওপর জোর দিচ্ছ কেন, বুঝিনে।—এক গলা হতাশা নিয়ে তিনি বলে ওঠেন, একজন বিপন্ন মানুষ ছিল সে। মানুষ কথাটা হারিয়ে ফেলছি সবাই।

খানিকটা বুঝি অপ্রতিভ হয় মিহির। তবু, হাসিটা ধরে রেখেই বলে, স্বাভাবিক অবস্থায় যাকে মানুষ বলে জানি, অস্বাভাবিক অবস্থায় সে-ই হয়ে ওঠে মুসলমান কিংবা হিন্দু, বাঙালি অথবা হিন্দুস্থানী। তখন যিনি তাকে আশ্রয় দিতে পারেন, তাঁকে প্রণম্য বলে মানি। তাঁর শক্তিকে ভয় করি বলেই তাঁকে নিঃসঙ্গ করে দিতে চাই, একঘরে করে রাখি। সেদিনের সব কথা

জানতে চাই আমরা, সব কথা আসা উচিত। এ ক'দিন কিছু সাজানো কাহিনী শুনে শুনে তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছি আমরা। আপনি পারেন, আপনিই পারেন—

ঠিক তখনই, তিনটি যুবকের মনে হলো, যেন তাদের বুকের গভীর থেকে উঠে এল এক ধাতব শব্দলহরী, ক্রমশই তা ছড়িয়ে পড়ল দিগবিদিক, কাছে-ভিতের তাবৎ শূন্যতায় ঝঙ্কৃত হতে থাকল সেই ধ্বনিতরঙ্গ—ক্রীং ক্রীং ক্রীং···

গেটের মুখে তাকে দেখা গেল একসময়। সেখানেই সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে সে ভেতরে এল। রহস্যময় হাসি হেসে বলল, ডিসটার্ব করলাম?

প্রত্যর্থী প্রায় বলে উঠতে যাচ্ছিল, 'হ্যাঁ করলেন', কিন্তু তখনই রমাপ্রসন্নর মুখে চোখ পড়তেই নিজেকে সামলে নিল। সে-মুখ নীরক্ত এখন।

আমারই বলা উচিত ছিল।—মিহিরের দিকে চেয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, কাকাবাবুর কথা বলছি। ওঁর কথা আমারই বলা উচিত ছিল।—তারপর, যেন নিশ্চিন্ত নির্ভার হয়ে তেমনিভাবে বলল, যাক, ঠিক মানুষের কাছেই এসেছেন। আমি সবাইকেই বলি, বুঝলেন কাকাবাবু, যারা খবর নিতে আসছেন, যা জান, কিছু গোপন করবে না। কত দূর থেকে আসছেন সবাই। যেমন এরা এসেছেন। কাকাবাবুকে জিগ্‌গেশ করুন, মিলিয়ে নেবেন। এখানে কোন রেলগাড়ি থামানো হয় নি, খুনোখুনির তো কথাই ওঠে না। এ-সব হলে তো আর কাকাবাবুর চোখ এড়াতে পারে না, বলুন? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা রেকর্ড আছে, মশাই, আমাদের। সেটা কালিমালিপ্ত করার একটা চক্রান্ত চলছে জানবেন, হ্যাঁ।

কাদের?

এ্যা—

চশমার ভেতর দিয়ে খুব গভীর করে তাকিয়ে প্রশ্নটাকে আর একটু প্রসারিত করে সত্যব্রত, চক্রান্তটা করছে কারা?

প্রশ্নটা শুনে কতোক্ষণ তো-তো করল সে। চোখেমুখে রক্ত ছড়াল তার। ভেতর থেকে একটানা ক্রুদ্ধ গ-র-র আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল। একসময় ফেটে পড়ল সে, এ্যাদ্দিন ধরে ঘোরাঘুরি করছেন, আর কারা চক্রান্ত করছে ধরতে পারেন নি। আপনাদের সম্পর্কে তা হলে তো অন্য কিছু ভাবতে হয়।

মিহির খুব শান্ত নিরুদ্‌বেগ কণ্ঠে বলল, ধরতে যে পারি নি তা নয়। তবে,

আপনার কাছ থেকে শোনার একটা আলাদা মূল্য আছে তো। আপনি হচ্ছেন এই সয়েলের লোক—শুধু লোক নন, একজন নেতা—

পরবর্তী কিছু সময় মোমের মত যেন গলতে থাকল সে। চোখেমুখে লাবণ্য ফিরে এল তার। উদ্‌গার তোলার মত করে হাসতে থাকল। শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিনয়ের ভাঁজ ফেলে বড়ই সঙ্কুচিতভাবে বলল, কুণ্ঠায় গলা বুজে এল তার, তা সার, হেঁ-হেঁ, বলছেন যখন—আসি, সার, একজন লিট্‌ল ফিস—হেঁ-হেঁ—তবে, সার, আপনি একজন অধ্যাপক, তাও কলকাতার কলেজের, বলছেন যখন, হেঁ-হেঁ—ঠিকই ধরেছেন, সার। চক্রান্ত করছে ওই মৌলবাদীরাই। আচ্ছা সার, ওই গন্ধের কথাটা জিগ্‌গেস করলেন না তো! ওটি বলার জন্যই ছুটে আসা।

গন্ধ!—বুঝি অবাকই হলো মিহির। সত্যব্রত প্রত্যর্থীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মনে পড়ল, একজন সাংবাদিক বন্ধু গন্ধের একটা কথা বলেছিল বটে। গন্ধ নয়, দুর্গন্ধ—ঝিলের বাতাস ভারি হয়ে ছিল দুর্গন্ধে।

এখন পাচ্ছেন না তো? আপনাদের আগে যারাই এসেছেন সবাই পেয়েছেন। হয়েছিল কী জানেন, ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যাঙ নিয়ে এসেছিল ওরা, মুসলমানরা।

সত্যব্রতর চোখদুটো ছোট হয়ে এল। কপালে গভীর দুটি রেখা এঁকে সে তার দিকে চেয়ে রইল নির্নিমিখ।

প্রত্যর্থীর গলা এমনিতেই ভারি। ইচ্ছে করলে সে তা আরও ভারি করে নিতে পারে। সে কেশে উঠতেই তার পূর্বাভাস পেল মিহির।

ওরা তো সব মিটিং-এ এসেছিলেন। হয়তো নমাজ পড়তেই। তা ওরা ঝুড়ি ঝুড়ি ব্যাঙ নিয়ে আসতে যাবেন কেন!

মনে হলো, প্রত্যর্থীর কণ্ঠ যেন খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে। যখন কথা বলল, বোঝা গেল, বিনয়ের ঝোঁকটা তখনও কাটেনি। এক মুখ হাসি ছড়াল, ব্যাঙের একটা এক্‌সপোর্ট ভ্যালু রয়েছে, সার। সেটি ভুললে চলবে না। ফ্রগ্‌স লেগের বিদেশে খুব চাহিদা।

কিছু একটা বলতে গিয়েছিল প্রত্যর্থী, চোখ নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল মিহির। সত্যব্রতর দিকে চেয়ে প্রত্যর্থীর মনে হলো, হাসির একটা দমকা হাওয়া কণ্ঠা অব্দি এসে আটকে রয়েছে তার। আভ্যন্তর সেই চাপেই বুঝি মণ্ডি জোড়া তিরতির করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একমাত্র অবিচল, অন্তত দেখে তাই মনে হচ্ছে। প্রত্যর্থীর মনে হয়, এই সব মুহূর্তে দাড়ি-গোঁফের

একটা বাড়তি সুবিধে থাকে যেন। মুখের অনেক কিছু তা আড়াল করে দিতে পারে। আর বড়ই নির্বিকার রমাপ্রসন্ন। কিছু হয়তো শুনছেনই না।

তো, তখন ফিরছে তারা। ট্রেনটা ঝিলের ধারে হঠাৎ থেমে পড়ে। তখন, মিথ্যে বলব না সার, কিছু দুষ্টু ছেলে, খান পাঁচেক ইট ছোঁড়ে ট্রেনে। আর ওরা প্যানিকি হয়ে ঝপঝপ সেই ব্যাঙের ঝুড়িগুলো ঝিলে ফেলতে থাকে। ফেলে দিয়ে তো গেলেন বাবুরা। এদিকে, সার, দুদিন যেতে না যেতেই সেই রাশি রাশি ব্যাঙ পচে ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠলে। কদিন যা দুর্গন্ধ গেছে! মনে হলেও গা ন্যাকাড় দেয় এখনও। বলুন, কাকাবাবু?

রমাপ্রসন্ন বাইরে চোখ ফেরালেন। প্রত্যর্থী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

হ্যা, যান। ঝিলটা ভাল করে দেখে আসুন। দেখুন, কোন লাশের সন্ধান পান কিনা—

লাশ!—যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল প্রত্যর্থী।—ব্যাঙের লাশ বলছেন?

হেব-হেব, অই হলো, হেব—

প্রত্যর্থী বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেলই না শুধু, সেই সঙ্গে নিশ্চুপ করে রেখে গেল তাকে। বেশ কিছুক্ষণ ঘুম ধরে রইল সে। অবশেষে, ঝিলের দিকে চোখ ফেরালো।

সেখানে তখন প্রত্যর্থী। বিশাল এই জলাধার যেন মুগ্ধ করে রেখেছে তাকে। নুয়ে পরে জলে হাত ডোবায়, ঢেউ কাটে, নিজের প্রতিচ্ছবির ভাঙাগড়া দেখে, হো হো করে ওঠে।

ঘরে ভেতর তখন সত্যব্রত তাকে বলে, সত্যি, কেমন সাজিয়ে কথা বলতে পারেন আপনি! সবাই পারে না। নেতারা পারেন, পারতে হয়। মানতেই হবে, এটা একটা গুণ—

হেব-হেব—

আপনি এক অভিজ্ঞতা হয়ে রইলেন আমাদের কাছে।

হেব-হেব, কিছু না, কিছু না। গ্রাম আর সেই আগের মত নেই, সার। আমার মত অনেককে পাবেন।—এরপর মিহিরের সামনে এসে দাঁড়ায়।—আমি এখন যাব, সার। ফিরে গিয়ে তো প্রেস কন্‌ফারেন্স করবেন? কাগজওলারা আপনাদের সংগঠনের খুব গুরুত্ব দেয়। সব জানি। আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন, সার।

নিশ্চয়ই রাখব।—মাথা কাত করে সায় দেয় মিহির।—আপনিই একমাত্র

লোক যিনি উপযাচক হয়ে কিছু খবর দিয়েছেন।—আপনার কথা মনে থাকবে।

আমাদের কিছু লুকোবার নেই জানবেন।

স্মিত হাসে মিহির।

চলি, সার। চলি, কাকাবাবু। সব কিছু খোলামেলা বলবেন। কষ্ট করে এ্যাদ্দুর এসেছেন এরা। চলি—

সাইকেলের ঘন্টি ক্রমশই দূরে সরে যায়।

আর ঠিকই তখনই ভেতর থেকে শোভা আসেন। গর্জন তেল মাজা দুর্গা প্রতিমার মত সারা মুখ জ্বলজ্বল করছিল তার। আঁচলে ঘাম গচ্ছিত রেখে দম-ফুরনো গলায় বললেন, গেছে—অফ্!

তখনই শব্দটা শোনা গেল। নৃত্যচঞ্চল ঘুঙুরের মত ঘুরে ঘুরে তা বাজতে থাকল—ক্রীং ক্রীং ক্রীং···

হাঁপাতে হাঁপাতে আসে প্রত্যর্থী। সে হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই রমাপ্রসন্ন বলে ওঠেন, বড্ড ঘেমে গিয়েছ। এখানটায় বসো। হাওয়া পাবে।

জেদী কিশোরীর মত মাথা ঝাঁকিয়ে শোভা যেন কোন সংকল্প বাণী পড়ে যান, খোকার কাছেই চলে যাব। কেন থাকব, কেন?

স্ত্রীর দিকে তাকালেন রমাপ্রসন্ন। কিন্তু তখনই কিছু বললেন না। সামলে নেয়ার সময় দিলেন হয়তো। শোভা মুখ মুছলেন, স্বামীর দিকে তাকালেন কিছু শুনবেন বলে যেন।

খুব মৃদু কণ্ঠে, স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে, বললেন, তা তো যায়ই—

ওরা ভেবেছিল, আর হয়তো কিছু বলবেন উনি। সবকটি মুখ তাকে ছুঁয়ে রইল অনেকক্ষণ। এদিকে বাইরে বয়ে গেল সেই ধ্বনিপ্রবাহ অবিরাম—ক্রীং ক্রীং···

মিহিরই উঠে পড়ল একসময়। বলল, আমরা যাই এখন। বসে থেকে আপনাদের বিড়ম্বনা বাড়াতে চাইনে আর।

মিহিরের দিকে চেয়ে হাসলেন তিনি। সে-হাসিতে কোন গ্লানি ছিল না। তবু কথা বলতে কিছুটা সময় নিলেন···একেবারে কিছু না নিয়েই চলে যাবে, শূন্য হাতে!—স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালেন, শোভা সেই গানটা—

রেকর্ড প্লেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন শোভা।

উদগ্রীব হয়ে বসে রইল তারা, তিনজন। ঝিলের ওপর দিয়ে ছুটে আসে

হা-হা জলীয় বাতাস। জানালার পর্দা ফুলে ফুলে ওঠে, ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকেন ফ্রেমবন্দী রবীন্দ্র ঠাকুর। দুরন্ত সেই বাতাসে পাক খায় ক্রীং-ক্রীং হুঙ্কার রণধ্বনির মত।

সহসা ঘরের ভেতর বেজে ওঠেন মহার্ঘ রবীন্দ্র মোহর। মুহূর্তেই শান্ত চারপাশ। সব ধ্বনি এই রাজ্যধ্বনিকে পথ ছেড়ে দেয়। চরাচর জুড়ে ক্রমশঃ তা ছড়িয়ে পড়ে যেন, বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি…

বড় রাস্তায় উঠতেই তাকে দেখতে পেল তারা। সাইকেলে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে আসতেই খুব চিন্তিত দেখাল। গভীর উৎকণ্ঠায় জিগ্‌গেস করে, নতুন কিছু পেলেন?

মৃদু হেসে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তারা।

ওদিকে তখন ঝিলের সামনে স্তব্ধ হয়ে রমাপ্রসন্ন। জলের গভীরে আকাশ দেখতে পান, মেঘের চলাচল, পাখার ওঠাপড়া। তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকেন।

একসময় বুক খুঁড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে আসে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে ওঠেন। খানিকটা পিছিয়ে আসেন। জল-তলের বিস্তৃত দৃশ্যটি ভেঙে যায়।

তখনই সেই গল্পটি মনে পড়ে। সেই যে, এক নাপিত রাজকে খেউরি করতে গিয়ে দেখে ফেলে রাজামশাইর এক কান কাটা। কথাটা কাউকে বলতে না পেরে ক্রমশই অস্থির হয়ে ওঠে সে। অবশেষে একদিন কাছাকাছি এক বনে চলে যায়। এক গাছের কাছে গোপন কথাটি বলে ভারমুক্ত হয়।

কিন্তু গাছ, শেষ পর্যন্ত, কথাটি গোপন রাখতে পারে নি।

অস্থির পায়ে জলাধার থেকে ক্রমশই দূরে সরে যেতে থাকেন তিনি। গলগল করে ঘামতে থাকেন। সারা শরীর যেন হৃৎপিণ্ড হয়ে বাজতে থাকে।

আর সেই সঙ্গে আকাশ-বাতাস জলাধার রণিত করে বেজে বেজে ওঠে সেই ধাতব হুঙ্কার—

সমুদ্রের নিলয়

আফসার আমেদ

গহর আলি আলেয়ার স্বামী। আলেয়ার বয়স এখনো কাঁচা। বছর আঠার হবে। গহর আলি তার বাপের বয়সী। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আলেয়া স্বামীকে স্বামী বলেই জানে। গহর আলির কাছেই আলেয়া এই বয়স পেয়েছে। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। যেন গহর আলির স্পর্শেই এই স্ফূর্তি। আজ চারবছর গহর আলি তাকে নিকে করেছে। দুটি পুত্র সন্তান তার গর্ভে জন্মেছে। গহর আলির প্রথম পক্ষ লালমন। আলেয়া বড়বুবু বলে ডাকে। তার চৌদ্দটা ছেলেমেয়ে। একা এত ছেলেমেয়ে আর এই সংসার চালাতে প্রাণপাত করতে হত বড়বুবুকে। আলেয়া এসে অনেক সুসার হয়েছে। এত ছেলেপুলেদের সামলানো, চাষবাসের নানা ঝক্কি ঝামেলা। তার পরেও আছে স্বামীর অবসাদে বিষাদে অবসরে বিশ্রামে ফরমাস খাটা, সেবায় লাগা। আলেয়া এলে চারদিকটা বেশ সামলে নেয়া যায়। এটা জানে আলেয়া। প্রথম প্রথম লালমন তার ওপর প্রতিহিংসার মনোভাব দেখিয়েছে। তারপর কেমন মানিয়ে নেয় তাকে বড়বুবু। মানিয়ে যায় আলেয়া।

গহর আলির বয়স এখনো পঞ্চাশ ছোঁয় নি। শক্তসমর্থ চেহারা। সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপে আটদশ বিঘে জমির সাম্রাজ্য গহর আলির। তার মধ্যে পুকুর বাগান ঘর বাকুল, আনাজবাড়ি। অসুরের মত খাটতে পারে গহর আলি। সারাক্ষণ চাষবাস আগান বাগানে ঘন মিশে থাকে। ছোট ছোট ঘর দালান দিয়ে টানা বাড়ি বানিয়েছে। বাকুলে রান্নার চালা, মুরগির দরমা। তারপরেই আনাজবাড়ি। চারধারে তাল খেজুরে ছাওয়া। এই পৌষে খেজুর গাছে রসের মিষ্টি গন্ধ। চারা নারকেল গাছেই কাঁদি কাঁদি নারকেল ফলেছে। একটা পেয়ারা গাছ। একটা নোনাফলের গাছ। কলাবাগান। বাবলার সারি জমির আলে, পুকুরের চারধারে। বাকুলের মাঝখানে ঢেঁকিঘর। ঢেঁকিতে পাড় দেবার সময় পেয়ারা গাছের একটা ডাল ধরা যায়। নোনাগাছে, পেয়ারাগাছে কতকগুলি পাখি আসে সকাল সন্ধে দুপুর। নানা তাদের রং, নানা গড়ন। নানা তাদের কথাবার্তা। এই সবের ভেতর আলেয়াকে গহর আলি অধিকৃত করেছে। সামনেই সমুদ্র।

বাতাসে অবিরত তার শব্দ বয়ে আনে। নোনা বাতাসে সিঁদরি পোকা উড়ে বেড়ায়। পাকা পেয়ারায় পাখি ঠুকরে যায়। ঢেঁকিতে চালের গন্ধ। গাছে গাছে খেজুর রস। এই সবের ভেতর থেকে ধরা পড়ে যায় আলেয়া গহরের হাতে। ধরাও দিয়েছে দ্বিধাহীন। গ্রীষ্মের কুমড়ো বাড়িতে, সন্ধ্যার আধো আঁধারে যখন সমুদ্র গর্জন করে। বাতাসের সাঁ সাঁ দ্বীপ জুড়ে থাকে। একটা নৌকোর মত দ্বীপটা যখন দুলতে থাকে। জোয়ার আসে। সাবাড়ের ঘাটের নৌকো নোঙর তোলে। ঢেউ আছড়ায় প্রলয়ের মত। বাপ-মা মরে যাওয়া আলেয়া, চাচির সংসারে থাকত। ছোটবেলা থেকেই এর-বাড়ি ওর-বাড়িতে ঢেঁকিতে আগানে-বাগানে খেটে নিজের পেট চালাত। গহর আলির কুমড়োবাড়িতে এসে আটকে যায়। গহর আলি কত সহজ স্বচ্ছন্দে তাকে অধিকৃত করে। আর এই এখানে গহরের আলেয়াকে প্রয়োজনও ছিল। আলেয়া জড়িয়ে যায় গহরের সংসারে। দুই সন্তানের জননী হয়েছে। গহরের সংসার ঘন জমাট। এমনভাবে সংসার পেতে রেখেছে গহর আলি, যে সেখানে আটকে না পড়ে উপায় ছিল না।

সন্ধের সময় কুমড়োবাড়ি থেকে সাঙাতের বাড়ি নিয়ে গিয়ে গহর তাকে নিকে করে, মোল্লা ডেকে। সেই রাত্তিরেই তাকে ঘরে নিয়ে আসে। বড়বুবু লালমনের সে কি জুলুম। একটা ঝাঁটা দিয়ে মারতে মারতে বার করে দিল। চাচির বাড়ি চিল্লিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেছে। পরদিন সেখান থেকে গহর আলি তার হাত ধরে নিয়ে আসে গহর আলির সংসারে।

সে সংসারেই এই চারবছর থেকে গেল। গহর আলি তাকে আশ্রয় দিল। বাদার দেশ। শীত বর্ষা, ঝড় ঝাপটায় এই দ্বীপটা মাঝে মাঝে দুলে ওঠে। নানা পোকামাকড়। সমুদ্রের চরে নানা ঝিনুক, সামুদ্রিক জীব। সমুদ্রের অবিরত গোঙানি বুকে এসে লাগে। আলেয়া এই গর্জনের ভিতরে শান্ত হয়ে থাকতে চেয়েছে। শান্ত হতে চেয়েছে গহরের বাহুতে বুকে। জীবনের স্বাদ তার ওপর চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। তার মধ্যেই তার থাকার অভ্যাস গড়ে উঠছে। গহর আলিকে বাদ দিয়ে গহরের এই সাম্রাজ্য অবান্তর। তার আকাঙ্ক্ষায় সে নিরুচ্চার। সংসারের প্রয়োজনে তার প্রয়োজন গহরের কাছে। কাদার তালের মত নীরব থাকে, সংসারের হাত তাকে প্রতিমা গড়ে, তাতেই শান্ত, তৃপ্ত থাকতে চেয়েছে। তাছাড়া, দ্বীপের সমুদ্র, চাষবাস, বর্ষাবাদল, পোকামাকড়, নোনা হাওয়া, নির্জনতা তাকে গহরের কেন্দ্রে সমর্পিত করতে চায়। এসবই গহরকে কেন্দ্র করে পরিধি।

তাই গহরের সংসারে আলেয়ার কোনো আপত্তি থাকে না। কারণ সে জানে তার নীরব স্বভাবের জন্যে গহর তাকে মনে রাখতে পারে। সমুদ্র নিশুতে গোঙায় যখন, শন শন এক হাওয়ার প্রবাহ থাকে চারধারে। হ্যারিকেনের কলে হাত ছুঁইয়ে নরম করে ফেললে আলোটা হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা তার ঘরের মধ্যে এক শান্ত শীতলতা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। বিছানায় বসে পা মেলে ধরে আরো নির্জন হয়ে ওঠে তখন আলেয়া। নাকের নাকছাবির টুকরো পাথর ঝিকমিক করে ওঠে। গহর এসে তার পিঠে হাত দেয়। সেই ছোঁয়ায় শরীরের কোনো প্রতিক্রিয়া জানতে দেয় না। ধীরে ধীরে সে সমর্পিত হয় গহরের মধ্যে।

এই ব্যবস্থা, পরিস্থিতির ভেতরই গাজি আসে। গাজি আলেয়াকে মনে করে আসে না নিশ্চয়। এখানে এসে আলেয়াকে বুঝি তার মনে পড়ে যায়। না হলে প্রথম এক-দুদিন এদিক ওদিক আনথান ঘুরে তার চারপাশে থাকে কেন? কোনো ঘ্রাণ বুঝি তাকে টানে। তার খালাতো ভাই গাজি। মেটেবরোজের বড়তলায় এক মুদিখানায় কাজ করে। আলেয়ার সঙ্গে ভাবসাব ছিল। এই দ্বীপেই আলেয়ার খালার বাড়ি। উত্তরছাড়ে বাগডাঙায়। এদিকে বালিয়াড়ার পথটুকু পায়ে পায়ে চলে আসতে কতক্ষণ আর লাগে। গাজি বলেছিল, তাকে সে বিয়ে করবে। গাজি তাকে আর বিয়ে করতে পারে নি। মেটেবরোজ থেকে চার-ছ মাস পরে এসে মনে পড়ত গাজির, সে নাকি আলেয়াকে ভালোবাসে। তারপর ফিরে গিয়ে আরো চার ছ মাস ভুলে থাকত। এই ফাঁকে গহরের সঙ্গে আলেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। এবং আলেয়া মনে করে এটাই ঠিক হয়েছে। গাজির ওপর তার প্রকৃত প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

গাজি এলে এমন তার চারপাশে ঘোরাফেরা করে। গহরের কাছে সমর্পিত হয় হয়ত সেই মুহূর্তে। একটা কালো পোকার ডানার ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে পায় সে-সময়। অদ্ভুত তার শব্দ। চারপাশের শব্দ তাকে উদ্বিগ্ন করে রাখে। গহর তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ভাল যে তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা খুব কম হয়। তার সংসারে খাওয়া পরা যা যা প্রয়োজন বড়বুবু দেয়। দিনমানে প্রায় কথাবার্তাই হয় না আলেয়ার সঙ্গে গহরের। ব্যাপারী, সমুদ্রের জেলে মানিষ্যি এলে তাকে কেউ কেউ গহরের মেয়ে শুধায়। আসলে "মেয়া"—বউ। এ কথাটা বুঝে কেউ কেউ তাকে ঘুরেফিরে দেখে। আকাশে বিদ্যুৎ যেমন চমকায় তেমন চমকে চমকে ওঠে আলেয়া।

সারাদিনই তার কারো সঙ্গে না-কথা বলে কাটে। পৌষের নরম বাতাসমাখা রোদ ফুর ফুর করে ওঠে তার মধ্যে। গাজি কলকেতা থেকে এসেছে। এ-ঘর সে-ঘর এ-পাড়া ও-পাড়া ঘোরাফেরা করছে। গোয়ালের ভেতর যখন ছিল তখন বাগানের ওপর দিয়ে রেডিও বাজাতে বাজাতে গাজি চলে যায় বালিয়াড়ার দিকে। গাজি কি তাকে দেখতে চেয়েছিল? তখন আলেয়া বেরয় নি গোয়ালের ভেতর থেকে।

এখনো ঘোরের মধ্যে আছে আলেয়া। চমকিত। এই আগান বাগান পুকুর ডোবা খেতের চৌহদ্দির ভেতরে তাকে আশ্রয় দিয়েছে গহর আলি। সে চমকানি তাকে ঘিরে থাকে। একটা অদ্ভুত মেঠো গন্ধ পায় সে বরাবর। একা থাকার ভেতর। সারাক্ষণ ত সে একা থাকে। হয়ত ধান ভাপায়, সেদ্ধ করে, শুকায়, ধানে 'পা দেয়', নয়ত খেজুর রস জ্বাল দেয়, ভাত রাঁধে, ধান ভানে ঢেঁকিতে। কিংবা দা নিয়ে পালাপুলি কাটে। গোল কাড়ে, ঘুটে দেয়। এক চমকিত বোধ নিয়ে থাকা। অবিরত এক গুন গুন চলে ভেতরে ভেতরে। দু-চার কথা হয় মাস্থরার সঙ্গে। বড়মেয়ে। গহরের বড়মেয়ে। তারও সম্পর্কে বড়মেয়ে। লালমন বড়বুবু চরকির মত সংসারে থাকে। অতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে হিম শিম। মাস্থরাও তার ভাই বোনদের সামলায়। মাস্থরার শাড়ি পরার বয়স হয়ে গেছে। মাস্থরা তাকে ছোটমা বলে সম্বোধন করে। মাস্থরার সঙ্গে আলেয়ার মা মা ভাবটা আরো জোরে চেপে বসে। চোখের পাতা তোলা ফেলায় এক প্রবীণ গড়ন সে পায়। কিন্তু মাস্থরা 'ছোটমা' বলে ডাকলে ভেতরে কেঁপে ওঠে আলেয়া। বারেক সাজু তাকে মা বলে ডাকে না। কোনোরকম সম্বোধন তার নেই। বড়বুবুর বড়-ছেলে। তারও সম্পর্কে ছেলে। বয়সে তার থেকেও বড় সাজু। তার বউ নাদিরা সঙ্গে কথা হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু সাজু এটা ওটা চাইতে এলে কোনো সম্বোধন না করেই চেয়ে নেয়। সাজুর সামনে বয়স বেড়ে ওঠে আলেয়ার। নিপাট এক জননী ভাব। এক গম্ভীর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে সাজুর সামনে। হাতে পায়ে স্নায়ু পেশীতে এক দৃঢ়তা এসে জমা হয় আলেয়ার। সাজু তার সামনে কত ছোট হয়ে যায়।

বাগানের ছাড়ে ধান উঠে যাওয়া মাঠে লঙ্কা বুনছে গহর আলি। এই অবয়বটা চোখে পড়লে কেমন ধ্বক করে ওঠে আলেয়ার ভেতরে। একজন প্রবীণ পুরুষ। বাপ বেঁচে থাকলে, তার চেয়েও বয়সে বড় হবে গহর। এই প্রবীণতা তাকে অধিকৃত করেছে। তার বিরাটত্বের কাছে সে এতই ক্ষুদ্র যে

সারাক্ষণই অধিকৃত থেকে যায় আলেয়া। সমর্পণে ভেঙে থাকে। গাজি বালিয়াড়ার হাটে যাচ্ছিল যখন রেডিও বাজতে বাজতে, গাজিকে দেখার বড় ইচ্ছে হয়েছিল আলেয়ার। কতদিন পরে দেশে এল। কিন্তু বেরতে পারেনি গোয়াল থেকে। গহরের বিরাটত্ব, আগান বাগান ক্ষেত জমি সব কিছুর ভেতর সে স্বেচ্ছাসমর্পিত।

বাস থেকে শাসমল বাঁধে নেমে, ভটভটি করে দ্বীপে এসেছিল গাজি। দ্বীপের সবটা জুড়েই তার ঘোরাফেরা এখন। কখন যে কোথায় যায়। সামনে এসেই পড়ে কখনো কখনো। কথা হয় না। চোখের দেখা। গাজি ছদিন এসে শুধু রেডিও নিয়ে ঘোরে। নতুন মশলা ভরেছে রেডিওতে। গম গম ঝম ঝম করে রেডিও বাজে। সুন্দর সুন্দর গান বাজে।

সাজুকে ভিন্ন করে দিয়েছে বড়বুবু। গহর আলি নয়। সাজুর বউয়ের সঙ্গে লালমন বুবুর পড়ছিল না। সারাক্ষণ খিটিমিটি চুলোচুলি লেগেই থাকত। মাসকয়েক হল আলাদা করে দিয়েছে। সাজুর বউ নাদিরা পাঁচ বছর বিবাহিত জীবনে সংসারে অনেক কষ্ট পেয়েছে। বড়বুবু তাকে খাবার কষ্ট দিয়েছে। গালমন্দ, মারধোর করেছে। মুখে মুখে চোপা করার স্বভাব নাদিরার। কিন্তু কি ভাল মেয়েটি। অথচ খাওয়ার কষ্ট আলেয়াকে দেয়নি বড়বুবু। আলেয়াকে মেনে নেয়াটা তার পক্ষে অনিবার্য ছিল।

সাজু ঘর বানিয়েছে পুকুরধারে, আনাজবাড়ির পাশে। আলেয়া দেখল নাদিরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁটা দিয়ে মুরগি তাড়ায় খেদিয়ে। 'শুয়োর বরা, মর মর।' তারপর গদ গদ করছে। এ বাড়ির মুরগি তার উঠোনতলার ধানে পড়েছিল। কট কট করে শাশুড়িকে গালাগাল দেয়। কিন্তু মাসুরা লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভাবির কাছে যায়। ঘরের এটা ওটা লুকিয়ে দেয়। এসব আলেয়ার দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু বড়বুবুকে এসব বলেও দেয় না। মাঝে মাঝে শাশুড়িকে লুকিয়ে নাদিরার সঙ্গে কথা বলে। সেও এটা ওটা আঁচলে লুকিয়ে দিয়ে আসে। নাদিরা আবার তার শোধ দেয়। চালভাজা দিলে একফালি নারকেল দেয়। একবাটি গুড় দিলে একটু শাকের তরকারি খাইয়ে দিয়ে যায়। নাদিরার ভয়ানক আবেগ। বড় মায়া তার। একটুতেই তার চোখে জল আসে। অথচ বড়বুবুর সঙ্গে যখন ঝগড়া করে মনেই হয় না নাদিরা এত ভাল। বড়বুবু তাকে খেতে না দেয়া মারধোর করার পর, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস কথা বলতে বলতে গলা ধরে উঠত তার। কেঁদে উঠত। সারা শরীর জুড়ে কান্না উথলে উঠত। সে কান্নার ছোঁয়ায় তাপে

দুলে উঠত আলেয়ার শরীর। এইভাবে গলা জড়িয়ে নিরিবিলিতে দুজন কতক্ষণই না কাঁদতে পারে। একা একা তেমনভাবে তার কখনোই কান্না আসত না। কেঁদে কেঁদে কেঁদে কেঁদে হালকা হয়ে উঠত।

আলেয়া গোবরের তালে জল ঢেলে ছানতে থাকে। ছেলে দুটো আরো চার পাঁচটি শিশুর ভিড়ে উঠোনে আছে।

সাজু পুকুর থেকে হাত পা ধুয়ে এল। দড়ির ওপর থেকে থেকে গামছা নেয়। হাতা মুখ-পা মোছে। চ্যাটাই মেলা বাকুলে কাঁথা-বালিশ বুকে করে করে এনে শুকোতে দেয় নাদিরা। তারপর সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। এক জাম পান্তা নিয়ে এসে সার্জুর সামনে বসিয়ে দেয়। সাজু বাঁ পা-টা ভাঁজ খাইয়ে হাঁটুটা ওপর দিকে তুলে, ডান দিকের পা ভেঙে বসে। সাজু পান্তা খায়।

একটা শালিক পাখি গহর আলির ঘরের বাকুলে ঘরে বেড়াচ্ছে। দানা খুঁটে খাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। কী সুন্দর তার রং, গড়ন। নরম পা। রঙিন চোখ। একটি নরম ভাললাগা বোধের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারছিল আলেয়া। একটা স্বপ্নের মত কিছু। যেন কিছু স্বপ্ন বা রূপকথার মত রং মিশে যায় তার মধ্যে। নড়াচড়া করে। উথালপাথাল করে। গড়িয়ে যায়। বাতাস রোদ আর চারদিকের স্ফুট প্রান্তর গাছপালা এসব যেন সে নিজেই গড়ে তুলছে। নিজেই জাগিয়ে তুলছে। এসব যেন সে নির্মাণ করে নিজের মধ্যে। সমুদ্রের বাতাস গোঙানি, সে যদি বলে আছে, তাহলে আছে। না হলে নেই। সে যদি বলে ছোট পাখিটার চলাফেরা আছে, তাহলে আছে। এরকমভাবে গড়ে তোলে। আঁচড় কাটে তার মধ্যে। এসময় শাদা কাগজের মত মনটা হয়ে যায়। একটু একটু করে আঁচড় পড়ে। নানা রঙে তাকে ধরতে থাকে। নানা দোলায় সে দুলে ওঠে। চমকিত বোধ। বাকুল বাগানে এক শান্ত নীরবতা। সে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে নি। গহরকে বিয়ে করে তার সংসারে থাকাটাই সীমা মনে করেছে। এর মাঝে যা কিছু আছে রং স্বপ্ন রূপকথা তা ভাবনার ভাল লাগার মধ্যেই সীমায়িত রাখতেই সে ভালোবাসে। গাজিকে সে আর চায় না। চেয়েছিল। কিন্তু গহরের সংসারে তার আর কী কষ্ট! গহরের নেতৃত্বে থাকাটাই ঠিক মনে করেছে। গাজিকে এড়াতে চায়। গহর তাকে বিয়ে করে তার মধ্যে যে প্রবীণতা জুড়ে দিয়েছে, সেই অবস্থার মধ্যে আলেয়া সমর্পিত থাকতে চেয়েছে। আর যা অবশেষ আছে তা কল্পনা স্বপ্ন রূপকথা।

নানা-রঙের ছড়াছড়ি। এখানে বাধা দেবার কারো হাত নেই। এমনভাবে আলেয়া নড়াচড়া করে।

তালগাছগুলোর পাতাগুলি নেই! পাতা কেটে নেয়া হয়েছে। তাদের কোমর বেয়ে সমুদ্রের নিলয়। এক অনন্ত সেখানে এঁটে আছে গোয়ালের পেছনে, পুকুরের ধারে। খিড়কির ঘাটে। বিশাল এক শূন্যতা। নীচে মাটিতে সেই প্রান্ত দিয়ে পুবে চলে এসেছে গহর আলির এই ঘর ভিটে আগান বাগান। সেখানের আশ্রয়টাকে আঁকড়ানো তাই তার সত্যি মনে হয়। গহর আলির মধ্যে ধরা পড়বার যথেষ্ট পারিপাশ্বিকতা তাকে গড়ে দেয়।

কিন্তু রং স্বপ্ন কল্পনা রূপকথা অন্য জিনিশ। তার মনে হয় তার জীবনের সঙ্গে মেলাবার এ বস্তু নয়। এটা একটা মুহূর্ত, ভাব—জীবনের অন্য আস্বাদ।

'চাষবাড়ি'তে মানুষ এসে গেছে। ধান কাটা, তোলা ঝাড়া, নৌকো ভরে নিয়ে যাওয়া চলছে। চাষবাড়িতে মরদ মেয়া, ছেলা পুলা। কাঁথি নামখানা কাকদ্বীপ ডায়মণ্ডহারবারের লোক। জঙ্গল হাঁসিল করা লোক। সমুদ্রের গা বেয়ে জেলেদের বাস। বাতাসে ভুরিমাছের গন্ধ। বোল্ডার, পাথর, বেলাভূমি—নৌকো ভটভটি পা-ছুঁয়ে ধু ধু সমুদ্র গাং চিল।

মাস্থরা সাজুদের চালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার বড়ভাইয়ের ঘরের সামনে। ভাবি নাদিরা তার সামনে মিটিমিটি হাসছে। 'শাউড়ি কুথা গেলা।'

'কুথা গেলা দেহো। পানি আনতে যাবি ভাবি?'

'ঢের কাম বাকি। অখন নয়।'—সাজুর দিকে তাকায় নাদিরা। 'তমার পা মেলে বইস্যা কাটলে হইবা? পান্তা বেলায় পান্তা খাইলে। বাকুলের শুকনা গোড়েখান চ্যালা কইরা দেও।—তা বাদে ধান ঝাড়তে যাবা।'

সাজু উঠে দাঁড়ায় 'কুড়ালে ডাঁপ পরাইতে লাগবা।' বলে দুহাত শূন্যে তুলে আড়ামোড়া ভাঙে। এতে কোমরে লুঙ্গির ওপর জড়ানো গামছাটা খসে মাটিতে পড়ে যায়। সেটা উবু হয়ে তোলে, ঝাড়ে।

'কুড়ালে ভাঁপ লাগানো আছে?'

'কে লাগালা।'

'মুই।'

'হারে, মেয়া মরদ অইল দেহি।'

নাদিরা হাসে। মাস্থরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

সাজু কুড়াল আনতে ঘরে যায়। কুড়াল টেনে এনে লুঙ্গির ওপর আবার

গামছা জড়ায়। কাঁছা মারে। 'খামারে ধান ঝাড়তে ঢের বাকি, জনগুলা আগে ভাগে চলে যাবা। ঘোর ফুরোন দিইতে রোদ গড়াইবা।'

নাদিরা হাসে—'রোদ গড়াইলে গড়াইবা।'

'গাজি যে রেডিয়া আনবা সাঁজ বেলাকে?'

'তাই ত।' ভাবে নাদিরা। 'ত্বরা কইয়া ফাড়ো, হাত চালাইয়া ধান ঝাড়বা।'

সাজু দ্রুত নেমে আসে বাকুলে। বাবলাগাছের গুঁড়িতে কুড়ালের কোপ বসায়।

নাদিরা ও মাস্থরা ওরা ভাবি-নগদে কত কথা বলে, এ-ওর দিকে গলা বাড়িয়ে।

তালগাছের গায়ে গায়ে ঘুটে দেয় আলেয়া। বাকুলে ঢেঁকিটা মুখ গুঁজে পড়ে আছে। পেয়ারাগাছের ডালটা তার দিকে ঝুঁকে আছে। খেজুর-গাছগুলিতে রসের গন্ধ। মাতাল করা রসের গন্ধ। মুরগিগুলোর চলাফেরা। চুন-মাখানো রসের কলসিগুলোকে রোদ খেতে দেয়া হয়েছে খেজুর ছাড়ে। তার ভেতর কালো কালো মাছি ভরে আছে। ভন ভন একটা শব্দ হচ্ছে। বড়বুবু এদিকে বাকুলে নেই। বড়বুবুর মেজ সেজ নসেজ ছেলে পিঠোপিঠি আর তুজন, ওরা সব চাষের কাজে আছে। অন্যের চাষে খাটে। গহরও খাটে। বাচ্চা ছেলেমেয়ে গুলোই উঠোন বাকুল ঘর জুড়ে থাকে। ওদের মাঝেই তার দুই খোকা আছে। আসলে গহরেরই ত সেই তুই খোকা। মেশামেশি হয়ে থাকে।

ধান ঝাড়ার পটাপট্ শব্দ এদিক ওদিক ছড়ানো-ছেটানো। মাঠে মাঠে ধানের বোঝা মাথায় করে নিয়ে যাওয়া জনেরা ছড়িয়ে থাকে। পুবদিকে বাঘডেঙা থেকে ইটের রাস্তা বেরিয়ে এসেছে বালিয়াড়া পর্যন্ত। স্কুল, মক্তব বালিয়াড়ার হাট, দোকানদানি। পশ্চিমে থই থই সমুদ্র। দ্বীপটা জুড়ে সমুদ্র আছে। জল আর জল। অকুল পাথার। এখানের বাতাসে লবণ উড়ে বেড়াচ্ছে।

'পেছন থিক্যা চিনা যায় না তুমারে।'

পেছন ফেরে আলেয়া। গহর আলি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে হাসছে গহর আলি।

'বেলা যায়, এখনো গোসল হয় নাই, খাওয়া হয় নাই?'

আলেয়া জানে, বড়বুবুর অনুপস্থিতিতে এই লোকটা তার সঙ্গে আলাপ

করার সাহস পায়। রাতে গহরের এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার হক আছে। বড়বুবু তাতে বাদ সাধে না। কিন্তু দিনমানে মাগ-ভাতারের আলাপচারিতায় আপত্তি আছে। বড়বুবু পাড়ায় কোথাও গেছে বলে, গহর লস্কারাড়ি থেকে উঠে এসেছে। উঠে এসেছে আলেয়ার পেছনে। তালগাছে ঘুটে দিতে দিতে মুখ ফিরিয়ে ধরেছিল আলেয়া। আঁচলটা গলা থেকে খসে পড়ল। হাতের গোবরের তাল ধরে আছে। ঠোঁটে মুখে কাঁপুনি। চোখের পাতা ওঠে নামে। পাশ ফিরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে আলেয়া। গহরের সামনে। গহরের মুখে হাসি খেলে বেড়াচ্ছে।

গহর তার সামনে এমনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। 'জিরেন দেও, গা ধোও ধোও। বাকুলপানে এস দিনি।'

গহর বাকুলের দিকে চলে যায়।

আলেয়া গোবরের তাল রেখে ধীর পায়ে পুকুরের দিকে এগচ্ছে। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে তার। শরীরে এক কাঁপুনি। ঠোঁট দুটো এখনো কাঁপছে তার। শরীরে গুরু গুরু ভাব।

ঘাট থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে দেখল গহর দাওয়ার বাড়ে বসে পা ঝুলিয়ে আছে। মুখ গুঁজে ছিল, ছায়া দেখে সামনে তাকায় গহর। 'পানি দ্যাও।'

কলসি থেকে ঘটি ভরে জল আনতে গিয়ে আলেয়া বুঝতে পারে গহর আলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। জল ঢালতে গিয়ে হাতের ঘটি কেঁপে যায় কেন?

দুহাতে জলের ঘটি ধরে গহরের কাছে আসে। একটা শিশু হামা দিয়ে তার দিকে আসছে। বাড়িয়ে দেয় জলটা। শিশুটা এসে তার পা জড়িয়ে ধরেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। এই শিশুটি তার নয়, বড়বুবুর। তাকে কোলে তুলে নিচ্ছে না। গহরের সামনে দিনমানে এমনই কাঁপুনি, জড়তা আসে তার। স্বামীর সঙ্গে খুনসুটি করবে? কীভাবে পারবে? লোকটার বয়স তার বাবার বয়সের থেকেও বেশি। আর বড়বুবু দিনমানে গহর আলির সঙ্গে একসাথ পছন্দ করবে না। অদ্ভুত জড়তায় একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে আলেয়া। পা ধরে আছে শিশুটি। তাকেও কোলে তুলতে পারছে না। আহা!

'গা কিটাচ্ছে—দ্যাও ত এট্টু কিটায়ে।'

পা টানতে শিশু উলটে পড়ে যায়। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসে।

পিঠের সিঁদরিপোকার ঘায়ে নখ দিয়ে ওসকায়। গহর আলির মাথা, পাকা চুলে ভরে গেছে। বাবার মতই মনে হয় তাকে। স্ত্রীত্বের লজ্জায় এক কাঁপুনি। জড়তা। নখ দিয়ে এমন সিঁদরিপোকার ঘা মারে গহর আলির সারা গায়ের। শিশুটি হামা দিয়ে তার পায়ের দুই ফাঁকে খেলছে। ছোট ছোট নরম হাতগুলি পায়ের ওপর আঁচড় কাটছে। আলেয়া আধভাঙা দাঁড়িয়ে ঘা মারছে। অদ্ভুত তার নুয়ে পড়া। এতে বুকটার ভারি হয়ে ওঠা অনুভব করে। সকল জননীত্ব এসে তার বুকে ভার করেছে। কলার কাঁদির মত ভার হয়ে ঝুলে আছে তার স্তন দুটি। তার ভীষণ ভার। পায়ে শিশুর হাতের আঁচড়ানি, কাতরতা। বুক টন টন করে ওঠে! স্তন উসখুস করে। স্তন দুটি দুধে ভরে গেছে। টন টন করে ওঠে। শিশুটি পায়ের তলায়।

বাড়ির পেছনে বড়বুবুর গলা পাওয়া যায়। গহরের পিঠ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নেয়। পায়ের তলায় শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কোলে বসিয়ে শিশুকে স্তন দেয়। বুক টন টন করছে। একেবারে পেনিয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে যন্ত্রণা সরায়।

বড়বুবু তার কোনো আধলা ছেলেকে বকছে। বকতে বকতে সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। আলেয়াকে দেখে থমকে যায়। ঘরের এখান থেকে ওখানে যায়।

আলেয়া জুড়িসুড়ি মেরে যায়। সঙ্কুচিত ভাব। জড়তা নিয়ে ঐভাবে বসে থাকে। দিনের বেলাতেও পাতলা অন্ধকার রয়েছে সে ঘরে। স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঠাণ্ডা ভাব। চোখ বুজে আসে। ঘুম ধরে যেন।

মরা রোদের ওপর ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। গাছে পালায় কুয়াশার স্তর। কাঁপুনি, ঠাণ্ডা। মাথার সিঁথেনের কাছে সমুদ্র গর্জন করে! দিগদিগন্ত কেমন আলগা ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে উঠছে। গহরের আগান বাগান ঘর ভিটেটুকু দৃশ্যের অখণ্ডতায় পেতে আছে। খেজুর গাছ থেকে রস ঝরে যায়। টুপ টুপ করে ঝরে। রসের গন্ধ ঠাণ্ডা হাওয়ায় থই থই করে। টিনে রস ফোটানো হচ্ছে। বড়বুবু আর গহর আলি দুজনে একসঙ্গে রস ফোটায়। তাদের আধলা দুই ছেলে পাতাপুতির জাল দেয়। আলেয়া ভাত চড়ায়। গনগনে আগুন তার চারপাশে। শিশুরা উঠোনে। তাদের নিয়ে থাকে মাসুরা। এখন মনে হয় গহরের আগান বাগান ঘর ভিটের বাইরে কোনো দৃশ্য নেই আর। যেন সব সমুদ্র, কোনো মাটি-পাথর নেই আর।

নাদিরা এখনো রান্না চড়ায় নি। আলেয়ার বড় ব্যাটার বউ। আলেয়ার থেকেও বড়। গলায় একটা চাদর বেঁধে তাদের উঠোন থেকে সাজু নেমে এল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। মা বাবা কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই সাজুর। মা-বাপের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। গহর আলি আর লালমনবুবু বউ-ব্যাটাকে মারতে মারতে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরের ঘরে দু-দশদিন সাজু নাদিরাকে নিয়ে থেকে ছিল, তারপর সালিশি বসে। গহর আলি সাজুকে একটুকরো জায়গা দেয়। তাতে ঘর তোলে সাজু। বাপ-মায়ের সঙ্গে সাজুর কোনো 'ল্যাপসা' নেই। নাদিরা আর সাজু তাদের ছোটমাকে শত্রু মনে করে না।

আলেয়া দেখল সাজু একগাছা বিড়ির আগায় পাছায় ফুঁ দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চুলোর দিকে এগিয়ে আসছে। আগুনের দিকে মুখ ডুবিয়ে টুপ করে বিড়িটা ধরিয়ে নেয়। উবু হয়ে খাঁড়তে আগুন জাগিয়ে তুলতে তুলতে সাজু বলল—'ছোটমা, বাপ একখান গাছ দিলনাই বলে মোর মেয়া ছেলারা গুড় খাবে নাই, ই ত নাই। হাট থিক্যা কিনা খাই।—বাপ কেন বালিয়াড়া হাটঘরে কাসেমরে কয়েচে, সাজু মেয়াডারে গায়ের কাপড় খুইলা চাবকাইবে। কে তোদের জ্বালুন কুটো লিইছে? মোর মেয়াকে উ শিক্ষা দিই নাই।—মাকে বলিস, তুরা মরে পড়্যে থাইকলে দেখতে যাব নাই।'

আলেয়ার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে! 'বাপ মা হয় নাই তুমার? ও কথা কও তুমি?'

'আমারে যেমন বাসবা তেনাদের তেমন বাসবা—ই ত রাস্তায় পড়ে রইছে।'

'গুণ্ডার বাপ, বাপ মায়ের বদলা লিওনি। কথা কইতে পারলে কথা কওয়া হয়ে যায়।' এই কথার চাপে আলেয়া কেমন পরিণত বয়স্কা হয়ে ওঠে। প্রবীণ, বয়স্ক। সাজুর সে যে মা এটা প্রকাশ পায়।

সাজু এই কথার ধাক্কায় একটু জড় সড় হয়ে উঠল। গুটিয়ে যায়।

আলেয়ার চোয়াল শক্ত। শরীরে এক প্রবীণতা তাকে এক ঋজু ভাব দিয়েছে। দিয়েছে কঠিনতা। চুলোর আগুন বাড়ায়। দাউ দাউ করে ওঠে আগুন। সেই আগুনের প্রায় আলেয়ার চোখ দুটি জ্বলন্ত হয়ে ওঠে। তপ্ত হয়ে ওঠে। চূর্ণকুন্তলে ভিজে ভাবটা চলে যায় কপাল থেকে।

সাজু চলে গেল।

নাদিরা লক্ষ করছিল। সেও এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তার কাছে চলে যাবে। 'ছোটমা, গুণ্ডার বাপ দুঃখ জানাই ছিল? অর বড়া রাগ। মানুষডারে নিয়া পারি নাই।'

'সইষ্য করো কেনে।' আলেয়ার চোয়াল আবার শক্ত হয়ে ওঠে।

'সইষ্য ত করচি ছোট মা।'

'দেখবি তুদের স্নার সুমসার হবে।'

নাদিরা ফিরে যায়। বড়বুবু গুড়শাল থেকে ফিরছে।

বাকুলের মাঝখানে উদোম চুলোয় রান্না করছে আলেয়া। এখন কেমন ম্লান হয়ে আসছে বাইরের আলো। বাইরে শীত এসে জড়াচ্ছে। আগুনের কাছে কোনো শীত নেই। আলেয়ার কোনো শীত নেই। তাপে তাপে চনমনে হয়ে উঠছিল। আগুনের শিখা জবাফুলের মত ছড়িয়ে পড়ছিল। পাতার জ্বালের অগ্নিকণা উড়ে যায়। হাঁটু দুটো তপ্ত হয়ে উঠছে। অগ্নিপ্রভায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। আলেয়ার হঠাৎই মনে হল, গাজি এসেছে। গাজি এসেছে, আবার চলে যাবে। আলেয়ার খালাতো ভাই। গাজির সঙ্গে আর আলেয়ার বিয়ে হল না। গহর তাকে অধিকৃত করে ফেলেছে। এখানেই আলেয়ার বেশি নিশ্চিন্ততা। তবে গাজি এলে তার ভাল লাগে। তবু ত জানাশোনা ছিল। ভাবসাভ। গাজিকে দেখতে পেলে ভালই লাগে আলেয়ার। একটা রেডিও এনেছে। ঝম ঝম করে বাজাচ্ছে। কিন্তু গাজির প্রতি আবেগ আকাঙ্ক্ষা তার ফুরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে যা, তা হল চোখের দেখা। চোখের দেখার আবেগেই আলেয়া নরম হয়ে উঠছে বার বার। ভিজে হয়ে উঠছে। গাজি কথা বলতে এলে বলবে না। তাকে এ ঘরে আসতেও বলবে না। সে ত গাজির কাছে আর কিছু চায় না!

সন্ধ্যা নেমে গেছে।

সাজুর দালানে গাজি এসেছে। রেডিও বাজাচ্ছে। খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে পা মেলে বসে আছে। পাশে নাদিরা রান্না করছে। আর-একটা খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে সাজু। নাদিরার হাসি হাসি মুখ। এখান থেকে দেখতে পায় আলেয়া। গাজি এদিকে তাকিয়ে আছে। আলেয়াকে দেখছে বুঝি। মাঝে মাঝে মুখ তোলে, গাজিকে দেখে আলেয়া। ভেতরটা কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। ভেতরে দোলা খায়।

মাসুরা পাশে এসে বসেছে। পাশ ফিরে মাসুরাকে দেখে আলেয়া। মুখ গুঁজে কাজ করে। আর গাজির দিকে তাকানো যাবে না। মাসুরা হাঁটুর

ওপর হাত দুটো চেপে বসে আছে। মাসুরাকে লক্ষ করে আলেয়া। মাসুরা তাকিয়ে আছে সাজুদের উঠোনের দিকে।

বড়বুবু হাঁসমুরগি তুলছে। গহর আলি গরু তুলে দিয়ে, খড় কুঁচোতে বসেছে লম্ফের আলোর ডেলা নিয়ে গোয়ালের সামনে।

ভাত হয়ে গেছে। তরকারি হয়ে গেলে বড়বুবু বাচ্চাদের খাওয়াতে বসাবে। একই সঙ্গে আলেয়ার দুটি শিশুও খেয়ে নেবে। শিশুর ভিড়ে হারিয়ে থাকে এই দুটি শিশু। মাঝে মাঝে চিনতে ভুল হয় আলেয়ার।

আলেয়া পাশ ফিরে দেখল মাসুরা মুখটা বাড়িয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে সাজুদের উঠোনের দিকে। মাসুরার মুখে কেমন আলোকিত প্রসন্নভাব। খুশি আনন্দ ভরে আছে। আলেয়া চমকায়। গাজি এদিকে তাকিয়ে আছে হাসিমুখে। ছটফট করে ওঠে আলেয়া। মাসুরাকে দেখে। মাসুরা হাসছে। গাজি হাত তুলছে, মাসুরাও হাত তুলছে—জড়সড় হয়ে যাচ্ছে। এটা কীরকম! গাজি মাসুরাকে নাচিয়ে তুলেছে। মাসুরাকে বশ করেছে। কখন গাজি মাসুরাকে তার আকর্ষণে টানল? সহসা টালমাটাল হয়ে উঠল আলেয়া। মাথার ভেতর চিন চিন করে। ভেতরটা কেঁপে ওঠে, দুলে ওঠে। গাজি মাসুরাকে বশ করেছে। গাজির গভীর সম্মোহনে মাসুরা দুলে উঠেছে। সহসা কেমন ভার হয়ে উঠল আলেয়া। রাগে চিন চিন করে উঠছে সে। গাজি আর মাসুরার প্রতি রাগে কঠিন হয়ে উঠছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। শরীরের ভেতর এক ইড়িশবিড়িশ। গাজি কেন মাসুরার দিকে নজর দিল? আগুনের তাপে আরো রাঙা হয়ে উঠছে আলেয়া। চোখের পাতায় ভিজে ভারি ভাবটা সরে যাচ্ছে। দীর্ঘ গরম নিশ্বাসপতন হয় তার। গাজির ওপর ক্ষেপে ওঠে। সেদিকেই তাকিয়ে আছে মাসুরা। আলেয়া সাপের মত ফুঁসছে। আলেয়া মুখ গুঁজে ধরে ছিল। পাশ ফিরে দেখে মাসুরা পাশে নেই। মাসুরা খাটের দিকে চলে গেছে।

আলেয়ার রান্না শেষ। হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি চাপায়। আগুন নেভায়। কিন্তু চুলোর ভেতর আগুন ধিক ধিক করছে।

মাসুরা এখনো ফিরছে না। খাবার ঘরে ছেলেপুলেদের খাওয়াচ্ছে বড়বুবু। দরজার মুখে আলেয়া বসে আছে। সাজুর ঘরে রেডিও বাজছে। দূরে দূরে পাড়ায় ঘরে ঘরে চাষবাড়িতে আলো জলে উঠেছে। গাজি কেন এল? আর এল যদি ত মাসুরাকে ফাঁদে ফেলল কেন? আলেয়া ছটফট

করে। গাজির এটা অন্যায়। আলেয়া সম্পর্কে মা হয়। মাসুরাকে গাজির কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। মাসুরা নেচে উঠেছে গাজির প্রতি। মাসুরার কম বয়স। ঘুরে ঘুরে রেডিও বাজাচ্ছে। হাতে ঘড়ি। গায়ে জামা, পরনে প্যান্ট। 'সিনেমা আর্টিস্ট'দের মত চুল কাটা। গাজি কেন মাসুরাকে ধরল? তার ত মেয়ে। গাজির অন্যায়। গাজি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। বিয়ে করতে পারে নি। কলকাতা থেকে ফিরলে এখানে এই বাকুলে ঘোরাফেরা করত। একে অপরের চোখের দেখা হত। প্রেম ভুলে যায় কেমন করে গাজি? এরই মধ্যে মাসুরা ডাগর হয়েছে ত গাজি তার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

বসে বসে দাহ অনুভব করে আলেয়া। একটি মুহূর্তে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে গাজি। গাজি মাসুরার সঙ্গে কেন প্রেম করবে? এটা ঘটতে দেয়া যেতে পারে না। অন্য কেউ নয়, সেত গাজি। গাজি তার পূর্ব-প্রেমিক। এখনো কি দেখার টান ছিল না উভয়ের মধ্যে? যেটুকু অবশেষ ছিল, সেটুকুকেই গোপনে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেখানে ঢুকে পড়েছে মাসুরা। মাসুরাকে ভুলিয়ে ফেলেছে গাজি। এক অসহায়তা বিপন্নতা এসে আলেয়াকে আলোড়িত করে। গাজি অন্যায় করছে। তার প্রতি অন্যায় করছে। তারই ঘরের মেয়ে মাসুরা। মেয়ে সম্পর্ক।

দ্বীপটা শীতের প্রকোপে জুড়িসুড়ি মেরে আছে। চারদিকে কুয়াশা। সমুদ্রের গর্জন। ছুঁইয়ে পড়া চাঁদের আলো। কাকজোৎস্নার মত চাঁদের আলো। চারদিকে মরাইয়ের গন্ধ। মাঠে মাঠে নাড়া, নাড়ায় হিম। হিম নাড়ায় এক বিষণ্ণতা। কুয়াশার স্তর সেখানে নুয়ে পড়ে। খসে পড়ে হিম। শীতের ভারি হাওয়া নেমে আসছে। অদ্ভুত এক নিঃশব্দতা।

গহর আলি দাওয়ায় বসে বিড়ি খাচ্ছে। গায়ে চাদর জড়ানো। মুখে বিড়ির আলো দপ দপ করে। আলেয়ার বয়স্ক স্বামী। শরীরে অঁবয়বে কেমন জেগে উঠেছে গহর আলি। খাবার ঘরের ভেতর থেকে হ্যারিকেনের আলো সরু হয়ে পড়েছে দাওয়ায়। গহর আলির গায়ে পড়েছে। একটু আগে মুড়ি খেয়েছে, চা খেয়েছে গহর আলি।

খোকাকে ঘুম পাড়াতে দোলায় বসে আলেয়া। মাসুরা এখানে কোথাও নেই। কোথায় গেল? সাজুদের উঠোনে রেডিও বাজে। ছোট খোকাকে কোলে নিয়ে দোলায় বসতেই ছোটখোকা ঘুমে কাদা। ঘরে এসে তাকে শুইয়ে দেয়। বাইরে বেরিয়ে আসে। জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। এদিক সেদিক। ছটফট করে আলেয়া। এই অস্থিরতা তার আরো বাড়তে থাকে।

উঠোনে চলাফেরা করে। ছটফট। ছটফট। কোথাও কুকুর কাঁদে। শেয়াল ডাকে। সমুদ্রের গর্জন বয়ে আসছে। ঢেউ, শুধু ঢেউ আছড়ায়।

গহর আলি বসে আছে গভীর শরীর নিয়ে। বিড়ির আগুন ধক ধক করে। পেঁচা ওড়ে ভারি ডানায়। বাদুড় উড়ে যায়। পেয়ারা গাছে বাদুড় ঝটপট করে। বেড়ালটা গোয়ালের চালায় উঠে গিয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করে। ঝিঁঝিঁর ডাক। রাতপোকার শব্দ। রাতপাখির ডাক। নরম হালকা জ্যোৎস্না শুয়ে আছে মাঠ জুড়ে। কিছু ধান শুয়ে আছে মাঠে। ইঁদুর তার ওপর চরে বেড়ায়। সড় সড় শব্দ করে।

উঠোন থেকে নামে আলেয়া।

উঠোনের ধাড় থেকে শব্দ করে গহর—'কোথা যাও নাকি?'

'ঘাটে যাই।' গহরের কথার উত্তর দেয় আলেয়া।

ঘাটে এসে কাঁদতে বসে আলেয়া। সমুদ্রের জলের মত, চোখের জল তার ঠোঁটে পড়ে, লবণাক্ত স্বাদ পায়। সমুদ্রের নোনতা স্বাদ শুধু নয় সমুদ্রের মত বিশাল আকাঙ্ক্ষা বোধ করে আলেয়া।

ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছে তার শরীর। ঠোঁট নড়ে। বুকে ভার লাগে। থেকে থেকে ধাকাচ্ছে বুক। নরম জ্যোৎস্না। চারদিক হিমেল হাওয়া। জোনাকি, কুয়াশা—দূরে সমুদ্রের নিলয়। সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে।

প্রসঙ্গ ঃ সমরেশ বসু

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রিয় অমিতাভ,

তুমি জান 'পরিচয়' পড়তে আমার ভাল লাগে, তোমার সম্পাদিত সংখ্যাগুলি আরও বেশী। সম্প্রতি জুলাই সংখ্যার পরিচয় পেলাম ও পড়ে ফেললাম। বিশেষ করে ১৭ পাতা থেকে, সমরেশের ক্রোড়পত্রটি। সমরেশ আমাদের প্রিয় সহকর্মী ছিল, তাই বিশেষ ভাবে পড়লাম। ওকে জানতাম এবং চিনতামও। জানা-চেনার মধ্যে কিছুটা ফারাক আছে। কারুকে জানতে গেলে তার সঙ্গে আদান-প্রদানের প্রয়োজন। যেটি সমরেশের সঙ্গে বা তোমার সঙ্গেও আমার ছিল বা আছে।

আমি তোমাব অগ্রজ, শুধু বয়সে নয়, সম্পাদনাতেও। তাই উপদেশের ছলে একটি সতর্কবাণী পাঠালাম, যে কোনও সৃজনশীল শিল্পী বা লেখককে বিচার করতে গেলে আমাদের দেশে লেখকরা প্রায়ই তার শিল্প-জীবনের চেয়েও ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রাধান্য দেয়। এ বিষয়ে সমরেশকেও হয়তো অভিযুক্ত করা যায়, 'রামকিঙ্কর' সম্বন্ধে ওর যতটুকু রচনা পড়েছি তাকে ভিত্তি করে। সমরেশের কিছু চারিত্রিক দুর্বলতা আলোচনা করেছেন লেখক দুজনেই। এমনকি তার বউকেও সাক্ষ্য মানা হয়েছে এজন্য। মুশকিল হচ্ছে আমরা যখন এমন নারী বিষয়ে হঠাৎ আগ্রহ দেখাই, সেটা হয়তো সাধারণ অনেকের কাছে ধারণা হয়ে ওঠে আমরা বুঝি 'বামাক্ষ্যাপা', কিন্তু এর আরও অন্য দিক আছে যেটা হয়তো অনেকের চোখেই পড়ে না, যেহেতু আলোচ্য-ক্ষেত্রে সমরেশ বা আমি দুজনেই পুরুষ, সেইজন্যই বামাক্ষ্যাপার প্রসঙ্গ এসে গেল। যদি শিল্পী বা সাহিত্যিকরা মহিলা হত, তাহলে হয়তো ঘটনাটি বিপরীত হত। সোজা চোখে ঘটনাটি বিচার করলে অনেক ক্ষেত্রে এটা নিছক ঔৎসক্য বা দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিষয়ে একটা বাস্তব ঘটনা বলি। ৬২ সালের মার্চ মাসে শ্রীমান কেশব মুখুজ্জ্যে সংগঠিত শরৎ সাহিত্য সম্মেলন সেবার সারাদিন স্টীমারে গঙ্গা ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে অন্যদের সঙ্গে আমি এবং সমরেশ আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার ভাগ্নী পুতুল এবং সমরেশের সঙ্গে ছিল ওর বড় মেয়ে বুলবুল, ভোরবেলা জগন্নাথ ঘাটে পৌঁছেই সমরেশদের সঙ্গে
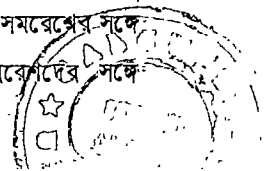
আমাদের দেখা হল। ওদের দেখেই আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। স্টীমারে ওঠার পাটাতনের মুখে দাঁড়িয়ে বুলবুল ও পুতুলকে বলে দিলাম, দেখতে পাচ্ছ স্টীমার ভর্তি ছেলে ও মেয়ে রয়েছে, আমি ও সমরেশ প্রৌঢ়, তোমরা দুজন কিশোরী। এখন থেকে স্টীমারে থাকাকালীন আমরা কি করছি তোমরা দেখবে না, তোমরা কি করছ আমরা দেখব না। যদি হঠাৎ কেউ কারুরটা দেখে ফেল তবে কেউ সেকথা বাড়িতে বলবে না।

সমরেশকে বললাম চল এবার দেখা যাক কার কত সামর্থ? কে কটা লটকাতে পারি? এতেই বোঝা যাবে কার কত মুরদ। সেবার স্বভাবতই জিতেছিলাম আমি। কারণ আমার শৈল্পিক সামর্থ এবং শারীরিক সামর্থ সমানভাবে প্রয়োগ করেছিলাম। বেচারা সমরেশ দু-ক্ষেত্রেই আমার সমকক্ষ ছিল না। তার প্রকাশ মাধ্যম ভাষা-ভিত্তিক, তাই পাঠকদের সেই মুহূর্তেই তার রসগ্রহণ করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আর দৈহিক সামর্থে সমরেশ কেন, অনেক বাঙালীই আমার সমকক্ষ ছিল না, তাছাড়া আমার ছবি দর্শনগ্রাহ্য বস্তু। সমরেশ যখন রেলিংএর ধারে মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরঘুর করছে, তখন আমি একলাফে রেলিং টপকে সারেঙ্গের ঘর পেরিয়ে খোলা ছাদে পা ঝুলিয়ে বসে একমনে গঙ্গার দুপাশের ঘাট এঁকে যেতে লাগলাম। ক্রমেই মেয়েরা আমার ছবি দেখার জন্য রেলিং টপকে একে একে আমাকে ঘিরে ফেলল। যাকে বলে প্রমীলা-বূহ্য। পেছনে ফিরে দেখি সমরেশ বেচারী তখন মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করছে। কারণ, তার সঙ্গে পরিচয় করে দেবার মত মধ্যস্থ ছিল না। স্বভাবতই বিখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু তা বুঝতে মুশকিল হচ্ছিল অচেনা লোকদের, এঘটনাই বলে দিচ্ছে এক্ষেত্রে দুষ্টুমি ও ঔৎসুক্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তার প্রমাণ আমাদের কাজ। আমরা বা মেয়েরা সেদিনের চারে পড়া ছেলেমেয়েদের কারুরই কোন ঠিকানা সংগ্রহ করিনি এবং যতদূর জানি সেদিনের সেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কারুরই এমন ঘনিষ্টতা হয়নি যাকে কি প্রেম বলা যায়। আর সেদিনের ঐ অবস্থায়ও আমি স্কেচ করেছিলাম ২০টি ছবি। আর সমরেশের 'গঙ্গা' উপন্যাসটি পড়েছেন অনেকেই যেটা বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সমরেশ যখন হরপ্রসাদের সঙ্গে প্রথমবার দার্জিলিং যায়, তখন ওদের থাকবার ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছিলাম লাটভবনের নীচে ভুটিয়া বস্তিতে যাবার রাস্তার পাশে 'হোম ডেন' বাড়ীতে। এর রক্ষক ছিল এক লেপচা পরিবার। তাদের আবার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। আমি যখন ওখানে

যেতাম মেয়েটি আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করত? কতটা আমার ছবি দেখার উৎসাহে আর কতটা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার উৎসাহে, বুঝতে পারতাম না, সমরেশরা যাওয়ার সময় ওদের এ-বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু, তাতে কি হবে? "ভবি ভোলার নয়।" যাই ঘটে থাকুক আমাদের লাভ হয়েছে দার্জিলিং-এর ওপর তার লেখা একটি চমৎকার উপন্যাস যার মধ্যে আমার বিষয়েও দুচার লাইন লেখা ছিল। এরকম ঘটনা ওর আমার অনেক ঘটেছে। তার ফলশ্রুতি ওর রচনায় বা আমার ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সেটিই দেশের আসল লাভ।

সত্যি আমি বিচলিত হয়েছি সমরেশকে নিয়ে যে সাংস্কৃতিক ব্যবচ্ছেদ শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় ভেবে। সমরেশের ক্ষেত্রে তবু একটা সুবিধা আছে কারণ ওর প্রাত্যহিকতায় সঙ্গীসাথী থাকত, আমি তো চিরকালই একা, আমার তোমরা কি করবে?

একজন স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী পাঠিকার চোখের সামনেকার জ্ঞানসীমার মধ্যে কিভাবে শিল্প বা সাহিত্য রচিত হয়। তার একটা সহজ সরল বিবৃতি বা রচনা এইজন্যেই তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। যাতে পাঠকসাধারণ সহজেই বুঝতে পারে আচারআচরণের সঙ্গে সৃজনের সম্পর্ক কতটুকু? এখনও তোমরা সেটিকে প্রকাশের প্রয়োজন বোধ কর নি। কারণ, বোধ হয় তোমাদের মত সম্পাদকের কাছে সমস্যার জটিল কচকচি উপাদেয় বলে মনে হয়। তাতে সত্য যত সীমিতই থাক। রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণে বোঝা যায় সমরেশ তার সাহিত্যিক মানসিকতার মতই অস্থির চিত্ত ছিল। তাই নিশ্চিন্তে সে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিল। আবার পার্টি ছেড়ে দিতেও সে দ্বিধা করে নি। সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেনি যে পার্টি বা পার্টি ছাড়া জনগণের কাছে তার কমিটমেন্টকে সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না, পারেও নি সে তার সারা জীবনে। আর্থিক প্রয়োজনে বা সাংসারিক চাপে সে আনন্দবাজারের ছত্রতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। আর মুচলেকা দিতে অস্বীকার করেছিল স্বাধীকার-সচেতন বলে। বিশেষ করে কমিটমেন্টের কথা ভেবে। কুম্ভমেলায় ও যখন আনন্দবাজারের টাকায় ঘুরছে, আমি তখন গাঁজা খেয়ে সাধুসঙ্গ করে ছবি এঁকে বেড়াচ্ছি, অবশ্য আমার কিছু স্থানীয় হিন্দি সাহিত্যিক বন্ধুও ছিল। এখানেই শিল্পী ছেড়ে ব্যক্তির কথা আসে, সমরেশের সাংসারিক মোহ ছিল। তাই সাধারণের চোখে তার কিছু কিছু বিচ্যুতি হয়তো চোখে পড়ে। আর আমি ছিলাম বায়ুভূক নিরাশ্রয়, তাই মোহমুক্ত। কিন্তু সৃষ্টি ক্ষেত্রে আমরা দুজনেই সৎ এবং আত্মপ্রত্যয়ী। আমি বড় সচকিত হয়েছি সমরেশের সাংস্কৃতিক ব্যবচ্ছেদ দেখে, আমি দেহ দান করে থাকলেও আমার শিল্পসত্বাকে দান করিনি, এবং আমার মৃত্যুর পর বিভ্রান্তিকর সাংস্কৃতিক ব্যবচ্ছেদের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত।

দয়া করে সহজ করে সত্য কথা বল, পরিচয়েকে আমাদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য করে দাও। এই আমার অনুরোধ।

সাড়া নেই

অরুণ মিত্র

আজই সকালে সূর্যকরোজ্জ্বল হাত শূন্যে
তুলে আমি ডেকেছি। অনেকবার। কই, কারো
সাড়া পেলাম না। তাহলে নিশ্চয় আমার আলোর
ছিটোন্ ক্ষিদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এখন তো
ঘেরাটোপের সময় এসে গেল। আর কেউ বেরোতে
পারবে না, কাউকে চেনাও যাবে না আর।
ঝুপ্ড়ি থেকে নর্দমার ধার পর্যন্ত মহাযাত্রার
কত মোড়! সেখানে তুলোট বেলা। পাঙাশ আকাশে
কিছু কি আছে, কোনো স্ফুরণ? সেখানে আমার দৃষ্টি
যায় না। আমি হাত নাড়ি আর উজ্জ্বলতার ঢেউগুলো
হারিয়ে যায়। কত মোড়।

সমুদ্র-পঞ্চক

মণীন্দ্র রায়

॥ ১ ॥

যেন ক্ষিপ্ত যুদ্ধঘোড়া, লাগামের টানে অকস্মাৎ
পিছনের পায়ে খাড়া; পরক্ষণে ঝাঁকিয়ে কেশর
ঢেউয়ের চূড়ান্তে উঠে হ্রেষাধ্বনি, শব্দের সংঘাত;
আর ফেনপুঞ্জে হীরা, প্রাণোচ্ছল—সমস্ত প্রহর
দেখি এই। কখনো-বা মনে হয় যেন বাসুকীর
নাতিপুতি অজগর আজো করে সমুদ্রমন্থন

অমৃতের লোভে ; কিন্তু ঘননীল বিষের অস্থির
জ্বালার নিশ্বাসে খোলে পাতালের রুদ্ধ পাটাতন
এ-বুকে আমার। ভাবি—জন্মাবধি আমি এরকমই
কখনো-বা যুদ্ধঘোড়া ; কখনো-বা বিষের বাসুকী।
নেই নোঙরের স্থিতি ; শুধু ঢেউ, শুধু জলভ্রমি
ভুল স্বপ্নে, আঘাটায়, নাকাল করেছে অহেতুকী।
শুনেছি সমুদ্র আনে স্নায়ুশান্তি। আমি আজীবন
করি চেষ্টা, পুনর্চেষ্টা,—পাই শুধু অশ্রুর ক্ষরণ॥

॥ ২ ॥

নির্মেঘ পূর্ণিমা-জ্যোৎস্না সমুদ্রের ঢেউয়ে জহরত
ঢেলে দেয়। আদিগন্ত নীলে শুধু সুন্দরী নারীর
সাতনরী হাতের ঝিলিক। আমি বসে স্থাণুবৎ ;
কোষে-কোষে, রোমকূপে পান করে আমার শরীর
দুর্জ্ঞেয় নেশার মতো এই দৃশ্য। অস্থির ঢেউয়েরা
চাঁদের সাপুড়ে-বাঁশি শুনে দোলে বিমুগ্ধ ফণায়।
হয়তো এমনই রাতে প্রত্ন-পিতামহ বুঝি ডেরা
বেঁধেছিল ভেলা বেয়ে অকূলের পলিনেশিয়ায়।
হয়তো এমনই জ্যোৎস্না তোলে রক্তে প্রশ্নের জোয়ার
—কেন জন্ম, কেন মৃত্যু, কেন এই অণুরেণু বাঁচা ?
হয়তো-বা খোলে অন্য চেতনার জং-ধরা দুয়ার—
আপাত-শান্তির নিচে জ্বলন্ত ইটের তপ্ত পাঁজা
চোখে পড়ে। হয়তো-বা রক্তে জাগে দুঃসহ বিষাদ ঃ
যেন বা দামিনী বলে দীর্ঘশ্বাসে—মিটিল না সাধ॥

॥ ৩ ॥

এম্নিতে সমুদ্র যেন চেকভের ডার্লিং-এর মতো—
যখন ঘরণী যার, মনেপ্রাণে তারই প্রিয়তমা।
হয়তো তিথির ষড়যন্ত্রে কিছু হয় সে বিব্রত ;
জোয়ারে সে কূলপ্লাবী, টানে যদি পূর্ণিমা কি অমা।
আবার কুঞ্চিত চুলে হাওয়া এসে কেটে যায় বিলি।

শিশুরা বালিতে ঘর বাঁধে, ঢেউ-জিহ্বা তাকে মোছে।
ফেণা আর ফসফরাসে বহুদূর জলে ঝিলিমিলি।…
মনে হয় চেনা। কিন্তু অন্তরে স্বৈরিণী নারী ও যে—
অকস্মাৎ বুকে তার ক্ষেপে ওঠে টর্নেডো, সাইক্লোন
ঘূর্ণিতে মোচড়ায় ডিঙি, পাঁজরা-ভাঙা মাঝিমাল্লা ডোবে।
উন্মাদিনী নারী সেই, কী করতে কী করে তার মন—
উড়ন্ত সে-উর্বশীর শাড়ি কোন্ পুরূরবা ছোঁবে?…
আমৃত্যু সমুদ্র দেখে, ঘর করো, ভালোবাসো, তুমি
আর এগিও না। তার মনের হেঁসেল আগ্‌লে টগর বোষ্টুমী॥

॥ ৪ ॥

আহত বাঘের মতো সমুদ্র নিঃশব্দে পড়ে থেকে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে দেয় হিংস্র লাফ ঢেউয়ের বর্তুলে।
কখনো-বা শুনি মত্ত হাওয়ার গোঙানি তোলে ডেকে
আদিপ্লাবনের সেই যূথস্মৃতি নোআ-র মাস্তুলে
প্রজন্মের ত্রাস। কী সে বলে? ওই বর্বরের ভাষা
হয়তো আতঙ্ক নয়, করুণারই খুঁজেছে স্পন্দন
মানুষের বুকে। তবু দেখ একি সৃষ্টির তামাশা—
কোটি প্রজাতির লোপ ঘটেছে জেনেও এ-কেমন
রাস্তার ম্যাজিকে মাতে তেজস্ক্রিয় বল্‌গুলি নিয়ে
বিস্ফারিত ছত্রাকের ধ্বংস এনে দিতে। সমুদ্র কি
লক্ষ ঢেউয়ে তোলে তাই তর্জনী? অথবা কী এ
খোঁজে এই অন্ধকারে ফসফরাসে জ্বেলে চকমকি
অজানা প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ের কোষকলা ছিঁড়ে
আমারই আক্রান্ত মনে; কণ্ঠহীন অশ্রু ও রুধিরে?

॥ ৫ ॥

বসেছি ছাত্রের মতো, খুলে রুদ্ধ আত্মার দুয়ার—
হে সমুদ্র, আকাশদর্পণ, তোমার সমীপে এসে।
বিপুল নীলিমা যেন চেতনাপ্রবাহে চুরমার
ঢেউয়ের আঘাতে, তবু কী কৌশলে তুমি শান্ত হেসে

হৃদয়ের হাসপাতালে এনে দাও শুশ্রূষা, আরাম,
বুঝি না কিছুতে। তাই বসেছি বালুতে, খোলো পুঁথি
দেখাও সে-শ্লোক, বলো, শুধে দিতে হয় কতো দাম
অস্থিরের কেন্দ্রে বসে স্থিরতার পেতে অনুভূতি ?···

জানি না কী কথা বলো সংঘর্ষের ঢেউয়ের বাতাসে।
শুধুই ঝিনুকভাঙা বতিচেল্লি ভেনাস তো নয়,
ও-জল আবিল রক্তে—হাঙরের দাঁতে, অক্টোপাসে ;
তবু কী প্রশ্রয়ে দেখ যৌবনের স্নানের প্রণয় !

দাও সে স্নায়ুর শক্তি—তারের খেলায় মৃত্যুঝুঁকি
শেখাও ; এ-বুকে চেপে অগ্নি, লাভা, লক্ষ জ্বালামুখী ॥

তোমার ভালোবাসা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমার ভালোবাসার গোলাপটিও একদিন
তোমার অলক্ষ্যে বদলে যেতে পারে।

তোমার এই ভালোবাসা কি কাছে টানে
নাকি দূরে ঠেলে দেয় ?
অপেক্ষা করতে পারে দিনের পর দিন,
রাত্রির পর রাত্রি নিদ্রাহীন ?
অথবা সমুদ্রঢেউয়ের মতো কি তার ওঠানামা,
নাকি বুদ্বুদের মতো,
দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

অথবা যেন জেট বিমান, দ্রুত
আকাশের দিকে উঠে যায় একবার,
পরমুহূর্তেই
ধূম্রজাল ছড়িয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে
মাটিতে ভেঙে পড়ে ?

নাকি হাজার হাজার মানুষকে টেনে আনে
ধুলো আর কাঁকরের পথে
এতোদিনকার ধুলিধূসর জং-ধরা পরিবেশে
নতুন পালা রচনার জন্যে ?

তোমার ভালোবাসা একান্ত ব্যক্তিগত, খুবই স্বাভাবিক,
কিন্তু তুমি তো জানো এই মুহূর্তে
কী এক সময়, সব দৃশ্য বদলে যাচ্ছে,
বদলে যাচ্ছে তোমার ভালোবাসার
বর্ণাঢ্য গোলাপও।

পথ জ্যোতির্ময়

গোলাম কুদ্দুস

একবার বৎসরান্তে ওরা
গোরস্তানে যায়
জ্বেলে দিতে বাতি।
সম্বৎসর বুকে রাখে
সে আলো লুকিয়ে
কাকপক্ষী কেউ কি তা জানে!
প্রতিদিন পাশ দিয়ে চলে যায় বহু
বুকভরা এমন প্রদীপ
অজ্ঞ আমি দেখি শুধু চলমান শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ বদন!
ওগো, যারা চলে গেছে
আমার স্মরণ-দীপ হয়ে
জ্বলে ওঠো চতুর্দিক থেকে
যাতে দেখি আঁকাবাঁকা পথ আমি নিকষ আঁধারে।

একদিন নিভে যাব যবে
হয়ত প্রদীপ হয়ে জ্বালাব নিজেকে
স্মরণের পথে কারো,

সে-ও যাবে তার পথে একদিন
আমাদের সবাকার মত
যদি না তখনো
মানুষের তপস্যা কঠোর
জ্ঞানশিখা রূপে ভেদ করে মৃত্যু-অন্ধকার।
হয় যদি জীবনের জয়! জয়! জয়!
সে পথও জ্যোতির্ময়, স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়।

আকাশের ওপরে আকাশ

রাম বসু

আকাশের ওপারে আকাশ
ক্রম-সংকুচিত পৃথিবীর ধারে বিহ্বল মানুষ

কেউ ভাবে মৃত্যু-পরিণয়ে পাবে প্রার্থিত উত্তাপ
কেউ বা রাত্রির পায়ে নিবেদিত অশোকমঞ্জরী
সব ভাবনা হাওয়ায় উড়িয়ে কেউ
সরাইখানার স্বর্গে বেহেড হুল্লোড়

সকলেই খুঁজে মরে অদিতির পরম প্রকাশ
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে
সুপর্ণ পাখির ঠোঁটে একগুচ্ছ যব
আর এমনই নিয়ম
অবোধ্য ইংগিতগুলি নক্ষত্রের স্তবকে স্তবকে
লুকিয়ে মুচকে হাসে

মর্মের খোলশ কিন্তু কাঠবাদামের মতো
তাই তো মানুষ থার্মোমিটার ভাঙা পারা
অথবা মাকুর মতো বুনে চলে নিজস্ব প্যাটার্ন

নাকি বিহ্বলতা সাময়িক?
চোখের ওপর থেকে টর্চের আলো সরে গেল

অন্ধকার
অন্ধকারে একলা সবাই

যেহেতু মানুষ সে নিত্যকালের মানুষ
বিহ্বলতা বিধিলিপি তার
ধ্রুবতারার জ্যোতিও তরঙ্গিত ঈথার তরঙ্গে
বুকের অমোঘ রাত্রি গাঢ়তর হলে বোঝা যায়
ক্রম-সংকুচিত পৃথিবী ও ক্রম-বিকশিত জীবন্ত নীলিমা
বিরোধ-বিহীন ঐক্যে সুষমা-শাসিত
মৃতদের পৃথিবীর বুকের ওপর
সোমরসে প্রদীপ্ত বয়ান তুলে কাল
চলমান সমুদ্রের গান গেয়ে যায় ।

অনুবাদ কবিতা

ইকবাল থেকে

শঙ্খ ঘোষ

গাও সেই গান উটকে যাতে মাতায় প্রেমের জোয়ার
বন্ধু ইয়াথ্ রিবে আমরা নেজ্ দে হে উটসওয়ার ।

বৃষ্টি দিল মেঘ, মাটিতে ঘাস তুলেছে মাথা
হতেও পারে সেইখানে উট হালকা চালে চলে
হৃদয় আমার কাঁদছে কেবল দূরে থাকার ব্যথায়
ধরো সেপথ, যেখানে আজ অল্প ঘাসই ফলে ।
উট তো আমার ঘাসেই মাতাল, আমি মাতাল প্রেমে
তোমার হাতে আমার উট আর আমি প্রেমের হাতে,
তালের পাতা ভিজল যত পাহাড়চুড়োর ওপর
জলের পথও বানায় ওরা মরুভূমির খাতে ।
ওই দূরে দুই হরিণছানা একের পরে একে
দেখো কেমন পাহাড় থেকে আসছে ওরা নেমে,
মরুভূমির ঝর্ণা থেকে তৃষ্ণা মেটাও ক্ষণিক
পথিকজনের দিকে তাকাও একটুখানি থেমে ।

শিশির প'ড়ে রেশম হলো সমতটের বালু
উটের পক্ষে সেপথ এমন শক্ত মোটে নয়
হাঁসের ডানার মতন মেঘে পাকের পরে পাকে
লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে—বৃষ্টিকে তাই ভয়।

বন্ধু ইয়াথ্‌রিবে আমরা নেজ্‌দে, উটের সওয়ার
গাও সেই গান উটকে যাতে মাতায় প্রেমের জোয়ার।

পুজো ১৯৮৮

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ছুটির দুপুরে ভরপেট খাওয়ার পর
টুথপিকের কুকৃরি দিয়ে
দুসারি দাঁতের পাহারা সাফ করতে করতে
ভরাট গলায় বলে উঠি—
এবার পুজোয় দার্জিলিং।

সঙ্গে সঙ্গে
চারপাশ পাগল ক'রে বেজে ওঠে দমকল,
এক লহমায়
আমার আট বাই দশ ঘরে
হু হু ঢুকে যায়
তরাই-এর ঝুঁটিছেঁড়া মেঘ
শিকড় ওপড়ানো একটার পর একটা রেললাইন
চোখা ছুঁচের মত জাতীয় সড়ক
আর
গেণ্ডিপেণ্ডি গাইবাছুর সমেত
আশিলাখ বানভাসি মানুষ।

এই দিশেহারা অরণ্য মেঘ মানুষের দঙ্গলে
কোনোরকমে দুপা সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে উঠতেই
খলখল গলায় ডেকে ওঠে
তিস্তা রায়ডাক মহানন্দা কুলিকের
তিন বছরের জমাট বাঁধা অভিমান—
আয়।

জন্ম নিক নতুন সন্দীপ

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

"চারিদিকে বিদ্রোহের দিনপঞ্জী লেখার গৌরবে / কবি কিশোরের / আকালে ও / নবান্ন-উৎসবে, অবেদিন-স্কেচে, সন্দীপের চরের / মৃত্যুহীন / নবজীবনের মতোই জাগ্রতের গানে… / তিনপুরুষের আশ্লেষ মেনে / এমনকী কবিতাভবনেরও কবিতার / নিরিখের তর্কে / কল্লাকের ডাকে…"—সাতের দশকের শেষ প্রান্তে এসে সিদ্ধেশ্বর সেন এইভাবেই; প্রায় তিরিশ বছর আগের, চারের দশকের মধ্যবর্তী সময়ের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিকে কাব্যভাষায় গ্রথিত করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। এ হয়তো একধরনের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনও, যে সময়টিতে বাংলা কবিতা ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছিল নতুনতর ভাষা ও পূর্ণতায়, কাব্যতত্ত্বের সমগ্র নান্দনিক সমূহকেই তখন দেখা হচ্ছিল নতুন দৃষ্টিতে, তিনিও তো ছিলেন তার অন্যতম শরিক। ঠিক এতোটা স্পষ্টভাবে না হলেও, তৎকালীন প্রায় সকলেই, কবিতা অথবা গদ্যে, এই সময়টিকে নানাভাবে দেখতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে। আমাদের সংস্কৃতির জগতে এই সময়টি চিহ্নিত করে একটি বিশেষ কাল-প্রবাহকে। ঠিক সেই সময় মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এমন কতগুলি বিপরীতমুখী ঘটনা-অভিমুখ সংঘটিত হয়েছিল, যার প্রভাবে অনেকটাই বদলে যায় সাহিত্যের প্রথাগত মূল্যবোধগুলি। সেই চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মানবেতিহাসের যে ধারায় সমৃদ্ধ হয়েছিল আমাদের মনন, যার প্রধান লক্ষণ ছিল, যুগ-যুগান্তের ধরাবাহিকতায় মানুষের যে জৈবিক ও হৃদয়গত বিবর্তন, এই প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত মানুষের উপলব্ধি ও অনুভবকে একটি সুশৃঙ্খল চিন্তা ও ভাবের দ্বৈত-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপ দেওয়া। মানুষের সীমাবদ্ধ কতগুলি নির্দিষ্ট অভাব অথবা আকাঙ্ক্ষাকে চিরায়ত প্রকৃতির সমান্তরালে লক্ষ্য করা। একটি বিষয় স্পষ্ট, এই পর্যায়ে চেতনার চলমান যে ধারাটি সভ্যতার মেরুদণ্ড, তার সামগ্রিক রূপটি আমাদের খণ্ডিত বলে মনে হয়। খণ্ডিত একটি বিশ্বের চিন্তার নিরিখে, যেখানে আমরা মানুষকে তার সমষ্টিগত অভিপ্রায়ে ও দীর্ঘকালীর আকাঙ্ক্ষার সুপ্তিমগ্নতায় চিনতে পারি না।

যে-বিশেষ সময়টির কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি, চারের দশকের সেই গমগমে দিনগুলির মাধ্যমে আমাদের শিল্প বা কাব্যচিন্তায় যুক্ত হয়েছিল এমন একটি চেতনার মাত্রা, যার ফলে আমাদের পুরনো মূল্যবোধগুলি নতুন-ভাবে নিজেদের যাচাই করতে বাধ্য হয়েছিল। হয়তো সামগ্রিক কাব্যভাবনায় এমন কোনো ইঙ্গিত বহু পূর্বেই ছিল, কিন্তু এই প্রথম, চিন্তার প্রক্রিয়া হিশেবে তাকে আমরা যুক্ত হতে দেখলাম কবিতার বা অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে। ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের সূচনার মাধ্যমে মানুষের সচেতন প্রয়াসের যে বিশ্ববিজয় লক্ষ্য করা গিয়েছিল, সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭-তে তারই পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল। এই ঘটনাটি ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষতবিক্ষত ভারতবর্ষের বিবেককে জাগ্রত করেছিল। তাহলে মানুষ শুধু দৈবীমায়া অথবা নিয়তি-তাড়িত অসহায় প্রাণীই নয়, সে-ও হতে পারে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তৈরি করতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত জগত। পাশাপাশি কিন্তু ভারতবর্ষ তখন অস্তাচল-গমনে উদ্যোগী ব্রিটিশ সূর্য। কিন্তু অপশাসনের ক্ষত তখন এদেশের সর্বাঙ্গে—যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হা-ভাতে মানুষের হাহাকার। কিন্তু ভারতবর্ষের জাগ্রত বিবেক তখন আকুল নয়নে তাকিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার দিকে, যেখানে ভোগ্যপণ্য অধ্যুষিত সমাজের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভারী হাওয়ায় এদেশ প্লাবিত। রাজতন্ত্র-শাসিত কাব্যচর্চা তখন বেদ-উপনিষদের পথ ধরে ভারতীয় ভাবাদর্শ প্রচারে আগ্রহী। দুটি স্রোত মিলেমেশে একাকার হয়ে গেল। ঔপনিবেশিক চোঁয়া-ঢেকুর এবং মিল-বেন্থামের উদারনীতি মিলেমিশে তৈরি হল মিশ্র-সংস্কৃতি। কিন্তু এই অচলায়তনে ধাক্কা মেরেছিল চারের দশকের সেই উদ্দাম বাতাস। সোভিয়েত বিপ্লব এবং এদেশের দাঙ্গা-মহামারী—এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতের টানাপোড়েনে একটি সত্য স্পষ্ট হল, যে, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শিল্পের মূল্যবোধের আওতা থেকে অনেক দূরে। আশ্চর্য এক দূরত্ব সেখানে—জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে শিল্পের মূল্যবোধের সেখানে বিশাল ফারাক। আশ্চর্য কেন একজন মানুষ ভিয়েতনামী একজনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে না, যখন তাদের শত্রু এক? বিশাল পৃথিবী আমাদের কাছে ছোট হয়ে এসেছে, হয়তো চিন্তার স্তরে পৃথিবীর অন্য অংশের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তা আমাদের সামনে অপেক্ষমান মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনের আলো দেখায় না।

ঠিক এইরকম সময়ই আমাদের কবিতায় যুক্ত হয়েছিল চেতনার নতুন মাত্রাটি। তা কোনো তথাকথিত আধুনিকতা নয়, যুগবাহী ঐতিহ্য মেনে

নিয়েই, বলা যায়, শুরু হয়েছিল নতুন পথ চলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এ-ও একটি বাঁক, অন্যতম প্রধান বাঁক। চেতনার এই মাত্রাটি বিরাট কোনো বিশ্বভূমিকে প্রত্যক্ষ করল। ঔপনিবেশিক শাসনে অন্ধ হয়ে কেবল মিথ্যা স্বপ্ন, ঝুটা আদর্শ বা শৌখিন নিসঙ্গতা বা কেবলমাত্র আত্ম-কণ্ডূয়ন নয়, ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিয়ে চারপাশের ক্ষতস্থানকে বোঝা যাবে না, বরং তাকে বুঝতে হবে সমষ্টির চোখ দিয়ে। অন্ধকারকে না বুঝলে বোঝা যাবে না আলোর স্বরূপকে। [আমাদের কী এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে 'সেই অন্ধকার চাই' এর কবি বিষ্ণু দে-কে।] এইভাবেই খুলে যায় বিশ্বের দরজা। এ-যেন ব্যক্তির চোখ দিয়ে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করার মহাকাব্যিক সংগ্রাম। কবিতা বা শিল্পের কোনো দেশ নেই। এ-কোনো ভাববাদীর চিন্তা নয়, নিজের দেশের জমিতে পা রেখেই বিশ্বকে আপন করা। তাই তো অমিতাভ দাশগুপ্ত সহজেই উচ্চারণ করতে পারেন—

"রোডেশিয়ার এক গেঁয়ো রেলপথ বেয়ে
ঐ হেঁটে চলেছেন নগ্নপদে মোহনদাস
দুপায়ের কাঁটামারা জুতোর তলা থেকে
জেগে উঠছে রবি ঠাকুরের কবিতা।"

এই নতুন চিন্তাই আমূল বদলে দিল বাংলা কবিতা। তিরিশ বছর আগে যুক্ত হয়েছিল চেতনার যে মাত্রা, তাই আজ নতুন ভাবে আমাদের কাব্যশরীরে প্রতিমায়িত। নিরক্ষর এই দেশে কবিতা হয়তো সকলে পড়ার সুযোগ পায় না, কিন্তু কবিতার যে অন্তর্বস্তু মানবকে সুন্দর করে, তাই আবার শক্তি যোগায় বলিভিয়ার একজন গেরিলাকে। জীবনকে কবিতার মতো আমরা চাই না, কিন্তু মানুষের জীবনে কবিতা থাকুক। এই চেতনাকেই আমরা মানুষের কবিতা আখ্যা দিতে চাই। অমানুষের কবিতা তো কেউই লেখেন না, কিন্তু প্রশ্নটি জীবনদর্শনের। আজকে বাংলা কবিতায় প্রাতিষ্ঠানিক ছত্র-ছায়ায় যে কবিতার জন্ম হচ্ছে, মানুষ তো থাকে সেখানেও। কিন্তু কেমন সে মানুষের চেহারা?' ভগ্ন, হতাশ অথবা ভোগী অথবা উচ্চাশী।

বর্তমানে আমাদের সংস্কৃতি-চর্চায় নিরপেক্ষতার জয়গান বড় বেশি। 'বামপন্থী' শব্দটি শুনলেই মনে হয়—'ঐ বুঝি স্তেপ-অঞ্চল থেকে নেমে আসছে কমিউনিস্ট ডাকাতরা'। বেশ বোঝা যায়, যন্ত্রণা কোথায়। এই পৃথিবীকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লুঠপাট করতে একমাত্র বাধা কমিউনিস্টরাই। তাই আমরা ভুলে যাই জাঁপোল-সার্তের সেই ভবিষ্যদবাণী—"বামপন্থার মধ্যেই লুকিয়ে

আছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।” আমরা কোনো কবিকে চিহ্নিত করতে চাই না, কিন্তু একজন মানুষের কবির জীবনদর্শন যে গঠিত হবে এই পথেই, সার্ত্র তা উচ্চারণে দ্বিধা করেননি। তাকেই হয়তো মানুষের কবিতা বলা যায়, যেখানে মানুষের সামগ্রিক কর্মসূচীকে একজন কবি ক্রমশ প্রসারিত করবেন ভবিষ্যতের দিকে। যদি ভবিষ্যতের গর্ভে তার কোনো ইঙ্গিত না থাকে, তবে তা কখনোই মানবিক হতে পারে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমরা লক্ষ্য করব এমন তিনজন কবিকে, চারের দশকের নব-চেতনার মাত্রায় সমৃদ্ধ হয়েছে যাঁদের কবিতা। এই কবিদের আমরা প্রতিনিধিস্থানীয় বলতে পারি না, কারণ এতো বড় তার পরিধি যে, সেখানে অগ্রজ কবিদের সংখ্যা কম নয়। বিষ্ণু দে, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসুর নাম সহজেই চলে আসতে পারে। কিন্তু আমরা বেছে নিলাম অরুণ মিত্র, সিদ্ধেশ্বর সেন ও অমিতাভ দাশগুপ্তকে। কারণ, এর ফলে একটি ক্রম পাওয়া যাবে, অরুণ মিত্র সরাসরি সেই সময়ের সঙ্গে যুক্ত, সিদ্ধেশ্বর সেনের আবির্ভাব অল্প পরে, এবং অমিতাভ দাশগুপ্ত এই সময়ের ফসল। আবার তাদের কবিতার সুরটিও তিনটি পৃথক সত্তাকে তুলে ধরে।

দীর্ঘদিন আগে কার্ল মার্কস একটি ছোট চিঠিতে বলেছিলেন—“চেতনা হচ্ছে এমনই একটা জিনিস, যা দুনিয়াকে অর্জন করতেই হবে। না-চাইলেও অর্জন করতেই হবে।” এই অর্জিত চেতনার স্বরূপটি বহুমাত্রিক। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব, তিনজন কবি কেমনভাবে সারাজীবনের চেষ্টায় এই চেতনা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে ও কবিতার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। মনে রাখতে হবে, হঠাৎ-জানা কোনো অভিভূত মানুষের মুগ্ধতায় নয়, সমস্ত জীবনব্যাপী বোধের পরিণতিতেই এই চেতনা অর্জন করা সম্ভব।

* * *

অনেকের মধ্যে নিজেকে আশ্চর্যভাবে আলাদা করে নিতে পারেন অরুণ মিত্র। এই পৃথকীকরণ কোনো অহং থেকে নয়, বরং তাঁর কবিস্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে এর কারণ। সেই ১৯৪৩-এ ‘প্রান্তরেখা’ দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর পথচলা, আজ পর্যন্ত কতো চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি এসে পৌঁছেছেন এক সন্ধিক্ষণের সামনে। চারের দশকের অগ্নিগর্ভ দিনগুলির শ্বাস-গন্ধ গায়ে মেখে কবিতার প্রাঙ্গণে তাঁর আবির্ভাব। তখন দুচোখে শুধুই নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। সে-সময় পরপর প্রকাশিত হচ্ছে ‘কসাকের ডাক’, ‘ভূমিকা’, ‘লাল

ইস্তাহার', 'আন্তর্জাতিক'-এর মতো স্বপ্নময় কবিতা। সমস্ত বিশ্বকে তিনি দেখছেন সমষ্টির চোখ দিয়ে। তাঁর কবিতার প্রথম প্রবণতাটি, যেটি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট, তখনই ফুটে উঠেছিল তাঁর কবিতায়। পাশাপাশি তাঁর কবি-চরিত্রটি ছিল ধ্যানমগ্ন। কিন্তু কখনোই তা পলায়নে ব্রতী নয়। প্রবণতাটি হলো, তাঁর কবিতার সামগ্রিক আবেদনটি আমাদের টেনে নিয়ে যায় অনিবার্য ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যৎকে অনুসন্ধানে রত হতে বাধ্য করে। স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কী আছে সেই ভবিষ্যতে?

> "শহরের ধুলো
> গহন মাটির কথা বলে চলে
> যেন কোনো বীজ থেকে অপরূপ রহস্য জন্মাবে।"

এই ভবিষ্যতের দিকে যাত্রাই কী, উল্টোভাবে, তাঁর শিকড় সন্ধান? নিরন্তর শুধু পৃথিবীর পথে ভ্রমণ নয়, যাত্রাপথের অণুবিশ্বকে আঁতিপাতি করে খোঁজা, কারণ তার মধ্যেই তো তৈরি হবে ভবিষ্যতের পথ। সেখানে কী অপেক্ষা করে আছে, আমরা জানি না। তবু মানুষের কবি[illegible] খোঁজ করতেই হয়, ঐপথেই তো সভ্যতার যাত্রা। তিনি জানেন [illegible]পাশের ভয়ংকরতাকে—"মলাট খুলতেই বেরিয়ে এল চেনা মানুষ আর চেনা রাক্ষস—" "তবুও তো মানুষের আশার মৃত্যু হয় না—"অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলেছি / তোমার মরা খাতে পরী নাচাও—"।

অরুণ মিত্রের কবিতা-ভাবনা অনেকাংশে তাপ পেয়েছে ফরাসী ভাষাচর্চার মাধ্যমে। প্রথমদিকে তার যে সরাসরি কথা বলার ঝোঁক ছিল, পরবর্তীকালে সেখানে যুক্ত হলো কিছুটা কৌতুক ও শ্লেষ, নিরাসক্ত মেজাজ। কিন্তু আন্তরিকতা ও মানুষের সপক্ষে ভাবনার সততায় তিনি যে আস্থাশীল, তা বোঝা যায়, যখন সম্পূর্ণ ভিন্নচিন্তার কবি র‍্যাবো তাঁর প্রিয় কবিদের তালিকায় প্রথম সারিতে থাকেন। এই আন্তরিকতাই তাঁর কবিতার দ্বিতীয় প্রবণতা। যে-স্বপ্নময় আকাশে তাঁর চলা শুরু, ইতিমধ্যে সেখানে জটিলতার ঘনঘটা। পথ ছেয়ে গেছে কুয়াশায়, মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার সামনে বাধার দেয়াল ট্রিগারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশকে আর 'নিবিড় উৎসাহের প্রবাহ' বলে ভাবা যাচ্ছে না। নানারকম প্রতিকূলতা, শংকা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় অস্থির তিনি কেবল আন্তরিকতাকে অবলম্বন করেই খোঁজ করেন 'অনন্ত রৌদ্রের ভূমিকা'-র। পাশাপাশি বদলে যাচ্ছে তাঁর ছন্দমাধ্যমও। শুরু হলো গদ্যছন্দের, যার চরম পরিণতি দেখা গেল 'উৎসের দিকে' গ্রন্থে।

স্বাধীনতার পর যে তীব্র স্বপ্নে আন্দোলিত হয়েছে তাঁর কবিতা, যত সময় গেছে, খাদ্য-আন্দোলন, দাঙ্গা, সাতের দশকের যুবমেধ ইত্যাদি তুমুল ঘটনাবলীতে সেই স্বপ্ন যেন আরও স্থায়িত্ব পেয়েছে। অনেক মোড়-বাঁকের মধ্যেই যে কবির হৃদয়ে একটিই আশা অনির্বাণ থেকে যায়, তা হল তীব্র ভবিষ্যৎ-আকাঙ্ক্ষা তবে এইটুকু আমি অনুভব করেছি যে আমাদের মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর রয়েছে। "তুমি মৌসুমকে জানো, ফলনকে জানো ; এই মাটিকে একবার তুমি আদর করে ছাখো।" সরল একটি চিন্তা এখানে অনায়াসে চিরায়ত হয়ে যায়।

তাই হয়তো অরুণ মিত্রের কবিতায় বারবার পাথরের প্রসঙ্গ আসে। পাথর, তা তো বস্তুর প্রতীক। আর বস্তুই তো ভবিষ্যতের আধার। প্রত্যেক বস্তুকণাই ধারণ করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে। এই 'পাথরের গুঞ্জন' শুনেই তিনি জয় করেন একাকীত্বকে। আমাদের চারপাশে আমরা একা নই, 'কিছুই স্তব্ধ নয় এই[illegible]ের আরম্ভ'। যে সন্ধিক্ষণের কথা আমরা আগে বলেছিলাম, তা এই স্বপ্নের [illegible]টি বদলে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে। স্বরূপ বদলালেও, তাঁর পরি[illegible]ক উৎসুক হয়ে চেয়ে আছেন কবি। তাই তো অনেকদিন আগে উচ্চারিত তাঁর সেই কথাটি এখনো অমোঘ মনে হয়—"আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর এসেছি ? যতদূরই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ঐ তারা এখন কাঁপছে আমি বুলার হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।"

সেই ১৯৫০-এই 'মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের গানে' গলা বেঁধে নিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বর সেন। তখনই অনেকাংশে নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি, পরবর্তীকালে যা ছড়িয়ে পড়েছে বৃহত্তর মহীরুহ হয়ে। একটি বিষয় বলে নেয়া প্রয়োজন। একজন পাঠক হিশেবে যত সহজে অরুণ মিত্রের কাছাকাছি চলে যাওয়া যায়, ততটা সহজে বোধহয় পৌঁছনো যায় না সিদ্ধেশ্বর সেনের কাছে। এমনটা কেন মনে হয় আমাদের, দুজনেই যখন অস্বীকার করেন না সংলগ্নতার দায়কে ? এককথায় এর উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তবু মনে হয়, তাদের দুজনের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেই এতো ভিন্নতা আছে যে, তা তাঁদের কবিব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত করে। অরুণ মিত্রের ভবিষ্যতের আশ্চর্যকে জানার চোখদুটির কারণে তা অনেক স্থির ও সহজ। এ বিষয়ে তার মিল আছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা কিছুটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তুলনায় সিদ্ধেশ্বর সেন সত্তা-সংকটের যন্ত্রণায় অনেক বেশি আলোড়িত, তাই

হয়তো স্থিতধী হয়েও বেশ অস্থির। এ-বিষয়ে তিনি বিষ্ণু দে-র অনেক কাছাকাছি।

এই অস্থিরতা চেহারাটি অনেকটাই বোঝা যায় সিদ্ধেশ্বর সেনের প্রথম দিকের কবিতায়। একজন সচেতন তরুণ, বামপন্থী ভাবাদর্শে দীক্ষিত তরুণ তাঁর অস্তিত্ব দিয়ে সামাজিক প্রতিবেশকে মেনে নিতে পারেন না। পরিচিত পৃথিবী আর মনোস্বপ্ন মেলানোর দুরূহ কাজে তখন হৃদয়ানুভূতির প্রাবল্যই বেশি। কিন্তু তা কোনো ভাবালুতা নয়, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানার কাজে ভাবালুতার ভূমিকা বড়ই কম। এই 'ঐতিহ্য' শব্দটি সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় বীজমন্ত্র হিশেবে কাজ করে। চারের দশকে চেতনার যে মাত্রা যুক্ত হয়েছিল, সেই বহুমাত্রিক বর্ণমালার অন্যতম হল ঐতিহ্যবোধ এবং ঐতিহ্যচেতনা। এর প্রভাব হয়তো পূর্ববর্তী কবিতায়ও ছিল, কিন্তু তা ছিল অনেকটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তির প্রেক্ষিতে অতীত ও মহাকালের সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন করার প্রচেষ্টা। কিন্তু তার কোনো সমষ্টিগত চে[illegible]না ছিল না। চারের দশকের এই চেতনার প্রভাবেই বিষ্ণু দে দাঙ্গার পরি[illegible]তে লিখতে পারেন 'জল দাও' বা সিদ্ধেশ্বর সেন লেখেন 'আমার মা'-[illegible] যেখানে পাষাণ-প্রাণের প্রতি বুকফাটা আর্তনাদটি অনায়াসে দৃষ্টি দিতে পারে শোষণ-ক্লান্ত মহাজীবনে। আর্তনাদের হাহাকার মুছে যায় মহাজীবনের স্বপ্ন-রূপায়ণে।

তবুও হয়তো তাঁর প্রথম দিকের রচনায় রয়ে গেছে কিছু হৃদয়াবেগ। তাৎক্ষণিকতার প্রস্তুতি। হয়তো তা অস্বাভাবিকও নয়—"এ মুঠোয় শক্ত করে ধরে থাকি জীবনের হাল / আমরা প্রস্তুতি মানি, সে আশার দিগন্ত বিশাল।" তারপর অনেকখানি সময় জুড়ে চলতে থাকে এই আশায় নিজেকে সংলগ্ন করার চেষ্টাটি। কিন্তু শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা ও আবেগ দিয়ে বর্তমান সময়কে লিপিবদ্ধ করার কাজটি বেশ দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। অভিজ্ঞতা যদি মননের রসে জারিত না হয়, আবেগ যদি মণীষাদীপ্ত না হয়, তবে সময়ের বহুমাত্রিক রূপটি অধরা রয়ে যাবে। এই চর্চাটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হলো 'নগরীর চাবি'-তে এসে। এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায়, সিদ্ধেশ্বর সেনের নিজের বৈদগ্ধ-সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি।—"ও কী বিবিক্ত / অন্ধকার ও আলোয় / ফেরে একহারা / উদয়-অন্তে আমরাই উৎসুক।" পরবর্তীকালে হৃদয়াবেগকে সংঘটিত করার কাজটি যতই এগিয়েছে, ততই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত পৃথিবীর প্রান্তর যেন খুলে যাচ্ছে তাঁর সামনে। ক্রমশ আমরা যেন লক্ষ্য করি, এই অর্জিত মণীষা, মনন ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে তিনি যেন অন্য কিছুর সন্ধানে ব্রতী। বারবার

বিভিন্ন কবিতায় তিনি আবহমান মানুষের হাহাকার ও প্রতিরোধের সেই ঐতিহ্যের কথাই বুঝি আমাদের স্মরণ করাতে চান। এটাই সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার অন্যতম প্রবণতা। বারবার তিনি একটি ধারাবাহিক, মানবিক ঐতিহ্যের কথা শোনাতে চাইছেন আমাদের। 'দেবীপক্ষ' কবিতায় ক্রীটের দেবী মূর্তির সঙ্গে আমাদের মূর্তির সাদৃশ্য তাই একাকার হয়ে যায়—"আমার তো মনে হয়, এই অর্বাচীন যদি / এতই প্রাচীন / আর সমস্ত প্রাচীন, সনাতন এক / কোনোকালে অর্বাচীন / এই প্রবহমানতা, তবে পরম্পরা, আশ্চর্যমুকুরে / ধরা আছে / আর, মনে হয়, এই যিনি দেবী / সিংহ-বাহিনী / গঙ্গামৃত্তিকার অথবা ক্রীটের / মাতৃউপাসনা-তন্ত্রে, ' বেঁচে / ক্ষণিক আনিত্য, তাহলে কী নয় নিত্যেরই?"—এইভাবে প্রবহমানতাকে আমাদের পরিচিত নিত্যের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রসঙ্গটি বারবার ঘুরে-ফিরে আসছে। এই পৃথিবীর প্রতিটি ধুলিকণায় আমাদের জন্মগত অধিকার, সত্যতার প্রতিটি অংশে আমাদের পিতৃ-পিতামহের স্বেদ-রক্ত লেগে আছে, এই উত্তরাধিকার বহন করেই নতুন ঐতিহ্যের দিকে এগিয়ে যান কবি। তাই মিথ থেকে পুরাণ, মায়াসভ্যতা থেকে আধুনিক কলকাতা—এ সবই বহমান তাঁর চিন্তার আকাশে। বাংলা কবিতার এই জরুরী কাজটি শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে। সেই ধারাকে মেনেই, তাকে নতুনতর ঐতিহ্যে স্থাপন করতে চেয়েছেন বিষ্ণু দে বা সিদ্ধেশ্বর সেন। এভাবেই তাঁদের কবিতায় জন্ম হয়েছে নতুন তত্ত্ববিশ্বের প্রতিদিনের চেনা, দীর্ঘদিনের প্রাচীন অচেনা পৃথিবীকে নতুনভাবে চেনা। চেতনার এই মাত্রাটিকে সিদ্ধেশ্বর সেন প্রতিটি কবিতায় আরও বাড়িয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাকেই আরও সমৃদ্ধ করছেন। এখানেই বাংলা কবিতায় তিনি স্বতন্ত্র। যে-সব সমালোচকরা বলেন, বামপন্থী কবিতা যান্ত্রিক, তাঁদের সবিনয়ে বলা যায়, সমস্ত পৃথিবীই বামপন্থীদের স্বদেশ, যা-কিছু মানুষের সপক্ষে, তাই চিহ্নিত হয়েছে বামপন্থী নামে। সেখানে যান্ত্রিকতার কোনো স্থান নেই। কবিতাকে ছোট ঘেরাটোপ থেকে আবিশ্বে মুক্তি দেয়ার কাজে তাঁদেরই ভূমিকা প্রধান। তাঁদের সবিনয়ে উচ্চারণ করতে বলব সিদ্ধেশ্বর সেনের এই লাইনটি—"আমাকেও নিয়ে যাও, নন্দিনী, তোমার হাত ধরে / যতদূরে, ছুটে যায়—তোমার জয়ের / ওই রথচূড়া।" আমরা বুঝতে পারি, এই ধরণের কবিতার মাধ্যমেই সবচেয়ে কম সময়ে বিশ্বকে প্রদক্ষিণ করে আসা যায়।

আবার অর্জিত চেনার স্বরূপটিকে সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিতে বোঝা যায় অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতায়। কালসীমায় তিনি অরুণ মিত্র ও সিদ্ধেশ্বর সেনের থেকে

অনেক ছোট, কিন্তু কাব্যচিন্তার সখ্যতায় তিনি তাঁদের পাশাপাশি হাঁটেন, কখনো বা তাঁদের পেরিয়ে চলে যেতে চান বড় কোনো স্পষ্টতার দিকে। ব্যক্তিগত বোধ থেকে সমষ্টিগত উত্তরণের যে মাত্রা শুরু হয়েছিল চারের দশকে, তারই সার্থক উত্তরাধিকার মেনে অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতা পথ হাঁটেন অগণিত মানুষের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে। তাই হয়তো সেখানে 'আমি'-র বদলে 'আমরা' শব্দের এতো প্রাচুর্য। অনেকগুলি বোধ যেন মিলে গিয়ে সেখানে তৈরি হয় সেতুবন্ধ—"পুর্ব আর উত্তরপুরুষের মাঝখানে / আমরাই তো সেতুবন্ধ—"। এর ফলে তার কবিতায় নিঃসঙ্গ কোনো বোধের পরিবর্তে সেখানে প্রাধান্য পেতে থাকে সংলগ্ন কোনো মানুষের চওড়া মুখের দৃঢ়তা।

এই সংলগ্নতাই অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতার অন্যতম প্রবণতা। এই সংলগ্নতা একই সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির, এবং কবিতার সঙ্গে মানুষের। কিছু মানুষের ভাবনাবিলাস এবং আপামর মানুষের শোষণক্লান্ত হাহাকার—এই ভয়াবহ চিত্রের বিরুদ্ধে কবিতায় শুরু হয়েছিল যে ঝড়ো হাওয়ার, তাই এখানে ক্রমশ পরিণত হতে হতে সাবালক। তাই অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতায় অনায়াসে ঢুকে পড়ে গোটা বিশ্ব, তার রাজনীতি, ভণ্ডামী অথবা যন্ত্রণার ছবিগুলি—আর এইসব সমেত কবি পরিপার্শ্বকে চেনাতে চেনাতে আমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যান, যেখানে এই পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনায় আমরা নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকি না, বরং তা হয়ে ওঠে একইসঙ্গে দুনিয়াকে ও নিজেকে জানার কর্মসূচী। এটাই তাঁর কবিতার অন্তঃস্থ শক্তি। এই ভাবনাই তাঁর কবিতায় জুড়ে দিয়েছে সামাজিক ও মানবিক বর্ণমালা। বর্ণমালাটি একমাত্রিক নয়, বরং সপ্তরঙা। এখানে মনে হতে পারে, এ তো একজন কবির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক কাজ। তা হয়তো বটে, কিন্তু এই কাজটিকে আশ্চর্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলে পাঠকমনে তিনি যে অভিঘাত তৈরি করেন, তার তুলনা ভারতীয় কবিতায় বিরল। নিজের অজান্তেই যেন আমরা, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে যুযুধান দুই পক্ষ সংগ্রামে ব্রতী, সমাজ পরিবর্তনের সপক্ষে, আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট পক্ষটি বুঝে নিতে পারি। নিজেদের মধ্যবিত্ত জীবনকে বাজি রেখেও, পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত করার কাজে আমাদের একটি পক্ষ বেছে নিতেই হবে— "ভরাট গর্ভের মত / আকাশে আকাশে কেঁপে উঠছে মেঘ। / বৃষ্টি আসবে। / ঘাতকের স্টেনগান আর আমার মাঝে বরাবর ঝড়ে যাবে বরফ-গলা গঙ্গোত্রী।" এই সজীব দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বাংলা কবিতায় অমিতাভ দাশগুপ্ত

স্বতন্ত্র। আবার হয়তো এই কারণেই তাঁর কবিতার স্বরগ্রামকে কখনো উঁচু মনে হয়, নিপুণ শব্দ-ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে আমাদের মিথ্যা-নমনীয় মুহূর্তগুলি, তবু এটিকে তাঁর কবিতার মেজাজ বলেই ধরে নিতে হবে। ধনুকে ছিলা জুড়ে স্থির লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন যে তীরন্দাজ, তাঁর ভঙ্গিটি কখনো কখনো তথাকথিত স্বাভাবিক আচরণের স্তরকে ছাড়িয়ে যেতেই পারে।

কবে শুরু হয়েছিল তার এই পথ-চলা? সেই পাঁচের দশকের গোড়ায় 'সমুদ্র থেকে আকাশ'-এ শুরু, তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ তিরিশ বছর, কবির হৃদয়ে—"একটা তুনিয়া জোড়া যুদ্ধ / তেতাল্লিশের মন্বন্তর / ছেচল্লিশের দাঙ্গা / ডানাভাঙা স্বাধীনতা / উনপঞ্চাশের ঝড় / উনষাটের ভুখমিছিল / আর / সত্তর-একাত্তরের যুবমেধের / দু-কূল ওপচানো স্মৃতি।" এই প্রতিবেশ যে-কোনো ভাববিলাসী কবিকেও নাড়িয়ে দিয়ে যাবে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে অমিতাভ দাশগুপ্তর চেতনা যেন আরও শক্ত হয়, পেয়ে যায় পাকাপোক্ত আশ্রয়, প্রতিটি ঘটনাই আমাদের সংলগ্নতাকে দারুণভাবে সত্যি প্রমাণিত করে। পরিপার্শ্বকে এইভাবে চিনে ও চিনিয়ে দিতে দিতে কবি শেষপর্বে এসে শান্ত হয়ে যান, চারপাশের ক্লেদাক্ত সময় তাঁর অচেনা নয়, মার্সিডিজের ভিড়ে লেনিন যে হারিয়ে যান, তা অজানা নেই কবির—তবু যে বিশ্বাসকে সঙ্গী করে যাত্রা শুরু, তাই যেন পূর্ণতা পায় অসহায় মানুষের সপক্ষে কবির এই উচ্চারণে—"সব কেড়ে নিতে পারো / নিতে পারো সমস্ত দক্ষিণা / বাম করতলে শেষ পূজা দেব—একতাল ঘৃণা।" লক্ষ্যণীয় যে, এটি একটি সম্পূর্ণ কবিতা, দ্যোতনাময় সরল এবং অভিঘাতপ্রবণ। এই লক্ষণটি বিশ্বসাহিত্যে অনেক লেখকের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করেছি। নিজের অবস্থান চিনিয়ে দিতে দিতে, একটি চূড়ান্ত পর্বে, করিতা থেকে ঝরে যাচ্ছে বাহুল্য, শুধু কথাটি অমোঘভাবে বলাটিই প্রধান হয়ে উঠছে। ভালো দক্ষতা তো অনেক দেখা গেল, এবার একটু সত্য উচ্চারণ শুনি। অমিতাভ দাশগুপ্তের সাম্প্রতিক কবিতায়, তাঁর শেষ গ্রন্থ 'বারুদবালিকা'-য় এই লক্ষণটি বেশ বোঝা যাচ্ছে। ছোট অথচ অনিবার্য কথাটিই শুধু বলা, মানুষকে তাঁর পরিপার্শ্বের স্বরূপটি চিনিয়ে দেয়া। সেই যে কবে বলেছিলেন—"একটু আধটু সত্যি এবং বাকিটা সব মিথ্যে কথার / রঙিন সুতোয় জড়িয়ে আছেন কবিতা কল্পনালতা"—সেই 'একটু আধটু সত্যি'-কেই তিনি শুধু এখন দেখতে চান, মিথ্যের রঙিন সুতো বাদ দিয়ে।

বিষ্ণু দে একটি দীর্ঘ চিঠিতে বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন—"অন্তঃ প্রেরণার তাড়নায় লেখে সবাই, কিন্তু দৈবাৎ যদি সেই তাড়না সাহিত্য সমাজ ও শিল্পের

ব্যক্তিত্বহীন নির্দেশে মিলে যায়, তাহলেই কবির সাধনা সার্থক এবং কবিতা যাকে বলে সাবালক।" এই বাক্যবন্ধের মধ্যেই সুপ্ত আছে মানুষের কবিতার বীজমন্ত্রটি। তাই এটাও খুব স্বাভাবিক মনে হয়, যখন কাব্যভাষাতেও এই চিন্তারই প্রতিফলন দেখি, যখন অমিতাভ দাশগুপ্ত লেখেন—"খড়কুটো জড়ো করে জ্বেলেছি যে আগুনের কণা / স্মৃতির বাতাসে তাকে দাবানল করো তেলেঙ্গানা / পাপঘ্ন পূষণ এসো, ভস্ম-অপমানে ঘেরা দ্বীপ / পোড়াও দুর্মর তাপে—জন্ম নিক নতুন সন্দীপ—" তখন তা আমাদের দায়বদ্ধতা ও অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে বাড়িয়েই, আমাদের জীবনযাপনকে যে আরও অর্থবহ করতে চায়, এই সত্যটি গোপন থাকে না। তাই আমাদের শেখায়, জীবনকে সংলগ্ন করে দেখার কাজটি কতো মধুর ও তাৎপর্যময় হতে পারে।

শেষ প্রতিনিধি

সৌরি ঘটক

"—মিনু এসেছিল নাকি? বলি ও মিনু কই গেলি? আয় মুখখানা একবার দেখি? কতদিন দেখি নি—' রায়বাড়ির দরজায় কাঁপা কাঁপা গলায়, একফালি ন্যাকড়া কোমরে জড়িয়ে আর একফালি বুকের একপাশে ঝুলিয়ে, তোবড়ানো স্তন দুটোকে বের করে—'মিনু, মিনু—বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ি ঢুকল গ্রামের ধাইবুড়ি। রুক্ষ শরীর খড়ি ওঠার মত শাদা শাদা দাগ, ছানি পড়া চোখে নিষ্প্রভ দৃষ্টি, গায়ে ঝুলে পড়া জড়জড় চামড়া, চুলহীন তেলা মাথা, বয়সের ভারে ধনুকের মত বাঁকা দেহটাকে লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে "মিনু-মিনু" বলে ডাকতে ডাকতে সোজা বাড়ির ভেতর চলে গেল।

বেলা প্রায় দশটা। পাড়াগাঁয়ে এখনও রান্না চড়াবার সময় হয় নি। কিন্তু আজ রায় বাড়িতে ধুমধাম করে রান্না চড়েছে। আজই ভোরে তাদের বড় মেয়ে মিনু, বিয়ে হয়েছে সাত-আট বছর তিন ছেলেমেয়ের মা, চারবছর পর জামাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছে।

এমনিতে রায়েরা স্বচ্ছল গৃহস্থ। দুখানা হালের চাষ, উঠোনে ধানের গোলা। ঘরের মেঝে, বারান্দা, সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো, উঠোনে টিউবওয়েল, তিন ছেলে, বৌ, নাতি নাতনি নিয়ে মোটামুটি সুখের সংসার।

কতদিন পরে মেয়ে এসেছে, মা মেয়ে দুজনেই বাচালের মত জমানো কথার লেনদেন করছে। জামাই হাসি মুখে সহ্য করছে শালাজদের খুনসুটি। ছেলেমেয়েরা মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে দাপাদাপি করছে। রান্নাঘরে জামাইয়ের জন্য রান্না চড়েছে, তার সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাড়ীর বাতাসে।

আর এরই মাঝে অকস্মাৎ ভগ্নদূতের মত "মিনু মিনু" বলে ডাকতে ডাকতে ধাইবুড়ির আবির্ভাব।

ওকে দেখে বিরক্ত হল রায়গিন্নি। আপন মনে বলল—"কি করে যে খবর পায়? এই সকালে এল, আর এরই মধ্যে জানতে পেরে গেছে? আশ্চর্য।"

এ কথা ধাইবুড়ির কানে গেল না। একটু জোরে না বললে সে আর শুনতে পায় না। সে লাঠি ঠকঠক করতে করতে রান্নাঘরের দিকে আরও দু পা এগিয়ে গেল।

কিন্তু মিনু মায়ের বিরক্তি গ্রাহ্য করল না। আজ দীর্ঘ চারবছর পর বাড়ি এসেছে, এখন এখানকার সবই তার কাছে প্রিয়। ধাইবুড়িকে দেখে সে উঠোনে নেমে এসে জোরে বলল—"তুমি এখনও বেঁচে আছ ধাইমা?"

বুড়ি ফোকলা গালে একগাল হেসে বলল—"তোকে দেখব বলে বেঁচে আছি মা। নইলে—" বলে হঠাৎ মুখখানা করুণ করে বলল—"যমে নিচ্ছে না রে। এত লোককে নিচ্ছে, আমাকে নিচ্ছে না। কি কষ্ট মা! মুখে এক গেলাস জল দেওয়ার কেউ নেই! এত করে ডাকছি যমকে, শুনছে না।"

মিনু বলল—"মরবে কেন? বালাই ষাট।"

ধাইবুড়ি এধার ওধার তাকিয়ে বলল—"কই জামাই কই? সোনার চাঁদরা কই?"

মিনু বলল—"আছে সবাই।"

ধাইবুড়ি বলল—"ডাক্ জামাইকে, একবার দেখি। কই বাবা? আমার জন্যেই এমন বৌ পেয়েছ? বুঝলে? বাবাঃ সে কি দিন? বর্ষাকাল। তিনদিন ধরে চলছে বাদলা। আর আঁতুরে সমানে চলছে পোয়াতির রক্তভাঙা। সবাই বলল এ পোয়াতি আর উঠবে না। শুধু মরাকান্না শুরু হতে বাকি। কিন্তু আমার নাম জাগি ধাই। তিনদিনের দিন যখন মেয়েকে হাত ভরে দিয়ে করলাম, তখন আর দম নেই। নেতানো। হাতে পড়ে রইল মরার মত। কাঁদল না সবাই। সবাই বলল 'মরা মেয়ে'। কিন্তু আমি দেখলাম গা গরম। ধরে আস্তে ঝাঁকি দিয়ে দিলাম ফুঁ। অমনি কেঁদে উঠল মেয়ে। তখন ছেড়ে ধরলাম পোয়াতি। তার তখন সামাল সামাল অবস্থা।"

—"আঃ। থাম তো! বারবার সেই এককথা। আর কোন কথা নেই তোমার"—জোরে ধমকে উঠল রায়গিন্নী।

ধমক খেয়ে থতমত খেল ধাইবুড়ি। মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল—"না মা, আর বলব না।"

তারপর কথা শুধরিয়ে মিনুকে মিনতি করে বলল—"মা এতদিন পরে এলি, আমায় একখানা ছেঁড়া কাপড় দিস। ঘরে একটু তেনাও নেই পরবার। কী পরে আছি দেখছিস। দিস মা দিস" বৃদ্ধার করুণ চোখে জল ঝরে পড়তে লাগল।

মিনু বলল—"আচ্ছা দেব। আছি তো একমাস। দেব।"

ধাইবুড়ি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—"আহা! রাজরাণী হ, ছেলেরা রাজা হোক।"

তারপর রায়গিন্নীকে উদ্দেশ করে বলল—"আজ দুটো ভাত দিও মা। দিও দুটো? আহা কি বাস বেরুচ্ছে আন্নার!"

রায়গিন্নি যেন ওকে বিদায় করার জন্যেই বলল—"দেব। দুপুরে এসো থালা নিয়ে। এখন যাও।"

—"যাই মা যাই"। মিনু, মা মিষ্টি আনিস নি দেশ থেকে। দে না মা! আহা কতকাল অসগোল্লা খাই নি? তোরা না দিলে কে দেবে আমায়? আর কে আছে? দুটো মুড়ি দিবি মা!"

বিরক্তিতে রায়গিন্নির মুখ কুঁচকে উঠল। কিন্তু মিনু বলল—"দাও মা। নইলে যাবে না। সমানে বকরবক করবে।"

রায়গিন্নি মেজ ছেলের বৌকে ডেকে বলল—"বৌমা ওকে চাট্টি মুড়ি দাও। আর দুটো মিষ্টি দাও।"

মুড়ির কথা শুনতে পেয়ে ধাইবুড়ি উঠোনের শিউলি গাছতলায় বসে পড়ল। হেমন্তের স্নিগ্ধ সকাল। ঝিরঝির করে মিষ্টি হাওয়া বইছে। শিউলি গাছের নীচে ঝরে পড়ে আছে দুচারটে ফোটা ফুল। গাছের ডালে লাফালাফি করছে এক ঝাঁক খঞ্জনা। ঘরের চালে চুপ করে বসে আছে দুটো পায়রা। পাঁচিলে একটা বিড়াল থাবার মধ্যে মুখ গুঁজে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দুপুর হতে চললেও এখনও এই নিভৃত পল্লীর সব কিছুর ওপর বেছান রয়েছে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

মুড়ি দেবে শুনে বুড়ি মাটির ওপর বসে পড়ে পিটপিট করে তাকাতে লাগল এধার ওধার। পায়ে পায়ে তার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল মিনুর ছেলে-মেয়েরা। বড়টির বয়স নয়, ছোটটি ছয়, আর মেয়েটি চার।

গভীর কৌতূহল ওদের মুখেচোখে। ওরা থাকে কলকাতায়। অভিজাত পাড়া। ফ্ল্যাটবাড়ি। সেখানে পাশের বাড়ির লোকের নাম না জানাটাই সভ্যতা। স্কুলের বাইরে ফ্ল্যাটের মধ্যেই এদের বন্দীজীবন। সেখানে ভাইয়ের খেলার সঙ্গী বোন, বোনের খেলার সঙ্গী ভাই।

এ-রকম দুঃস্থ ভিখারি এরা দেখেছে স্কুলের গাড়িতে যেতে যেতে, দেখেছে পথের ধারে ফুটপাথে। কিন্তু এমন সামনাসামনি কখনও দেখে নি।

এখন অনেকক্ষণ ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধাইবুড়িকে দেখে ছুটে গিয়ে তার মামাতো বোনকে জিজ্ঞেস করল—"ও কে রে?"

মামাতো বোন বলল—"ও হল ধাইবুড়ি।"

—"ধাইবুড়ি কি?"

"ধাইবুড়ি হল ধাইবুড়ি।"

ওরা কিছুই বুঝতে না পেরে ছুটে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল—"বাবা ধাইবুড়ি কি?"

বড় গণ্ডগোলের প্রশ্ন। বাচ্চাদের কাছে ব্যাখ্যা করা যায় না। বাবার কাছে জবাব না পেয়ে ওরা ছুটে গেল মায়ের কাছে—"মা ধাইবুড়ি কি?"

মিনু সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে জবাব দিল—"ধাইবুড়ি হল নাম। তোমার নাম যেমন দীপায়ণ, ভাইয়ের নাম রূপায়ণ তেমনি ওর নাম ধাইবুড়ি।"

বাচ্চারা বুঝে চুপ করে গেল।

মেজ বৌ একথালা মুড়ি আর দুটো মিস্টি নিয়ে এল। ধাইবুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বুকের নেকড়াখানা খুলে পেতে দিল মাটিতে। মেজবৌ মুড়ি ঢেলে দিল তার ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির নিষ্প্রভ চোখ যেন জ্বলে উঠল দপদপ করে। নেকড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে সে হাতে করে ফোকলা মুখে এত দ্রুত মুড়ি ভরতে লাগল যে মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে।

মিনু ভয় পেয়ে বলে উঠল—"ও ধাইমা। আস্তে খাও। গলায় লেগে যাবে?"

কিন্তু কে কার কথা শোনে। যেমন জান্তব ক্ষুধা তেমনি জান্তব খাওয়া।

মেজ বৌ তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল নিয়ে এল।

মিনু বলল—"খাবে এসো?"

দূরে একটা ভাঙা নারকেলের মালা পড়ে ছিল। সেটা কুড়িয়ে মিনু ধাইবুড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল—'এইটা ধুয়ে নাও।'

মাটি ধুয়ে মালায় করে খানিক জল খেল ধাইবুড়ি। তারপর একটা রসগোল্লা খেল। আবার জল খেল। তারপর একটু দম নিয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত করে বলল—"কাল চৌল্ল দিনমান কিছু খাই নি মা! কেউ দুটো ভাত দেয় নি। বড্ড খিদে নেগেচিল।"

বৃদ্ধার ঐ অর্ধ নগ্ন দেহ, ঐ গোগ্রাসে খাওয়া, ঐ গলায় আটকে যাওয়া সব দেখে বারবার শিউরে উঠেছিল মিনুর অনুভূতি। এবার সে বলল—"ধাইমা এবার তুমি বাড়ি যাও। ঘরে গিয়ে আস্তে আস্তে খাওগে! দুপুরে এসো ভাত দেব।"

—"তাই যাই মা। যাই। রাজরাণী হও। রাজা হোক তোমার ছেলেরা। আহা মা আমার সাক্ষাৎ নক্ষী। কি মিষ্টি কতা।"

মুড়িগুলো নেকড়ায় বেঁধে বিড়বিড় করে উঠে দাঁড়াল বুড়ি। তারপর যেমনভাবে এসেছিল তেমনিভাবে লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

মিনুর ভেতরটা তখনও মোচড় দিচ্ছে। সে স্বচ্ছল ঘরের মেয়ে, ভাল রোজগেরে স্বামীর স্ত্রী, তার চোখে এধরনের বীভৎস খাওয়া যেন গোটা চেতনাকে ঘুলিয়ে দিচ্ছিল।

ধাইবুড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর সে মাকে জিজ্ঞেস করল—"ওর কি করে চলে মা।"

রায়গিন্নি বলল—"কি করে আর চলবে? কেউ তো নেই ওর। লোকের বাড়ি চেয়েচিন্তে চলে।"

মিনু নরম গলায় বলল "কাল সারাদিন কিছু খায় নি।"

কিন্তু সংসারের পোড়খাওয়া রায়গিন্নির মন তাতে নরম হল না। বলল—"সংসারে বারমাস কে কাকে দেয় মা! আজকাল ছেলেরা বুড়ো মা বাপকে খেতে দেয় না তা ওতো কোথাকার কে?"

মেজ বৌ পাশে বসে তরকারি কাটছিল। বলল—"বুড়ির রাগও খুব। আজকাল সবাই বাচ্চা হতে হাসপাতাল যায়। তাতে জ্বলে পুড়ে মরে বুড়ি। সবাইকে মানা করে—"যেও না। আমি খালাস করব।"

মিনু একটু অবাক হয়ে বলল—'ও চোখে দেখতে পায় না, কানে শোনে না, হাত পা কাঁপে, ও খালাস করবে কি?'

মেজ বৌ বলল—"সে কথা ওকে কে বোঝায়? গাঁয়ের কাছে হাসপাতাল। তারপর এখন যে লেডি ডাক্তার আছে খুব ভাল। এখন গরিবরা পর্যন্ত সন্দেহ হলেই ওর কাছে যায়। টিকিট করায়, মাসে মাসে চেক করায়। যে তারিখ দেয় খালাসের, তার আগেই হাসপাতাল যায়। আর সেই রাগে ও সবার সঙ্গে ঝগড়া করে। কি জ্বালা।"

রায়গিন্নি বৌয়ের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল—"জ্বালা না জ্বালা। শুধু কি তাই? ভাত মুড়ি চাইতে গিয়ে কার কবে আঁতুরে কি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা শুরু করবে। লোকজন মানামানি নেই। সেইজন্যেই তো চটে সব। আমি কতদিন বুঝিয়েছি তা কে কার কথা শোনে? মরুক গে!"

মেজ বৌ বলল—"সবচেয়ে বাজে লাগে যখন সবার সামনে আঁতুরঘরের গল্প ফাঁদে। লাজলজ্জার হুঁস নেই।

আর কথা এগুলো না। বড়বৌ রান্নাঘর থেকে ডাকল "মা একবার আসুন তো?"

"যাই"—বলে রায়গিন্নি উঠে গেল। মেজবৌ তরকারি কাটা শেষ করে বঁটি কাত করল। মিনুর স্বামী হাঁকল—"হ্যাগো ছেলেদের স্নান করিয়ে দাও।"

যে বুড়িকে নিয়ে গ্রামের মানুষের এত জ্বালা, আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেও সে ছিল গ্রামের ধাত্রী। শুধু নিজের গ্রাম নয়, আশেপাশের গ্রামেও প্রয়োজনে ডাক পড়ত তার। তখন লোকের ডাক্তার দেখানোর সচেতনতা ছিল না, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র কি শহরে বড় হাসপাতাল হয় নি, রেডিও, টি ভি-তে জন্মরহস্যের কারণগুলি নিয়ে, প্রসূতির স্বাস্থ্য ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হত না বা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেয়েরা মাঝে মাঝে লোকের বাড়ি গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করত না এ নিয়ে। তখন সন্তানধারণের শুরু থেকে প্রসূতিকালীন সব রকম সমস্যা নিরসনে মেয়েরা প্রধানত নির্ভর করত এই গ্রাম্যধাত্রীদের ওপর।

এই নির্ভরতা চলে এসেছে যুগ যুগান্ত ধরে। বয়ে গেছে অনন্তকালের প্রবাহ, কত উত্থান-পতনে ঝলকিত হয়েছে ইতিহাসের পাতা, কিন্তু পৃথিবীতে নতুন মানুষের আগমনের লগ্নে এদের ওপর নির্ভরতা অটুট থেকেছে। আর এর ফলে ধীরে ধীরে এটা গড়ে উঠেছিল একটা পেশা হিসাবে। আর এরা বংশানুক্রমে আয়ত্ত করেছিল এই পেশাকে। এইভাবে এরা হয়ে উঠেছিল সর্বসাধারণের মা, গ্রামের ছেলে-বুড়ো, মা-মেয়ে সবাই ডাকত 'ধাইমা'।

অবশ্য সকলের মা হলেও জাতিভেদ প্রথার বিধানে এরা ছিল অচ্ছুৎ। এদের বলা হত হাড়ি। এরা থাকত গ্রামের এক প্রান্তে, অনান্য অচ্ছুতদের সঙ্গে আলাদা পাড়ায়, লোকে বলত 'হাড়ি পাড়া'।

এ-গ্রামেও অনেক আগে, বুড়ো-বুড়ো লোকেরা বলত,—এখন যেখানে ধাইবুড়ির ভাঙ্গা চালাঘর ওরই আশেপাশে ছিল নাকি হাড়িদের জমজমাট পাড়া। আর পাড়ার যোয়ানদের সব চেহারা কি? যেমন কালো, তেমনি লম্বা এক একটা যেন যমের দূত। এরা কেউ পরের জমিতে মজুর খাটত, কেউ কেউ ছিল নামজাদা লাঠিয়াল, পাল্কি বইত কেউ কেউ, আবার ডাকাত, ঠ্যাঙারেও থাকত এদের মধ্যে। পূজাপার্বনে কি কোন বিশেষ উৎসবে এরা যখন কালিঝুলি মেখে গিঁটওয়ালা লম্বা বাঁশের মাথায় উঠে—ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে রায়বেশে নাচ নাচত আর সমস্যার মুখে হাত চাপড়ে রে-রে শব্দ করত তখন ভয়ে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়ে যেত।

এ সবইগল্প। মৃত গল্প। কেননা এসব গল্প করার মত লোকও বিশেষ কেউ বেঁচে নেই আর। সুদূর অতীত থেকে পরাধীনতার কাল পর্যন্ত যে দেশ ছিল আজ সে দেশও আর নেই।

তখন না ছিল রাস্তাঘাট, না ছিল পণ্য চলাচল, পরিবহন ব্যবস্থা বলতে ছিল গরুর গাড়ির আর পাল্কি, নদীপথে নৌকা। তখন দিগন্তবিস্তৃত অবারিত মাঠ, ঘন গাছপালায় ঢাকা ছায়চ্ছন্ন মৌন গ্রাম। মানুষের নিত্যসঙ্গী ছিল রোগ শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর সেইসঙ্গে অশিক্ষা আর সীমাহীন কুসংস্কারের বোঝা। তখন প্রতি বছরই কিছু মানুষকে প্রাণ দিতে হত অপঘাতে। এক একটা দুর্ভিক্ষ আসত আর মানুষ খাদ্যের সন্ধানে পালাত গ্রাম ছেড়ে।

সেদিন মরণের এই অলিম্পিক রেসে প্রথম সারিতে থাকত গ্রামের গরিবরা। দৈনন্দিন চলমান জীবনে এতটুকু ছন্দপতন হলেই তারাই হত প্রথম বলিদান।

গ্রামের বসতির চারিধারের প্রান্তে প্রান্তে ঐ যে ধানের জমি, যেখানে এখন সেচের জল, কেমিক্যাল সার, অধিক ফলনশীল বীজের দৌলতে বছরে দুবার করে পাকা ধানের শীষ হাওয়ায় দোল খায়, গমের শীষে সবুজ টিয়াপাখির ঝাঁক উড়ে এসে বসে, সেখানে মাটির অনেক নীচে যে চাপা পড়ে আছে অতীত যুগের নিঃস্ব মানুষদের কান্না, ব্যথা, হাহাকার, যন্ত্রণা,—বিস্মৃত সে ইতিহাসে আজ কার কি দরকার। কি হবে জেনে যে ঐ সব ধানের জমির ওপর একদিন ছিল সারসার মাটির ঘর, সেখানে সন্ধ্যায় জ্বলত মাটির প্রদীপ, মিলন পিয়াসী তরুণী বধূ সাজিমাটি দিয়ে গা ঘষে চুলে জবজবে করে তেল দিয়ে, খোঁপা বেঁধে কপালে পড়ত সিঁদুরের টিপ, সতীনের হাত থেকে স্বামী বশকরার জন্য কেউ পড়ত বশীকরণের মাদুলি, তের চোদ্দ বয়সেও সন্তান না হলে বন্ধ্যাদোষ খণ্ডনের জন্য কোন নারী অমাবস্যার গভীর রাতে ঘুমন্ত গ্রামের সকলের অগোচরে একা উলঙ্গ হয়ে এলোচুলে গুণিনের মন্ত্র পড়ে সিঁদুর মাখান মাগুরমাছ ছেড়ে দিত তেমাথার মোড়ে, সে সব গল্প শোনার এখন সময় কোথায়?

এখন সন্ধ্যায় রেডিও, টিভিতে দেশের খবর, আবহাওয়া সংবাদ, চাষবাসের বক্তৃতা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা, নাটক, গান, দেহচর্চ্চা, রূপচর্চার বিবরণ, নানা পণ্যের চটকদার বিজ্ঞাপন।

কিন্তু মুস্কিল হল ধাইবুড়ি এ-সব বোঝে না। সে বোঝে না সেকালে যখন নয় দশ বছরে মেয়ের বিয়ে না হলে জাত থাকত না, পিতৃগৃহে কন্যা ঋতুমতী

হলে সাতপুরুষ নরকে যেত, সেখানে এখন বিশ পঁচিশের নীচে কোন মেয়ের বিয়েই হয় না। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, যৌন পত্রিকা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীদের দৌলতে তারা এখন বিয়ের আগেই যৌন জীবন, সন্তানধারণের তত্ত্বগত ধারণা গড়ে তোলে।

কিন্তু ধাইবুড়ি এসব বোঝে না। শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি, তার জীবন শুধু এখন টুকরো টুকরো অতীতের স্মৃতির সমাহার।

চৈত্রের খর দুপুরে, প্রচণ্ড দাবদাহে যখন দিক-দিগন্ত জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় তখন নিজের ভাঙ্গা চালাঘরের দাওয়ায় বসে বুড়ি খোয়াব দেখে তার তরুণ স্বামী পলো হাতে মাছ ধরে কাদা মেখে বাড়ি ফিরল, বড় ভাশুর নেয়ে ফিরল, বড় জা এক পাথর পান্তা আর খানিকটা তেল পেঁয়াজ ভাজা এনে নামিয়ে দিল সামনে, পাড়ার কোন বৌ এসে একটু নুন ধার চাইল, চাষি পাড়া থেকে কে যেন এসে ধাইবুড়িকে বলে গেল—"মা একবার যেতে বলেছে বিকেলে।"

ধাইবুড়ি শুধাল—"ক্যানে?"

সে জবাব দিল—"বোনটা এয়েছে শ্বশুর বাড়ি থেকে।"

সব বুঝে নিল ধাইবুড়ি। লোকটা চলে গেলে অন্ধ শ্বাশুড়ি বলল—"বড় ঘোষের বেটা না?"

—"হঁ্যা।"

—"একটু কুলের আচার চেয়ে আনিস তো ওদের ঘর থেকে। টক্ আচার।"

ধাইবুড়ি ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে—"আচার নিলে তো হবে না। সিধে নিতে হবে? ঘরে চাল নেই আমার!"

নির্জন দাওয়ায় কথাটা চমকে উঠে মরে যায়।

দিনে রাতে এইসব স্বপ্ন দেখে বুড়ি। কবে জন্মেছে তারও হিসেব নেই, কবে বিয়ে হয়ে এবাড়ি এসেছে তাও মনে নাই। শুধু মনে আছে সাত বছরের মেয়ে শাড়িখানা সামলাতে গায়ে এমন করে জড়াত যে লোকে বলত 'পুঁটলি', —গুটি গুটি পায়ে শাশুড়ির পিছন পিছন মাথায় একহাত ঘোমটা টেনে লোকের বাড়ি যেত, মেয়েদের সমস্যাগুলো চুপ করে শুনত, শাশুড়ির কাছে ওষুধের গাছগাছড়া চিনত, আঁতুরে সাহায্য করত তাকে।

কত গাছ, কত লতাপাতা, কত তার গুণ। কোনটা খাওয়ালে পোয়াতির হাত পা ফোলা কমে, কোন শিকড়ের রসে স্রাব বন্ধ হয়, কোন পাতা বেটে

পেটে প্রলেপ দিলে তাড়াতাড়ি প্রসব হয় এ সব জানে হাসপাতালের ধিঙ্গিগুলো ? তবু মেয়েগুলো ওদের কাছেই যায় !

কতকাল গেছে এ সব শিখতে, গাছ-গাছড়া চিনতে। এ সব জানত বলেই আশে-পাশের গাঁয়ে ডাক পড়ত তার। লোকে চাল দিত, টাকা দিত কাপড় দিত। একজন দিয়েছিল একটা বকনা! সেটা বিয়োনোর পর দুধ দিত দুসের। এক সের ঘরে খেত আর একসের রোজ দিত। মাঝে মাঝে বিড়াল এসে কড়াই থেকে দুধ খেয়ে যেত চুরি করে।

হঠাৎ হাতের লাঠিটা তুলে বিড়াল তাড়াল বুড়ি "হ্যাত! হ্যাত। রোজ এসে দুধটুকু খেয়ে যাবে ?"

আর এই দুধের কথা মনে পড়তেই খেয়াল হল—'খিদে পেয়েছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। ঘরে কিছু নেই।'

টিনের থালাটা নিয়ে লাঠি ঠকঠক করতে করতে বেড়িয়ে পড়ল বুড়ি, লোকের বাড়ি ভাত চাইতে।

সেদিন লোকে তাকে খোসামোদ করে বাড়ি ডেকে নিয়ে যেত, মেয়েরা কত তোয়াজ করত, মুড়ি দিত, গুড় দিত, চাল দিত, পুজোপার্বনে ভালমন্দ রান্না হলে ডেকে ভাত দিত।

আর আজ সবাই তাড়িয়ে দেয় তাকে। ভাত দূরের কথা একমুঠো মুড়িও দিতে চায় না। বৌ ঝিরা বলে—"কোথায় পাব ভাত। চালের কেজি কত জান ? পাঁচ টাকা।"

একালের ছুঁড়িগুলো চালের দাম শোনায়। আর তখন ? ঐ হাবু মোড়লের বড় পিসি, তিনবার মরা ছেলে বেরুল পেট থেকে। চারবারের বার ওর বাবা নিয়ে এল বাড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ি বলে পাঠাল এবার মরা ছেলে হলে আর ওকে ঘরে নেবে না, ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

খবর পেয়ে মুখ শুকিয়ে গেল সবার। একদিন দুপুরবেলা বুড়িকে বাড়িতে ডেকে মেয়ের কি কান্না—'যেমন করে হোক এবার বাঁচিয়ে দাও ছেলেটাকে ধাইমা।"

সেদিন কানের সোনার দুল খুলে দিয়েছিল সে।

বেঁচেছিল সেবার ছেলে। ছয় মাস ধরে কত গাছের রস খাইয়েছিল ধাইমা, কত পাতার রসের প্রলেপ দিয়েছিল পেটে, কত শিকড়-বাকদের মাদুলি তাবিজ পরিয়েছিল।

আর বিদেয়! পেয়েছিল দশসের চাল, একখানা নতুন আর দুখানা পুরোনো শাড়ি, দশটা টাকা, একটা কাঁসার থালা, আর মুড়ি-চিড়ে তরি-তরকারির—তো কথাই নেই।

আর সেই হাবু মোড়লের নাতনি খালাস হতে গেল হাসপাতাল। তাকে একবার ডাকলও না।

খবরটা শুনে সারারাত কেঁদেছিল বুড়ি। কেউ আর তাকে ডাকবে না, একঘরে করেছে। সে কি খাবে, কি করে বাঁচবে? কি করে মরণ হবে?

নির্জন ঘরে হাউ হাউ করে কেঁদে কপাল চাপড়েছিল বুড়ি। শুকনো বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল চোখের জলের ধারা।

স্মৃতিগুলো মনে পড়ে আর এমনি করেই কাঁদে ধাইবুড়ি।

…ত্রৈলক্য চাটুজ্যে। লোকে বলত তিলক ঠাকুর। ন বছরে গৌরী দান করে মেয়েরে বিয়ে দিল। কি ধুমধাম। বাজি-বাজনা, হৈ-চৈ। এগার-বছরে ছেলে এল পেটে। পাঁচ মাসে সাধ খাওয়ার দিন মা ঠাকরুন মেয়েকে এনে বলল—'ধাইমা এই তোমার হাতে তুলে দিলাম মেয়ে। ওর ভালমন্দ সব ভার তোমার। আজ থেকে তুমি ওর মা।'

সেই মেয়েকে ছেলে কোলে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে হাঁফ ছেড়েছিল ধাইবুড়ি।

…"আবার পারেও নি। এখন যেখানে মোড়লরা বাস করে—সেখানে ছিল ভুবন গাঙ্গুলীর বাড়ি। কালী সাধক। সাত মেয়ে। অষ্টমবার বৌ-এর পেটে সন্তান আসতেই ক্ষেপে উঠল গাঙ্গুলী ঠাকুর। বলল "এবার ছেলে। নির্ঘাত ছেলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অষ্টমগর্ভের সন্তান। এবার আমার ঘরেও আসবে ক্ষণজন্মা ছেলে।"

তারপর দশমাসে ঠাকরুণের ব্যাথা উঠল। আঁতুর ঘরে ধাইবুড়িকে ডেকে দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে মা। মা বলে পগেলের মত চিৎকার শুরু করল।

সে এক দৃশ্য। আঁতুর ঘরে ঠাকরুণ কোঁকাচ্ছে—'আঃ! উঃ!' আর ধাইমা তাকে ধমক দিচ্ছে—"কি কর কি। সাত-সাতটা বিইয়েছ এর—আগে। পা দুটো ভাঁজ কর। জোরে জোরে কোঁথ দাও।"

পাড়ার বয়স্ক মেয়েরা আঁতুর ঘরের সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। আর চণ্ডীমণ্ডপে গাঙ্গুলী গর্জন করছে—"মা, মা। সর্বার্থসাধিকা সর্বপাপহারিণী মা।"

অবশেষে ধাইবুড়ির হাতে কেঁদে উঠল নবজাতক। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে এল গাঙ্গুলি—"কী হয়েছে? ছেলে?"

ধাইবুড়ির হাতে রক্তমাখা কন্যা সন্তান। সে ভয়ে উত্তর দিল না। জটলা করা প্রবীনাদের কে একজন বলে উঠল—"মেয়ে।"

—"মেয়ে। তাহলে আমার বংশে পুত্রসন্তান হবে না। আমার পূর্ব্বপুরুষরা পুৎনরকে পচবে পিণ্ড পাবে না, এক গণ্ডুষ জল পাবে না।" বলতে বলতে ছুটে এসে আটন থেকে কালীর কাঠামোটা টেনে উঠোনে ফেলে দিয়ে বলল—"সারাজীবন তোর পুজো করে এই করলি আমার। দূর হ। দূর হ। আমার বাড়ি থেকে—" বলে সেটাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে বেরিয়ে চলে গেল বাড়ি থেকে।

একেবারে চিরকালের মত নিরুদ্দেশ। কি কাণ্ড সে সব।

ভিক্ষে করে বেড়ায় ধাইবুড়ি। দয়া হলে কেউ একমুঠো দেয়, নইলে উপোস। কি খাবে? চেয়েচিন্তে চাট্টি মুড়ি পেলে রেখে দেয় হাঁড়িতে। খুব খিদে পেলে তাই চিবোয় চাট্টি। আর খিদের যন্ত্রণায় ঘুম হয় না বলে চালার ভেতর অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকে। ঘরে প্রদীপ আছে কিন্তু তেল নেই, একটা পুরনো দেশলাইয়ের বাক্স আছে কিন্তু কাঠি নেই। চালের বড় বড় ফুটো দিয়ে চোখে পড়ে দু একটি তারা, কিন্তু বুড়ি তা দেখতে পায় না, সে শুধু অন্ধকারে বসে বসে ঝিমোয় আর স্বপ্ন দেখে খাওয়ার।

ক্ষুধার জৈবিক নিয়ম হল যখন পেট ভরা থাকে তখন মুখে রসগোল্লা দিলেও শরীর তা প্রত্যাখ্যান করে। জোর করে বেশি খেলে বমি করে বের করে দেয়। কিন্তু যখন পেট খালি থাকে, ক্ষুধার যন্ত্রণা যখন পাকস্থলির সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে দেহের সমস্ত গ্রন্থিতে, শিরায় উপশিরায় তখন অদ্ভুত ধরনের একটা ভোঁতা যন্ত্রণা শুরু হয় মাথায়। তখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় এক অদ্ভুত ঐক্যতানে শুধু খাদ্যের সন্ধান করে। চোখে খোঁজে খাবার, ঘ্রাণ শুধু পেতে চায় খাবারের গন্ধ, জিব শুধু পেতে চায় খাদ্যের আস্বাদ আর চেতনা শুধু পেটা ঘড়ির একটানা ঘণ্টাধ্বনির মত একটা আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করে "খাবার, খাবার খাবার।"

বুড়িরও শুধু এখন ঐ এক চিন্তা খাবার। খাবার। খাবার। সেই কবে, কোন যুগ আগে, কার বাড়িতে দই খেয়েছিল, কার বাড়িতে রসগোল্লা খেয়েছিল, কোন মেলায় পাঁপড় খেয়েছিল, কাদের বাড়ি পেট ভরে ডাল, ভাত তরকারি খেয়েছিল শুধু তাই ভাবে। যেদিন কোন কিচ্ছুই জোটে না পাগলের মত সেদিন সে বেরিয়ে আসে বাইরে। দাওয়ায় বসে কঁকিয়ে ওঠে—"আমার খিদে নেগেচে। চাট্টি ভাত দাও।"

গভীর রাতে হঠাৎ এই কান্নার শব্দ শুনে একটা বাদুড় ডানা ঝটপট করে উড়ে পালায়, দমকা হাওয়ায় গাছের পাতাগুলোয় শন্‌শন্‌ শব্দ হয়, নিশুতি গাঁ নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। শুধু বিগত যুগের সেই গ্রাম্য ধাত্রী ক্ষুধার তাড়নায় লাঠি হাতে ঠকঠক করে বেরিয়ে পড়ে পথে; অন্ধকারে পথ ভাল করে ঠাহর হয় না, পাড়ার কুকুরগুলো চমকে ঝাঁ ঝাঁ করে ডেকে ওঠে, কোন মোড়ের মাথায় গিয়ে বুড়ি কাঁদে "আমায় খেতে দাও গো। ও গাঁয়ের লোক।"

সে কান্নার সুরে রাত শিউরে ওঠে পথের আশে-পাশের বাড়ির কোন মেয়ে আতকে বলে "পেত্নী কাঁদছে।" হয়ত কোন সাহসী পুরুষ লাঠি হাতে বেরিয়ে গর্জন করে ওঠে—"কে? কে কাঁদে ওখানে?"

ধাইবুড়ি হাঁউমাউ করে ওঠে—"আমি বাবা। কিছু খেতে দাও।"

লোকটা হয়ত চমকে ওঠে—"ধাইমা? কী হয়েছে?"

—"খিদে নেগেছে। খেতে দাও"।

—"এখন রাত দুপুরে কী খেতে দেব। সকালে এসো মুড়ি দেব।"

—"বড্ডা খিদে নেগেছে।"

আচমকা ঘুমভাঙ্গা মানুষটা রেগে উঠে বলে—"আচ্ছা জ্বালা বটে। রাত দুপুরে কে খাবার নিয়ে বসে আছে তোমার জন্যে। যাও ঘরে যাও। সকালে এস।"

সে শুতে চলে যায়। বুড়ি কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে আবার হয়ত ফিরে আসে। ঘরের দাওয়ায় বসে অবুঝের মত আবার কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে—"বড্ডা খিদে নেগেছে গো। দুটো ভাত দাও।"

বুড়ি এখন গোটা গ্রামের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাত দুপুরে কারও ঘরের দাওয়ায়, কারো খামার বাড়ির খড়ের গোলার কাছে "খেতে দাও—খেতে দাও" বলে কাঁদে। লোকজন বিশেষ করে ঘরের মেয়েরা সেই কান্না শুনে দারুণ ভয় পায়। একদিন তো একটি বৌ রাতে বাইরে উঠে অন্ধকারে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভয়ে 'বু-বু-বু-বু' করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

নিরুপায় হয়ে তারা ওকে সহ্য করে। ও নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলেই খেতে দেওয়ার প্রশ্ন আসে। আর কে খেতে দেবে বারমাস। আগে এ ধরনের ক্ষেত্রে গ্রামের মাতব্বররা বারোয়ারীতলায় সাধারণের সভা ডেকে কিছু চাল, পয়সা তুলে সাহায্যের ব্যবস্থা করত। কিন্তু এখন ওসব প্রথা উঠে গেছে।

তবু এক-আধদিন এক-আধজন দেয়। আর যা পারে, দেয় তার ঘরের পাশের ডোমপাড়ার মেয়েরা। তবে তারাও তো গরিব। তাদেরও তো নিত্য অভাব। তাদেরই সময়ে অসময়ে কে দেয় তার ঠিক নেই। তবু যা দেওয়ার তারাই দেয়। গরিব বলেই হয়ত গরিবের দুঃখ বোঝে।

এমনিভাবে চলতে চলতে একদিন গ্রামের মানুষের মনোবাসনা পূর্ণ করে মারা গেল ধাইবুড়ি। একেবারে অপঘাতে মরা। বিকেলে কালবৈশাখীর জলে ঝড়ে পিছল হয়েছিল উঠোনটা। দুপুর রাতে উঠে দাওয়া থেকে নামতে গিয়ে পিছলে লাঠিটা সরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়ে হার্টফেল করল বুড়ি।

সারারাত সে ঐভাবেই কাদায় পড়ে রইল। সকালে প্রথম দেখল ডোমপাড়ার একটি বৌ। তারপর হৈ-চৈ চেঁচামেচি, কিছু কৌতূহলী লোক জড় হওয়া, তারপর গ্রামের ঘরে ঘরে "এই বার্তা রটি গেল ক্রমে।"

জলাশয়ে ছোট্ট ঢিল ফেললে যেমন মৃদু আলোড়ন হয় একটু তেমনি মৃদু চাঞ্চল্য উঠল গ্রামের বয়স্ক নারী পুরুষদের মধ্যে। কেউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। কেউ বলল—"যাক। বাঁচল বুড়ি। বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল।"

কেউ বলল—"ধাইবংশটা নির্বংশ হয়ে গেল।"

—"ধাইবংশটা কেন, গোটা হাড়িপাড়াটাই উচ্ছেদ হয়ে গেল—" মন্তব্য করল আরেক জন।

তারপর ?

এই পৃথিবীতে নবজাতকদের আগমনের ওপর নির্ভর করে গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছিল যে পেশা তার শেষ প্রতিনিধির স্মৃতিটুকুও ভুলে গেল সব।

'ধাইমা, ধাইবুড়ি' শব্দগুলি হয়ত এখনও কিছুদিন বেঁচে থাকবে অভিধানে, যদি কোন সমাজ-বিজ্ঞানীর গবেষণার কাজে লাগে এই প্রতীক্ষায়। তারপর একদিন এগুলোও মৃত শব্দ বলে বর্জিত হবে। সমাজ বিবর্তনের ধারায় যেমন বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে তেমনিভাবেই একদিন অবলুপ্ত হবে এই স্মৃতি।

পৃথিবী

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

জীবনভর কম দুঃখ পেল না সীতাবতী। তার বাপ মরেছিল রাজনৈতিক দাঙ্গায়—উলুখাগড়ার প্রাণ, তাই আসতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ। এক কাটের ফ্রক পরে সে তখন বাতাসী মাষ্টারের পাঠশালে পড়তে যেত। কানে খুব খোয়া হত কথা ভাল শুনতে পেত না সে। পুকুর কাটাই হলে পাড়ে পড়ে থাকা গ্রীষ্মের পাঁক ফাটা মাটিতে খুঁটে খুঁটে খুঁজে নিত শুকনো পানিফল, শালুকের গেঁড়। আগুনে পুড়িয়ে তাই খেতে ভালোবাসত। এই তার শৈশবেব ভালোবাসা। বাপের মৃত্যুতে চোখের জল ফেলতে পারেনি সীতাবতী, গভীর জ্বরে ঘুমিয়ে ছিল তখন। খুব জ্বর হত তার। কচিকালের দুঃখ আর ভালোবাসার ইতিহাস বলতে এটুকুই তার মনে পড়ে।

তারপর প্রখর রোদের জ্বালায় ফেটে গেল সেই কচি প্রাণ। শক্তসামর্থ তেজালো চেহারার পাকা ছাতিম গাছটায় ফুল এল। অন্যরকম এক গন্ধ পেল সীতাবতী। কেমন একটা মাতন লাগল শরীরে। পুকুরঘাটে নাইতে গিয়ে শিমলি পাতায় জল টলমল দেখল। আহা কি ভালো লাগল তার! ঘাট থেকে উঠে আসার সময় নিজে নিজেই বুকে গামছা পেতে দিতে শিখে গেল।

এখন সীতাবতীর গায়ে খড়ি ফুটছে। মাথার চুল গ্রীষ্মের ঝলসানো ঘাসের মত ধূসর। মাখতে পরতে মানা, তার মাছ খেতে নেই—নিরামিষ। অশৌচের দিন মনে আর শরীরে শুদ্ধ থাকার বিধান। মা মরেছে যক্ষায়। একমাসের মাথায় ভাই কলা চটকে বামুন ডেকে শ্রাদ্ধ করবে। আকাশের রোদ খেয়ে ধান শুকছে উঠোনে, কুটলেই আতপচাল। রাতের বেলা সীতাবতীর শরীর ফাটে, পোড়ে, জ্বালা ধরে। একা একা শুতে পারে না সে। নিশিজাগরণে রাত কেটে যায়। মাঝরাতে কামারের হাপরের আগুন খেয়ে মদ্যিগগনে যখন চাঁদ জ্বলছে তখন সীতাবতী তাকিয়ে আছে ডোবার পাড়ে তাদের কলাগাছটার দিকে। ডোবার ধারে ভেজা এঁটেল মাটি হলুদ, জ্যোৎস্নায় মেয়েমানুষের ডৌল উরুর মাসের মত চিকচিকায়। জল পায় আরশীর চরিত্র। তাকালে মুখ দেখা যায়। পাড়ে দাঁড়িয়ে গাছটার বাড়ন্ত কলার কানা ছায়া ফেলেছে জলে। আঙুলের গিঁট গুনে সীতাবতী হিসাব করে, আরো দশদিন পরে ঘাট···ক্ষৌরকর্ম। এগার দিনের দিন শ্রাদ্ধ।

মধ্‌দুয়ারে পাতা খেজুর পাতার তালাইয়ে শুয়ে ছিল সীতাবতী। কি মনে এল কে জানে। সে উঠে এসে দাঁড়াল ডোবার ধারে। দেখল কলার কাঁদি থেকে আকাশের দিকে জেগে উঠেছে একটা কচি পাতা। তীব্র কোন তলোয়ারের মত দৃঢ়, ধারালো। গাছটার গোড়ার দিকে তাকাতেই বুকটা ধ্বক করে ওঠে সীতাবতীর—জায়গাটা কালো হয়ে আছে, আর মাটি থেকে কয়েকটা পিঁপড়ে বেছে বেছে কি যেন খাচ্ছে। নিচে ডোবার জল, ওপরে ঝুঝকা আঁধারে ছাওয়া আকাশ—মধ্যিখানের ফাঁকা ছিদ্রহীন পৃথিবীতে সীতাবতী তার মায়ের মুখ দেখতে পেল। আর ভয়ে ভড়কে গিয়ে কঁকিয়ে উঠল,… আঁ…

তারপর আবার থিতু। চতুর্দিক স্থির। ঈশ্বরের মহিমা দেখা যায় সসাগরা চরাচরে। সীতাবতী তাকিয়ে দেখল ঘরের চালের মটকায় কেমন পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে একটি গোল পেট-ঢপকা লাউ। আবার ফিরে এসে সে শুয়ে পড়ল তার নিদেন বিছানায়।

১৩ বছর বয়সে সীতাবতীর বিয়ে হয়েছিল জংলাদেশে। ভঞ্জভূম পরগণার কাশীডাঙায়। তমালের কুলে। রাঢ় মাটির যেমন ধরন মাটিতে বালির ভাগ বেশি। শসা, ফুটি, তরমুজ ভাল ফলে। ধানে মন্দা যায়। দু বছরের মাথায় লোকটা অন্য মেয়েমানুষ নিল, ছেড়ে দিল সীতাবতীকে। মেয়েটা ড্যাং ড্যাং করে ফিরে এলো বাপের বাড়ি; কিন্তু দুঃখ পেল না।

নিজের মানুষের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে সীতাবতীর এক বদ অভ্যাস হয়ে গেছিল। একা একা আর শুতে পারত না সে। তাই বাপের ঘরে এসে শুল মা কিরণীর সঙ্গে। কখনো জড়িয়ে ধরে, ঘুমোতে ঘুমোতে গায়ে মাথায় পা তুলে দেয়। গুড়েবাগান পুকুরের পাড়ে মড়া পোড়ানোর বোল শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে যেত মায়ের শরীরে। গায়ে গতরে সব পেয়েছে সীতাবতী, কিন্তু মায়ের কাছে মেয়ে মেয়েটি হয়েই থেকে যায় চিরকাল।

আবার বিয়ে হল তারর সতীশের সঙ্গে। দেখে পছন্দ হয়েছিল মেয়েকে। দোজবরে ঘরে গেল সীতাবতী। লোকটার প্রথম পক্ষের বউ বাঁশতলায় বজ্রাঘাতে পুড়ে মরেছে। সীতাবতী পিতলের গাগরায় ভরে কাঁখে করে জল তুলে আনল ঘরে। উঠোনের মাঝখানে তুলসী গাছ লাগাল, জ্যৈষ্ঠ মাসে নতুন ভাঁড় ফুটো করে টাঙিয়ে দিল তুলসীর মাথায়, জল ঝরল—বসুধারা। ভোরে গেরস্থের চৌদিকে গোবরের ন্যাতা আর সন্ধ্যায় শাঁখে ফুঁ দিয়ে ঠাকুর জাগাল সীতাবতী। ক'মাস ঘর করল মেয়েটি—। কিন্তু কপালে নাইকো

ঘি, ঠকঠকালে হবে কি। এ লোকটাও ছেড়ে দিল সীতাবতীকে,…মেয়ের স্বভাব চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁশগাছের ডগায় ভর দিয়ে গভীর রাতে প্রেত নামে উঠোনে…সংসারে পাঁচ পুয়ো পাপ পড়ল হে…

লাজ নাই, লজ্জা নাই, সোয়ামীর ঘরের মাথা খেয়ে আঁটকুড়ো মেয়েছেলেটা বাপের ঘরে ফিরে এলো। এবারও কোন দুঃখ হল না তার। শীতের রোদে বসে মৌতাতে তারিয়ে তারিয়ে এক সানকি পান্তাভাত খেল শুধু লাটু পেঁয়াজ দিয়ে, সর্ষের তেল কাঁচা লংকা দিয়ে। আর লোকের কথায় হি হি করে বেহায়ার মত হাসল, রাত্রে ঘুমোতে গেল মা কিরণীর কাছে। যেমন খায় তেমনি ঘুমোয়।

কাশতে কাশতে একদিন কিরণীর গলা চিরে রক্ত পড়ল। মায়ের পিঠটা ডলে দিতে দিতে মাথার তেলায় ফুঁ দিল সীতাবতী। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—বৈকুণ্ঠ নাপিত চুপ। বৈকুণ্ঠ নাপিত চুপ। রক্তপড়া বন্ধ হল বটে। কিন্তু পরের দিন আবার পড়ল রক্ত। মুখ খুলে সীতাবতী গাল দিল ভগবানকে। কেশপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কিরণীকে দেখাল ভাই সুধন। মায়ের রোগের কথা শুনে দুঃখ হল তার। খেতে পায়নি কিরণী ঠিকমত, প্রথমে পিত্তি চুঁইল সেই আগুনের শিষ উঠল ফুসফুসে। যক্ষা রোগের ধাক্কা, মহাধাক্কা। রোজই রক্ত নামে কাশির সঙ্গে। সীতাবতী বলে, হায় মা! একি হলো গঅ তোর…।

কুমোর ঘর থেকে ঘরে এলো নতুন মাটির সরা। আমন ধানের খড় পুড়িয়ে তৈরি হল পাঁশ, ছাই। সেই ছাই সরায় ধরে রাখা। মাকে দেখভাল করে মেয়েটা, কাশির সঙ্গে পড়ে রক্ত। সেই রক্ত ছাইভরা সরায় করে ধরে ডোবা পাড়ের চারা কলাগাছের গোড়ায় পুঁতে দিয়ে আসে, গাছ রক্ত খায় আর দিনে দিনে বাড়ে। মাজা পুষ্ট হয়। তেজে গোড়ার দিকটায় ফাট ধরে। পাতায় চিকন লাগে। বসন্তকালের নরম হাওয়ায় অঙ্গ দুলিয়ে নাচে কলাগাছ।

সেই কলাগাছ থেকে কলার কাঁদিটা বঁটির এক কোপে কেমন অবলীলায় নামিয়ে ফেলল সুধন। দুদিন শিরিষ পাতার ভেতর কার্বাইড ফেলে মাটির হাঁড়িতে রেখে দিলেই পেকে যাবে। শ্রাদ্ধের রান্না হবে। কাঠ কাটা হচ্ছিল দুপুরে। ভরা গরমকাল, গা ধুতে গিয়ে গোপালকোলে পুকুরের জলে হেলেঞ্চে লতায় পোকা দেখল সীতাবতী। লম্বা মুড়ির মত…ইঃ! কি ঘেন্না।

রাত্রে চোখে ঘুম নেই সীতাবতীর। জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে অন্ধকার মেয়েমানুষের ছেঁড়া চুলের মত উড়ে উড়ে যায়। তাল গাছের বাঁকে বসে মদন গান ধরেছে। লোকটা দু চক্ষের বিষ···যেমন ষণ্ডাপাষণ্ড দেখতে। রাতের বেলা তারও চোখে ঘুম থাকে না। পুকুরের পাড়ে কিংবা আস্ত পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে গান ধরে। সে চায় সীতাবতীকে। দেবে নতুন জীবন। জীবনের মায়ায় আর কতবার সীতাবতী ঘর করবে। ঘর করলেই ঘরের বাঁশে ঘুণ লাগে। চোখের ভেতর সাপের ফণা আছে লোকটার, পারলে দংশায়। চতুর্দ্দিক চুপ। রাত যেমন নিরুপদ্রব হয়। লোকটা গাইছে...

এমন মানব জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা···
মনরে কৃষি কাজ জান না···

এক এক সময় সীতাবতীর ইচ্ছে হয় ওই লোকটার সঙ্গেই চলে যায়। একা থাকা, সে এক হতচেতন পরমায়ু। কতকাল যে জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে সীতাবতীর, হাসা হয়ে ওঠেনি, সে খেয়াল কে রাখে। গানের দিকে কান, সীতাবতী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘর থেকে উঠে বাইরে আসে সে। কলা গাছটার দিকে তাকিয়ে মুখচোখ যেন ভরে যায়। আদুল হাওয়াটি শরীরে ধরে ডোবার জলের দিকে গাছটা নামিয়েছে তার পাতা। কেমন সতৃষ্ণ, ঠিক একটা মেয়েমানুষের মত। ঘোমটা আড়াল দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।

দুগ্‌গা পূজার কথা মনে পড়ে যায় সীতাবতীর। ষষ্ঠীর রাতে কলাবরণের কলাবৌয়ের মত এই গাছ। সমস্ত জ্যোৎস্না আজ ওকে দুহাত দিয়ে বরণ করছে। রক্তখাকি, প্রাণবিনাশী। মায়ের শরীর নিংড়ে নিজে পেয়েছে অলীক যৌবন। ভাবতে ভাবতে বিছানায় এসে শোয়। এবং একসময় ঘুমিয়ে যায়। আর দেখা হয়ে যায় মা কিরণের সঙ্গে। মা লাল পাড়ের কোরা শাড়ি পরেছে। এয়োতি মেয়েদের যেমন, সিঁদুরে মাথাটা লাল। ঠোঁটের ওপর সেই কাটা দাগ···

মা বলল, ঘুম নাই চোখে?

উঁহু···

কিসের এত ভাবনা···হাতমুখ ঘাটে ভাল করে ধুয়ে এসে শুদ্ধ মনে ঠাকুরের নাম কর। ঘুম আসবে।

ভিতরটা যে জ্বলছে গও মা…

কিসের জ্বলন ?

তোর মুখে যে রক্ত নামে মা,… তার কি বৃত্তান্ত…

খকখক করে কাশল কিরণ। যেন দৈব কোন যোগ। কথার সঙ্গে রক্তের লীলা। হিক্কায় কথা ফুরায় না, থাক্কা খায়। চাপ চাপ রক্ত, কালো একটা বদ অন্ধকারের গুঁড়ো যেন সেই রক্তে। মাটির সরায় করে ধরল সীতাবতী। মুখ তুলল কিরণ, যেন নেশার পান তার ঠোঁটে রক্তের আলপনা দিয়েছে। কেঁদে উঠল সীতাবতী:…মাগো—মা! মা বলল, এ মাসেই আমি মরব। ভালো থাকিস্ লো। যা কলা গাছের গোড়ায় পুঁতে দিয়ে আয়……

কলা গাছের তলায় গিয়ে এই জ্যোৎস্না রাতের স্বপ্নের ভেতর দিয়ে সীতাবতী যেন মহাজীবনের বীজ পুঁতে দিয়ে এল এক আধিদৈবিক অন্ধকারে। এবার ধারন করুক পৃথিবী, গাছ, চরাচর।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সীতাবতী বুঝতে পারল কাল গভীর রাতে সে মাকে স্বপ্নে দেখেছিল। আর কাকেই বা দেখবে, আর কেবা আছে তার যাকে স্বপ্নে দেখা যায়। চতুর্দ্দিকে জটিল কুটিল পৃথিবী, তার ভেতর দিয়ে বোধহয় লুকিয়ে চুরিয়ে অনেক ফন্দি করে পালিয়ে এসেছে সকালের টাটকা রোদ। খুব হলুদ, বাঁ হাতটা আড়াল থেকে রোদের দিকে বাড়িয়ে দিতেই তার গায়েহলুদের দিনটির কথা মনে পড়ে যায়।

বিকালে আবার সেই পাষণ্ড মদনের সঙ্গে দেখা। তার ছাতিতে চুল, পিঠে চুল। দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় হাতপায়ের গিঁটগুলি খুব শক্ত। লোকটা বলল, যাবি…যাবি নাকি রে…

কুথা যাবো—

নাবাল—

খাবো কি…

জিভ দিয়েছে যে খাবার দিবে সে…। খাটব খাব…

রুক্ষ লোকটার চুলের রঙ আরো রুক্ষ, হীরাকষে ধোয়া। যেন ধূপের ধোঁয়া চুলের গহীনে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। খর চাউনিতে কেমন একটা ইচ্ছে। সীতাবতী বুঝতে পারে, সব বুঝতে পারে। ভেতরটা তার চুপ। তবু বাইরেটায় অবিকল হাসির মত আহ্লাদ ঝরতে থাকে। নিজেকে দামী মনে হয়। কিন্তু কোন উত্তর করে না। লোকটা আপন খেয়ালে

এসেছিল। চলেও গেল খেয়ালে গাইতে গাইতে। সেই গান শ্যামাসঙ্গীত। চরিত্র তুলিয়ে সীতাবতী হাসতে গেল। অমনি হোঁচট খেল মাটির মধ্যে ডুবে থাকা একটা পাথরের থুথনিতে। পায়ের একটা আঙুল ফেটে গেল। যেমন গোড়ালি ফাটে শীতকালে। ঠাণ্ডায়। হিমে কনকনায়। কিন্তু তেমন যন্ত্রণা পেল না সে···মগজ এখন রক্তের বদলে ওই পুরুষ মানুষটাকে দেখছিল। মানুষটাকে ধরে রাখতে পারলে অমন অনেক রক্ত আসবে যাবে। নিচ থেকে যন্ত্রণাটা যখন উপরে উঠে এল তখন সে বরং একটু তৃপ্তিই পেল কারণ যৌবনের মধ্য গগনে এসে এই পৃথিবীর সব মেয়েমানুষই যন্ত্রণার ভেতর থেকে এক অলৌকিক নোনতা স্বাদ পায়। আর তা হল জীবনের স্বাদ।

সীতাবতীর ভাই সুধন মায়ের শ্রাদ্ধ করল কলা চটকে। আতপচাল, কলা, বাতাসা, তিল চটকে পিণ্ড। সব দেখল সীতাবতী। লোক খেল। বামুন বিদায়। সারাদিন কীর্তনীয়ার দল বসে বসে তারক ব্রহ্ম গাইল।···

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সীতাবতীর। পাঁচজনের সঙ্গে সুর করে মড়াকান্নাও গাইল সে। সন্ধ্যে উত্তরে গেলে খই ছড়াতে ছড়াতে শলার ফুলঘর মায়ের শ্মশানে দিয়ে এলো। মালাকারের পাওনা মিটিয়ে যখন ভাইয়ের দিকে তাকাল সে তখন কান্নায় আরেকবার গলা রুদ্ধ হয়ে এলো তার! ভাইয়ের চুলহীন নেড়া মাথাটা যে চালে পড়ে থাকা সেই পেট চপকা লাউটার মতই একা। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের এই যোগাযোগ, সাদৃশ্য, সম্পর্কের গূঢ় তত্ত্ব কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু ভাইটার দিকে তাকিয়ে তার এক অর্বাচীন মায়া তৈরি হল। যার সঙ্গে গভীর রাতে সে পালিয়ে যাবে ঠিক করেছিল এখন ইচ্ছে তাকে গাল গিয়ে উদ্ধার করতে—খাল ভরা, ড্যাকরা, সাত—

রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে আবার সেই নিদ্রাহীন চোখ জ্বলতে লাগল তার। শরীরে হুট্ট লাগে। নিজের শরীর থেকে এক গন্ধ উঠে এসে ঢুকে যায় নিজেরই নাকে। নতুন শাড়ির কোরা গন্ধ, অচেনা এক আঁশটে গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে সে এক বিষাক্ত ভাব। শরীর জ্বালা করে, বাইরে উঠে গিয়ে চাঁদের আলোয় সে দেখল পৃথিবী ফাঁকা, একা, অবয়বহীন।

অবয়বহীন পৃথিবীকে তার মেয়েছেলের মত মনে হয়। অবলা কলাগাছটি দাঁড়িয়ে আছে ডোবার পাড়ে। সেই কলাবউ, দুর্গা ষষ্ঠীর রাত থেকে পালিয়ে এসে এখন শুধু উঁকি মারে। আড়ে আড়ে ডাকে সীতাবতীকে···আয় সখী, কি তোর দুঃখ, পরাণ খুলে আমাকে একবার দেখা তো দেখি······

ভাই বলছিল কাল দুপুরে কলাগাছটিকে কাটা হবে। কাঁদিহীন গাছ নাকি কুনজরে বাড়ে। ওর ছাতি থেকে থোড়টা খুলে নিয়ে রান্না হবে। সীতাবতী দেখল গাছে পাতায় বেশ বাড়ন্ত চেহারা তার। জোৎস্নায় দূর থেকে দেখা যায় গাছের গোড়ায় গর্তের মত কালো অন্ধকার জায়গাটি পড়ে আছে রক্তহীন হয়ে। আর ডোবার জল কুঁচুলে বাতাসের তাড়নায় সেই হলুদ এঁটেল মাটিকে ধরে ছলকায়। উঠে পড়ে বাড়ে, ছোট হয়। শরীরে শরীরে লাগিয়ে হড়কায়।

হঠাৎ সীতাবতী নিজের শরীরে কি একটা বেগ অনুভব করে। ভেতরে শুয়ে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা নদী যেমন গর্জায়। কোথায় কোন মাঠের ধারে অনিদ্রায় লোকটা ঘুরে বেড়ায় কে জানে। তার গান শুধু হাহাকারের মত ভেসে আসে হাওয়ায় হাওয়ায়···

এমন মানবজমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা···
মনরে কৃষি কাজ জানো না···

ঘরে উঠে যায় সীতাবতী। ছ্যাঁড়া ন্যাকড়ায় করে নিজের শরীরের অশুদ্ধ রক্তটি ধরে এনে পুঁতে দেয় সেই কলাগাছটির গোড়ায়। যেন পৃথিবী আবার রজস্বলা হয়ে উঠল। কলাগাছ মেয়েমানুষের মত জেগেছে মাটির হৃৎপিণ্ড ভেদ করে, বহু যন্ত্রণায়। মানুষের মন সে এক অদ্ভুত কারিগর···। হাত দিয়ে সেই রক্ত মাখা ন্যাকড়াটি গাছের গোড়ায় পুঁতে দিতে গিয়ে প্রথমে সীতাবতীর চোখে পড়ল অন্ধকার মাখা মাটি। নাকে এসে লাগল আঁশটে গন্ধ। ঝুরো মাটি সরিয়ে মাকে যেন আদর করল সীতাবতী। তখনই হাতে খচ করে লাগল কি, কি একটা খোঁচা কলাগাছের গোড়ায়, এটা আবার কি?

তরসতরি মাটি সরাতেই পৃথিবী ভেদ করে অবিকল মানুষের মত জেগে উঠল নতুন গাছের একটি ফোঁড়। শিশুটির দিকে তাকিয়ে আনন্দে সীতাবতীর বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেল, যেমনটা মেয়েমানুষের হয়।

র‍্যাম্বো অথবা রামচন্দ্র

কিন্নর রায়

হাঁটু ছাড়ানো ফেনিল, নোংরা জল ভাঙতে ভাঙতে সিদ্ধার্থ প্রায় তিন ঘণ্টার ধারাবর্ষণে আক্রান্ত এই শহরকে যেন বা সমুদ্রের মায়ায় আবিষ্কার করতে পারছিল। তার চারপাশের কলকাতা এখন বাস্তবিক অর্থেই জল-কল্লোলিনী। সারি দিয়ে দাঁড়ানো ট্রামেরা লাইনের ওপর মৃত। তাদের গায়ে জল ছুঁয়ে গেলে যে জলজ শব্দ, তা এই দুঃসময়েও সিদ্ধার্থকে দীঘার স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। বোল্ডারে সাগরজল এমন ঘা দিয়ে ফিরে আসে।

ফুটপাত রাস্তা নর্দমা এখন একমেব। আনাজের খোসা, ডিমের খোলা, ঠোঙা, ব্যবহার করা স্যানিটারি ন্যাপকিন—আর আরও আরও রাজ্যের জঞ্জাল সিদ্ধার্থর দুপাশ দিয়ে বহে যাওয়া কলকাতা নামে নদীটির যাত্রা-সঙ্গী। সরকারি বাস নেই। দুঃসাহসী প্রাইভেট বাস বা মিনি কখনও ঐচ্ছিক ভাবে ঝড়ের গতিতে চার চাকার তলায় এই নদীকে সিন্ধুবৎ কল্লোলিত করে, (তখন সিদ্ধার্থর পুরীকে মনে পড়ে যায়, অহো ঢেউ, সফেন ঢেউ) হাঁটু জলকে কোমর অব্দি প্লাবিত করিয়ে চলে যায়। তাদের একটি বা দুটি গেটেই তখন মানুষের মৌচাক। শুধু হ্যাণ্ডেল ধরেই নয়, মানুষের হাত অথবা পা ধরে মানুষই—সোভিয়েত সার্কাস কিংবা থার্ড থিয়েটার-এর থেকে কোনো নতুন কম্পোজিশন আয়ত্ত করতে পারে, এমন ভাবনাও ছুঁয়ে যায় সিদ্ধার্থকে। ফলে মৌচাকে হাত বাড়াতে সাহসী হওয়া যায় না।

কলেজ স্ট্রিট থেকে রিকশায় ঠনঠনের ভরা নদী পেরিয়েছিল সিদ্ধার্থ। জল রঙের চাউস প্লাস্টিকের ঠোঙায় নিজেকে মুড়ে, সামনে অনেকটা ঝুঁকে, দুপা দুহাত এবং কোমরের জোরে জল ভেঙে, গাড্ডা বাঁচিয়ে যে মানুষটি তাকে জলভূমির কিছুটা পার করে দিল, তার পারানির মূল্য ছিল আট টাকা। চাকার ওপর দিয়ে জল ফুলে উঠতে উঠতে পা-দানি ভাসিয়ে দিচ্ছিল। লাল রেক্সিন মোড়া ভিজে সিট একটু একটু করে সিদ্ধার্থর প্যান্টকেও সংক্রামিত করছিল। তার কোলের ওপর ভিজে ফোল্ডিং ছাতা, চ্যাপ্টা বাহারি সিনথেটিক ব্রিফ কেস আর প্লাস্টিক ঢাকনায় মোড়া গদা। রঙিন প্লাস্টিকের তৈরি। স্টোরের সান্যালদা বলেছিলেন, শেয়ালদায় শস্তা পাওয়া যাচ্ছে। দোকানের নামও

বলে দিয়েছিলেন। পাড়ার সাড়ে আটটাকার জায়গায় সাড়ে পাঁচ, ছয়। ফলে ডালহাউসির অফিস পাড়া থেকে শেয়ালদায় হেঁটে গদার খোঁজে।

সান্যালদার প্রেসক্রাইব করা দোকানে সিদ্ধার্থ গদা পায়। কিন্তু দাম সাতের এক পয়সা কমানো যায় না। মধ্যবিত্ত সংস্কারে সান্যালদার নামও করে ফেলে সিদ্ধার্থ। গদা দেয়া মানুষটির কপাল কুঁচকোয় পরিচিত অপরিচিতের গণ্ডী তাতে ভাঙে কি ভাঙে না, সিদ্ধার্থ বুঝে উঠতে পারে না। দাম তার নিজস্ব বিন্দুতে স্থির থাকে। আর যেন তখনই কালো আকাশ উপুড় হয়ে ভেঙে পড়ে কলকাতার ওপর। আসন্ন সন্ধ্যার শেষ আলোটুকু শুষে নিয়ে থৈ-থৈ নাচ শুরু করে মেঘেরা। চারপাশ শাদা হয়ে বৃষ্টি পড়ে। ব্রিফকেস থেকে ফোল্ডিং ছাতা বের করে বিপন্ন সিদ্ধার্থ দেখতে পায় স্নান সেরে নিতে নিতে আষাঢ় সন্ধ্যার কলকাতা একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে।

মাথার ওপরে নক্ষত্রহীন আকাশ, কালিমা পেরিয়ে বীরভূমের লাল মাটির রঙ পেয়েছে। কোথাও হাওয়া নেই। দুএক ফোঁটা বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে ফোল্ডিং ছাতার ঢাকনায় আটকে যাচ্ছে। দুপায়ের চামড়ার চটি জলে ভিজে পাথরা ভারি, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট পরিশ্রমের। গুটনো প্যান্টের ফোল্ডে জল ঢুকে বেশ অস্বস্তিই তৈরি করছে। রাস্তার দুপাশে মৃত বাড়িগুলি, ফাঁকা রাস্তা, কপাট বন্ধ দোকান পেরিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল না এখন ঠিক কটা। তার বাঁ হাতের ঘড়ির ওপর রুমালের ঢাকনা। আধ ভেজানো কোনো দোকানের ভেতর থেকে উপছে আসা টিউব ল্যাম্পের চাঁদনি এই খলবলে জলে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থ-বড় রাস্তা থেকে তাদের গলির মুখে। জল এখানে আরও গভীরতর। ডান হাতে ফোল্ডিং ছাতার বাট, বাঁ হাতে ব্রিফকেসের হাতল, বাঁ বগলে গদা। সিদ্ধার্থ ধীরে তার শরীরটিকে জলে নামিয়ে দিতে দিতে বুঝতে পারল ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা, পাম্প, উন্নয়ন, আর অজস্র গালভরা প্রতিশ্রুতি—সবই আজকের বৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়েছে। আর তখনই এই গলির ভেতর একটি জলবন্দী প্রাইভেট গাড়িকে আবিষ্কার করল সিদ্ধার্থ। বিদেশী সিনেমার পর্দায় হারপুন খেয়ে ভেসে ওঠা কোনো তিমির শবকে মনে পড়ে গেল। কাচ তোলা, আলোবিহীন হিন্দুস্তান মোটরের মডেল অচল হয়ে বৃষ্টি ভিজছিল। তার চালে পড়া ফোঁটার শব্দে, এবং নিজের ফোল্ডিং ছাতার কাঁপন থেকে সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল বৃষ্টি আবারও জোরে এলো।

এই জল, এই অসহায়তা পেরিয়ে যেতে যেতেই তার চোখের সামনে গোটা

পাড়া জুড়ে নেমে এলো এক অদ্ভুত আঁধার। সাঁওতালডি, ব্যাণ্ডেল অথবা অন্য কোথাও বিদ্যুতের দম বন্ধ হলো। 'আওয়ারা'-র রাজ কাপুরের থেকেও অনেকটা উঁচুতে প্যান্ট গুটিয়ে পা টেনে টেনে শারীরিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলা সিদ্ধার্থ একটু টাল খেয়ে গর্ত বাঁচিয়ে যখন বাড়ির দরজায় পৌঁছল, তখন সেখানকার জমা জলে রাস্তার বেঁটে কলটি, ময়লা ফেলার জায়গা এবং নর্দমা একাকার হয়ে গেছে।

রাস্তা থেকে উঠে এলে তাদের দরজার সামনে লম্বা সিমেন্ট বাঁধানো গলি। সামনের পোরশান সিদ্ধার্থদের, পেছনের পোরশানে অরিন্দমরা। বছর তিরিশ আগে এই বাড়িটা কেনেন সিদ্ধার্থ এবং অরিন্দমদের বাবা। তাঁরা দুই বন্ধু মার্চেন্ট অফিসে বড় চাকরি করতেন। তখনও বাঙালি কলকাতা বলতে শ্যামবাজার বাগবাজার, ভবানীপুর, কালীঘাটই বুঝত। বালীগঞ্জ নিউ আলিপুর তেমন করে জমে ওঠে নি। সল্টলেক, গড়িয়া তো মানচিত্রেরই বাইরে। ভাড়াটেসুদ্ধ বাড়ি কিনে দুই বন্ধু নগদ টাকায় ভাড়াটে বিদায় করেছিলেন। তারপর নিজেদের মতো কিছু ছেঁটে-জুড়ে থাকার ব্যবস্থা। সিদ্ধার্থর একতলার বসার ঘরে বন্ধ সবুজ দরজাটির খিল সরালেই অরিন্দমদের রান্না-খাওয়ার জায়গা। পুরনো স্থাপত্যের খিলানের মাথায় নানা রঙের রঙিন কাচ। সেখানে কখনও রোদ ছুঁয়ে যায় না।

বাবিন, দীপা একতলাতেই ছিল। ফোল্ডিং ছাতা বন্ধ করে, ঝাঁকড়া ভিজে চুল একবার বাঁ হাতে ঝেড়ে থপ থপ করে ওপরে উঠে আসতেই মোমবাতি হাতে দীপা। ব্রিফকেস, ছাতা নিতে নিতে বলে উঠল, গরম জল করে দিচ্ছি। একেবারে কলঘরে চলে যাও। আর বাবিন তার বাঁ বগল থেকে প্লাস্টিক মোড়া গদাটি এক হ্যাঁচকায় কেড়ে নিয়ে ভিজে ঝুপ বাবার দিকে তাকিয়ে সেই টি. ভি-র মতোই হুংকার দিয়ে উঠল—জয় শ্রী রাম। জয় শ্রী রাম।

সিদ্ধার্থ তার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া সাত বছরের একমাত্র সন্তানের দিকে তাকাল। এ কোন অরণ্য-যাত্রার আয়োজন? বাবিন আর একবার শূন্যে লাফ দিয়ে মাটি ছুঁলো। তার গলায়—হর হর মহাদেও। তারপর ভিজে পেছল, দোতলার সিঁড়ি বেয়ে যুদ্ধযাত্রার গতিতে উঠে গেল দোতলায়।

ছাতা, ব্রিফকেস বৈঠকখানার ঘরে রেখে রান্নাঘরের সামনে ছোট বালতিতে রাখা জল হাতের তালুর ছোঁয়া বাঁচিয়ে, কব্জির মোচড়ে ঢেলে দুহাত ধুয়ে, সাবান বুলিয়ে আবারও ধুলো দীপা। ইদানীং তার এই

ধোয়াধুয়ি যেন কিছু বেড়েছে। এখনই, সিদ্ধার্থকে কলতলায় গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান সেরে নেয়ার জন্যে যে আকুতি, তা যতটা না শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক, তার চেয়েও বেশি ছোঁয়াছুঁয়ি সংক্রান্ত। এমন কি ইদানীং গড় হিসেবে মাসে আট থেকে দশবার শরীরী মিলনের পরও এই শুচিবাইপনায় আক্রান্ত থাকে দীপা। যা সিদ্ধার্থকে ক্লান্ত করে। বিরক্তও।

গ্যাসের নীল আঁচে জল গরম হতে তেমন দেরি হলো না। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে বাথরুম। পাশে পায়খানা। দুহাতের ভেতর রান্নাঘর। বসার ঘর। বাথরুমে মোমের আলোয় নগ্ন সিদ্ধার্থ গায়ে সাবানের সুগন্ধি ফেনা জড়াতে জড়াতে ভাবছিল তার বাবা ভবনাথ এই বাড়ি কিনলেন বন্ধু শৈলশেখরের সঙ্গে। নিজেদের মতো ভাগজোক করে নিলেন। সামনের বাঁধানো গলিতে সিদ্ধার্থ অরিন্দমদের গলি-ফুটবল। যার বার পোস্ট চটি জুতো। প্রায়ই পাশের বাড়ির হেঁসেলে বা শোয়ার ঘরে উড়ন্ত রবারের বল। ঝগড়া। খেলা বন্ধ। বঁটিতে কাটা বল নর্দমায়। শীতে দেয়ালে খড়ির তিনটে দাগ কেটে উইকেট আগলানো। ক্যাম্বিশের বল উড়ে অন্যের ছাদে পড়লেই আউট। সেই বলও পাশের বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়লে চিল-চিৎকার। বল চাইতে যাওয়া তখন এক সমস্যাই। অনেক সময়েই বঁটি কাটা হয়ে ফেরত আসত ক্যাম্বিশ বল। নয়তো দুদিন পরে সামনের নর্দমায়। প্রায় নতুন বল বঁটিতে দ্বিখণ্ডিত, লুটোপুটি খাচ্ছে জলে-কাদায়। শোক, অপমান, রাগ…। সিদ্ধার্থরা তিন ভাই, অরিন্দমরা চার। সিদ্ধার্থদের বোন নেই। অরিন্দমদের এক। ভাইফোঁটায় ওদের বাড়ি ফোঁটা নেয়া ও খাওয়া-দাওয়ার নেমন্তন্ন। এবং কিছু ভালোলাগা ও প্লেটোনিক ভালোবাসার বিভ্রম। শৈলশেখর আর ভবনাথ-গিন্নি ম্যাটিনিতে উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, সন্ধ্যারানী, অসিতবরণ, সুচিত্রা সেনের ছবি দেখে বাড়ি ফিরছেন।

…চোখে সাবান ঢুকে গেল। অন্ধকারে মগ হাতড়াচ্ছে সিদ্ধার্থ। হাতড়ে হাতড়ে একসময় বালতির পাশেই মগ পেল। বালতি থেকে ফিকে গরম জল তুলে তুলে মাথায়। সাবান মাখা হাতে চৌবাচ্চায় একেবারে মগ ডোবানো পছন্দ করে না দীপা। জল খারাপ হয়ে যায়। তাই চৌবাচ্চা থেকে বালতিতে জল তুলে নিয়ে, তারপর মগে করে ঢালাঢালি।

সাবান-শ্যাম্পু সুরভিত বাথরুমের বাতাসে বিশাল চৌবাচ্চার ভেতর মগ ডুবিয়ে জল তুলতে তুলতে সিদ্ধার্থর মনে হলো চৌবাচ্চার মেঝেতে যে পুরু শ্যাওলার আস্তর, তা আসলে প্রাগৈতিহাসিক। একদা সেখানে কৈ, শিঙি

মাছ পুষত সিদ্ধার্থর ছোট ভাই বুলটান। তখন জলের এমন সংকট ছিল না। বাবিন কয়েকটা গাপ্পি ছেড়েছে চৌবাচ্চায়। যাতে মশা না হয়, এই যুক্তিতে দীপা রাজি হয়েছে। তবুও আঁশ-জলে চান করতে তার গা ঘিনঘিন। এনিয়ে মাঝে মধ্যেই ঘ্যান-ঘ্যান।

বুলটান হিন্দুস্তান কপারের বড় চাকরিতে ঘাটশিলায় পোস্টেড। দোতলায় তার ভাগের একখানা ঘর চাবি দেয়া থাকে। বছরে বার দুই তিন খোলা হয়, একবার অবশ্যই দুর্গা পুজোর সময়।

বগলে, কুঁচকিতে, হাঁটুতে, পায়ের গোছে চন্দনের গন্ধ দেয়া সাবান ঘষতে ঘষতে সিদ্ধার্থর মনে পড়ল অরিন্দম আর সে কতদিন সিগারেটের খালি প্যাকেট কুড়নোর জন্যে গ্রে স্ট্রিট ধরে কতদূর চলে গিয়েছে। তাদের বাড়ির পেছনে বস্তির ছেলেদের সঙ্গে সিগারেটের তাস জিত জিত বা গুলি খেলায় অরিন্দম এবং সিদ্ধার্থর ছিল সমান উৎসাহ।

ইদানীং অরিন্দম মারুতি কিনেছে। তার বডির রঙ স্টিল গ্রে। তার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা হয় না। অরিন্দমের গোটা মুখ জুড়ে সফল মানুষের প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস। যেমন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির হাই এগজিকিউটিভদের হয়ে থাকে। ওর বৌ স্বাতীলেখা মাস তিনেক হলো ধর্মতলায় গিয়ে বয়েজকাট করে এসেছে। বালক-বয়েস, গলি-ক্রিকেট, ট্রাম লাইন ধরে সিগারেটের খালি খোল খুঁজতে যাওয়ার নিরুদ্দেশ-যাত্রা—সবই এখন ঘষা কাচের ওপারের ছবি।

চুলে লাগা ফেনায়িত শ্যাম্পু চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলতে ফেলতে সিদ্ধার্থ হঠাৎ এই আনন্দে ডুবে গেল—কলকাতায় থাকলে অরিন্দমকেও আজ এই নরক ঘেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। বাথরুমে জলের শব্দ তীব্রতর হতে থাকল এই ভাবনার সঙ্গে।

গায়ের থেকে উড়ে আসা সাবান-সুঘ্রাণ হাওয়ায় মিশিয়ে দিতে দিতে সিদ্ধার্থ সরু সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দোতলায় তাদের ভাগের একটিমাত্র ঘরে উঠে যেতে চাইছিল। সিঁড়িতে কোনো আলো ছিল না। অথচ বাঁকটি ঘোরার মুখে, ড্যাম্প ধরা দেয়ালের গায়ে তাদের পারিবারিক গ্রুপ ফটোর আরও দুটি ভাইকে চিনে নিতে অসুবিধে হলো না। ওভাল শেপের ব্যাক গ্রাউণ্ডে হালকা হালকা ড্যাম্পের জলছাপ লাগা স্বাস্থ্যবান ভবনাথ, মা স্বর্ণলতা। গ্যালিস দেয়া প্যাণ্ট পরা সিদ্ধার্থ, নেকার-বোকার পরনে বুলটান, যার ভালো নাম সুব্রত, আর একদম ছোট দেবু, দেবব্রত মেয়েদের মতো

ফ্রক পরে। মেয়ে ছিলনা বলে দেবুকে চার বছর অব্দি মেয়েদের মতনই সাজাতেন স্বর্ণলতা। ডি. রতনের দোকানে তোলা, ওখান থেকেই প্রিন্ট নেয়া। ম্যাট ফিনিশ।

ছবির কাচে পৃথিবীর কোনো অজানা কোণ থেকে চুঁইয়ে আসা আলগা আলো লেপ্টে ছিল। তার ভেতর দিয়েই নিজের শৈশবকে একবার ছুঁয়ে সিদ্ধার্থর ফিরে আসা। কত বড় বাড়ি করেছে দেবু সল্টলেকে। বিদেশিনী স্ত্রী। ভেজানো দরজা ঠেলে অন্ধকারে গামছা পরা খালি গায়ের সিদ্ধার্থ কিছু হাতড়াচ্ছিল। তার গায়ের সাবান সুঘ্রাণ ধীরে মিশছিল এঘরের বদ্ধ বাতাসে। হাজার দশেক টাকা দিতে হয়েছিল দেবুকে তার সল্টলেকে বাড়ি তৈরির সময়ে। বাজার দর অনুযায়ী একতলায় ভাগের একটা ঘর ছেড়ে দেয়ার পক্ষে টাকাটা যথেষ্ট কম। তবু দেবু নিয়েছিল, কারণ দেবু দয়াপ্রার্থী হওয়া ও দয়া করার বিরোধী। সফল ডাক্তার হিসেবে দীর্ঘদিনের আমেরিকা-ইউরোপ প্রবাস তাকে এই শিক্ষাটুকু দিতে পেরেছে। ধার করে, কষ্ট করেও সিদ্ধার্থ টাকাটা দিয়েছিল।

মোমবাতির আলো ও আগুনকে বাতাস থেকে রক্ষা করতে করতে সিদ্ধার্থ অনুগামিনী হয়েছিল দীপা। আর জানলা না খুলেও সিদ্ধার্থ বুঝতে পেরেছিল অরিন্দমরা ব্যাটারির আলোয় আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। দীপার হাতের মোমবাতি-শিখা প্রাচীন কড়ি-বরগা, আর পেটাই ছাদের রঙে জড়িয়ে যাচ্ছিল। চারটি কাঠের ব্লেডঅলা ঢাউস ডি সি ফ্যানটি সিলিংয়ে, দেয়ালে তার মস্ত ছায়া ছাড়িয়ে অপার্থিব, অতিকায় কোনো বাদুড়ের রূপকল্পনা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আর এই ঘরের বড়সড় পালঙ্কটির কোণ থেকে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম হুঙ্কার দিতে দিতে বেরিয়ে এলো বাবিন। তার কাঁধে ফেলা গদা, খালি গা। আঁটসাঁট গামছা বাঁধা—কোমরের নিচে থেকে হাঁটু অব্দি। মোমের ম্লান আলোয় বাবিনের ছায়া শংকরস্কোপের কোনো একটি মাত্রা হয়ে ধীরে দেয়ালে জড়িয়ে গেল। তারপর প্রলম্বিত, প্রসারিত হতে হতে এঘরের কোণে কোণে বহুমাত্রিক ছবি হয়ে ফুটে উঠল।

দুই

খবরের কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে শুধুই জলবন্দী কলকাতার ছবি। খবর। সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, মানিকতলা বালিগঞ্জের কোথাও কোথাও আর পিকনিক গার্ডেনস-এ নৌকো নেমেছে, এমন খবর পড়তে পড়তে সিদ্ধার্থ অফিস যাওয়া বাতিল করতে চাইছিল। কিন্তু তার মাত্র পাঁচ দিন সি-এল পাওনা,

ছটি মাস এখনও বাকি—এমন ভাবতে ভাবতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অফিস-অভিসারী সিদ্ধার্থ।

বাবিন স্কুলে যায় নি। গদা কাঁধে খালি গায়ে, কাছা দিয়ে টেনে গামছা পরে খাট থেকে লাফিয়ে মেঝেয়। কখনও খাটের ওপরই শূন্যে উঠে নেমে আসা।

মেঘলা দুপুর গড়িয়ে গেলে টের পাওয়া যায় না। ভাত খেয়ে লাইব্রেরি থেকে আনা সাম্প্রতিক টিভি সিরিয়ালে দেখানো স্বাস্থ্যবান নভেলটি নিয়ে দীপা হাই তুলছিল। তারপর তার চোখের পাতায় উপন্যাসের অক্ষরগুলি জড়িয়ে যেতে যেতে একসময় মুছে গেল। দোতলার কাঠের বরগায় আংটায় ঝোলা চারটি কাঠের ব্লেডের ডি. সি. ফ্যান নিজের কক্ষপথে ঘুরে যাচ্ছিল। অটো স্টপ ক্যাসেট প্লেয়ারে মুকেশের গলায় রাজকাপুরের ফিল্মি গীত একটু একটু করে বিষাদ মিশিয়ে দিচ্ছিল দীপার রক্তে। ঘুমোলেই নাক ডাকে দীপার। নাকের ডাকের সঙ্গে তার শরীর ওঠে নামে। এমন দৃশ্যমায়ায় বাবিন মা-কে কুম্ভকর্ণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারল না।

একতলায় বসার ঘরে গদা কাঁধে 'জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম' বলতে বলতে পৌঁছে বাবিন দেখতে পেল তাদের লম্বা জানলার শিকে রাবণের মুখ।

এই মেঘলা দুপুরে বাবিনদের বাড়ির ঠিক দুটো বাড়ির পরে নতুন আসা অভিষেক, রাবণের মুখোশ পরে। তার পাশে স্বপ্রতীক অভিষেকদের বাড়িঅলার ছেলে। কাঁধে তীরধনুক, যেন বা বনচারী রাম অথবা লক্ষ্মণ। বয়েসে দুজনেই বাবিনের সমান, অথবা একটু উনিশ বিশ। অভিষেকের হাতে প্লাস্টিকের লম্বা তলোয়ার, কাঁধে তীর-ধনুক।

দরজা খোলাই ছিল। এই তিন বালক বসার ঘর পেরিয়ে বাবিনদের একতলার শোয়ার ঘরে খেলার ছলেই মেতে উঠেছিল যুদ্ধের মহড়ায়। বাবিনের ল্যাজ ছিল না; বাজারে প্লাস্টিকের ল্যাজ পাওয়া যাচ্ছে, সুতরাং তার হনুমানত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছিল অভিষেক, স্বপ্রতীক।

একতলার শোয়ার ঘরটি ধীরে পরিণত হচ্ছিল রণক্ষেত্রে, হুংকারে, গদা ও তলোয়ারের সংঘর্ষে, তীর ও ধনুকের শব্দে। তিনটি বালক তাদের টি ভি-তে দীর্ঘদিন রবিবারের সকালটি নষ্ট করার অভিজ্ঞতায় 'হুঁঃ', মূরখ, অথবা 'ম্যায় তুমকো আজ নেহি ছোড়েগা'—ইত্যাদি শব্দে যুদ্ধের উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছিল। কখনও 'হর হর মহাদেও' কখনও বা 'জয় শ্রীরাম' আর রাবণের নিজের গলাতেই 'জয় লঙ্কেশ, জয় লঙ্কেশ' ছিঁড়ে দিচ্ছিল ঘরের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা

মেঘলা বাতাস। মুখের ভেতরের হাওয়ায় দুই ঠোঁটের ওপর ও নিচের অংশটি ফুলিয়ে, দম প্রায় বন্ধ করে বাবিন হনুমানের মেকআপ বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের পদচারণায়, লম্ফে, আস্ফালনে একটু একটু করে লণ্ডভণ্ড হচ্ছিল ঘরটি। যেন বা রাস্তবের লঙ্কাকাণ্ড। বাবিন তার প্লাস্টিকের গদায় রাবণকে আঘাত করতেই ভেতরের পাথর ঝুমঝুম করে বেজে উঠছিল।

এবং তারপর একসময় রাবণের তলোয়ার থেকে বাঁচতে মুহুর্মুহু তীর ছুঁড়ছিল রাম। আর এভাবেই রাবণকে নয়, তার তীক্ষ্ণ তীর হনুমানের বাঁ চোখটিকে তীব্র খোঁচা দিয়ে গেল। রাবণের তলোয়ার ততক্ষণে হনুমানের হাত থেকে গদা খসিয়ে দিয়েছে।

রাবণের বাণে আহত রামকে সেবা শুশ্রূষা করতে দেখা গেছিল লক্ষ্মণকে, টি ভি-র পর্দায়। অথচ বাবিনের বাঁ চোখ দিয়ে উঠে আসা রক্তের ধারাটি দেখে রাম ও রাবণ দুজনেই প্রমাদ গণেছিল। টি ভি পর্দায় হনুমানের বাণ-বিদ্ধ কোনো দৃশ্য তাদের স্মৃতিতে ছিল না। আর বাবিন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে যেতে তার ইষ্টদেবতা রাম-এর নামে জয়ধ্বনি দিতে ভুলে গেছিল। এই যন্ত্রণা-কাতর মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে মা-বাবা, উঃ, মরে গেলাম—ছাড়া অন্য কোনো শব্দ বেরিয়ে আসছিল না। যন্ত্রণায়, ভয়ে, লুটোপুটি খেতে খেতে তৃষ্ণার্ত বাবিন তার হাতের তালুতে রক্তের স্পর্শ পেল। উষ্ণ চটচটে। তার লাল রঙে যেন বা ভয়, ভয়ই শুধু। বাবিন ভাবল সে এবার সত্যিই মরে যাবে। রাবণ ও রাম ততক্ষণে একই সঙ্গে রণক্ষেত্র ত্যাগ করার জন্যে দৌড় লাগিয়েছে।

লিও কোম্পানির বন্দুক-পিস্তল, রাইফেল নেই, র‍্যাম্বো-থ্রির ভি. ডিও ক্যাসেটও ছিল না, তবু এক পৌরাণিক যুদ্ধের আধুনিক মহড়ায় আহত রক্তাক্ত বাবিনকে তুলে ধরতে ধরতে দীপার গলায় যে হাহাকার বেজেছিল, তার সঙ্গে যে কোনো পুরাণ-কথিত যুদ্ধে নিহত পুত্রের জন্যে আর্ত চিৎকারে খান খান হয়ে যাওয়া মাতৃমূর্তির চিত্রকল্পই মেলে শুধু।

দুপুরের ভাত-ঘুম, অটো স্টপ ক্যাসেট প্লেয়ারে থমকে যাওয়া মুকেশ, টি ভি সিরিয়ালের জনপ্রিয় নভেল—সব পেরিয়ে, হঠাৎ সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দীপার নেমে আসা ঘাড় ও হাত-পা লটপটে রক্তাক্ত বিধ্বস্ত বাবিনকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে ধরতে ধরতে তার নিজেকে কোনোভাবেই বীরমাতা মনে হলো না। বরঞ্চ নিদারুণ শীতল কঠিন এক ভয় শিরদাঁড়া বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল হাতে-পায়ে মাথায়। এই বিপন্ন দুপুরে আক্রান্ত বাবিনকে নিয়ে দীপা কি জ্ঞান হারাবে? তার পা টলল, দুলে উঠল মাথা। পৃথিবী এখন কি শুধুই ধোঁয়াময়, ঘোলা! আর যেন তখনই কাঠের কড়ি-বরগার পাশে লেগে থাকা বুড়ো টিকটিকি খিটখিটে গলায় ডেকে উঠল—টিক টিক। টিক টিক।

দায়

রঞ্জন ধর

অনেকক্ষণ ধরে একটা অস্বস্তি বোধ করছে রিনা। অবিশ্যি এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। তবে সব দিন নয়, ভিড়ের বাস-এ মাঝে মাঝে এমনি অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় বৈকি! রিনা একটু আড়চোখে দেখে নেয় লোকটিকে। বয়স মাঝারি, চোখে-মুখে নির্বিকার ভাব, যেন যা ঘটছে তা সে বুঝতেই পারছে না অথবা বুঝলেও তার করার কিছু নেই। ভিড়ের চাপে অমন ঘটেই থাকে। লোকটা বোধহয় জানে না যে, ভিড়ের চাপে কিছু ঘটা আর ইচ্ছা ক'রে ঘটানোর তফাৎটা মেয়েরা বুঝতে পারে। কিন্তু এই নিয়ে আজকাল কিছু বলতে যাওয়া মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ পুরুষকণ্ঠ প্রতিবাদ করে উঠবে, 'অত যদি স্পর্শ-কাতরতা, ট্যাক্সি ক'রে গেলেই পারেন।' সবচেয়ে বেশি গর্জন করবে এই লোকটি, যে অন্তত মনে মনে নিজেকে অপরাধী বলে জানে। রিনার অফিসের বিশাখা একদিন সামান্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে এমনি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। চারদিক থেকে তার ওপর কথার আক্রমণ। শেষটায় বাধ্য হয়ে তাকে গন্তব্যের আগেই বাস থেকে নেমে যেতে হয়েছিল। আগে পুরুষদের মধ্যে অন্তত কিছু সংখ্যক মেয়েদের সমর্থনে কথা বলত, আজকাল বলে না। এর কারণ রিনার জানা নেই। হয়ত চাকরি-করা মেয়েদের সম্পর্কে তাদের মনে ঈর্ষা বা একরকমের বিরূপতা দেখা দিয়ে থাকবে। যেন মেয়েরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তাদের অধিকার কেড়ে নিতে বসেছে।

অফিসের মধ্যেও অনেকের এমনি মানসিকতা। এই তো কয়েকমাস আগে রিনা একটা প্রমোশন পেয়েছে—এল-ডি থেকে ইউ-ডি। অমনি শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন! রিনা নাকি নিজের পারফরমেনসের জন্য নয়, অন্যভাবে অফিসারকে খুশি করার জন্য প্রমোশন পেয়েছে! কী নোংরা চিন্তা! কিন্তু কেউ যদি ও রকম ভাবে, সে আটকাবে কেমন ক'রে? এ তো তার ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচির ব্যাপার। যেমন এই লোকটি! পোশাকে-পরিচ্ছদে যথেষ্ট ভদ্র, হয়ত ভাল চাকরিও করে, অথচ তার মধ্যে যে অমন একটা কুৎসিত মন লুকিয়ে রয়েছে, বাইরে থেকে কিছু বুঝবার কি উপায় আছে? রিনা কিছু বললেও লোকে বিশ্বাস করবে না। তার ভদ্র চেহারা আর পোশাকই তাকে বাঁচিয়ে

দেবে। গড়িয়াহাট থেকে যাদবপুর পর্যন্ত ভিড়ের সুযোগ নিয়ে লোকটা রিনার শরীরের সঙ্গে একরকম লেপ্টে থেকে তার অশালীন মনের পরিচয় রেখে গেল। সামনের সিটে বসা একটি মেয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। সে রিনার সঙ্গে চোখাচোখি হলে একটু মুচকি হাসল, যার মানে, এটুকু মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি আমাদের?

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে রিনা গাঙ্গুলীবাগান স্টপেজে বাস থেকে নামল। লোকটার আচরণ সে ভুলতে পারছে না। এ-সব লোক সমস্ত পুরুষজাতের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দেয়। খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ হাঁটার পর উত্তেজনা থিতিয়ে আসে। রিনা একটা মুদি দোকানের সামনে দাঁড়ায়। কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে কোয়ার্টারের দিকে চলতে শুরু করে আবার।

বাস-রাস্তা থেকে চার-পাঁচ মিনিট হাঁটতে হয়। সরকারি টেনামেণ্ট স্কীমের কোয়ার্টারস। একটা ক'রে ঘর, সঙ্গে স্টোর-কাম-কিচেন আর বাথরুম। পাশাপাশি অনেকগুলি ফ্ল্যাটের সামনে লম্বা বারান্দা। কারুর ফ্ল্যাটে যেতে হলে অন্যের ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দরজা বন্ধ রাখলেও কার ঘরে কি কথা হচ্ছে বাইরে থেকে শোনা যায়। সব সময় সতর্ক থেকে নিচুগলায় কথাবার্তা বলা কি আর সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে? বিশেষ ক'রে পারিবারিক উত্তেজনা বা ঝগড়াঝাটির সময়? এই দিক থেকে রিনার সুবিধা। তার ফ্ল্যাট একেবারে শেষ মাথায়, কাউকে তার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয় না। এ ছাড়া একটা বাড়তি সুবিধাও সে পেয়েছে। যেহেতু তার বারান্দা পর্যন্ত কাউকে আসতে হয় না, তাই সে বারান্দাটাকে টিন দিয়ে ঘিরে একটা চিলতে ঘর করে নিতে পেরেছে। লোকজন এলে ওখানে বসে। অতিথি এলে শোয়ার ব্যবস্থা করা যায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের ছোট্ট সংসার, তাই এভাবেই চলে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে লাইট আর ফ্যানের সুইচ অন্ ক'রে হাতের জিনিসপত্রগুলো আর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে রিনা এসে ফ্যানের তলায় বিছানার ওপর বসে। বাস-এর এক-দেড়ঘণ্টা ধকলের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিলে অন্য কাজে হাত দেওয়ার এনার্জি ফিরে আসে না। চা করা, ঘর গোছানো, রাত্রির রান্না সবই তাকে করতে হবে। ফ্রিজ নেই। সকালের রান্না রাত্রিবেলা পর্যন্ত থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়, তাই রাত্রির রান্না রাত্রেই রাঁধতে হয়। সাহায্য করার কেউ নেই। অর্ণব তো ফিরবে সেই কত রাতে, তার কোন ঠিক নেই। আর আগে ফিরলেই বা কী, সে-কি সাহায্য করবে রিনাকে? সে একজন সোস্যাল

ওয়ার্কার। অফিসে ইউনিয়নের পাণ্ডা, এখানেও রয়েছে তার ক্লাব আর পার্টি, চা-এর দোকানের আড্ডা। এসব ক'রে সংসারের কাজে রিনাকে একটু সাহায্য করার মত তার সময় কোথায়? কিছু বললে অমনি, যেন সে অন্য একটা উঁচু জগতের মানুষ, এমনি মুখভঙ্গি করে বলবে, 'এই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে তুমি আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাও? জান, বাইরে আমার কত কাজ!' রিনা যদি বলে, 'ঘরটা কি আমার একার, এর সব ঝামেলা কি আমি একা সামলাব?' তক্ষুনি সে জবাব দেবে, 'আমি কি করতে পারি বল! বাইরের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সেলফ্-সেণ্টারড হয়ে জীবন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' আর কি বলবে রিনা, তখন রাগে চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? বেশি তর্ক করতে গেলে লাগবে ঝগড়া। এই জিনিসটাকে সে সব সময় এভয়েড্ করে চলতে চায়। রুচিতে বাধে। তাছাড়া যে তার অসুবিধাগুলি বুঝতে চায় না, তাকে সে কেমন ক'রে বোঝাবে?

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রিনা উঠে পড়ে। অফিসের শাড়ি ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধোয়। এক কাপ চা না খেয়ে কাজে হাত লাগানো যাবে না, সে গ্যাসের উনুনে চা-এর জল চাপায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা তৈরি হয়ে যায়, কাপটা হাতে নিয়ে এসে আবার ফ্যানের তলায় বসে রিনা। একবার সারা ঘরে চোখ বুলোয়। সব এলোমেলো হয়ে আছে। সকালে তাড়াহুড়ো করে সব কাজ সেরে আর ঘর গুছিয়ে রেখে যাবার মত সময় থাকে না। অর্ণবের একটু দেরিতে ঘুম ভাঙে, তবু দয়া করে যে বাজারটা করে দেয়, এই যথেষ্ট। বাজার এলে সাত-তাড়াতাড়ি ক'রে মাছ-তরকারি কোটা, রান্না করা, তারপর চান-খাওয়া সেরে অফিসের জন্য তৈরি হয়ে বাস ধরতে ছুটতে হয়। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেবার জো নেই, তা হলেই লেট। না, রিনা অন্যদের মত লেট করে অফিসে যায় না। এই ব্যাপারে তার সুনাম আছে। কাজের ব্যাপারেও আছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিস্টার ঘোষ তার প্রশংসা করেন এবং তার এ-সি-আরও ভাল লেখেন। এই জন্যই তার এত তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাওয়া সম্ভব হয়েছে, অথচ এই সহজ সত্যটাকে অস্বীকার ক'রে কলীগ্‌দের কেউ কেউ অন্য রকম রটিয়েছে। আসলে ঈর্ষা! এমন কি অর্ণবও এর বাইরে নয়। নিজে তো বারোবছর ধরে এল-ডি হয়ে পড়ে রয়েছে। থাকবেই বা না কেন! রোজ লেট, যখন খুশি অফিসে গিয়ে হাজিরা দেওয়া। ওর অফিসার কিছু বলে না কেবল ইউনিয়নের পাণ্ডা, এই ভয়ে। সারা দিনে একঘণ্টাও সিটে থাকে কিনা সন্দেহ। নিজেই গর্ব ক'রে বলে, 'আমাকে কে

বলবে! অতখানি বুকের পাটাঅলা অফিসার জন্মেছে নাকি?' জন্মেছে কিনা টের পাওয়া যায় বারোবছর এক গ্রেডে পড়ে থাকা দেখে। মুখে কিছু বলার দরকার কি, যদি এ-সি-আর-এ বছরের শেষে কলমের খোঁচায় প্রমোশনের বারোটা বাজিয়ে দেওয়া যায়। আলাদা অফিস হলে কি হবে, রিনা সব খবর রাখে। অর্ণবের অফিসে কাজ করে তার এক বন্ধু, ওর কাছ থেকে সব জানতে পারে সে। তাছাড়া রাগের মাথায় অর্ণবও মাঝে-মাঝে বলে, 'শালা ব্যানার্জিটা আমাকে প্রত্যেক বছর খারাপ রিপোর্ট দেয়।' রিনা সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিল, 'লেট ক'রে যাওয়া বন্ধ ক'রে অফিসের কাজকর্ম কিছু কিছু কর, নইলে কীসের ভিত্তিতে তোমার ভাল রিপোর্ট যাবে?' শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিল অর্ণব। চিৎকার ক'রে বলেছিল, 'সব বাজে কথা। যারা অফিসারের পায়ে তেল মাখায়, তাদের জন্যই শুধু ভাল রিপোর্ট যায়।' শুনে ভীষণ বিরক্তি লাগে রিনার। অর্ণব মাঝে মাঝে এমনি স্থূল ভাষায় কথা বলে। রিনা প্রতিবাদ ক'রে বলে, 'হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। তোমার কি ধারণা, আমি ওভাবে প্রমোশন পেয়েছি?' একটু চুপ ক'রে থেকে সে বোধহয় ভেবে নেয়, পরে বলে, 'কেমন করে বলব? তোমার ব্যাপার তুমিই জান।' হাসতে চেষ্টা করে, তবে সেই হাসিটা যেন প্রাণ থেকে আসেনি। অন্তত রিনার তাই মনে হয়েছিল। অর্ণব আরও বলেছিল, 'আমি কোন শালাকে খুশি ক'রে প্রমোশন চাই না। আমার একটা আদর্শ আছে। প্রমোশন আটকে রেখে আমাকে ওরা দমাতে পারবে না।' তা ঠিক। অফিসে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ও খুব পপুলার। যে কোন সংগ্রামে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাছাড়া খুব মনখোলা। মনের কথা চেপে রাখতে পারে না, কেউ খুশি হবে না জেনেও সোজা মুখের ওপর বলে দেয়। কিছু আটকায় না। সেদিন রিনা তাকে প্রমোশনের খবরটা দিল, সেদিন একটু অবাক হয়ে সে মন্তব্য করল, 'এত অল্পদিনের মধ্যে আপগ্রেডিং! খুব অস্বাভাবিক। কীসের বিনিময়ে তোমার অফিসারের মন জয় করলে!' শুনে ভীষণ রাগ হয়েছিল রিনার, তবু তার ইঙ্গিতটাকে গায়ে না মেখে সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, 'কাজের বিনিময়ে। আমি তোমার মত ফাঁকি দিই না, জানতো! লেট করে অফিসে যাওয়ার অভ্যাসও নেই।' এ-ও রিনা লক্ষ্য করেছে, তার প্রমোশনের পর থেকে অর্ণবের মধ্যে যেন এক রকমের কমপ্লেক্স দেখা দিয়েছে। পুরুষ হিসেবে তার সভিনিস্টিক মর্যাদায় ঘা লেগেছে বলে কি সে মনে করে? কিন্তু তা তো তার তার মনে করার কথা নয়। সে যে নারী-পুরুষের সমান

মর্যাদার আদর্শে বিশ্বাসী। বোধহয় বিশ্বাস আর তার বাস্তবায়ন এক নয়, নইলে আজকাল পারিবারিক বিষয়ে কিম্বা যে কোন বিষয়ে রিনা একটুখানি দৃঢ়ভাবে তার মত ব্যক্ত করতে গেলেই অর্ণব হঠাৎ রেগে যায়, আপাতদৃষ্টিতে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু রিনা সেটা অনুভব করতে পারে, তাই কথা বলার সময় তাকে সচেতন থাকতে হয় আজকাল।

চা খাওয়া হয়ে গেলে রিনা উঠতে যাবে, তখন ঘরে ঢোকে পাশের ফ্ল্যাটের সুনন্দা। তার হাতে একটা খাম।

'রিনা, তোমার চিঠি।'

সুনন্দার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে রিনা বলে, 'তোমার খবর কি সুনন্দাদি?'

'আমার আবার খবর থাকে নাকি?', হেসে সুনন্দা বলে, 'আমি তো খাঁচায় বন্দী! ঘরে থাকি, রান্না করি, স্বামী আর ছেলে-মেয়ের মন জুগিয়ে চলি।'

আরও কিছুক্ষণ ঘরোয়া বিষয়ে কথাবার্তার পর সুনন্দা চলে গেলে রিনা খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে। মা-এর চিঠি। পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রিনা। পড়া শেষ হলে বসে থাকে কিছুক্ষণ। নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল তার সামনে।

বর্ধমানের বৈঁচী গ্রামে তাদের বাড়ি। বাবার মৃত্যুর পর দাদাই সংসারের কর্তা। সত্যি কথা, তার আয় খুব বেশি নয়—বৌদি আর তার তিন ছেলে-মেয়ে, এর ওপর মা, ছোট ভাই রণু, এই নিয়ে সংসার। রণু এবার স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। দাদা বলে দিয়েছে, আর তাকে পড়াতে পারবে না, এবার নিজের ব্যবস্থা সে নিজে করুক। রণুর ইচ্ছা, আরো পড়বে। এই নিয়ে অশান্তি চলছে, রণু কান্নাকাটি করছে। তাই নিরুপায় হয়ে মা রিনাকে লিখেছে রণুর পড়াশুনার দায়িত্ব নিতে।

রিনা নিজের কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মনে মনে একটা প্ল্যান করে। বারান্দার চিলতে ঘরটায় ঢুকে চোখ বুলিয়ে জরিপ করে। পাঁচ ফুট বাই চৌদ্দ ফুট ঘর। দু'দিকে দু'টো জানালা। আলো-হাওয়ার অভাব হবে না। দরকার হলে একধারে একটা টেবিলফ্যান বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। একটা চৌকি পাতা আছে, ছোট একটা টেবিলও ধরবে পড়াশুনার জন্য। বইপত্র রাখার জন্য একটা ছোটখাটো র‍্যাক ধরাতেও অসুবিধা হবে না। অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে রিনা। এখন শুধু অর্ণবের মত নিতে হবে।
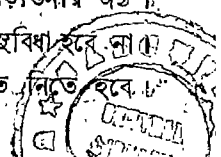
রিনার মনে হয় না, তার দিক থেকে কোন আপত্তি উঠবে। সে যদি রাজী হয়, রিনা কালই চিঠি লিখে দেবে মাকে। দাদা নাই বা তার দায়িত্ব নিল, এর জন্য রণুর পড়া বন্ধ থাকবে? একটা তো মাত্র ছোট ভাই, ছোটবেলা থেকেই সে তার একান্ত আদরের, তার জন্য কি এটুকুও করতে পারবে না রিনা? তাহলে আর স্নেহ-ভালবাসার কি মূল্য রইল!

রিনা আর সময় নষ্ট না ক'রে রান্নার কাজে হাত লাগায়। ছুটির দিন ছাড়া তাদের সারা সপ্তাহের খাওয়া-দাওয়া খুব সাদাসিধে। সময় কোথায় পাঁচ রকম রান্না করার! বেশির ভাগ দিন ডালের সঙ্গে একটা ভাজা বা আলুসেদ্ধ আর ডিমের ঝোল। এরকম বিষয়ে অর্ণবের কোন বিশেষ ধরনের আব্দার নেই। একটা কিছু হলেই হ'ল।

রান্না প্রায় শেষ, তখনও গ্যাস নেভানো হয় নি—অর্ণব ঘরে ঢোকে। তাকে দেখে রিনা বলে, 'চা করব, নাকি আড্ডা থেকে খেয়ে এসেছ?'

'সে তো অনেকবার খেয়েছি—তা বলে কি আর খেতে নেই?' জামা খুলতে খুলতে জবাব দেয় অর্ণব।

রিনা কেৎলিতে ক'রে দু'কাপ চা-এর জল চড়ায়। অর্ণব জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে চান করতে ঢোকে। যত রাত্রিই হোক, ফিরে এসে তার বারো মাস চান করা চাই। চান সেরে বেরিয়ে এসে সে টেবিলের ওপর খোলা চিঠিটা দেখতে পায়। 'কার চিঠি?' জিজ্ঞেস করে।

রান্নাঘরে কাপে চা ঢালতে ঢালতে জবাব দেয় রিনা—'মা-এর চিঠি। পড়ে দেখ, অনেক দরকারি কথা লিখেছে।'

চিঠিটা হাতে তুলে নেয় অর্ণব। পড়তে পড়তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। পড়া শেষ হ'লে তেমনি চাপা দিয়ে রেখে দেয়। কোন মন্তব্য করে না।

'পড়েছ?'

দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে রিনা। একটা কাপ অর্ণবের সামনে টেবিলের ওপর রেখে আর একটা কাপ নিয়ে সে একটু দূরে গিয়ে বসে। নিজে থেকে তার মত জানতে একটু সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় না তাকে বেশিক্ষণ।

'এ হ'তে পারে না।' অর্ণব বলে।

'কেন?' মৃদুস্বরে জানতে চায় রিনা। হাতে চা-এর কাপটা ধরাই থাকে, চুমুক দিতে ভুলে যায়। একই অবস্থা অর্ণবেরও।

'একটা ঘর, জিনিশপত্রে ঠাসা—এর ওপর আর একজন এলে কী অবস্থা দাঁড়াবে, বুঝতে পারছ না?' শান্তভাবেই বুঝতে চেষ্টা করে অর্ণব, 'তোমার ওপরও দারুণ চাপ পড়বে, সামলাতে পারবে না। তাছাড়া এখন রান্নার লোক রাখা সম্ভব নয়। অনেক খরচ।'

'লোক রাখব কেন, আমি নিজেই পারব।' জবাব দেয় রীনা।

'তা না হয় পারলে, কিন্তু থাকার ব্যবস্থা?'

'সে-ও ভেবে রেখেছি। বারান্দার ঘরটায় ও থাকতে পারবে।'

'তবু এর অনেক ঝামেলা। দু'জনে বেশ আছি, এর ওপর কোন উটকো ঝামেলা আমার পছন্দ নয়।'

'উটকো বলছ কেন?' মনের ক্ষোভটা চেপে রেখে রিনা শান্তকণ্ঠে বলে, 'অন্য কোন উপায় থাকলে মা কি এ-প্রস্তাব দিত? মা-এর অবস্থাটা ভেবে দেখ।'

'ভেবেছি।' অর্ণবের বিরক্তি চাপা থাকে না, 'নিজের বড় ছেলের ঘাড়ে সে দায় চাপাতে পারেন নি, সেটা আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।'

রিনা অর্ণবের চোখে দৃষ্টি রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, অনেকগুলি প্রশ্ন তার জিভের ডগায় এসে যায়, কিন্তু সেগুলিকে চেপে রেখে সে শুধু বলে, 'মা হয়ত আমাদের আপন ভেবেই প্রস্তাবটা দিয়েছে, যাই হোক, আমি তাঁকে জানিয়ে দেব, রণুর এখানে থাকার অসুবিধা রয়েছে।'

অর্ণব কিছু বলে না। রণুর এখানে আসার ব্যাপারে তার যে মত নেই, সেটা খুবই স্পষ্ট। এ অবস্থায় নিজের ভাই-এর জন্য আর কিছু বলতে রিনার আত্মমর্যাদায় বাধে। নিঃশব্দে চা খেয়ে কাপটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সে। হঠাৎ স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে একটা অস্বস্তির পরিবেশ গড়ে ওঠে। অন্যদিন এসময় নানা রকম কথা হয় তাদের মধ্যে, আজ কেউ কথা বলছে না। রিনা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত, আর অর্ণব পত্রিকা টেনে নেয় মুখের ওপর।

খাওয়ার পাটও চুকে যায় নিঃশব্দে। প্রয়োজনীয় দু'একটার বেশি কথা হয় না। একবার শুধু রিনা বলেছিল, 'মা-এর চিঠি পড়ে তুমি খুব রেগে গেছ, মনে হচ্ছে।'

'রাগব কেন?' অর্ণবের গম্ভীর জবাব।

'সেটা তুমিই ভাল জান।'

'তোমার মা-এর ওপর রাগ নয়, তোমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়েছি।'

'কেন ?'

'তুমি জান, একটা জমি কেনার কথা চলছে। তারপর, বাড়ি করার কথাও ভাবতে হবে। এসব জেনেও এতবড় একটা খরচের বোঝা ঘাড়ের ওপর নিতে চাইছিলে, এতে কি প্রমাণ হয় না তোমার কতটা কাণ্ডজ্ঞান ?'

রিনা আর কথা বাড়ায় না। চুপ ক'রে থাকে।

তবু ব্যাপারটা কি মিটে যায় ? না, অন্তত রিনার দিক থেকে নয়।

একই বিছানায় শুয়েছে তারা রোজকার মত। কিন্তু দু'জনের মাঝখানে থেকে গেছে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, অন্যদিনের তুলনায়। তেমনি ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে দু'টি মনের মাঝখানেও, এই ঘণ্টা তিনেক সময়ের মধ্যে। রিনা চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারছে না। একটা বিশ্বাসে ঘা খাওয়ার ব্যথায় টনটন করছে মনের ভিতর।

'তুমি কি ঘুমিয়েছে ?' জিগ্যেস করে রিনা।

'না।'

'বিয়ের পর চার-পাঁচ বছর তোমাদের জয়েণ্ট ফ্যামিলিতে আমি থেকেছি।'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে ?'

'আমার রোজগারের সব টাকা তোমাদের ফ্যামিলি-ফাণ্ডে দিয়েছি। তোমার বোনের বিয়ের সময় তাকে কিছু গয়না দেবার দায়িত্ব পড়েছিল তোমার ওপর। তখন তোমার নিজস্ব কোন ফাণ্ড ছিল না, আমাকেও কিছু জমাতে দাও নি। বাধ্য হয়ে তোমার মর্যাদার খাতিরে আমার তিন-সেট গয়না তোমার বোনকে দিতে হয়।'

'কি বলতে চাও তুমি ?' উত্তেজিতভাবে অর্ণব বিছানায় উঠে বসে।

ঘরে অন্ধকার, তারা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। একটা খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের একটুখানি আলো ঢুকে অর্ণবের চেহারাটাকে কেমন ভৌতিক ক'রে তুলেছে। রিনা তার দিকে না তাকিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'আমিই এতদিন বুঝতে পারি নি। আসলে তোমার কাছে তোমার-নিজের চাওয়া-পাওয়াটাই প্রধান, যেমন আর সব পুরুষদের থাকে।'

'রাবিশ ?'

'রাবিশ নয়, এটাই বাস্তব। আজ তোমার ভাই এসে এখানে থাকতে চাইলে, তুমি কি আমার মতামত গ্রাহ্য করতে ?'

'বাজে বকো না। এখন ঘুমোতে দাও।'

অর্ণব শুয়ে পড়ে। রিনাও আর কোন মন্তব্য করে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া বা মতবিরোধ তো হয়েই থাকে। একদিন বা দু'দিন বাদে সব মিটে যায়। অর্ণবও কয়েকদিনের মধ্যে ভুলে গেল সব। তার নিজের কাজের জগৎ নিয়ে মেতে রইল। রিনার আচরণেও অস্বাভাবিতার কোন লক্ষণ নেই। সকালবেলার কাজকর্ম সেরে অফিসে যায়, ফিরে এসে আবার নিয়মমাফিক সব কিছু করে। রোজকার মত রাত ক'রে অর্ণব ফিরে এলে তার জন্য চা বানায়, নিজেও খায়। কথাবার্তাও চলে এটা-ওটা নিয়ে।

'আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে কি?'

রিনার প্রশ্নে একটু অবাক হয় অর্ণব। হঠাৎ আজ সে ছুটি নিয়েছে, আবার তাকেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলছে। ব্যাপার কি? আজ তো তাদের বিবাহবার্ষিকী নয়, জন্মদিনও নয় দু'জনের কারুর। বোধহয় সন্ধ্যার শো'তে সিনেমা দেখতে যাবার ইচ্ছা।

'এই মুশকিল করেছ!' অর্ণব জবাব দেয়, 'আজ যে ছুটির পর ইউনিয়নের মিটিং রয়েছে। মিটিং শেষ না ক'রে আসা যাবে না।'

'ঠিক আছে।'

'তবু ভাল', রিনা আর পীড়াপীড়ি করে না।

রাত ন'টা নাগাদ অর্ণব বাড়ি ফিরে দেখে, দরজায় তালা। তার সঙ্গে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। অতএব ঘর খুলতে অসুবিধা নেই। রিনা তাহ'লে একাই সিনেমায় গেছে, ভাবে অর্ণব। কিন্তু সেটাও খুব অস্বাভাবিক। সে তাকে বাদ দিয়ে কখনও একা সিনেমায় গেছে বলে তো তার মনে পড়ে না!

তালা খুলে ঘরে ঢুকে অর্ণব সুইচ টিপে আলো জ্বালে।

কয়েক মুহূর্ত আগেও সে ভাবতে পারেনি, তার জন্য এতবড় একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে! যে-দু'তিনটা বড় স্যুটকেসে রিনার কাপড়-জামা থাকে, তার একটাও ঘরে নেই। নেই আরও কিছু জিনিস, যা তার নিজস্ব। বিছানার ওপর একটা খোলা চিঠি। যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গিয়ে অর্ণব চিঠিটা হাতে তুলে নেয়।

প্রিয় অর্ণব,

আমি আলাদা বাড়িতে উঠে যাচ্ছি, রন্টু আমার সঙ্গে থাকবে। কম ভাড়ার বাড়ি, আশা করছি, কোনরকমে ভাই-বোনের চলে যাবে। যাবার

সময় তুমি সামনে না থাকায় একদিক থেকে ভাল হয়েছে, একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া এড়ান গেল।

একটা কথা তোমার জানা দরকার। আমি মনে করি না, বিয়ে হলেই একজন মেয়ের কাছে তার বাবা-মা-এর সংসারের প্রতি দায়-দায়িত্ব বা কর্তব্য ফুরিয়ে যায়। কর্তব্যবোধে যা তুমি করতে পেরেছ এবং আমার দিক থেকে বাধা দেওয়া হয় নি, আমাকে সেই কর্তব্যপালনে তুমি বাধা দিলে—এই দুঃখ ও অপমান আমার মনে গাঁথা হয়ে রইল। অথচ তোমার কাছে অনেক বেশি উদারতা আমি প্রত্যাশা ক'রে এসেছি। আমার ধারণা ছিল, তুমি হবে পুরুষপ্রাধান্যবাদী সমাজে এক ব্যতিক্রম, অথচ আজ নিজের জীবনে বিশ্বাসকে প্রয়োগ করতে গিয়ে তুমি হয়ে গেলে নিদারুণভাবে ব্যর্থ। এ শুধু আমার দুঃখ নয়, লজ্জাও। ইতি—

রিনা।

একটি মোকদ্দমার সত্যাসত্য

অমর মিত্র

কলিকাতা নগরস্থিত ১নং বিচারপতির আদালতে গত ২৩শে আগস্ট, ১৯৮৪ তারিখে আহিরিটোলা নিবাসিনী শ্রীমতী অনীতা পাল চৌধুরী স্বাঃ মহীতোষ পাল চৌধুরী, কর্তৃক রুজু ফৌজদারি মামলার রায় নিম্নে বর্ণিত হইল।

মোকদ্দমার নং···তাং ২৩।৮।৮৪

এই মোকদ্দমা চলাকালীন এই আদালতের বিচারপতি আনন্দময় পাল হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং স্বেচ্ছায় তাঁহার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, পরবর্তীকালে মোকদ্দমা হস্তান্তরিত হয় বিচারপতি সুহাস মজুমদারের এজলাসে, কিন্তু তিনি সরকারি চিঠি অনুসারে বদলি হন পার্শ্ববর্তী জিলা সদর আদালতে। অতঃপর এই মোকদ্দমার নথিপত্রাদি যায় বিচারপতি নবনীধর মণ্ডলের নিকট, কিন্তু তিনি নথিপত্র বিচার করিতে করিতে অবসর গ্রহণ করিলে, মোকদ্দামার ভার নিম্ন-স্বাক্ষরকারী বিচারপতি গ্রহণ করেন। চতুর্থ বিচারপতি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী শ্রীশশিভূষণ পোদ্দার, বাদী বিবাদীর যাবতীয় নথিপত্র, সাক্ষীসাবুদ, প্রমাণাদি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন।

মোকদ্দমার বিবরণ।

(ক) অভিযোগ সমূহ।

অভিযোগকারিণী শ্রীমতী অনীতা পাল চৌধুরীর বিবৃতি অনুসারে যাহা যাহা জানা যায়—

(১) অনীতা পাল চৌধুরীর পিতৃগৃহ বর্ধমান জিলার অন্তর্গত সলসীথান ভুক্ত চন্দনপুর গ্রামে। পিতা অবিনাশ নন্দী সম্পন্ন 'চাষি', স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। প্রকাশ থাকে যে 'চাষি' অর্থে অভিযোগ কারিণীর পিতা শ্রীঅবিনাশ নন্দী মহাশয় স্বহস্তে চাষ করেন না, অন্যের দ্বারা তাঁহার প্রভূত ভূসম্পত্তি কর্ষণ করাইয়া থাকেন। যেহেতু চাষ অর্থাৎ কৃষিকর্মই তাঁহার সম্পন্ন হইবার মূল কারণ সে কারণে তিনি 'চাষি' এই বিশেষণে কোন আপত্তি ত্যাখেন না। ইহা তাঁহার মহত্ত্ব।

প্রকাশ থাকে অনীতা নন্দী বিবাহের পর মহীতোষ পাল চৌধুরীর পদবী অনুসারে অনীতা পাল চৌধুরী হইয়াছেন।

অভিযোগকারিণীর বিবৃতি অনুসারে ইহা জানা যায় যে শ্রীমহীতোষ পালচৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ-পূর্ব পরিচয় ছিল। তাঁহাদের প্রথম পরিচয় ঘটে গত ১৯৭৭ সনের প্রথম মাসে, কলিতাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী থাকা-কালীন। উভয়েই সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী। পরিচয় প্রগাঢ় হইবার পর তাঁহারা পরস্পরে রেজিস্ট্রি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন গত ১৯৭৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় তারিখে। অতঃপর সামাজিক অনুষ্ঠানাদি হয় একবৎসর আড়াইমাস অতিক্রান্ত হইবার পর ১৯৮০ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম তারিখে। সামাজিক অনুষ্ঠান, হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি দ্বারা স্বামী স্ত্রীরূপে পরিচিত হওয়া ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন উপায় ছিল না কেন না অভিযোগকারিণীর পিতা শ্রীঅবিনাশ নন্দী একজন সম্পন্ন ও মানী মানুষ, তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যা সন্তানের বিবাহ অনাড়ম্বর ভাবে হউক ইহা কোন ক্রমেই মানিয়া লইতে রাজি ছিলেন না। এক্ষেত্রে অভিযোগকারিণী শ্রীমতী অনীতা পালচৌধুরী (তৎকালীন নন্দী) প্রধান কর্তব্য ছিল একমাত্র কন্যা হিসারে তাঁহার পিতার মান ও সম্মান রক্ষা করা। প্রকাশ থাকে যে তাঁহাদের এ বিবাহে শ্রীঅবিনাশ নন্দী সহ তাঁহার যাবতীয় আত্মীয় পরিজন অসুখী হইয়াছিলেন। আরো প্রকাশ থাকে যে এইরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরীর দৃঢ় আপত্তি ছিল।

বাদী শ্রীমতী অনীতা পালচৌধুরী জানান যে বিবাহের পূর্বে তিনি তাঁহার সহপাঠী মহীতোষ পালচৌধুরীর সত্যকার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, যদিও তাঁহাদের অন্তরঙ্গতা দীর্ঘদিনের ছিল, তথাপি সেই অন্তরঙ্গতাকে তিনি 'প্রণয়' বলিয়া চিহ্নিত করিতে চাহেন না। তিনি এও বলেন যে তিনি আশা করিয়াছিলেন বিবাহের পরে সুখী হইবেন, প্রণয়ের আলোয়-উজ্জ্বল হইবেন, সেই আশা গোধূলির আলোর মত ক্রমশ ম্রিয়মান এবং নিষ্প্রাণ হইতেছে। বিবাহের পরে তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন মহীতোষ গভীর আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর, লোভী এবং অন্যনারীতে আসক্ত। তিনি এখন তেত্রিশ বছরের গৃহবধূ, সংসারের সাধ আহ্লাদ সমস্ত ব্যর্থ হওয়ায়, এই সামান্য বয়সেই গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হইয়াছেন। রাতের পর রাত, অন্ধকার ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দিন যায়, দিনভর কথা না কহিয়া ম্লান মুখে দেয়ালের পুরানো ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টাইয়া আগামী মাস গুলির বার তারিখ হিসাব করিয়া,

বিগত মাসগুলির ছুটির দিনগুলিকে স্মরণ করিয়া যন্ত্রণা দগ্ধ হন। তিনি এই জীবন হইতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন।

আরো অভিযোগ নিম্নে বর্ণিত হইল।

(২) তাঁহার পিতা প্রভূত সম্পত্তিব অধিকারী ধনী এবং মানী কৃষক। বর্ধমান জেলা দামোদর নদীর উপরে নির্মিত ব্যারেজের কল্যাণে এখন লক্ষ্মীর কৃপাধন্য। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বর্ধমান জেলার মাটি হরিৎক্ষেত্র হইয়া থাকে। এ জেলায় এখন ভূসম্পত্তির অধিকারী পরিবারে পুত্রকন্যার বিবাহে বহু টাকার লেনদেন হইয়া থাকে। ইহাই রীতি। ভূমি হইতে উপার্জিত অর্থ এই মত সদ্ব্যয় করিতে কেহ অরাজী হন না। অভিযোগকারিণীর পিতা তাঁহাকে সুপাত্রস্থ করিবার নিমিত্ত একলাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এ সংবাদ তিনি বিবাহের পুর্বে তাঁহার সহপাঠী মহীতোষ পাল চৌধুরীর নিকট কথার ছলে বলিয়াছিলেন।

মহীতোষ হিন্দু বিবাহরীতিতে তীব্র অনীহা প্রকাশ করিয়াছিল ঐ পরিমাণ মুদ্রা যৌতুক হিসাবে না পাওয়ায়। মহীতোষ পালচৌধুরী একটি ব্যাঙ্কের সামান্য করণিক। তাহার পরিবর্তে কোন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, প্রযুক্তিবিদ অথবা চিকিৎসক যদি অবিনাশ নন্দীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিত তো তিনি যৌতুকের মুদ্রা তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া উল্লসিত হইতেন। বাদীর পিতা অবিনাশ নন্দীর অভিলাষ ছিল মহকুমা অথবা জেলাশাসক জামাতার কেন না প্রশাসনের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্কে বাঁধা পড়িতে সকলেই ইচ্ছা করেন।

(৩) উপরোক্ত পণের টাকার জন্য মহীতোষ প্রায়শ তাঁহার স্ত্রী, অভিযোগকারিণীর উপরে চাপ দিতেন, এর ফলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে সূক্ষ্ম চিড় ধরে। তিনি তাঁহার পিতাকে এবিষয়ে অবহিত করায় পিতা রাজি হন নাই। কেন না পণ দিবার রীতি বিবাহ বাসরে, তাহার বহুদিন পরে নহে। জামাতার মুখ দর্শন করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ স্বরূপ ঐ পরিমাণ মুদ্রা যদি তিনি অর্থে এবং জিনিসপত্রে প্রদান করিতে পারিতেন তবে আত্মীয় পরিজনের নিকট তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইত। সামান্য ব্যাঙ্ক করণিকের পক্ষে অত আশা করা ঠিক নহে।

(৪) উপরোক্ত কারণে বাদী এবং বিবাদীর ভিতরের ভালবাসা ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। এবং বাদী একথাও বলিতেছেন যে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে কখনোই ভালবাসিতেন না। এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

বিগত ১৯৮২ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে অভিযুক্ত মহীতোষ পালচৌধুরী তাঁহার স্ত্রী অনীতা পালচৌধুরীকে অগ্নিদগ্ধ করিবার চেষ্টা করে। অর্ধদগ্ধা অনীতা সে-বার হাসপাতালে নীত হইয়া কোনক্রমে রক্ষা পান। প্রকাশ থাকে যে ঐ দিন অনীতার পরিধানে একটি কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্র ছিল এবং ইহার ফলে অভিযুক্ত বাড়তি সুবিধা পাইয়াছিলেন। ঐদিন সকাল হইতে মহীতোষ তাঁহার স্ত্রীর উপরে সামান্য কারণে বিরক্ত হইতেছিলেন, স্ত্রীর বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করিবার পূর্বে উভয়ের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ, বচসা ইত্যাদি হয়। বচসার কারণ, মহীতোষ শ্রীমতী ইলা সেন নামক অন্য এক নারীতে আসক্ত। ইলা সেনের একটি পত্র উক্ত ঘটনার পূর্বদিবসে বাদী অনীতা পালচৌধুরীর হস্তগত হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৫) বিগত ১৯৮২ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম তারিখে, তাঁহাদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর দিনে সামান্য ত্রুটিতে মহীতোষ তাঁহার স্ত্রীকে অপমান করেন বাড়ির ঠিকা কাজের লোকের উপস্থিতিতে। এ সম্পর্কে প্রতিবাদ করায় বাদী শ্রীমতী অনীতা পালচৌধুরী তাঁহার স্বামীর দ্বারা প্রহৃত হন। ইহার পর তাঁহার স্বামী অফিসের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁহাদের দ্বিতীয় বিবাহ-বার্ষিকী নিরানন্দময় হইয়াছিল।

(৬) মহীতোষ মদ্যপানে আসক্ত এবং তাঁহার স্ত্রীকে নিরত ঐ ব্যাপারে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে বাদী সর্বদাই আপত্তি জানান ফলত গৃহে অশান্তি প্রবল হইয়া থাকে। প্রথম বাদানুবাদ হইয়াছিল ৭ ২ ৮১ তারিখে। অর্থাৎ বিবাহের দুই মাসের মধ্যে, কলিকাতার একটি বিখ্যাত রেঁস্তোরায়।

মহীতোষের মদ্যপানের অভ্যাস বহুদিনের।

(৭) মহীতোষের বিধবা মা অন্য এক জেলা শহরে তাঁহার অন্য পুত্রের নিকটে বাস করেন। তিনি কখনো সখনো মহীতোষের নিকটে আসেন। তিনি তাঁহার পুত্রবধূ প্রাপ্তিতে সুখী হন নাই একথা প্রায়শ বলিয়া থাকেন। এবং পণের কথা বলিয়া তাহাকে অপমান করিতে চেষ্টা করেন। ব্যাঙ্কে সুচাকুরিয়া পুত্রের বিবাহে তিনি ঠকিয়া গিয়াছেন, কন্যার বিবাহে যত খরচ হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ যদি পাইতেন তো এ বিবাহের অর্থ বুঝিতে পারিতেন।

বিগত ১৯৮২ সনের জুন মাসের বিশ তারিখে মহীতোষের উপস্থিতিতেই তাঁহার মা পুত্রবধূকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করেন, অপরাধ আহারের সময়

ভাতের অকুলান হইয়াছিল। পুত্রবধূ শেষ পর্যন্ত নিজে অনাহারি থাকিয়া শাশুড়ি মাতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

এব্যাপারে তাঁহার স্বামী মহীতোষ কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

(৮) গত ৬।৮।৮৪ তারিখে মহীতোষ তাঁহাকে প্রহার করিয়া বলেন পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে। তিনি শেষ পর্যন্ত তাহাই করিতে বাধ্য হন যদিও স্বামীগৃহ ত্যাগ করিতে কখনোই ইচ্ছা করেন নাই। এখন বর্ধমানে তাঁহার পিতার আশ্রয়ে আছেন।

(৯) বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী বাদী অনীতা পালচৌধুরীকে প্রায়শ নির্যাতন করিয়া থাকেন। নিম্নে কতগুলি তারিখের উল্লেখ করা হইল।

তাং ৫ ৬ ৮২—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়।

তাং ৭ ৮ ৮২—সকাল ৬ ঘটিকা ৩৫ মিনিট সময়ে।

তাং ৩.২.৮৩—সকাল ৮ ঘটিকায়।

তাং ৩ ৫.৮৩—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা ৪০ মিনিট সময়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।

নির্যাতনের শেষ তারিখ—৬ ৮ ৮৪ সকাল ৯ ঘটিকায়।

নির্যাতন অর্থে দৈহিক ও মানসিক। দৈহিক নির্যাতন অর্থে প্রহার। মানসিক নির্যাতনের পদ্ধতি বহুপ্রকার, যেমন অপমান, অসম্মান, বচসা, অশ্লীল বিশেষণে ভূষিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে বাক্যালাপ বন্ধ থাকিলে বরং বাদী অনীতা পালচৌধুরী সুখী হইতেন, যদিও ইহাও মানসিক নির্যাতনের বহুপ্রকার পদ্ধতির অন্যতম একটি।

অভিযোগকারিণীর আবেদন, তিনি অবলা গৃহবধূ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুমারী অবস্থায় উচ্চশিক্ষার্থে আসিয়াছিলেন। নিজে প্রণয়াসক্ত হন নাই কিন্তু বিবাদী মহীতোষপাল চৌধুরী প্রায় জোর করিয়া তাঁহাকে প্রণয়ে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি বিবাদীর মিথ্যা প্রণয় সম্ভাষণে ভবিষ্যত বিস্মৃত হইয়া রেজিস্ট্রি বিবাহে রাজি হইয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে এ বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ ইচ্ছার মূল্য বিবাদী দেন নাই। অকস্মাৎ প্রণয় আলিঙ্গন চুম্বনে তাঁহার সহপাঠী তাঁহাকে বিবশ করিয়া ছলনার জাল পাতিয়াছিল, তিনি অসহায় হরিণীর মত তাহাতে ধরা পড়িয়াছিলেন।

অভিযোগ যে, অভিযোগকারিণীর পিতা বর্ধমান জেলার সম্পন্ন অর্থবান ভূস্বামী, চাষি এবং তিনি যেহেতু এ বিবাহে রাজি হইতেন না সেহেতু

রেজিস্ট্রি করিয়া বিবাদী মহীতোষ পাল চৌধুরী নিষ্কণ্টক হইতে চাহিয়াছিলেন।

অভিযোগকারিণী বলেন যে তিনি অসহায়া তরুণী গৃহবধু, স্বামীর অত্যাচারে সুবিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছেন। স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার প্রাণ সংশয়, ইতিপূর্বে তাঁহার স্বামী সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন যে তাহাও মহামান্য আদালতের অজানা নয়, পূর্বের পরিচ্ছেদেই ব্যক্ত। সুতরাং তিনি···ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীমতী অনীতা পাল চৌধুরী সর্বশেষে ইহা বলেন যে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ চান।

(খ) অভিযুক্ত বিবাদী শ্রীমহীতোষ পাল চৌধুরী পিং হরেকৃষ্ণ পাল চৌধুরী, নিবাস আহিরিটোলা-র জবাবী বিবৃতি অনুসারে যাহা যাহা জানা যায়।

অভিযুক্ত শ্রী মহীতোষ পাল চৌধুরী স্বীকার করেন যে অভিযোগকারিণী তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী। রেজিস্ট্রি বিবাহ এবং তৎপরে হিন্দু লোকাচার অনুযায়ী বিবাহ করিয়া তিনি অভিযোগকারিণীর স্বামীর অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন ইহা যেমন সত্য, তেমনই সত্য এই অধিকার অর্জন পারস্পরিক, এবং ইহাতে উভয়েরই গভীর সম্মতি ছিল। বিবাহের তারিখ সম্পর্কে বাদী শ্রীমতী অনীতা পাল চৌধুরী যে তথ্য দিয়াছেন তাহাও সত্য।

তিনি অভিযোগকারিণী বাদী শ্রীমতী অনীতা পাল চৌধুরীর প্রথম বিবৃতির কিয়দংশ সংশোধন করিয়া বলেন যে তাঁহারা উভয়ে যে শুধু পরস্পরের পরিচিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের বিবাহপূর্ব প্রণয় ছিল। অভিযোগকারিণীর অন্তিম বিবৃতি তিনি তীব্রভাবে অস্বীকার করিয়া বলেন যে গভীর প্রণয়াবিষ্ট হইয়া তাঁহারা রেজিস্ট্রি বিবাহে উদ্যোগী হইয়াছিলেন উভয়েই। তিনি আরো জানান যে রেজিস্ট্রি বিবাহ তাঁহাদের পারস্পরিক মিলিত হইবার আশঙ্কার পরিচয় মাত্র। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথম দেখিয়াছিলেন অনীতা নন্দীকে। সহপাঠিনীর সহিত ক্লাস নোট্‌স আদানপ্রদানের ভিতর দিয়া, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রণয়রস আলোচনা, সাহিত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিমালার বিচার বিশ্লেষণ করিতে তরুণ সহপাঠী একদিন আবিষ্কার করিয়াছিল যে সে সহপাঠিনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। ইহা তাহার জীবনের এক অত্যাশ্চর্য, অনাস্বাদিত অনুভূতি। তিনি আরো বিস্মিত হইয়াছিলেন যে তরুণী অনীতাও তাঁহার প্রতি দুর্বল হইয়াছেন। ইহার পর সদ্য গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাসস্টপে গিয়া

স্থাখেন অনতিদূরে রাধাচূড়া গাছ কলিকাতায় পাষাণের মধ্যে বাঁচিয়া পূর্ণ হলুদ রঙে আলো করিয়া তুলিয়াছে মাথার খণ্ড আকাশ, তাহার ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে বর্ধমানের অনীতা নন্দী। মুখমণ্ডলে সুখমিশ্রিত বিষাদ। সেই অপরাহ্ণ উভয়ের জীবন বদলাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত ভারতবর্ষ সেদিন উদ্বেলিত ছিল নির্বাচনের ফলাফল ধারণ করিয়া, কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকার শাসক পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহার প্রভাব তাঁহাদের তরুণ রক্তেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। সেই অপরাহ্ণ তাঁহাদের জীবন বদলাইয়া দিয়াছিল। তিনি তাঁহার গোপন অনুরাগ প্রকাশ করেন রাধাচূড়ার তলা হইতে সহপাঠিনীকে লইয়া বাসস্টপে যাওয়ার সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে। অনীতা ও ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন—নাই।

প্রণয় ছিল পারস্পরিক। তিনি জোর করিয়া বাদীকে রেজিস্ট্রি করিতে বাধ্য করেন নাই। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি দাখিল করিতেছেন দীর্ঘ কয়েক বৎসরে পরস্পরে আদান প্রদান করা একগুচ্ছ পত্র। মহামান্য বিচারপতিই তৃতীয় ব্যক্তি যিনি এই পত্রগুলি পাঠ করিবেন। এতকাল ইহাতে দুইজনের অধিকার ছিল।

অভিযোগকারিণীর আর একটি অভিযোগে তিনি মর্মাহত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সহপাঠিনীর পিতার বৈভব সম্পর্কে তিনি কোন রূপ অবগত ছিলেন না। বিবাহে পণের কথা সত্য নহে। তাঁহার স্ত্রী ধনী পিতার আদরিনী কন্যা হওয়ায় জেদী, অহঙ্কারী। তিনি সামান্য ইস্কুল শিক্ষকের পুত্র, পিতার আদর্শে বিশ্বাসী। হিন্দু লোকাচার সম্মত বিবাহে তিনি প্রাথমিক ভাবে আপত্তি জানাইয়াছিলেন কারণ বর্ধমান জেলার ধনীকৃষকের সহিত জাঁকজমকে পাল্লা দেওয়া তাঁহার মত ইস্কুল শিক্ষকের পুত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ বাদী অনীতা তাহার পিতার দ্বারা প্রভাবিত, সে-কারণে অনীতার মন রক্ষা করিতে—তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানে সম্মত হইয়াছিলেন।

বরং তাঁহাকে সামান্য অঙ্কের পণ দিয়া তাঁহার স্ত্রীর পিতা সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন একটি উদ্দেশে; তাঁহাদের ব্যাঙ্কের যে শাখা বর্ধমান জেলার গলসি থানায় রহিয়াছে সেখান হইতে বিপুল পরিমাণ ঋণ অবিনাশ নন্দী পূর্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঋণ শোধ করেন নাই। এ বিষয়ে জামাতাকে দিয়া ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কহিয়াছিলেন, "টাকা যদি দিতে হয় তো জামাই বাবাজীবনকে দিবো, উহারা কেনে লিবে গো।"

মহীতোষ পালচৌধুরী তাঁহার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের এই প্রস্তাবে অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, শ্বশুরমহাশয় তাঁহাকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিতে চাহেন।

বিবাদীর অভিযোগ বাদী সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করেন। বাদী শ্রীমতী অনীতা পালচৌধুরী বলেন, তাঁহাদের বিবাহের সময়ে তাঁহার স্বামী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের নিম্ন করনিকের কাজ করিতেন এবং ব্যাঙ্কের চাকুরির প্যানেলভুক্ত ছিলেন। বিবাহের দুইমাসে পরে, ১৯৮১ সনের ফেব্রুআরি মাসে তিনি ব্যাঙ্কের চাকুরিতে যোগদান করেন। সুতরাং এ অভিযোগ অসত্য। বাদী আরো বলেন যে তাঁহার পিতা ধনীকৃষক, সফল ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের নিকটে তিন বহু ভাবে দায়বদ্ধ। কিন্তু একটি ব্যাঙ্ক নহে, গলসীথানায় চারটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, প্রতিটি হইতে তিনি ঋণ গ্রহণ করিতেছেন এবং শোধ করিতেছেন, ব্যবসায়ের ইহাই রীতি। পণ দেওয়া তাঁহার পিতার অভিলাষ ছিল, ইহাতে তাঁহার সামাজিক মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাইত। তাঁহাদের গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের ইহাই রীতি। এ বিষয়ে আরো নিঃসন্দেহ করিবার জন্য আদালতকে কিছু নথিপত্র তিনি পেশ করিতেছেন।

নথিপত্র হইতে দেখা যায় যে শ্রীঅবিনাশ নন্দী তাঁহার কন্যার বিবাহের দশদিন পূর্বে ১৯৮০ সনের বাইশে নভেম্বর গলসীথানার··· ব্যাঙ্ক হইতে আশি হাজার টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। বাদী বলেন যে ঐ টাকা তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহার পিতা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ হিসাবে আদায় করিয়াছিলেন। নভেম্বর মাসে বর্ধমান জেলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইয়া থাকে। আমন ধান কর্তনের পর ভূস্বামী গৃহস্থের ব্যাঙ্ক একাউন্ট ভারী হইয়া উঠে। সুতরাং ঐ সময়ে অর্থ্যাৎ ফসল কর্তনের কালে কৃষিঋণ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান। তাঁহার পিতা ফসল বিক্রয়ের অর্থ কন্যার বিবাহে খরচ করিতে রাজি ছিলেন না কেন না উহা লক্ষ্মী, উহা দ্বারা ব্যাঙ্ক একাউন্ট, লকার এবং গৃহের সিন্দুক সমৃদ্ধ হয়। ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ ধনীকৃষকের নিকটে অনেক সহজ উপায়। হ্যাঁ ঐ টাকা জামাতা লইতে অস্বীকার করিলে কন্যার নামে বর্ধমানের ঐ ব্যাঙ্কেই ফিক্সড ডিপোজিট করেন। ইহাতেই তাঁহার পিতার প্রভাব ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

[বিচারপতির মন্তব্য ঃ বাদী ও বিবাদী, অভিযোগ, জবাব, প্রত্যভিযোগ, জবাব দ্বারা ইহা স্পষ্ট দুজনের কেহই সত্য বলেন নাই।]

অভিযুক্ত শ্রীমহীতোষ পালচৌধুরী পণ সংক্রান্ত বিষয়ে আরো কিছু কথা

বাদীর উত্তর প্রসঙ্গে আদালতের নিকটে বলিয়া থাকেন। তাহা এই রূপ।

তিনি আদর্শবাদী ইস্কুল শিক্ষকের পুত্র। তিনি যে বিবাহে পণপ্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ইহা সত্য, তাহা মহামান্য আদালত বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার অর্থাৎ, বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরীর অজ্ঞাতে তাঁহার স্ত্রীর নামে ফিক্সড ডিপোজিট-অ্যাকাউণ্ট খোলায় তিনি অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। এবং স্ত্রীকে ঐ অর্থ তাঁহার পিতার নিকটে হস্তান্তরিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলে স্ত্রী তাহাতে তীব্রভাবে অসম্মত হন। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ, আলোকময় থাকা উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন, গাছ ও ফুলের ন্যায় তাহারা একজন অন্যের দ্বারা বাঁচিবে, জন্মাইবে, সুন্দর হইয়া উঠিবে, এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। তাঁহার স্ত্রীর দম্ভ, পিতার বৈভবের অহঙ্কারই এইরূপ ঘটিবার কারণ।

অভিযুক্ত বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরীর এই প্রত্যভিযোগে বাদী শ্রীমতী অনীতা পালচৌধুরী কিছু নথিপত্র আদালতের নিকট পেশ করেন। সেই নথিপত্র এবং বাদীর জবাবে ইহা জানা যায়।

তাঁহার নামে অর্থ্যাৎ শ্রীমতী অনীতা পালচৌধুরীর নামে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে তাহা প্রাথমিক অবস্থায় বিবাদী মহীতোষের অজানা ছিল। সুতরাং অপমানিত বোধ করিবার কারণ অমূলক। তিনি অর্থাৎ বাদী তাঁহার পিতার একমাত্র সন্তান, পিতার স্বোপার্জিত অর্থে তাঁহার পূর্ণ অধিকার। পিতা যদি তাঁহার ভবিষ্যতের সুরক্ষার নিমিত্ত কিছু অর্থ তাঁকে প্রদান করেন তাহাতে মহীতোষ পালচৌধুরীর অসম্মান হইবার কোন কারণ থাকে না। অবশ্য এই প্রসঙ্গ এখানে অমূলক কারণ ফিক্সড ডিপোজিটের বিবরণ মহীতোষের অজ্ঞাত ছিল ইহাই সত্য। বিবাহের দুই বৎসরের সামান্য পূর্বে মহীতোষ ইহা জানিতে পারেন, এবং অনীতা পালচৌধুরীই তাঁহার স্বামীর নিকট এই সঞ্চিত অর্থের কথা প্রকাশ করেন যেহেতু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মহীতোষ পালচৌধুরী বর্ণিত গাছ ও ফুলের ন্যায় সুন্দর এবং সুশ্রী হওয়াই কাম্য। বিবাদী এই অর্থের বিবরণ তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে জ্ঞাত হওয়ার পর স্ত্রীকে অনুরোধ করেন যে ঐ অর্থ দ্বারা কলিকাতায় একটি স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাহা চিন্তা করিতে। বাদী ইহাতে কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই, এবং তাঁহার পিতার নিকটে এই বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি ও সম্মত হন। ফিক্সড ডিপোজিটের অর্থ এই দুই বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া একলাখ অতিক্রম করিয়াছিল।

কিন্তু ইহার পরে শ্রীমহীতোষ পালচৌধুরী তাঁহাকে বলেন যে ঐ অর্থ দ্বারা যে ফ্ল্যাট ক্রয় করা হইবে তাহা তাঁহার নামে রেজিস্ট্রি করা আবশ্যক, কেন না ঋণ তিরিশ হাজার টাকা তিনিই শোধ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে ফ্ল্যাটের মূল্য একলাখ তিরিশ হাজার টাকায় ধার্য হইয়াছিল। এই ঘটনায় বাদীর পিতা শ্রীঅবিনাশ নন্দী রীতিমত অসম্মত হন এবং বলেন যে ঋণ তিরিশ হাজার টাকাও তিনি পরিশোধ করিয়া দিতে প্রস্তুত যদি ফ্ল্যাটটি তাঁহার নামে রেজিস্ট্রি হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিবাদী এই অভিযোগের জবাবে বলেন যে তিনি তাঁহার স্ত্রীর পিতার দ্বারা ক্রয় করা ফ্ল্যাটে থাকিতে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং···।

বাদী বলেন, ফ্ল্যাট ক্রয় করিবার সিংহভাগ অর্থ তো তাঁহার পিতার দান ইহা বিবাদী জানিতেন। কন্যা জামাতাকে যদি গৃহসংস্থান করিয়া দিয়া তাঁহার পিতা সুখী হইতে চান, তাহাতে বিবাদীর—আপত্তি কেন?

বিবাদী ইহার উত্তরে বলেন, যে দানের পরে দান সামগ্রীতে দাতার অধিকার থাকে না, সুতরাং ফ্ল্যাটটি তাঁহার নামে ক্রয় করিলে তিনি তাঁহার চাকুরি ক্ষেত্র হইতে বাকি তিরিশহাজার টাকা গৃহঋণ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন। ঐ টাকা পরিশোধ করিবার অধিকার তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের নাই।

বাদী বলেন, ইহা তাঁহার নামে সংঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করিবার ষড়যন্ত্র মাত্র। বিবাদী ইহা অস্বীকার করেন।

[বিচারপতির মন্তব্যঃ বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী তাঁহার বিবাহের সময় আদর্শবান তরুণ যুবকের মত যে অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া দুই বৎসরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান। এ বিষয়টির কোনরূপ ফয়সালা আদালত দ্বারা হইবার নহে, সুতরাং এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করা হইল।]

অভিযোগকারিণীর চতুর্থ অভিযোগ বিষয়ে বিবাদী হাসপাতালের নথিপত্র। পুলিশ রিপোর্ট আদালতে দাখিল করেন। তাহার মধ্যে হাসপাতালে নীত হইবার পর অগ্নিদগ্ধা অনীতা পালচৌধুরীর বিবৃতি রহিয়াছে। বিবৃতি অনুসারে জানা যায় যে রান্নাঘরে হঠাৎ তাঁহার পায়ের ধাক্কায় জলন্ত স্টোভ উল্টাইয়া তাঁহার কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ হইয়া যায়। এই মর্মে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করিয়াছিল তরুণী গৃহবধূর বিষয় হেতু। সেই মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছিল উভয়পক্ষের একত্র বিবৃতিতে। পুলিশের তদন্ত অনুসারে শেষ পর্যন্ত ইহা একটি দুর্ঘটনা বলিয়া প্রমাণিত।

এই প্রসঙ্গে বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী বলেন যে তাঁহার স্ত্রী অতীব ক্রোধসম্পন্না। সামান্য দাম্পত্য কলহের পর উত্তেজিত হইয়া জ্বলন্ত স্টোভে পদাঘাত করে এবং নিজে অগ্নিদগ্ধ হইয়া তাহার স্বামী মহীতোষ পালচৌধুরীকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করে। স্টোভে পদাঘাত করিবার পূর্বে অনীতা পালচৌধুরী তাঁহার মনোবাসনা উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই অভিযোগ করিতেছেন। প্রজ্বলন্ত স্ত্রীকে রক্ষা করিতে বিপদ তুচ্ছ করিয়া তিনি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া অগ্নি নির্বাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই চিহ্ন এখনো তাঁহার পৃষ্ঠদেশের বামপার্শ্বে রহিয়াছে। ঐ দুর্ঘটনার পর তাঁহার স্ত্রীর বাম উরুর একাংশ দগ্ধ হয়। ঐ চিহ্ন বিলুপ্ত হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। উভয়েই সেই দুর্ঘটনার স্মৃতিবহন করিতেছেন। হাসপাতালে পৌছিয়া অনীতার ক্রোধ নির্বাপিত হয়, ফলে তিনি 'হত্যার প্রচেষ্টা' এই অভিযোগ হইতে মুক্ত হন।

বিবাদীর এই প্রত্যভিযোগ বাদী শ্রীমতী অনীতা পালচৌধুরী সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এবং সেই কারণে সাক্ষী হিসেবে হাজির করেন তাঁহাদের সংসারে তৎকালে নিযুক্ত গৃহভৃত্যকে। তাহাকে জেরা করা হয়। জেরা করিয়া জানা যায় যে বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরীর অভিযোগ সত্য নহে। উহা একটি স্বাভাবিক দুর্ঘটনা মাত্র।

[বিচারপতির মন্তব্য : বাদীর অভিযোগ, বিবাদীর জবাব, বিবাদীর প্রত্যাভিযোগ কোনটিই সত্য নহে। কেহ সত্য বলেন নাই।]

চতুর্থ অভিযোগে বাদী বর্ণিত ইলা সেন নামক যে নারীতে বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী আসক্ত, সে-বিষয়ে কোনরূপ তথ্য বাদী অনীতা পালচৌধুরী আদালতে পেশ করিতে পারেন নাই। এবং অগ্নিদগ্ধ হইবার সহিত যে ইলা সেন নামক অন্য কোন নারীর অস্তিত্ব জড়িত, সে অভিযোগ পূর্ব পরিচ্ছেদেই খারিজ হইয়া গিয়াছে। কারণ উহা একটি দুর্ঘটনা ছিল।

[বিচারপতির মন্তব্য : বাদীর অভিযোগ অসত্য। আদালত কোনরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিতেছেন।]

বাদীবর্ণিত পঞ্চম অভিযোগের উত্তরে বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী জানান যে ১৯৮২ সনের পহেলা ডিসেম্বর তাঁহাদের দ্বিতীয় বিবাহ বার্ষিকী ছিল ইহা সত্য। এবং ঐদিনে তাঁহারা উভয়েই দিল্লিতে ছিলেন। এবিষয়ে বিবাদী সমস্ত রকম কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন, যেমন হোটেলের রিসিট ইত্যাদি। সুতরাং ঠিকাকাজের লোকের উপস্থিতিতে অপমানের অভিযোগ অমূলক।

বিবাদীর এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাদী শ্রীমতী অনীতা পালচৌধুরীকে জেরা করা হয়। তিনি বিবাদী, তাঁহার স্বামী মহীতোষ পালচৌধুরীর কথা আংশিক স্বীকার করেন; বলেন ঐদিন দিল্লিতে ছিলেন বটে মহীতোষ, কিন্তু তিনি নন। মহীতোষ তাঁহার অফিসের কারণেই দিল্লি গিয়াছিলেন একা। তিনি বর্ধমানে পিতার নিকটে ফ্ল্যাট বিষয়ে কথা কহিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী নিরানন্দে কাটিয়াছিল।

[বিচারপতির মন্তব্য : আদালত বাদী এবং বিবাদীর পারস্পরিক এই মিথ্যা আচরণে বিস্মিত। তাঁহাদের নিকট যে বিবাহবার্ষিকী অন্যান্য একটি দিনের মতই অনুজ্জ্বল তাহা আদালত স্পষ্ট অনুভব করিতেছেন। এবিষয়ে উভয়ের কোনরূপ মায়া নাই। নবদম্পতির বিবাহবার্ষিকী উদযাপনের আনন্দ-হীনতা অনুভব করিতেছেন বিচারপতি স্বয়ং।]

বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী মদ্যপানের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বাদী বলেন এবিষয়ে কলিকাতার দুটি বিখ্যাত পানশালার বেয়ারা সাক্ষ্য দিবে।

বেয়ারাদ্বয় উভয়কেই সনাক্ত করিয়াছে।

বাদী বর্ণিত সপ্তম অভিযোগের উত্তরে বিবাদী মহীতোষ পাল চৌধুরী বলেন, তাঁহার মতো আদর্শ ইস্কুল শিক্ষকের স্ত্রী। পণবিষয়ক ঐরূপ বাক্য উচ্চারণে তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন। বাদীর অভিগি প্রমাণ সাপেক্ষ। এবং ১৯৮২ সনের জুন মাসের বিশ তারিখ—অম্বুবাচীর কাল ছিল। তাহা পঞ্জিকা পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে। অম্বুবাচীর কালে সংসার অনুযায়ী হিন্দু বিধবা অন্নগ্রহণ করেন না। সুতরাং ঐ অভযোগ কি করিয়া সত্য হয়। যে বাদী অনীতা পালচৌধুরী নিজে অনাহারি থাকিয়া, শাশুড়িমাতাকে আহার করাইয়া ছিলেন।

বাদী অনিতা পালচৌধুরী বলেন তাঁহার অভিযোগ অসত্য নহে, অর্থাৎ পণ বিষয়ক অপমানসূচক বাক্য তিনি শাশুড়িমাতার নিকট হইতে প্রায়শ শুনিতেন। তাহার সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে তিনি বলেন, তারিখটি কোনক্রমে ভুল হইয়াছে।

সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে এ অভিযোগের নিষ্পত্তি হইল না। প্রকাশ বিবাদীর মাতা এখন জীবিত নাই, সুতরাং··· ।

বাদীর অষ্টম অভিযোগের উত্তরে বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী বলেন যে গত আগস্ট মাসের ৬ তারিখে (৬।৮।৮৪) তিনি কলিকাতায় ছিলেন না,

সুতরাং ঐ তারিখে প্রহারের অভিযোগ ভিত্তিহীন। এবিষয়ে তিনি প্রতিবেশিনীর সাক্ষ্যও আনিবেন। তারিখটি মনে রাখার কারণ ঐ তারিখেই তাঁহার স্ত্রী গৃহত্যাগ করে।

এবিষয়ে অনুসন্ধানে জানা যায় যে বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী ঐ তারিখে তাঁহার গৃহে ছিলেন না সত্য, তবে ৫।৮।৮৪ তারিখে তীব্র দাম্পত্য অশান্তি হওয়ায় ঐ দিনই অর্থাৎ ৬।৮।৮৪ তারিখের পূর্ব দিনে কলিকাতার একটি হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং ৮ তারিখে সকালে সেই হোটেল ত্যাগ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখেন তাঁহার স্ত্রী বর্ধমানে চলিয়া গিয়াছেন।

[বিচাপতির মন্তব্যঃ প্রাথমিক পর্যায়ে বাদী এবং বিবাদী উভয়েই অসত্য বলিয়াছেন। প্রহারের অভিযোগ অপ্রমাণিত।]

বাদী অনীতা পালচৌধুরী তাঁহার নবম অভিযোগে কতগুলি তারিখ এবং সময়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলিতে তিনি তাঁহার স্বামী মহীতোষ পাল চৌধুরীর নিকট হইতে নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন।

বিবাদী বলেন, তারিখগুলি কাল্পনিক, এবং যেন পঞ্জিকা পর্যালোচনা করিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে নির্যাতনের দিনক্ষণ উল্লেখপূর্বক। তিনি আরো বলেন যে দিনক্ষণগুলি যদি সত্য হয় তো ইহা স্পষ্ট যে তাঁহার স্ত্রী এই মোকদ্দমায় অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত বহুকাল হইতে প্রস্তুত হইতেছেন। সাংসারিক কলহ, মন কষাকষির তারিখ, সময় কোন স্বামী স্ত্রী মনে রাখে না, বা ডায়েরিতে নথিবদ্ধ করে না।

[বিচারপতির মন্তব্য ঃ আদালত বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরীর মন্তব্য যথার্থ মনে করে। এবং ইহার সহিত আদালত ইহাও মনে করে যে তাঁহাদের ভিতর কলহ মনকষাকষি প্রায়শ হইত, তাহা অস্বাভাবিক নহে। সংসারে তাহা অদৃষ্টপূর্ব নহে। অদৃষ্টপূর্ব হইল সেই তারিখগুলি দুচার বছর বাদেও অবিকল মনে রাখা, সময়গুলিকেও না বিস্মৃত হওয়া।

(গ)

বিবাদী মহীতোষ পালচৌধুরী তাঁহার আরো কিছু অভিযোগ এই প্রসঙ্গে আদালতের নিকট পেশ করেন। তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল বাদীর জবাব সহ।

(১) অনীতা সন্তানের মা হইতে চান না এবং প্রথম ভ্রূণটিকে হত্যা করিয়া তাঁহার অশেষ মানসিক পীড়নের কারণ হইয়াছে।

বাদী অনীতা পালচৌধুরী বলেন অভিযোগ উদ্দেশ্যমূলক। বিবাহের প্রথম

তিনমাসের মাথায় তিনি সন্তানধারণ করেন এবং তৎকালে তাঁহারা উভয়েই মানসিক প্রস্তুতিহীন অবস্থায় থাকায় পরস্পরে পরামর্শ করিয়া কলিকাতার একটি নার্সিং হোমে গিয়ে সর্ভপাত ঘটান। এবিষয়ে নার্সিং হোমের কাগজপত্র রেজিস্টার সাক্ষ্য দিবে।

বিবাদী এবিষয়ে নীরব।

(২) স্ত্রী অনীতা পালচৌধুরীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক বহুদিন ক্ষীণ। তাঁহাদের শয়নকক্ষও আলাদা। কেহ কাহাকে বহুকাল স্পর্শ করেন নাই।

বাদী অনীতা পালচৌধুরী এ-বিষয়ে নীরব। বিষয়টি একান্ত ব্যক্তিগত, সুতরাং······

(৩) নিজস্ব ফ্ল্যাট নাই বিবাদীর, রঙীন টি. ভি. হয় নাই এখনো, ফ্রীজ আছে কিন্তু ভি. সি. আর নাই—যেগুলি নাই সেগুলি দ্রুত সংগ্রহের তিনি চেষ্টা করিতেছেন, সেইমত আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বাদী অনীতা পালচৌধুরী ইহা লইয়া তাঁহাকে নিয়ত ব্যঙ্গ করে। ইহা তাঁহার তীব্র মানসিক পীড়নের কারণ হইয়া দাঁড়ায় অনবরত।

বাদী অনীতা পালচৌধুরী এবিষয়ে নীরব। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন, কিন্তু বলেন সংসার করিবার জন্য ঐগুলি অপরিহার্য। একথা তাঁহার স্বামী মহীতোষ পালচৌধুরী বুঝিতে চাহেন না।

এই তিনটি বিষয়ে বিচারপতির মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

(ঘ)

মহামান্য বিচারপতির শেষ মন্তব্য।

মোকদ্দমার বিবরণে দেখা যায় এক্ষেত্রে বাদী বিবাদী উভয়েই পরস্পরে অভিযুক্ত। উভয়েই অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং অভিযুক্ত হইয়াছেন। এবং উভয়পক্ষের কোন অভিযোগই সত্য নহে।

অথচ ইহা স্পষ্ট যে বাদী বিবাদী—স্ত্রী ও স্বামীর সম্পর্ক দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর। উভয়ে প্রণয় মুগ্ধ ছিলেন একদা, ইহা বাদী স্বীকার না করিলেও জলের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং সেই প্রণয়মুগ্ধতা তাঁহাদের পারস্পরিক বিবাহবন্ধনে অবদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের প্রণয়ের গভীরতা পুরাতন পত্রগুলিতে নিবদ্ধ। পত্রগুলি মুগ্ধ বিষয়ে পাঠযোগ্য। গাঢ় প্রণয়ে জীবনের কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপলব্ধি জড়িত থাকে তাহা এই আদালতের সম্পূর্ণ জানা ছিল না। আদালত জানিতেন না, ১৯৭৭ সনে সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে দুই তরুণ তরুণী কিরূপ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। আবেগে, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি

ভালবাসা তাঁহাদিগকে নৈকট্য দিয়াছিল। আদালত জানিতেন না ১৯৭৮ সনের প্রবল বন্যায় দুই তরুণ তরুণী কিরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। বন্যার্তের সেবায় তরুণ যুবক যখন দুর্গম অঞ্চল গমন করিয়াছিল, তখন তরুণী কিভাবে দিন-যাপন করিত, কিভাবে কলিকাতার সাধারণ মানুষের নিকট হইতে সাহায্য তুলিয়া গ্রামে তাহার প্রেমিক তরুণের নিকট পৌছিয়া দিয়াছিল। পত্রগুলিতে সেই সকল ঘটনার উল্লেখ আছে। তাঁহাদের পুরাতন প্রেম ও প্রণয় সন্দেহাতীত। এখন তাহা ঢাকা পড়িয়াছে কোন কারণে।

তাঁহারা যখন আদালতে থাকিতে চাহেন। কিন্তু আলাদা থাকিবার যে কারণগুলি অভিযোগ আকারে উভয়পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন তাহার একটিও সত্য নহে। শুধুমাত্র মিথ্যায় ভর করিয়া উভয়েই শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছেন বিচ্ছেদের আশায়। মোকদ্দমায় ইহা প্রতীয়মান যে উভয়েই পূর্বপ্রণয়ের কথা ভুলিয়াছেন।

তাঁহাদের পুরাতন প্রেম আর নাই। তাহারা এই মোকদ্দমায় যত কথা অভিযোগ, প্রত্যাভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার একশোভাগই ব্যক্তিগত। অথচ প্রণয় পত্রগুলিতে পৃথিবীর কথা থাকিত, থাকিত বিহারে হরিজন পল্লীতে হত্যাকাণ্ডের খবর পাঠে গভীর দুঃখবোধ, থাকিত পথের ভিখারিনী বালিকার জন্য বেদনার অনুভূতি। এখন সেই অনুভূতিমালা তাঁহারা বহন করেন না। এখন তাঁহারা তাঁহাদের ফ্ল্যাট, চাকুরি অর্থ, ফ্রীজ, ভি. সি আর রঙীন টি. ভি. ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে আসক্ত নহেন। তাঁহাদের প্রথম প্রণয়ের বিস্ময় এখন অন্তর্হিত। কেন অন্তর্হিত তাহা এই মোকদ্দমার বিবরণ পাঠে কিছু কিছু আন্দাজ করা অসম্ভব হইবে না। সুতরাং আদালতে আর সে পর্যালোচনায় যাইতে ইচ্ছা করেন না।

মিথ্যা অভিযোগগুলি আদালত খারিজ করিল, কিন্তু আদালত অপেক্ষা করিয়া আছেন সত্য অভিযোগগুলির জন্য। আদালত মনে করেন যাঁহারা মিথ্যার জাল বুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন আসল সত্যটি কি?

মামলা খারিজ। আদালত শুধু এই আদেশ করিতে ইচ্ছা করেন যে উভয়ে মুখোমুখি বসিয়া সত্য অভিযোগগুলি দিয়া পরস্পরকে অভিযোগ করুন। পুরাতন প্রণয়ে পত্রগুলি সংরক্ষণ করুন। তাহাতে মামলার রায় উভয়েরই অনুকূলে যাইবে।

এই পাড় ভাঙে এই গড়ে

সিদ্ধেশ্বর সেন

একবার তারা বলেছিল চায় ভাষা
পলিমাটি নদী সব দিয়েছিল তুলে
স্তরে-স্তরের অতীত পাঠায় অনাগতে কিছু আশা

আরও দূরে যায়, বিনিময়ে, উপকূলে
বঙ্গসাগরে ঢেউয়ের চূড়ায় দুইতটে
যাওয়া-আসা

কেউ চলেছিল পূবে কেউ পশ্চিমে
একই বাচনিক দেশের হৃদয়ে এসে
একই করি তার একই জন্মের—আশা

এখন তো তারা প্রতি পদে জাগে, প্রতিবাদে
তোলে ভাষা—
বৃথাই রাষ্ট্র জটিলে ধর্মে মেশে

এই পাড় ভাঙে এই গড়ে নদী কালের দ্বন্দ্বে দিশা ॥

পাথরের পাঁজর ফাটিয়ে

কৃষ্ণ ধর

অনেকদিন আগে পড়া সেই তেজী মানুষের গল্প
মনে পড়ে যায়
তার হেরে যাওয়াটা লেগেছিল বুকে
স্মৃতিতে মিশে আছে সেই মানুষ আর তার গল্প
এখন তারই কথা ভেবে কবিতার অক্ষর সাজাই।

সামনে ভাঙা পাঁচিলের পাঁজর ফাটিয়ে
বেরিয়েছে সন্ধ্যামণি
পুরনো বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে সেই সব স্মৃতি
ফুলের রঙে মিলে মুহূর্তে একাকার

শ্যাওলা জমে জমে পাঁচিলের গায়ে বিচিত্র সাইকাডেলিক ছবি
সন্ধ্যামনির ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে
পাথরের পাঁজর ফাটিয়ে সে হাসছে।

উইয়ে-কাটা পুরনো বইয়ের পাতাগুলো
বেবাক এখন যাবে বাতিল কাগজের ঝুড়িতে
তারপর পুরনো শিশিবোতল কাগজওয়ালার কাঁধে চেপে বাজাবে।

সেই তেজী মার-খাওয়া মানুষটির গল্পের স্মৃতি
তবু জড়িয়ে থাকবে আমাকে
আর সন্ধ্যামণি ফুলের দিকে তাকিয়ে ভাবব
পাথরের পাঁজর ফাটানো জীবনের অজেয় হাসি।

যা আছে, তা আছে

সুনীলকুমার নন্দী

এ কী আয়োজন! এই শোক-উদ্‌যাপনে
যত-না আড়াল ফেলো, ফেলতে চাও, আমি জেনে গেছি
আমাকে সরিয়ে দিয়ে
অদ্ভুত কৌশলে তুমি ভুলপথে টেনে নাও
টেনে নিয়ে আমার বুকের ময়না করেছ শিকার—
সে নাকি দেখেছে সবই, তোমাদের যত অনাচার,
তাই এত ভয়; তাকে
আগুনে ভাসিয়ে দিলে…
গুমখুন, না-ঘটিয়ে কোনো রক্তপাত।

হতে পারে
মেলে না তেমন চিহ্ন শনাক্তকরণে, তবে
পারে না লুকোতে চোখ
যা আছে, তা আছে ত্রস্ত চোখের ভাষায়—
জানি, তুমি কী না-পারো,
এবার আড়াল নিতে
তাহলে নিজের চোখ অন্ধ করে ফেলো।

ডুবুরী

অতীন্দ্র মজুমদার

পশ্চিম সমুদ্রে আমি মুক্তো খুঁজি। কালো
ডুবুরীর বেশ প'রে উল্টোমুখে ঝাঁপ দিয়ে জলে।
দুপুরের সূর্য ফোঁসে হিঙ্গুলের বনে, বাষ্প ঝর্ণার স্রোত—
জলন্ত অঙ্গারে ক্রোধ তটিনীর চোখের কাজলে।

রক্তের সমুদ্রে আমি মুক্তো খুঁজি ঃ আর তার তীরে
দামিনী বেঁধেছে ঘর উলুখড় কাদামাটি দিয়ে।
অতলে রয়েছি আমি জলজ উদ্ভিদে মাথা রেখে—
মাঠকোঠায় দামিনী আছে, আমার ভোজালি
মৃত্তিকার মুখোসের ভ্রূমধ্যে বিঁধিয়ে॥

মাটির জিনিশ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কী নিয়ে আছি যদি জানতে ওগো মাটির জিনিশ;
কী ভাবে আছি একসঙ্গে—
এই বনভঙ্গি নিয়ে!
শখের বাজারে সেলাম একাএকা ;
যে-সাধ মাটি-হওয়ার, যে-রক্ত ব্যাঙ্কের—
তার কিছু খরচ হলো।
কিন্তু কী ক'রে হলো—তা যদি দেখতে!

হাতদুটি মাটি-দিয়ে তৈরি ;
আর কাঠের ছাঁচ থেকে এসেছে মুখ ;
তবে মুখোশটি শুধুই কাগজের।
এখন কাগজের কাছে আছি বললে—
ছাঁচের মুখটি তার হাতের মতোই মিথ্যে হয়ে ওঠে।

আর মাটির পা তার মাংস ও হাড়ে পা-কে
সত্য বলে কেবল একটি মুহূর্ত ;
যে-মুহূর্তে
একটি আগুনের ঢাকা দেখা দিলো আকাশে।
কিন্তু সে-ও আসলে মাটিরই চাকার
দহন,
পুড়তে-পুড়তে যে পেয়েছে তার আগুনের আমি-কে।

এই অহংকারও তবে সুদূর
একটি মাটিরই জিনিশ।

তিন শহরের মুখ

মানস রায়চৌধুরী

বার্সেলোনা। রোদ্দুর লুটিয়ে আছে দালির ছবিতে
শিরশিরে বাতাসে ওড়ে সুরের পালক
গীটারে অচেনা গলা বুঝতে যায় বেলা
কোস্তা ব্রাভা, মাইল মাইল জুড়ে সুখ-জাগানিয়া—
আলস্যে রয়েছে পড়ে নারী ও পুরুষ
এখানে কি একদিন বিপ্লবের কথাবার্তা হয়েছিল রক্ত-বিনিময়ে?

প্যারিসে মানুষ থাকে? অবশ্যই থাকে।
কবি থাকে, গীতিকার এবং তুলি ও রঙ ছবির সংসার
সুরা থাকে সুরভির চোরাটান বাঁকানো শরীরে
পথ ঘুরে ঘুরে গেলে কালের দাগের মতো ম্লান
স্মৃতি এসে আক্রমণ করে যায়, পরিত্রাণ নেই
পাখি যদি গান গায় মনে হয় নিজেরই সংলাপ,
মসৃণ মানুষ থাকে এইখানে ভিতরে ভিতরে আছে চোরা বিস্ফোরক।

যেদিকে তাকাও সেই পরাক্রান্ত আলপ্‌স-এর ধূসর
টুপিপরা চেনা মুখ, ইনসব্রুক এত পরিচিত !
জানলা খুললে সেই ছায়া, দরজা ঠেললেও সেই ছায়া
আলপ্‌স-এর নানা গড়নের নাক চোখ
গম্ভীর চেলোর তারে গমগম্ করে ওঠে স্তম্ভিত শহর ।

এদেশেরও মানুষের মনে

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

বৃক্ষপত্র মর্মরধ্বনিসমৃদ্ধ ছিল
বাতাসের বেগ ছিল
জলস্রোতে তীব্রতার স্পন্দন ছিল
আলোয় উজ্জ্বলতা উষ্ণতা উভয়ের উপস্থিতি ছিল
আকাশ একটি গোলার্ধে সম্পূর্ণ হয়েছিল
ভিখারির আহার্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল নাকো ।
স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছার যথেচ্ছাচার ছিল
শরীরে কামনার গন্ধের সার্থকতা ছিল
ভালোবাসায় উদ্দীপনার প্রেরণার বর্ণবহুল হওয়ার ঘ্রাণ ছিল ।
পৃথিবীর এরকম প্রতিকৃতি
এদেশেরও মানুষের মনে ছিল ॥

পথ চলি

শ্যামসুন্দর দে

পাতা ঝরে যায় গাছে গাছে
হলুদ পাতারা ঝরে যায়
উড়ে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
কোথায় হারায় তারা
নিরুদ্দেশ কোন পথে পথে !

পৃথিবীর পথ ধরে
মানুষের কত পথ চলা
আসে যায় কত লোক
কত স্মৃতি আঁকে
জোনাকিরা আলো জ্বালে
অন্ধকার অঙ্গণ-প্রাঙ্গণে
নক্ষত্র প্রদীপ জ্বালে
নীলিমার নীলে।

ভালোবাসা অবকাশ কতটুকু
রুক্ষ পৃথিবী জুড়ে গ্রীষ্মের দাহ
ফুল ফোটে—ঝরে যায়
গন্ধ হারায় বাতাসে
শিকড়ে শিকড়ে আর্তি
সঞ্চালিত জীবন-জোয়ারে
তবুও তো ঘরে ফেরে
বিকেলের পড়ন্ত আলোয়
নীড়ের আশ্রয়ে ফেরে
ক্লান্তডানা পাখি
শ্রান্তিভারে সিক্ত পাখা মেলে
ভালোবাসা উত্তাপে উত্তাপে।

পৃথিবীতে বিরল সে সব দিন
পাওয়ার অন্তরালে আছে
চাওয়ার ব্যাকুলতা
পাবার বাসনা নিয়ে সূর্যমুখী
অনিমেষ চেয়ে থাকে সূর্যের দিকে।

কতদিন পথ চলি ঘাসে ঘাসে
পাতার মর্মরে মিলাই আমার
পায়ে চলা গান
পৃথিবীর বুকে আমি খোঁজ করি
ভালোবাসা দিন,

বড়ই কৃপণতা জল-সিঞ্চনে
আকাশ তোমার মেঘে বর্ষা ঢালো
হলুদ পাতারা দূরে যাক
শ্যামলের অভিযানে।
ঝরা পাতা ঝরে যায়
হারায় কোথায় নিরুদ্দেশে
ছিন্নদল বিচ্ছেদের বেদনায়

আমি চলি ঘাসে ঘাসে
পায়ে পায়ে
যারা পথ চলে
তাদের গানের সুরে
আমার কণ্ঠ মেলাই।
চলে যাব
শুধু আমি রেখে যাব নাম
ধরণীর ধূলিতে দূলিতে
রেখে যাব
মাটির পৃথিবী মানুষের মনে
আমার যে পথ চলা
পৃথিবীরই ধূলিতে
আমার যে পথ চলা
মানুষ হাজার জনে।

তোমার আসা

আবুবকর সিদ্দিক

দিন দিন রুক্ষ রসকসহীন অপয়া যাপন,
মরলায় মাথা গোঁজা কানাদের বাদুড়জীবন।
হঠাৎ অগুরু গন্ধ পাই। মাঝরাতে চৌয়াঘুমে
কী বিপুল ঝেঁপে আসো তুমি, যেন শ্রাবণের তোর্সা
তিস্তা মাতঙ্গী রূপসা! অন্ধকার, তবু টের পাই
অই, তীব্র ছেপে জেগে ওঠে ঘাসের রোমাঞ্চ।

কুরুবক হয়ে যায় মানুষের অঙ্গার যকৃৎ।
চোখে চোখে চাঁদের আদল, ঘরে ঘরে ভরে ওঠে
শুভঘট, ঘুমঘোরে বারাঙ্গনা হাসে, মন্ত্রপুত
একটি রাতের আধখানা।
দ্যাখো, রাস্তা মাতিয়ে ছুটেছে
অপমৃত সীতারাম মাহাতোর টমটমগাড়ি।

রাতদিন

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ইঁদারার গোল জলে ভাসতে আমি দেখেছি সে চাঁদ
সে-ই ছিল আমার প্রমাদ।
কিশোরসময়কাল থেকে তাই চঞ্চল ভ্রমণে
কখনো ভুলেও কাশবনে
এমনকি···সত্যি, আনমনে
যাইনিকো, যাইনি আজো উতল অস্থির
কেননা ঐ ব্যাপারেই রাখিনেকো নিজের নিবিড়
অহেতুক এলোমেলো কোনো বিসম্বাদ।

সারারাত সারারাত প্রচুর তিমির
আরো কত রজনী তিমির ভরা তারা
ফুট্‌ফুট্‌ জেগে থেকে ঘুমোতে দেয়নি বুঝি যারা—
ভোরভোর স্বপ্নে গাঢ় শৈশবের ডাক দিয়ে যায়,
যেরকম দেশে মাঠে কার্তিকের প্রথম শিশির
ঘাসের জগতে ম্লান লেগে থাকে সকালের খড়ে...
যেমন দরিদ্র খুব গরিব মানুষ আপন স্বভাবে গান গায়।

সকালের খড়, পাখি, ঘাসের জগতে
আনন্দে স্বাধীন এক বিপ্লবের গুপ্ত ঋতুপথে—
তেমনই তো, ভাসে, ছায়া-ছবির ইঁদারা
যে-তার আশ্চর্য তপ্ত গোল জলে ধরে সৌরকরোজ্জ্বল সাড়া।

এ যেন আবার কোনো অবিরল উদাস প্রহরে
কবেকার অন্যমন দূরদূর চৈত্রের হাওয়ায়
কেউ আনে···কে-যে আনে···তাকে আনে, তার ভাবনায়
তার কথা শুধু মনে পড়ে।

এই যুদ্ধে, প্রেমে, দীর্ঘ বয়সে জীবনে
যতই সরিয়ে রাখি অহেতুক বাজে বিসম্বাদ
কিংবা শত চাঁদের প্রমাদ—
আমার কৈশোরে সেই কাশবন থেকে পলায়নে
ছোটে নাকি তাহারও শরীর!

বাতাস, তিমির কিংবা ঐ ইঁদারায়
ফুটে-ওঠা···ভেসে-থাকা যত আছে তারা
তারও থেকে বেশি সে গভীর!
সে কি বন্ধু···মৃত্যুত্তীর্ণ, সারারাতদিন
উদ্বেল অমর অন্তহীন
ইঁদারার গোল জলে উজ্জ্বল ইশারা?

শহরে পাহাড়ে গ্রামে যেখানেই যাই
আরো যাই
পাশে পাশে শব্দহীন শুধু টের পাই
হাঁটে শান্ত তাহার শরীর।

শাদার রহস্য

শিবশম্ভু পাল

তোমার দিতে বশংবদ আগুন, শিরোনামা
পাঞ্জাবি আর চোস্ত পায়জামা
তোমার হাতে কোন ভুবনের ভার?
তোমায় দরকার।

ভুবন-টুবন শিল্পশোভন, পরের মুখে ঝাল
ছি ছি এত্তা জঞ্জাল।
ধুলোয়-ধুলোয় আড়াল হল সব
বসন্ত উৎসব।

ধুলোর মধ্যে শিরোনামার অনুমোদন কই ?
ধুলোর মধ্যে ঘামের টিপসই।
তুমি বললে, 'বলার কথা আমার ঘরে লো ;
এটাই চালচলন।'

বুঝে গেছি কোথায় বাঁধা তার
কোন আগুনটা জ্বলার, নেভবার।
পাঞ্জাবিটা ধোপদুরস্ত, রহস্যটা কী ;
শাদার চালাকি।

চোখের ফলক

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

কারও কারও চোখের ফলক
সুনিপুন বিঁধতে জানে ছুরির মতো
কৃপণ বসে খুঁটতে থাকে শস্যকণা
অন্ধকারে সেই বিষধর শানায় ফণা
সকাল দুপুর আর সন্ধেবেলা
অথচ সে ছুঁড়তে পারে সবকিছুতেই হেলাফেলা ;

কারও কারও চোখের ফলক
ছিনতে জানে জয়পরাজয়
দাম্ভিকতা মাটি ছুঁয়ে নোয়ায় মাথা
পোষা জলে পোষা রোহিত
পুচ্ছ নাচায় বড়শী গাঁথা
জল রাঙা হয় অতি গোপন রক্তপাতে ;

কারও কারও চোখের ফলক
লিখতে জানে শহরতলীর ইতিকথা
কাঁধের ওপর কামড়ে বসা বাঘের থাবা
কেউ ভোলে না কেউ বা ভোলে
আকাশ ছোঁয়া পাঁচিল তোলে
চোখের ফলক ধুইয়ে দিয়ে বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে।

ভয়শূন্য পৃথিবীর দিকেই

দিলীপ সেন

আকাশটাকে ছাখো
যেন ক্রমশই গনগনে দিনের উত্তাপে
রাত্রির চাঙরগুলো গলে গলে
রাস্তাঘাট, উঠোন, অন্দরমহলে ছড়িয়ে পড়ছে রোদ্দুর

শান্তির দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা
আজ দিনভর গান গাইবে
সেইসব নদীর, বনভূমির, আর উপত্যকার।
অনেক আগেই পায়ে পায়ে দামাল শিশুরা
তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সর্বনাশা যুদ্ধকে।
সপ্তরথী সূর্যের অভ্রান্ত রণকৌশলে
আজ দাঁতনখ অন্ধকার ক্রমাগতই কোণঠাসা।
সাতসমুদ্রের টগ্‌বগে ঘৃণার আগুনে
দাউ দাউ জ্বলছে নরঘাতক বোথা···

গলায় গলা মিলিয়ে আসছে হুড়দাড় সমুদ্রজোয়ার।
গাঁ-গঞ্জ-শহরের মানুষ, মিছিল, নিশান,
উজিয়ে ওঠা জীবনের
অক্ষৌহিনী সেনা···

দক্ষিণ পশ্চিমের অবিশ্রান্ত বায়ুস্রোতে
আকাশে সাদা পায়রা উড়ছে। শান্তির।
অবিচ্ছিন্ন ভালবাসার এই চারদেয়ালে
চপচপে রোদ্দুরে আঁকা ছাখো সূর্যহারা অরণ্যের মুখ
নেলসন ম্যাণ্ডেলা।
সংগ্রামের বন্ধুরা, এখন সেই সময়
ভয়শূন্য পৃথিবীর দিকেই শতাব্দীর পা রাখা॥

মাটি কিন্তু

সাগর চক্রবর্তী

সবুজ সতেজ সকালগুলি তোর
গভীর কোনো আগমনীর সুরে
বলেছিলো : খুলে জানলা-দোর
বেরিয়ে আয় আদরে রোদ্দুরের

এবার তবে রৌদ্রে গিয়ে দাঁড়া
ঐ মাঠে প্রান্তরে
তিন ভুবনের স্বপ্ন জ্বলে ধু ধু বালির চড়ার
খরায়, কেমন টান লাগে অন্তরে

সজনে হিজল পিপুল পেঁপের ছায়ায়
দীঘল পরিপাটি
বিছিয়ে শীতল পাটি
শব্দ নিয়ে মুগ্ধ প্রহর আনিমানির খেলায়
গিয়েছে তোর বেলা

এবার রৌদ্রে দুহাত মেলে দুহাত পেতে দাঁড়া
ঐ মাঠে প্রান্তরে
তিন ভুবনের শ্যামল অপ্ন খুঁড়ছে ধু ধু চড়া
সুদীর্ঘ নখরে

মাটি কিন্তু আগের মতই খাঁটি

ততোটাই ভাঙবো আমি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

ততোটাই ভাঙবো আমি গড়ে তোলার সফল প্রতিশ্রুতি
যতোটা। এই নিজের মধ্যে সঞ্চিত, আর সবই
অটুট সুস্থিরতা নিয়ে বেঁচে থাকবে বলছি না তা। এসো
ঠেলতে ঠেলতে পাথর দেবো পথের মসৃণতা ;

আমার তোমার শিশুর চলার যোগ্য তো নয় এই
পুরোনো পথ, এবড়ো খেবড়ো গাছ-আগাছায় জটিল
মাথার উপর আকাশটাকে আড়াল করে দিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে প্রেতের মতন মানুষ লোভী মানুষ
গাছের পাতায় সূর্য ঢালছে নীরবে চুম্বন
খেলছে হাওয়া ছুটছে হাওয়া বুনো গন্ধে মাতাল

এই পৃথিবী তেমনি আছে আমার পিতামহীর
ঘুমপাড়ানি গানের মতন, অথচ তার কোলে
ঘুরছে যারা মুখোশ এঁটে মুখোশই মুখ যেনো
তারা তো নয় সহজ, বড়ো বিসম্বাদী চারপেয়ে সব মানুষ
মৃত্যু ওরা বিলায় যেনো স্বর্ণমুদ্রা, ওরা
আমার তোমার শিশুর পায়ের মাটির নিচে পোতে
বিষাক্ত টাইমবোমা ; দেখি মরণবাষ্পে ছাওয়া
শূন্যতাও ; কোনখানে পা রাখবো আমি ? আমার
শিশুর বুকের বাতাস ভালো গ্যাসের চেম্বারে
আবদ্ধ ; সে বাঁচবে কেমন করে ?

সফলতাই শেষকথা নয়। এক জীবনে তুমি
সব আগাছা ফেলবে তুলে, তোমার সঙ্গে আমি
সকল কাঁটা উপড়ে দেবো এমন সফলতার
প্রতিশ্রুতি দেবার মতন অবোধ বালক আছে কি সংসারে ?

তথাপি চাই ভাঙতে পারবো গড়তে যতোটাই
এই মানুষই শ্রমের স্বেদের ফসল বুনে গেছে
এই মানুষই শস্য কেটে গোলায় ভরে রাখে
সন্তানেরে দুর্ভাবনার করাল নখর থেকে
বাঁচাতে তার আয়াস থাকে সাধ্যাতীত ; তাদের
গড়ে তোলার কঠিন প্রয়াস ধুলোয় আছে মিশে
তাদের স্বপ্নমিশেল ধুলোর মিনার মাথা তুলে
দাঁড়িয়ে থাক, ভাঙবো পাশের রাশিকৃত বাঁধা
পুরোনো ইটপাথর।

বন্যাত্রাণ

মৃণাল দত্ত

বন্যাত্রাণের জন্য ম্যাচিং গ্রাণ্ট পাঠানো হবে, কেন্দ্রের
বিভাগীয় মন্ত্রী জানালেন।
গ্রাণ্ট এলো—শ্রাবণ মাস, ভাদ্র মাস পেরিয়ে, আশ্বিন মাস
পেরিয়ে কার্তিক মাসের শেষে।
অল্প অল্প শীত, উত্তুরে হাওয়া আর কুয়াশায় তখন চারদিক ঝাপসা।

কেউ এলো না,
যদিও ঢ্যাঁড়া পেটানো হয়েছিল ঢের আগে।
ত্রিপল, চিঁড়েগুড়, ওষুধ-পথ্যি, কাপড়-চোপড়, কম্বল, কাঁথাকানি
ঘর-গেরস্থালি পুনর্নির্মাণের জন্য যৎসামান্য বরাদ্দ টাকা
পরিবার পিছু, এলো।

খবর নিয়ে জানা গেলো যাদের জন্য এই ত্রাণব্যবস্থা
সেইসব দুর্গতরা অনেক আগেই জলের নিচে তলিয়ে গিয়েছে,
ভেসে গেছে জলের টানে,
হেজে মজে ফসিল হয়ে গিয়েছে বন্যার পলিতে।

ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তাই জানা হলো না, মৃতের সংখ্যা,
তাদের নাম-ধাম ডাকঘর সাকিন জানা হলো না,
ত্রাণের জন্য যাবতীয় বরাদ্দ ও মজুদ সবই বণ্টন হয়ে গেল
অন্নহীন, গৃহহীন, জমি-জিরেতহীন অশরীরী প্রেতাত্মাদের মধ্যেই।

এই বঙ্গের জন্য ত্রাণ বাবদ বরাদ্দ টাকা কেন্দ্রে ফেরৎ গেল না।

দুটি কবিতা

সামসুল হক

উদ্ধার

দেখি নাই কভু আমি এইরূপ উলঙ্গ খোড়ের সঞ্চালন
যেমতি খণ্ডিতদেহ অন্ধকার স্ট্রিপ্‌টিজ দেখায় আবিঃকে
কালো মাংস গ্রাসিতেছে নীল গোশ্‌ত
হঠাৎ চ্ছলাৎ কথা হয়ে
অভ্রান্ত শাস্ত্রের ন্যায় ঠোঁটে ফোটে বিশ্বাসের তুমি তুমি বিশ্বাসের এক

বাঁচিয়া গিয়াছি আমি এইভাবে দয়াময় বাক্যের কৃপায়

ঠা ঠা সত্য

জন্ম আছে মৃত্যু আছে সেইরূপ আমাদের জন্ম আছে মৃত্যু আছে ক্ষুধা
জনম কাহার শাদা কার মৃত্যু অশরণ জেনেছিলো ক্ষুধার জনক
অপিচ জিজ্ঞাসা থাকে কভু কি জন্মিয়াছিলো অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমায়
শুধু জানি ঠা-ঠা সত্য
খিদে খুবই জন্মান্তরবাদী

ইঁদুরগুলোকে

রত্নেশ্বর হাজরা

দেয়াল ফুটো করে মাটির তলায় না নিয়ে গিয়ে
বরং
বাঁধনগুলোই কাটতে থাকো সব গোলার—
আলগা বাঁধন অথবা জব্বর কষানো গিঁট
যা-ই হোক না কেন
দাঁতে ধার থাকলে
আর কতক্ষণ!

ধানের গোলা থেকে ধানের বীজ—আর
রাইসর্ষের গোলা থেকে রাইসর্ষে
ডালের গোলা থেকে ডাল—আর
ফলের হিমঘর থেকে ফলের দানাগুলো
বাঁধন কেটে দিতে পারলে
ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে
চারপাশে···

আর তখন
যদি বৃষ্টির মতো বৃষ্টি হয় দু'এক পশলা তো
কথাই নেই
দু'মুঠো বেশিই জমাতে পারবে
আসছে বছরের জন্য—

গাঙুরযাত্রায়, সহোদর

শুভ বসু

এই-যে কালনাগিনী আজ গরল দিল জীবনে, আমি কাকে
দোষ দিয়ে দায় ভুলব, আমার বাসরঘরের সহজ অহংকার
জানত আমি শরীর জুড়ে বহন করি বীজের তৃষ্ণাজল,
বহন করি মমতা, যার একটি দুটি ক্ষীরের মত কৌটায়
প্রাণ পেতে পারে অঙ্কুর। কত সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা
মায়া সিঞ্চন করেছে এবং অধীর করেছে আমাকে।

এই যে বিষে বিনষ্ট আজ প্রাণ, যা আমার চূড়ান্ত পূর্ণতা
তা-কি মানুষের শিবসাধনারই অন্তিম পরিণাম?

তবে দোষ দেব কাকে দোষ দেব তবে কোন সান্ত্বনা
আমাকে আগলে রাখবে পাতালশাসনের সংসারে?

ও সোদর, পিছু ডেকো না, এখন বিষজর্জর দশদিক, তাই
দায় নিতে হবে নিশিদিনমান নিদ্রাবিহীন একাগ্রতায়,
দাঁড় বেয়ে বেয়ে যেতে হবে স্থির অধীর আমাকে।

ভেসে যেতে হবে অনিশ্চিতের আর অজানার ভেতর, এবং
ঝুঁকি নিতে হবে প্রতিকূলতার, পথ হারাবার, লোভ ও ভয়ের
হাজার হাজার মুখোশের লাল রক্ত চোখের প্রচণ্ডতার।

সম্বল শুধু নন্দন, আর কিছু নেই, শুধু সুন্দর, যাকে
ছন্দ-শরীরে রূপ দিতে চাই, প্রাণ দিতে চাই, মুক্তির
প্রখর মহিমা যাতে দশদিকে ঝঙ্কার তোলে, আর কিছু নেই।

যাবো তবু তাই, ও সোদর, পিছু ডেকো না, এখন
চারিদিকে জল খলখল করে হাসে।

পোস্টার

কালীকৃষ্ণ গুহ

অনেকদিন পর জ্বর ছেড়ে গেলে বিকেল হলো।
বারান্দায় এসে দেখলাম
রাশি রাশি পোস্টার উড়ছে চারদিক।
গাছের মাথায় বড়ো বড়ো বাড়ির ছাদে লাইপোস্টের তার ছুঁয়ে
পোস্টার উড়ছে—উড়তে উড়তে মিশে যাচ্ছে
সাবাস, মেঘের সঙ্গে, নক্ষত্রলোকে।

'নেলসন্ ম্যাণ্ডেলার মুক্তি চাই, ভাঙো জেলখানা'
'ব্যক্তি-জীবনের কথা অতিক্রম করে যাক্ জিঘংসা ও ভয় গ্রসনস্ত'
'প্রকৃত শিল্পীর সরলতা ছাড়া কোনো আঙ্গিক থাকে না'
'রমণীরা শান্তভাবে স্কুটার মিছিলে যোগ দিন—দাবি : স্বাধীনতা'
'সব অস্ত্র ফেলে দাও, দাবা-যুগের যুগ শুরু হোক'
'আমরা এই থমথমে সত্যতাকে বুঝে নিতে চাই আমরা ভিক্ষুক।'
এইরকম অজস্র পোস্টার।

রাগ

শামশের আনোয়ার

আমি ক্ষিপ্ত হলে
আমার মাথার কেশর ক্ষিপ্ত হয়
আমি গর্জন করলে
আমার জিভের সমুদ্রও গর্জন করে
আমি নিঃশ্বাস ফেললে
আমার আঙুলের নখে
দশটি মরুভূমি
তপ্ত বালুকাময় নিঃশ্বাস ফেলে
কিন্তু আমি হাসলে
আমার ভিতরের
থুতু ও লালার সব কটি নদী
মুহূর্তে শুকিয়ে যায়
এমনই অবস্থা আমার যে আমি হাসলে
আমার চারিপাশ
শুকিয়ে ঝাঁঝরা ও কালো হয়ে যায়।

মৃত্যুর আগেই

তুলসী মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর আগেই যে
মৃত্যুর চরণে
প্রতিদিন বুকের জবা অঞ্জলি দিয়েছে
তার জীবন এক নিদারুণ ভ্রমণ-কাহিনী !
চরাচর সূর্যোদয়ে
তার আর সূর্যোদয় নাই
শস্যের উল্লাস তাকে ইসারা করে না
তার প্রেম ও যুদ্ধ নিয়ে
খেলা করে নিশাচর বাদুড়-বাহিনী !

মৃত্যুর আগেই যে
মৃত্যুর দুপায়ে জীবন সঁপেছে
আমার কলুর ঘানিতে
তার নিদারুণ বলদভ্রমণ !

রাত্রির সঙ্গীত

ভাস্কর চক্রবর্তী

কারুকার্যময় মতো শিং আজ তুমুল কাপ্তেন দিকে দিকে।
এসো হে কঙ্কাল তুমি নাচ দেখাও গান শোনাও কোনো
আমার প্রথম উপন্যাসে জেনো প্রধান চরিত্রে আছো তুমি
অবশ্য সুতোয় ঝুলবে—ডায়ালগ নেই কোনো—ভাবভঙ্গী শুধু,
নাচগানবাজনা চালাও।

বালি খুঁড়ি বালি খুঁড়ি
আমরা শুধু বালি খুঁড়ে যাই।

আজ পলিথিনের প্যাকেটে দেখি পুরো একটা পরিবার হাওয়ায় দুলছে
দুদিকেই, পেঁচিয়ে রয়েছে শীত, এরই নাম সাঁড়াশিকাহিনী—
তুমিও জঙ্গলে আছো মহামান্য দে-মশাই আমিও জঙ্গলে আছি বেশ
জমাট চলেছে নাচগান।

বালি খুঁড়ি বালি খুঁড়ি
আমরা শুধু বালি খুঁড়ে যাই

যদি দেখি শান্ত আলোকরেখা কোনো

যদি দেখি ছটফটে কিশোর কোনো হাসিমুখে তুলছে গাণ্ডীব।

তাই ফিরে আসা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

শুশ্রূষার প্রয়োজন ছিল। দীর্ঘকাল
কেটে গেছে দেশপর্যটনে। ধুলোময়লা
লেগেছে শরীরে। তাই ফিরে আসা।

মৌসুমী বৃষ্টির শব্দ, জলপাইয়ের ছায়া, আর
ঝিরিঝিরি হাওয়া; তারি প্রয়োজন ছিল।

অরণ্যভ্রমণে ছিল আরণ্যক গন্ধ, আদিমতা।
সেই গন্ধে ভরেছে এ বুক। তাতেও ছিল না
যেন সুখ। তাই ফিরে আসা।

চাঁদেও থাকে না চাঁদ, আমাদের জানালায়
যেরকম থাকে। আকাশে হয় না ভোর,
এইখানে যেরকম হয়। তাই ফিরে আসা।

এই যে বকুলগাছ, হলুদরঙের ছোট বাড়ি,
এইখানে বসে পুনরায় এইসব দেখা। এরও বুঝি
প্রয়োজন ছিল? এখানে শুশ্রূষা আছে। শুশ্রূষারও
প্রয়োজন ছিল। তাই ফিরে আসা।

ভেনাসের মৃত্যু

রবীন সুর

চুল তার জগদ্দল চটকলের ধোঁয়া। ক্লেদ ভুষো কালি—
ব্রংকিয়াল অ্যাজমার টান, মরামাস, থুকথুকে উকুন,
নোংরা বস্তি, এঁদোগন্ধ, ছেঁড়া ব্লাউজের চামচিকে দেহখানি,
মর্কুটে স্তনের হাত শিরা-ওঠা, ভাঙা চোয়ালের
পোকা ধরা দাঁতে-পেষা দেহাতের খিস্তি সারাদিন;
ভেনাস মরেছে কবে, পচামাংস ক্ষয় কাশ, প্রমেহ মলিন,
জড়ি বুটি মাদুলি পাথর ধুনি জ্বলে জ্যোতিষী জুয়ায়
আর কসাই-এর বেঞ্চে ওঠা পরিত্যক্ত ফুলের দোকানে।

পার্টটাইম পুরুতের তুখোড় ঘন্টায় লোনাধরা টেরাকোটা—
মন্দিরে বাদুড় ওড়ে, প্রত্নগন্ধে স্মৃতি ন্যায় কদাচিৎ বাঁচে
তবু ঘোরাফেরা পিনকলের মোড় থেকে নৈহাটি মাদ্রাল,
বংকিমচন্দ্রের বাড়ি, শাস্ত্রীরোড, ললিতমোহন রাসমেলা;
শুধু ধোঁয়া, শুধু ধুলো, বাফারের দাপাদাপি প্রাচ্যের ডাণ্ডীর
লোকোশেডে ইঞ্জিনের কাতর গোঙানি,
দাড়ি-টুপি-টিকি আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের
ছেঁড়া মাপ পড়ে আছে যতদূর সাইরেন পৌঁছোয় :
বগলের টোকো গন্ধ, সুদখোরের নির্মম তাগাদা,
জেটিতে জেটিতে ছয়লাপ, গাদাবোট গঙ্গার পুলিনে
রাধিকা ফুরলো কান্না উদয়াস্ত অস্তোদয় চটকলের বাঁশি—
কে চেয়েছে এ জীবন ? তোবড়ানো ঘটির মুখ যে-কোনো ভোরের
স্বপ্নকে চোয়ালে চেপে গর্ভ যন্ত্রনার সমস্ত দিনের ফর্দ হাতে ?

জীবনকে যুদ্ধ বলতে আমি অনিচ্ছুক

সত্য গুহ

যুদ্ধ
সে একটা বীভৎস প্রাতিপদিকের কদাকার দানবীর চেহারা
আর তার ধারাবাহিক কীর্তিকলাপের দ্যোতনা
শত সহস্র বিধবার উৎপন্ন গান্ধারীর চোখ জুড়ে
সাম্প্রতিকতম দৃশ্য :
ফসলের ক্ষেতে ক্ষুধার্তের মুখের গ্রাস দিয়ে তৈরী
পারমাণবিক বোমার কারখানা
ইস্কুল বাড়ি জুড়ে রোবটের ক্রীতদাসদের
কুচকাওয়াজান্তে নারী ধর্ষণের মহড়া
আবালবৃদ্ধ বণিতার কাটাছেঁড়া অঙ্গে সাজিয়ে তোলা শ্মশানে
বলাৎকার প্রসূত বিনষ্টির জন্মোৎসব
কেঁচো আর তার আত্মীয়দের গড়া মানুষ ও তার সভ্যতার
স্মারক স্তম্ভ
—এই সব

প্রকৃতপ্রস্তারে এর সমান্তরালেই চলছে প্রতিস্পর্ধী প্রতিবাদ
এর প্রতিবাদেই পরিত্রাণকামী জাতকের প্রবাহ
ধ্যান করে গান করে জন্ম দেয় জন্ম দিতে দিতে
পরিশুদ্ধ হয় আর উচ্চারণ করে 'ওঁ'
শান্তি

আমার মেয়ে

বাসুদেব দেব

যুদ্ধ মন্বন্তর দাঙ্গা দেশভাগে ছেঁড়াখোঁড়া
কয়েকটি পাতা নিয়ে ঝড়ো হাওয়া খেলেছে সেদিন
মাঝখানে ধুলোবালিমাখা সেই হতভম্ব বালকের কথা মনে পড়ে ?
প্রত্যেক বছর স্বপ্নে পড়ে থাকা তার ভিটের ওপর
মেঘ হয়ে উড়ে যেত পুজোর সময় এক অবুঝ কিশোর
টিউশনি সেরে সদ্য পিতৃহারা যে তরুণ রাত করে ফেরে
অন্ধকার কলোনির পথে, পায়ের কাঁটাটি তার আজো কষ্ট দেয়
ট্রামভাড়া নিয়ে সেই তুলকালাম, খাদ্য আন্দোলন···মনে পড়ে ?
কলেজ পালিয়ে হাঁটা মিছিলের পথে, ভেবেছিল তারা
এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে, / আধখোলা জানালায় কার হাতছানি ;
এনিমিক আঁকিবুঁকি থেকে যার উঠে আসে মফঃস্বল মানুষের মুখ
রুখু মাঠ বিকল নলকূপ, কিছুই হলো না তার, কত যে বদল হলো বাসা
নিজেকে নিংড়ে নিয়ে খেজুর গাছের মত বছর বছর
সেও চেয়েছিল বুঝি কয়েক গণ্ডুষ জ্যোৎস্না কয়ফোঁটা জল
তিক্ত কটু সংশয়মলিন শব্দ কয়েকটি, তারা আজ জানে দীর্ঘশ্বাস

পড়ে আছে স্খলিত গাণ্ডীব আধখানা শতাব্দী আমার
কেবল অর্জুন থাকে বৃহন্নলা সেজে, আজো গৃহহারা
ফাঁকা কোন জমি নেই শরহতলীতে, প্লাকার্ডে পোস্টারে ছয়লাপ
আকাশ আচ্ছন্ন করে উঠে যায় এ্যাপার্টমেন্ট উঁচু, শুকোয় পুকুর
তারই পাশ দিয়ে আমাকে পেছনে ফেলে চলে যায় আমার মেয়েটি

নতুন বসতি, বড় অচেনা সঙ্কীর্ণ আর সন্দেহজনক পথঘাট
সে দ্রুত চলেছে ঐ, সর্বনাশ, আমি তাকে বলি 'সাবধানে যাস, সাবধানে'
গাছ নই, একা একা দাঁড়িয়ে থাকাও আমার স্বভাব নয়
গাড়ির চাকায় ধারলো পথের ডাক মেয়ের গলায় ঃ
'এসো বাবা, দেখে শুনে এসো'

বেলা চলে যায়

অনন্ত দাশ

দুঃখ আমার অগ্নিশুদ্ধ শিখা
আজীবন তাই কাটালাম সংক্ষোভে
বুকে, হাহাকারে ছুটে যায় মরীচিকা
আমি তো চাইনি ইচ্ছামৃত্যু পুণ্যের বৈভবে—

হেমিস্ফায়ারে জমে আছে কালোমেঘ
দূরে পর্বত এখনও গর্জমান
কে মাপে হাওয়ার মাতাল অশ্ববেগ
গ্রামে গ্রামে তবু শ্রেণীর দ্বন্দ্ব অপরিবর্তমান

সঞ্চয় আমি যেটুকু করেছি রাতে—
বিদুরের খুদ—শিশিরসিক্ত কণা
তাও ঝরে পড়ে প্রতিদিন সংঘাতে
রক্তে তবু তো বহন করেছি এই যুগযন্ত্রণা

মাটির গন্ধে ফিরে যাব সেই ঘরে
অনেক দিনতো কাটালাম হেলাফেলা
বহুদূর থেকে কে ডাকে আর্তস্বরে ঃ
বেলা চলে যায়, বেলা চলে যায়, বেলা চলে যায়, বেলা…

মাটির মানুষ যেন ভুল না করে

কমলেশ সেন

আমি দূর থেকে
চোখের ওপর হাত রেখে
ঠাওর করতে পারি না
এ চোখের জল,
না অন্য কিছু।

মানুষ কেন এমনভাবে
কান্নার মধ্যে নিজেকে উন্মুক্ত করতে চায়!

অন্ধ দাঁড় করিয়ে রাখে
যে কণিষ্ক মাটি,
সে মাটি এখনও
আমার পায়ের তলায় জোগান দিয়ে যাচ্ছে শক্তি।

আমি
      হঠাৎ হঠাৎ
কখনও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠি না।

বলি না,
ইচ্ছে করলেই আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
ভুলকালাম করতে পারি।

নিজের বুকের ওপর নিজের পরিচিত
আঙুলের শব্দ রেখে
ফিসফিস করে বলি,
পারবো হে
পারবো।

পায়ের তলায় মাটির যে বিশাল অস্তিত্ব
সেই অস্তিত্ব নিয়ে
বেঁচে থাকতে হলে
চাই মাটির মতো গড়ন।

আমি কবে থেকে
নিজেকে মাটির মতন আপ্রাণ গড়ে তুলছি।

নিজেকেই নিজে বলি
মাটির মানুষ যেন তোমাকে ভুল না করে।

অনাধুনিক ধুলোয়

রাণা চট্টোপাধ্যায়

ওই মুখোশের মুখগুলি দেওয়াল থেকে
সরিয়ে ফেলো
সদাহাস্যময়ী মহিলার বুকের ভেতর
পাথর চাপিয়ে ভারি করো না দিনকাল
দৃষ্টির ভেতর প্রসন্নতা রাখো
ওই ভয়ংকর মুখোশগুলি সরিয়ে নাও।

আজ আমার খুব যন্ত্রণা
আজ আমার নীল রঙ গাঢ়তম হয়ে উটেছে
মুখোশগুলি সরিয়ে নাও অলৌকিক শহরে জেগে উঠবে
পচা-মজা ওই নর্দমার ভেতর
এতকাল রেখেছো কেন দরোজা বন্ধ করে
করে প্রতিরোধ কিসেরই বা প্রতিবাদ ?
কালো দেওয়াল থেকে মুখোশগুলি সরিয়ে নাও
ব্যর্থতার পর যেদিন প্রথম সফলতা আসে মানুষের
প্রথম সেই অনাবিল আনন্দময় মুহূর্ত
অলৌকিক মেঘ সরিয়ে রোদের মতন হেসে ওঠো
মুখোশগুলি বড়ো বিরক্ত করছে
ওগুলি সরিয়ে নাও অনাধুনিক ধুলোয় আমি শুয়ে থাকব
সমস্ত জীবন।

প্রসূতিসদনের সামনে

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শববাহকেরা এইমাত্র শ্মশানের দিকে চলে গেল
মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে সূর্য

প্রসূতিসদনের সামনে
সদ্যোজাত শিশুটিকে দুহাতে জড়িয়ে
তার মা ট্যাক্সিতে বসে

রাস্তার গলা পিচে টায়ারের দাগ
লেগে থাকলো একমুঠো খই

শ্মশানযাত্রীরা ঐপথে ছড়িয়ে গিয়েছে।

সূর্যাস্তের আগে

[উপলক্ষ্য : লেখা মজুমদার]

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

ঘরে ঘোমটা দেওয়া ঝিমধরা আলো
পথের সব শব্দকে
গলা টিপে মারার ইচ্ছেয়
দরজা জানলায় নিঃশব্দ-কুলুপ
ঘর বারান্দা আবার ঘরে
ঘোরাফেরা উদ্বিগ্ন মুখের ঘূর্ণি
কৃষ্ণচূড়ার ঝুপসি পাতায়
যাই যাই-বর্ষার মৃদু টোকা
মূহ্যমান বাতাসে উড়ছে
ডেটল-ফিনাইলের মিশ্র জিঘাংসা
সবার কান যখন মারু-বেহাগের জ্বালায়
পার্ডের সবুজ নিশানে তুমুল ঝড়
নিমীলিত চোখে তখনও তুমি খুঁজছ
খাঁসাহেবের ভৈরবী ঠুংরির রেকর্ড।

প্রগতি

আনন্দ ঘোষ হাজরা

যতই সভ্যতা এগোচ্ছে, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হচ্ছে। খুব সাধারণ তুলনায়, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। অর্থাৎ জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিটি বস্তুকে, প্রতিটি ঘটনাকে আরো পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারছি। যেমন ধরুন, এখন মানুষের হাড় আর শুকনো গাছের ডালে কোনো পার্থক্য নেই। শুকনো গাছের ডাল যেমন মট্‌মট্‌ ক'রে ভাঙা যায়, মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর হাড়কে শুধু ভেঙে ফেলা কেন, চিবিয়ে গুঁড়ো করা যায়। তাছাড়া রক্ত? প্রাণীর রক্ত আর জলের মধ্যে বাস্তবিক কোনো পার্থক্য নেই। অনেক প্রাণী আছে যাদের রক্ত লাল নয়, শাদা। সুতরাং জলের মতো খুব সহজেই রক্ত পান করা যায়। দুঃশাসনের রক্তপান আজ আর মিথ মনে হয় না। মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর আন্তরানুভূতির বাহ্যিক প্রকাশও একটা যান্ত্রিক স্নায়বিক বিকার ছাড়া কিছুই নয়। দেখবেন, এক একজন মানুষ মুখভঙ্গি করলে মুখমণ্ডলটা নরম কাদার ওপর পদচ্ছাপের মতন দেখায়। বস্তুতপক্ষে, এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের পাঁজর ফুটো ক'রে গুলি চালানো আর দেশলাই কাঠি জ্বালা এখন একই কথা।

যতদিন যাবে আমাদের জ্ঞানসম্পদ এইভাবেই বেড়ে বেড়ে যাবে, বেড়ে বেড়ে যাবে······

স্রোত

অশোক দত্তচৌধুরী

খুব ভোরবেলা বৃষ্টি নেমেছে
আব্‌ছা আলোর গর্ভের থেকে স্বর্ণ-শিহর মায়া—
কানে-কানে বলে, 'শুয়ে আছো কেন?
আমি কি এনেছি অন্ধ-কারণ?'

অধ্যবসায়ী শিখার মেদুরে, উঠে আসে মুখ
মৌর্য নারীর কজ্জল নিয়ে, অমোঘ পিতা
আমার পুরুষ ছোঁয়।

অপ্রতিহত স্রোতে শোক-ভালবাসা আজ—
বিকিরণে দেখি, নীল।

এই মুহূর্ত

তুষার চৌধুরী

তোমার নিজের কথা বলো
নমুনা ছড়িয়ে আছে, তুমি শুধু তোমার নিজের কথা বলো
কল্পনাপ্রবণ দীর্ঘ হাতের আঙুল
কি কথা শোনাতে চায় ?
ঊর্ধ্বে নিম্নে ঈশানে নৈর্ঋতে
স্তূপাকার শুধুই নমুনা
কালো শাদা হলুদ বাদামী ওরা সব একাকার হয়ে আছে

স্বপ্নজীবী ছায়ার ভেতরে পলকা বেতের খিলেনে
আজো ফোটে ঝুমকোলতা ? অশরীরী কিশোরীরা দুলে দুলে হাসে ?
এখনো তোমার রক্তে ঢোকেনি দস্তার নুন শিকারীর শ্বাস ?
কী তোমার ইতিহাস? বলো কী তোমার ইতিহাস ?
শুয়ে আছো বাথটাবে, ফেটে যাচ্ছে সাবানবুদ্বুদ
মারিয়ার ক্লোরোফিল মারিয়ার আমিষগম্বুজ
উল্লাসের হাসপাতালে বাতি জ্বালে—এ তোমার প্লুত পরবাস ?
রঙিন পুরুষ নারী শিশু ছাতা কুকুরের ভিড়ে মোলায়েম
রেশমসৈকতে যদি কল্পনাপ্রবণ
তোমার আঙুল কাঁদে, সেসব কান্নার কথা বলো

নমুনা অনেক আছে, এ-মুহূর্তে তুমি শুধু তোমার নিজের কথা বলো।

মনুর সন্ততি

কৃষ্ণা বসু

এসব তুমি ঢাকবে বলে মানবসন্ততি,
মুখের ভিতর হলুদ হাড় আর হাড়ের মধ্যে অতি
গোপনচারে শীত ঢুকেছে শীত খেয়েছে শাদা
হাড়ের ভিতর মজ্জা ও সার হাড়ের মধ্যে কাদা ;
সময় তীব্র হাতে রেখেছে সময় জাগে ধীরে,
বিনিদ্র রাত লবণ কিছু খরিদ করো-নি রে।
ঘুমের মধ্যে ঘুমের জলে ঘুমের গাঢ় দেশে
এবার যাবো লবণ নেবো সেই লাবণ্যে মেশে
পরিশ্রুত স্বভাবধর্ম খরার অবশেষে
মাঠ থৈ থৈ বৃষ্টি আসে তীব্র লাজুক হেসে।
কিন্তু হাড়ের কী হয়েছে ? ঘোচে না কেন শীত ?
হাড়ের মধ্যে বইছে হাওয়া এমন বিপরীত !
শীত করেছে যাওয়া-আসা, শীত পেতেছে জাল,
মনুর ছেলে, জানলা খুলে রাখো, ছাখো, কাল
জেগেছে ঐ, বসন্তকাল, তোমার আমার ? কার ?
নাই বা হল। এই বসন্ত মানবসভ্যতার !

পেরেস্ত্রোইকা—'দ্বিতীয় সোস্যালিস্ট বিপ্লব' ?

গোপাল হালদার

১৯১৭-র ৭ অক্টোবর রুশ বলশেভিক পার্টি ও লেনিনের নেতৃত্বে 'দশ দিনে পৃথিবী কাঁপিয়ে', রুশ দেশে ঘটেছিল সোস্যালিস্ট বিপ্লবের সূচনা। সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রথম ভিত্তি স্থাপনা তার ফল, সোস্যালিস্ট রুশ রাষ্ট্রে রূপ পায় সেই সোভিয়েত সিস্টেম। সত্তর বছর পার করে তিন-চার বৎসর ধরে পৃথিবীতে নানা তর্কের তুফান তুলেছে—১৯৮৮-র জুলাইতে চার দিন ধরে সেই পার্টি (এখন নাম সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি) তার মহাসম্মেলনের পরে যে কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছে তা নিয়ে। সম্প্রতি আমেরিকার একটি (না একাধিক ?) সংবাদপত্র জানাচ্ছে—এবার সেই পার্টির আয়োজনে আরম্ভ হয়েছে 'দ্বিতীয় সোস্যালিস্ট বিপ্লব'। কথাটায় এবার কিন্তু পৃথিবীতে ভয়-বিস্ময়ের উৎকট কাঁপুনি ধরে নি। কিন্তু প্রশ্নের বিচারবিবেচনায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে সোভিয়েত-অনুরাগী ও সোভিয়েত-বিরাগী বিদ্বেষী গবেষকদের মাথা ধরেছে—সত্যই তো, ১৯১৭-র পর সত্তর বৎসর কেটে গেছে। অনেক বাধা-বিপত্তি, গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর গুপ্ত চক্রান্ত, হিটলারী সোস্যালিজম বিরোধী বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের একটানা বজ্রাঘাত সহ্য করেছে সৃষ্টিছাড়া সোভিয়েত দেশ। এখনো হার মানে নি। আজকের দুনিয়ায় সোভিয়েতের নামে কোনো বিভীষিকাও আর নেই। সোভিয়েত দেশের পক্ষেও পৃথিবীতে বুর্জোয়াদের সোভিয়েত নিপাত-যজ্ঞের সে অসহায় বলি হবার মতো সম্ভাবনাও আছে কি ? এমন কি, পারমাণবিক যুদ্ধ বা নাক্ষত্রিক মহাসমরে অবলুপ্ত হবার মতো সম্ভাবনাও সোভিয়েত শক্তির আছে কিনা সন্দেহ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকের হিসাবেও সোভিয়েত শক্তিকে আজকের জগতে সম্মানিত স্থান দেওয়া হয়। সেই ষাট বৎসরের সোভিয়েত ব্যবস্থায় তাই মনে হয় তার সোস্যালিজম ক্ষেত্রে উল্টে হলেস ব্যবস্থার ওলট-পালট ঘটিয়ে 'দ্বিতীয়

বিপ্লব' ঘটাবার প্রয়োজনটা কী সোভিয়েতের ? পরিকল্পিত আয়োজনটারই বা রূপ কী ?

এসব প্রশ্ন নিতান্তই অকারণ নয়—এ কথা অত্যন্ত সত্য, অন্তত এ লেখকের মতো সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির ভারতসন্তানরা সোভিয়েত তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই, তার সম্বন্ধে যদিও আগ্রহশীল। আমরা জানি, সোশ্যালিজমের কঠোর পরীক্ষা সোভিয়েত দেশ করেছে, অথবা, অন্য ভাষায়, মার্কসবাদী সোশ্যালিজম কমিউনিজমের আবর্তন-বিবর্তন লেনিনের সময় থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থায় চলেছে—তাকে আমাদের বিস্ময়েরই সঞ্চার করেছে। নানা হেরফেরের মধ্যেও, সময় সময় ব্যাহত হলেও, মূল ধারাটি বাহিত হয়েছে এই সত্তর বৎসর—তাতে যেমন আগাগোড়া বিভ্রান্ত মনে করি নি, তেমনই একেবারে অভ্রান্তও মনে করি নি সব দিকে সব ব্যাপারে। ভুল তারা কম করে নি, সব সময় সত্য প্রচার তারাও করে নি। মিখাইল গোর্বাচভের পন্থা কি তাই রিফর্মিজম বা রিভিসনিজম ? ভাবতে দ্বিধা হয়, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ভুল, ঠগবাজি করছে কি ? মার্কসবাদের নামে দেশের সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে ও পায়ে থেঁতলিয়ে একটা ধূর্ত ব্যুরোক্রাসি দুর্ধর্ষ স্বৈরতান্ত্রিক পার্টি (শ্রমিকশ্রেণীর ডিকটেরশিপের নামে) আত্মছলনা ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবতাকে প্রবঞ্চনা করছে—একথাও ভাবতে পারি না।

ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সীমিত চেষ্টায় যতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে করি—গোর্বাচভের নীতি মোটামুটি বোধ হয় সেই ষাট বৎসরের ধারার ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করে এখন আবশ্যকমতো মোড় ফেরাতে চায় যে ব্যবস্থাটা, তা দ্বিতীয় 'বিপ্লব' কিনা জানি না, কিন্তু ঠিক মতো রূপায়িত হলে ('ঠিক মতো' কথাটা কিন্তু ভবিষ্যতেও দ্রষ্টব্য) মার্কসবাদকেও বিশুদ্ধতর প্রয়োগ পদ্ধতির (Practice method) সন্ধান দেবে। সোভিয়েত সোশ্যালিজমকে লেনিনের নামে ভুলচুক আঁকড়ে না থেকে সুস্থ ও সুস্থির কর্মে চিন্তায় চালিয়ে নিয়ে যাবে। সত্যই মোড় ঘুরিয়ে সোশ্যালিজমের বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলবে। মোটামুটি 'গ্লাসনস্ত', 'পেরেস্ত্রোইকা' ও 'ডিমোক্রাটিক' কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এই ধারণাটি হয়তো মূঢ়ের স্পর্ধা বলে মনে হচ্ছে।

কথাটা তবু বিচার করতে চাই—বুঝতে চাই কি তার প্রয়োগ।

ভূমিকাটি দীর্ঘ হচ্ছে, তবু আর একটা কথা মনে রাখা দরকার—১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লবের সময় থেকে প্রায় মহাযুদ্ধের শেষপর্ব (১৯৪৪-১৯৪৫) পর্যন্ত সোভিয়েত সমাজের যথার্থ অবস্থা জানা, বুঝা ছিল দুঃসাধ্য। কারণ, প্রথম

থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র ধনিক রাষ্ট্রের চেষ্টা ছিল অপপ্রচারের দ্বারা সোস্যালিজমের এই প্রথম ঘাঁটি সোভিয়েত দেশকে বিনাশ করা, অন্তত সভ্যতা ও মানবতার শত্রু বলে সোভিয়েতকে চিহ্নিত করে রাখা—যা সম্ভব হয় নি, বলাই বাহুল্য। আবার বিপ্লবের সময় থেকে বিপ্লবী সোভিয়েত ঘটনা, অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজেদের কোনো সংবাদ দেশের সাধারণের নিকট গোপন করেছে, বাইরের পৃথিবীর সব লোককেও জানতে দেয়া হয় নি—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বা যাকে আমরা Free Press বলি তখন থেকে সোভিয়েত শাসক তা চাইত না। তাদের যা শাসনকার্যে প্রয়োজন তেমনি সরকারী ইস্তাহার তুল্য সংবাদপত্র তারা নিজেদের অভিপ্রেত নীতিতে পরিচালনা করা, তার ষোল আনা, মালিকানা থেকে পরিচালনা পর্যন্ত, সবই সরকারের ও সরকার অন্তর্ভুক্ত বিভাগের অধীন (যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, সৈন্য বিভাগ প্রভৃত)। অর্থাৎ সোভিয়েতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রকারান্তরে সমস্ত জনসাধারণকে পৃথিবীর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত করে তাদের অন্ধকারে আটকে রেখেছিল, সোস্যালিস্ট ডিমোক্রেসি ছিল তাদের ভাবনার অতীত। তাদের সংবাদপত্রে বাইরের জগতের বেশি আস্থা ছিল না। কাজেই সত্যই সে সমাজের সংবাদ যথার্থ জানা বোঝা, সোভিয়েতের প্রতি প্রীতিপূর্ণ বিদেশীর পক্ষেও ছিল দুরূহ—তা সোভিয়েতের সরকারী প্রচারিত সংবাদ বা বিবরণ বিশ্বাস করলে দেখা যায় সময়ে সময়ে ঠকতে হয়। আবার বুর্জোয়া জগতের সোভিয়েত বিষয়ক শুধু অপপ্রচার প্রায়ই ছিল জলে মিশ্রিত দুগ্ধ বা জলে মেশানো ঘোল।

এভাবে সোভিয়েত সম্বন্ধে আমরাই যে শুধু সঠিক ধারণা করতে পারিনি তা নয়, সোভিয়েত জনসাধারণও বঞ্চিত। এ সন্দেহ স্বাভাবিক, গোর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পর একটু একটু করে মুক্তদ্বার (গ্লাসনস্ত) পদ্ধতির দিকে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এগিয়ে যান। তাতে সে সময় থেকে সোভিয়েতের সংবাদ সংগ্রহ অনেকটা সহজ হয়েছে—আমেরিকার মত গোঁড়া পুঁজিবাদী দেশও বহু পরীক্ষার পরে কখনো কখনো তা স্বীকার করে। গত পার্টি সম্মেলনে তো সে দেশের ও বহু দেশের সাংবাদিকরা ডজনে ডজনে উপস্থিত থেকে সোভিয়েতের সাধারণ মানুষের মনোভাব জানতে পেরেছেন। তাদের সেসব বিবরণ দেশে বিদেশে প্রচারও করেছেন। নিশ্চয়ই বলা যায়, সোভিয়েত সমাজ সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ ও তথ্য জানা আজ আর দুঃসাধ্য নয়। অবশ্য সোভিয়েত প্রচারিত সে দেশের নানা বিষয়ের পুস্তিকা, পত্রিকার এখন অভাব নেই। সেসব এখন অবিশ্বাস করারও কারণ নেই। পৃথিবীর সব দেশের

অবস্থা এখন এত জটিল, পরিশ্রম ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে সকল সংবাদেরই মূল্য বিচার করতে হয়—তবু ভুল ঘটতে পারে। কারণ, মার্কসবাদও ঠিক বুঝেছি কিনা সন্দেহ। সোভিয়েত কি তার সত্য পরীক্ষা করছে ?

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো এ ভূমিকাটি এবার শেষ করি।

মার্কসবাদী সমাজবিপ্লব শুরু; ফেব্রুয়ারি ১৯১৭। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে (১৯১৪—১৯১৮) প্রথমেই ভেঙে পড়ল জারতন্ত্রের পচ ধরা রুশ রাষ্ট্র। গোড়াতেই তার সৈন্যরা, যারা যুদ্ধ করতে থাকে, অধিকাংশই ছিল ক্ষেতের কৃষক। যুদ্ধের জন্য যথোচিত অস্ত্রও তাদের দেওয়া হয় নি। জোর করে জারশাসক পাঠিয়েছিল যুদ্ধে মরতে। তারা রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ নয়, চাইছিল শান্তি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদ্রোহী হয়ে ফিরছিল। অন্য দিকে দেশের মধ্যে খাদ্য বস্ত্রের অভাব—সাধারণ মানুষও তখন সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের দাবি, রুটি, শান্তি, জারতন্ত্রের নিপাত। জারতন্ত্র বরবাদ করে তখন রাশিয়ায় সরকার বিরোধী পার্টিগুলির মধ্যে মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মেনশেভিকরা সোস্যাল রিভোলুশানি শাসন ক্ষমতা চালাতে থাকে: রাজতন্ত্রে যেমন শোষকদের শোষণ বজায় রাখা হয়, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব না করা—এই ছিল তাদের কাজ। না ছিল তাদের যোগ্যতা, না সংকল্প। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করল লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বলশেভিক পার্টি। রুশ সোভিয়েতের চালক হয়েছে তখন কমিউনিস্টরা। তারা মার্কসবাদী সোস্যালিস্ট—প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। যুদ্ধ বিরোধী সৈনিক (কৃষক) ও শহরের নানারূপ শ্রমজীবী, এরা এই কমিউনিস্ট শ্রমিক-পার্টিতে যোগ দিচ্ছিল। তাই রুশ বলশেভিক (কমিউনিস্ট) পার্টির ক্ষমতা ও শক্তি বাড়ছে, এবং গোঁড়া মার্কসবাদী হিসাবে তারা চায়, অবিলম্বে যুদ্ধ ত্যাগ, শান্তি স্থাপন, বুর্জোয়া সামন্তদের ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া, সোস্যালিজমের প্রবর্তন। তাদের বুদ্ধি, সংখ্যা বৃদ্ধি, সংগঠন শক্তি, দুর্দমনীয় সংকল্প প্রভৃতির জোর ছিল। লেনিনের নেতৃত্বে এই রুশ বলশেভিক(কমিউনিস্ট) পার্টি নভেম্বরে রাষ্ট্র ক্ষমতা সবলে দখল করলে পর দিনই বেরুল তাদের হুকুম—যুদ্ধ বন্ধ। সোস্যালিজমের নীতি-অনুযায়ী দেশের কলকারখানা দোকানপত্র প্রভৃতির মালিকানা শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র গ্রহণ করছে। মুনাফাবাদ বরবাদ হল। দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তি—জারের নিজের, সামন্ত শ্রেণীর বড় বড় জমিদারের মালিকানা রাষ্ট্রের, চাষী-কৃষকরা যে যা জমি চাষ করত—এখন

সরকারের অধীনে তারাই তার চাষের অধিকারী (জমির ফসল উৎপাদনের কর্তা)। দেশের যাবতীয় সম্পত্তি জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রের (যে রাষ্ট্রের শাসক হল বিপ্লবী সোভিয়েত) শ্রমিক, সৈনিক, দরিদ্র কৃষকের সম্মিলিত সমিতির (সোভিয়েত) আওতায় আনা হয়। সোভিয়েতসমূহে তখনো অন্য পার্টির লোক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু সংখ্যাধিক্যে প্রাধান্য ছিল রুশ কমিউনিস্ট পার্টির। সোভিয়েত হয় রাষ্ট্রশাসন কাউন্সিলের নেতৃত্ব।

এরপর শুরু হল সোভিয়েত সোস্যালিজমের (মার্কসবাদী তত্ত্বের) রূপায়ণ—মার্কস-তত্ত্ব অনুসারে বিশেষ প্রয়োজনে তার পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনও। একটা কথা বোঝা দরকার—নীতি মার্কসবাদ, এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি, লেনিনের নেতৃত্বে (১৯১২) যা গড়ে উঠছিল, মার্কসবাদে তা ১৮৮৮ থেকেই পরিষ্কার ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই বিশ্বদীক্ষা—এখানে তার সাধারণ ব্যাখ্যা করলেও অন্তত এক-আধ শত পৃষ্ঠা দরকার। আমরা তা ছেড়ে সংক্ষেপে কতকটা বলছি। প্রথমত, বিজ্ঞান ও দর্শন অনুযায়ী মার্কসবাদের প্রথম পর্বকে বলা যায় (১) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (dialectical materialism)—অনাদিকাল থেকে জগৎ প্রপঞ্চ বস্তুময়, সেই বস্তুর মধ্যে দুইটি বিপরীত অংশের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বজাত ব্যক্তিত্ব, তার সব গতিময়। এবং তাই বস্তুময় প্রকৃতির ক্রমবিকাশ—সূর্য বা পৃথিবী—(২) সেই বিকাশের মধ্যেই ক্রম-উর্দ্ধ্বত জীব উদ্ভব, তারও দ্বন্দ্বময় বিকাশ মানুষ, সেই মানুষের দ্বান্দ্বিক বিবর্তনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—দ্বান্দ্বিক আর্থিক জীবনের মধ্য দিয়ে তার সভ্যতার উদ্ভব।

সোভিয়েত আবর্তন-বিবর্তনে সোস্যালিজম

অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (তাদের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মত) যখন তথাকথিত মেনশেভিক (ক্ষুদে শাখায় চালক) সোস্যালিস্ট কেরেনস্কির হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে—তখন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্যে রুশ দেশে মার্কসবাদী সোস্যালিজম কি পদ্ধতিতে রূপায়িত হবে, অন্তত গোর্বাচভের পূর্ব পর্যন্ত এই পার্টি চালিত সোভিয়েত গবর্নমেণ্টে প্রশ্নটি আবর্তিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশদ বলা অসম্ভব—পার্টির ইতিহাস যা পাওয়া যায় তা নেতৃত্বের খুশী মতো বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে, বিশেষত স্টালিনের দৃষ্টিভঙ্গি মতো—তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কথা কখনো একেবারে বাদ দিয়ে নেতার তৎকালীন আবশ্যক মতো তাঁর নীতি কীর্তিকথা যোজনা ক'রে। কাজেই সে ইতিহাস কখনো নিরপেক্ষ বিবরণ নয়। তবু তার থেকে

সোভিয়েত শাসনের ও তার শাসিত সোস্যালিজমের আবর্তন-বিবর্তনের ধারার কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের শত্রুপক্ষীয় লেখা কিংবা অন্যদেশীয় সোস্যালিজম সমর্থকদের লেখা দিয়ে (যথা ই সি কার-এর) রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, ওবের দম্পতির লেখা 'সোভিয়েত সোস্যালিজম' প্রভৃতি) সে সঙ্গে তুলনা করে দেখাও সঙ্গত। কিন্তু বিশদ ভাবে এসব প্রমাণপত্র পরীক্ষা এখানে অসম্ভব—আমরা দু-এক পৃষ্ঠায় তার মাত্র সেইটুকু উল্লেখ করতে চেষ্টা করতে পারি, যা এ স্তরের 'গ্লাসনস্ত,' 'পেরেস্ত্রোইকা', 'ডেমোক্রাসি'-র আলোচনার জন্য না বুঝলে নয়।

সার্থক সূচনা

প্রথমত মনে রাখা উচিত, রুশ কমিউনিস্ট পার্টি তখনো সর্বপ্রধান পার্টি নয়, শ্রমিক সদস্য সামান্য। সমস্ত রুশিয়াতে শিল্পোদ্যোগ বেশি নয়, শিল্প-শ্রমিকও তাই সংখ্যায় প্রবল নয় (রাশিয়া তখনো কৃষকের দেশ), তবে তা পরিপুষ্ট ও বড় হতে যাচ্ছে যুদ্ধত্যাগী রুশ সৈনিক দ্বারা ও প্রধান প্রধান শহরের দরিদ্র-সাধারণের ক্রমিক যোগদানে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত অন্নবস্ত্রহীন জনসাধারণ শান্তি চাইছিল, রুশ কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সমর্থনে জোরদার হতে থাকে। আর বিপ্লবী নীতিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত করে এরূপ রুশ কমিউনিস্ট পার্টি—শহর গ্রামের কৃষকের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ প্রবল হয়। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবে তাদের পার্টির নেতাদের নির্দেশানুযায়ী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে দ্বন্দ্বের ফলে বিশ্বব্যাপী গতিময়তা নিত্য পরিবর্তন, জীবের দেহমনেরও বুদ্ধিরও তাই বিকাশ ঘটতে থাকে, কিন্তু আসল মূল হল দ্বান্দ্বিক বস্তু। জীবের জীবন খাদ্যবস্তু, প্রভৃতি বস্তুর প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। সভ্যতার গোড়ার কথা তার আর্থিক জীবন—অন্যান্য জিনিশ অর্জন। যতই দেহমনের চেষ্টায় জীবনযাত্রা উন্নত হচ্ছে—দ্বান্দ্বিক বস্তুময় তার নিয়মে নতুন নতুন সভ্যতার স্তর দেখা দিচ্ছে—সেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের একই নীতির নাম। প্রতি বস্তুর আর্থিক দ্বন্দ্বময়তা এক স্তর ছাড়িয়ে অন্যস্তরে উন্নত হচ্ছে। ইতিহাসে আদি সমাজ একযোগে চলত, ক্রমে দেখা গেল কর্মের ক্ষেত্রে বিভাগ দরকার। তথা একদলকে চালনার ভার দিতে হয় পক্ষ-বিপক্ষ—রাজাপ্রজাকে।

অলস শোষকদের অলসতায় ক্রমে উৎপাদন যখন ইপ্সিত ভাবে বাড়ে না,

তখন দেখা দেয় দু'শ্রেণীর শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রমিকের অনিবার্য দ্বন্দ্ব—এই শ্রেণীভেদ মূলত সেরূপ শ্রেণীদ্বন্দ্বেই রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, যা বিভিন্ন স্তর ছাড়িয়ে সমাজে চলে। উন্নতির প্রয়োজনেই শ্রমিকের শ্রমশক্তির সহায় নিয়ে দেখা দিয়েছে পুঁজিতন্ত্র। কলকারখানার মালিকেরা মুনাফার তাগিদে পাগল-পারা। তাদের কারখানা এমনই, যেখানে একত্রিত হয়েছে বেশি বেশি শোষিত শ্রমিক। মালিকে-শ্রমিকে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়। শোষিত শ্রমিক-শ্রেণীর প্রয়োজন এই শোষক পুঁজিশক্তির বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। শ্রম-বিপ্লব অর্থ সেইসব কলকারখানা শ্রমিক শ্রেণী আয়ত্ত করে। সমস্ত শক্তি সমাজআয়ত্ত করে উন্নতিতে এগিয়ে চলে। শ্রমিকরা তো সমাজ-উৎপাদক শক্তি। শ্রমিকতন্ত্রের এই ক্ষমতালাভে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে। মালিকের কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের বিলোপ অনিবার্য। তারা যাবে, কারণ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিয়মে এই পরিণাম—উন্নতিরই জন্য অনিবার্য শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব সমস্ত পৃথিবী জুড়ে, যতই কলকারখানা, শিল্পোৎপাদন ও সভ্যতা বাড়বে, ততই পুঁজিবাদের প্রয়োজন কমবে। শ্রমিকশ্রেণীও সর্বত্র বিপ্লব-অগ্রসর হবে। তারা ক্ষমতালাভ করলে আর পুঁজিপতি প্রভৃতি শোষক শ্রেণী থাকবে না—সমাজে শ্রেণীভেদ অনাবশ্যকীয় বলে লুপ্ত হবে—সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। উৎপাদনে সরকারির কর্তৃত্ব, সমাজে সকলে সমান, শোষণহীন সেই ন্যায়সম্মত পথে দণ্ডমুণ্ডের রাষ্ট্র নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্র উঠে যাবে। সাম্যতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণী পরস্পরে মিলে সমাজ চালনা করবে। মার্কসবাদের ওপর বিশ্বাস না করা হাস্যকর। তাই কি বুঝা গেল—লেনিনপন্থী বিপ্লবীরা এবং শ্রমিকদের সহযোগী করণে সৈনিক, দরিদ্র শ্রমজীবী, যারা মুক্তি চাইছিল সামন্ততন্ত্র পুঁজিতন্ত্র থেকে, তারাই ডিকটেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত—শ্রমজীবীর শাসন পরিচালিত করছে? সেই পর্বের বিপ্লবী-শ্রমিকরা সংগঠিত হয়েছিল কিভাবে? সেই সোভিয়েতের নীতি অর্থাৎ একেবারে গোড়ায় সাধারণ শ্রমিকশ্রেণী সোভিয়েতে গণতান্ত্রিক নীতিতে নির্বাচন করবে। কিন্তু নির্বাচনের পরে নেতাদের আদেশেই চলবে সোভিয়েতের সকল সদস্য। ক্রমশ একচ্ছত্র আধিপত্য নেতৃত্বের হাতে এসে যাবে।

স্বাধীন ভাবনারও ছিদ্রপথ—দেখা দিল—কারণ রাষ্ট্রানুমোদিত যা আবার মূলত স্তালিন অনুমোদিত সংবাদপত্র ছাড়া সোভিয়েত দেশে কোনো সংবাদ-পত্র, প্রকাশ, মুদ্রিত পুস্তিকা, গ্রন্থ কিছুরই স্থান রইল না (স্তালিনের মৃত্যুর পরে এই রুদ্ধ গৃহ কিছু কিছু খুলে আসতে পায়, কিন্তু তাও বিশেষ অনুগ্রহে)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেও বাইরের পৃথিবীর প্রতি সোভিয়েতের নাভিশ্বাস কমল না—জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষ করে মহাকাশ-বিজ্ঞান ও সমরাস্ত্র, মারণাস্ত্র প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানের শাখায় যে অগ্রগতি—সে সময়ে সোভিয়েতে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। তেমনি লক্ষণীয় এই সত্তর বৎসরে মানবীয় বিদ্যায় তার ক্রমশ কৃতিত্বহীনতা গতিশিথিলতা—যদিও ব্যালে, সঙ্গীত ও নাটকে এখনো তাদের নিপুণতা আছে। আর আছে খেলাধুলোয়। কিন্তু তাছাড়া দেখা যায়—সোভিয়েত নরনারীর বিসদৃশ অর্থ-লোভ, বিশেষ করে 'ডলারের' নামে বিকৃত প্রলোভন। বিদেশীয় ভোগ্যদ্রব্যের জন্য উচ্ছ্বাস ও প্রকাশ্য লোলুপতা। সোস্যালিজম্ তাদের দিয়েছে সাধারণ সহজতা, অকৃত্রিমতা সরলতা, সার্বজনীন মানবতা ও মানবীয়গুণ, এ সত্ত্বেও সোস্যালিস্ট কালচারের যে কোনো উচ্চ আদর্শ ও শ্রী আছে তা তাদের লোভ দেখে মেনে নেওয়া কঠিন। তবে পৃথিবীর সব দেশের মতই মানুষ সেখানেও মানুষ—সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে স্নেহ-প্রীতি সৌহার্দ্যে আস্থা আবার এরই পাশাপাশি শহর কলকারখানা অঞ্চলে পুঁজিবাদী দেশের মানুষের মতই হৈ-হৈ ফুর্তি, আধুনিক যুগের ভোগলিপ্সা—নিজের গায়ে না লাগলে কী হচ্ছে দেশের সে সম্পর্কেও, শাসনতন্ত্র, আর্থিক অবস্থার জন্যও কোনো মাথাব্যথা নেই—এমনকি মুখে সবাই সত্যবাদী অথচ Socialism-এর হাল সম্বন্ধেও খোঁজখবর রাখেই না। জানা গেল, ষাট বৎসর যে ভাবে চলেছে, গত দশ বছরে তা আর চলে না। উৎপাদনে ভাঁটা পড়েছে, আর এখন দেখা যাচ্ছে—হিশেবে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর আর্থিক, যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় পূর্বেকার গতি খুইয়েছে। এমন কি, গড়পড়তা দেশের মানুষের শিল্পও হ্রাস পাচ্ছে। যে অর্থনৈতিক অবস্থাই মানব সমাজের সংস্কৃতির মানদণ্ডের প্রধাননিয়ামক বলে মার্কসবাদ, গত দশ বৎসরে তারও এসেছে শ্লথতা—উৎপাদনের গতি খর্ব হচ্ছে, তা বাড়তে পারছে না—প্রয়োগ-বিজ্ঞান কলকারখানার যন্ত্রপাতি উন্নত হচ্ছে না, যে ট্রাকটার-এর ব্যবহারে কৃষির উন্নয়ন হবে,—সোভিয়েত কারখানার সে ট্রাকটার প্রভৃতি সেকেলে, দুদিনেই অচল। মেরামতেও নেই গা। আর কালেকটিভ-এর উৎপাদন কমলেও কৃষককর্মীর নেই চৈতন্য—(মুনাফার সুযোগ না থাকলে কি এ দায়িত্ববোধ লুপ্ত হয়? রূপান্তরগত কৃষিক্ষেত্রের কর্মাগ্রহ দেখে তাই মনে হয়।) ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে সোভিয়েত অর্থনীতিতে 'পরিমাণ' quantity ছিল লক্ষ্য। দুর্দশাগ্রস্ত সোভিয়েত জীবনাচারে চাহিদা মেটানো সর্বাগ্রে দরকার। কিন্তু ষাট বৎসরের শেষেও সেই উৎপাদনে বিন্দুমাত্র গুণগত পরিবর্তন দেখা যায় না।

ক্রেতাদের অভাব অসন্তোষ এখন চাপা যায় না। সোস্যালিস্ট বিপ্লব কতদূরে? অবশ্য একটা কথা সুনিশ্চিত—চিরায়ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মুনাফা গড়ে তোলার পুরনো নিয়মকানুন, অতিকায় পুঁজিবাদে এখন টিকে থাকতে পারে না, সমাজতন্ত্রের পথ ছেড়ে দিতেই হবে। পুঁজিবাদের 'মার্কেট' প্রভৃতি ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেলে সমাজতন্ত্রকে আবিষ্কার করতে হবে। অর্থনৈতিক ভারসাম্যের কার্যকর নীতি, বোঝা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের আসল নীতি ষাট বছরেও ঠিক নির্মিত হয়ে উঠতে পারেনি। সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমস্ত বাঁধন একদিকে যেমন অনড়, অন্যদিকে ঢিলেঢালা—পার্টির নেতাদের জন্য স্বতন্ত্র বাজার, সেখানে অভাব নেই, আর কাজে তারা ফাঁকি দিতে পারে। এমনকি চোরাবাজারও নিষ্প্রয়োজন, কারণ বুরোক্র্যাসির চুরি, প্রবঞ্চনায় যেমন যথেষ্ট প্রবৃত্তি, তেমনি অবাধ সুযোগ। এ পালা এখানেই শেষ হোক, কারণ পালা প্রায় অন্তহীন। সহজেই বোঝা যায়—'পেরেস্ত্রোইকা' ও সোভিয়েত অর্থনীতি ঢেলে না সাজালেই নয়। কেন কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা হ্রাস করতে চাচ্ছে সোভিয়েত শাসনযন্ত্রের উপর?

এই সব পুঞ্জীভূত গলদের অবসান করার জন্যই সোভিয়েতের নতুন ব্যবস্থা—'গ্লাসনস্ত', 'পেরেস্ত্রোইকা' সকল দিকে ডেমোক্র্যাসি বা লোকমতের পথ গড়ে তোলা।

একি দ্বিতীয় বিপ্লব? না NEP এর সবই 'দুপা পিছিয়ে এক পা' অগ্রসরের নীতি? এই প্রয়োজনীয় সংস্কারে সোস্যালিস্ট সোভিয়েত সিস্টেম তার ক্রম ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সরিয়ে ফেলে মোড় ঘুরতে পারে পরিচ্ছন্ন সফল ভবিষ্যতের দিকে।

একটা কথা বোধহয় বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়—সোস্যালিজম অর্থ দ্বন্দ্বহীন অনড় অবস্থা নয়। সোস্যালিস্ট সিস্টেমে ছোট বড় স্ববিরোধ আছে—দ্বান্দ্বিক সংগ্রাম তাতেও অনিবার্য। তার ফলে গতিময়তা এবং স্তরের পর স্তরে সোস্যালিজমের পরিণতির দিকে অগ্রগতি। তাই সোস্যালিস্ট সিস্টেমের এই গলদ দেগে চমকানোর কিছু নেই—এই রূপ ওঠানামার (zig-g) মধ্য দিয়েই ইতিহাসের পথ।

গোর্বাচভ্ সেই একটা অচলতার মোড় ঘুরিয়ে এগুতে যাচ্ছেন, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য একই সংশয়ও আছে। সোস্যালিজমের প্রধান শত্রু তারই সৃষ্ট তার আমলাতন্ত্র (যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 'পোষ্যপুত্তুর') তারা কি দুর্বল? ক্রুশ্চেভের কথা স্মরণ করতে হয়—অবশ্য

পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ট

রণধীর দাশগুপ্ত

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে যখন বৃহৎ ও নতুন সমস্যাবলী দেখা দেয় তখন কেবল রাজনৈতিক নেতাদের নয়, জনসাধারণকে সেই সব সমস্যাবলী বুঝতে হয় ও বিশ্লেষণ করতে হয়। কারণ, মানুষের জীবন মানুষকে নতুন নতুন সমস্যাবলী চিন্তা করতে বাধ্য করে। মার্কস বলেছিলেন, যখন মতাদর্শ জনসাধারণকে নতুন ধ্যানধারণার দিকে আকৃষ্ট করে, ও প্রভাবিত করে, তখন সেই ধারণা একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়। বর্তমান কালে গুণগতভাবে নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক, শিল্প ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবকে নতুন চিন্তাধারার অন্যতম উৎস বলা যেতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবাচভ রুশদেশে অক্টোবর বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকীতে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তার প্রধান ভিত্তি হ'ল নতুন চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণা। এই নতুন চিন্তাধারা এই যুগের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলি এবং দেশে দেশ কঠিন ও জটিল সমস্যাসমূহকে এই নতুন চিন্তাধারার আলোকে বিশ্লেষণ না করলে তার সমাধান অসম্ভব। আবার সমস্যাবলীর সমাধানের প্রক্রিয়ার আরও নতুন নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব ও সংযোজনে আরও জটিলতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে অথবা সমাধানকে সহজসাধ্যও করতে পারে। অতএব উদ্ভাবনী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর না হলে আমাদের কালের বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলি সমাধানের পথ উপলব্ধি ও আবিষ্কার করা অসম্ভব।

কমরেড গোরবাচভ যে নতুন চিন্তা ধারার কথা বলেছেন, তার মৌলিক নীতিটি কি? বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন চিন্তাধারার মধ্যে 'সমাজতন্ত্রের সংকট' আবিষ্কার করেছেন; আবার বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন চিন্তাধারা 'পেরেস্ত্রোইকা','গ্লাসনস্ট'কে মার্কসবাদকে বর্জন করে শোধনবাদের দিকে পদক্ষেপ বলে অবহিত করছেন। তবে সমস্যা এত কঠিন ও জটিল যে কারো পক্ষে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কারো কাছে ইতিবাচক দিকটা প্রধান, আবার কারও কাছে নেতিবাচক দিক। তবে চিন্তার জগতে যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নতুন চিন্তা একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা পুরানো গণ্ডী অতিক্রম করে নতুন শিক্ষা লাভ করি এবং চির নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হই। যেমন পারমাণবিক যুদ্ধ, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আদর্শগত বা অন্যান্য লক্ষ্যে পৌছুবার উপায় হতে পারে না—বস্তুতপক্ষে এটা হল যুদ্ধ সম্পর্কে পুরানো চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যুদ্ধের রাজনৈতিক চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন উপলব্ধি না করলে যুদ্ধ ও বিপ্লব সম্পর্কে অতীত চিন্তাধারার অবসান হতে পারে না।

রুশো-জাপান যুদ্ধের পর রাশিয়ার ১৯০৫ সালে বিপ্লব হয়েছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে জারের পতন ঘটে এবং বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করে। ঐ একই সালে অক্টোবর মাসে শ্রমিকশ্রেণী ও বলশেভিক পার্টি লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে বিভিন্ন দেশে বিপ্লব হয়। এর ফলে তখন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জন্য যুদ্ধকে বিপ্লবের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার মনে করা হত। লক্ষ্য করা দরকার যে বিগত যুদ্ধগুলিতে মানুষ ও সম্পদের অভাবনীয় ও মর্মান্তিক ক্ষয়ক্ষতি হলেও মানবসভ্যতা বিলুপ্ত হয় নি। কারণ তখনও মানবসভ্যতাকে বিলোপ করার মত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি বর্তমান পারমাণবিক স্তরে পৌছায় নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার অভূতপূর্ব বিপ্লব চিন্তার জগতেও আর কোন কালে এরকম গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে নি।

অতএব অতীতকালে 'যুদ্ধ ও বিপ্লবের' ধারণা বর্তমানকালে অবাস্তব বলে প্রমাণিত হচ্ছে, যুদ্ধ সামাজিক বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য—এই ধারণা প্রাণী-জগতের বিলুপ্তির ধারণার সমার্থক। পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। ঐতিহাসিক অবস্থায় এই আহ্বান ছিল সঠিক, কারণ এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করা এবং আক্রান্ত দেশ সমূহের মুক্তির পথ। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি এমনই যে, যা এক যুগে ছিল সত্য তা পরবর্তী যুগে আর কার্যকরী হয় না। পারমাণবিক যুগ আর গৃহযুদ্ধে পরিণত করার যুগ নয়। অতএব পরিবর্তনশীল ইতিহাস তার পূর্বতন সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিয়েছে।

যুদ্ধ হল বিভিন্ন রাজনীতিকে চালিয়ে যাবার উপায় বা হাতিয়ার, উপায় বা পরিণতি—এই পুরাতন ধারণা বর্তমান কালে অচল। অথবা যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দুই বিপরীত সমাজব্যবস্থা আধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত তখন কোন কোন মার্কসবাদী মনে করতেন যে এই পরিস্থিতি অনিবার্যভাবেই সশস্ত্র

সংঘাতের দিকে বা পরস্পরকে আক্রমণের দিকে চালিত করবে। কিন্তু পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সীমিত করার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর পুরানো দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হচ্ছে। বরং অনুভূত হচ্ছে যে পারমাণবিক যুদ্ধে কোন পক্ষের জয়লাভ করা অসম্ভব। একমাত্র সম্ভব বিশ্ববিনাশ। অতএব বিশ্বস্বার্থে ও ও পারস্পরিক স্বার্থে কোন সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে বিভিন্ন মত, পথ ও ব্যবস্থা সত্বেও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান-সম্পন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে তোলাই বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত করার পথ। অর্থাৎ নিরাপত্তার প্রশ্নটি বর্তমান কালে অবিচ্ছেদ্য ও সামগ্রিক।

যখন সারা বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন সোভিয়েত নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে সামরিক সমতা বিনষ্ট হলে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে। কিন্তু যখন সামরিক সমতা অর্জিত হল তখন অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য না করে সোভিয়েত সামরিক খাতে অর্থ বিনিযোগ করতে বিরত না হবার ফলে আভ্যন্তরীন উন্নয়ন ব্যাহত হতে থাকল। উচিত ছিল সামরিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযান পরিচালনা করা বিশ্বব্যাপী। গোরবাচভের এই স্বীকৃতি নতুন চিন্তাধারারই প্রতিফলন। এই নতুন চিন্তাধারা কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, আভ্যন্তরীণ বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পেরেস্ত্রোইকা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং গ্লাসনস্ট

এগুলি কেবল বিশ্বব্যাপী পরিচিত শব্দ নয়। এই শব্দগুলির মর্মার্থ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ আলোড়ন থেকে দূরে থাকার অর্থ হচ্ছে বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকা। পেরেস্ত্রোইকার অর্থ কি? সমাজতন্ত্র নির্মাণের ইতিহাসে বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের জনজীবনে এর তাৎপর্য কোথায়? যুদ্ধ ও শান্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়?

পেরেস্ত্রোইকা একটা স্বতস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয় বা একটা নিছক অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা নয়। অক্টোবর বিপ্লব-এর জন্ম। এটা একটা নতুন ধরনের বিপ্লব। এতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন নেই। অক্টোবর বিপ্লবের যেমন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র নির্মাণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাম্যবাদে উত্তরণ, তেমনই সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে তা লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। পেরেস্ত্রোইকা সমাজতন্ত্রের মধ্যে অর্থনীতিবাদ নয়, বরং সমাজতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি, প্রসার, ঐ একই লক্ষ্যে পৌছুবার জন্য। এক কথায় বলতে গেলে এর অর্থ হল সমগ্র জনগণের ও সমাজের আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক ও মনন জগতের গুণগত পরিবর্তনের

বিপ্লব। এটা নতুন যুগের এমন একটা পথ যে পথে সাম্যাবাদে উত্তরণের দিক নির্ণয় করে।

একটা নতুন সমাজ নির্মাণের কঠিন পরিক্রমার পথে বহুমুখীন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আবার দ্বন্দ্বের তৎপর সমাধান না করে গোটা সমাজজীবনকে সংকটজনক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয়, উৎপাদন ব্যাহত হয়, শ্লথ হয়, দুর্নীতি, ঘুষ ও নানাবিধ সংকটজন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তত্ত্ব ও মতাদর্শগত অবহেলার জন্য সংকট গভীর হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে বহুলাংশে কলুষিত করে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার দরকার যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সব দ্বন্দ্ব সেই বিরোধ পুঁজিবাদী সমাজের মত বৈরীমূলক নয়। পুঁজিবাদী সমাজে বৈরীমূলক বিরোধই পুঁজিবাদের ধ্বংসের বিষয়গত কারণ। আর সমাজতন্ত্রে অ বৈরীমূলক বিরোধের সমাধানই হল অগ্রগতির সোপান।

সোভিয়েতে উৎপাদনীশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ শ্রেণী-সংগ্রামে প্রকাশিত হয় না। প্রকাশিত হয় চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে, উৎপাদন হ্রাসের মধ্যে, পণ্যমূল্য নির্ধারণের মধ্যে, পণ্যের মানের অবনতির মাধ্যমে লক্ষ্য করা উচিত পণ্যের মান সমাজতান্ত্রিক জগতে একটা অর্থনৈতিক প্রশ্ন নয়। এটা হল রাজনৈতিক প্রশ্ন, সমাজতন্ত্রের দক্ষতার প্রশ্ন, পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন। সমাজতন্ত্র মানে উদ্যোগ, চেতনাসম্পন্ন উদ্যোগ। উদ্যোগবিহীন সমাজতন্ত্র হয় না।

দ্বিতীয়ত একদিকে যেমন সর্বাধুনিক ও উচ্চমানের কলকারখানা আছে, তেমনই অন্যদিকে সেকেলে যন্ত্রপাতি সজ্জিত কারখানাও রয়েছে। স্বাভাবিক-ভাবে এধরনের কারখানায় উৎপাদন হ্রাস; উৎপাদিত পণ্যের মানও কম, কাঁচা মালের অপচয় আরও বেশি। উদ্যোগও কম।

অতএব আধুনিকরণ হল পেরেস্ত্রোইকার মূল কথা। এর অন্য অর্থ শ্রমিক ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৈনন্দিন মৈত্রী।

এর জন্য দরকার আধুনিক পরিকল্পনা, পরিচালন ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্রের বিনাশ, যাতে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়, শ্রমিকদের সুপ্ত উদ্যোগের স্ফুরণ হতে পারে। পেরেসত্রোইকা হল সোভিয়েত অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী হুকুমনামার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রবর্তন, উৎপাদনী সংস্থাসমূহে উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহ দান, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে তার বিকাশ সাধন

হল পেরেসত্রোইকায় জীবনীশক্তি। সাম্প্রতিক কর্মসূচীর প্রধান চালিকাশক্তি হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ। এই বিকাশে মানবশক্তি ও তাদের জ্ঞান; চেতনা ও সংগঠন হল প্রধান। তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যবস্থা, সমাজ ও প্রত্যেকের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অবিরাম প্রয়াস হল গণতন্ত্রের অঙ্গীভূত। পেরেসত্রোইকার সারমর্ম হল গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের প্রাণশক্তিতে পরিণত করা এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণে লেনিনবাদী ধারণাকে তত্ত্বে ও কর্মে পুনরুজ্জীবিত করা অন্যতম কাজ।

পেরেসত্রোইকাকে গ্লাসনস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। গ্লাসনস্ট হল গণতন্ত্রের স্ফুরণ, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের একটা রূপ, গণউদ্যোগ প্রকাশের জন্য রুদ্ধ দরজা বা আমলাতন্ত্রের লৌহ কপাট ভেঙে দেওবা। এটা সমালোচনায় নামে অরাজকতা সৃষ্টি নয়। কারণ এর পরিচালক শক্তি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি।

অক্টোবর বিপ্লব পেরেসত্রোইকা ও গ্লাসনস্ট এর বিবর্তন লক্ষণীয়, তেমন প্রসাসনিক ব্যবস্থার বিবর্তনও লক্ষ্য করা উচিত। নতুবা লক্ষ্যচ্যুত হবার আশংকা থাকে। স্থানাভাবে এই অংশটিকে খুবই সংক্ষিপ্ত করতে হল।

অক্টোবর বিপ্লবে প্রতিষ্টিত হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। এর ছিল তিনটি কাজ···দমনমুলক, গঠনমুলক ও শিক্ষামূলক। দমন করতে হয়েছিল প্রধানত কুলাকদের। বাদবাকি দুটো কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সমাজতন্ত্রের উপকারিতা উপলব্ধি করলেন। শোষণের শেষে শ্রেণীর এক নায়কত্বের রূপান্তর হল সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র হিসেবে। এ বিষয়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিরোধ ছিল। পেরেসত্রোইকা ও গ্লাসনস্ট এর প্রবর্তনের ফলে আরও বিবর্তনের সূচনা হল···সেটা হল Socialist self govt অর্থাৎ উন্নত সমাজতন্ত্র থেকে ভবিষ্যতে সাম্যবাদে উত্তরণের সোপান। বিশ্বের একপ্রান্তে এক নতুন ধরনের স্বাধীনতা ও সভ্যতা প্রবর্তনের সংগ্রাম চলেছে।

পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্ত

বাসব সরকার

পেরেস্ত্রোইকা আর তার জুড়ি গ্লাসনস্ত, এই দু'টি শব্দ একদা নিষিদ্ধ দেশ, 'পাপের সাম্রাজ্য' সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রায় রাতারাতি পশ্চিম দুনিয়ায় জাতে তুলেছে। বছর তিনেক আগে রুশ দেশের বাইরে তাদের কথা বিশেষ কেউ জানতো না। শুধু তাই নয় সোভিয়েতেও তখন এই দু'টি শব্দের ব্যঞ্জনা নিয়ে তেমন বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় নি। কিন্তু আজ একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমকালীন ধারণা সম্পর্কে এই দুটি শব্দ একটা প্রতীকধর্মিতা লাভ করেছে।

পেরেস্ত্রোইকা বা পুনর্গঠন আর খোলামেলা বা গ্লাসনস্ত বলতেই বোঝায় সোভিয়েত সমাজের সদরে অন্দরে মুক্ত বাতাসের অবাধআনাগোনার জন্যেই এই বিশেষ আয়োজন। ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর আন্দ্রোপভের সময় থেকেই পরিবর্তনের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল; গর্বাচেভের আমলে সেটা একটা গণভিত্তি পেয়েছে। আন্দ্রোপভ কিম্বা চেরনেন্কোর সময়ে যেটা ছিল মৃদু, ধীর গতি, গর্বাচেভের আমলে পুরানো ধাঁচের জীবনচর্যার বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা এসে পড়েছে ঝড়ের মাতন নিয়ে। যদি বছরকয়েক আগের সেই প্রবণতাকে সংস্কারধর্মী বলতে হয় তাহলে হাল আমলের পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তকে বৈপ্লবিক বলতে হবে।

বস্তুত ব্যাপারটা তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লব বলতে যদি সমাজের সমূহ পরিবর্তন বোঝায়, পুরানো কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে তাহলে অবশ্যই বৈপ্লবিক বলতে হবে। ঠিক এইরকমই একটা দৃষ্টিভঙ্গি সোভিয়েতের ভিতরে ও বাইরে বর্তমান। পেরেস্ত্রোইকা ঠিক কি নিয়ে সে বিষয়ে কিছু বলার আগেই প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় উত্থাপন করা দরকার।

লেনিনের পরে এই গর্বাচেভের আমলেই সর্বপ্রথম সোভিয়েত প্রসঙ্গে খোলা মনে মতামত দেওয়ার একটা সুযোগ এসেছে। এমন কাণ্ড দীর্ঘকাল অভাবিত ছিল। সোভিয়েত ব্যবস্থা সারা দুনিয়ায় যতোদিন অনন্য ছিল, তখন সাম্রাজ্যবাদ ও ঘরে বাইরে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণ থেকে

সোভিয়েতকে রক্ষা করার তাগিদে দুনিয়ার সব কটি মহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তার সবরকমের আতিশয্য উপেক্ষা করে জানিয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন। তারা যে সবাই মার্কসবাদী কিম্বা সমাজতন্ত্রের কোন না কোন ঘরানার শরিক ছিল সে কথা যেমন তখন, তেমনই এখনও বলা যায় না। তখনকার প্রায় সবকটি নামের মিছিলে যে সব নাম সব সময়েই থাকতো তা হলো রবীন্দ্রনাথ, বার্নাড শ, ওয়েব দম্পতি। এই সব মনীষীরা সোভিয়েত ব্যবস্থার সবকটি নীতি ও পদ্ধতির সুখ্যাতি করেছেন তেমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাঁরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী এমন কথা বলেছিলেন যে, সেদেশে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ তার ইতিহাস বিশ্রুত জনগণ সমাজে রাজনীতির চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। অথচ পশ্চিম দুনিয়ার বুদ্ধিজীবী মহল, জ্ঞানীগুণীদের অধিকাংশ, সেকথা তখন মানতে চাননি।

একটি একদলীয় সর্বাত্মক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের স্বার্থের দৃষ্টান্তে কাজ করে না, সে কথাই তাঁরা জোরের সঙ্গে বলতেন। সোভিয়েতে স্যাধারণ মানুষের ভূমিকা ছিল যান্ত্রিক ধরণের হুকুমে চালিত, একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার নির্দেশে তার সব কাজ চলেছে, এটাই ছিল অভিযোগের মূল কথা। সমাজ শোষণ মুক্ত হলে, মানুষের উদ্যোগ বাধামুক্ত হবে, এই ধরনের তাত্ত্বিক কথা তাঁদের কাছে আমল পা য়নি। সমাজতন্ত্রের জয়ধ্বনি দেওয়ার দরকার আছে বলে তাঁরা মনে করতেন না। বরং উদার গনতন্ত্রের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকার জন্যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের গুরুত্বকে তাঁরা খাটো করে দেখতেন।

অন্যদিকে সোভিয়েতের অনুরাগীদের বক্তব্য ছিল, বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষ আত্মবিকাশের তাগিদে যে বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছে, সেই ভাঙাগড়ায় কিছু ভুল ভ্রান্তি ঘটে যাওয়া, আতিশয্য এসে পড়া, এমনকি কিছুটা অন্যায় অনাচারও এসে যেতে পারে। কিন্তু এই সবের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিলেও সোভিয়েত সমাজের আত্মবিকাশের তাগিদ থেকে উদ্ভূত এই কর্ম-চাঞ্চল্যকে বিভিন্ন দেশের মনীষীরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁরা ends ও means-এর নৈতিক টানাপোড়েনে সবাই আবদ্ধ হতে না চেয়ে অনেকেই ends-কে চরম মনে করেছিলেন।

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন, সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রচণ্ড সোভিয়েতবিরোধিতার মধ্যে means-এর বিশুদ্ধতা কতোটা বজায় রাখা সম্ভব ছিল, নাকি means এর নৈতিক মান
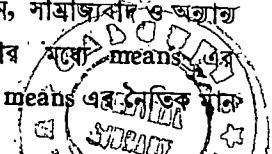
বজায় রাখতে ends কে সামগ্রিকভাবে দুর্বল করা সঠিক হতো, এই সব বিতর্ক আজ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিতর্ক মনে পড়ে। এসে পড়ে নেহেরু-র আমলে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের Strategy'র কথা। জহরলাল দারিদ্র্য-দূরীকরণের কর্মসূচী নিয়ে সমাজের কায়েমী স্বার্থকে আঘাত করার জন্যে জবরদস্তি করেননি বলে এদেশের বামপন্থী আন্দোলন তাঁর গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনক্ষমতা বজায় রাখার কৌশল বলেছে; আবার পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের পথ নেওয়ার জন্যেই এদেশ ও বিদেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁকে 'বর্ণচোরা কমিউনিস্ট' বলেছে। তিরিশের দশকে সোভিয়েতে সমস্যাটা ছিল নেহরুর সমস্যার চেয়েও বহুগুণ জটিল আর দুরূহ। কিন্তু বিচারের সময় সেই দিকটাই চাপা পড়ে যায়।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে প্রথম যখন ব্যক্তিপূজার পদ্ধতি ধিক্কৃত হয়, তখন শোনা গিয়েছিল লেনিনের মৃত্যুর পর থেকেই সেদেশে গণতন্ত্রের অপঘাত সুরু হয়েছে। তিরিশের দশক থেকে আর গণতন্ত্র বলে কিছু ছিল না। স্তালিনের জীবদ্দশায় এক সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্র সোভিয়েত ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। নাৎসী জার্মানীতে শৃঙ্খলিত প্রতিভা হুকুমদারী সহ্য করতে না পেরে হয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মরে নয়তো দেশত্যাগী হয়। কিন্তু স্তালিনযুগের স্বৈরাচারের মধ্যে সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সেই বিস্ময়কর অগ্রগতি কি করে সম্ভব হলো যা একটা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে কেবল পুনর্গঠন করেনি একই সঙ্গে স্পুৎনিক থেকে ICBM পর্যন্ত সম্ভব করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে সোভিয়েতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে সহমত হতে বাধ্য করেছে?

ঘটনার দিক থেকে স্বীকার করতেই হবে সোভিয়েতে "গ্লাসনস্ত" প্রথম সুরু করে ছিলেন ক্রুশেভ। ব্যক্তিতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্তালিন প্রয়াত হওয়ার অল্পকালের মধ্যে বিশেষতঃ যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেও চলেছে স্তালিন যুগ তখন স্তালিনের ভাবমূর্তিকে আঘাত করার সাহস তিনিই দেখিয়েছিলেন। কিন্তু "পেরেস্ত্রোইকা" সুরু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন করার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়। ব্রেজনেভ সেই কাজ নাকি করেছিলেন। ১৯৭৭ সালের সংবিধান শোনা গেছে তারই স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু গর্বাচেভের আমলে স্তালিন ক্রুশেভ ও ব্রেজনেভ সবাই ধিক্কৃত হচ্ছেন খোলামেলা আর পুনর্গঠনের নামে।

দেশ জুড়ে মানুষ যদি সেই ধিক্কারে গলা মেলায়, তা হলে প্রশ্ন থেকেই যায় সমাজে কাম্য পরিবর্তন স্থুরু করার পরেও অচিরে সেই ধারা পুরানো খাতে আবার বইতে স্থুরু করে কেন? গলদ কোথায়? নেতার, নেতৃত্বের, নাকি ব্যবস্থাগত? সেটাই প্রশ্ন।

বিগত কয়েক বছরে পেরেস্ত্রোইকা যে কর্মসূচীর উপর জোর দিয়েছে বিগত জুন মাসের শেষে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ. ১৯তম সারা ইউনিয়ন সম্মেলনে গর্বাচেভ তাঁর প্রতিবেদনে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারে তারই তিনটি দিকের কথা বলেছেন। প্রথমতঃ অক্টোবর মহাবিপ্লবে যে বিরাট কর্মকাণ্ডের বোধন হয় একটি বিশেষ স্তরে হুকুমনির্ভর প্রশাসনিক পদ্ধতি কায়েম করে স্তালিন ও তাঁর সহযোগীরা তাকে চরম বিকৃত করেছেন। সেই ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের পথ বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের আধিক্য এমনই বেশি যে মানুষের সমস্ত নিজস্ব উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেটাকে দূর করতে হবে। তৃতীয়তঃ চলতি রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইনের কাঠামোর মধ্যে সমাজ জীবন গঠন করতে না চেয়ে উপর থেকে খামখেয়ালী নির্দেশের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে এসেছে। তাকে দূর করতে হবে।

যেকোন গণতন্ত্রপ্রেমিক মানুষের কাছে এই তিনটি বক্তব্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কোন কারণ নেই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে এযাবৎ এই নীতিগুলি আদৌ অনুসৃত কেন হয় নি, সেটাই হলো বিস্ময়ের কথা। সমাজতন্ত্র বলতেই যে স্বতন্ত্র সমাজের ভাবমূর্তি মনে আসে তার কাঠামো ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে গণতান্ত্রিকতার রূপরেখা নির্ণয় করতে হবে মার্কস থেকে লেনিন সকলেই তো সে কথা বলেছেন। উদার গণতন্ত্রের নিয়ম নীতির কোন সমাজতান্ত্রিক সংস্করণ সম্ভব কিনা বলা শক্ত। তা মানতে হলে বনিয়াদ ও উপরিকাঠামোর ধারণায় কিছুটা কাটছাঁট বোধহয় দরকার হয়। আধুনিক মার্কসবাদ চর্চায় রাষ্ট্র কাঠামোর অটোনমির ধারণা চালু হয়েছে। সোভিয়েত তত্ত্ববিদরা সেই তত্ত্বকে এতোকাল তো নস্যাৎ করে দিয়ে এসেছেন। তাহলে তত্ত্বের ধারণায় কতোটা পরিবর্তন স্বীকৃত হয়েছে জানা না গেলে, এই ধারণার যৌক্তিকতা স্বীকারে বাধা আসতেই পারে।

আপাতদৃষ্টিতে পেরেস্ত্রোইকা যে সংস্কারের উপর নির্ভর করছে তা হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা স্বৈরাচারের জন্ম দেয়, একথা বহু প্রাচীন। কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন যে-ঐতিহাসিক পটভূমিতে আবশ্যিক মনে

হয়েছিল, সেটা প্রয়োজন ছিল কিনা বলা না হলে পুনর্গঠনের লক্ষ্য নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকেই যাবে। স্তালিন, ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভের রাজনৈতিক উত্থান-পতনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক চলেছিল সেগুলি মনে হবে আসলে ক্ষমতার লড়াই। মতাদর্শ সেখানে গৌণ।

পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে সোভিয়েতের বর্তমান নেতৃত্ব উৎসে অর্থাৎ লেনিনের নীতিতে ফিরতে চাইছেন। বিগত সাত দশকের বেশির ভাগ সময় ধরেই চলেছে সেই উৎস থেকে ক্রমাগত বিচ্যুতি। যেমন স্তালিন লেনিনবাদ অনুসরণের নামে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে দল ও সরকারের অবিসম্বাদী নেতারূপে সেই সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিজের খুশিমতো কাজে লাগিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তত্ত্ব মেকিয়াভেলীর সৃষ্টি। রাষ্ট্রের সর্বময়তা কায়েম করে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তত্ত্বকে হাতিয়ার করে একনায়ক হয়েছিলেন। সমাজতন্ত্র, অন্তত স্তালিনীয় সমাজতন্ত্র নাৎসীবাদের মতোই সর্বাত্মক ব্যবস্থা, এই সমালোচনা ভাববাদী দার্শনিকরা বহুদিন ধরেই করে আসছেন। শুধু সমাজটা শোষণমূলক নয়, এই পার্থক্য ছাড়া পেরেস্ত্রোইকার আলোয় সেই সমালোচনা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

রাষ্ট্রের সর্বময়তার ধারণা ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভ-যুগেও ছিল। আজো আছে। মহাকাশ যুদ্ধের সর্বাত্মক ধ্বংসের পটভূমিতে দিশেহারা মানুষ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে, রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রনেতার প্রতি তার অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে একালে। পেরেস্ত্রোইকার মধ্যে কি এই সমকালের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি বেশি মাত্রায় পড়েছে? কিম্বা বলা যায় রাষ্ট্রের সর্বময়তার ধারণা বাতিল হয়ে গেলে মার্কসের কল্পিত Withering away of the State এর দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়া কি সম্ভব হবে?

সন্দেহ নেই সোভিয়েত ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য সর্বত্র গড়ে উঠেছে। আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গণউদ্যোগ। কিন্তু মার্কিন দেশে এবং অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানেও আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য সোভিয়েতের তুলনায় কম নয়। এমন কি আমাদের দেশেও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নামেমাত্র থাকা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের লাইসেন্স পারমিট রাজ কায়েম করতে অসুবিধা হয়নি। তাই সোভিয়েত ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য খর্ব করার

উদ্যোগ অবশ্যই কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আসতে পারে। কিন্তু তার জন্য বিগত সাত দশকের অনেক ঘটনার অবমূল্যায়ন করতে হবে কেন?

বহুদিন ধরেই অনেকের মনে হয়েছে দল, সরকার ও রাষ্ট্র এই তিনের মাধ্যমে কাঠামোগত কার্যকর পার্থক্য থাকলে অন্তত উদার গণতন্ত্রের মানরক্ষা হয়, সোভিয়েতে সেটা আদপে নেই। কোনদিন পার্থক্য বজায় রাখার চেষ্টাও হয়নি। দলীয় প্রধান তাই রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান হয়ে থাকেন। শাসনব্যবস্থার একটা সমাজতান্ত্রিক মডেলের মতোই এটা চলে আসছে। এবং যেহেতু সরকার ও প্রশাসনের সর্বস্তরে কলেকারখানায় পরিচালনব্যবস্থায় সর্বত্র দল সমান্তরাল ভাবেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে, তাই দলীয় আমলাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায় আরো বেশি। তখন দলীয় আমলা আর প্রশাসনিক আমলা এই দুয়ের চাপের যাঁতাকলে মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার সম্ভাবনা খুবই থাকে। বস্তুতঃ সোভিয়েতে তাই ঘটেছে। গ্লাসনস্ত সেই নির্মম সত্যকে ভাষা দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমী কায়দায় নির্বাচন, সমালোচনা ইত্যাদি কি লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নীতির বিকল্প? সেকথাও এখন পরিষ্কার হওয়া দরকার।

সন্দেহ নেই সোভিয়েত ব্যবস্থায় ত্রুটি আছে অনেক। কিন্তু তার কোনটি মনুষ্যসৃষ্ট আর কোনটি ব্যবস্থাগত সেই আলোচনাও প্রাসঙ্গিক। লেনিন যখন প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন, তখন চলতি বুর্জোয়া সমাজগুলির দোষত্রুটি থেকে সমাজতন্ত্রকে মুক্ত রাখার জন্য অনেক নীতি ও পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেগুলিও ছিল পরীক্ষামূলক এবং সোভিয়েতের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা সীমিত। লেনিনের নীতিতে প্রত্যাবর্তন সমকালীন সোভিয়েত সমাজের পক্ষে কতোটা সম্ভব কিম্বা কতোটা প্রয়োজন, পেরেস্ত্রোইকার জয়ধ্বনির মধ্যে সেই চিন্তা হারিয়ে যেতে পারে না।

এই প্রসঙ্গেই বলা দরকার পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের যে বিষয়গুলি একান্তভাবে সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, সে বিষয়ে সোভিয়েত জনগণের মতামতই চূড়ান্ত। অন্যদেশের মানুষের প্রত্যাশা সেখানে গৌণ হতে বাধ্য। কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থার যে দিকগুলি বিশ্বজনীনতার দাবী রাখে, সেখানে অন্য দেশের মানুষের মতামত অন্ততঃ কিছুটা গুরুত্ব নিশ্চয়ই পেতে পারে। বিশেষতঃ সম্প্রতি দেখা গিয়েছে পশ্চিম দুনিয়ার, আরো স্পষ্টভাবে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশের সমালোচনার প্রতিকারে সোভিয়েত নেতৃত্ব বেশি মনোযোগী। গর্বাচেভ তাঁর একাধিক

বক্তৃতায় পশ্চিম তুনিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে সোভিয়েতের Shared concern-র ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর সেই উদ্বেগ থেকে পশ্চিমী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সঙ্গে একটা সহমর্মিতা স্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি পুঁজিবাদের থেকে চরিত্রগতভাবে পৃথক হয়, যে পার্থক্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অল্পকাল আগেও অনেক কিছু বলা হয়েছে, এই Shared concern-এর ধারণা সেই পার্থক্যের এলাকা সংকুচিত করে বলেই মনে হয়। তুনিয়াকে পারমানবিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো তাবৎ বিশ্ববাসীর সমান উদ্বেগের বিষয়। কয়েকটি দেশ বা মহাদেশের মধ্যে সেটা সীমিত নয়।

পরিশেষে পেরেস্ত্রোইকার আরেকটি দিকের কথা বলা দরকার। শোনা যাচ্ছে সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সীমিত আকারে হলেও যে পার্লামেণ্টারী কাঠামো রয়েছে তাকে বদলে রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থা চালু করা হবে। তুলনামূলক শাসনতন্ত্রের আলোচনায় পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বেশি বলে শোনা যায়। গণতান্ত্রিকতার মান ও পরিমাণ সেখানেই রক্ষিত হয়। সোভিয়েতে লেনিনের দিকে ফিরে যাওয়ার সময় কেন লেনিন অনুমোদিত পার্লামেণ্টারী কাঠামো বদলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন-ভিত্তিক রাষ্ট্রপতিপ্রধান ব্যবস্থা চালু করা দরকার, তবে যুক্তিতা বোঝা গেল না। আমাদের এই তুর্ভাগা দেশে পার্লামেণ্টকে খর্ব করে রাষ্ট্রপতিপ্রধান ব্যবস্থা প্রবর্তনের তোড়জোড় ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই চলে এসেছে। কংগ্রেসের নেতারা তাই সোভিয়েতের এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রেরণা পেতে পারেন।

রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ বার্কার তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সার সংকলন করতে গিয়ে বলেছিলেন: "গনতন্ত্রের কর্মবস্তু হলো বাছাই করার ক্ষমতা, কি বাছাই হবে সেটা নয়।" উদারনৈতিক ব্যবস্থার শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, ইংল্যাণ্ডের জনগণের পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা বজায় রাখার সচেতন মানসিকতার পটভূমিতে এই মত যতোটা সত্য ও গ্রহণীয়, সব দেশে সেটাই প্রযোজ্য কিনা তার বিচারও এর সঙ্গে যুক্ত। পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত যদি সেই পথ প্রশস্ত করতে পারে, সেটা অবশ্যই হবে দেখার মতো বিষয়, যদিও একালে সমাজ কিম্বা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন মডেলের ধারণা কোন বুদ্ধিমান মানুষ মানতে পারেন না। এটাও গ্লাসনস্তের আরেক দিক।

পেরেস্ত্রোইকা—পরিপ্রেক্ষিত, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

অরিন্দম সেন

আঁকা-বাকা চড়াই-উতরাই পথে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ধারায় এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আজ বিশ্বের প্রথম ও বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক দেশে এক বড়সড় পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। সুতরাং এই বিকাশধারার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে এবং বর্তমান সন্ধিক্ষণটিকে না বুঝলে পুনর্বিন্যাস, মুক্তনীতি ও গণতন্ত্রিকীকরণের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে না। স্বল্প পরিসরেও সেই চেষ্টাই আমরা করব।

"কমিউনিস্টরা আমলায় পরিণত হচ্ছেন। যদি কোনোদিন আমরা ধ্বংস হই তবে তা ঘটবে এই আমলাতন্ত্রের জন্যই"—১৯২২ সালে বলেছিলেন লেনিন[১]। একবার নয়, বারবার তিনি পার্টি ও জনগণকে "সর্বহারা রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি" সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু আজ প্রায় সত্তর বছর পরে সোভিয়েত নেতৃত্বকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র আর সঠিক অর্থে রাষ্ট্রই থাকবে না, বরং ধীরে ধীরে জনগণের স্ব-শাসনে পরিণত হবে—লেনিনের এই দিকনির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে এতকাল ধরে জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রচণ্ড আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। এবং এর ফলে ব্যাপকভাবে দেখা দেয় "জনগণের সামাজিক সক্রিয়তা হ্রাস ও নিস্পৃহতা দেখা দেয় সামাজিক মালিকানা ও পরিচালনা থেকে শ্রমজীবী মানুষের বিচ্ছিন্নতা"[২]। গর্বাচেভের ভাষায়, "এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে কর্তৃত্ববাদী আমলাতান্ত্রিক বিচ্যুতিগুলির জন্য সমাজতন্ত্র যখন একটা বিকৃত অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন [জনগণের মধ্যে] দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতা (alienation)। মানসজগতে এবং অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠাই হল আজকের প্রধান কাজ।..."[৩]। রাশিয়ায় "উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা জনগণের হাতে নেই, রয়েছে "শাসকদের" অর্থাৎ আমলাদের হাতে", সেখানকার উৎপাদনের ধরণ (mode of production) তথা সমাজব্যবস্থা হল "রাষ্ট্রবাদী বা etatist"—এই ধরণের মতামতও সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী এবং পার্টি ক্যাডাররা ব্যক্ত করেছেন এবং সরকারী পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিতও হচ্ছে। কেবল আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রেই নয়, বৈদেশিক

নীতির ক্ষেত্রেও যে অনেক বৃহৎশক্তিসুলভ বিচ্যুতি ঘটে গেছে (চেকোশ্লোভাকিয়া, আফগানিস্তান) তারও স্বীকৃতি মিলছে নেতৃত্ব, কর্মী ও জনগণের কাছ থেকে। বিগত কয়েক দশক ধরে যাঁরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের একপেশে গুণগানে পঞ্চমুখ ছিলেন, এসব স্বীকারোক্তি তাঁদের বেশ অসুবিধেয় ফেলে দিয়েছে সন্দেহ নেই। আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের দুঃস্বপ্ন এখনো যাঁদের চোখে লেগে রয়েছে তাঁরা এসব পরিবর্তনকে, বিশেষতঃ আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের মত ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে না পেরে চীৎকার করে চলেছেন—"তফাৎ যাও, সব ঝুট হায়"। তুলনামূলকভাবে সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছেন সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা, যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে মেনে নিয়েও তার বৃহৎ শক্তিসুলভ তথা আধিপত্যবাদী আচরণ এবং সোভিয়েত সমাজের নানা বিকৃতি সম্পর্কে সমালোচনা রেখেছেন আবার এগুলি বহুলাংশে কাটিয়ে ওঠা সম্পর্কে আশাবাদীও।

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে নানান অ-সমাজতান্ত্রিক বিচ্যুতি ও বিকৃতির উদ্ভব কিভাবে ঘটল সে বিষয়ে সোভিয়েত নেতৃত্বের মূল্যায়ণগুলি মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই পড়েছেন। পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত মূল্যায়ণের ব্যর্থতা থেকে শুরু করে, হুকুম-নির্দেশের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালনার পদ্ধতি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের বিষয়ীগত ভুলের ওপর জোর পড়েছে। এবং স্তালিন ও স্তালিনবাদকে বানানো হয়েছে পয়লা নম্বর অপরাধী। কিন্তু আমরা জোর দিতে চাই আরও মৌলিক চরিত্রের কিছু বস্তুগত বা পরিস্থিতিগত কারণের ওপর, যা ক্রমে ক্রমে কিছু বিপজ্জনক ঝোঁক ও ক্ষতিকর তাত্ত্বিক সূত্রায়ণের জন্ম দেয় এবং পরিশেষে ব্রেজনেভের আমলে সমাজতন্ত্রের এক নিদারুণ বিকৃতির মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করে।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের ধারণা যে সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল, এই স্বাভাবিক অথচ প্রায়শঃ-ভুলে-থাকা সত্যের অন্যতম সাক্ষী হল পশ্চাদপদ রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রথম বিজয়লাভ। একসঙ্গে সমস্ত বা অধিকাংশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লবী সর্বহারার ঐক্যবদ্ধ আঘাতে পুঁজিবাদের মূল দুর্গগুলি ধ্বংস হবে, দেশে দেশে গড়ে উঠবে সমাজতন্ত্রের দৃঢ়মূল, শক্তিশালী ইমারত—এই সুন্দর স্বপ্ন পূর্ণ না হওয়ায় একেবারে শুরু থেকেই অসম্ভব রকম জটিল ও কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য। স্বাভাবিকভাবেই তত্ত্ব সবসময়ে এই অজানা অনুশীলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি, এড়ানো যায়নি বড় বড় ভুল,

তবু বহু অসম্ভবকে সম্ভব করে, মেহনতী মানুষের হাসি-কান্না-রক্ত-ঘামে গড়ে ওঠে বিশ্বের বিস্ময় মহান সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। কিন্তু এই বিশিষ্ট পরিস্থিতির কারণেই ভেতরে ভেতরে থেকে যায় কতকগুলি গুরুতর ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা তথা ভারসাম্যহীনতা বা বিকৃতি। যেমন, দেশের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির ওপর গৃহযুদ্ধের ক্ষত আর বাইরে থেকে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ঘেরাও-আগ্রাসনের কারণে লেনিনকে স্বল্পকালের জন্য হলেও "যুদ্ধকালীন সাম্রাজ্যবাদ" নামে অপরিহার্য অভিশাপকে বরণ করে নিতে হয়েছিল। স্তালিনের আমলেও সাম্রাজ্যবাদী বিপদ সোভিয়েত অর্থনীতিকে সামরিকীকরণের দিকে নিয়ে যায়। দেশের ভেতরে গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্তর্ঘাত এবং তাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখার ফলে সমাজজীবনে ও পার্টিতে এক অস্বাভাবিক সন্দেহপ্রবণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তৈরী হয় স্তালিনের কঠোর বহিষ্কার-অভিযান এবং অন্যান্য "বাড়াবাড়ি"র জমি। প্রতিরক্ষা ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ভারী শিল্পের ওপর জোর পড়ে অতিরিক্ত বেশী, অবহেলিত হতে থাকে ভোগ্যপণ্য-উৎপাদক হালকা শিল্প।

স্তালিনোত্তর যুগে অর্থনীতির এই ভারসাম্যহীনতা প্রকটতর হয়, আমেরিকার সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও মহাকাশ অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তিবিদ্যা মূলতঃ আটকে পড়ে, দেখা দেয় খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য, বাসস্থান ও পরিসেবার ঘাটতি। লিবেরম্যান সংস্কার ও অন্যান্য উপায়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টা আমলাতন্ত্রের বিরোধিতায় মাঝপথে আটকে যায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিকীকরণের আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে চাপা গণ-অসন্তোষ এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা থেকে জনগণের বিচ্ছিন্নতা। বৈষয়িক ও আত্মিক—উভয় ধরণের উৎসাহদানের (incentives) অভাবে উৎপাদিকা শক্তির স্ফুরণ ব্যাহত হয়। দেশের মধ্যে গণতন্ত্র-হত্যার সাথে সাথে বেড়ে ওঠে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ও বন্ধুদেশ এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ওপর দাদাগিরি। এসব কিছুই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ব্রেজনভের আমলে দেশ এক গতিরুদ্ধতার সংকটে আটকে পড়ে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কেবল শেষ বিচারেই নয়, আশু ব্যবহারিক দিক থেকেও প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা এবং একপেশেভাবে এর ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বেশ কিছুকাল ধরেই যে অতি-বৃহৎ শক্তিসুলভ প্রবণতা মাথা চাড়া দিচ্ছিল, তাতে নতুন করে ইঞ্জিন যোগায় একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

তা হল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেরীতে আসা আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ তথা বিশ্বযুদ্ধের প্রধান উৎস হিসাবে দেখার তত্ত্ব এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চীন-মার্কিন বন্ধুত্ব। পাশাপাশি, আফগানিস্তানে জাঁকিয়ে বসে সোভিয়েত সেনা, সমর্থন জানানো হয় ভিয়েতনামের কাম্পুচিয়া দখলকে। এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে দেশে বিদেশে বিপ্লবী জনগণ থেকে ভীষণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র, অর্জন করে এক দানবীয় চেহারা। গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ারই ভাবমূর্তি ম্লান হতে থাকে; অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছে যায় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন ও সংকট।

ঘরে-বাইরে এই সংকটজর্জরিত পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতাই সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কার-অভিযানের আসল উৎস—কোন ব্যক্তিনেতার সদিচ্ছা নয়। এর শিকড় রয়েছে রাশিয়ার ঐতিহাসিক বাস্তবতায়। এক সুপরিকল্পিত, পূর্ণাঙ্গ (অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে শুরু করে বৈদেশিক নীতি ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত) কর্মসূচীর অধীনে পার্টি এটিকে পরিচালিত করছে এবং ইতিমধ্যেই জনগণের মধ্যে একে ঘিরে বেশ কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এসব দিক থেকে বিচার করলে সাধারণভাবে পেরেস্ত্রোইকা, গ্লাসনস্ত ও গণতন্ত্রিকীকরণের কর্মসূচীকে স্বাগত না জানানোর কোন কারণ নেই। তবে এই কর্মসূচীকে প্রাথমিক ভাবে একটি রুশ ঘটনা (phenomenon) হিসাবেই দেখা উচিত। দেশে দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিতে গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকার দাবী তোলা বা চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় আমরা অনেকে তা নিয়ে যেভাবে মাতামাতি করেছিলাম তার আংশিক পুনরাবৃত্তিও বাঞ্ছনীয় নয়। এর খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণের দায়িত্বও তাই সোভিয়েত পার্টি এবং জনগণের। আমরা বরং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের সেই দিকগুলি নিয়েই আগ্রহী যেগুলি সমাজতন্ত্রগঠনের অর্থাৎ বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সার্বজনীন সমস্যাগুলিকে স্পর্শ করেছে। এরকম দিক আছেও অনেক। কিন্তু দু-চার কথায় এ আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং দীর্ঘদিনের যেসব মারাত্মক বিচ্যুতি ও বিকৃতির কথা এতকাল পরে আজ স্বীকার করা হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে একটি মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধান করাটাই বোধহয় বর্তমান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

১৮৯০ সালে কনরাড স্মিডট্‌কে একটি চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন "এমন কিছু সার্বজনীন কাজ আছে যা ছাড়া সমাজ চলে না। এই উদ্দেশ্যে যাঁদের নিয়োগ করা হয় তাঁদের নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজের মধ্যে শ্রমবিভাগের এক নতুন শাখা। এঁদের যাঁরা মনোনীত করেন তাঁদের স্বার্থ থেকে পৃথক

একধরনের স্বার্থও এঁদের গড়ে ওঠে ; মনোনয়নকারীদের থেকে এঁরা স্বাধীন হয়ে ওঠেন—আর এভাবেই জন্ম নেয় রাষ্ট্র। এখন…এই নতুন স্বাধীন ক্ষমতা মূলতঃ উৎপাদনের ধারা অনুসরণ করতে বাধ্য হলেও তার অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক স্বাধীনতার (অর্থাৎ যে আপেক্ষিক স্বাধীনতা শুরুতে সমাজ থেকে তার হাতে এসেছে এবং ক্রমশঃ আরও শক্তিশালী হয়েছে) সুবাদে তা উৎপাদনের অবস্থা এবং গতিপথকে প্রভাবিত করতে থাকে। দেখা দেয় দুটি অসম শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত : একদিকে অর্থনীতির গতিধারা আর অন্যদিকে সেই নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতা যা যথাসম্ভব স্বাধীন হয়ে ওঠার জন্য জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং একবার গড়ে ওঠার পর যার মধ্যে জন্ম নেয় নিজস্ব এক গতিবেগ। সামগ্রিক অর্থে অর্থনৈতিক গতিধারাই, কিন্তু তাকে একদিকে রাজনৈতিক গতিধারার (যাকে সে নিজেই গড়ে তুলেছে এবং আপেক্ষিক স্বাধীনতা দিয়েছে) অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতার গতিধারার এবং অন্যদিকে পাশাপাশি-গড়ে ওঠা বিরোধীপক্ষের প্রতিক্রিয়াগুলিও সহ্য করতে হয়।…”[৪]

এঙ্গেলস চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা উত্তরোত্তর স্বাধীন হয়ে উঠতে চায়। আমরা এখানে যোগ করতে পারি—একটি রাষ্ট্রকাঠামো যত বেশী সুসংবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত ও স্থিতিশীল হবে, এই প্রবণতা ততই জোরালো-ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, যেমনটি সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক উপরিসৌধের এই স্বাধীনতা অবশ্যই আপেক্ষিক এবং শেষ বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক বুনিয়াদের গতিধারা দ্বারা সীমাবদ্ধ। মূলগতভাবে সমাজতান্ত্রিক (বেশ কিছু “কর্তৃত্ববাদী আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি” সত্ত্বেও) অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে থেকেও সোভিয়েত রাষ্ট্র কিভাবে চেকোশ্লোভাক ও আফগান ঘটনার মত বিভিন্ন আধিপত্যবাদী এবং অ-সমাজতান্ত্রিক আচরণ ঘটিয়ে এসেছে—এই রহস্য সমাধানের একটা তাত্ত্বিক ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে। বস্তুতঃ একদা শ্রমিক অভিজাততন্ত্রের আবির্ভাবের মতই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক বিশেষ সুবিধাভোগী স্তর হিসাবে “শ্রমিক আমলাতন্ত্র” (নাকি “জনগণের আমলাতন্ত্র”!)-এর উদ্ভব, রাষ্ট্র যতদিন থাকবে ততদিন অন্ততঃ কিছু পরিমানে এই স্তরটির ব্যবহারিক অপরিহার্যতা, এঙ্গেলস উল্লিখিত এঁদের “পৃথক স্বার্থ”, এঁদের ওপর জনগণের তত্ত্বাবধানের (মতান্তরে শ্রেণী সংগ্রামের) উপায় ও পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় শুরু থেকেই সমাজতন্ত্রের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ – হয়ত সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ—সমস্যা

হয়ে রয়েছে। রাষ্ট্র বনাম জনগণের দ্বন্দ্ব হিসাবে এই সমস্যা অনেক সময় অভিব্যক্ত হয়, কখনও কখনও বিস্ফোরক মাত্রাতেও পৌঁছে যায়। টিটোর "স্বয়ং-পরিচালিত সমাজতন্ত্র", মাও এর "গণলাইন" এর মত নানাদেশে নানা প্রচেষ্টা চলেছে, চলছে এই ব্যধি এবং তার মারাত্মক উপসর্গ—শ্রমজীবী জনগণের সার্বিক বিচ্ছিন্নতা—কাটিয়ে তোলার জন্য। রাশিয়ার সংস্কার আন্দোলন যতদূর এই প্রচেষ্টায় এক সৃজনশীল সংযোজন ততদূর তা মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত হওয়ার দাবী রাখে।

অপরপক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বিরোধিতা করার মত অন্ততঃ একটি বিষয় আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের নব্যচিন্তায় দেখতে পাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং তার অনুষঙ্গ হিসাবে ভারতের মত দেশগুলিতে কার্যতঃ শ্রেণী সমঝোতার পথে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ—ক্রুশ্চেভের এই নয়া-সংশোধনবাদী উত্তরাধিকারকে বিকশিত ও উর্ধে তুলে ধরেছেন গর্বাচেভ। তুলে ধরেছেন অক্টোবর বিপ্লবের ৭০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর বিখ্যাত ভাষণে। সুখের কথা, আমেরিকা থেকে জাপান, কিউবা থেকে ভারত বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা নানাভাষায় নানাভাবে এর বিরোধিতা করেছেন। সেই বিরোধিতার মুখে সোভিয়েত নেতৃত্ব এখন বোঝাতে চাইছেন যে গর্বাচেভের ভাষণটি এক বিশেষ উপলক্ষ্যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে (শান্তি-অভিযানকে ত্বরান্বিত করা) ও বিশেষ শ্রোতৃমণ্ডলীকে (মূলতঃ পশ্চিমী শক্তিজোট) লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছিল বলেই সেখানে একটি দিকের ওপর—অর্থাৎ শান্তি ও সহযোগিতার ওপর—বেশী জোর পড়েছে, অন্য দিকটি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের দিক তথা তাঁদের সমগ্র বিশ্ববীক্ষণ আসলে ২৭ তম পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টের মধ্যে পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই যুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। কারণ, প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় কমিটি ও সুপ্রীম সোভিয়েতের জুবিলী বৈঠকে প্রদত্ত এই "রিপোর্ট" গোটা বিশ্বের সামনেই (এবং আমরা বোধহয় আশা করতে পারি, প্রাথমিকভাবে বিপ্লবী জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সামনে) অতীত, বর্তমান ও আগামী দিন সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টির সর্বশেষ উপলব্ধিকে তুলে ধরেছে। বিদেশী অতিথিদের উপস্থিতি এই ব্যাপারটাকে পাল্টে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, ঐ রিপোর্টে প্রসঙ্গটি উত্থাপনের সময়ে গর্বাচেভ স্পষ্টই বলেছেন, "স্থায়ী শান্তির দিকে এগিয়ে সম্ভাবনার তাত্ত্বিক দিকগুলি আমরা খতিয়ে দেখছি" এবং "সাম্রাজ্যবাদের

পদ্ধতিতে" (ইংরাজী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২)। এ ধরণের একটি তাত্ত্বিক কাজে আমরা কি সামগ্রিকতা আশা করতে পারি না?

আসলে সামগ্রিক অর্থেই সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন মূল্যায়ণ সাধারণ সম্পাদক এখানে চালু করেছেন, তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর সতীর্থরা। "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নব্যচিন্তা" প্রবন্ধে আন্দ্রে নিকিফোরভ লিখছেন, "দুটি ব্যবস্থা একে অপরের কোন ক্ষতি না করেই বিকাশ লাভ করতে পারে," কারণ উভয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বৈরী নাও হতে পারে। তাঁর মতে, দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাত বেধে যাওয়ার মত শ্রেণীগত বৈরী দ্বন্দ্ব নেই। এবং কোন কোন ভারতীয় কমিউনিস্ট হয়ত জেনে খুশী হবেন যে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ১৯৮৬ সালের দিল্লী ঘোষণা এবং ভারতীয় পার্লামেণ্টে গর্বাচেভের ভাষণের উল্লেখ করেছেন[৫]। শান্তি-অভিযান অবশ্যই সমর্থনযোগ্য, কিন্তু এ ধরণের তাত্ত্বিক অপকর্ম ছাড়া কি সেটা সম্ভব ছিল না? এটা ঠিকই যে আণবিক অস্ত্রের অভূতপূর্ব (আক্ষরিক অর্থেই অভূতপূর্ব) ধ্বংসক্ষমতা যুদ্ধ ও শান্তির ইতিহাসে কিছু নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে আণবিক যুদ্ধে উভয়েরই (এবং সেই সঙ্গে গোটা মানবসভ্যতার) ধ্বংসের সম্ভাবনা প্রবল—এই বাস্তবতাই বিশ্বে এই প্রথম দুটি যুযুধান শিবিরকে অস্ত্রহ্রাস চুক্তির দিকে গেছে; এই বাস্তবতা দেশে দেশে গণচেতনায় প্রতিফলিত হচ্ছে, আলোড়ন তুলছে। এ ধরণের সম্ভাবনা লেনিন বা স্তালিন দেখে যেতে পারেননি। এ যুগের মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা তাই এসব নতুন বৈশিষ্ট্যকে শান্তি আন্দোলনে কাজে লাগাবেন, এ নিয়ে সৃজনশীল তাত্ত্বিক কাজও করবেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনবাদী মূল্যায়ণ থেকে সরে আসাটা আমরা মেনে নিতে পারি না।

২৭তম কংগ্রেসের রিপোর্টে কী আছে? সেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে সংগ্রামে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট সরকারগুলির বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম বা বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্থান নেই। বরং নয়া বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সেইসব সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগগুলিই সোভিয়েত নেতৃত্বের চোখে বেশী মূল্যবান। আর এ ব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়ার বড়দাদা ভারতের ভূমিকা (তা সে যতই দোদুল্যমান, আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যতই ভরপুর হোক না কেন) যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট স্বীকৃত তাই এই সরকারের সুস্থিতি রক্ষাই ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাজ বলে সি পি. এস. ইউ মনে

করে। রাজীব জমানায় যখন আগের যে কোন সময়ের চাইতে খোলাখুলি ভাবে দেশীয় বৃহৎ পুঁজি ও বিদেশী লগ্নী পুঁজির শোষণ লুণ্ঠনকে অবাধ করে দেওয়া হচ্ছে ঠিক তখনই রাজীবের এই অর্থনৈতিক 'পুনর্গঠনকে' পেরেস্ত্রোইকার সঙ্গে তুলনা করে সোচ্চার সমর্থন জানালেন তাঁরা। এ বিষয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সমস্ত ধারা যে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে তা ভালরকম জেনেই তাঁরা এটা করলেন। ভারতের অভ্যন্তরীন পরিস্থিতির মূল্যায়নে এবং কমিউনিস্টদের কর্তব্য নির্ধারণে এ ধরণের হস্তক্ষেপ অবশ্য নতুন নয়। এও এক ক্ষতিকারক ক্রুশ্চেভীয় উত্তরাধিকার, পুনর্বিন্যাসের হাওয়া যাকে পাল্টাতে পারে নি।

এই বিষয়টি ছাড়াও আমাদের সুস্পষ্ট বিরোধিতা রয়েছে স্তালিনের পুনর্মূল্যায়নের ধরণ সম্পর্কে, প্রশ্ন থাকছে স্বল্পমাত্রায় ধর্মীয় পুনরুত্থান ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে।[৬] কিন্তু, পেরেস্ত্রোইকার সামনে এখনো অনেক পথ বাকী। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোটি সোভিয়েত জনগণ ও কমিউনিস্টরা নিজেদের ইতিহাস ও বর্তমান অনুশীলন থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেবেন, ভুলগুলি শুধরে নেবেন এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুর্ণবিন্যাসকে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়কেতনকে আবার স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে তুলবেন।

সূত্র ঃ

১, সংগৃহীত রচনাবলী, ৩৫ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৯।

২. উনবিংশ পার্টি সম্মেলনে গর্বাচেভের রিপোর্ট ; মস্কো নিউজ নং ২৭, ১৯৮৮।

৩. সোভিয়েত পত্রপত্রিকার পরিচালকের সঙ্গে ৭ই মে, '৮৮-র বৈঠকে আলোচনা থেকে ; মস্কো নিউজ নং ২১, ১৯৮৮।

৪. "Selected Correspondence of Marx and Engels" (Progress, 1975), পৃঃ ৩৯৮-৯৯ ; প্রথম বড় হরফ ("সমাজের মধ্যে") এঙ্গেলসের, বাকী আমাদের।

৫, "Socialism : Theory and Practice," July '88.

৬. আগ্রহী পাঠক "লিবারেশন", সেপ্টেম্বর '৮৮ সংখ্যা দেখতে পারেন।

তারপর

অমিতাভ গুপ্ত

সারারাত বুনো বোবা চাঁদ
আমাদের খড়ের চালার
পিছনে উলঙ্গ শুয়ে ছিল
ঘরেঘরে, ঘুমহীন রাত

রাক্ষসের হাসি তারপর
উঠে এল পূবদিক জুড়ে
শুরু হ'ল আমাদের দিন
শুরু হ'ল আমাদের ক্ষয়

কতবার ভেবেছি রাতের
উলঙ্গ চাঁদের স্মৃতি মুছে
বিষ মুছে সূর্যের আলোয়
চলে যাব দিগন্তের দিকে

অন্ধকারে আমরা থাকব না
এই বন সরিয়ে একদিন
সব কৃষিজমি গড়ে নেব
অথচ সূর্যেরই ক্ষয় হয়

সূর্য নেই ? সূর্য নেই ঘরে ?
অন্ন নেই ? প্রাণ নেই ? আলো ?
রাহুর মতন কালো মেঘে
তবু যেন বিদ্যুৎ চমকাল

রাত্রির মাদল শব্দ

রণজিৎ দাশ

মুণ্ডা, সাঁওতালদের রক্ত আমার শরীরে।

তোমার পুরুষবন্ধুর স্কুটার এত শব্দ করে কেন ?
সন্ধ্যাবেলা থানার লালবাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কেন ?

টাঙ্গি হাতে নিয়ে আমি সব লক্ষ্য করছি।
আরকান পর্বত থেকে আমি সব লক্ষ্য করছি।
পুরীর সমুদ্র দেখে অভিভূত হই বলে ভেবো না আমি নিরাপদ,
যথেষ্ট বাঙাল।

আমি খোঁজ রাখি, কিভাবে
চাকমা শিশুর আর্তনাদে জেগে ওঠে বেলপাহাড়ী গ্রাম।

আমার প্রেমের ভাষা দুর্বোধ্য, তুমি অভিযোগ করেছো।
অভিযোগ সঙ্গত। কারণ আমায় প্রকাশভঙ্গীতে মিশে আছে
হার্মাদের হাসি আর রাত্রির মাদলশব্দ, হয়তো কিছুটা
আদিম অলচিকি।

কিন্তু আমার ক্রোধের ভাষা দুর্বোধ্য নয়।
টাঙ্গি হাতে নিয়ে আমি সব লক্ষ্য করছি।
আরাকান পর্বত থেকে আমি সব লক্ষ্য করছি।

একদিন অসংখ্য নেকড়ের মতো
কাইনেটিক হোণ্ডার ঝাঁকে ছেয়ে যাবে তোমাদের শহর।
থানার কাছে ছিন্নভিন্ন পড়ে থাকবে পুরুষবন্ধুর স্কুটার,
প্রতিটি জানালায় উঁকি দিয়ে ম্যাড ম্যাক্স খুঁজবে তোমাকে।

সেদিন রাত্রির মাদলশব্দে শুনতে হবে নিশিডাক, আত্মপরিচয়।
আমার রক্তের রেখা ধরে ধরে
এগুতে হবে তোমাকে-ও—পালামৌর জঙ্গলের দিকে।

মূর্তি

ব্রত চক্রবর্তী

রোদ্দুর দিয়ে গড়া।
বৃষ্টিতে গলিয়ে ফেলা।
সে।

তার মূর্তিতে
রোজ একবার তো
হাত দিতেই হয়।
নইলে রোদ্দুর বৃথা পোড়ে,
বৃষ্টি অকারণ রিমঝিম,
সা নি ধা নি ধা পা
আঙুল টঙ্কার দিতে থাকলেও
তানে সাড়া দেবে না তানপুরা।

রোজ একবার সে।
মূর্তির চোখ আঁকতে আঁকতে
আমার চোখ খুলে যায়।
নাসারন্ধ্রের ফুটো বাড়াতেই
আমার নিঃশ্বাস শুরু হয়।
শরীরের ধাপে ধাপে
পুরোটা শরীর গড়ে বসিয়ে দিতেই,
আমার সমস্ত আমি
ছুঁতে পাই।
ছুঁয়ে, মূর্ছা যাই আনন্দে, আনন্দে।

কবিতার জন্ম হয়

প্রভাত চৌধুরী

সন্ত্রাস্ত বিশ্রাম থেকে উঠে বসে কালি ও কলম
নিরক্ষরেখায় কিছু আঁক পড়ে বুঝি
ছুটে আসে বর্ণমালা চিত্রকল্প স্মৃতি ও বিস্মৃতি

ভাঙরাস্তে জমে থাকা সুখ ও অসুখ
প্রত্নতত্ত্ব থেকে খসে পড়া শিলালিপি তাম্রমুদ্রা
নিরেট পাথরে পড়ে ছেনি

ভূমিকম্প হ'লে
সম্ভ্রান্ত বিশ্রাম থেকে
ঘুমন্ত কবিও জেগে ওঠে, কবিতার জন্ম হয়।

অব্যবহিত

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

তাই বলা হবে শয়াধবার
হাওয়া দোলনার শূন্যতাবোধ
আমি জানি মাটি কেন নন্দন
অগ্নি সিঁদুর বাঁশ জলে বাও

মানুষের ডাক কালাফালা করে
জামিরের দ্রাণ সব ঋণ শোধ
অর্ঘ্য সেনের অতলান্তিক
কণ্ঠ জোয়ারি গান-অভিমান

কিছু এই জানি ; তোমরা কি তবে
সব জেনে গেছ সন্তানগণ ?
কত অনায়াস অপরা ও পর
বিশ্বা ব্যাপার মহাজাগতিক

—হারে রেরে রেরে— রহস্যঘর
ভাঙতে পেরেছ ওগো সন্তান ?

কার শব, কার পিছুটান

সুরজিৎ ঘোষ

এই ঘর মৃত্যু গন্ধে ভরে আছে, এখানে আমাকে কেন নিয়ে এলি তোরা ?
ওখানে, ও কার বাছা ঘুমিয়ে রয়েছে এক কোণে ?
আমার বাঁ-চোখ কেন অকারণ কেঁপে উঠছে কীসের শঙ্কায়
আমি অশিক্ষিত মেয়ে বোঝাতে পারি না সবখানি।

এই ঘর বড় সাদা, আমার গাঁয়ের ঘর হলে
মাটি থাকত, দেয়ালে মেঝেয় উজ্জ্বল মাটির রঙে ভরে থাকত চারপাশ—
এত হিম মৃত্যুর নীরব, থাবা গেড়ে বসতো না বিড়ালের মতো
ঐ কাঁচা কিশোরের ঘনচুল মাথার শিয়রে।

পাশ থেকে ঐ মুখ বড়ো চেনা মনে হয়, সাত আট বছরে
চার বছরের ছেলে কতখানি বেড়ে ওঠে আমি তার হিসাব বুঝি না।
সাত বছরেরও বেশি আমার ছেলেকে ওরা নিয়ে গেছে উদ্ধার আশ্রমে
ভালোই হয়েছে নইলে সে সময়ে আমারও তো মাথা গোঁজবার
মতো আশ্রয় ছিলনা।

আজ আমি ভালোই আছি দুবেলা খাওয়ার জোটে, পরণের নতুন কাপড়
যাদের আশ্রয়ে থাকি—আদর শাসন, কিছুরই অভাব নেই কোনো
তবু মাঝে মাঝে বসে দুপুরের একথালা ভাতের সামনে
সেই শত্তুরের ছেলে, তার মুখ মনে পড়ে, সে কি আজ খেয়েছে এখনো !

কী তোরা বলছিস বল, আমার বুকের মধ্যে কীরকম করে
তবে কি ওখানে শুয়ে আমারই রক্তের পিণ্ড, অনিচ্ছায় ফেলে আসা ধন
কী করে বুঝব আমি গান্ধারী জননীর চেয়েও অধম
সে তবু গলার স্বরে চিনে নিত ভালোবাসা, কে ডাকছে দুর্যোধন
নাকি দুঃশাসন।

নিয়ে যা আমাকে, নয়তো এক্ষুনি সরিয়ে নে ওকে
শুনব না কোনো কথা জানতে চাইনা কোনো কিছু
বুকের গভীর থেকে দুধরক্ত ছুটে আসে, কেন আসে কোন্ ঘূর্ণীপাকে?
যে গেছে ভাসান ব্রতে সে কি আসে পিছু পিছু, যদি আসে কতক্ষণ থাকে ?

আলোর অপেরা-র অংশ

অনন্য রায়

ওগো রূপকথা, ভেসে যাবার এই-ই কী পরিণাম ?··· আমরা যারা পেরিয়ে এসেছি নীলশূন্য ও পরমাণুর হাহাকার ; অন্ধকারের জলন্ত প্রহর ; কান্না ; ক্যাক্টাসের ঝড়। মিশরীয় স্ফিংক্সের জ্যামিতি। ফিনিশীয় নাবিকের বিষাদ ও বর্ণমালা ; হরপ্পার লিপি। ইউফ্রেটিসের তটরেখা। মহেঞ্জোদারোর ষাঁড় ; বাতাসের নীল মরুভূমি : প্যালেস্টাইন, শিঙাবাদকের মতো তিব্বত ও ইস্রায়েল ; উজ্জ্বল গ্রীসের শস্য ; রোমান হরফ । কৃষিবালিকার কান্না ; ক্রীটের ক্রন্দন। মায়ের স্তনের নিচে শিশুর।

কোমল স্বেরাচার ; ম্লান ট্রয়। দ্রাক্ষারসে-চোবানো পারস্য ; উর ; কুমারী কার্থেজ। তুরস্ক ও প্রসাধন ; দূষিত নক্ষত্রশোভা ; নিনেভের দুধ। ইঙ্কা সভ্যতার ভাঙা পাথরের ভস্মভার ; স্তব্ধতা ও কোমল গান্ধার : বাংলাদেশ।

ঝড়ের চাবুক-খাওয়া, হে সোনার পক্ষীরাজ, নীলাভ মত্ততা
নাসারন্ধ্রে বজ্রফেনা, এলোমেলো কেশরের শনি
বৈদ্যুতিক সড়কের অন্তে ম্লান অন্নের কুয়াশা
দিগন্তে মেঘের অশ্ব, সূর্য যেন তারই হ্রেষাধ্বনি,
কলকাতা, তোমাকে ঘিরে সহিসের টাটকা রক্ত, আমিষ রূপকথা।

নরখাদক নগরী, কেন শেখালে নিষ্ঠুর ভালোবাসা ?

নতুন শব্দের সন্ধানে

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

ভাঙা আয়নার কাচে
দেখেছিল স্বদেশের বলিজীর্ণ মুখ,
বুকের মধ্যে প্রগাঢ় রক্ত ঝরিয়েছিল কবি।

কথার পেছনে শুধু কথা জুড়ে জুড়ে
ক্লান্তির প্রহর ভেঙে
অযুত শব্দের প্রাসাদ বানিয়েও

কোনোদিন স্বদেশের অমল মুখের দিকে
চোখ তুলে তাকিয়ে সে বলতে পারেনি
তোমার কাছেই,
তোমার কাছেই শুধু একান্ত নতজানু হয়ে
সব ঋণ শোধ করে যাবো একদিন।

তার বুকের মধ্যে আশ্চর্য প্রদীপের নীলশিখা
দুহাতের আড়াল করা ছিল।
নিভৃত সঙ্গীতে তার একটিই জিজ্ঞাসা ছিল
বারংবার পৃথিবীর হৃদয়ের কাছে—
কত দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্তি খুঁজে পাবে
আহা, এই অনন্ত বৈদূর্য্যমণি
দুহাতে আঁকড়ে ধরে থাকা।

অজাতশত্রু মানুষের সন্ধানে
সে বড় গোপন দুঃখে গভীর মাটিতে কান পাতে।

শান্তিনিকেতন

সমরেন্দ্র দাস

পেট্রোলশহরে ওড়ে ছাই, ছাইয়ের পাশে ধান্যের সবুজ আভা
জলের নিচেই তো হাতটান, আমাদের প্রকৃত ভালবাসা
হলুদ দাগ, দারুচিনি নামে দ্বীপ নয়, অবাধ প্রকৃতি
'কেন তুমি ভাসিয়েছিলে আঁচলখানি, শাদা বরফকুচি!'

শীতের হাওয়া জাগে রুক্ষ পেট্রোলশহরে বসন্তে কী নয়?
সবুজ গানের বাণী শুনিয়েছিলে হিমেল হাওয়ায়
চার বছরের ঋতু পালটে যায় খোলা দরোজায়…

আজো নয়, কথা হবে বসন্ত-পঞ্চমীর রাতে শাদা বিছানায়
আমাদের হৈ হৈ বিবাহ উৎসব, উলুধ্বনি, শঙ্খের মাদল

জলের ভিতরে আজ জেগে উঠছে হলুদ রঙের রোদ, শান্তিনিকেতন!

মুখোমুখি

আনর্বাণ দত্ত

এত দূরে নও যে দূরবীন লাগে,
এমন দূরত্ব নেই—যে দূরবীন চোখে খুঁজে হবে তোমাকে ;

এত কাছে বলেই এত মায়া…
এত ঘনিষ্ঠ বলেই এমন মায়াবী তোমার চলাচল ;
তুমি জড়িয়ে আছ ছায়ায়,
অথচ কায়া নেই, ছায়াও নেই তোমার।

আমি ধ্যানে বসি,
সব দ্বারামুখ আগলে থাকে পাথর ;
এখন পাথরেরাই শুধু আগলে রাখে আমায়…
আমি ভাঙতে চাইনা এই পাথরদুর্গের আড়াল।

খয়া-খর্বুটে শ্যাওলার গুঁড়ো-ধুলো মাখা
নষ্টরঙ এইসব শিলাস্তূপ থেকেই
বরং বেছে নেব আমি
পছন্দসই একটিমাত্র পাথর—

যাকে
অস্থির তোমার মুখ ভেবে
মুখোমুখি দুটো কথাও অন্তত বলতে পারব।

শিল্পের রসদ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভাবনা ও জাগরণ থেকে
একদিন তুলে নিয়েছিলাম শিল্পের রসদ
কোন শর্তাবলী ছিল না, দাসত্বও নয়
কান্নার গ্লানি থেকে
এক নিবিড় স্বপ্ন জেগে উঠেছিল

যাকে বলে জাগ্রত চেতনা…
সভ্যতার প্রয়োজনে, প্রবল তৃষ্ণায়
সম্ভাবনা ও জাগরণ থেকে
একদিন তুলে নিয়েছিলাম শিল্পের রসদ

আলাপ থামিয়ে রাত

নীরদ রায়

চোয়ালে গম্ভীর ব্যথা,
স্নায়ুতে মাধুর্যের আলোক হাওয়া, ঋণগ্রস্ত আবেগ.
দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে চকিত ছায়া, পাতাহীন শিমুল,
নির্জনতা গিলছে নদী—,
গতবছরের বন্যায় ভেঙে পড়া মাটির দেয়াল
উঠোনের একপাশে এখনো জীবিত জঞ্জাল,
ছেঁড়া কামিজের রোদ্দুর ছোবলের বিষজ্বালা
আর্তচোখের ভাষা বোঝে না কেউ—
শুধু ঘাসে ও শিশিরে পা মুছে রাস্তা কিছুটা সোজা
ছোট বড় কপালের ভাঁজ,
আলাপ থামিয়ে রাত নড়ে-চড়ে বসে

অসুখে এবং জ্বরে

নন্দদুলাল আচার্য

মাংসমুকুর বলে দেয় তাকে
বড় কৃশ হয়ে গেছো,
অসুখে অসুখে কাটালে দীর্ঘ বছর।
ঘুমের আঠায় জড়ানো দুচোখে
স্বপ্নের বাইলেনে
হারিয়ে ফেলেছো ঘর।

তাই একা একা ছাড়া সড়কের খোঁজে
বোশেখকে ডেকে বলে উঠি 'ব্রাহ্মণ',

ফুঁ দিয়ে যেমন হিম্মত দাও ঝড়ের অশ্বখুরে,
শোনিত ধমনি তোলপাড় করে
দিতে পারো নাকো সেই,
গম্ভীর ডাক, মেঘভাঙা গর্জন ?

তবে বৃথা আমি অলকানন্দা
এলাম তোমার মাটির বোনের ঘরে
আধটি জীবন ঘুমে কাটালাম,
আধটি জীবন অসুখে এবং জ্বরে।

আমার একটা বাড়ি ছিল

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

আমার একটা বাড়ি ছিল অর্থাৎ কিনা বাড়িই ছিল
সেই বাড়িতে নারী ছিল, নারী মানে শুধুই নারী
চাঁদ ছিল ঠিক চাঁদের মতোই অন্ধকার তো অন্ধকারই
আধভীরু এক দরজা চোরাঘর ছিল দখিনদুয়ারী
খাঁচা ছিল সোনার খাঁচা আমরা ছিলাম এবং ময়না
আপ্তবুলি ফুটত ঠোঁটে কিষ্টা কিষ্টা হরে মুরারি।
আত্মারাম তো খুঁড়ত শব্দ—দোখানা মাল্লাদের চিৎকার
দূরের খালে—রাক্ষসখালি, হেই কেডা যাবা রাক্ষসখালি
বুকের মধ্যে সমস্তদিন রাক্ষসখালি রাক্ষসখালি
মধ্যরাতের হাড়গোড় ঘুম ঢুকে খেয়ে যায় সুতাশঙ্খ—

আহা যদি আজ থাকতেন তিনি—মৃত্যুর মতো সুস্বাদু ঘুম
ঘুমেই ছিলাম ঘুমেই ছিলাম—হঠাৎ শব্দ বজ্রপাতের
রাক্ষসখালি রাক্ষসখালি
ছি ছি শেষে ওটা আমারই ময়না—আমারই হাফগেরস্ত ময়না
নিয়ে এল সেই সমুদ্র ঠোঁটে, ঠোঁট নয় ? ওর আছে আত্মাও ?

কোন বাড়িটায় ঘুমুতে যাব ? কোন বাড়িটা এবার আমার ?

সে আসে আজ

গৌতম দাশগুপ্ত

পুরুষমের সেরে নিহত মহারানী
সেই যে শুরু হল ধূমল পাপ।
এখানে গুম্ খুন ওখানে রাহাজানি
শান্তি শুষে নেয় রোটাং পাস।

জ্বলছে মন্ত্র যন্ত্র পীড়নের
লুপ্ত কথামালা সহজপাঠ,
ফুঁসছে পালামৌ রুদ্র চণ্ডাল
ভ্রষ্টনিকেতন নেই মা-বাপ।

মাৎস্যন্যায় চিড়ে কোথায় সেই পেশি
ধর্ষিতার শেষ শঙ্খনাদ,
কালবোশেখী হাঁকে মত্ত মহীরুহ
জলের কল্লোলে সে আসে আজ।

বোল

সুব্রত রুদ্র

শ্রীবাসের আঙিনা থেকে একদিন যে গান ছোটে
হাওয়ায় চৈতন্যধূলায়; এ বাংলায়
চণ্ডালেতে বাঁধে গান
ব্রাহ্মণেতে ধায়

তুমি তার বোল জানো ?
তার নাচ চৈতন্যসহায়।

মুখের অন্তরাল

শ্যামল সেন

না-আবরণ খরস্রোতা দিন তো গেছে চলে
আর কী তবে রাখবে স্মরণ পুরাণ-কথা বলে
আমার পাঁজরখোলা দিনরজনীর দুঃখগুলি ?
এই আছো বেশ, চোখে-দেখা বাইরে থেকেই দোলে।

শিথিল হল স্বপ্নেঘেরা অস্ত্রযাপন দিন।
বুকে এখন দুধের জোয়ার, মুখের যত ঋণ
শুধিয়ে দেবে ননীর গন্ধে উপোসী এই প্রাণ?
বৃষ্টি এলে চোখের পাতায় ভাঙবে নতুন দিন।
রক্তে লালন মাটির বুকে নবান্নেরই ঘ্রাণ।
আজ তো গেল, কাল?
উঠে এসো, ছিঁড়ুক এখন মুখের অন্তরাল।

মূষিক থেকে মানুষ

সুবোধ সরকার

এই বাড়িতে ঢুকতে ভয় করে
এই বাড়িতে মানুষ থেকে থেকে
চেঁচিয়ে ওঠে লাফিয়ে ওঠে ভয়ে
বিছানা উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি ঘরে।

ঢুকতে ভয় কিন্তু আমি ঢুকি
এখনো দুটো বিড়াল জাগ্রত
এখনো জেগে দাঁড়িয়ে দারোয়ান
যেন সে ভগবানের মুখোমুখি।

'কি চাই?' বলে দরজা খুলে যাবে
ঢুকেছি চাঁদ যেভাবে ঢোকে বলে
কি চাই আমি বলবো, তার আগে
আমাকে ডেকে বসাত ভালোভাবে।

এই বাড়িতে আছেন পাঞ্চালী
তাকে জানাও এসেছে এক রাজা
চোদ্দমাস ভারতে ঘুরে ঘুরে
রাজ্য গেছে পড়েছে চোখে কালি।

এই বাড়িতে সিংহাসন নেই
সকালে তবু ময়ূর ডাকবেই
জানো না তুমি আমার পাগলামি
মূষিক থেকে মানুষ হবো আমি।

এই শহর

পার্থ রাহা

এই শহর
এই শহরের অগণন অন্ধগলি
নির্মম গলানো পিচে
বৃষ্টির কলায় শোনা অর্গ্যানের সুর
আমার আকাশ আকাশের দরোজা
শহরের শিরায় শিরায়
প্রাচীন রক্তের প্রবাহে
ভীষণ বেগার্ত বিচূর্ণ শব্দ আর
গাড়ীবারান্দার নীচে আমার জন্যে অপেক্ষায়
সেই নিরবধি নারী
বর্ষা আর চোখের জল যার
পায়ের তলায়
এই শহর এখন
আমার নিভৃত নাড়ীর মধ্যে
সারাক্ষণ সারাক্ষণ
কোন এক অজানিত উৎসবের আয়োজনে
খেলা করে খেলা করে খেলা করে
এই শহর আমার ভালবাসার
ক্রুদ্ধতার ঘৃণার আগুন।

শৈশবস্মৃতি

প্রদীপ পাল

আমাদের উদ্যানবাড়ির কাছে ক্যাকটাস ঝোপ ছিল না
মুক্ত প্রাঙ্গনে ছিল না রক্তজবার আহ্লাদী হাসি
খুব একলা থাকার সময়ে আমি বাড়িটার কথা ভাবি
শৈশবে অনেক কাঁটা ঝরা দিনের কথা মনে পড়ে
অবেলায় মনে পড়ে শৈশবের অনেক আনন্দ-হাসির দিন
আবেগে শিহরণে আমি তখন খুব দুর্বল হয়ে পড়ি
রক্তজবার আহ্লাদী হাসি, ক্যাকটাস কাঁটা আমাকে তোলপাড় করে

ক্রীতদাসের ট্রেন

অলকেশ ভট্টাচার্য

ট্রেন লাইনটিকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, কাল অমারাতে।
বলরামবাটী রিক্সস্ট্যাণ্ড-বিচ্যুত ট্রেন তুমি পৌছে যাও
আমার গ্রামটির কোন বরাবর, আকবরশাহীর মশজিদ ঘেঁষে।

প্রতি প্রত্যূষে নিয়ে এসো হাজার কয়েক দিনমজুর, সাঁওতাল, কোঁড়া।
থরে থরে নামিয়ে দাও চাষের জমিতে। বর্ষাকাল হানা দিয়ে গেছে
ভাতের হাঁড়িতে। ব-কলমে মজুরী নিক সহস্র ক্রীতদাস-তুমি
জোত জমি চষে টসে উদাস আকাশের দিকে ছুঁড়ে দাও তোমার
ব্যঞ্জনা, তোমার পৌরুষ।

আমাদের গ্রামের নাম মধুবাটী। সেখানে তুমি আশ্রয় পাবে না।
আজবনগর পুলের ঠিক ডানদিকে বটগাছের বেদীতে যারা বসে থাকে,
হুঁকো খায়, তাঁরা কিন্তু তোমারই অপেক্ষায়।

প্রতি ভোরে তুমি আরও বেশী কিছু দিনমজুর এনে ফ্যালো, ছুঁড়ে ছুঁড়ে
আমাদের গ্রামে নয়—আর একটু ওদিকে। ওপাশে।

উৎসব নয় ঘটনা নয়

অভী সেনগুপ্ত

জন্মসূত্রে যার নষ্ট হবার কথা ছিলো সে হেঁটে যাচ্ছে স্থির
যখন চারিদিকে হিম তরবারি খোলা
সান্ত্বনার থেকেও অনেক বেশী দূরত্বে সে যখন চলে গেছে বারংবার
হাহাকার তাড়া করেছে তাকে

শয়তান শিউরে উঠে বন্ধ করে দেয় একটিমাত্র চোখ
উৎসব নয় ঘনঘটা নয় শুধু চেনাপরিচিতরা অম্লানবদনে
চেয়েছে ঘনঘটা, চেয়েছে সে নষ্ট হোক
বড়ো সমুচিত হবে সেই নষ্ট হওয়া—চেয়েছে তার মৃত্যু
এভাবেই বেঁচে যাবে বুকপিঠ কত না ভণ্ডজনের—
জন্মসূত্রে যার নষ্ট হবার কথা ছিলো সে হেঁটে যাচ্ছে স্থির
এইসব দৈবঘটনায় পৃথিবীর আয়ু অসীমকে কাছে পাবার
ছাড়পত্র নীরবে অর্জন করে নিচ্ছে।

নুলিয়া ও লোহিতাশ্ব

মল্লিকা সেনগুপ্ত

সমুদ্রেই থামতে চাই, অশ্ব মানছে না
আর্ত হ্রেষা ছড়িয়ে পড়ে সিন্ধু সৈকতে
ওদের কিছু পাওনা আছে নগরে বন্দরে
কয়েকশত ক্রুদ্ধ ঘোড়া প্রবল বেগে আসছে।
এবার ঘোড়া সমুদ্রের কুক্ষি থেকে উঠলো
প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়ে ঘোড়ার মত বীর্যে
ডুবছি আমি সাগরে ডুব জীবনে ডুব ঘোটকে
আসলে ওই নিরন্নেরা ঘোটকমুখী নুলিয়া

কালো ওদের অঙ্গ, কালো চোখের কণীনিকা
নিকষকালো রাতবাদুর ওদের ঢেকে রাখে
ঢেউগুলির শীর্ষে চড়ে নাচছে শাদা পাখিরা—
ঘোটকমুখী নুলিয়াদের ছিন্ন দাবীপত্র।
চাবুক হাতে রাতবাদুর শাসনভার চায়
বাদুর নাকি দেবতা, পূজা করেছি এতোদিন
এবার দাবী না মেনে নিলে রক্ত ঝরবেই
আসছে উঠে লোহিতাশ্ব সমুদ্রের থেকে।

লোহিতাশ্ব ঘোড়ার নেতা, মাথায় বল্লম
লবনজলে হঠাৎ আজ ঘনালো দুর্যোগ।
কালো ডানার অন্ধকারে হাঁপিয়ে গেছে নুলিয়া
ঘোড়ার ডাক ছড়িয়ে পড়ে সিন্ধুসৈকতে
বিপুলবেগে কয়েকশত নুলিয়া উঠে আসছে
রাত বাদুর মরবে ডুবে, বাঁচবে লোহিতাশ্ব
জলশীর্ষে ক্রুদ্ধ কালো নুলিয়াদের ছেলে।
সমুদ্রেই থামতে চাই অশ্ব মানছে না।

মেঘাপিয়ন

জয়দেব বসু

মেঘ, তুমি ফিরে এলে ? মেয়েটি তো এখনও এলনা ! বলেছিলে, আমি তার অপেক্ষায় আছি ? ভয় হয়, তুমি তো প্রাচীন দূত, কাণ্ডাকাণ্ড কিছু বাধিয়ে আসোনি তো ? নীবিবন্ধের দিন কবেই বিগত। এখন ওসব কথা তোলো যদি গণপ্রহারের ভয় আছে। রবি ঠাকুরের দেশ উনিশ শতক থেকে ভিক্টোরিয়, শোভন, সুন্দর। অশ্লীল কথা তাই আশা করি ভুলেও বলোনি। সত্যি করে বলো দেখি, মেয়েটি কি জানে আমি রোজ ঘুমে আঁকড়ে ধরি তাকে ? উল্লাসিকা জেনেও এল না ! ধন্যবাদ মেঘদাদা, আপাতত মনে হচ্ছে কপালেরই দোষ, হতাশায় যুক্তিবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এবার তাহলে যাও নিজপথে উত্তর ভারতে। ডু-সন খরার ফলে কৃষকের ভবিষ্যত চৌচির হয়ে আছে। যাও সেথা বৃষ্টি দাও, সঙ্গে দাও আমাদের পক্ষ থেকে কুলাক বিরোধিতা। বোলো, শুধু বৃষ্টি নয়, প্রয়োজনে বজ্রপাতও ভাগ করে নেবো।

নিঃসঙ্গ রাতের গান

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

আকাশ নিয়েছে জেনে নিদারুণ খরার খবর।
আকাশ, হে শূন্যনীল, সোনালি থালার ক্লেশ দিও না আমাকে
মেঘের শুশ্রূষা দাও, আনো তার গান, ঢালো, খাই
আকণ্ঠ, দুহাত ভরে, যা কিছু গরল, সুধা, তা-ও।

আকাশ, হে শূন্যনীল, রাত্রির পাথরে জ্বালো রূপ, রাখো হাত
মৃত্যুহিম সুখে ঢাকো, অন্ধ করো, অদেখা রহস্যে দিই ঝাঁপ।
ডুবে যাই, ডুবে মরি, দুজন দুজনকে খুঁজে রাত হোক ভোর
ভাঙা দিন, পোড়া দিন, নিবন্ত এ-ঘরে গড়ি অন্য সূর্যলোক।

লোকের ফোয়ারা

সুব্রত সরকার

শাড়ি হোক, কুয়াশায় হোক, বিদ্যুতে ছেয়ে গেছে দিক-বিদিক
গাছ বলে আমি, পাতা বলে আমি, ফল বলে আমাকে দেখুন
কে কাকে দেখবে ? লোকের ফোয়ারা
শুধু লোকের ফোয়ারা…

রাত্রি বাঁধের পিছনে টেনে নিয়ে যে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে
তাকে বলি, দেবীর চোখের পলক পড়ে না
প্লিজ, কিছু একটু করুন !

IF YOU ARE IN THE MARKET

a) Flux grade & Foundry grade Limestone.
b) Limestone for lime manufacture, Chemical & Industrial use.
c) Limestone powder for Agriculture use.
d) Limestone chips as concrete aggregate.
e) Flux, refractory or Chemical grade Dolomite.

She Bisra Stone Lime Co. Ltd.

Chartered Bank Buildings

Calcutta-700 001

Will be at your Service

With best Compliments from :

R. S. ENGINEERING WORKS

Minning & Mechanical Engineer

Manufacture of :

Screw type, Props, Haulage Rope Cabbles, Coal Tubs, Cosl Tub Wheel Axle, D-Link, Worm Wheel, Worm Shaft, Spares for Powered Support Face.

Repairer of :

Industrial Engines, Truck & Buses Body, Repairing & Any Tube of Fabrication Jobs.

RAMBANDHU TALAW, G. T. ROAD
ASANSOL-713303

With best Compliment from :

T. Phone No. 60344

R. N. PANDEY

Structural Engineers, Erection & Febrication Contractor

Workshop :
Near JORAPOKHAR P. S.

P. O. JEALGORA
Dist. Dhanbad

With best compliments from :

M/s Linkman Production

Barrackpore

21, Sahid Mongal Pandey Sarani
Barrackpore-743101
24-Parganas

IMPORTANT PUBLICATIONS OF CALCUTTA UNIVERSITY

1. Catalogue of Arts of The Asutosh Museum—Calcutta University—By Niranjan Goswami 250-00
2. Collected Poems—Dr. Manmohan Ghosh Vol. I 20-00
   Vol. II 25-00
   Vol. III 40-00
   Vol. IV 38-00
3. Dictionary of Indian History—Dr. S. Bhattacharyya 50-00
4. Liberty, Equality, Property and The Constitution—P. J. Reddy 90-00
5. Comparative Aspects of Pituitary Gland—Dr. B. B. Ray 275-00
6. Political History of Ancient India—Dr. H. C. Raychaudhury 50-00
7. Studies In Mahima Bhatta—Dr. Amiya Kumar Chakrabarty 35-00
8. Hindi Muhaware—Dr Prativa Agarwal 75-00
9. Yoga Philosophy of Patanjali—Sri H. Aranya Rendered into English By P. N. Mukherjee 125-00
10. Elements of Science And Language—Taraporwala 60-00
11. A Linguistic Study of Personal Names and Surnames—Datta 80-C0
12. Neuroendocrinological Studies in Stress and Strain —B. B. Ray 90-00
13. Hundred Years of Calcutta University. Part I 25-00
14. Acharyya P. C. Ray Birth Centenary Commemoration Volume 15-00
15. Ananda Coomarswamy Centenary Volume 60-03
16. Buddhism-Early and Late Phases—Edited By Dr. K. K. Dasgupta 40 00
17. Varieties of Socialism—Tapan Kumar Chattopadhyay Dipak Kumar Das 40-00

For Other Details Please Get In Touch With :

THE MANAGER, PUBLICATIONS AND BOOK DEPOT
CALCUTTA UNIVERSITY
48 Hazra Road Calcutta-700 019

PARICHAYA AUG-OCT 1988 Reg. No. 13732
WB/EC—265

সবে বের হল

বাংলা ভাষায় লেখা লেখকের প্রথম বই

ভারত, রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

একটি সার্থক স্বপ্ন

এ. পি. গ্নাতিউক [illegible]

রুশদেশে ভারতচর্চা। রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত দেশ ও ইউরোপ ভ্রমণ। রুশদেশ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসা। সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তিক্ত মূল্যায়ন। রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার ও তাঁর গ্রন্থের মূল্যায়ন। লুনাচারস্কি ও তিখোনভের রবীন্দ্র মূল্যায়ন ইত্যাদি। সমগ্র বইটি যেন একটি তথ্যমূলক দলিল।

দাম: ৩৫.০০ টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় / ৪-৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

26 OCT 1988

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

পরিচয়

৫৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮৮ কার্তিক ১৩৯৫

প্রবন্ধ

গল্প

কবিতা

পুস্তক পরিচয়

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

পাঠকগোষ্ঠী

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৯৩

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

উনিশ শতকের বাংলাদেশ ঃ মুসলিম মানসে রেনেসাঁ-ভাবনা

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ

[বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা ও খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ এই প্রবন্ধের অনুলিপিটি কয়েকদিন আগে পাঠিয়েছেন তাঁর বিশেষ বন্ধু ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সভাপতি অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে। উত্তর বাংলাতে সাম্প্রদায়িক শক্তিদের পুনরুজ্জীবনে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি চেয়েছেন এই লেখাটি পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত হোক—যাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসাবে প্রবন্ধটি ব্যবহৃত হতে পারে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধটি "পরিচয়"-এ প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা সানন্দে তা এই সংখ্যার "পরিচয়"-এ ছাপলাম।

সম্পাদক, "পরিচয়"]

বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই উপমহাদেশে আধুনিকতা বলতে আমরা যা বুঝি তার বহুমুখী স্ফুরণ ঘটেছিল উনিশ শতকে এই বাংলাদেশেই। অবশ্য এখানে বাংলাদেশ বলতে ১৯৪৭ সালের পূর্বে বৃটিশ ভারত সাম্রাজ্যের অধীনে যে প্রধানত বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চল 'বাংলাদেশ' বা ইংরেজিতে Bengal নামে পরিচিত ছিল, সেই অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক আর একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই শতকেই আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের অধিবাসীরা সকলে না হোক তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের এক স্বতন্ত্র 'বাঙ্গালী জাতি' বলে চিহ্নিত করতে শুরু করেছে, যদিও সেই জাতির মধ্যে নানা রকম স্তরভেদ ও বর্ণভেদ রয়েছে। আজ থেকে একশ বছরেরও আগে (বঙ্গাব্দ-১২৮৭) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ 'বাঙ্গালীরা বহু জাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙ্গালী সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালী মুসলমান।'

বাঙ্গালী মুসলমানদের সম্বন্ধে এই উক্তির পেছনে সমকালীন ইংরেজ

গবেষকদের রচনার প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এঁদের মধ্যে H. Beverly-র Report on the Census of Bengal, 1872 এবং H. Risley-র Tribes and Castes of Bengal, 1891 উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী মুসলমানদের অধিকাংশই যে নিম্নবর্গের স্থানীয় ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর, এই মতবাদ কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্তবংশীয় বাঙ্গালী মুসলমানদের আত্মসম্মানে আঘাত হেনেছিল। তাঁদের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি মুর্শিদাবাদ নবাব এস্টেটের দেওয়ান খান বাহাদুর খোন্দকার মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করে ১৮৯৫ সালে উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন 'হাকিকাত-ই মুসলমান-ই-বাঙ্গালা'। এর একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হয়—'The Origin of the Musalmans of Bengal'। ঐ পুস্তিকার লেখক কিছুটা দুর্বল যুক্তি দেখিয়ে এই মত প্রকাশ করেন যে, বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার বেশির ভাগই বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর, এবং এই সব বহিরাগত মুসলমানরা বিজয়ী পাঠান ও মুঘল ওমরাহ ও সৈনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দেওয়ান সাহেব নিজে ছিলেন অভিজাত বংশীয় এবং উর্দুভাষী, যদিও তাঁর পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশে বহু যুগ ধরে বসবাস করে এসেছেন। সুতরাং বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঢালাও মন্তব্য যে, তারা নিম্নবর্গের হিন্দু জনসাধারণের বংশোদ্ভূত এটি তাঁর অভিজাত মন গ্রহণ করতে রাজি হয় নি। এখানে উল্লেখযোগ্য, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই সমাজ কেবল উনিশ শতকে নয় সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ভাষাগত সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি হচ্ছে মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণী, যাঁরা বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর, তাঁরা ছিলেন উর্দুভাষী এবং তাঁদের অধিকাংশই নগরের বাসিন্দা। অন্য শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র কৃষক, তাঁদের ভাষা বাংলা। অর্থাৎ এঁরা বংশানুক্রমিক জন্মসূত্রে এবং মাতৃভাষাসূত্রে যথার্থ অর্থেই বাঙ্গালী। এঁদের মধ্যে সবাই যে দরিদ্র ও অশিক্ষিত ছিলেন এমন কথাও বলা যায় না।

সতের শতকের আরাকান রাজসভার কবি আলাওল কিংবা জন্মভূমি ও মাতৃভাষা সচেতন কবি আব্দুল হাকিম প্রমুখ ব্যক্তির অস্তিত্ব কথাটি প্রমাণ করে। যাই হোক, যে প্রসঙ্গে এই আলোচনার সূত্রপাত তা হল এই যে—উনিশ শতকে বাংলাদেশের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে 'বাঙ্গালী' অভিধায় আত্মপরিচিতি সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছিল।

আঠারো শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যা অঞ্চল নিয়ে 'সুবা বাঙ্গালা' নামে ভূখণ্ডটি সর্বভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের একটা অংশ মাত্র ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, চোদ্দ শতকের প্রায় মাঝামাঝি নাগাদ পাঠান সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এই অঞ্চলের প্রায় সমগ্র জয় করে একত্রিত করার পর 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' নামে ভূষিত হয়েছিলেন। তার পর প্রায় দু'শ বছর এই অঞ্চল স্বাধীন পাঠান সুলতানদের অধীনে ছিল। পাঠান সুলতানরা বহিরাগত হলেও এই দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হোসেন শাহী আমলে বাংলার ভাবজগতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। একদিকে হিন্দু ভক্তিবাদ ও অপরদিকে মুসলিম সুফীবাদের ব্যাপক প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার উন্নতি বিকাশের এটা ছিল স্বর্ণযুগ। একালে মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত এবং ভগবদ্গীতা প্রথম বারের মত সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। সুলতান হোসেন শাহ ভগবদ্গীতা অনুবাদ করার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে কবি মালাধর বসুকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং কবি সে কথা বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন ঃ

নির্গুণ অধম মুঞি নাই কোন গ্রাম।
গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান॥

'পদ্ম পুরাণে'র রচয়িতা কবি বিজয় গুপ্ত সুলতান হুসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক' বলে অভিহিত করেন।

সতের শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। আঠার শতকের গোড়ার দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে বাংলাদেশ কিছুকালের জন্য আবার একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তবে এই অঞ্চলের শাসক শ্রেণী পনের ও ষোল শতকের স্বাধীন সুলতানরা বা আঠার শতকের স্বাধীন নবাবরা কেউই যথার্থ অর্থে বাঙালী ছিলেন না।

এই উপমহাদেশে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় পাশ্চাত্যের প্রভাবে। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের দৌলতে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত এই শ্রেণী

সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজ শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই উপমহাদেশের পুরাতন ঐতিহ্যিক সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন স্থান ছিল না বলা যায়। ইংরেজ রাজত্বকালে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ও শাসন কার্য পরিচালনার ব্যাপারে সহযোগিতার ফলে এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগ নাগাদ এই শ্রেণী ছিল প্রধানত হিন্দুদের দ্বারা গঠিত। হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবমুখী। মুসলিম রাজত্বকালে তারা অনেকেই রাজভাষা ফারসী এবং এমনকি আরবী শিখতে দ্বিধা করে নি, এবং মুসলমান রাজত্বকালে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে। তেমনি ইংরেজের রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দুরা সাগ্রহে নতুন শাসকশ্রেণীর ভাষা ইংরেজি শিখতে সর্বাধিক আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন এবং বিশেষ করে আঠার ও উনিশ শতকের ইউরোপীয় উদারনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। তাছাড়া তারা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে নানা দিক দিয়ে লাভবান হয়েছে। হিন্দু সমাজের আর্থিক বুনিয়াদও তুলনামূলকভাবে মুসলমান সমাজের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিমূল ছিল বরাবরই দুর্বল। এ দেশের মুসলমানরা সাধারণত ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন উৎসাহ দেখায় নি। ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু বণিক ও মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বৃটিশ শাসনের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি হিন্দুদের হাতে ছিল। নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় (১৭০০—১৭২২) বাংলাদেশের জমিদারদের তিন চতুর্থাংশ এবং অধিকাংশ তালুকদার ছিলেন হিন্দু। মুঘল শাসনব্যবস্থার অধীনে নবাব মুর্শিদকুলি বহুসংখ্যক হিন্দুদের রাজ কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। বস্তুত মুসলমান শাসনামলে এ দেশের রাজস্ব বিভাগের চাকুরি প্রায় একচেটিয়া হিন্দুদের হাতেই ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কেবলমাত্র বিচার বিভাগের দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। তবে এঁদের অধিকাংশ বিচারক উকিল ও আইনজীবী ছিলেন বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর। তাঁরা বাঙ্গালী ছিলেন একথা বলা যায় না। মুসলমান আমলে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল মুসলিম রাজশক্তির উপর

নির্ভরশীল। সেই রাজশক্তি যখন ভেঙে পড়ল তখন সেই শক্তির উপর নির্ভরশীল আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদেও ভাঙন দেখা দিল।

উনিশ শতকে এই উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই চ্যালেঞ্জটা ছিল একদিকে অন্তর্নিহিত অবস্থা থেকে উদ্ভূত। আঠার শতকের শেষের দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার ভেতর থেকে এর আবির্ভাব। অন্যদিকে এই চ্যালেঞ্জটা এসেছিল বাইরে থেকে। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা থেকে এর উৎপত্তি। এই ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠাকে কেবল শাসক-গোষ্ঠির পরিবর্তন বলা যায় না। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে ইংরেজদের মাধ্যমে এসেছিল ইউরোপের নব্য চিন্তাধারা যা এ দেশের জীবন ও মানস-ভুবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে উনিশ শতকে এই উপমহাদেশে যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয় তার পটভূমি রচিত হয়েছিল আঠার শতকের শেষের দিকের বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, যদিও ভারতের ইতিহাসে আঠার শতক ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাঙন ও অবক্ষয়ের যুগ। চিন্তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই যুগটা ছিল সৃষ্টিশীল এই অর্থে যে, সমকালীন ইউরোপের মত এই যুগে ভাবনার জগতে এক আলোড়ন দেখা যায়। ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রে বিদ্যমান রক্ষণশীলতার পাশে এক নতুন আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী ও সমন্বয়ধর্মী ধারার উন্মেষ ঘটেছিল। এই ধারাটিকে চোদ্দ ও সতের শতকের মধ্যবর্তী সময়কালের হিন্দু ও ইসলামের মরমী ধারার উত্তরসূরী বলে অভিহিত করা যায়। এই ধারা ছিল প্রধানত লোকজ, এবং তা বিশেষ করে বাংলার জনজীবনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কর্তাভজা ও বাউল সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সব সম্প্রদায়ের লোকেরা সমাজ ও ধর্ম ক্ষেত্রে সকল রকম বিভেদ ও বিরোধ দূর করে এক সার্বিক সমন্বয় ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছিল। আঠার শতকের শেষ নাগাদ উপমহাদেশের ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে এইভাবে পরমতসহিষ্ণুতার ধারা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ওলন্দাজ পরিব্রাজক স্টাভোরিনাস (তিনি ১৭৬৮ এবং ১৭৭১ সালের মধ্যে ভারত ভ্রমণ করেন) এ দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্যের নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জনৈক ইংরেজ উইলিয়াম হেনরী টোন যিনি পেশওয়ার অধীনে পদাতিক সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ১৭৭৯ সালের পুনা শহর সম্বন্ধে

এই উক্তি করেন—'মারাঠা সম্প্রদায়ের রাজধানী পুনা, যেটি ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি, সেখানে অনেক মসজিদ এবং একটি গির্জা দেখতে পাওয়া যায় যেখানে দুই ধর্মের উপাসকবৃন্দ কোন প্রকার অসুবিধা বা বাধার সম্মুখীন না হয়ে নিজেদের ধর্মমত অনুযায়ী উপাসনা করেন।' তেমনি উনিশ শতকের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ হোরেস হাইম্যান উইলসনের ১৮৪০ সালে প্রদত্ত একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—'যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে হিন্দু আইনের সঙ্কলনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাঁরা তাঁদের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, সকল প্রকার ধর্মের উপাসনা পদ্ধতিতে সমান গুণ রয়েছে ; বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য এবং ধর্মীয় ব্যাপারে বৈচিত্র্য, তাঁদের মতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্ট। কারণ একজন চিত্রশিল্পী যেমন নানা রং দিয়ে তার ছবিকে সুন্দর করে তোলে কিংবা একজন মালী বিভিন্ন রং-এর ফুলের গাছ লাগিয়ে তার বাগানকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি ঈশ্বর প্রত্যেক গোষ্ঠীকে দিয়েছেন তাদের নিজস্ব ধর্ম, যাতে মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে পারে। সব পদ্ধতির উদ্দেশ্য এক ঈশ্বরের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।'

বস্তুত মধ্য যুগের রাজনৈতিক মঞ্চে হানাহানির নেপথ্যে দেশের হিন্দু ও মুসলিম জনজীবনে এক মিলন ও সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় এ দেশের সমাজে, সাহিত্যে এবং শিল্প-সংস্কৃতিতে। বাংলাদেশে এই ধারা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উনিশ শতকের প্রথমাবধি বাংলাদেশের নগর অঞ্চলের কিছু সংখ্যক বিদগ্ধ মানুষের জীবন ও মানস পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাব-আন্দোলনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং বলা যেতে পারে তার ফলেই বাংলায় তথা ভারতে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে। এই প্রক্রিয়া ইউরোপের অনুকরণে 'রেনেসাঁ' বলে আখ্যায়িত হয়ে এসেছে। তাই উনিশ শতকের 'বাংলার রেনেসাঁ' বলতে ঐ শতকের প্রথমাবধি নগরবাসী পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন ও মানসে যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বা পরিবর্তনের সপক্ষে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেটাকেই বোঝায়। সাম্প্রতিককালে এই রেনেসাঁর চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। প্রশ্ন উঠেছে—কোন্ অর্থে কিংবা বিচারে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁ-ভাবনা সমগোত্র সম্পর্কিত? অথবা 'বাংলার রেনেসাঁ' ব্যাপারটাকে যদি মেনেই নিই, তবু কথা থেকে যায়—

ব্যাপারটা সামগ্রিক কি না ধর্ম বিশ্বাস, বিত্ত ও সামজিক অবস্থান নির্বিশেষে?

যাই হোক পূর্বোক্ত কথাটির জের টেনে বলি বিগত প্রায় চার দশক ধরে যাঁরা বাংলার রেনেসাঁ নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা এই আন্দোলনের আধুনিকীকরণের চরিত্রটির উপর জোর দিয়েছেন। এই আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে চিন্তার দিক দিয়ে প্রাথমিক-ভাবে কেউ ছিলেন রক্ষণশীল, কেউ ছিলেন সংস্কারপন্থী, আবার কেউ ছিলেন অতি অগ্রসারী চরমপন্থী। রেনেসাঁ যুগের ঐতিহাসিকরা যে সকল তথ্য নিয়ে গবেষণা করেছেন সেগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই আন্দোলন কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—যেমন রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪—১৮৬৭), রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩) এবং হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ইউরোপীয় শিক্ষক যুক্তিবাদ ও মুক্ত চিন্তার ধারক ডিরোজিওর (১৮০৯—১৮৩১) অনুসারী বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দু যুবক যাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪—১৮৭৬) এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বলা হয়ে থাকে, উনিশ শতকের আধুনিকতার প্রক্রিয়া বাংলার মুসলমান সমাজের উপর তেমন রেখাপাত করতে পারে'নি। এই উক্তির সপক্ষে উল্লেখ করা হয় যে, এ যুগের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা সবাই ছিলেন সনাতনী ঐতিহ্যের ধারক। তাঁদের চিন্তাধারা ছিল মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন এবং যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৭), বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নেহায়েৎ জাগতিক প্রয়োজনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, তবে তাঁদের মন ও মানসিকতা ছিল মূলতঃ আধুনিকতা-বিমুখ। উক্ত ধরনের মতবাদের প্রধান উৎস হল—১৮৭১ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম হাণ্টারের সুবিখ্যাত পুস্তক 'The Indian Musalmans'। এই পুস্তকে বৃটিশ সিভিলিয়ান হাণ্টার সায়েব সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের সমস্যাগুলি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। হাণ্টারের মতে উনিশ শতকে মুসলমানদের অবনতির প্রধান কারণ হল তাদের রক্ষণশীল মনোভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং আর্থিক অবক্ষয়। বাংলার মুসলমানদের সম্বন্ধে হাণ্টার সায়েব অন্য যে সব ঢালাও মন্তব্য করেছিলেন, যেমন ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান

জমিদারী হিন্দুদের হাতে চলে যায়, এবং ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের রিজাম্পশন প্রোসিডিংস অর্থাৎ পুনরাধিকার মামলা-মোকদ্দমার ফলে অবশিষ্ট মুসলমান জমিদাররাও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন—তথ্যসমর্থনবিহীন এই ধরনের উক্তি ঐতিহাসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হলেও অধিকাংশ মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ এগুলিকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। হান্টারের বই ছাড়া অন্য যে সব তথ্যাদিতে মুসলমানদের রক্ষণশীলতা ও অনগ্রসরতা সম্বন্ধে মন্তব্য পাওয়া যায় সেগুলি হল প্রধানতঃ সরকারী নথিপত্র, ইংরেজী সংবাদ ও সাময়িকপত্র এবং বেশ কিছু সংখ্যক ধর্মীয় পুঁথি ইত্যাদি। এগুলিতে উত্তরভারতে 'ওয়াহাবী'দের তৎপরতা, পশ্চিমবঙ্গে তীতুমীরের বিদ্রোহ এবং পূর্ববঙ্গে ফরায়জী আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই সময়কালে মুসলিম মানসভুবনে কি ঘটেছে তার খবর খুব কমই পওয়া যায়। তা ছাড়া ধর্মবিষয়ক ছাড়া কেবলমাত্র জাগতিক বিষয়ে রচিত সাহিত্যের সারমর্ম সম্বন্ধেও কোন বিশেষ আলোচনা হয়নি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর মনোজাগতিক ভাষা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত ছিল প্রধানতঃ ফারসী। বস্তুতঃ মুঘল আমলের এই রাজভাষা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের কালেও ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত সুবিধা পেয়ে আসছিল। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে মুসলিম মানস এবং বিশেষ করে মুসলিম সমাজচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে ফারসী ভাষায় রচিত প্রকাশিত সাময়িক পত্র পত্রিকা, ক্ষুদ্রকলেবর পুস্তক পুস্তিকা এবং অপ্রকাশিত কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি থেকে তথ্যানুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন।

এই সব আকর-উপকরণ থেকে আমরা এমন একজন মুসলমান বুদ্ধিজীবীর সন্ধান পেয়েছি যিনি কেবল উনিশ শতকের বাংলার মুসলিম সমাজেরই নয় কালোত্তীর্ণ অসাধারণ প্রতিভাধরদের অন্যতম। তিনি হলেন আবদুর রহীম (আনুমানিক ১৭৮৫-১৮৫৩)। ব্যতিক্রমধর্মী ও প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী মতবাদের কারণে তিনি দাহ্‌রী নামে পরিচিত ছিলেন। আবদুর রহীম দাহ্‌রী ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁর সবচেয়ে অগ্রগামী ও চরম-পন্থী চিন্তানায়ক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর সমসাময়িক এবং উভয়ের চিন্তাধারার মধ্যেও এক আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ উনিশ শতকের প্রারম্ভকালে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা সকলেই চিন্তার দিক দিয়ে রক্ষণশীল এবং আধুনিকতা-বিমুখ ছিলেন এমন কথা এখন জোর

দিয়ে বলা যাবে না। কেননা উনিশ শতকের মুসলিম চিন্তাক্ষেত্রে আধুনিকতা এবং আমূল সংস্কারবাদী ধারা বিদ্যুৎচমকের ন্যায় দেখা দিয়েছিল—এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য ইদানীং আমরা পেতে শুরু করেছি। যদিও ইসলামের সনাতনী ধর্মবিশ্বাসে নমনীয়তার অস্তিত্ব ও স্বীকৃতি তেমন নেই বলা চলে, এতদ্‌সত্ত্বেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামী চিন্তা ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের একটা স্থান সব সময়েই লক্ষ্য করা গেছে। সম্ভবতঃ এর প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় খৃস্টীয় নয় শতকে আরব দেশের মুতাজিলা দার্শনিকদের মতবাদের মধ্যে। মুতাজিলা নামে পরিচিত আরব দার্শনিকরা প্রাচীন গ্রীক যুক্তিবাদী দর্শন, বিশেষ করে এ্যারিস্টটলের যুক্তিন্যায় বিদ্যার দ্বারা গম্ভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে সুদীর্ঘ কালব্যাপী সেই উভয়-সঙ্কট পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন—কি প্রকারে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় ঘটানো যায়। চিন্তার ক্ষেত্রে দুঃসাহসী এই অভিযান রক্ষণশীল, মৌলবাদী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধিতার দরুণ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। তবে তাই বলে ভাবনাটা কদাপি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। এবং ইসলামের মনোজাগতিক ঐতিহ্যে উক্ত মানসচিন্তার নিদর্শন সব সময়েই থেকে গেছে।

উনিশ শতকের ভারতে সে যুগের উদার পরিবেশে এই যুক্তিবাদী চিন্তার ধারাটি কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। তারই অন্যতম প্রধান ধারক আমাদের পূর্বোক্ত আবদুর রহীম দাহরী। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে এই যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ আবদুর রহীম সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করা গেছে। তা থেকে জানা যায় উত্তর প্রদেশের গোরখপুর নিবাসী দরিদ্র তন্তুবায় পরিবারের সন্তান আবদুর রহীম আপন অধ্যবসায়ে আরবী-ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। নানা বিষয়ে বিশেষ করে দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে তিনি জ্ঞানার্জন করেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেম। ফারসী ভাষায় তিনি কবিতা চর্চা করতেন। ছাত্রাবস্থায় আবদুর রহীম ছিলেন (ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা) রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদের সহপাঠী। প্রথম যৌবনে দিল্লীর সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার পরিমণ্ডলে তাঁর মানসভুবন লালিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল। এবং পরিণতিতে এই পুরুষকে দেখি সর্বপ্রকার কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধী—তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস চিন্তার স্বাধীনতায়, যুক্তিবাদে এবং প্রকৃতির নিয়মে। তাঁর মতে সূর্যই হচ্ছে সকল সৃষ্টির উৎস।

১৮১০-এ পঁচিশ বছর বয়সে আবদুর রহীম কলকাতায় এসে স্থায়ী বাস

শুরু করেন। পাশ্চাত্য ইংরেজ শাসনের রাজধানী এই কলকাতাকে তাঁর ভাল লেগেছিল। কারণ এইখানে তিনি পান সর্বমুক্ত বিশ্বজনীন পরিবেশ যা কি না সকল ধরনের মানুষ এবং সর্ব প্রকারের চিন্তার জন্য মুক্ত। কলকাতায় এসে আবদুর রহীম ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই সে ভাষায় অধিকার অর্জন করে ইউরোপীয় জ্ঞানের সঙ্গে সেতুবন্ধন স্থাপনে সমর্থ হন। এর দরুণ তাঁর চিন্তাধারা আরও তীক্ষ্ণ হয়, তাতে নবতর মাত্রাসমূহ যুক্ত হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে বিশেষ লক্ষণীয় যে, কলকাতার জীবনে আবদুর রহীমকে কেন্দ্র করে সেখানে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন নতুন একটি মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে ওঠে। এই কারণেই বলছি যে, উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশে আগত এই ব্যক্তি যিনি অবশ্যই প্রবাসী এবং যাঁর মাতৃভাষা, মননের ভাষা অবশ্যই বাংলা নয় তাঁর নেতৃত্বে এদেশে প্রথম বারের মত রেনেসাঁ-ভাবনার সূত্রপাত—সমগ্র ব্যাপারটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। আবদুর রহীম প্রসঙ্গে আমরা তাঁর সমকালীন ডিরোজিওর উল্লেখ করেছি। বস্তুতঃ ডিরোজিওর মতই তিনি সংশয়বাদী ছিলেন। এবং ডিরোজিওর মতই তিনি জ্ঞানচর্চার একটি পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যায় প্রখ্যাত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ আল্ ওবায়দী (১৮১৪-১৮৮৫)। ওবায়দীর নিজের উক্তি অনুযায়ী তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন তাঁর মহান শিক্ষাগুরু আবদুর রহীমের নিকট থেকে। মনে হয় আবদুর রহীমের যুক্তিবাদী মতাদর্শ তাঁর প্রিয় ছাত্র ওবায়দুল্লাহ্'র চিন্তা-ধারাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। মৃত্যুর মাত্র এক বছর পূর্বে তিনি তাঁর বন্ধু ব্রাহ্ম সমাজের নেতা রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯) অনুরোধে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে রামমোহন রায়ের বিখ্যাত পুস্তিকা 'তুহ্ফাত্-উল-মাওয়াধ্-হিন্দীন' (আরবী শিরোনাম ও ভূমিকাসহ মূল ফারসী ভাষার রচিত এবং ১৮০৪/৫ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত) ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই পুস্তিকায় রামমোহন কেবল হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজারই কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তা নয়, গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলমানদেরও অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করার প্রবণতাকেও তাঁর সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। রামমোহন দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, সকল ধর্মে কিছুটা অসত্য নিহিত রয়েছে।

যাই হোক এইভাবে দেখা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের প্রারম্ভ

কালপর্বে রেনেসাঁ আন্দোলনের যুক্তিবাদ কেবলমাত্র হিন্দু সমাজে নয়, বহুবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজেও বেশ কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল আবদুর রহীম এবং তাঁর ভাবশিষ্য মৌলানা ওবায়দীর মাধ্যমে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা আর একজন বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎ পাই, তিনি আধুনিকতার ধারক নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৭) এবং সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯—১৯২৮) সমসাময়িক, কিন্তু চিন্তা ক্ষেত্রে তাঁদের উভয়ের অপেক্ষা অনেক বেশি আধুনিক ও অগ্রগামী। বাংলাদেশে রেনেসাঁ-ভাবনার অঙ্গনে বাঙ্গালী মুসলমান এই চিন্তানায়ক দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০—১৯১৩)। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করি, আবদুর রহীম বাসা বেঁধেছিলেন কলকাতায়। আর দেলওয়ার হোসেন আদ-পেই বাংলার সন্তান। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলায় তাঁর জন্ম। শিক্ষা জীবন, ক্যালকাটা মাদ্রাসায় এবং ১৮৬১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেলওয়ার হোসেন সম্ভবতঃ এই উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট।

দেলওয়ার হোসেনের কর্মজীবন শুরু হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে এবং সরকারী চাকরিতে যোগ্যতার সঙ্গে তিনি কাজ করেন সুদীর্ঘ তিরিশ বছর। এই সময়কালে তিনি বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় চাকরি করেন। সরকারি চাকরিতে থাকাকালান দেলওয়ার হোসেন মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তিনি ইংরেজীতে লিখতেন এবং তাঁর প্রবন্ধাদি বিভিন্ন ছদ্মনামে প্রকাশিত হত - যেমন 'ইসমাহু আহমদ', 'মুতাজিলাহ্' এবং 'সাইদ' ইত্যাদি। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডে তাঁর পুস্তক 'Essays on Muhammadan Social Reforms'।

অবসরগ্রহণের পর তিনি আপন সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা-প্রবন্ধাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার The Muslim Chronicle, Muhammadan Observer এবং The Musalmans পত্রিকায়। দেলওয়ার হোসেনের এই সব লেখা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি সমকালীন পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও উদারনীতিক মতাদর্শের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সহায়তায় তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে মুসলমানদের অবনতির কারণসমূহ তাদের নিজেদের অতীত

ইতিহাস, তাদের আইন-অনুশাসন এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাঁর গভীর জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁকে একজন অনন্য রেনেসাঁ ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক বলে অভিহিত করা যায়। বস্তুতঃ আধুনিক যুগের মুসলিম চিন্তা-নায়কদের মধ্যে দেলওয়ার হোসেনই সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামের এমন কতকগুলি আইন-অনুশাসন যেগুলি মূল ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, যুগের প্রয়োজনে সেগুলিকে পরিবর্তন করার এমনকি বিসর্জন দেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদের উন্নতির পূর্বশর্ত হল যে সব বিধান সমাজের অগ্রগতির অন্তরায় বলে মনে হয় সেগুলি হয় বদলানো অন্যথায় তুলে দেওয়া। দেলওয়ার হোসেনের মতে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মূল কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে তাদের অতিরিক্ত ব্যয় করার প্রতি প্রবণতা, তাদের স্বভাবসিদ্ধ অলসতা এবং অদৃষ্ট-বাদে বিশ্বাস ইত্যাদি। তাঁর মতে মুসলমানদের সুদগ্রহণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা পুঁজি-বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধাস্বরূপ। তেমনি তিনি আরো মনে করতেন, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন যুগের প্রয়োজনে বদলানো দরকার। কারণ এটিও মুসলমান সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে একটা বিরাট বাধা স্বরূপ। ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর কতিপয় দৃঢ় ধারণা ছিল। ধর্ম এবং স্বধর্মীয়দের জাগতিক জীবন বিষয়ে, এবং এ দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত তিনি তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহে ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণতঃ যেমন— অবনত মুসলমানদের উন্নতির জন্যই তাদের দৈনন্দিন জীবনের জাগতিক আইনকে ধর্মের আওতামুক্ত করা দরকার; পরিবর্তনশীল সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বস্তুগত চাহিদাকে কোন চিরন্তন ধর্মীয় বিধান দ্বারা মেটানো সম্ভব নয়; মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাদের ধর্মাচারের অন্ধ গোঁড়ামী এবং সহনশীলতার অভাব; রাষ্ট্রীয় জীবন ও আইন থেকে ধর্মের ক্ষেত্রকে পৃথক করা দরকার, ইত্যাদি। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম থাকার কারণে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেলওয়ার হোসেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাবই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। তিনি দেখিয়েছেন যে কোন মুসলমান রাজ্যে রাজার স্বৈরাচারকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন পন্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ পাশ্চাত্যের অধিকাংশ উন্নত দেশে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান তিনি, সম্রাট, রাজা বা প্রেসিডেন্ট যে নামেই অভিহিত হোন না কেন, তাঁর ক্ষমতা

সুনির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে মুসলমান দেশসমূহে রাষ্ট্রপ্রধানকে দেশবাসীর কাছে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি দিতে হয় না এবং মনে হয় তিনি যেন আইনের উর্ধ্বে বিচরণ করেন।

দেলওয়ার হোসেন ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের একত্রীকরণ মুসলমান সভ্যতার বিকাশকে ব্যাহত করেছে। এবং চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাবের ফলে মুসলমানরা আধুনিককালে জ্ঞানের রাজ্যে বিশেষ অবদান রাখতে পারছে না। অন্য যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সমকালীন মুসলমান সমাজের উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করছে বলে তিনি মনে করতেন সেগুলিকেও দেলওয়ার হোসেন চিহ্নিত করেছিলেন। এগুলির মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লেখ্য—

১. যেহেতু পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র আরবী ভাষায় পড়া হত, দেশের মুসলমানদের অধিকাংশই কুরআন-বাণীর অর্থ বুঝতে পারে না; ফলে কুরআনের মর্মবাণী তাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে যায়;

২. মুসলমান সমাজে অমিতব্যয়িতা;

৩. পর্দা প্রথা;

৪. বহুবিবাহ;

৫. উপপত্নী রাখার প্রথা;

৬ দাস প্রথা। (যদিও ১৮৪৩ সালে বৃটিশ ভারতে দাস প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়, তদ্‌সত্ত্বেও এই প্রথা বেশ কিছুকাল কোন না কোনভাবে বজায় ছিল।)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকে অর্থাৎ দেলওয়ার হোসেনের কালে বাংলার মুসলমান সমাজ দুভাগে বিভক্ত ছিল ঃ (ক) নগরবাসী অভিজাত শ্রেণী, যাঁরা ছিলেন উর্দুভাষী এবং নিজেদের বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর বলে দাবী করতেন, এবং (খ) বাংলাভাষী গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ। অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানরা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করতেন এবং তাঁরা নিজেদের বহিরাগত আশরাফ বা অভিজাত পরিচয় নিয়ে বিশেষ গর্ব অনুভব করতেন। বস্তুতঃ তাঁরা ছিলেন প্রাক্-বৃটিশ আমলের সামন্তবাদী অভিজাত শ্রেণীর বংশধর। বাংলার জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুষ্টিমেয় হলেও বহুকাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব তাঁদের হাতেই ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারের ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ করায় নীতির ফলে মুঘল আমলের রাজভাষা ফরাসীর

প্রাধান্য কোম্পানীর আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত বজায় ছিল। বস্তুতঃ ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর কোর্ট কাছারীতে ফারসী ভাষার প্রচলন ছিল এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই ভাষার বিশেষ সমাদর ছিল। এর ফলে কিন্তু মুসলমানদের মনে নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনেক মুসলমান বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা যুগযুগ ধরে বাংলাদেশে বসবাস করলেও নিজেদেরকে আরবী ফারসীভিত্তিক মধ্য প্রাচ্যীয় সংস্কৃতির ধারক বলে মনে করতেন। নিজেদের কখনও বাঙালী বলে পরিচয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে নি, এবং তাঁরা বাংলা ভাষা শেখার প্রয়োজনও বোধ করেন নি; বাংলা ভাষাকে তাঁরা মনে করতেন নিম্ন শ্রেণীর ভাষা। অন্যদিকে গ্রাম বাংলায় সাধারণ মানুষ অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান; তাঁদের যেমন মাতৃভাষা বাংলা এবং সংস্কৃতি ছিল লোকজ, যে সংস্কৃতির জন্ম এই বাংলার মাটিতে। এই সকল মানুষ ছিলেন দরিদ্র ও অশিক্ষায় নিমগ্ন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন তাঁরা হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিলেন তেমনি তাঁরা ছিলেন ইংরেজ নীলকরদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারে জর্জরিত। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যখন দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের মুসলমান কৃষক তাঁতী ও জেলে প্রভৃতি লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উর্দুভাষী অবাঙালী মোল্লাদের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে লিপ্ত হয়ে পড়েন। নগরবাসী শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের সুখ দুঃখ নিয়ে কদাপি মাথা ঘামায় নি। ফলে কৃষকদের মধ্য থেকে এক নতুন নেতৃত্ব বেরিয়ে এসেছিল; এই নেতৃত্ব অল্পশিক্ষিত হলেও এর মনোবল ছিল সুদৃঢ় এবং এর চরিত্র ছিল কিছুটা গণতান্ত্রিক। কিন্তু এর প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, তীতুমীর, হাজি শরায়াতউল্লাহ বা দুদু মিয়ার মত গ্রামীণ নেতৃবৃন্দের সমকালীন ব্যাপক আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ প্রকৃত মাত্রায় উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল না। তাঁরা ঐ সমস্যাগুলিকে অতীতের ধর্মীয় বিধান দিয়ে সমাধান করতে গিয়ে চরমভাবে ব্যর্থ হন। এর ফলে এবং স্বার্থদ্বেষী মহলের কূটকৌশলে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিরোধ যা পরবর্তী-কালে বাংলার জনজীবন কলুষিত করেছিল।

উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম জীবন ও মানসের এই পটভূমিতে দেলওয়ার হোসেনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তিনি নিজে ছিলেন আশরাফ শ্রেণীর মানুষ। তবে রেনেসাঁ-ভাবনার ফসল দেলওয়ার

হোসেন যথাযথই উপলব্ধি করেছিলেন যে, নগর-দেশাঞ্চলের সেতুবন্ধন ব্যতীত তাঁর স্বধর্মীয় কোটি সাধারণের মুক্তির ও উন্নতির অন্যতর পথ নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাংলার মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজী ও বাংলা এই দুটো ভাষা শেখা অপরিহার্য। দেলওয়ার হোসেন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন মাদ্রাসাগুলিতে যে ধরনের শিক্ষা নেওয়া হত সেটা ছিল যুগের প্রয়োজন মিটাতে একেবারে ব্যর্থ। সুতরাং তাঁর মতে যে-শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে মূল্যহীন এবং ভবিষ্যতেও কোন কাজে লাগবে না এমন ব্যবস্থার পিছনে অর্থব্যয় করা অনুচিত। দেলওয়ার হোসেন মুসলমানদের বাংলা ভাষা চর্চার জোরালো পরামর্শ দেন। তাঁর বক্তব্য হল, এতদিন মুসলমানরা বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণী বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে সমগ্র মুসলমান সমাজের ক্ষতি করেছেন। এর ফলে নগরবাসী শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে গ্রামের সাধারণ মানুষের ব্যবধান অনেকখানি বেড়ে গেছে। দেলওয়ার হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলার মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর লোকদের যত শীঘ্র সম্ভব উর্দুকে বাদ দিয়ে বাংলাকেই নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে যেহেতু সকলের পক্ষে ইংরেজী ভাষা শেখা সম্ভব নয় সে জন্য একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশের সাধারণ মানুষ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। সে জন্য তিনি সুপারিশ করেন যে তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তাঁদের দায়িত্ব হল বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের উপর ইংরেজী ভাষায় রচিত মৌলিক পাঠ্যপুস্তকাদি বাংলা ভাষায় তর্জমা করা। তিনি মনে করতেন এইভাবে পাশ্চাত্য জগতের প্রগতিশীল চিন্তাধারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে দেলওয়ার হোসেনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা সমকালীন মুসলমান সমাজে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি। মুসলমান সমাজ রক্ষণশীল ও প্রাচীন ঐতিহ্যের গুরুভার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে নি। দেলওয়ার হোসেনের চিন্তার বেশ কিছুটা স্ববিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ উনিশ শতকের বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিবেশে প্রায় সকল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই এই স্ববিরোধিতা কোন না কোন ভাবে বিদ্যমান ছিল। এই প্রসঙ্গে দেলওয়ার হোসেনের হিন্দু সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের প্রথম গ্রাজুয়েট (১৮৫৮) এবং দেলওয়ার হোসেনের মতই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি

কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। উভয়েই পাশ্চাত্য দুনিয়ার আধুনিক চিন্তাবিদ জেরেমী বেন্‌থাম (১৭৪৬-১৮৪২) এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) উদার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র বা দেলওয়ার হোসেন কেউই সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমের রচনায় যেমন মুসলিম-বিরোধী অযৌক্তিক ধারা দেখা যায়, তেমনি দেলওয়ার হোসেনের লেখাতেও হিন্দু বিদ্বেষ বিদ্যমান। বস্তুতঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তারই কিছুটা প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় দেলওয়ার হোসেনের রচনায়। উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থেকে এ দেশে সুস্থ ও প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এই প্রকার সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও বলতে চাই যে, উনিশ শতকের বাংলায় আবদুর রহীম ও রামমোহন থেকে শুরু করে দেলওয়ার হোসেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন কালক্রমে তা বাঙালীর আত্মসচেতনতাকে জাগ্রত করতে এবং বাঙালীকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেকটা সহায়তা করেছিল। এই আন্দোলনকে অবশ্য পনের শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে উপমিত করা যথার্থ হবে না—এ-কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবু বাংলার এই আন্দোলনকে অবমূল্যায়ন করবারও কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে মুসলমান সমাজে চিন্তার ক্ষেত্রে আবদুর রহীম এবং দেলওয়ার হোসেন যে যুক্তিবাদী ধারার প্রবর্তন করেছিলেন নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। তার একটি ক্ষীণ ধারা বর্তমান শতকের প্রথম দিকে সঞ্জীবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে ১৯২৬-এর দিকে। সে বছর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ, যার মুখপত্র ছিল 'শিখা' পত্রিকা এবং এই গোষ্ঠীর আদর্শ ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' সাধন। মুসলমান সমাজকে সর্ব প্রকার অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করাই ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এইভাবে উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম সমাজে সংস্কারমুক্ত যে ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যেন সাহিত্য সমাজের ক্রিয়াকাণ্ডে এবং 'শিখা' পত্রিকার প্রকাশনায়।

বাংলা মৃৎশিল্পের ত্রিধারা

অশোক ভট্টাচার্য

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে, প্রখ্যাত জর্মান ভারততত্ত্ববিৎ হাইন্ৎস মোদে কলকাতার কয়েকজন তরুণ ঐতিহাসিক-গবেষকের কাছে গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের আসন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনে যে বড় রকমের অদল-বদল ঘটবে, এবং এক প্রজন্মকালের মধ্যেই যে আমাদের পরম্পরাগত লোকায়ত শিল্পগুলি তার এত দিনের প্রবহমানতা হারিয়ে বিনষ্টির পথে এগোবে—এটা তিনি তাঁর ঐতিহাসিক বোধে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তবে এ কথা আমরা আত্মশ্লাঘার সঙ্গেই উল্লেখ করতে পারি যে এর আগেই, ১৯৪১ সালে, কয়েকজন অগ্রণী বাঙালী ঐতিহাসিক ইতিহাসের এই অনিবার্য ফলশ্রুতি প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মকে কেন্দ্র করে একটি "রুরাল আর্ট সার্ভে স্কীম" গ্রহণ করেছিলেন। এই স্কীমে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব-ভারতের গ্রামীণ লোকায়ত শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজজীবন সম্পর্কে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করে তার বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ এবং নানান লোকশিল্পের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। বলা বাহুল্য, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দুরূহ প্রকল্পটি তখনই চালু করা সম্ভব হয় নি। তার সামান্য পরিমাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হয় ১৯৪৭ সালে আশুতোষ মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর দেবপ্রসাদ ঘোষের তত্ত্বাবধানে, বহু উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিক, সমাজ-নৃতাত্ত্বিক এবং শিল্পপ্রেমিকের মিলিত উদ্যোগে। এরই ফলে পরবর্তী দশ বছরে এই সংগ্রহশালায় কেবল বাংলার নয়, ওড়িশা, বিহার, আসামেরও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পের এক বিচিত্রমুখী সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। এই সংগ্রহের নানান ধরণের গড়নের ও বর্ণের পুতুল, খেলনা এবং পূজা-পার্বণ-ব্রতের অনুষঙ্গ মূর্তিগুলি এক অপসৃয়মান গ্রামীণ সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে ক্রমশই গুরুত্ব লাভ করবে। কিন্তু দুঃখের কথা এখনও পর্যন্ত এই সব সস্তা দামের পুতুলগুলির প্রতি আমাদের শিল্প-গবেষক ও রসিকেরা যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না। তাঁরা যে আগ্রহে প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তিগুলি, এমন কি পুথিচিত্রগুলি অনুধাবন ও অনুশীলন করছেন, তার

কিছুই এদের প্রতি দেওয়া হচ্ছে না—এমন কি আজকের এই "জনগণতান্ত্রিক" রাজনৈতিক পরিবেশেও। অথচ একথা কে অস্বীকার করবে যে এই সব লোকায়ত পুতুল-খেলনা-ব্রতের ছোট ছোট সস্তা মূর্তিগুলির মধ্যেই বিমূর্ত হয়ে আছে আমাদের লোকমানস—তার ধর্ম ও নান্দনিক বোধ নিয়ে। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমরা আমাদের বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীকে তাই চেষ্টা করবো এই সব স্বল্পমূল্যের শিল্পকর্মগুলির প্রতি আকৃষ্ট করতে—এদের বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে।

নদীমাতৃক উপত্যকায়, যেখানেই মানুষের আদি সভ্যতাগুলির জন্ম, সেখানেই মাটি তার সহজলভ্যতার কারণে এবং জলনিষিক্ত অবস্থায় তার কমনীয়তার গুণে, এক লোকপ্রিয় ব্যবহারিক শিল্পের উপাদান বা মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশেষত, পোড়ামাটির কাঠিন্য ও দীর্ঘস্থায়িতা মৃৎশিল্পকে সভ্যতার আদি কাল থেকেই এক বিশিষ্ট স্থান অর্পণ করেছে। ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় প্রাগৈতিক সভ্যতার পর্বেই এই শিল্প এক ঈর্ষণীয় উন্নতমান অর্জন করেছিল—যার অজস্র নমুনা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালি-বাঙ্গান, লোথাল প্রমুখ স্থান থেকে আবিস্কৃত হয়েছে। কি মৃৎপাত্র রচনায়, কি মাতৃকা মূর্তি অথবা পশু-পাখির রূপদানে সিন্ধু সভ্যতার শিল্পীদের অবদান আজও 'আধুনিক' বলেই প্রতীয়মান হওয়ার যোগ্য। ঐতিহাসিক যুগগুলিতে গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও এই মৃৎশিল্পের ধারা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশেও সেই মৌর্য কাল থেকেই প্রায় সকল ঐতিহাসিক যুগপর্বের টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ও মৃৎপাত্র আবিস্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই ধারাতেই, বলা যেতে পারে, এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে মাটির পুতুল তৈরি হচ্ছে—যদিও সেই ধারা দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। এই আলোচনায় আমরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মাটির খেলনা, পুতুল, মানতের মূর্তিগুলির পটভূমি এবং তাদের সম্ভাব্য শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে বিচার করবো। কেননা, আমরা চাই বা না চাই, তাদের জীবন্ত ধারাটি আর বেশি দিন প্রবাহিত হবে না—তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে থাকবে মিউজিয়মে সংরক্ষিত বস্তু হিসাবেই সংগৃহীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আশুতোষ মিউজিয়ামে মাটির পুতুলগুলির একটি তালিকা পুস্তক ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছে (Catalogue of Folk Art in the Asutosh Museum, Part I by M. K. Pal)। এই তালিকা প্রণয়নে লেখক মৃণালকান্তি পাল শিল্পের বিষয়কেই মাপকাঠি ধরে জেলাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই

প্রারম্ভিক কাজটি প্রশংসনীয় হলেও, এর মধ্য দিয়ে কোনো নান্দনিক বা সমাজ-নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা যায় না। তাই পুতুলগুলির শ্রেণীবিভাগ নিয়ে নতুন আলোচনার প্রয়োজন আমরা অনুভব না করে পারি না।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা প্রসঙ্গত ভারতীয় পোড়ামাটির শিল্প এবং ভারতীয় লোকশিল্প সম্পর্কে যথাক্রমে স্টেলা ক্রামরিশ ও আনন্দ কুমারস্বামীর মতবাদের উল্লেখ করবো। কেননা, এঁদের অবদান স্ব স্ব ক্ষেত্রে এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে তার সঙ্গে অপরিচিত থেকে কারোর পক্ষেই ভারতীয় টেরাকোটা শিল্প বা লোকশিল্প সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা অর্জন সম্ভব হবে না।

ক্রামরিশ ভারতীয় টেরাকোটা সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটি প্রকাশ করেন ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ("Indian Terrocotta", Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol. VII)। এই নিবন্ধে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের পোড়ামাটির শিল্পকর্মগুলি অনুশীলন করে তিনি তাদের দুটি মূল ভাগে বিভক্ত করেন: (১) 'কালাতীত' বা 'কালনিরপেক্ষ' ('ageless' বা timeless) এবং (২) 'কালাশ্রয়ী' বা 'কালক্রমে বিবর্তমান' ('time-bound' বা 'time variant')। তাঁর এই বিভাগ অনুযায়ী 'কালাতীত' হল সেই সব টেরাকোটাগুলি যেগুলির মধ্যে আদিম কলাশিল্পের চরিত্রলক্ষণগুলি আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সরল গড়নের এই সব মানুষ ও পশুপাখির ছোট ছোট মূর্তিগুলি যেমন পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলি থেকে তেমনই, পরিবর্তমান শৈলীর টেরাকোটার পাশাপাশি ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্বেও। ক্রামরিশ সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন: 'এদের সংখ্যা আজও কম নয়, বাংলা, বিহার ও অন্যান্য অঞ্চলের কুমোর ও মেয়েরা সেগুলি আজও তৈরি করছে।" এই সব 'কালাতীত' বা 'এজলেস' টেরাকোটাগুলিকে এখনও নির্মিত হতে দেখা যায় বিশেষ করে রাঢ় বাংলার বিভিন্ন জেলায়—মানতের ঘোড়া, হাতি আর নানান পার্বণের 'প্রিমিটিভ' ধারায় মাতৃমূর্তিরূপে। অন্যপক্ষে, 'কালাশ্রয়ী' বলা হয়েছে সেইসব টেরাকোটা নিদর্শনগুলিকে যার মধ্যে সমকালীন উচ্চমানের ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই বাংলাদেশেই শৈলীর বিচারে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্তশিল্পরীতির অনেক সংখ্যক টেরাকোটা আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্রামরিশের এই বিভাজনগত তত্ত্ব ভারতীয় টেরাকোটা শিল্পের বিচার ও বিশ্লেষণে এক প্রধান অবলম্বন হিসাবে আজ প্রায় সকল শিল্প-ঐতিহাসিকের

কাছেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের বিচারের ক্ষেত্রেও এই বিভাজনরীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

কুমারস্বামীর যে নিবন্ধটি আমাদের আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ সেটি হল : "Nature of 'Folklore' and popular Art" (তাঁর Christian and Oriental Philosophy of Art গ্রন্থে সংকলিত এবং প্রথম প্রকাশিত ১৯৩৬ খ্রীঃ)। এই নিবন্ধটিতে তিনি ভারতীয় পট-ভূমিতে লোকায়ত শিল্পের চরিত্রনির্ধারণে এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে বর্তমানে দুটি শিল্পধারা—'উচ্চশিল্প' ('high art') এবং 'লোকশিল্প' ('popular art')—একে অন্য নিরপেক্ষ-ভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু তিনি মনে করেন ভারতের ক্ষেত্রে এই বিভাজন ভারতীয় সমাজজীবনকে কখনই দুটি ভাগে বিভক্ত করেনি। ভারতেও তিনি দুই ধরণের শিল্পরীতি—'মার্গ' এবং 'দেশী'—লক্ষ করেছেন এবং প্রথমটিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় শিল্পরূপে ('মার্গ' অর্থাৎ 'highway') এবং দ্বিতীয়টিকে সাধারণের মনোরঞ্জনকারী হিসাবে ('লোকানুরঞ্জকম্'; 'দেশী', অর্থাৎ 'byway' বা স্থানীয়)। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে মার্গ শিল্পকে আধ্যাত্মিক শিল্প বলে গ্রহণ করার পক্ষে নই। কিন্তু তাঁর প্রকৃত বক্তব্য সম্পর্কে আমরা একমত যে ভারতীয় সমাজকাঠামোয় এতাবৎকাল যাবৎ মার্গ ও দেশী সংস্কৃতি একই সময় একই পরিবেশে এক সঙ্গে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। কারণ, তিনি যেমন বলেছেন, এই সংস্কৃতিদুটি দুটি ভিন্ন নৃগোষ্ঠী কিংবা দুটি ভিন্ন শ্রেণীর ছিল না, যেমন ছিল দুই ধরণের গুণগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের। এই পার্থক্যটা ততখানি ছিল না কৃষক-সংস্কৃতি থেকে অভিজাত সংস্কৃতির, যতখানি ছিল অভিজাত ও কৃষক সংস্কৃতি থেকে বুর্জোয়া ও প্রলিতারিয়েত নগর সংস্কৃতির। এইভাবে, আমরা দেখি, কুমারস্বামী শিল্পায়ন-পূর্ব কৃষি-ভিত্তিক সমাজের সংস্কৃতি ও ভারী শিল্পায়নের পরবর্তীকালের সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান নির্দেশ করেছেন। আরও সুস্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে—তিনি পার্থক্য টেনেছেন ধনতন্ত্রের বিকাশের পূর্ববর্তী মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির, যাতে সমাজের সকল মানুষের অনামী শিল্প বিকাশ লাভ করতো, আর ধনতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে, যাতে এত বিশেষ ধরণের ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং একাডেমি-অনুমোদিত শিল্পের জন্ম হয়। আমরা মনে করি ভারতীয় সংজ্ঞায় দেশী শিল্প হল সাধারণভাবে জনপদ বা গ্রামাঞ্চলের শিল্প এবং মার্গ হল নগরভিত্তিক সমাজের শিল্প, যা কিনা নাগরিক ও

নাগরিকারা অনুশীলন করতো। স্বভাবই গ্রামীণ দেশী শিল্পে ছিল ধর্মাচারণের প্রাধান্য এবং তুলনায় মার্গ শিল্প ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, ইন্দ্রিয়পোষক ও লোকানুরঞ্জক।

ক্রামরিশ ও কুমারস্বামীর উপরোক্ত মতবাদ দুটি বাংলার পোড়ামাটির শিল্পের আলোচনায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে-তুলতে দুই দিক থেকে সাহায্য করে। প্রথমত, ক্রামরিশ তাঁর আলোচনায় যে প্রশ্ন তুলেছেন তা হল টেরাকোটা শিল্পের রূপ ও নান্দনিক চরিত্রলক্ষণ সম্পর্কিত। অন্যপক্ষে কুমারস্বামী আলোচনা করেছেন লোক-শিল্পের বিষয় ও সামাজিক স্বরূপ সম্পর্কে। এঁরা যাঁর যাঁর অগ্রাধিকার অনুযায়ী আলোচনার দ্বারা টেরাকোটা তথা লোকশিল্প বিষয়ক বিচারে যে বিভ্রান্তি তার অনেকটাই দূর করে সঠিক বিশ্লেষণের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তবু না বলে চলে না যে ক্রামরিশ ও কুমারস্বামী যথাক্রমে লোকশিল্পের এক একটি দিকই শুধু আলোচনা করেছেন। প্রথমজন রূপ বা কর্মের দিকটি এবং দ্বিতীয়জন বিষয় ও সমাজ-সম্পর্কের দিকটি। আমরা চেষ্টা করবো এই দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণকে একত্রিত করে আরও পূর্ণাঙ্গ এক সমাজ-নান্দনিক দৃষ্টিতে বিষয়টির বিচার করতে।

ক্রামরিশ যে ধরণের টেরাকোটাগুলিকে 'কালাতীত' বা 'এজলেস' বলেছেন তা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে ছোটনাগপুর মালভূমির সন্নিহিত পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-উত্তর মেদিনীপুর অঞ্চলে যথেষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের সব থেকে প্রতিনিধিমূলক পোড়ামাটির শিল্পকর্ম হল পুরুলিয়ার গালার আস্তরণ দেওয়া পুতুল এবং বাঁকুড়ার লাল ও কালো রঙের ভিন্ন ভিন্ন মাপের হাতি ও ঘোড়া। পুরুলিয়ার পুতুলগুলি ও বাঁকুড়ার হাতি ও ঘোড়া নিঃসন্দেহেই যে শিল্পরীতিতে প্রস্তুতি তা হল আদিম বা 'Primitive'। বাঁকুড়ার ঘোড়ার সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের বাস্তারের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ঘোড়ার নির্মিতি তুলনা করলে পরস্পরের সেই সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়বে এবং সেই সঙ্গে এ কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে অন্তত পক্ষে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে সমস্ত বিন্ধ্য পার্বত্য এলাকার আদিবাসীরা হল মোটামুটি ভাবে একই সংস্কৃতির অংশীদার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংযোগ যেমন সমতল ভূমির মানুষের সঙ্গে বেড়েছে, তাদের শিল্পকর্মও তেমন কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মূলগতভাবে এই শিল্পের আদিম প্রকৃতি যেমন বাস্তারে তেমনই পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় রক্ষিত হয়েছে। এবং তা হয়েছে যেমন গড়নের দিক থেকে তেমনই
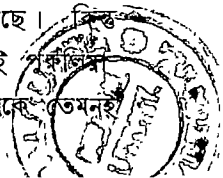
করণকৌশলের দিক থেকে। বিনয় ঘোষ তাঁর Traditional Arts and Crafts of West Bengal গ্রন্থে (পৃঃ ৪২-৪৩) বাঁকুড়ার বহু প্রশংসিত টেরাকোটা শিল্পে আদিম সংস্কৃতির টোটেম-বিশ্বাস আজও কীভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের বহুসংখ্যক তফসিলী জাতি ও আদিবাসী মানুষ আজও তাদের স্থানীয় দেবতাদের 'স্থানে' পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি, বাঘ ও ফণাধারী সাপের ছোট-বড় মূর্তি মানত হিসাবে কেমন উৎসর্গ করে আসছেন। এই সব স্থানীয় 'দেবস্থান'গুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পূজা পায় না। তিনি তাই মনে করেন যে রাঢ় বাংলার এইসব মাটির শিল্পবস্তুগুলির উদ্ভব হিন্দু-পূর্ব টোটেম-এর বিশ্বাসকালে এবং সেই ধারাই স্থানীয় কুমোররা আজও রক্ষা করে চলেছে। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে আজকের বাঁকুড়ার পোড়ামাটির শক্ত মূর্তিগুলি, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল পাঁচমুড়ার মাথা-উঁচু ঘোড়া, সমতলের পরিশীলিত সমাজের সংযোগের ফলেই তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে। কিন্তু এখনও মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম সাব-ডিভিসনে এইসব পশুরূপগুলির আদিম গড়ন দেখতে পাওয়া যায় পূর্ণত হাতে তৈরি তাদের অপরিশীলিত নিদর্শনে। বিনয় ঘোষের এই পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহেই ক্রামরিশের 'কালাতীত' বা 'এজলেস' শ্রেণীর টেরাকোটা শিল্পের যে বিশিষ্ট শৈলী তার এক সামাজিক ভিত্তি নির্দেশ করে।

আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর জানি যে নদীমাতৃক সমতল বাংলার কৃষি-সমাজ তাদের নিজস্ব ধারার এক বিশিষ্ট পোড়ামাটির রূপশিল্পকে বহুকাল থেকে সৃষ্টি করে আসছে। এইসব পোড়ামাটির ছোট-ছোট মূর্তিগুলির মধ্যে যেমন আছে পূজাপার্বণের দেবদেবী মূর্তি তেমনই ধর্মনিরপেক্ষ খেলনা ও সামাজিক পুতুল। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের ঐতিহ্যমণ্ডিত মাটির শিল্পকর্মগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে যেমন দেখি রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, তেমনই আছে কাঁখে ঘড়া নিয়ে গ্রামবধূ এবং 'বাবু' পুতুল। শেষোক্ত চরিত্রটি যে কালীঘাটের পটের 'বাবু' চরিত্রেরই ত্রিমাত্রিক রূপ তাতে সন্দেহ নেই। জয়নগরের সকল কাজই সুস্পষ্টভাবে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের মাটির শিল্পকর্ম থেকে ভিন্নরীতির—কী করণকৌশলের বিচারে, কী শৈলীর নিরিখে। এদের মধ্যে বরং আদর্শায়িত ভারতীয় পরম্পরাগত রূপশিল্পের আদল খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। ফলে সহজেই এদের আমরা

'কালাতীত' না বলে 'কাল্‌াশ্রয়ী' বা 'টাইম-বাউণ্ড' বলে ক্রমারিশেরশ্রেণী বিভাগের দ্বিতীয় অংশে ফেলতে পারি। অন্যদিক থেকে, বিষয় নির্বাচনের বিচারে এবং সামাজিক পটভূমির বিচারেও, জনপদের এই শিল্পধারাকে অনায়াসে কুমারস্বামী-কথিত 'দেশী' শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

আমরা যদি বাঁকুড়ার টেরাকোটাকে ক্রামরিশের নির্দেশিত 'কালাতীত' শ্রেণীর বলে মনে করি এবং জয়নগরের মাটির পুতুলগুলিকে দেখি কুমারস্বামীর 'দেশী' পর্যায়ে, তবে সহজেই আমরা কৃষ্ণনগরের কুমোরদের তৈরি প্রকৃতিবাদী ছোট-ছোট বিভিন্ন কর্মরত মানুষের ও অন্যান্য নানান বস্তুর রূপগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি নাগরিক শিল্পকর্ম বলে—যার প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুমার-স্বামী 'দেশী' পর্যায়ভুক্ত শিল্প থেকে তার ভিন্নতা ব্যাখ্যা করেছেন। এ শিল্পকে আমরা অবশ্যই 'মার্গ' রীতিভুক্ত বলে মনে করি না। কিন্তু এগুলি যে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোর বহির্ভূত এবং জন্মকাল থেকেই 'নাগরিক' বা 'বুর্জোয়া' সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কৃষ্ণনগর কুমোরদের ইতিহাস আড়াই শ বছরের, এবং কীভাবে তারা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আগ্রহে প্রথমে ঢাকা বা নাটোর থেকে এসেছিল তা সকলেই জানেন। কিন্তু যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই কুমোররা কৃষ্ণনগরের নগরজীবনে কাজ করতে শুরু করে নাগরিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করলো এবং সেই সঙ্গে বাংলার পরম্পরাগত শিল্পাদর্শ থেকে সরে গেল। তারা তাদের বাস্তব অনুকৃতির সাফল্যে বিদেশের নানান শহরের পুরস্কার লাভ করলো; এবং সেই সঙ্গে তারা গ্রামীণ কুমোরদের থেকে ধনে ও মানে হয়ে পড়লো বিচ্ছিন্ন। নাগরিক পৃষ্ঠপোষকদের মনোরঞ্জনের জন্য এই শিল্পীরা য়ুরোপীয় একাডেমিক বাস্তববাদকেই করলো আদর্শ এবং বাহবা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের শিল্পবোধ য়ুরোপীয় কলাশিল্প তথা সংস্কৃতির সংস্পর্শে পরিপুষ্ট। কৃষ্ণনগরের কুমোরদের কৃতিত্বের সমস্ত ইতিহাসটাই তাই অনায়াসে কুমারস্বামী-নির্দেশিত 'বুর্জোয়া' সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে প্রতিভাত হয়।

এইভাবে নতুন এক সমাজ-নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এবং আমাদের পূর্বসূরী শিল্প-ঐতিহাসিকদের অভিজ্ঞতাজাত তত্ত্বকে গ্রহণ ও বর্জন করে, আমরা বাংলার মৃৎশিল্পকে তিনটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি: (১) ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের সন্নিহিত পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-উত্তর মেদিনী-পুরের ট্রাইবাল শিল্প; (২) সমতল বাংলার কৃষি-ভিত্তিক সমাজের শিল্প এবং (৩) য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে সৃষ্ট 'নাগরিক' বা 'বুর্জোয়া' রীতির শিল্প। এই তিনটি শিল্পরীতিই যে তার করণকৌশল ও শৈলী নিজ নিজ সমাজ-নান্দনিক ভিত্তি থেকেই গড়ে তুলেছে, সেই কথাটাই হল বর্তমান নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

মাছ

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

মহা মহা দুর্গাপূজা। বাইরে কাঁসর ঘণ্টা,-ঢাকের শব্দ কানে আসছে। পটকাও ফাটছে। সপ্তমীর পালি চালাতে কানাইপুর এসেছেন ভবানী বাঁড়ুয্যে। মাটির চালাঘরের ইটপাতা উনুনে বড় কড়ায়ে তরকারি নাড়ছিলেন তিনি। পরনে বিবর্ণ লুঙ্গি, উর্ধাঙ্গ নগ্ন, ময়লাচিট একটা গামছাকে উত্তরীয়ের মত জড়িয়ে নিয়েছেন।

'৭৮ সালের বন্যার সময় কানাইপুর জলমগ্ন হয়েছিল। আনন্দবাজার কাগজেও নাম ছাপা হয়েছিল কানাইপুরের। তারপর বহু চেষ্টা চরিত্র এবং ভবানীবাবুর বাবার রিটায়ার করা টাকায় বাড়ী কেনা হয় হেতমপুরে। জলের দামে, রাজাদের বাড়ী। এখন পূজো-পাব্বনে পিক্‌নিক করার মত গ্রামে আসেন সবাই মিলে।

এবছর অর্পনও এসেছে। অর্পন ভবানীবাবুর বড় জামাই, শহরে থাকে,- গ্রামে, বিশেষে শ্বশুরবাড়ি এলে সাধারণে মিশে যায়। খড়ের চালায় বস্তার উপর বসে বসে কড়কড়ে খাচ্ছিল সে।

মহিম হাঁপাতে হাঁপাতে চটি পরেই অর্পনের পাশের সঙ্কুচিত জায়গাটাতেই বসে পড়ল। করুণস্বরে বলল: মাছ পেলুম নাইখো। চ্যাং, গড়ুই, পুঁটি মাছ রইছে আর ছুটঅ ছুটঅ পুটনা—সব রেতের ধরা, আনতে আনতেই গলে যেত, তাই আনলুম নাইখো।

মহিম ভবানীবাবুর বড় ছেলে কলিয়ারীর চাকুরে। সপ্তমীর দিন, রবিবার,- তাই ছুটি। দুবরাজপুর থেকে কানাইপুরের দূরত্ব পাঁচ মাইল, সাইকেলে এখানের সব লোকেদের ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। মাঝে মাঝে খানা, খন্দ, মাঠ —শাল নদী, মহিমের কোনকালে অভ্যাস নেই, তার দু ঘণ্টা লেগেছে।

মহিমের কথায় ভবানীবাবু চমকালেন, পরে মুখের ভাব দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হতে লাগল। জামায়ের উপস্থিত ভুলে চীৎকার করে উঠলেন: এত্‌ত বড় মায়ের পূজো, দুমবছর বাদে ব্রাহ্মণভুজন হবেক—মাছ হোল নাইখো! পরক্ষণেই নিজের অক্ষমতার বিস্তার ছড়ালেন বাতাসে। ইদানীং ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা নেই। একটা দূরত্বের পর্দা। যেন সূক্ষ্মভাবে ঝোলানো আছে দুজনের মধ্যে।

অর্পনকেই শোনাচ্ছেন এমনভাবে বলে চললেন ভাবানীবাবু ঃ মুঙ্গলবার থেকে বাদলা নেমে রইলো তিনদিন, আমিও বেরতে পেলম্ নাইখো—তা না হলে কি মাছের জন্য ভাবনা করতে হয়! বলে, প্রত্যেক বছর ষষ্ঠীর দিন পজ্জন্ত বাজার থেকে হোক, কেয়ট ঘর থেকে হোক, ত্যাশদুনিয়া ঘুরে মাছ নিয়ে এসেছি। তাঁর নিঃশ্বাসের ক্ষরণবায়ু সামনের বাতাসের স্তর কেটে এগিয়ে এল ঃ এখুন তো আমার হাতে টাকা নাইখো……

মহিম কলিয়ারীতে চাকরী পেয়েছে কালো মেয়ে বিয়ে করে। সেই সময় সত্যস্নাতক মহিম বিয়ে করে চাকরী না নিলে সংসারের হাঁড়িও বন্ধ হয়ে যেত। ভবানীবাবুর ত্রিশ বিঘে জমির ধান বর্গাদাররা ত্রিশ বছর ধরে দেয়নি—তার মামলা ঝুলছে জে. এল. আর. ও কোর্টে। ভবানীবাবুর বাবার রিটায়ারের টাকা বাড়ী কেনা ও সংসার চালাতে শেষ হয়েছে। ভবানীবাবু সময়কালে চাকরী নেননি, চাষবাস দেখেছেন, এখন বেকার। মহিমের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত দুবছর পার্টির কমরেডদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে অর্ধেক বিক্রীর টাকা দিয়ে ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

তখনই মহিমই বাঁচিয়েছিল সংসারকে। কিন্তু কালো মেয়ে শেফালী মহিমের জীবনে এবং জটিলতায় আসার পর মহিম একটু একটু করে ভাঙ্গতে লাগল। শেফালী বড়লোকের মেয়ে, শেফালীর বাবা মহিমদের বাড়ী, জমি দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সংসারের স্রোত যে ফল্গুধারার মত নিম্নগামী হয়ে গেছে এ খবর রাখেননি। শেফালী ক্রমশঃ অভাবের মুখোমুখি হয়েছে বিয়ের মাখামাখি সময়টুকু পার হওয়ার পরই। তখনই তার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। দু বছরের দাম্পত্যজীবনে শেফালী তিনবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে, ফলে মহিমের মুখ এবং মানসিকতা নীরবতা ছাড়া কিছু আশ্রয় করতে পারেনি। শেফালীর দাপট বেড়েছে, মহিম হয়ে গেছে নির্জীব।

আর্থিক অভাব পারিবারিক জীবনে অনেক কিছুরই জন্ম দেয়। মহিমের সামান্য চাকরীতে এই সংসারের সকলের ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হয়নি। যার হয়নি সেই মনে মনে গোপনে মহিমের প্রতি বিদ্বেষে বিরাগ পোষণ করেছে, ফলে মহিম হয়ে গেছে সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু একা।

মহিমের সঙ্গে ইদানীং মা-বাবারাও তেমন সদ্ভাব নেই। মাঝে কিছুদিন বাসা করেছিল মহিম, সেখানেও একমাত্র ছেলের অসুখ, সংসারের অভাব তার ভিতর পর্যন্ত ঝাঁঝরা করে দেয়। পরে অর্পনের ভাইয়ের সহযোগিতায় সে রাশিয়ান কোলাবরেসনের ঝাঁঝরা প্রকল্পে বদলি হয়। বাসা তুলে দেয়,

বাড়ীতে ফিরে যায়। কিন্তু মা-বাবার মনের যে ভালোবাসার বাসাটা সাময়িক ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে পুনঃপ্রবেশ করতে পারেনি।

মহিম ছেলেটি এমনিতে ভালো তবে একটু বদমেজাজী। ঝাঁঝিয়ে উঠল সেঃ তাহলে তুমাকেই নিয়ে আসতে হোত, আমাকে দায়িত্ব দিবার কি দরকার ছিল?

ইতিমধ্যে ভবানীবাবুর বাবা অবনীবাবু ঘরে এলেন। অবনীবাবুর বয়স আশির কোঠা পেরিয়েছে, শরীরে সামর্থ্য অটুট, কেবল চোখের জ্যোতি কমেছে। তিনি ঘটনা শুনে বললেনঃ ই-গলা আগে থাকতে বেবস্থা করে রাখতে বয়, কেয়টদিগে বায়না করতে হয়—আজকে পূজোর দিনে বাজার থেকে মাছ এনে কি কাজ হয় রে! তুদের সবকিছুই উদ্ভট। যত সব না-বালকের কারবার।

অর্পনের কড়কড়ে খাওয়া শেষ। তার বিয়ে হয়েছে দশ বছর এবং এতদিনে সেও সংসারের একজন হয়ে গেছে। অর্পনের মন একটু ভাবালু, গতিশক্তিসম্পন্ন। তার কাল্পনিক চোখের সামনে প্রতিভাত হোল এই মাছের জন্যে পরে এদের সংসারে একটা বিরাট অশান্তির রূপরেখা। পারম্পরিক বক্তব্যের সবটুকু দেখতে পেল সে, এছাড়া ভোজের সময় গ্রামের লোকেদের বাঁকানো, কটু মন্তব্য—যদিও এই ব্রাহ্মণ ভোজন প্রথানুযায়ী চলে আসছে তবু এখন মহিমের একার চাকরীতে এই সব দায় ঠেকানো একেবারেই অসম্ভব। অর্পনের চকিতে মনে হোল হয়তো খরচের কথাটা চিন্তা করেই মহিম ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

সমস্যা যখন গভীর হয়ে দেখা দেয় তখন কাছাকাছি মানুষজনকে তা আক্রান্ত করে। অর্পনও আক্রান্ত হোল। এছাড়াও মনে মনে সেও তো একটা ভূমিকা কামনা করে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের মত নিজেকে প্রকাশ করার প্রবণতা পেয়ে বসল অর্পনকে। তাই ভবানীবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলঃ এ গ্রামে তো অনেক পুকুর আছে, মাছ পাওয়া যাবে না?

ভবানীবাবুর এখন মলিনতম বেশভূষা, ইদানীং খরচের কথা ভেবে লোকজন বা রাঁধুনিও ডাকেন না। অর্পন দেখল সম্বোধন না করায় মগ্ন ভবানীবাবুর কানে পৌছল না তার কথাটা। কানাইপুর গ্রামখানি ছোট, দশ/বারো মানুষের ঘর বাস, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছেলেবুড়ো ও বাইরের দু-একজন নিয়ে শ'খানেক। সমস্ত রান্না ভবানীবাবু এ ক'বছর স্ত্রীর সহযোগিতায় করে চলেছেন। অন্যান্য বছর মেয়ে জামাইরা আসে না, মহিমও এল

তিনবছর পর। উপলক্ষ নতুন বৌকে দেখানো। লক্ষ্মীপূজো, ষষ্ঠীপূজো, ঠাকুরসেবা ইত্যাদি উপলক্ষে তাঁরা স্বামী স্ত্রীই আসেন। ছেলেরা পারতপক্ষে এখানে আসতে চায় না।

তবু অর্পনের নাড়ীতে কোথায় যেন একটা টান বাজে। মনে পড়ে যায় প্রথম গরুর গাড়ীতে করে হিংলো, অজয় নদী পেরিয়ে মেয়ে দেখতে আসা, কিশোরী শ্যালিকাটির চারঘণ্ট ধরে পাখার বাতাস, ভবানীবাবুদের সচ্ছলতা, কানাইপুরের বিভিন্ন মানুষজনের হার্দ্য ব্যবহার—যেন বাতাসে ব্যাকুলতার বাঁশি বাজিয়েছিল সেদিন। তাইতো সে এমন গ্রামে বিয়ের সম্মতি দিয়েছিল।

কিন্তু সবই হারিয়ে গেল এক রাজনৈতিক ঘূর্ণ্যাবর্তে। আটাত্তর সালের বন্যার পরের বছর থেকে বর্গাদার আন্দোলন শুরু হোল জোর কদমে। কানাইপুরের কয়েকঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ অসংখ্য প্রতিবাদীদের সঙ্গে হোল পরাজিত, প্রহৃত, বিধ্বস্ত। গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন অনেকে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের দেয়ালগুলো কাটতে, ভাঙ্গতে শুরু করল। অর্পনের স্বপ্নের সে কানাইপুর এখন হতশ্রী, বিগতযৌবনা। আগে মাঠে ফসল ভরে থাকত; সবুজে দু চোখ জুড়িয়ে যেত—বর্গাদার আন্দোলন সেই সবুজকে লাল আলোয় কালো করে দিয়েছে।

অর্পন পুনরাবৃত্তি করল গাঢ় সম্বোধনে। ভবানীবাবু সচকিত হলেন। অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ কণ্ঠে অর্পনকে বললেন: না বাবা, এখন পথরে জল আছে, কেয়টরাও ই-গাঁয়ের লয়খো, মাছ আর পাওয়া যাবেক নাইখো। গভীর খেদোক্তি ছড়ালেন কণ্ঠে: ই-বারে মায়ের পূজো নিরিমিষই হোক। সবই লিখন বল। আগে কত ভুজ করেছি, এখন বিটা-বউয়েব আমল, যেমন হচ্ছে হোক।

কোথায় যেন আহত পাখির গান বাজে বুকের ভেতর লুটোপুটি খায় স্বপ্নের ঝিলিমিলি। অর্পনের চোখের তারায় এক একটি বেদনার তীর এসে বিদ্ধ করছে। অর্পন শুধু আহত হতেই জানে, আঘাত সারিয়ে ফেলার ক্ষমতা তার নেই। গ্রামেরই ছেলে অর্পন, তবে দীর্ঘদিন সেই গ্রামের সঙ্গে কোন আত্মিক যোগাযোগ নেই, শহরে পড়াশোনা করেছে, চাকরীও করে শহরে তাই গ্রামের মানুষের কাছে অকারণে ভালোবাসা, আন্তরিকতার বাষ্প কামনা করে। তারই জন্য তার এবছর কানাইপুরে আসা। বিয়ের পর থেকে সে দেখেছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে এক ধরনের স্বচ্ছ আন্তরিকতার প্রবাহ—সেই প্রবাহের হারিয়ে যাওয়া উৎসমুখ খোঁজে সে এখন, পায় না।

অর্পন বলল ঃ কাছের কোন পুকুরের মালিককে অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই মাছ পাওয়া যাবে। আমি দেখছি।

দাদাশ্বশুর এবার জোরে জোরে বলে উঠলেন ঃ না হে, তুমাকে জামাই হয়ে মাছের জন্যে বেরতে হবেক্ নাইখো। থাকুকগো, লুকে যা বলার বলবেক। এমনি তো সবই গেইছে নাম নাম পূজোটই হচ্ছে মায়ের। ই-বছর বদনাম আরও একটুন বাড়ুক। পাঁচজুনা জানুক আর ভুজ করতে লারছি আমরা।

ভবানীবাবু বাবার উত্তরে ঝঙ্কার দিলেন ঃ কেনে, নিজেদের প্যাটের বিলায় তো কসুর নাইখো। সারাবছর পর মায়ের পূজো তাথেই তুমাদের যত অভাব। কুমু জিনিসটও ও বাদ নাইখো—সবই ত হচ্ছে।

অর্পন জানে অবস্থাটা ক্রমশঃ এমনিভাবে নিম্ন পর্যায়ে চলে যাবে এবং তখন সেই অবস্থার মধ্যে অর্পনও আর থাকতে পারবে না। ভবানীবাবুর চোখে তার বাবা মহিমের গোত্রের। মহিমের দাদু প্রীতি, টাকাকড়ি দাদুকে রাখতে দেওয়া ইত্যাদিতে ভবানীবাবু এবং তার স্ত্রী দুজনেই ক্ষুব্ধ। বাস্তবের কোন ফাঁককে তারা আমল দিতে চান না—অভিমানই বাজে যা পিতৃহৃদয়ের একমাত্র মূলধন।

মহিম বদলী হয়ে এসেছে পূজোর একমাস আগে। তাতে সাঁকতোড়িয়ার ঘুস দিতে হয়েছে উর্ধতন অফিসারদের, ইউনিয়ন লীডারদের, যদিও ঝাঁঝরায় সমস্ত ব্যবস্থা অর্পনের মেজ ভাইই করে দিয়েছে। কোন টাকাকড়ি না দিয়েই। মহিম বি-কম পাশ করেছে, এতদিন নিংগা কলিয়ারীতে জেনারেল মজদুর, এক্সপ্লোসিড ক্যারিয়ার ইত্যাদির কাজ করেছে। কলিয়ারীর এক ম্যানেজারকে স্ত্রীর গয়না বিক্রী করে আঠারোশ টাকা ঘুস দিয়েছিল বদলি করানোর জন্য, তিনি দু বছর ধরে বদলির ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এখন বদলি হওয়ার পর টাকাটাও যেতে বসেছে।

এতদিন মহিমকে খাদের নীচে শিফটিং ডিউটি করতে হোত। তিন বছর ডিউটি করে বুকে সর্দি জমে প্লুরিসি হয় পূজোর আগে। কলিয়ারীতে তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই চিকিৎসার, তাই নিজে পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখাতে হয়েছে—এভাবে তার আর্থিক টানাটানি এখন চরমে।

এসব কথা অর্পন সদ্য শুনেছে, ভবানীবাবু শোনেননি, শুনতে চাননা—এখানেই সংকট বেড়ে যায়। পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অবনীবাবু জানেন সব—কেননা সংসার চালাতে হয় তাঁকেই। এখন অর্পনের সামনেই

সব কথা হয়, প্রায় সবই জানে অর্পন। অবনীবাবু বলে উঠলেন ঃ কি হঁয়েছে কি করে সংসার চালাচ্ছে মহিম, তুঁই কি করে জানবি। নিজে তো কুনুদিন দায়িত্ব লিলি নাইখো, আগে বাপ চাকরী করত, জমির আয় ছিল, তাতেই সব স্টোনো করে হঁয়েছে। এখন ত তুরও চাঁ বিক্রীতে কিছু হয়—কই বাপকে ত ছুটো টাকা দিয়ে সংসার চালাতে সাহায্য করিস না।

অর্পন দেখল সে এক অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে। জমির আয় চলে যাবার পর ভবানীবাবু এখন চা ফেরি করে বেড়ান গাঁয়ের দোকানে দোকানে, গৃহস্থবাড়ীতে। অর্পন জানে, তাতে পরিশ্রমই হয়—রোজগার ন্যূনতম।

ভবানীবাবু এবার ইন্ধন পেয়ে যেন জ্বলে উঠলেন ঃ কি দিয়েছে বিটা, সুম বছর বাদে পূজোতে, একটও নতুন জামা কাপড় পর্যন্ত দেয় নাইখো। কলিয়ারীর সবাই তো বোনাস পেলেক্ মা-বাবার জন্যে বিটা একটও নতুন কাপড় কিনতে লারত!

এখানেই যেন পরাজয় ঘটে যায় মানুষের। অর্পনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় বেদনার একটি শীতল ধারা। প্রত্যাশার ডানা সাজিয়ে বসে থাকে মানুষ, পূর্ণ হলে জয়ধ্বনি বাজে, নতুবা ধিক্কার অনুশোচনা আর অভিমান। প্রয়োজন কোন কিছুকে চাপা দিতে পারে না। তার দাবী অনন্ত, অনন্ত।

মহিম কিছু বলতে যাচ্ছিল, অর্পন ইঙ্গিতে মহিমকে চুপ করতে বলল। বোনাসের আটশ সাতাত্তর টাকা নিয়ে মহিম গিয়েছিল তার কাছে। অর্পনের যখন বিয়ে হয় মহিম তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তাই মহিমকে সে ছোট ভায়েরই মত দেখে। মহিমের টাকায় সে শেফালীর জন্য একজোড়া আটপৌরে শাড়ী, ব্লাউজ, ঘরের ঝির জামাকাপড় কিনে দিয়েছিল। বাকী টাকা ছিল পুজোর আনুষঙ্গিক খরচের জন্য। অর্পন নিজের টাকায় মহিমের স্ত্রীর জন্য একটা তোলা শাড়ী, মহিমের বাচ্চাটার জন্য একটা ভালো জামা প্যান্ট কিনে দিয়েছিল। দেড় বছরের বাচ্চার জন্য কৌটোর দুধ এবং সামান্য হাত খরচের টাকা রেখে অর্পনের নির্দেশ মত বাকী টাকা সে দাদুর হাতে তুলে দিয়েছে।

অর্পন জানে, মহিমের শ্বশুরবাড়ী থেকে ভবানীবাবু এবং শাশুড়ীমাতাকে নতুন জামা কাপড় দিয়েছে। তাই মহিম আর তাদের জন্য কেনেনি। সারাবছর পর প্রায় নতুন বউএর জন্যে একটা তোলা শাড়ী না কিনতে পারার বেদনা সেদিন মহিমের চোখকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছিল। অর্পন বুঝেছিল সে বেদনা। অথচ সংসারে বাবা-মার চোখে মহিম এখন শত্রু, কোনও

সহানুভূতিই নেই তার উপর। অর্পনের মনের মধ্যেও এক ধরনের বিপন্নতা। এই সংকটের যুদ্ধে কেমন করে এরা বেঁচে থাকবে!

অর্পন কোন উত্তর করল না শ্বশুরমশায়ের কথায়। জানে, তার কথা কেউ বুঝবে না। উপরন্তু সবাই মনে করবে মহিমের হয়ে সালিশী করছে। এখন তার শ্বশুরবাড়ীতে দুটি ইউনিট। একটিতে মহিম, দাদামশাই, মহিমের স্ত্রী শেফালী, ছোট শ্যালক রঞ্জন, অন্যটিতে মহিমের ঠাকুমা এবং মা-বাপ। অর্পন এবং তার স্ত্রী মহিমের দলে। ছোট মেয়ে সীমা এবং সুকান্ত ভবানীবাবুদের দলে। একটা ছোট্ট শক্তি নিয়ে আর্থিক ও ভালোবাসার সূত্রে দুটি ইউনিটকে এক করার অনেক চেষ্টা করেছে অর্পন, পারেনি।

ভবানীবাবুদের বাড়ীতে ক্রমেই লোক সমাগম হচ্ছে। গাঁয়ে আজ কারও বাড়ীতে রান্না হবে না তাই সবাই নিয়মরক্ষার খাতিরে ভবানীবাবুর কাছে এসে খবর নিচ্ছে। মাছ আসেনি জেনে অনেকেই ক্ষুব্ধ। দণ্ডায়মান দু একজনকে সম্পর্ক ধরে জিজ্ঞাসা করল অর্পন: এখানে মাছ কোথায় পাওয়া যাবে?

পাড়ার শংকরবাবু এবং আরও দু'চারজন বললেন: ভাঁরড়ার ফকরে লাপিতের পখর আছে, মাছ দিলে উই দিতে পারবেক।

বিস্মিত হোল অর্পন। এখানে ব্রাহ্মণদের বাস অথচ তাদের তেমন কিছু নেই। সামান্য একজন নাপিত যার যজমান হচ্ছে এ অঞ্চলের মানুষেরা, তারাই সম্পন্ন। প্রসঙ্গক্রমে জানল, ফকির নাপিতের হাস্কিং মেশিন, গোলদারি দোকান এবং আরও অনেক কারবার আছে। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণরা এখন ভাঙ্গনের মুখে।

ভবানীবাবু বলে উঠলেন অর্পনকে: ফকরের কাছে মাছ কিনতে লারবে বাবা। গতবছর উয়োর মাছ আমি ঘুঁরোয় দিঁয়েছি। ছুটঅ ছুটঅ পুঁটা— আঠারো টাকা কেজি দর বলছিল, আমি বললুম—দরকার নাইখো, তুর মাছ ঘুরে নিয়ে যা, আমি বাজার থেকে মাছ আনা করাব।

অর্পন বুঝল একটা দারুণ সংকটের মধ্যে তাকে মাছ যোগাড় করতে হবে। ফকির ভাণ্ডারী এবার যা খুশি দর হাঁকাবে—সেই দরেই মাছ নিতে হবে তাকে। হয়তো বিপদে ফেলার জন্য নাও দিতে পারে। পরক্ষণেই অর্পন একটু থমকাল, মনের মধ্যে একটা গুঞ্জন ধ্বনি ব্যাপ্ত হোল: মাছ না পেলে গাঁয়ের মানুষদের কাছে একটু ছোট হতে হবে, মহিমের সম্মান সংসারে আরও একটু নিম্নমুখী হবে। ভবানীবাবুর যতই আর্থিক টানাটানি থাক না কেন, প্রতিবেশীদের কাছে পুরোনো ঐতিহ্যটা ঠেক্ দিয়ে রাখতে চান। এটা শ্রেণী

মানসিকতা। অর্পন বুঝল, ভিতরে মহিম যতই ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যাক, তাদের অন্নসংস্থান হোক বা নাইই হোক, বাইরের ঠাট বজায় রাখার জন্য আড়ম্বরটা কমাতে পারবেন না। ভিতরে ভিতরে এক ধরণের অসহায়তা যন্ত্রণা হয়ে অতর্কিতে অর্পনকে কুরতে আরম্ভ করল।

থলি হাতে মহিম এবং অর্পন বেরুল। অর্পনের ভিতরেও একটা জেদ যেমন করেই হোক, যে কোন দরেই সে মাছ নিয়ে আসবে।

পথ চলতে চলতে অর্পন ভাবল, এটাও এক ধরণের আত্মম্ভরিতা, নিজেকে প্রকাশ করার অন্যায় ইচ্ছা ছাড়া কিছু নয়। মহিম বা গ্রামের সকলের কাছে সে যেন বিশেষিত হতে চায়। আর্থিক সঙ্গতি অর্পনের তেমন কিছু নয় অথচ নিজেকে বড়ো মাপের করে তুলে ধরার কামনা জাগ্রত হয়ে আছে সবসময়। আপনমনেই হাসল সে, তাহলে ভবানীবাবুর আচরণেই বা অন্যরূপ কোথায়?

কানাইপুরের আমের গাছগুলো এবং গোরুর পায়ের ছোপভরা একটুখানি রাস্তা পার হলেই আগলিয়া গ্রাম। বাঁদিকে একটা তালপুকুর। কানা ভর্তি জল। এসবই অর্পনের চোখে লাবণ্য আনে। এ গ্রাম যেন মায়াপুরী। সেই প্রথম দিনের স্মৃতিটা এখনও তাকে ছেড়ে যায়নি।

বর্গাদার পুন্নুর সঙ্গে দেখা। একগাল হেসে পুন্নু বলল : জামাইবাবু যে—কবে এলেন, ভালো আছেন?

অর্পন ঘাড় নাড়ল। মৃদু কণ্ঠে বলল : তোমরা সব ভালো তো! বলেই একটু অন্যমনের হয়ে গেল অর্পন। যখন পুন্নু বর্গা করেনি তখন অর্পন তাকে পূজার সময় ধুতি বা একটা নতুন লুঙ্গি দিত, দু'চারটে টাকাও। এখন মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। তাছাড়া চারবছর পর সে কানাইপুরে এসেছে এবার।

মহিম দাঁড়াচ্ছিল না। অর্পন মহিমকে একটু ইঙ্গিত করল। মনে মনে ভাবল, কার দ্বারা কোন উপকার হবে কে জানে। ইচ্ছা নেই তবুও পুন্নুকে বলল ঘটনাটা। পুন্নু বাগদীপাড়ায় প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখল যদি জিয়োনো কোনো মাছ পাওয়া যায়। পেল না। শেষে সে দেখিয়ে দিল দাড়িভর্তি মুখ, খালি পা, মলিন বেশধারী এক মধ্যবয়সীকে। বলল : জামাইবাবু, মাছ পেলে ইয়ের কাছেই পাবেন, ফকিরদার ভাই বিনু।

অর্পন পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। জীবন কি এইরকমই। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিলই নেই যেন। ভিতরে ভিতরে ছায়া ঘনাচ্ছে অর্পনের, দুঃখের ছায়া, বেদনার ছায়া। চোখের সামনে কত কি নতুন চেহারা নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে—যা সে কখনও কল্পনা করেনি।

এবার অর্পন সচেতনভাবে তার শহরের পোষাকী কৃত্রিমতা সরিয়ে লোকটির গায়ে হাত দিয়ে নকল আন্তরিকতায় একটু বশ মানানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝল লোকটি ভীষণ ধূর্ত। অর্পনের আলিঙ্গনে লোকটির দ্রুতগতি একটু করে শিথিল ও স্থির হোল। অর্পন বলল ঃ আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম ভাই, একটু মাছের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

লোকটি যেন একটুখানি বাতাস টেনে নিয়ে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছে। অর্পনের অনভিজ্ঞ চোখেও তার ছায়া পড়ল। লোকটি দ্রুততার সঙ্গে বলে উঠল ঃ দাঁড়ান, আমি বলাই ঘোষের কলাকাঁদিটা দাম করে দিয়ে আসি।

অর্পন বিস্মিত প্রশ্ন করল ঃ আপনি কিনবেন ?

গরিমা এবং কৌশলীর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেল লোকটির চোখেমুখে। বলল ঃ না মশাই, আমি কিনতে যাব কেনে, ই-খানে কিনা-বিচার দরদাম আমিই করে দিই। চোখ ছোট করে কথা শেষ করল ঃ আমি যা বলে দিই মেনে নেয় সবাই।

কলাকাঁদিটার দাম হোল পাঁচটাকা। অবাক হয়ে গেল অর্পন। এক কাঁদি কলা কমপক্ষে বিশ / পঁচিশ টাকায় বিক্রী হয় বাজারে। তাদের শহরে তো একজোড়া কলার দামই একটাকা। ভাবল, গ্রাম বলে হয়তো শস্তা। পরক্ষণেই মনে হোল, না গ্রাম বলে নয়—মালিকের সরলতা, অজ্ঞতা অথবা অভাবের সুযোগে এমন দাম। সেই ধারণাটাও স্থায়ী হোল না—বছর পাঁচেক আগেও এমনি ছিল। মনে মনে তার একটা সুক্ষ্ম চিন্তা গোপনে বিস্তার লাভ করতে লাগল, তাহলে মাছের দরও শস্তা হতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে বিলুকে অনুসরণ করতে লাগল দুজন।

পথে নানা যজমান। সাধারণ, গরীব, মধ্যবিত্ত সকলেই। তবে গরীবের দলই বেশী। মধ্যবিত্তরা পূজোর দিনের জন্যে কাজ ফেলে রাখে না। চকিতে মনে হোল তার শ্বশুরমশায়দের পরিবার ছাড়া। বিশু থামল, বলল তার হাতের ঝোলা নামিয়ে ঃ দাঁড়ান মশায়, ই-কটার দাড়িগলান ছুলে দিই। পূজোর টাইম।

অর্পন দেখতে লাগল এক একটা গরীব কালো কালো মানুষ একমুখ দাড়ির জঙ্গল নিয়ে নালার জলে দাড়ি ভেজাচ্ছে এবং বিলু অবলীলাক্রমে কয়েক মিনিটে তা পরিস্কার করে দিচ্ছে। মহিম বলল ঃ দেখছেন জামাইবাবু আমাদের সাবান, ক্রীম, লোশন কত কি লাগে—এদের শুধু জলেই···

অর্পনের ইচ্ছে হোল বলে ঃ কিছুই লাগে না। পরণের একটা বস্ত্র,

বাঁচার জন্য দুটো ডাল ভাত আর একটা কুঁড়ে রোদবৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে পেলেই তো মানুষের চলে যায়। তাহলে, চাহিদা বাড়ছে কেন। কেন তাদের মাছের থলি হাতে নিয়ে যেতে হচ্ছে!

মুখে বলল : যা লাগে তা নিয়েই যদি চলত সবাই তাহলে পৃথিবীতে আর একটা মানুষও অভুক্ত থাকত না।

লোক আসছে। সপ্তমীর দিন। সকলেই একটু পরিচ্ছন্ন হতে চায়। মায়ের পূজা। সারাবছর পর মা আসছেন। বিলুকে তাড়া দিতে বিলু বলল : অত্ত হড়বড় করলে কি হয় মশায়! যজমানগলা তো সারতে হবেক্।

মহিমের হাতের ঘড়িতে এগারোটা বাজল। অর্পন যেন ভাগ্য এবং ভবিষ্যতের উপর অর্পণ করেছে সবকিছু। এ পর্যন্ত মনে মনে অনেকবারই নিজেকে অপমানিত বোধ করেছে সে। আর নয়।

তবুও সময় দাঁড়িয়ে থাকে না। অর্পন ভাবল, এরপর ভাঁড়রা খাবে, পুকুরে মাছ ধরা হবে—সেই মাছ রান্না করে ভোজ। নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করতেও তার হৃৎপিণ্ড বাজতে লাগল।

আগলিয়া সেরে উঠতে সামনের রাস্তার জুনিদপুরের এক কোয়াক ডাক্তার আটকাল বিলুকে। বিলু যেন এইসব মানুষদের কাছে সমর্পিত প্রাণ। না বলে না। কোয়াক ডাক্তারের জন্য পালেদের বাড়ী থেকে পিতলের ঘটিতে জল আনা হোল। কাটার ধরণ এইরকম—তবে অন্যান্যদের গোঁফসুদ্ধ কামাচ্ছিল, বিশু ডাক্তারের গোঁফ ঝুলিয়ে রাখল।

এক একটি মুহূর্ত তখন অর্পনের বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটাচ্ছে। মহিম একবার করে ঘড়ি দেখছে আর মুখের মধ্যে করুণ ভাবকে ফুটে ওঠার সমূহ প্রশয় দিচ্ছে। বিলু এখন ফাঁকা রাস্তায় তার গৌরব, সম্পদ ইত্যাদি বিস্তারে মগ্ন। একবার বলে উঠল : বুঝলেন জামাইবাবু আপনার খাতিরে যেছি। বাঁড়ুয্যে মশায় এলেও মাছ দিতম নাইখো। তখনই বলেছিলম, আজ্ঞে—বাজারে মাছ পাবেন নাইখো, আমাকে বলুন, আমি মাছ দিঁয়ে দুব আপনাকে। তা তখন আমাকে বললেক কি, আমার বড় ছেলেকে দিঁয়ে বাজার থেকে মাছ আনা করাব। গতবছর তো মাছ নিয়ে ঘুরে এলুম। গাঁয়ের লুকে আমাদিগে গণ্য করে না মশায়। বাইরে দর দিয়ে কিনবেক, আমাদিগে পয়সা দিতেই যত জলন!

অর্পনের মনের মধ্যে অস্বস্তি, জ্বালা। এভাবে প্রতিটি মুহূর্ত তাকে চরম মনোবেদনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে সে ভাবেনি। ধানমাঠের সবুজ চোখের

মধ্যে সুরভি ছড়ায়, সামান্য সময়ের জন্য। আলপথে হাঁটতে হাঁটতে দূরের দিকে চোখ চলে যায়, বুকের দোলাচল বাড়ে···অনেক পুরোনো স্মৃতি স্বপ্নের মত ভীড় করে আসে। তখনই মনে হয় বিলুও তো মানুষ তারও তো সম্মান আছে। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অপমান যে কোন মানুষের কাছেই সমান বেদনার।

অর্পন বিলুর সব কথা বুঝছে না, তবু তার মনোরঞ্জনের জন্য গল্পে অংশ নিয়ে চলেছে। মহিমের মুখের হাসি কারুণ্যের মাত্রায় বাড়ছে। অর্পন ধানে পোকা লাগার খবর নিচ্ছে, ফলনের ভাগ, বাজারের দর, গাঁয়ের মানুষের সরলতা বিষয়ক নানা ব্যাখ্যা করে চলেছে—যা আদৌ সে জানে না, বিশ্বাসও করে না।

অসম শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথায় তাল রাখা অত্যন্ত কষ্টের। তাই মাঝে মাঝে অর্পনের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। বিলুর দ্রুত হাঁটার সঙ্গে তাল রেখে হাঁটায় অনভ্যস্ত অর্পনের কষ্টও হচ্ছে।

বিলু এবার বলে উঠল : জানেন মশাই, গাঁয়ের সব লুক আমাদের সঙ্গে এমনি, আঙুলে আঙুল জড়িয়ে মুদ্রা দেখাল···তা আমরা কারুরই পরোয়া করি না। আমাদের ঘরে তো মশায় ভাতের অভাব নাইখো, কারুর ঘরকে তো টুকা কাছাড়তে যেতে হয় না। আর আপনাদের পাঁচজুনার আশীর্ব্বাদে পাঁচ / দশ হাজার টাকাও যখন তখন বারও করতে পারি। হুঁ।

ছেঁড়া লুঙ্গি, বিবর্ণ টেরিকটনের শার্ট, গ্রাম্য মলিনতায় পরিপূর্ণ মানুষটিকে দেখে এবং তার এ যাবৎ নানা কথা শুনে অর্পনের মধ্যে এক ধরনের বিদ্বেষ কাজ করতে লাগল। সে শহরে থাকে, মোটামুটি ভালো রোজগারও করে তবু এভাবে তাকে এক সাধারণ গ্রাম্য মানুষের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে—এমনকি অর্পন ব্রাহ্মণ হয়েও বিলুকে আপনি সম্বোধন করাতেও সে কোনরকম কুন্ঠিত নয়। অর্পন ভাবল, টাকাপয়সা মানুষকে দেমাকী করে দেয়। তাদের শহরের সেলুনের নাপিতরাও কি বিনয়ী!

ইতিমধ্যে বিলুর কাছে অর্পন জেনেছে এই ক্ষৌরকর্মের জন্য মাথাপিছু একশলি (কুড়ি সের) করে ধান বরাদ্দ। সপ্তাহে বা মাসে একদিন গিয়ে চুল বা দাড়ি কাটা। অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠান, যেমন বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশনের আলাদা পাওনা। বিলু বলল : জানেন মশাই, আমার দাদাই হলো মালিক। তবে দাদাকে যেঁয়ে যদি বলি, আপনি চার কেজি মাছ লিবেন—তালে কি না করতে পারবেক।

অর্পন এবার বুঝল প্রকৃত অবস্থাটা। কিন্তু তা সামলে বিলুর মানসিক গৌরবের সীমানাটা যাচাই করার জন্য বলল : চলুন, না হয় আমি গিয়ে বলছি। দরকার হলে হাতে পায়ে ধরব। বিপদে পড়েছি উদ্ধার তো হতে হবেক।

রিলু স্বল্পপরিসরে জিব কাটল : না মশাই, আপনারা বামুন। ব্রাহ্মণ থেকে শব্দের তারতম্যে সম্যক অবস্থা হৃদয়গত হল অর্পনের। বুঝল, অদূর ভবিষ্যতে সেইরকমই দিন আসছে। সম্পদ এদের হাতে যাবেই। তাদের মত মেকী মধ্যবিত্তদের উন্নাসিকতার বর্ম মোচন করার সময় এসেছে। সময় একদিন সকলকেই সুযোগ দেয়, এদেরই এখন সময়।

দম্‌দম্‌ পা ফেলে যেতে যেতে চকিতে কৌশলী মানুষটি হেসে এবার বলে উঠল : আচ্ছা মশায়, কি দর দিবেন বলুন দিখিনি ?

এবার অর্পনের চোখে মুখে মেঘের ভার নেমে এল। মহিমের মুখও ভাবলেশহীন। অর্পন তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধির মানুষ নয়, তবু এতক্ষণের প্রতিকূল পরিস্থিতি, সংকট তাকে সাময়িক পরিবর্তিত করে দিয়েছে। তাই সে নিরাসক্ত কণ্ঠ ছড়াল : আগে মাছ পাই, দেখি তারপর দরের কথা হবে। মুখে বলল বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝল কোন অজান্তে সেও একটা জালে মাছের মত আটকা পড়ে গেছে—সেই জাল কেটে বেরোনোর তার ক্ষমতা নেই।

বিলুর ঘরে পৌঁছে দেখা মিলল ফকির ভাণ্ডারীর। পরণে চেক্ লুঙ্গি, খালি গা, মাথায় একটুও চুল নেই। হাস্কিং মেশিনের ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রলোক। বিলু আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেল। ফিরে এলেন গম্ভীর মুখে। পরক্ষণেই বিলুর সঙ্গে বাইরের ঘরে কথা বলে জাল নেবার জন্যে ভিতরে গেলেন।

মহিম একবার ফিসফিস করল : জামাইবাবু, আর মাছ নিয়ে ভোজ হবে ? কৌতুক ছড়াল অর্পন : তোদের বীরভূমে তো ছুটোর সময় ভোজ হয়। পরে জিজ্ঞাসা করল : কটা বাজল ? মহিমের হাতটা তুলে নিয়ে দেখল, বারোটা।

জাল নামাল দুভাই। ছোট একটা ডোবা। তাতে প্রথমবার কেজি খানেক মাছ উঠল। পরের খেয়াতে আর মাছ ওঠে না। বিলু জাল টানা ছেড়ে দিয়ে জলে নামল। সাঁতার কেটে, পাড়ের জলে ডুবে থাকা খেজুর ; বাঁশগাছগুলোর গোড়াগুলো নাড়াচাড়া করে, কাঁপিয়ে, দাপিয়ে জলকে তরঙ্গ করে, মহিমের ধৈর্যের বাঁধ চুরমার করে মাছ উঠল সাকুল্যে কেজি তিনেক। একশ, দেড়শো গ্রামের পোনা। ফকির এবং বিলু চার কেজি পূরণ করে

দিতে চাইছিল, অর্পনও অস্থির হয়ে গেছে ততক্ষণে। বলল : না, আর দরকার নেই।

ফকিরের মেজ ভাই ঘাস কাটতে গিয়েছিল মাঠে। সে এসে চিৎকার করতে শুরু করল : ছুটঅ ছুটঅ মাছগলানকে মেরে দিছিস। পরক্ষণেই একটু থিতিয়ে ঘাসের ঝুড়ি নামিয়ে বলল : কি দর হল ?

অর্পনের মধ্যেও সেই অস্বস্তি। কি দর বলবে এরা। তাদের দর তো কোনমতেই গ্রাহ্য হবে না। ফকির ভাণ্ডারীর কথায় চমকে গেল অর্পণ : পঁচিশ টাকা দর লাগবে। শেষ পর্যন্ত ফকির ভাণ্ডারীর ভিজে হাতে হাত রেখে পাঁচ টাকা কমল। তিন কেজি মাছ সত্তর টাকায়। মহিমের পকেটে একশ টাকার নোট ছিল একটি। কোমরের গামছায় হাত মুছে ফকির নোটটি তার বউকে দিতে বউ ভেতর থেকে ত্রিশ টাকা এনে দিল। অর্পন দেখল প্রায় আদুল গা, স্বাস্থ্যবতী রমণীটি কেমন অহঙ্কারের পা ফেলে ফেলে হাঁটছে। গা ভেসে গেল অর্পনের।

সেই ধানমাঠ, রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। একটা বাজছে। বাড়ি ফিরতে লাগল দুজন। মহিমের হাতে মাঠের থলি। দূরত্ব কম করতে জল কাদা না মেনে সোজা পথে হাঁটতে গিয়ে মহিম পড়ে গেল কাদায়। ওর পায়ের ছিল অর্পনের চটি—সেটা ছিঁড়ে গেল।

চকিতে মহিম একবার বলে উঠল : মাছটা না নিলেও হত। সত্তরটা টাকা বাঁচত। বেকার টাকাটা গেল। এত ছোট্ট মাছ—দেখবেন সেই বদনামই হবে।

অর্পনের মধ্যে মহিমের কথাটা আর অতিক্রম করতে পারল না। সীমানায় বন্দী হয়ে গেল যেন। চরকির মত ঘুরতে লাগল নাম, বদনাম। বাজতে লাগল ক্ষীণস্বরে।

অর্পনের ব্যস্ততায় এবং দ্রুততায় মহিম, অর্পন, ছোট জামাই সুকান্ত এবং মেয়েরা মাছ কুটল, রান্না করলেন ভবানীবাবু। নিমন্ত্রিতদের ধৈর্য মানছে না। বিনা ডাকেই সবাই উঠোনে এসে ভিড় করেছে।

বেলা দুটোর সময় মায়ের ভোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসল সবাই। পরিবেশন করতে লাগল বাড়ির লোকজন। একটু শান্ত আবহাওয়া, স্নিগ্ধতাও বোধ ছড়াতে লাগল কাছের বাতাস।

গ্রামের ব্রাহ্মণরা খেয়ে উঠে গেল। মেয়েরা খেল। তারপর বেলা চারটের সময় খেতে এলেন পাশের গ্রামের ধনী কেনারাম ঘোষ। তিনি

প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান, সাধারণত বাইরে যান না, যেহেতু অবনীবাবু একদা পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন সেই সূত্রে বা রাজনৈতিক মতৈক্যের কারণেই ভবানী-বাবুর বাড়িতে আসেন। প্রতি বছরই।

কেনারাম ঘোষের জন্য ঘরের বারান্দায় আসন পেতে জায়গা করে দেওয়া হল। ভবানীবাবু অক্লান্ত পরিবেশক। অর্পনের বহুবার অনুরোধ সত্বেও তিনি এক-দু গ্রাস সরবত ছাড়া কিছু মুখে দেননি। এবার কেনারাম ঘোষের জন্য কাঁসার থালায় খাবার সাজিয়ে এনে দিলেন ভবানীবাবু। ঘোষমশাই নির্লিপ্ত। মুখে ক্ষুধার কোন চিহ্নমাত্র নেই।

অনেকেই দর্শনার্থী। দরজার সামনে, উঠোনে, রান্নাঘরের উনুনের কাছে যে যেমন পেয়েছে জায়গা নিয়েছে। কেনারামবাবু সকলের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। রাজনৈতিক মতামত দিচ্ছেন। অর্পন নির্বিকার। যেন এই গ্রামে এই মানুষটি একটি জ্যোতির্বলয়ের মত আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন সামান্য সময়ের জন্য।

অনেকবার বলার পর কেনারামবাবু ভোজনে রত হলেন এবং অর্পন দেখল এই অবেলাতেই তার পরিপাটি আহার করার ক্ষমতা। ভবানীবাবু যথাসম্ভব পর্যাপ্ত পরিমাণেই সবকিছু সরবরাহ করে চলেছেন, মাছের ব্যাপারেও একই নিয়ম অনুসরণ করলেন তিনি।

মাছের মুড়ো খেতে খেতে কেনারামবাবু বলে উঠলেন: ভবানী, মাছ কুথায় পেলে গো, আজ তো বাজারে মাছের আমদানিই নাই তো।

পাশেই বসে ছিল নীলু ভটচাজ। নীলু গরীব, কোনরকম পূজো-পাট করেই সংসার চলে তার। নীলু এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেয়ে ছাড়ল না। ভবানীবাবুর উত্তরের আগেই ঝটিতি বলে উঠল: জামাই আর মহিম ধেয়ে ভাঁড়বার ফকরে নাপিতের কাছে মাছ নিয়ে এসেছে। ত্রিশ টাকার দর। ব্যাটা নাপিত এখন খুব গলা কাটছে।

প্রবীন কালো চাটুজ্যে সামনেই বসেছিলেন। তিনি কৃতী পুরুষ। চার ছেলে কলিয়ারীতে ভালো চাকরি করে। গায়ের উত্তরীয় দিয়ে মুখ মুছে বলে উঠলেন: ন্যাখ কেনারাম, ফকরে নাপিতের বাবা পূজা ক'দিনে মন্দিরে বসেই থাকত, সারাদিন। এখন ফকরের টিকিও দিখা যায় না, রেন্ধা ভাইটাক পাঁঠায় দেয়। সাতবার বলে পাঠালেও নিজে আর দিখা দেয় না—বিটার পয়সা হঁয়েছে।

কেনারাম একটু শুনলেন, মনের ভিতরে কোথায় যেন গ্রহণ করলেন

কালোবাবুর কথাগুলো। পরে ভবানীকে উদ্দেশ্য করে বললেন : ভবানী, তুমি আমাকে বল নাই কেনে, তুমের মাছের অস্থায় ইয়েছে ত, আমি পখর থেকে মাছ ধরায় দিতুম। মায়ের ভুগের জন্যে চার-পাঁচ কেজি মাছ দিতুম না হলে। দরের জন্যে কি আসে যায়!

অর্পনের কানে এই লোকটির চরিত্রের সবকিছুই প্রকট। তবু ভবানীবাবু তার কাছে কৃতজ্ঞ। বন্যার সময় সাহায্য করেছিলেন কেনারামবাবু। সরকারি সাহায্য হলেও ভবানীবাবু যেহেতু তা ঘোষমশায়ের মারফৎ পেয়েছিলেন, তাই একথা এখনও সবিস্তারে বলে থাকেন।

কথাটা শুনে ভবানীবাবু অর্পনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ও হাসলেন। অন্যান্যরাও হাসলেন। গোপনে। অর্পনের চোখ সবই দেখছিল। অর্পন জানে, লোকটির সব বদনামই আছে কিন্তু টাকার জোরে কোনকিছু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতাও কম নয়।

নিঃশব্দ পরিবেশের বাতাসে আবার ধ্বনি ছড়ালেন কেনারামবাবু, সেই পুরোনো প্রসঙ্গে : আমার পখরের একটঅ মাছেই তুমার ই-কটা লুক খাওয়ানো ইয়ে যেত। নাকি নীলু? বলেই সগর্বে হাসলেন।

এবার অন্যরা হাসল না। কেবল নীলু কেনারামবাবুর হাসিতে স্পর্শ মেখে স্ফীত অধরে বলে উঠল : সি কথা কি বলতে হয় জিঠা? তুমার পখরের মাছের সাইজই আলাদা। পরক্ষণেই একটু কৃত্রিম অন্তরঙ্গতার বাষ্প ছড়িয়ে নীলু বলে ফেলল : আমার ছেলেটর পৈতে দিব চৈত মাসে। তখন কিন্তুক তুমার পখরের মাছ লিব জিঠা। না বলতে পারবে নাইখো।

মাছের টকের ঝোল তিনবার নেওয়ার পর পায়েস খেতে হাতের তালু চাটছেন কেনারামবাবু। পরিতৃপ্ত মুখে ঘোষমশাই এবার অন্য কণ্ঠে বলে উঠলেন : দর দিতে পারবি—দেখছিস তো মাছের কত দর!

অতর্কিতে শব্দের ঝনাৎকারে জনমণ্ডলী ও নীলু কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই নির্নিমেষে চেয়ে রইল আয়তচক্ষু কেনারাম ঘোষের দিকে। অর্পন খুব ছোট্ট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে, চোখের নীলিমায় তার অসংখ্য ছোট ছোট মানুষ, দীন, দরিদ্র, মানুষের মিছিল, চিৎকার ভাসতে লাগল, বাজতে লাগল হৃদয়ের দামামায়। এমন সুরের সঙ্গে, দৃশ্যের সঙ্গে, তার আজো কোন পরিচয় ছিল না—এই কয়েকটি ঘণ্টায় সবকিছু স্পষ্ট, একাকার হয়ে গেল।

একটু পরে কেনারাম ঘোষের মোটর সাইকেলের শব্দ মিলিয়ে গেলে

সকালের মত বস্তাটা পেতে বসে পড়ল অর্পন। নীরব, একাগ্র অর্পনের মানসপটে মানুষের মিছিলটা মাছের স্রোত হয়ে নামতে লাগল বুকের চারপাশে। পাথর ভেঙ্গে পাহাড় থেকে যেমন ঝর্ণা নামে, সেইরকম।

অজান্তেই মনে হল, ফকির নাপিতের ছোট জালে এ মাছেদের ধরা যাবে না। তরঙ্গ তুলতে হবে, তুমুল তরঙ্গ!

কামিনেরা এঁটো পাতা তুলতে আসেনি। কেনারামবাবুর উচ্ছিষ্ট পাতের উপর মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। কাঁসার থালায় সূর্যাস্তের ঝিলিক। থালার চারপাশে মাছেদের শরীরের ভুক্তাবশেষ। অর্পন আর চোখ তুলতে পারল না।

পুনর্জন্ম

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

এখন নদীটা নিতান্তই শান্তশিষ্ট ক্লাস নাইনের বালিকার মত। দূর থেকে দেখলে একটা সামান্য সরলরেখা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। তার দু'চোখের লোভ লালসা ক্ষুধা অন্ধকারে কিছুতেই ঠাওর করা যাবে না। অবশ্য থাকলে তো ঠাওর করবে। এখন বাতাসে ঠাণ্ডা স্রোত। মরা বাদার ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা ঝাপটা বইছে তো বইছে। দাঁত বটে শীতের। ঝকঝকে। ধারালো। ভাবলে শেষতক্ হাসি পায় নুটুর। কখনো নদীর দাঁতে ধার বাড়ে। কখন শীতের। একচেটিয়া কামড় খেতে খেতে নুটুর শরীরে সম্বৎসর দাদ একজিমার ক্ষত। শাদা চোখে খেয়াল পড়বে না। তবে ক্ষত আছে। জ্বালাও আছে।

সংসারী মানুষেরা কখন শীতের রাতে নদীর চরে একাকী ঘোরাফেরা করে না। সংসারে হাজার বাঁধন। সুখের পরশ। গভীর রাতে নিঃশব্দে সেখানে উনুনের আঁচ যেন অন্ধকারে গন্‌গন্ করে। নুটুর সংসার আছে। তবু থেকেও কিছু নেই নুটুর। বন্যা নুটুকে মেরে দিয়ে গেছে। ওঃ, একচোট বন্যা হয়েছিল বটে এবার। জায়গাটার গোটা সভ্যতা, জনবসতি তথা হাজার মানুষের পেটের অন্নকে উপড়ে নিয়ে বন্যা বওয়া নদীটা যেন এখন মাথা দুলিয়ে নীরবে ক্লাসের পড়া মুখস্ত করছে। ভিটে মাটি ফাঁকা। বাদার দুচোখে মরণ। পেটে বাড়বাড়ন্ত আগ্রাসী ক্ষিদে। জলের তোড় যখন ভরা জমিটার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল···। ভাবলে এখনও দুচোখে নোনা জলের ঢল নামে নুটুর। সে কিছুতেই বেগ সামলাতে পারে না। তারপর থেকে সমানে হা অন্ন চলেছে। গর্ভবতী গাই আর লক্ষ্মীর সদ্য বিয়া নো দু-মাসের ছেলেটাকে টেনে নিয়ে বন্যা উধাও। কোলের ছেলেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমনই জলের টান। ক্যাম্পে কদিন চোখের জলে নুটুকে এবং নিজেকে ভাসিয়েছে লক্ষ্মী। সবে আয়েস করে বিয়োন ছেলে। ভাবা—যায়—না। এসব ভাবলে, বুকে, প্রকাণ্ড ক্ষিদে থাকলেও, চিনচিনে ব্যথা ওঠে। হাজার হোক পুত্রশোক। যদিও নুটু এখন ক্ষিদের দাপটে ক্ষ্যাপা ষাঁড়। বা, তার চেয়েও ভয়ংকর। ঘরে অসুস্থ বাপ। কোলখালি করা বউ। এবং যথেষ্ট যৌবনবতী বোন। আর ক্ষিদে। এমন ঘরে কার মন থাকে। রাখা যায়? যায় না।

চক্রবর্তীদের বাড়ি কাজে গেলে খালি হাতে ফেরে না বউ। আলু চাল। ডাল চাল। কখনো বা আটা। সন্ধ্যায় কাজ। সকালে কাজ। কি যে এত কাজ নুটু বোঝে না। সন্দেহ হয়। এ নিয়ে বউয়ের সঙ্গে লাগল আজ। লাভের মধ্যে সকাল থেকে কাজেই যায়নি বউ। পেটে তালা। ভেবেছিল সন্ধ্যা নাগাদ বলবে—ও বউ, মুখের কথা কি বলতি কি বলেছি, ধরে কেউ! যা…! বস্তুতঃ বলতে চটাং করে প্রেস্টিজে লেগে গেছে নুটুর। হাজার হোক পুরুষ মানুষ। গেলবছরও তার চার বিঘে জমি ছিল। একটা দুধেল গাই। সে এখনও এমন নিড়েন দেয়…। সে সাধবে বউকে? কেন নুটুকি পুরুষমানুষ নয়? ইজ্জত নেই নুটুর? সকালের ঝগড়ার শোধ তুলছে বউ। মেয়েমানুষেরা বড় অদ্ভুত। যেন জানে নুটু সাধতে আসবেই। মেয়েমানুষেরা সব বোঝে। তেনাদের পেটেই তো মানুষ জন্মায়। বউয়ের ওপর এত অভিমান হয় নুটুর—বলবার নয়। সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে নুটুর। অভাব—অভাব। একটু আয়েস করে, ঘরে বসে সুখের দোলা খাওয়া এজন্মে আর হল না। ভাবলে নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়। আপনা হতেই বুকের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় দীর্ঘশ্বাস। এত বোকাবোকা লাগে নিজেকে! নদীর পাড় ধরে সে তখন হাঁটে। দিগন্তটা একদম ঝাপসা। ঠাণ্ডায় আকাশের তারাগুলোর টাইফয়েড না হয়ে যায়! দূরে বকুল গাছ। বাবলা কলি মনসার ঝাড়। ক্ষ্যাপা নুটুকে দেখে বাতাসের ধাক্কায় তারা হেসে কুটোকুটি। এ ওর গায়ে গিয়ে পড়ে। আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়। নুটু হাঁটে। পাগলা করা ক্ষিদেতে তার পেটে সব জট পাকিয়ে যায়।

বাপটা দুপুর থেকে নিয়ম করে রক্ত তুলে যাচ্ছে কাশরোগ। নুটু জানে। কাঁথা ন্যাকড়া সব লালে লাল। ঘরে যেন লালের বন্যা নেমেছে। ওষুধপত্র কিছু নেই। শুধু জলে তো আর রোগ সারে না। তবে বাপের জ্ঞান আছে বটে। জ্বরে বেঁহুশ। রক্ত উগরাচ্ছে। যন্ত্রণায় অঙ্গ বেঁকেচুরে একসা। তবু জ্বর সামান্য নামলে বাপ এখনও বলে—জমির খবর কিরে নুটু? নরেন বাবুর কাছে গেসলি? নুটু?

তখন নুটু কপালে জলের পটি দেয়। বলে—একটুন চুপ করে শোওতো!

—আর কদিন আটা খাইয়ে রাখবি বাপ? চাট্টি ভাত…।

—দেবো বাপ, নিশ্চয় দেবো।

—গরম ভাতরে নুটু, ধোঁয়ায় ঠোঁটে জল জমে যাবে।

—খাবে খাবে। এখন চুপ করো।
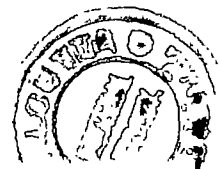
তখন বাপ পাশ ফেরে। গায়ে তাপ। শুকনো চামড়া। শরীরের হাড় কখানা ঠাঠা, করে হাসে। অন্ধকারে যেন মিশে থাকে বাপ। নুটু জানে এমনভাবে রক্ত তুলে তুলে টপ করে একদিন স্বর্গে চলে যাবে বাপ।

নুটুর বিয়ের বছরখানেক পর সম্পত্তি ভাগ হল। দুই ভাই। বিয়ে থা করেছে। বাচ্ছাকাচ্ছা হবে। ভেন্নও হওয়াই তো উচিত। গাঁয়ের পাঁচমাথা বসে ওদের হাঁড়ি কড়া আলাদা করে দিল। ঘর ঘটি বাটি সব ভেন্ন হল। নুটুর ভাগে বাবা আর বোনটা পড়ল। মাকে নিল দাদা। ছেলে বড় হয়ে বাপ মাকে না দেখলে অধম্ম হবে। ইচ্ছে হলে মাকে নিতে পারত নুটু। নেয়নি। আসলে বাবার প্রতি ওর একটা প্রগাঢ় মমতা আর ভালোবাসা আছে। তাই সে বাবাকে নিয়েছে। দুধেল গাইটার জন্য বোনের দায়টা ঘাড়ে চেপে গেল।

পরের বছরই মা শুয়েমুতে শেষ হয়ে গেল; তখন থেকে দাদা ঝাড়া হাত পা। লক্ষ্মী এখন মুখ ঝামটা দেয়।

—একেই বলে হাঁদারাম। বেতো বাপ আর আইবুড়ো বোনকে না নেলে চলছিল না। এখন মাগীর বে দেবে কে? একেই নুন আনতে⋯।

বলব বলব করেও কিছু বলতে পারেনি বউকে। লক্ষ্মীর গায়ে যৌবন ওলটপালট খাচ্ছে। মা মারা যাবার পর দাদা জমি বেচে সদরে দোকান দিলে। বেশ চলছে দোকানটা। ওদিকে নুটুকে প্রথমে ডোবালে খরা। তারপর বন্যা। এখন নুটু কোথায় যায়? সেই হা অন্ন। অকাল চলেছে। বউ চক্রবর্তী বাড়িতে কাজ করে সংসারের চাকা ঘুরোচ্ছে। মহাজনের সিন্দুকে বাঁধা আছে জমি। কমাস ধরে ক্রমাগত দিনের বেলাতেও অমাবস্যা দেখছে নুটু।

তখন নুটু নদীর সামনে এসে দাঁড়াল। এমন ভাব যেন নদীটাকে নেবে এক হাত। সবুজ ঘাষ গজিয়েছে চারপাশে। দিনের বেলাতে ফড়িং চোখে পড়ে। তার শরীরে ছেঁড়া কম্বল। শীতের যোদ্ধারা অলিগলি ফুঁড়ে ঠিক কামড় লাগাচ্ছে। ব্যাপারটা সয়ে গেছে নুটুর। মুখে দাড়ি। চোয়াল বসে গেছে গভীরে। জলজ্বলে চোখ শীর্ণ শরীর। যে কেউ নুটুকে দেখলে পাগল ভাববেই। দোষ নেই তাদের। এমন ঠাণ্ডায় নদীর চরে পাগল ছাড়া কেউ বা চলাফেরা করে?

গাঁয়ে কাজকম্ম যে কিচ্ছু হয়নি এমন কথা কেউ বলবে না। হেলথ সেণ্টার। ইস্কুল। ফুড ফর ওয়ার্ক। কিন্তু নুটুর কাজের লাইনে দাঁড়াতে

প্রেস্টিজে লাগে। এককালে জমি ছিল তার। আর সে কিনা…! নুটু জানে তার আত্মসম্মান বড়ই প্রখর। টনটনে। ভবেন বলেছিল চক্রবর্তী মশাইয়ের জমিতে ক্ষেতিমজুর হতে। ছ টাকা রোজে কাজ। নভেম্বরে বোরো হবে। বসে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। লক্ষ্মী সাধাসাধি কম করেনি। কিন্তু রাজী হয়নি নুটু। নরেন মহাজনের কাছে গিয়ে সে অন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। বাবু, আমার জমিটুকুন আপনারই থাক। আমায় চষতে দেন। ফসল আধাআধি। রাজী হয়নি মহাজন। কেন হবে? ক্ষেতি মজুর দিয়ে চষালে অনেক লাভ।—ফিরে এসেছে নুটু।

নুটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কুয়াশার ওপরে মেঠো জ্যোৎস্না। রাত গভী র হবার সঙ্গে সঙ্গে শাদা জ্যোৎস্না যেন ভরভরন্ত দুধের সর। কুয়াশায় এমন লাগছে জায়গাটা। পেট ভর্তি থাকলে, এমন সময় যে কোন মানুষের কাছে পৃথিবীটা বড়ই পবিত্র এবং সুষমামণ্ডিত।

গেল বছর খরা হয়নি। বৃষ্টিফিস্টি হয়েছিল বেশ। এক এক কলি ধানচারা জল ইউরিয়া খেয়ে আশি নব্বুই কলিতে দাঁড়িয়েছিল। রোয়া ধান চারায় ধুয়ে গিয়েছিল মাঠ। চকচকে গদ্দা জমি। ক্ষীরের মতন নরম। খোয়ালি দেবার প্রয়োজন নেই কোথাও। সেই জমিতে এখন টাক। দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে গিয়ে অস্ফুট শব্দ করল নুটু। কটা ঘাষ ও সেই শব্দ শুনে চমকে পাশ ফিরল।

শান্ত নির্জন এই চর। জ্যোস্না ফর্সা রমণীর মত। নুটু ভাবছিল বউয়ের গোঁ কাল সকালে ভাঙ্গবে তো? ঠিকে ঝিয়ের কাজ চক্রবর্তীর বউ যদি ক্ষেপে যায়, কাজটা যদি না থাকে তাহলেই নুটুর হাতে হ্যারিকেন। আকাশের দিকে তাকাল নুটু। অনেক সময় আকাশে অনেক প্রশ্নের উত্তর লেখা থাকে। টানাপোড়েনে, আক্লিষ্ট মানুষ তখন আকাশের দিকে তাকায়। কিন্তু এই আকাশ কাল সকালে নুটু কি খাবে তার কোন সদুত্তর দিতে পারল না। চোখ নামিয়ে সামনে যতদূর চোখ যায় তাকাল। পঞ্চায়েতের বিশুবাবু টিউকল বসাবে। পরশু পথে দেখা হয়েছিল। নু টু পেন্নাম করে বলেছিল

—পেটে কিছু নেই বাবু। টিউকলে কি হবে?

—ভালো জল পাবে নুটু। বিশুদ্ধ জল।

—এদিকে যে বাবু হা-অন্ন।

—আমি তো ভগবান নই নুটু। একা কত করবো? তারপর ক্রিং ক্রিং শব্দ তুলে বিশুবাবুর সাইকেল যেন বাতাসে উড়ে মিলিয়ে গেল।

—তোর অবার কষ্ট কিসের হুটু? জিনিশের সদব্যবহার করলে কখন কষ্ট থাকে না।

ফণী বলেছিল কথাটা। নরেন মহাজনের পয়লা নম্বরের সাগরেদ। প্রথমটা হুটু তেমন বোঝেনি। নরেন মহাজন বাড়ি ছিল না। জমির জন্য কথা বলতে গিয়েছিল হুটু। বারান্দায় বসে ফণী তখন সিগারেট ধরাচ্ছে। হুটুকে দেখে বলেছিল—আয় বোস।

—বড় আকাল চলেছে বাবু। এমন চললে সংসার থাকে না। বাপের অসুখ। জানেন তো সব।

তখন ফণী কথাটা বলেছিল।

—কি জিনিশ বাবু? ঘরে জিনিশ বলতে তো··· ।

—আছে, আছে হুটু, চোখ খুললেই দেখা যায়

—কি বাবু···কি।

—নরেন বাবু তোকে জমিটা ফেরৎ দিতেই চায়। তবে বুঝলি না ঐ আর কি।

—কি বাবু··· । কথার এমন টান—কিছুই বোঝে না হুটু। জমির কথা শুনে তার বুকে তখন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।

—তোর বোনটাকে বাবুর বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দে। থাকবে, খাবে··· শোবে ..। হ্যা হ্যা করে হেসেছিল ফণী।

সাপের ছোবলের চেয়েও দ্রুত একটা শিহরণ নেমে গেছে হুটুর মেরুদণ্ড বেয়ে। চমকে উঠেছে হুটু। ভয়ে পালিয়ে এসেছে। একটা মাত্র বোন তার। কত সাধ জামাই আনবে। সে কিনা··· । লক্ষ্মীকে বলেছিল সে কথাটা। রাতের অন্ধকারে যতটা কাছে আসা যায় এসে হুটুর গলা জড়িয়ে লক্ষ্মী বলেছিল—এমন সুযোগ পায়ে ঠেলে কেউ! ওগো! হুটুর মনে হয়েছিল একটা প্রকাণ্ড অজগর আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে ওকে। হুটুর না আছে তাবিজ। না কোন জানা মন্তর। হাতের জোরে ছোবল থেকে বাঁচিয়েছে নিজেকে। তখন লক্ষ্মী রাগে ফুঁসছে।—তা শুনবে কেন মিনসে? বোয়ের গতর ভাঙ্গিয়ে খেতে বড় স্বোয়াদ যে। মরণ হয় না তোমার। হুটু কোন জবাব দেয়নি। অন্ধকারকে দুহাতে জড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছে কেবল। সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দে চমকেছে বারবার।

প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে। চল্লিশ বছর প্রায় বয়স হতে চলল। মেদ মাংস বলে শরীরে কিছু অবশিষ্ট নেই। আকাল হু-হু করে শুষে

নিচ্ছে সব। তবু জনমজুর খাটতে গেলে ঠক্ করে সম্মানে বিঁধে যাবে কাঁটা।

ঠাণ্ডায় কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ। ঘরে বাবা কাশছে। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে লক্ষ্মীর পাশে টুপ করে শুয়ে পড়লেও ঘুম আসবে না তার। নুটু জানে। তাই সে একা নির্জনে নদীর চরে ঘুরে বেড়ায়। জোৎস্না ঝিলিক দেয় আকাশে। শতকোটি বছরের পুরানো আকাশ। শতকোটি নক্ষত্র। মরা বাদা। শান্ত নদী। নীরবে সকলে লম্বা ঘুম দেয় তখন। ভাত ঘুমের সময় এটা।

মেয়ে দুটো ভালো আছে। ফল পাকড় গাছ-গাছড়া যা পাচ্ছে হজম করে ফেলছে। না চিনে জেনে যা খাচ্ছে পেট ঠিক সইয়ে নিচ্ছে। কখনো পেট ছাড়ে না। লক্ষণটা ভালো। এমন হাভাতের ঘরে পেট রোগা হলে তো আর কথাই নেই।

আসলে ভাগ্য একেই বলে! নুটু বোঝে। ওমন দুধেল গাইটা ভেসে গেল। নইলে এসময় দুধ বেচে দুটো পয়সা আসত। খড়ের দাম আগুন। হাত দেওয়া যায় না। তা নদীর চরে এদিকটায় কচি ঘাস উঠেছে। গরুর পেট ভরাতে যথেষ্ট। ওঃ অমন গাইটা…। মাথার মাঝখানে অদ্ভুত এক অবসাদ অনুভব করল নুটু। ঘুম পাওয়া না পাওয়ার মাঝখানে তন্দ্রা মাখানো একটা জাগিয়ে রাখা ক্লান্তিতে ছেয়ে যাচ্ছে শরীরটা।

লক্ষ্মী এখন দুবেলা গালমন্দ করে। "মরণ অমন মিনসের। বসে না থেকে চরের কচি ঘাস কেটে মধুবাবুর বাড়ি যোগান দিতে পারতো। ওদের দুধেল গাইটা খাবে। তা করবে কেন? কটা পয়সা আসবে যে ঘরে।"

বাস্তবিক ও কাজ করতে হাত উঠবে না নুটুর। নিজের দুধেল গাইটা ভেসে গেছে। সে অন্যের গরুকে ঘাস খাওয়াবে? এমন কাজের চেয়ে হাঁসুয়া দিয়ে নিজের গলাকাটা অনেক পূণ্যের। কিন্তু তার বউ যে পরের বাড়ি খেটে তাকে খাওয়াচ্ছে—তাতে নুটুর সম্মান যাচ্ছে না? এটা সে কখনও গভীরভাবে চিন্তা করে না। কারণ তাতে নিজের সমূহ ব্যর্থতা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাত ক্ষিদে এবং জমানো ঠাণ্ডা আরো জমে উঠছে। নুটু একা চরের জমিতে। শীতকালে সাপখোপের ভয় তেমন নেই। তাই নুটু স্বচ্ছন্দে হাঁটছে। চলছে। ফিরছে। একরাশ দাউদাউ করা ক্ষিদে তার সঙ্গে সঙ্গে। চলছে। ফিরছে। নৈঃশব্দ এখানে প্রবল। একেই সন্ধ্যা হলে গাঁ গঞ্জ

থেকে শব্দ টব্দ একদম উধাও হয়ে যায়। গভীর রাতে তো কথাই নেই। বিড়ি জ্বালিয়েছে নুটু। আগুনটাই দেখা যাচ্ছে কেবল। নুটুকে নয়। উপবাসজর্জর নুটু ক্ষিদে ভুলতে পায়চারি করে যাচ্ছে। সে জানে বাড়িতে সকলে ক্ষিদেতে ছটফট করছে। বাপ গলগল করে তুলছে রক্ত। ছোঁয়াচে রোগ। ময়না কুশী, নুটুর দুই মেয়ে। ওদের বাপের কাছে ঘেঁষতে দেয় না লক্ষ্মী। কিন্তু আজ নুটু বিকেলে নিজের কানে শুনেছে ময়নার গলা।—দাদু ডুমুর খাবি? খা না! কটা খেলেই পেট ভরে যাবে, দাদু খা না।

বাপের সাড়া নুটু পায়নি। বাপ তখন জ্বরে বেঘোর। রোগের ঘরেই কচকচ করে ডুমুর চিবোচ্ছে মেয়েটা।

মাটি থেকে কচি ঘাস কটা তুলে নুটু শূন্যে ছুঁড়ল। বউয়ের জন্য তার আজ এই হাল। স্বামী কি দুটো কথা বলেছে, তাতেই মাগীর গোঁ চেপে গেল। কাজে গেল না। একটুন চক্রবর্তী বাবুর বাড়ি ঘুরে এলে আর কিছু না হোক দুটো করে হাতগড়া রুটি…। যথেষ্ট। ক্ষিদের বাজারে যা পাওয়া যায় তাই নসীব। এমনভাবেই মেয়েমানুষের দোষে সংসার পোড়ে।

নুটু গভীরভাবে বিড়িতে সুখটান দিল।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে নিজেকে কড়া কটা খিস্তি করল। যদি মনটা ভাল হয়। হল না। হয় না এভাবে।

রিলিফের টাকা এখনো আসেনি। বাঁশের দরমা দেওয়া ঘরে হু-হু বাতাস ঢুকছে। স্যাঁতস্যাঁতে মাটি। বনবন করে চক্কর খাচ্ছে ক্ষুধার্ত মশা। এক ঘরে বাবা শুয়ে কাশছে। জ্বরে শুয়ে আছে বোন। অন্য ঘরে মেয়েদের নিয়ে লক্ষ্মী। চরের কাছে উদভ্রান্তের মত হাঁটছে নুটু। নুটু জানে তার বউটা আর সতী নেই। চক্রবর্তীবাবুর বাড়িতে একবার গেলে ফিরতে চায় না। এবং নুটুকে ইদানিং কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। অথচ আগে, অবস্থা যখন মোটামুটি ভালই, রাত হলে লক্ষ্মী এবং নুটুর মধ্যে যেন জেগে উঠত উষ্ণ প্রস্রবন। লক্ষ্মী তখন মোমবাতির মত জ্বলত। তার চারপাশে মরণ পাখনা ওঠা পতঙ্গ নুটু। সেসব যে কি দিন গেছে—এখন ভাবলে নুটুর পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

তার নিজের বউকে চক্রবর্তীবাবু…। অসতী বউয়ের আনা চালে সপাসপ ভাত খেয়েছে নুটু। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইল নুটু। মেঠো জ্যোৎস্নায় যেন নদীটা ডুবে গেছে। তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে জল। হঠাৎ নুটুর মনে হল সে কি মরে গেছে? মরে কেঠিয়ে গেছে নিজের মধ্যে?

নইলে ঐ ভাতের গরাস তোলে কি করে? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, চাট্টি গরম ভাত পেলে, খাওয়া দাওয়ার পর বউ সতী না অসতী সেই বিচারটা জমে ভাল।

হেলথ সেন্টারের কাজল ডাক্তার পয়লা নম্বরের খচড়া। বাপের চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠাবার চিঠি কিছুতে দেবে না। দেবার মধ্যে কিছুটা লাল মিক্সচার। দশ শিশি এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেছে বাপের। একটুনও জ্বর নামেনি। হাতে চাট্টি পয়সা থাকলে নিজেই সদরে নিয়ে যেত বাপকে। চোখের সামনে বাপটা মরে যাচ্ছে। হুটু আর ভাবতে পারে না। বউটা অসতী। বাপ মরমর। কি রইল জীবনে?

কাল সকালে হুটুর প্রথম কাজ ঠেলেঠুলে বউটাকে চক্রবর্তীদের বাড়ি পাঠানো। যেতে যদি না চায়, দুচার ঘা দিয়ে দেবে হুটু। তার কথায় সংসার চলবে। বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে ফিরে আসবে বউ। চাল পেলে তো কথাই নেই। আটাও মন্দ নয়। গরমাগরম ভাত। বা, হাতে গড়া রুটি। খেয়ে পেট ঠুসে জল। বিড়ি। তারপর হুটুকে দেখে কে? সন্ধ্যায় আবার কাজ। আবার খাবার। সুখের ছোঁয়াচ লেগে যাবে সংসারে। ভাবতে ভাবতে হুটুর মনে হল এবার সে নির্ঘাত খুশির জোয়ারে আকাশে উড়ে যাবে। জমি যাবার পর থেকে বউটাই সংসার চালাচ্ছে। অভাবে সব ভেঙেচুরে গেছে। তবু বউ আর বোনটার গতর ভাঙেনি। আসলে, হুটুর মনে হল, ঐ চক্রবর্তীদের বাড়ি কাজ করার জন্যই ভগবান বউয়ের গতরটা ভাঙেনি।

হঠাৎ হুটুর মনে হল শাদা জ্যোৎস্নার তলায় একপেট ক্ষিদে নিয়ে সে যেন ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। নরেনবাবুর দালাল ফনীর প্রস্তাবটা এতদিন পরে মনে পড়ে গেল। বোনটাকে বাঁধা রাখলেই নরেনবাবু জমিটুকুন ছেড়ে দেবেন। বস্তুত সে বড়ই নিরুপায়। এই অভাব আকালের মধ্যে কতকাল বোনকে আগলে বেড়াবে? তার চেয়ে জমিটুকু ছাড়ান পেলে বোরো শুরু করে দেওয়া যায়। আবার কাজ। নিড়েন। রোয়া। বীজতলা। খোয়ালি। নিজের জমিতে ধান রুইবার যে কি আনন্দ! ভাবতেই আচ্ছন্নতা এল হুটুর। বাতাসে সে ধানের গন্ধ পেল। মজা ধানের গন্ধ। বুনো লতাপাতা তিরতির করে কাঁপছে। শূন্য নির্জন নদীর চরে হুটু নিজেই নিজের একক উপমা হয়ে গেল। বোনটাকে সে নরেনবাবুকে দিয়ে দেবে। দেবেই। নিজের জমিতে ধান ফলাবে সে। ক্ষেতমজুর কিছুতেই হবে না। এককালে তার নিজস্ব

জমি ছিল। একটা দুধেল গাই। সে কখন অন্যের জমিতে ক্ষেতীমজুর হতে পারে? সে কখন অন্যের গরুর জন্য ঘাস কেটে আনতে পারে? তার কি সম্মান বলে নেই কিছু? ওসব কাজ সে পারবে না। কিছুতেই পারবে না। জমি। তার আবার নিজের জমি হবে। একটা আবেগ আসছিল বুকের ভিতর। হঠাৎ সেটা মাঝপথে থেমে গেল। চমকে উঠল নুটু। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বোনের লাবণ্যভরা মুখ। একদিন বিয়ের কথা বলেছিল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল বোনের মুখটা। সে তখন ছুটে চলে গিয়েছিল পুকুরপাড়ে। নুটু বোঝে বোন তখন পুকুরে নিজের মুখের ছবি দেখছিল। একদিন বিকেলের কথা। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল; পৃথিবী বড়ই মহার্ঘ্য। সূর্য সবে অনেক বলে কয়ে আকাশের কাছ থেকে সেদিনের মত ছুটি পেয়েছে। পুকুরের চোখে তালগাছটা বড়ই বেচাল বাতাসে। সেখানে সেখানে তখন তার সবে যৌবনের সিঁড়িতে পা দেওয়া বোন অধীর চঞ্চল। গোটা পৃথিবীটা মুখ তুলে যেন কেবল তাকেই দেখছে। ওমন সুন্দর লজ্জার চোখ নুটু পৃথিবীতে দুটো দেখেনি। বড় মোহময় মহার্ঘ্য লাবণ্যমুখর সেই মুখ। বোন। তার নিজের বোন। রক্তের সম্পর্ক। একই রক্ত কুলকুল করে বইছে দুটো শরীরে। এই সব ভেবে ভেবে নুটু, সেদিনের নুটু বুক থেকে বড় আনন্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। সেই শব্দে হেসে ফেলে টুপ করে ফুটে উটেছিল একটা পলাশফুল।

কিন্তু তার জমি। এতক্ষণের চিতাটা বাস্তবে এবং অলীকে, স্মৃতি ও বিস্মৃতিতে নুটুকে বড়ই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

জেগে উঠল নুটু। নতুন করে। নতুন নুটু। এই নুটুকে নুটু যেন নিজেই ঠিকমত চেনে না। ঠাওর করতে পারে না। এই নুটুটা একদম আলাদা। পেটে তার খিদে। তার বউ চক্রবর্তীবাবুর বাড়িতে নিজেকে বেচতে যায় নি আজ। উনুন চড়েনি ঘরে। আর উনুন না চড়লে, সম্পর্কের ব্যাপারটা, রক্তের হলেও যেন বড় জোলো হয়ে যায়। টানটা তেমন আর থাকে না। দুফসলী উর্বর জমি তার। পাথর ফেললে টপ করে সোনা হয়ে যায়। তাদের আর চালের কষ্ট থাকবে না। তখন তাদের বড় সুখের সময়। নুটু বোঝে একটা সুখ এইভাবে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। নুটু যেন শুনতে পায়, পেটপুরে ভাত খেয়ে তার বাবা বলছে—আমি ভালো হয়ে গেছিরে নুটু। আর আমার কোন অসুখ নেই।

কিন্তু তার বোনটা…।

অমন সুন্দর জমিটা··· ।

বস্তুতঃ পাপপুন্য দিয়ে তো আর জল খাওয়া যায় না। অনাহারে থাকার চেয়ে দুবেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকা অনেক ভালো কাজ। নুটু বোঝে। নুটু জানে। সাদা ধবধবে ভাত। ধোঁয়া উড়ছে ফরফর করে। কলমীশাক মেখে··· । ভাবতে গিয়ে নুটু দেখল প্রচণ্ড শীতেও সে বেশ গরম বোধ করছে। একটুও শীত লাগছে না তার। শরীরের রক্তপ্রবাহ মাতাল সমুদ্রের মত তাকে আছড়ে মারছে। সে আবার সব উষ্ণতা ফিরে পাচ্ছে। পৃথিবীটাকে সে বড় কাছে পেয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সময়ের মধ্যে স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে একাকার। আশ্চর্য ঘ্রাণের মত এক সৌরভময় জগতে সে এখন। যেন এক অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা। নিরবধিকাল সে যদি এমন থাকতে পারতো?

তখন জ্যোৎস্না কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বারবার। তারাগুলো কুঁইকুঁই করে কাঁপছে। বাবলার ঝাড় নিঃসাড়। নদীটা যেন আচম্বিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এবং, বিশাল চরের মাঝখানে, নুটু, নতুন নুটু, তার নিজের অস্তিত্বটাকে ঠিকভাবে ধরে রাখতে গিয়ে বুঝল সে কেবলই নিজের অজান্তে পিছিয়ে পড়ছে খানিক। তাই, শীতের অনুভূতিটা তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে অনেক দেরীতে।

হঠাৎ নুটু শুনতে পেল কে যেন তাকে ডাকছে। তাকেই। কারণ সে ছাড়া বর্তমানে এই নির্জন চরে আর কেউ নেই।

—দাদা, ও দাদা, দাদাগো ··!

বোন! হ্যাঁ বোনই। নিঃস্তব্ধ অন্ধকার মাড়িয়ে, নৈঃশব্দ ভেঙেচুরে লাল তাঁতের বিবর্ণ শাড়ীটা পরে তার বোন ছুটে আসছে।

নুটু অবাক হোল কিছুটা। বর্তমান চিন্তার সঙ্গে বোনের এইভাবে ছুটে আসা একটা গোলকধাঁধার সৃষ্টি করল। শরীরের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের শিহরণ আর কাঠিন্য অনুভব করল নুটু।

—দাদা, তুই এখানে, আর তোকে তখন থেকে··· ।

হাঁপাচ্ছে বোন। এতটা ছুটে আসার দরুন শরীর কাঁপছে। শীতের মধ্যেও প্রবল ঘামছে বোন। নুটু বোনের দিকে তাকাল। তারপর বলল—কি হয়েছে রে?

—বাবা কেমন করছে রে দাদা। এবার বোধ হয়··· ।

চমকে উঠল নুটু। যদিও সে জানে এমনিভাবে বাবা একদিন চলে যাবে। তবু, যেন মৃত্যুর গন্ধের ঝাপটা আচম্বিতে আছাড় মারল তার বুকে। নিঃশ্বাস

হয়ে গেল ওলটপালট। শরীরের ঋজুভাব থেকে প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল।

ঘরে ফিরে সে অবাক।

লক্ষ্মী দরজার এক কোণে দাঁড়িয়ে। জানলা গড়িয়ে নেমে এসেছে সাদা জ্যোৎস্নার ঢল। তখন সে তার বাবাকে দেখল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে বাবা। মুখের কষ গড়িয়ে ক্ষীণ রক্তের নদী। শীর্ণ লম্বা শরীর। চোখ ঢুকে গেছে অনেক গভীরে। তবু দুহাত দিয়ে বিছানার চাদর আঁকড়ে বাবা যেন বেঁচে থাকার যুদ্ধ করছে। তখন অন্ধকার যেন আর অন্ধকারই নয়। সেখানে চন্দ্রদেব অযাচিত জ্যোৎস্না ঢেলে যাচ্ছে। দরমার ফাঁক দিয়ে প্রকৃতি পাঠাচ্ছে বিশুদ্ধ বাতাস। ঠাণ্ডা যেন এখানে ততটা নয়। নুটুকে দেখে বাবা বলল—একটুন জল দে তো। আজ আমি মরব না দেখিস।

বাবাকে জল দিল। এবং চমকাল নুটু। সে যেন তার বাবাকে ঠিকঠাক চিনতে পারছিল না। ওষুধ নেই। পথ্যি নেই। ঝাঁঝরা ফুসফুস। তবু পাহাড় প্রমাণ মনের জোর নিয়ে বাবা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বাঁচার লড়াই। বেঁচে থাকার লড়াই। যুদ্ধ। নিরস্ত্র সৈনিকের মত, অজস্র ক্ষতকে উপেক্ষা করে ক্ষয়াটে ফুসফুসে বাবা টেনে নিচ্ছে পৃথিবীর মুক্ত বাতাস। তাহলে নুটু কেন পারবে না? বোনকে বাঁধা দিয়ে সে কেন জমি ছাড়াবে? চক্রবর্তীবাবুদের লালসার মুখে সে তার বউকে ঠেলে দেবে কেন? আর কিছু না থাক দুটো শক্ত হাত তো আছে নুটুর। সে জনমজুরী করবে। লোহার মত শক্ত দুটো হাত দিয়ে সে লড়াই করে যাবে। বাঁচার লড়াই। যুদ্ধ। বাবার মত। বাবার বুকটা ওঠানামা করছে। মুখে প্রশান্ত নিদ্রার ছাপ। ক্লান্ত সৈনিক বিশ্রাম নিচ্ছে। কাল প্রত্যুষে উঠেই আবার মরণের সঙ্গে তার সম্মুখ সমর।

নুটু কাঁপছে। নুটু যেন নতুন করে জন্মাচ্ছে। পরাশ্রয়ী গাছের শিকড়টা হঠাৎই খসে গেছে। এতদিন সে এক দীর্ঘ শীতঘুমের মধ্যে ছিল। জেগে উঠেছে। এখন তার লড়াই করার সময়।

নুটু বোনের কাঁধে হাত রেখে বলল—বাবা ঠিক ভালো হয়ে যাবে দেখিস। আমি থাকতে তোর কোন কষ্ট হবে না বোন।

শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া মাখানো গভীর রাত্রে, সাদা জ্যোৎস্নার নীচে ভয়ংকর শক্তি আর আত্মবিশ্বাস নুটুর ভিতরে অগ্নিসম উষ্ণতার জন্ম দিয়ে যাচ্ছিল।

ভারতে প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষণায়—ওয়ারেন হেস্টিংস

তাপসকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংস একটি সুপরিচিত নাম। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে পুরোপুরি ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের সূচনায় ইংরেজ কোম্পানীর স্বার্থরক্ষায় নবনিযুক্ত বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের সম্প্রসারণ নীতি বিশেষ করে রোহিলা জাতির বিনাশ ও টাকা আদায়ের নামে বেনারসের রাজা চৈৎ সিংহ এবং অযোধ্যার বেগমদের ওপর পাশবিক উৎপীড়ন তাঁকে বার্ক, মেকলে প্রমুখ অষ্টাদশ শতকীয় বিশিষ্ট ইংরেজ চিন্তানায়কদের চোখে নিন্দিত ও বিতর্কিত পুরুষ করে তুলেছে, এমনকি বিলেতের সংসদে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। অদ্ভুত বিষয় ওয়ারেন হেস্টিংসের এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তি, পরিশীলিত রুচি, বৈদগ্ধ্য, সাহিত্যমনস্কতা এবং প্রাচ্য ঘেষা যে কোন বিষয়েই প্রবল অনুসন্ধিৎসার আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এ কারণেই তিনি বসওয়েল, স্যামুয়েল জনসন প্রমুখ সমকালীনদের কাছে এবং এইচ বেভারিজ, পোওয়ারেল মুন প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের লেখায় নন্দিত ও কীর্তিত হয়েছেন। বাংলাদেশে কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ খৃষ্টাব্দ) ও কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ)র প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকায় প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা বিনম্রভাবই প্রস্ফুটিত। আরো, তাঁর পরবর্তী বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস যেখানে ভারতীয়দের "দুর্নীতিপরায়ণ" এবং কর্ণওয়ালিসের উত্তরসূরী বড়লাট লর্ড হেস্টিংস যেখানে হিন্দুদের "পাশব ও উদাসীন প্রকৃতির" বলে মনে করেন, সেখানে লর্ড হেস্টিংসের কাছে লেখা একটি চিঠিতে শাসিত ভারতীয়দের সম্বন্ধে ওয়ারেন হেস্টিংসের সপ্রশংস উল্লেখ বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য—"Our Indian subjects have been supresented as sunk ink in the grossest brutality and defiled with every abomination that can debase humanity ;......These I dare to pronounce,......are as exempt from the worst propensities of human nature as any people upon the fall of the earth, ourselves excepted. They are gentle, benevolent, more sus-

ceptible of gratitude,……faithful and affectionate in service and submission to legal authority……” ওয়ারেন হেস্টিংসের এ ধরণের প্রাচ্য প্রীতির অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সে প্রসঙ্গ আপাততঃ তোলা থাক্, স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে: হিন্দুদের সম্বন্ধে বিজাতীয় ওয়ারেন হেস্টিংসের এ ধরণের শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের উৎস কি? কিসের তাগিদে তিনি প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনে ব্রতী হন? অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে কতখানি সহায়ক হয়? তাঁর প্রাচ্য শাসননীতি ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র উপলব্ধিসুত—ডেভিড কথা প্রমুখ বিদেশী ঐতিহাসিককৃত এ ধরণের সিদ্ধান্ত কতখানি গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত? এ জাতীয় জিজ্ঞাসাসমূহের মীমাংসার জন্য চোখ ফেরাতে হবে ওয়ারেন হেস্টিংসের বাল্যশিক্ষার সেই পর্যায়গুলির এবং ভারতে অতিবাহিত তাঁর সুদীর্ঘ কর্মধারার অভিজ্ঞতাপ্রসূত একমাত্র সেই দিকগুলির প্রতি যেগুলি পাঠককে প্রাচ্যবিদ্যোৎসাহী ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে পরিচয় করাবে।

(১)

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন অধস্তন কর্মচারী হিসেবে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮ খৃষ্টাব্দ) মাত্র আঠারো বছর বয়সে ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন। এর আগে বিলেতে এক দুর্ধর্ষ শিক্ষিত যুবা এবং ওয়েস্টমিনস্টার বিদ্যালয়ের সেরা পড়ুয়া হিসেবে তিনি কৃতিত্বের ছাপ রাখেন। বিদ্যালয় জীবনে ওয়েস্টমিনস্টারের ক্ল্যাসিক্সের পঠন-পাঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর মধ্যে শোধিত মানসিকতা, ল্যাটিন কবিতার প্রতি ঝোঁক এবং ল্যাটিনের অনুকরণে ইংরেজীতে কবিতা লেখার নেশা এনে নেয়। ক্ল্যাসিক্সের প্রতি তাঁর এই অনুরাগ উত্তরকালেও যে অটুট ছিল তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর উত্তরপুরুষ ভারতের বড়লাট জন শোরের উদ্দেশ্যে হোরেসের (বুক টু, ওড ষোল ইত্যাদি) অনুকরণে রচিত তাঁর কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। জলযাত্রা ও পর্যটনের কাহিনী, ব্রহ্মবিদ্যা, ইতিহাস, কবিতা ও নাটক প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণেই ছিল তাঁর জ্ঞানপিপাসু বালকমনের অভিসার।

(২)

ওয়ারেন হেস্টিংসকে একাধিকবার দীর্ঘ সময়ের জন্য ভারতে আসতে হয় —প্রথমবারে (১৭৫০-৬৪ খৃষ্টাব্দে) ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন

অধস্তন কর্মচারী বা রাইটার (১৭৫০ খৃষ্টাব্দ) হিসেবে এবং দ্বিতীয়বারে (১৭৬৯-৮৫ খৃষ্টাব্দে) মাদ্রাজ কাউন্সিলের দ্বিতীয় সারির সদস্য (১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ) হিসেবে। প্রথমবারে (১৭৫০-৬৪ খৃষ্টাব্দে) সুবা বাংলার কাশিম-বাজারে কর্মসূত্রে থাকাকালীন (১৭৫২-৫৪ খৃষ্টাব্দ) হেস্টিংস ভারতীয় ভাষা, সভ্যতা, দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সময়ে তিনি প্রথমে উর্দু ও পরে কলকাতাবাসী শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের কাছে পারসী ভাষা শেখেন। পারসী সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হেস্টিংস জীবনীকার জি. আর গ্লেইগ দেখিয়েছেন যে পলাশী উত্তর যুগে সুবা বাংলা যখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় উত্তাল, তখন বাংলার নবাব মিরজাফরের দরবারে রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত হেস্টিংস এদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ইংরেজ কাউন্সিলের সভ্যদের জন্য বিভিন্ন চিঠি ও কাগজপত্র অনুবাদের কাজে লিপ্ত। ভারতীয় বিশেষ করে মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি গভীর টানবশতঃ ওয়ারেন হেস্টিংস বিলেতে ফেরার পর ১৭৬৫-৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পারসী ভাষার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টিতে প্রাণিত হন এবং এ ব্যাপারে একটি প্রকল্পও রচনা করেন; পরিকল্পনাটি কার্যতঃ ভেস্তে গেলেও প্রাচ্যজ্ঞান তপস্বী হিসেবে তাঁকে তাঁর বন্ধু ডক্টর জনসনের কাছে সমাদৃত করে তোলে।

(৩)

মুসলমান ভারত সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্যাকুল অন্বেষণ দানা বাঁধল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বাংলার বড়লাট হিসেবে তাঁর নিয়োগের পর। ইতিমধ্যে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে প্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষ করে ভারতীয় সভ্যতা, হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে গবেষণা, আলাপ আলোচনা ও লেখালেখি পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে এবং ভারত সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচুর বই-ও প্রকাশিত হয়েছে যেমন—আলেকজাণ্ডার ডাউ-এর 'হিস্টরি অফ হিন্দুস্থান' (তিন খণ্ডে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) বিশেষতঃ 'এ ডিসারটেশন কন্সারনিং দি কাস্টমস, ম্যানারস, ল্যাঙ্গুয়েজ, রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ফিলজফি অফ দি হিন্দুজ', উইলিয়াম বোল্টস্-এর কন্সিডারেসন্স অন ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স, বিশিষ্ট ভারতবিদ্ ও সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্সের প্রাচ্য সম্বন্ধীয় একাধিক লেখা প্রভৃতি। ভারতীয় সভ্যতার গরিমা ও অফুরন্ত জীবনী শক্তি সম্বন্ধে ইউরোপে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার সঙ্গে আত্মবিশ্লেষণের কাজও বিকশিত এবং ইউরোপীয় মূল্যবোধকে ঘিরে সংশয়ও উপস্থিত। পশ্চিমী

দুনিয়ায় ভারত সংশ্লিষ্ট চলমান এই বিতর্ক যে প্রতীচ্যের সুদীর্ঘ ভারতপরিচিতি সম্ভূত তা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। বিস্ময় ও প্রাচুর্যের দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ প্লিনি স্ট্যাবো প্রভৃতি গ্রীক লেখক থেকে আরম্ভ করে মেগাস্থিনিস, ফিচ্, নিউবেরী, হকিন্স, স্যার টমাস রো, টেভারনিয়ের বার্ণিয়ের প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে আগত গ্রীক, ইংরেজ, ফরাসী এবং অপরাপর বিদেশী পর্যটকের বিবরণীতে বিশদভাবে প্রতিভাত হত। এই সমস্ত বিদেশী সফরকারীদের লেখায় হিন্দুদের বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে ঠাসা খবর থাকলেও হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও সামগ্রিকভাবে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত আলোচনা পাওয়া যায় না, কারণ ভারতে ওয়ারেন হেস্টিংসের বড়লাট হিসেবে নিয়োগের আগে পর্যন্ত ভারতবাসী তথা ভারতে প্রচলিত সংস্কৃত ও পারসী ভাষার সঙ্গে পরবর্তীকালে ভারতবিজয়ী ইংরেজদের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে ওঠে নি।

ইউরোপের উক্ত ভারতবোধের সমানুগ হয়েছিল অষ্টাদশ শতকীয় ইউরোপের বৌদ্ধিক ও আলোকিত চিন্তাদর্শন। এর ভিত্তি বিশ্বজনীনতা, সহিষ্ণুতা ও যুক্তিবাদ। এই চিন্তাধারার প্রবর্তক ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার ও তাঁর সমসাময়িকেরা। সম্প্রসারণ ও রূপের সুর ভলতেয়ার প্রমুখ ফরাসী চিন্তাবিদদের ভাবনায় ঝংকৃত। খৃষ্ট ও অন্যান্য অপৌরুষেয় ধর্মের বিরুদ্ধে এঁদের জেহাদ এবং মানুষের সাম্য ও যৌক্তিকতায় এঁদের অটল আস্থা। পর্যটকদের বৃত্তান্ত থেকে অ-ইউরোপীয় অখৃষ্ট দুনিয়া সম্বন্ধে আহৃত স্বচ্ছ ধারণাকে আশ্রয় করেই ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে এঁরা ধাবিত।

অষ্টাদশ শতকীয় ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত আন্দোলনের ঢেউ ইংলণ্ডকেও আঘাত করেছিল। এরই প্রভাবে খ্যাতনামা ইংরেজ বাগ্মী ও চিন্তাবীর এডমণ্ড বার্ক, ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস, প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্যাপথিক স্যার উইলিয়াম জোন্স, ঐতিহাসিক উইলিয়াম রবার্টসন ভারতের সনাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা তথা ভারত শাসনের প্রয়োজনে ভারতীয় রীতিনীতিকে "অটুট" রাখার উগ্র সমর্থক। অষ্টাদশ শতকে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়জনিত রাজনৈতিক অনৈক্য এবং ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলার শাসনভার সর্বপ্রথম অধিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রথাকে অব্যাহত রাখার এই দাবি জোরালো ভাবে উত্থিত। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ভারত সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বহুদিনের সচেতনতা। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারতে

বড়লাট হিসেবে নিয়োগে ভারতীয় রীতিনীতির লালন ও পোষণই অভিব্যক্ত হল।

অষ্টাদশ শতকের শেষে ভারত বিশেষ করে বাংলার সাংস্কৃতিক চালচিত্রের স্বরূপ আলোচনায় এবার মনোনিবেশ করা যাক্। অষ্টাদশ শতকে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনোদ্ভুত সারা ভারতব্যাপী, রাজনৈতিক বিপর্যয় বাংলা দেশকেও এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রাস করে। পলাশী উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ মূলক আর্থিক নীতি তথা জমিদার-প্রজা শোষণ নীতির প্রভাবে বাংলাদেশের দরবারী সংস্কৃতির চরিত্রে আমূল রূপান্তর এল। ফলতঃ, এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক পুরনো জমিদার গোষ্ঠী (যেমন নাটোরের রাণী ভবানী, বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র, বিষ্ণুপুরের রাজপরিবার প্রভৃতি) অপসৃত হলেন, এই সংস্কৃতি গঙ্গার পূবে ইংরেজদের গড়ে তোলা নয়া শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকল এবং এর নতুন পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্যপুষ্ট নব্য ধনিকগোষ্ঠী দেওয়ান ও বেনিয়া (যেমন কলকাতাস্থ শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব, ভূকৈলাসের কন্দর্প ঘোষাল, জোড়াসাঁকোর দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রমুখদের) আশ্রয়ে এর মধ্যে নবাবী আমলের জের (যেমন মধ্যযুগীয় দরবারী সংস্কৃতির বহিরঙ্গ আড়ম্বর, আঞ্চলিক অধিপতির উৎসাহে বিদ্যাচর্চা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসমূহ) ও নব্যধনিকদের (যার অভিব্যক্তি ঘটল হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি, কবিগান ও যাত্রার দলের মধ্যে) সংমিশ্রিত হল। মূলতঃ নতুন বিত্তশালী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত কবিগানে যেমন বাঈ নাচের বেলাতেও তেমনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে নৈতিক অধঃপতনের দিক—নব্যধনিকদের চারিত্রিক স্থূলতার দিকই—উদ্ভাসিত।

(৪) বাংলাদেশের উপরিউক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় ডামাডোলের মুহূর্তে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইন বলে (১৭৭৩খৃষ্টাব্দ) বাংলার বড়লাট হন (অক্টোবর ১৭৭৪-জানুয়ারী ৮৫ খৃষ্টাব্দ) তখন দেওয়ানীর দায়িত্ব সরাসরি ইংরেজ কোম্পানীর ওপর ন্যস্ত। এই সমস্ত বিচারব্যবস্থার পূর্ণবিন্যাস বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে এ কাণ্ড জরুরী হয়ে দাঁড়ায় এর জন্য হিন্দু ও মুসলমান আইন কানুনকে ইউরোপীয়দের কাছে বোধগম্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভারত শাসনের প্রয়োজনে ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য বিজিত জাতির (অর্থাৎ ভারতবাসীর) ভাষা (বিশেষতঃ ফার্সী ও হিন্দুস্থানী) অনুশীলনের আবশ্যকীয় হেষ্টিংস ভারতে

এসেই বোধ করেন। ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকায় ইংলণ্ডের রীতিনীতি কায়েম করার প্রবণতা রেগুলেটিং আইন বলে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলীতে প্রতিফলিত হলেও তিনি যে গোড়া থেকেই ভারতে ইংলণ্ডের আইনবিধি চালু করার পুরোপুরি বিরোধিতা করে আসেন তা লর্ড ম্যান্সফিল্ডকে লেখা তাঁর চিঠিতেই পরিষ্কার। এই চিঠিতে হেস্টিংস বলেন ভারতীয়দের ব্রিটিশবিধির অধীন করা হলে তা হবে "অকথ্য নিষ্ঠুরতা'র সামিল। তাঁর লক্ষ্য হল বাংলাদেশে ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্বকে প্রাচীন আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যত্রও তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন ভারতীয়দের শাসনের সহজ ও মধ্যপন্থী পথটি হল তাদের এমনভাবে ছেড়ে দেয়া যা—"Time and religion had rendered familiar to their understandings and sacred to their affections."

উল্লিখিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য হেস্টিংস কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেন। প্রথমতঃ, বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান আইনসমূহের সংকলন। তাঁর কাজ হল ইউরোপীয় বিচারকদের সুবিধার্থে মৌলবী ও পণ্ডিতদের দেওয়া ভারতীয় আইনের বিভ্রান্তিকর ব্যাখা দূর করা এবং তর্কাতীত ও নিখুঁত আইন সমষ্টি বিচারকদের হাতে তুলে দেয়া। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পণ্ডিত ও মৌলবীদের সক্রিয় সাহায্য জরুরী হয়ে পড়ে। তিনি মনে করতেন যে মুসলমান ও হিন্দু আইনের কাঠামোর মধ্যেই তিনি বিচার করতে সক্ষম। তাঁরই উদ্যোগে মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের ফতাওয়া-অল্-আলম সীরীর (প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে ভারতে প্রচলিত হানাদী আইনের দুটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বারো শতকে লেখা টীকা হেদায়া এবং মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের উদ্দেশ্যে সংকলিত ফতাওয়া-অল্-আলমগীরী) এবং হেদায়ার ইংরেজী ভাষান্তর যথাক্রমে ইংরেজ কোম্পানীর যুবক কর্মচারী ডেভিড অ্যাণ্ডারসন এবং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যদলের চার্লস হ্যামিল্টন সম্পূর্ণ করেন। "এ কম্পেণ্ডিয়াস ভোক্যাবুলারি ইংলিশ অ্যাণ্ড পার্সিয়ান" (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) এবং বিশেষভাবে 'আইন-ই-আকবরী'র ফ্রান্সিস গ্ল্যাডুইনকৃত ইংরেজী তর্জমাকে স্বাগত জানিয়ে এই আশা ব্যক্ত করেন যে মুঘল সাম্রাজ্যের মূল সংবিধান এর অন্তর্ভুক্ত হবেএবং ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ের ওপর পরিচালক সভাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করবে এই ভাষান্তর। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজে জনৈক মহম্মদ ওয়াসীল জইসীকে দিয়ে আইন সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার কাজ শুরু

করান। মুসলমান সংস্কৃতি বিশেষ করে পারসী ভাষার প্রতি তাঁর নিবিড় টান বিলেতে কার্যকরী না হলেও বড়লাট হিসেবে তাঁর নিয়োগে কিভাবে উদ্দীপিত হল তার সাক্ষ্য দেয় কলকাতা মাদ্রাসা সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা পুরনো দলিলটি। এই নথি অনুসারে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কিছু বিদ্বান মুসলমান ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাচ্য বিদ্যা পোষণের খ্যাতির সপ্রশংস উল্লেখে ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে পেশ করা এক আবেদন পত্রে এই বক্তব্য রাখেন যে তাঁদের (অর্থাৎ উক্ত বিদ্বান মুসলমানদের মধ্যে থেকে মুজিদ্-উদ্-দীন নামে কথিত একজন বিশিষ্ট মৌলবীর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে "মুসলমান আইন এবং মুসলমানদের বিদ্যালয়ে পঠিত অপরাপর বিজ্ঞানে নবীন ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য" একটি বিদ্যালয় চালু করা হোক্, কারণ সরকারের বিভিন্ন কার্যালয় সুযোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে পূরণ করার জন্য প্রার্থীদের শিক্ষণের উদ্দেশ্যে এধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। আবেদনপত্রটি অচিরেই ফলবতী হল এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চল্লিশজন আবাসিক সহ মুজিদ্-উদ্-দীনের বিদ্যালয় ভূমিষ্ঠ হল।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী হিন্দুদের বিচার করার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস এগারো জন স্মার্ত পণ্ডিতকে কলকাতায় আহ্বান জানান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে কিছু স্থিরীকৃত বির্তকিত সূত্রের ওপর চিরকালের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে এঁদের নির্দেশ দেন। তদনুসারে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামে হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের ফার্সী অনুবাদ থেকে হেস্টিংস মনোনীত হ্যারো ও ক্রাইস্ট চার্চের ছাত্র এবং অক্সফোর্ডে পার্সী ভাষায় শিক্ষিত নাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহড (১৭৫১-১৮৩০ খৃষ্টাব্দ) নামে ভারতে আগত ইংরেজ কোম্পানির একজন রাইটার "এ কোড অফ জেণ্টু লজ" নামে এক ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ); এর মূলবন্ধে তিনি ধর্ম, বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে হিন্দুদের অভিমত এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এইভাবে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ইংরেজ বোধিনীর সঙ্গে ভারতীয়দের সংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয় যদিও এই সংযোগ ছিল একেবারে ব্যক্তিগত ও সীমিত চরিত্রের। বাঙলা ভাষাবিদ্, "ইম্পে কোড"-এর বঙ্গানুবাদক (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ) ওপরে বারাণসীতে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) জোনাথান ডানকানও ছিলেন হেস্টিংসের আশীর্বাদধন্য। হেস্টিংসের সক্রিয় সমর্থনে এবং হ্যালহেড

ও চার্লস উইলকিন্স নামে ইংরেজ কোম্পানীর অপর একজন রাইটারের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত "এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ" (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ) নামে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের মুদ্রণে বাংলা অক্ষর ও পারসীর লিপির ছাঁচের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ-ছাড়া সংস্কৃতশাস্ত্রে পারঙ্গম উইলকিন্সকৃত মহাভারতের তর্জমার প্রথমাংশকে আশ্রয় করে হেস্টিংস জায়ার প্রীত্যর্থে রুরু ও প্রমোদ্বরার হিন্দু উপাখ্যানটি ইংরেজী কবিতার আকারে লেখেন। মহাভারতের অপরাংশ ভগবদ্গীতার উইলকিন্সকৃত ভাষান্তরে হৃষ্টচিত্ত হেস্টিংস উইলকিন্সের অগোচরে কপিটি প্রকাশ করার সপক্ষে জোরালো দাবি জানিয়ে বিলেতে ইংরেজ কোম্পানীর পরিচালক সমিতির চেয়ারম্যান নাথানিয়েল স্মিথের কাছে উক্ত কপিটি একটি চিঠিসহ প্রেরণ করেন; উক্ত চিঠিতে তিনি এই বক্তব্য রাখেন যে ইংরেজদের শৃংখল মুক্ত হলেও ভারত যুগ যুগ ধরেই এই সব অমর সাহিত্য সম্ভারকে অটুট ও অক্ষুন্ন রাখবে। বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ ও কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের অবর বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য অনুশীলনের কেন্দ্র কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে) যে হেস্টিংসের সুস্পষ্ট প্রেরণাপুষ্ট ছিল তারই ইঙ্গিতবাহী সোসাইটির কর্ণধার স্যার উইলিয়াম জোন্সের উদ্দেশে লেখা তাঁর ও অন্যান্যদের স্মরণীয় চিঠিটি এবং স্যামুয়েল টার্ণারকে এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যপদ প্রার্থী হতে আনুকূল্য করতে তাঁর সাহায্যদান।

(৫)

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাচ্য পরিক্রমার ধারা ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর প্রশাসনিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ থেকেই উৎসারিত। কিন্তু তাঁর কৈশোরে লব্ধ ক্ল্যাসিক্সের মানসিকতা ও হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাসিন্দাদের খাপ খাওয়ানোর বাস্তবোচিত নীতি তাঁর প্রাচ্য-বিদ্যা চর্চায় যে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ক্ল্যাসিক্স তথা প্রাচ্য-সাহিত্যমুখিনতা তাঁকে করে তুলেছিল পরিচ্ছন্ন রুচিসম্পন্ন, বিজিত জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অষ্টাদশ শতকীয় জ্ঞানদীপ্ত দর্শনে স্নাত জোন্স ও হ্যালহেডের প্রিয়তম সুহৃদ্ এবং পণ্ডিত ও বিদ্বান ভারতীয় (যেমন কাশীর ম্যাজিস্ট্রেট, পাটনার অধিবাসী, ও অসামান্য প্রতিভাধর আলী ইব্রাহিম খাঁ) দের

পৃষ্ঠপোষক। রাজা নবকৃষ্ণের মাধ্যমে 'বিবদার্ণব সেতুর' সংকলক পণ্ডিতদের প্রধান বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর আলাপ শুধুমাত্র উক্ত পণ্ডিত ও তাঁর সহযোগীদের প্রত্যেককে সরকার থেকে দৈনিক এক টাকা করে আজীবন "চতুষ্পাঠী বৃত্তি" প্রদানেই থেমে থাকে নি; ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে হেস্টিংস বারোশত অর্থমূল্যের জমি বিশিষ্ট পণ্ডিত রাধাকান্ত শর্মার জন্য মঞ্জুর করেন। আরো, রাজা নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত রাধাকান্ত তর্কবাগীশ হেস্টিংসের নির্দেশমত "পুরাণার্থ প্রকাশ" নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন— "রাজ রাজেশ্বর—শ্রীল হেষ্টীনস্য নিদেশতঃ।" তাঁর ভারত ত্যাগের বিশবছর পরেও তাঁর পুরণো ভারতীয় বন্ধুদের তাঁর সম্পর্ক "ব্যগ্র অনুসন্ধান" অব্যাহত এমনকি তাঁর বিচারকালে বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসী পণ্ডিত কৃপারাম দরখাস্ত দাখিলের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকায়। তিনি নিজে যে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্যবিদ্যার যথেষ্ট সমাদর করতেন তার প্রমাণ মেলে নিজ ব্যয়ে: (ক) ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইনের আইন-ই-আকবরীর ভাষান্তরের বারো সেট গ্রন্থ খরিদে, (খ) কলকাতা মাদ্রাসার জন্য জমি ক্রয়ে এবং (গ) কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক মুজিদ-উদ্-দীন ও তাঁর ছাত্রদের জন্য বৃত্তিদানে। তাঁর জানা হিন্দু সাহিত্য সম্পর্কে প্রশংসাসূচক উক্তি চার্লস উইলকিন্স অনূদিত ভগবদ্গীতাকে "একটি মহান মৌলিকতাপূর্ণ এবং ধারণা, যুক্তি ও শব্দ চৈলীর দিক থেকে প্রায় অনন্য কাজ" (" .....A performance of great originality; of a sublimity of conception, reasoning, and diction, almost unequalled...") আখ্যা দেওয়ায় পরিষ্কার। ইউরোপের সুদীর্ঘ প্রাচ্য পরিচিতি এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের দীর্ঘকাল বিভিন্ন পদে থেকে ভারতে বসবাসের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রাচ্য-বিদ্যার লালনে নিঃসন্দেহে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিল। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনাবলীর সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না যে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাচ্য-পরিক্রমা ইংরেজ কোম্পানীর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেও ছাপিয়ে গেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় আইন, ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানকে টিঁকিয়ে রেখেও ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক জিনিষ আহরণ করে বদান্যতার সঙ্গে ভারত শাসনের জন্য তৈরী হবে। তাঁর এই প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমন্বয়ের অভিলাষ অংশতঃ তাঁর উগ্র খৃষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস ও অংশতঃ ক্ল্যাসিক্সের শিক্ষা তথা রোমক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রাণিত।

উক্ত আলোচনা থেকে প্রাচ্য বিদ্যানুরাগী ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কে স্বচ্ছ

ধারণা তৈরী হলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়—তাঁর এই প্রাচ্য বিদ্যায় উৎসাহ দানকে বিলেতে ইংরেজ কোম্পানীর পরিচালকেরা কী ভাবে নেন ?

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাচ্যবিদ্যায় উৎসাহদানকে বিলেতে ইংরেজ কোম্পানীর পরিচালকেরা ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই স্বাগত জানান। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে সমস্ত ভারতীয় রীতিনীতিকে না হলেও জাতপাতকে ইংরেজরা অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিল পাছে জাতবিচারের বিলুপ্তিতে উদ্ভূত বিপ্লব ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে আলগা করে—এই ভয়ে। এই আশংকা থেকেই মনে হয়, ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানীর না হস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণ যা ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে, মনে হয়, অত্যন্ত অচেতন-ভাবে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত। এই নীতি অনুসরণের অপর উদ্দেশ্যটি ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে গৌরবান্বিত করা। নিজেদের কর্মচারীগণ কর্তৃক ভারতীয় সংস্কৃতির পঠন পাঠনে উৎসাহ যোগানোর জন্য বিলেতের পরিচালকেরা উদার সরকারী সাহায্য ও অন্যান্য সমস্ত সম্ভাব্য সুযোগ দেন। ফোর্ট উইলিয়াম বোর্ডও অবশ্য পরিচালকমণ্ডলীর উক্ত নীতিতে সমভাবে উৎসাহী ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন আইন-ই-আকবরীর গ্ল্যাডুইন কৃত প্রকাশনায় মদত দেবার জন্য বোর্ড-এর কাছে প্রস্তাব দেন তখন বোর্ড সম্মতি দিয়ে এই অভিমত দেন যে এই কাজের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতাই বোর্ডকে নিজ ক্ষমতার মধ্যে এই কাজকে উৎসাহ যোগাতে উদ্যোগী করেছে। চার্লস উইলকিন্সের ভগবদ্‌গীতার প্রকাশনার জন্য জোরালো দাবি তুলে হেস্টিংস যখন বিলেতে পরিচালক সভার কাছে সুপারিশ করেন (অক্টোবর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ) তখন উক্ত সভা অবশ্য কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি। তবে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের পর পরিচালকবর্গ এই শর্তে রাজী হন যে ২০০ পাউণ্ডের বেশী ব্যয় হবেনা এমন হলে উইলকিন্সের উক্ত রচনা প্রকাশিত হতে পারে।

কিরাত জনের কথা

সুনির্মল দত্ত চৌধুরী

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত ভারতের আর্যেতর একটি জনগোষ্ঠীর নাম কিরাত। কিরাত নামটির প্রথম উল্লেখ যজুর্বেদে, তারপর অথর্ববেদে মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণে। যজুর্বেদে কিরাতরা গুহাবাসী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথর্ববেদে আছে ভেষজের সন্ধানে পর্বতের সানুদেশে খননরতা এক কুমারী 'কৈরাতিকা' বা কিরাত মেয়ের কথা। মহাভারতের বিবরণে কিরাতরা হিমালয় অঞ্চল বিশেষত পূর্ব হিমালয়ের অধিবাসী; বনপর্বে তাঁরা 'স্বর্ণ-সদৃশ' অর্থাৎ হরিদ্রাভ বা পীতবর্ণ বলে চিত্রিত হয়েছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে কিরাতরা 'সোনার মত উজ্জ্বল, প্রিয়দর্শন মাথায় বাঁশের চূড়াবাঁধা চুল—জলের নীচে সঞ্চরণক্ষম, ভয়ঙ্কর, প্রকৃত নরব্যাঘ্র বলে তাঁরা খ্যাত'। রামায়ণের অন্যত্র আরেকদল কিরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তাঁরা সাগরপারের বাসিন্দা, নৃশংস, কাঁচা মাছ খেতে অভ্যস্ত'। পুরাণে তাঁরা 'অরণ্যচারী, বর্বর, পর্বতারোহী' ইত্যাদি বিবিধ আখ্যায় ভূষিত। কালিকাপুরাণের (আ অষ্টম শতক) বর্ণনানুযায়ী 'আসামের আদিবাসীরা ছিল কিরাত; তাঁরা পীতবর্ণ, শক্তিমান, নিষ্ঠুর, অজ্ঞ এবং মাংস ও সুরাপানে আসক্ত'। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে 'ভারতের পূর্বে কিরাত এবং পশ্চিমে যবন'।

প্রায় এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ উল্লিখিত কিরাতরা যে ভারতের এক সুপ্রাচীন অধিবাসী সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিরাতদের সম্পর্কে মহাকাব্য দুটির বিশদ বর্ণনা আর্যভাষীদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সাক্ষ্য দেয়। স্মর্তব্য যে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল মোটামুটি ৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল অনেক পরে। বর্তমান আকারে সম্প্রসারিত বিশাল মহাভারতের রচনাকাল সুদীর্ঘ—৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ। রামায়ণ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল সম্ভবত খ্রীষ্টজন্মের সমকালে। কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় রামায়ণ মূল মহাভারতের পরবর্তী বলেই অনুমিত। বর্তমান রূপে পুরাণগুলি গুপ্তযুগের (৩২০—৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) আগে গ্রথিত হয়নি। পুরাণে প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য যেমন আছে, তেমনি অপ্রাচীন অনেক কাহিনী-কিংবদন্তীও প্রক্ষিপ্ত রয়েছে। আজকের ভারতে কিরাতশ্রী নর সন্ধানের সূত্রটি এই প্রাচীন সাহিত্যের পটভূমিতেই নিহিত।

ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আদি মঙ্গোলীয় উপজাতীয় মানবগোষ্ঠীর আগমন হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার আগে কোন এক সময়ে এবং সম্ভবত তা ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আর্য উপজাতিদের আবির্ভাবের মতই প্রাচীন, হয়তো প্রায় সমকালীন। কালক্রমে মঙ্গোলীয় উপজাতিরা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে, আসামে' হিমালয়ের দক্ষিণ তলদেশে, পূর্ব নেপাল, সংলগ্ন উত্তর বিহারে এবং উত্তর ও পূর্ব বাংলার প্রত্যন্তে।

মহাভারতে (সভাপর্ব ও স্ত্রীপর্ব) প্রাগজ্যোতিষের (প্রাচীন কামরূপ-পশ্চিম আসাম) নৃপতি ভগদত্তকে বলা হয়েছে 'শৈলালয় রাজা' অর্থাৎ যে রাজার আবাস ছিল পর্বতে। তিনি কিরাত, চীনা এবং সমুদ্রোপকূলের অন্য অনেক যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। সম্ভবত তাঁর রাজ্য উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত প্রসারিত চিল। কিরাত সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে এই কিরাতরা দেখা দিয়েছিল সোনার রঙে, তাঁদের বাহিনী হলদে ফুলের ('কর্ণিকার') অরণ্যের মত প্রতিভাত হচ্ছিল।

মহাভারতের বনপর্বে কিরাতবেশী শিব ও উমা এবং অর্জুনের একটি উপাখ্যান আছে। তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্য বরপ্রার্থী অর্জুন হিমালয়ে যান। তাঁর নিষ্ঠা ও সাধনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য শিব কিরাতের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে এই উপকথাটি বর্ণিত হয়েছে হিমালয় পর্বতের পটভূমিতে। হরিবংশে দুর্গা বা উমার একটি উপনাম কিরাতি।

মহাভারতের (সভাপর্বে) একটি পদ্যাংশের ইংরেজী অনুবাদ এরকম :

> "Those kings who are on the other half of the Himalayas and in the mountains of the east (Sun-rise mountain) in Karusa by the end (edge) of the sea and beside ihe Lauhitya (Luhit or Upper Brabmapntra river), those who are moreover Kirates living on fruits and roots, clad in skins, fierce with their weapons, cruel in their deeds them I saw, O Lord : and loads of sandal and agallochum wood, and of black (?) pepper and masses of skins and gems and gold and of aromatic shrubs."
>
> —Sunite Kumar Chatterji, Kirata-Jana-Krti, p 31

উপরিউক্ত লৌহিত্য নদীটি অরুণাচল প্রদেশের লোহিত জেলার মিশমি অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে লোহিত নামেই প্রবাহিত। মহাভারতের সভাপর্বে আমরা আরও দেখি যে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীরা সোনা, রুপা, বিচিত্র মণি-মুক্তা ইত্যাদি ব্যবহার করত এবং তাঁরা ছিল বস্ত্রবয়ন শিল্পে নিপুণ।

কিরাতদের কথা প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও বলা হয়েছে। The Periplus of the Erythrean Sea (খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতক) এবং টলেমীর ভূগোলে (The Geography of Ptolemy—আ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) কথিত Kirrhadae বা Kirrhadai কিরাত শব্দের গ্রীক নাম। পেরিপ্লাসের বর্ণনানুযায়ী কিরাতরা ছিল 'খর্বনাসা ও অতন্দ্র দুর্বিনীত', যাঁরা বাস করত দশার্ণ (পেরিপ্লাসের Dosarene কি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দর্শনা?) ছাড়িয়ে। সম্ভবত এই কিরাতদের বাসভূমি ছিল দশার্ণের উত্তর-পূর্বদিকে বাংলাদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলে। পেরিপ্লাসে আছে যে কিরাতদের নিকটে Bargysoi নামে ছিল আরেকটি উপজাতি। এই Bargysai-রা ইতিহাসে ভার্গস বলে সনাক্ত, বিষ্ণুপুরাণে যাঁদের কিরাতদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। টলেমীর ভূগোলে পূর্ব ভারতে সেরিকা (Serica) নামে একটি দেশের কথা আছে। 'দেশটি পূর্বদিকে পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা, যেখানে সেতু নির্মাণের বাস্থ বেত ব্যবহার হয়'। অনুমিত হয় যে এই সেরিকা ছিল আসামে। আসামের পার্শ্ববর্তী অরুণাচল প্রদেশে আজও বিস্ময়কর বেতের পুল দেখা যায়। পেরিপ্লাস ও টলেমীর ভূগোলে বিবৃত পূর্বভারতের কিরাত অধ্যুসিত অঞ্চলটি সম্ভবত বিস্তৃত ছিল আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদের পর্যন্ত।

কিরাতদের সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁরা ছিল মূলত পার্বত্য উপজাতি, হিমালয়—প্রধানত পূর্ব হিমালয়ের অধিবাসী এবং তাঁদের বাসভূমি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে সাগর সন্নিকটে পদ্মা-মেঘনার অববাহিকা অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ছড়ানো ছিল। তাঁদের পীতবর্ণ, দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবিকা, খাদ্যাভ্যাস, কেশবিন্যাস এবং বেশভূষা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে কিরাতরা ছিল এক বিশিষ্ট নব্যগোষ্ঠী; তাঁরা ভারতের অন্যান্য আর্যেতর দস্যু, অসুর, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, কোল, ভীল প্রভৃতি কৃষ্ণকায় বা শ্যামবর্ণ, দ্রাবিড় কিম্বা অস্ট্রিকভাষী প্রাচীন অধিবাসীদের অনুরূপ নয়। ভারত ইতিহাসবিদ পণ্ডিতেরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে কিরাতরা ছিল আদি মঙ্গোলীয়। তাঁরা বলেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে

কিরাত আখ্যাটি পার্বত্য মঙ্গোলীয় উপজাতিদের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যাঁদের বসবাস ছিল বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং হিমালয়ে। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং পূর্ব নেপাল—ভারত মহাদেশের এ দু'টি কিরাত ভূমি ছিল আদি মঙ্গোলীয় জনপ্রবাহের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

হিউয়েন সাঙ ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপে এসেছিলেন। ভাস্করবর্মা তখন কামরূপের রাজা। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, 'কামরূপের পরিধি মোটামুটি ১০,০০০ লি বা প্রায় ১,৭০০ মাইল, পূর্ব সীমানা পাহাড়ে বেষ্টিত, এই সীমান্ত দক্ষিণ-পশ্চিম চীন সংলগ্ন। এই দেশের উপজাতিদের রীতিনীতি সীমান্তের মন্দের অনুরূপ। আচার ব্যবহারে কামরূপের অধিবাসীরা সরল এবং সৎ'। হিউয়েন সাঙ আরও বলেছেন, 'এই অধিবাসীরা দেখতে খর্বকায় এবং তাঁদের গাত্রবর্ণ গাঢ় পীত। তাঁদের স্বভাব অত্যন্ত উগ্র এবং অদম্য'।

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে অনুমিত হয় যে সমগ্র বর্তমান আসাম, অংশত অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমে করতোয়া নদী পর্যন্ত উত্তর বাংলা এবং সম্ভবত পূর্ব বাংলার কোন কোন অংশ ভাস্করবর্মার সময় কামরূপের অন্তর্গত ছিল। কামরূপের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের যে ইঙ্গিত আমরা এই বিবরণে পাই তা তাঁদের মঙ্গোলীয় পরিচিতির সাক্ষ্য দেয়।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল কিরাতদের অন্যতম বাসভূমি বলে চিহ্নিত ছিল। আসামে এই কিরাতরা ছিল সম্ভবত বড়ো জনগোষ্ঠী। বড়ো একটি উপজাতি সমষ্টির কৌমনাম। আজকের আসামের কোচ, কাছারী, রাভা চুটিয়া, লালুং মেচ এবং ত্রিপুরার টিপরা উপজাতিরা এই বড়ো কৌম্যের (tribal community) অন্তর্ভুক্ত। মেঘালয়ের গারো এবং হাজংরাও বড়োদের সম্পর্কিত বলে গণ্য। আসামে—সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও কাছাড়ে তাঁদের আধিপত্য ছিল সুদীর্ঘকাল। শুধু আসামেই নয়, উত্তর ও পূর্ব বাংলা এবং ত্রিপুরায় এমনকি সম্ভবত উত্তর বিহারে তাঁদের বসতি বিস্তৃত হয়েছিল। আসামের স্থাননামতত্ত্ব (toponymy) এ-অঞ্চলে দীর্ঘ বড়ো আধিপত্যের প্রমাণ দেয়। বড়ো ভাষায় 'ডি'—এই আদ্যশব্দের (prefix) অর্থ জল। ডিহিং, ডিফু, ডিগারু, ডিগবয়, ডিমাপুর, (ডিব্রুগড়), ডিবং, ডিহং, ডিখু, ডিমলা, ডিফাং ইত্যাদি স্থান ও নদীর নামগুলি আজও বড়োদের দূরবিস্তৃত পূর্ব বসতিগুলির পরিচয় দেয় এবং দেখায় যে আসামে বড়ো ভাষার প্রভাব কত প্রাচীন ও গভীর। বড়োদের আগে উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি আদি অস্ট্রেীয় জনপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। ডিহং নদীর আস্ট্রিক পূর্বনাম 'হং'। বড়োরা 'ডি' জুড়ে দিয়ে এই নদীর নতুন নামকরণ করে ডিহং। মেঘালয়ের খাসিরা ভাষায় আস্ট্রিক (মন্‌-খমের), যদিও তাঁরা প্রধানত মঙ্গোলীয়। সম্ভবত বড়োদের আগমনের পূর্বেই আসামে ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কপিলি উপত্যকায় এবং কামাখ্যা অঞ্চলে খাসিদের বসতি ছিল। খাসিরা ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় সব উপজাতি 'তিব্বত-ব্রহ্ম' ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

ঊনবিংশতি

প্রজ্ঞার কাছে আবেগ প্রথমে বন্দি
শিল্পশাসনে প্রজ্ঞার অঞ্জলি
শিল্পকে ফেলে সত্যে বাড়ানো হাত
অলীক আরশি পেলে সবই উৎখাত

তাবৎ প্রাচীন উত্তর-অধিকার
মাতৃজঠর খুঁড়ে পোড়া অঙ্গার
ঊনবিংশতি, চাপাব না তোর কাঁধে
জানি তোর চোখ দূরবর্তিনী চাঁদে

অবভৃথ স্নানে এবার প্রসন্নতা
তোকে দিয়ে যাব এক মাঠ স্বাধীনতা
প্রথম দৌড়ে পা ফেটে রক্তে যদি
ভেজে মৃত্তিকা, শুষে নিয়ে হব নদী।

হাসছিল বলছিল

বাস্তর নাম শীতলকুচি
নদী বলতে রস্তি
লাল অরণ্য পছন্দসই
বন্ধু কিছু দস্তী
ভূপর্যটক স্বপ্ননায়ক ছিল

মল্লার আর মেঘের নামে
গঙ্গামাটি চুণ
কৃষকটি বিশুদ্ধ চালাক
অরণ্যময় ঘুন

পুত্রকন্যা হাসছিল বলছিল

বিজ্ঞাপন

গর্ভপাত তাহলে সম্ভব পাঁচবার—
বিজ্ঞাপন এমত লিখেছে।
ছ'সপ্তাহে নষ্টগর্ভ বউ
তবে কাঁদলি কেন
কেন স্তনমুখে
লেগেছিল পল্লবের কালো ?
উদরে ঘুরিয়ে রাঙা হাত
আগ্রাসী অপত্যস্নেহে গ্রহণের ছায়া
ও রাক্ষুসি. ধর্মে সইবে না
ভ্রূণকন্যা ফিরবে বারবার
বারবার উন্মুখ তোকে
যেতে হবে দুর্গন্ধ ক্লিনিকে।

চতুরিন্দ্রিয় কলা

কেঁপে যায় চোখ
শুষ্ক অশোক
অন্ধ যেমত কাঁপে
শুধু খরশান
অক্ষত ঘ্রাণ
স্পর্শের সন্তাপে।
হাওয়া পত্‌ঝরী
চেনে বিষহরি
অরণ্য সংবাদ

অক্ষ নেবাল
রক্তের আলো
শুষে নিল তার স্বাদ।
আছে অবিনয়ী
প্রমাদ প্রণয়ী
চতুরিন্দ্রিয় কলা
রাত্রি অন্ধ
ঋজু কবন্ধ
তথাপি রজস্বলা।

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

গৃহপালিত

স্বপ্নের পায়ে আমরা
রুপোর শিকল পরিয়ে রাখি।
স্বপ্ন একটি দুগ্ধবতী গাভী।

স্বপ্নই শেষ সীমা

পৃথিবীকে ভাঁজ করে সন্ততির জন্য একটি
স্বপ্নের চ্যাপ্টা নৌকো বানিয়ে দিতে গিয়ে দেখি,
তিমির হাড়ের মত আকাশকে চিরে
সব পিতৃপুরুষেরা নামছেন!
পৃথিবী দুভাঁজ করে তৈরি করছেন
উত্তরপুরুষের স্বপ্নের শাম্পান!

মানুষ

তারা ফুটকি সাপের মত ওরা সুন্দর;
প্রসারিত শাদা হাত বাড়ালেই
এক মুহূর্তে নীল হ'য়ে যায়!

অ্যাকোরিয়াম

শক্তিশালী দেশগুলি লাল, নীল, হলদে মাছ পোষে
রঙিন কাচের ঠুনকো চৌবাচ্চায় ভ'রে।

স্বপ্ন নিয়ে

পৃথিবীর দশভাগ মানুষকে বাদ দিলে
আমরা প্রত্যেকে খাই স্বপ্নের সোনার আপেল।
কেননা সোনার কোনো দায় নেই
মৌলিক স্বাদগন্ধ দেবার।

দেবতা

সিঁড়ির ছুলক্ষ ঊনপঞ্চাশ ধাপে বসে
তিনি সমুদ্রের তলাকার
জটিল ভূমিজ সব খেলনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

পৃথিবীর পুঁজিবাদী ম্যাজিক লিফ্‌টগুলি
শুধু তাঁকে ছুঁতে পারে।

ল্যাবিরিন্থ

লাল জঙ্গলটা পেরোতে না পেরোতে
আর একটা লাল জঙ্গল এসে গেলো।
সেটা ছাড়াতে ছাড়াতে পড়লাম আর একটায়।
আরো একটা লাল জঙ্গল ঘুরে যখন ভাবছি
পথ শেষের গানটি গাইবো,
ঠিক তখনই ঢুকতে হলো
পেরিয়ে-আসা জঙ্গলগুলির চেয়েও
আরো গভীর আর লাল আর একটি জঙ্গলে!

মোহিনী অট্ট

অনিমা মিত্র

অই হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলে এ মন্দিরের চুড়ো
যুবতী দেবীর কিশোরী বুকের মেঘ ভারি-ভারী হয়ে যায়।
দূর প্রবাস থেকে দিলে ডাক দেবী দেহে মানবী-মানবী গন্ধ
শরীরের পালে লাগে হাওয়া—
মন্দির চুড়োর লাল কেঁপে গেলে মায়াবী পালক
খসে খসে পড়ে।

তখন কণক রঙা দুটি ডানা কুসুমের রেণু হয়ে
উড়ে উড়ে বেড়ায় আনগ্ন প্রকৃতিতে :
হোক সে প্রপঞ্চ-মায়া তবুও সে মায়া নামে নারী
মোহিনী মহিমা দিয়ে মোহনীল শাড়ির আঁচলে বোনে
শান্ত ঘরবাড়ি।

স্যানাটোরিয়াম

মহুয়া চৌধুরী

যেন আমি ভোরবেলা ট্রেনে করে শিলিগুড়ি যাচ্ছি
আর ক্রমশ ঘাসগুলির ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে
সমস্ত মাঠ সান্দ্র হলুদ হয়েছে
তার উপর ঝুঁকে পড়ল পৃথিবীর আচ্ছন্ন উপরদিক্
ঘন বৃষ্টির মধ্যে তোমার মনে পড়ল, অবরোধ পেরিয়ে
শাকের ক্ষেত সদৃশ ঘন কালো পুতুলের শহর দেখা যায়
আর সমস্ত কলকাতা ডুবিয়ে দিয়ে জল হওয়া এসব রাত্তিরে
স্বপ্ন কাঁপিয়ে দেয় বিকলাঙ্গ হাওয়া ভরা বাচ্চা
ছুটল ফসলক্ষেত পেরিয়ে, বাঁ পাশে
সাদা পাথরের স্তূপ, পণ্য ওগ্‌রানোর কল ;
শুনে যারা মূর্চ্ছা গিয়েছিল তাদের আঠা লাগা চুল
পেরিয়ে খাটের ধার মাটি ছুঁল, আর
হাওয়া থেকে উড়ে নেমে জ্যোৎস্না কিরণের মতো
লাল পাড় শাড়ি
ঢেকে দিল খাটের উপরে তার মরে যাওয়া দেহ

যে মুখ আমার পাশে

রেণুকা পাত্র

শাদা পর্দায় ভেসে ওঠে
শব্দ আর শব্দ…
বন্ধু শত্রু অথবা পরমাত্মীয়। এদের কারো ছবি
আমার পাশে নেই। ম্লান দলিল-দস্তাবেজে
আঁটা এক গুহামানবের মুখ।
তার এক চোখ স্বর্গের খাঁজে আঁটা
অন্য চোখের প্রখরতা নেমে গেছে নরকের নীচে,
বুকের ভেতর থেকে নিমেষে সে উপড়ে আনে
এক এক শতাব্দীর ইতিহাস।

ডোরিক বিন্যাসের এক দীর্ঘ করিডোর
যেখানে শত্রুরা কাজের হিশেব রাখে
বন্ধুরা ঢালে চারাগাছে জল
তার মাঝ-বরাবর বিস্তীর্ণ নদীর মতো
সেই মুখ। পথ হয়ে যে চলে গেছে
চিত্রিত বর্ণমালার সমুদ্রের দিকে, ভয়াবহ শূন্যতার
বজ্রমুঠি খুলে সে এখন আমার পাশে।

আমার প্রতিবাদের ভাষা

লুই আরাগঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ফরাসীদেশের নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রের এত প্রাধান্য কেন? আরাগঁর জবাব ছিল সংক্ষিপ্ত, 'আমি তাদের শ্রমিক-কৃষকের চেয়ে ভালোভাবে জানি।' 'কমিটেড' বা অঙ্গীকারবদ্ধ লেখকের অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে জনগণের কাছে। জনগণের কথা বলবার দায়িত্বই মূলত তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু যে জনগণ তাঁর পরিচিত তার বাইরে তিনি যদি পা বাড়ান তাহলে অঙ্গীকারের আন্তরিকতা হয়তো ক্ষুন্ন হয় না, কিন্তু উপলব্ধির গভীরতা নষ্ট হয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন তাঁরা সবাই যে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন তা নয় কিন্তু অন্তত কয়েকটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় নি। জীবনধারণের জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার সংঘাত এবং প্রাণসত্তার সামগ্রিক বিকাশের জন্য একত্রে কাজ করে যাওয়া জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক—এই দুটিই হচ্ছে মানব ইতিহাসের অন্তর্নিহিত চালিকা শক্তি। এই দুটিকে বাদ দিয়ে সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতিফলন অসম্ভব। অবশ্যই প্রত্যেক লেখকের দেখার চোখ আলাদা, লেখার কায়দাও আলাদা। তাই সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কেবল এই শ্রেণীসংঘাত বা মানবিক সম্পর্কের অথবা মানুষের সুখদুঃখের গতানুগতিক চিত্রাঙ্কণেই কি সমাজ সচেতন লেখকের দায়িত্ব শেষ? তাঁরা কি সামাজিক বৈষম্য বা অন্যায় অবিচার সম্পর্কে কেবল প্রশ্ন তুলবেন, প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেরও চেষ্টা করবেন না? এ সম্পর্কে দুটি মতবাদ রয়েছে। ডিকেন্স, তলস্তয় বা কনরাডের মতো প্রথমদিকের মহান বস্তুনিষ্ঠ রচয়িতারা বৈষম্য বা অবিচার সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা উত্তর খোঁজার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ কখনোই দেখান নি। লুকাচ তাই এঁদের বিশ্লেষণধর্মী বাস্তববাদী বলতে চেয়েছিলেন, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী' বলেন নি, কারণ অবদমিত নীচের তলার মানুষেরা নিজেদের দাবী-

দাওয়া খাদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছেন এমন চিত্র তাঁদের লেখায় কখনো দেখা যায় নি। ১৯১০ এবং তারপর থেকে গোর্কী এবং আপটন সিনক্লেয়ার সহ এমন অনেক লেখক এলেন যাঁরা নতুন ঐতিহ্যের সূত্রপাত করলেন। এঁরা সমাজের নীচুতলার মানুষের দিকে শুধু যে বিশেষ করে নজর দিলেন তাই নয় এঁদের মধ্যে সেই মানবিকগুণেরও সন্ধানে তাঁরা সচেষ্ট হলেন যা নতুন সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। লুকাচের মতে এরাই যথার্থ 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী'। কারণ, সমাজের অভ্যন্তরে যারা সমাজতন্ত্র গঠনের সংগ্রামে লিপ্ত এঁদের লেখায় তাঁদেরই চরিত্র অঙ্কিত।

মিহির সেন এবং ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'প্রতিবাদের গল্প' সংকলনটির আলোচনা প্রসঙ্গেই এই পটভূমিকার অবতারণা। ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় জানিয়েছেন যে কেবল বরণীয় লেখকদের স্মরণীয় ছোটগল্প চয়নে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত লেখক কেবল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'বহুবিচিত্র নরনারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা বেদনা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব তথা জীবনযন্ত্রণাকে' ছোটগল্পে সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন সেই কারণেই তাঁদের অনেকের লেখা এই সংকলনে নেই। সম্পাদকেরা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের সন্ধান করেছিলেন এবং যেখানে যেখানে 'ছোটগল্পে সামাজিক অন্যায় অবিচার ধর্মীয় কুসংস্কার, রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচার এবং শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর সচেতনভাবে ধ্বনিত' হয়েছে তাঁরা সেগুলি সম্পর্কেই আগ্রহী ছিলেন। 'সচেতনভাবে' কথাটি বিতর্কমূলক। কারণ, প্রকৃত শিল্পীদের রচনায় তাঁদের অজ্ঞাতসারে সমসাময়িক কালের সামাজিক বিপ্লবের অন্তত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিফলন ঘটেই। তলস্তয়ের রচনায় নানাধরনের স্ব-বিরোধিতা লেনিনেরও চোখে পড়েছিল। কিন্তু সেগুলিকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সামাজিক মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে তাঁর ঋজু, বলিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রতিবাদকে। এই প্রতিবাদ কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সচেতনভাবে হয় নি। অথচ মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য সমালোচকদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব হল একে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া। সমাজ, রাষ্ট্র বা শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে যেখানে লেখকের কণ্ঠস্বর সোচ্চার সেখানে তা নিশ্চয় প্রতিবাদের রচনা কিন্তু ব্যক্তিহৃদয়ের আনন্দ বেদনা, দ্বিধা সংশয় ও জীবনযন্ত্রণাও তো কেবল ব্যক্তিগত নয়। এ ব্যাপারে কার্ল মার্কসের সেই অতি বিখ্যাত উক্তির পুনরাবৃত্তি না করে কোন উপায় নেই—
Our opinion of an individual is not based on what he thinks

of himself so can we not judge of such a period of transformation by its own consciousness, on the contrary this consciousness must be explained rather from the contradictions of material life from the existing conflict between the social productive forces and the relations of production. (Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy).

সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদনের সম্পর্কগুলির মধ্যেকার সংঘাত এবং বাস্তবজীবনের বৈপরীত্যই যেখানে ব্যক্তিজীবনে দ্বিধা সংশয়, দুঃখ বেদনা বা সংঘাতের সৃষ্টি করে সেখানে ব্যক্তির কণ্ঠের আক্ষেপ বা আর্তি প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিবাদ। তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণই হোন বা শৈলজানন্দ কিংবা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তই হোন এদের অনেক গল্পেই এই ধরনের প্রতিবাদ রয়েছে। দু-একটা ছোটখাটো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তারাশংকরের 'মুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী অহমিকার এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ রয়েছে, বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা গল্পের নায়িকার অকালমৃত্যু কিন্তু ঘটেছিল বিবাহের সময় তার পিতার পণদানের অক্ষমতার প্রতিক্রিয়ায়। শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি বা অচিন্ত্যকুমারের সারেঙ্ জাতীয় গল্পে পরোক্ষ প্রতিবাদ সুস্পষ্ট। কেউ যদি প্রয়াত সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পটিকে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের গল্প বলে উল্লেখ করেন তাহলেও বোধহয় প্রতিবাদ জানানো সম্ভব নয়। এতকথা বলবার দরকার হল এই কারণে যে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে এমন কয়েকটি গল্প রয়েছে যাদের প্রতিবাদের গল্প বলে ভাবাই কষ্টকর। জীবিত লেখকদের নামের উল্লেখ অস্বস্তিকর। কিন্তু একটি বিনীত প্রশ্ন প্রথিতযশা লেখক রমেশচন্দ্র সেনের 'যৈবন' গল্পে কোন ধরনের প্রতিবাদ রয়েছে? আর এই ধরনের প্রতিবাদী বিষয়ের গল্পের অন্তর্ভুক্তি কি এই সংকলনে কাম্য? এঁর অন্য কোন গল্প বাছাই করা সম্ভব ছিল না? আর বাকী দুয়েকজন লেখকের গল্পের পরিবর্তে উপরোক্ত কয়েকজন লেখকের বিষয়ানুগ গল্প স্থান পেলে সংকলনটির মর্যাদা বোধহয় আরও বৃদ্ধি পেত।

কিন্তু এটা কোন বিরূপ সমালোচনা নয়। সংকলনটির পরিকল্পনা যেমন অভিনব, তেমনি প্রশংসনীয়। সম্পাদকদ্বয় ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিশেষ করে ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত তিন

খণ্ডের মার্কসবাদী সাহিত্য বিচার যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই এঁদের কাছে প্রত্যাশা ছিল বেশি। তবু যা পাওয়া গেছে তা নিয়েই খুশী থাকা যেতে পারে। কেননা, এর আগে এক জায়গায় এই একই বিষয়ের এতগুলি গল্পের সাক্ষাৎ লাভের কোন সুযোগই ছিল না। সংকলিত গল্পের সংখ্যা মোট ৩৬টি। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে, সমসাময়িক দেশকালের সার্থক প্রতিফলনও এখানে ঘটেছে। প্রতিবাদেরও রকমফের আছে। জমিদার, দারোগা-পুলিশ, কালোবাজারি বা মহাজনদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের গল্পই মনে হয় এখানে বেশি। এদের মধ্যে স্মরণীয় 'মেজাজ' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'আইনের তালিম' (সোমনাথ লাহিড়ী), 'সলিমের মা' (ননী ভৌমিক) এবং 'প্রতিরোধ' (সমরেশ বসু)। উচ্চবর্ণের অহমিকাবোধের বিরুদ্ধে তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদের গল্প 'আম্মা' (সুশীল জানা)। দ্বিধা সংশয় সমাকীর্ণ মধ্যবিত্তের প্রতিবাদের গল্পও সংকলনে কিছু কম নয়। এদের মধ্যে কাঁটা (সত্যপ্রিয় ঘোষ), জবচার্নকের কলকাতা (বরেন গঙ্গোপাধ্যায়), বিধিলিপি বনাম পুরুষকার (শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং সতীশ দা (অমল দাশগুপ্ত) সতর্ক পাঠক-মাত্রেরই চোখে পড়বে। ধর্মীয় কুসংস্কারকে আক্রমণ করা হয়েছে শ্যামরায়ের মৃত্যু (নবেন্দু ঘোষ) এবং সিদ্ধবাক (মিহির সেন) গল্পে। মেহনতী মানুষের শিল্পসম্মত প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তীর্থযাত্রা'য় বা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জখমী মানুষের কথা' গল্পে। মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদীর প্রতিবাদ বোধহয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, আর এর সঙ্গে মিশেছে জোরালো রাজনৈতিক বক্তব্য। কিছু গল্পে প্রতিবাদটাই মূলকথা, নিজস্ব বক্তব্যটিকে তুলে ধরার জন্য লেখকদের পক্ষে সর্বদা শিল্পের মুখরক্ষা সম্ভব হয় নি। সৌরী ঘটকের 'হারামের ভাত', ঋত্বিকের 'কমরেড' কিংবা চিত্ত ঘোষালের 'চাকা' এই পর্যায়ের গল্প। মস্তানী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়েছে অসীম রায়ের চমৎকার গল্প 'ধোঁয়া-ধুলো-নক্ষত্র'তে। অমলেন্দু চক্রবর্তী, দেবেশ রায় এবং তপোবিজয় ঘোষের গল্পে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ছমছমে আবহাওয়ার অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠ চিত্র। দেবেশের 'মানুষরতনে' প্রতিবাদ তীব্র ব্যঙ্গাত্মক, অমলেন্দুর নচিকেতায় নায়কের নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মধ্যেই প্রতিবাদ আর তপোবিজয়ের 'কপাটে করাঘাতে' একদিকে সন্ত্রাসের ভয় জাগানো অন্ধকার অপরদিকে সেই

অন্ধকারকে পরাস্ত করবার জন্য সমবেত প্রতিরোধের প্রচেষ্টা। তরুণতর লেখকদের মধ্যে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের 'দেওয়ালির রাতে ধনুয়া', শৈবাল মিত্রের 'খয়ের খাঁর ইন্তেকাল', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ভর' অথবা আফসার আমেদের 'গোনাহ্' প্রভৃতি গল্পের বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে আলাদা, কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্য দিয়েই লেখকের প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। গল্পের সংখ্যার ব্যাপকতা অথবা বিষয়বস্তুর বৈচিত্রই প্রমাণ করে যে সংকলনে প্রায় সমস্ত ধরণের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরই মর্যাদার স্থান পেয়েছে। এব্যাপারে সম্পাদকদ্বয় সত্যই নিরপেক্ষ। তবে যেখানে প্রতিবাদই মুখ্য সেখানে সর্বদাই যে রসোত্তীর্ণ গল্পের সন্ধান পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশা অন্যায়। কয়েকটির ক্ষেত্রে যে সে প্রত্যাশার পূরণ ঘটে নি তা আগেই বলা হয়েছে। লেখকদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সংশ্লিষ্ট গল্পগুলি রচনার সময়ের উল্লেখ থাকলে বোধহয় ভালো হত। গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাই অচিরেই এর পরবর্তী সংস্করণের প্রত্যাশা করা যায়। তখন কিছুটা গ্রহণবর্জন যে একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

প্রতিবাদের গল্প ঃ—সম্পাদনা—মিহির সেন ও ধনঞ্জয় দাশ। প্রাইমা পাবলিকেশনস। দাম ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা।

কুরপালা ঃ রমেশচন্দ্র সেন

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

কোনও একজন লেখকের লেখাপত্রের আন্তরিক পুনরুদ্ধার, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পাঠ, আলোচনা ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা কখনও কখনও আর কোনও এককত্বে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই বিশেষ লেখকের সাহিত্যকর্মের আলোচনার ভেতর থেকেই সেসব, যেন, একটা ধারার প্রতি আলোকপাতক্ষম হয়ে উঠতে চায়। চাইলেই সে সব সময় তেমন সক্ষমতা জোটে, তা কিন্তু নয়। বরং তেমন একজন লেখক, যিনি নিজের সমকালে তো বটেই, উত্তর কালেও পাঠকের কাছে পরিচিত ও প্রচারিত নন, তাঁর লেখাপত্র নতুন করে ছাপানো, সেসবের আলোচনা সংগঠিত করা, পাঠে উৎসাহ দেবার মধ্যেও আত্মশ্লাঘার এক গোপনস্রোত বুঝি বহমান থাকে, যার কারণে সেই লেখকের সমগ্র সাহিত্য-কর্মের ভেতরে অভিজ্ঞতা ও শিল্পরূপায়ণের অন্তর্সম্পর্ক, দুর্বলতা, নিহিত জটিলতা ও দ্বান্দ্বিক পরিণতির যে নানামুখ, সে অবধি আলোচনার পরিধিবিস্তার ঘটানো যায় না। ভাবখানা এই, তাঁকে যে আমরা, একালের পাঠকেরা তাক থেকে নামিয়ে এনে ধুলো ঝেড়ে আবার পড়ে উঠতে পারছি, যেন সেটুকুতেই সেই লেখকের রচনাকর্মের কালোত্তীর্ণ সিদ্ধি ঘটে যাচ্ছে। ফলে, একজন লেখক, নতুন করে তাঁর লেখাপত্রের প্রতি কিছু পাঠকের তৈরী হওয়া আগ্রহের মাধ্যমে শিল্পগত নবজন্ম পেয়ে যাবার বদলে শুধু যেন পঠিত-ই হচ্ছেন, এবং স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার এক মায়ামাধ্যম হয়ে থাকছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের আসলটাকে জেনে বুঝে নেবার, দোষ-দুর্বলতা, ও শক্তির শনাক্তকরণের কোনও তাগিদ-ই সেখানে তৈরী হচ্ছে না। এতে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের সকলেরই। রমেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যে বিস্মৃতপ্রায় হয়েও ঠিক কি কারণে পুনরুদ্ধৃত হতে পারেন, সে ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী না হয়েও রমেশচন্দ্রর লেখাপাঠের এক হীনতৃপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারেন কোনও পাঠক। যেন ওই পাঠটুকুই রমেশচন্দ্র সেনের একমাত্র প্রাপ্তি, কেন পাঠ, বা

পাঠে কি প্রাপ্তি সে সম্পর্কে কোনও সদুত্তর ছাড়াই। এতে রমেশচন্দ্র সেনের লেখাগুলো নতুন করে ছেপে বের করার যে শুভ উদ্যোগ, তাও কোনও সুপরিণতির দিকে যায় না। কেবল 'রমেশচন্দ্র সেন' নামক এক 'ব্রাত্যজনের সখা'কে ঘিরে এক অন্ত হৈ-হল্লা হয়।

আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে রমেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর লেখার জীবনানুগ চরিত্র, সেইসব লেখালেখির প্রতি আমাদের এতকালের অনাদরের বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে একরাশ লেখা নানা ধরনের নানা কাগজে বেরল, একটা বা দুটো লেখা বাদ দিয়ে তার সবকটাতেই ওই গোপন শ্লাঘা শেষাবধি আর গোপন থাকেনি। অথচ রমেশচন্দ্র সেনের মৃত্যুর অব্যবহিতেই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিচয়'-এর জুন '৬২ সংখ্যায়, এক শোকলেখনে, রমেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকর্মের প্রতি এক প্রাজ্ঞ দৃষ্টিপাতে, চিহ্নিত করেছিলেন রমেশচন্দ্র সেনের সমস্ত লেখার নিহিত প্রাণশক্তিকে। দীপেন্দ্রনাথের সেই ছোট রচনাতেও স্পষ্ট ছিল যে, ১. মানুষের রোগের চিকিৎসা করতে করতে অনিবার্যভাবে রমেশচন্দ্রের শিল্প দৃষ্টিতে সময় সমাজ ও অস্তিত্বের বিবিধ রোগের উপসর্গ ধরা পড়েছে। ২. বাংলাদেশের প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন, রাখার সজ্ঞান চেষ্টা করেছেন। ৩. রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যপাঠের ফল ও নিজের অভিজ্ঞতা এবং জীবনবোধ রমেশচন্দ্রকে এক স্বতন্ত্র ভাষা ও ভঙ্গির সন্ধান দিয়েছে। তা বাস্তবতানির্ভর, কখনও পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিকতার গুণবিশিষ্ট, কখনও নগর কেন্দ্রিক, অথচ লেখক ভঙ্গিতে যা একধরনের কবিত্ব লাভ করে সর্বজনীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ৪. টোলের ছাত্র এবং কবিরাজ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখায় কোনদিন আকস্মিক বা যুক্তিহীন কিছু ঘটেনি। প্রগাঢ় নৈর্ব্যক্তিকতায় তিনি সমাজের ভাঙন ও ইতিহাসের গতিকে রূপ দিয়েছেন। প্রবল সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে যে অক্ষয় মানব সম্পদের অধিকারী করেছিল তারই ফলে ইতিহাস, সমাজ ও মানুষ-ই শেষদিন পর্যন্ত তার সাহিত্যের বিষয় থেকেছে। এই কটি কথাই হয়ে উঠতে পারত রমেশচন্দ্রের মৃত্যু পরবর্তীতে তাঁর লেখাপত্র মূল্যায়নের ভিত্তি। আর সেইসূত্রে অভিজ্ঞতার জমিতে দাঁড়িয়ে কথাসাহিত্য রচনার প্রাথমিক দায়িত্ববোধকে নস্যাৎ করার জন্য সক্রিয় যে মহল, তার বিরুদ্ধে লড়াই এবং বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে অন্যতর এক পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার অন্যতম প্রেরণাউৎস হিসেবে আমরা

পেতে পারতাম রমেশচন্দ্র সেনকে। কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি। রমেশচন্দ্রও আমাদের মন থেকে প্রায় মুছে গেছিলেন। এখন আবার তিনি পঠিত হচ্ছেন এটা যেমন সুখবর, আবার তাঁর বই নতুন করে বেরচ্ছে এটা যেমন আশার কথা, তেমনি রমেশচন্দ্র সেনের লেখা পড়তে বসে দীপেন্দ্রনাথের ওই ইঙ্গিতের সত্যের থেকে নিজেদের দূরে রাখাও বেদনাদায়ক। কারণ, অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ও বিষয়ের পরিধিপ্রসারের কাজ করে ওঠার সূত্রে একজন কথাশিল্পী যে সার্থকতার ক্ষেত্রে চিহ্নবান হয়ে ওঠেন, একালের একজন অন্যতম সাহিত্যিক সমালোচকের সেই মতামতের নিরিখেও রমেশচন্দ্র সেন তাঁর কালের একজন অন্যতম সাহিত্যিক। বাস্তবতাকে যিনি অস্বীকার করতে চান না, বরং দেশ ও দশের বাস্তবকেই নেন নিজের সাহিত্যকর্মের অবলম্বন হিসেবে। এবং যা তিনি বেছে নেন, নিজের ক্ষেত্রে, সেই ভিন্নধর্মী বাস্তবতার চর্চার কারণেই হয়ত তিনি নিজের কালে গ্রাহ্য হন না পাঠকের কাছে। সেই পরিস্থিতি থেকে যে আজকের সাহিত্য-আবহ মুক্ত, এমনও নয়, ফলে সামাজিক ঐতিহাসিক কারণেই রমেশচন্দ্র সেনের মত একজন লেখক তার সঠিকমাত্রায় পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হতে পারেন না। যখন তাঁর নানা লেখা নানা কাগজে বেরচ্ছে, তখনও নয়, আর এখন তাঁর লেখা নিয়ে নানা লেখা নানা কাগজে বেরচ্ছে, তখনও নয়। অথচ রমেশচন্দ্র একটা গ্রামকে নায়ক করে আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে লেখেন কুরপালার মত উপন্যাস যেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোতেই ছড়ানো ছেটানো অথচ ভাঙনে তছনছ এক গ্রামীন সমষ্টিজীবনকে তিনি তুলে আনেন অসামান্য দক্ষতায়, অনুপুঙ্খ ডিটেলে, এক পরিবর্তমান কালের অস্থিরতার উদ্‌ঘাটনে।

প্রথম প্রকাশের একচল্লিশ বছর পরে অরুণা প্রকাশনী সম্প্রতি 'কুরপালা' ছেপে বের করেছেন। দুশো এক পাতার যে উপন্যাস, দীপেন্দ্রনাথেরও মতে, বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্র সেনের এক অন্যতম অবদান, তাঁর জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যকর্ম। বাংলা গল্প-উপন্যাস প্রধানতঃ ব্যক্তিগত কাহিনী-নির্ভর। নৈর্ব্যক্তিক সমষ্টি জীবন আমাদের ভাষার উপন্যাসের প্রচলিত বিষয় নয়। এমন-কি, আদিবাসী বিদ্রোহ বা কৃষক বিদ্রোহের মত সামাজিক প্রক্রিয়ার কাহিনীও আমরা কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিসম্পর্ক না ধরে বলতে পারি না। কিন্তু রমেশচন্দ্র সেন বাংলা কথা সাহিত্যের সেই বিরল লেখকদের একজন যারা সমষ্টিজীবনের মত জীবনের এক সামাজিক সত্যকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে নিয়েছিলেন। এবং ব্যক্তি বা ব্যক্তিসম্পর্ক না ধরে সামাজিক

প্রক্রিয়ার কাহিনী বলবার অক্ষমতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। সেই সামাজিকতা যা গ্রামভারতের সমস্ত পুরনো সম্পর্ককে মূল্যহীন করে দিচ্ছে, সেই অর্থনীতি, যা পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের জায়গায় এনে দিচ্ছে নতুনকে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটছে, আর সেই অস্থির বিকাশের বিকারে কুরপালা'র মত গ্রামের, গ্রামীণ জীবনের সমস্ত সনাতন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এই উপন্যাসের 'ব্যক্তি'-রা যে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ, সম্পর্কের সেই সামাজিকতা বা সংযোগ মুখরতা 'কুরপালা' উপন্যাসের একটা বড় গুণ। অথচ এই উপন্যাসের যা নির্মিতি, তাতে তিনি অত্যন্ত শৈল্পিক ভঙ্গীমায়, এক বিশেষ গ্রামের ভেতর দিয়েই ধরতে চেয়েছেন নির্বিশেষকে। পূর্ববাংলার এক গ্রাম, 'কুরপালা,' যার নামে উপন্যাসেরও নাম, তার গ্রামসমাজের ভেতরে জাতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, কৃষির পুরনো ব্যবস্থায় সর্বগ্রাসী ভাঙন, নতুন কল-কারখানা তৈরীর মত ঐতিহাসিক সামাজিক প্রক্রিয়াকে এমন মুন্সীয়ানায় চিত্রিত করেন যে, শেষাবধি এই 'কুরপালা'ই প্রতিভাত হয় বাংলাদেশের এক প্রতীকে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, সমাজ-বিকাশের এক বিশেষ স্তরে, ভারতের জাতীয় মুক্তির আবেগ-মথিত এক যুবকের ভিত্তিহীন রাজনীতিচর্চা কিভাবে সামাজিকস্তরে শেষ পর্যন্ত অবান্তর হয়ে যায়. ইতিহাসচেতনাহীন প্রতিরোধের সমস্ত সামাজিকতা ও ব্যক্তিত্ব খানখান হয়ে যায় দৈনন্দিনের তাড়নায়, 'কুরপালা'য় তারই শিল্পায়ন। রমেশচন্দ্র সেনের বর্ণনায়, নিরাবেগ ও প্রায় নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশনে। রাজনীতি তখনও কংগ্রেস পতাকার তলার গ্রামবাংলায় প্রোথিতমূল হয়ে উঠতে পারেনি। বিচ্ছিন্নভাবে কোনও ব্যক্তির উদ্যোগে, কিছু সামাজিক সংস্কারের উত্তেজনায়, এবং প্রতিবাদের স্বতঃস্ফূর্ততায় তখন রাজনীতির অস্তিত্ব। জমিদার বিশ্বনাথ রায়ের ছেলে শঙ্কর তাই শহরের ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাবার স্বপ্ন-ভঙ্গ ঘটায়, অথচ পুরনো জমিদার প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার আন্তরিক প্রয়াসী হয়েও বাস্তবতার কোনও বদল ঘটাতে পারে না। বরং বঙ্কিম কুণ্ডু পরি-কল্পনামাফিক গ্রামের সমস্ত জমিদারি নিজের আওতায় এনে, কারখানা খুলতে উদ্যোগী হয়। পুরনো সমস্ত মূল্যবোধের বিষয়ীগত চর্চা বা পিছুটানোর জন্য রায় বংশের জমিদারি যখন তার সমস্ত প্রভাব ও সামগ্রিক আধিপত্য খুইয়ে ওই মূল্য-বোধেরই চর্চায় ও আবেগপ্রবণতায় ক্ষয়িষ্ণু হয়েও টিকে থাকতে চেয়েছে দিনের পর দিন, ঠিক তখনই নতুন কালের নতুন মানুষ হিসেবে বঙ্কিম কুণ্ডুর ক্রমাগত সম্পন্ন হয়ে ওঠা, সে তো নতুন কালের সমস্ত ইঙ্গিতগুলো জেনে বুঝে নিতে

পারার জন্যই। অর্থসর্বস্ব এবং মানবতাবিরোধী যে কালপর্ব, সমাজবিকাশের সেই বিশেষ স্তরের পৃথিবীকেই জীবনানন্দ বলতে চেয়েছেন 'অ-পৃথিবী' এবং মার্কস তাঁর নানা রচনায় যার বিপরীতে এক 'humane world' গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলেছেন। বঙ্কিম কুণ্ডু তাই এমন এক সময়ের প্রতীক যে সময়ে সহানুভূতির অন্তরালেও থেকে যায় কোনও নিহিত স্বার্থ। সর্বদমন নামে যে চরিত্র, তাতেও আমরা সেই অর্থলোলুপতা দেখি। 'কুরপালা'-র নানাধরনের মানুষের ভীড় থাকলেও তাদের সকলের চেতনার স্তর এক নয়, সবসময় সমস্বার্থ-চেতনা তাদের কোনও ঐক্যসূত্রে গাঁথতে অক্ষম থেকে যায়। ফলে গ্রামে যখন বঙ্কিম কুণ্ডু মেলা বসায়, গ্রামীন জীবনের সংহতিতে ফাটল ধরানোর জন্য, তখন একদিকে যেমন বিচ্ছিন্নভাবে, গোপনে, একক মানুষ সেই মেলায় যায়, মেলার সমস্ত দংশন সর্বাঙ্গে মেখে বাড়ি ফিরে আসে, অন্যদিকে এই মেলা তাকে বিভ্রান্ত করে, যে বিভ্রান্তির হাত থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য শঙ্করকে ছুটে যেতে হয় মেলার উদ্যোক্তা বঙ্কিম কুণ্ডুর কাছে। রাজনীতির অনেকটাই যে তখন ব্যক্তিগতের উপর নির্ভরশীল ছিল, সমবেত চেতনা গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার বদলে, যেন তারই এক প্রকাশ পারিবারিক অবস্থানের অসহায়তার জন্য শঙ্করকে শেষাবধি বঙ্কিমের কাছে নতি স্বীকার করে দেশ ছেড়ে চলে যাবার মধ্যে। অথচ মেলায় কেনা কদমের ঘড়ি মেলাভাঙার পরেই তার দম হারিয়ে ফেলে। মদ এবং বেশ্যার দরজায় কড়া নাড়া যে গ্রামীণ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর তা যে কেউই বোঝে না, তা কিন্তু নয়। কিন্তু বঙ্কিমের এই মেলার আয়োজন বা মেলার পরেই রূপমতীর পাড়ে কারখানার উদ্যোগ— এই সাবরই কাছে এক নিরুপায় সমর্পণ মেনে নেয় বিপন্ন, প্রান্তিক, প্রায় সর্বহারার দল। তাদের এতকালের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার সাথে এই ধ্বংসাত্মক সর্বগ্রাসী চাপের দৈনন্দিন মেলে না, অথচ সেই অমিলের কার্যকারণ সম্পর্ক-ও তাদের কাছে পরিচ্ছন্ন নয়। তাই তাদের প্রতিরোধ থাকে না, থাকলেও তা সংহতি পায় না, বিপথগামী হয়ে পড়ে। আর কুরপালায় যাদের দেওয়ানী মামলা চলছিল তাদের কেউ কেউ মেলা থেকে তাবিজ-কবচ কেনে। কিনেও তাদের শেষরক্ষা হয় না। বঙ্কিম কুণ্ডুর কারখানাতেই শ্রমিক হবার জন্য লাইন দিতে হয়। শুরুর দিনে এক বুর্জোয়া যুগ যেমন পুঁজির অলৌকিক ক্ষমতায় মানুষ সম্মোহিত করে রাখে, তেমন সম্মোহনেই কিন্তু রমেশচন্দ্র সেন তার নায়কনায়িকাদের, গ্রামের নানা অংশের, সম্প্রদায়ের মানুষদের আচ্ছন্ন রাখেননি। কোনও আকস্মিকতাই রমেশচন্দ্র সেনের কাছে কোনওদিনই

আমল পায়নি, না জীবনে, না শিল্পচর্চায়। তাই তার উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাগুলোর পেছনের কার্যকারণ-ই তিনি স্পষ্ট করে দেন, শোষণের প্রত্যক্ষতার মত। কিন্তু সেই শোষণের বিপরীতে যে প্রতিবাদ তার দলীয় চেহারার প্রতি রমেশচন্দ্র সেন 'কুরপালা' উপন্যাসে কোনও দুর্বলতা দেখেন নি। আরোপিত সংঘচেতনার সহজেও তার কোনও আগ্রহের পরিচয় আমরা তাঁর কোনও রচনাতেই পাই না, 'কুরপালায়' তো নয়-ই। তাই এই উপন্যাসের সমস্ত প্রতিবাদ-ই ব্যক্তিমাত্রায় উজ্জ্বল, গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ। নারায়ণ তেমনই এক প্রতিবাদমুখর ব্যক্তিত্ব। নিজের কর্মদক্ষতার স্বীকৃতির মত দুর্বলতর মুহূর্ত-ও তার সামগ্রিক প্রতিবাদের মানসিকতা থেকে তাকে একটুও সরাতে পারে না, নিজস্ব ভাষায় ও ভঙ্গিমায় নারায়ণ-ই নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের অবিচ্যুত প্রতিবাদকে মূর্ত করে। সমাজের নীচুতলার মানুষের কাছে সেসময়কার কংগ্রেসী রাজনীতির অপ্রাসঙ্গিকতারই এ যেন এক স্পষ্ট ইঙ্গিত।

'কুরপালায়' রমেশচন্দ্র চমৎকারভাবে বঙ্কিম কুণ্ডুকে উপস্থাপিত করেছেন। যদি রাজনীতির দিক থেকে দেখা যায়—তাহলে, শঙ্কর যাদের নিয়ে কংগ্রেসী রাজনীতি করতে চায়, বঙ্কিম কুণ্ডু তাদের সকলের বিরুদ্ধে। আপাতনজরে যাতে কংগ্রেসী রাজনীতি বা কংগ্রেসের-ই বিরোধিতা। আসলে বঙ্কিম কুণ্ডু ইতিহাসের হাতিয়ার। সে কারখানা খোলে, সেই কারখানার পুঁজি সংগ্রহের জন্য গ্রামের মানুষদের, মায় পুরনো জমিদারকেও সর্বস্বান্ত করে। সেই কারখানাতেই কাজের আশায় ছোটে সবহারানো নারীপুরুষের দল, এমনকি তাদের নাবালক সন্তানরাও, সম্ভব হলে। এই কারখানাই তো এদেশে কংগ্রেসী রাজনীতিকে গতি দেয়, স্থিতি দেয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের অভিলাষে ব্যস্ত করে। আর করে বলেই সুধাঞ্জনবাবুর মত স্বদেশী নেতা এসে মিলের উদ্বোধন করেন। সুধাঞ্জনবাবুর অন্যসব তৎপরতাও তখন আমাদের কাছে পৌছয়। কংগ্রেসী রাজনীতির ফলবাদী দ্বিচারিতার এতে যেন এক আভাস তৈরী হয়। একেবারে নিচুতলার মানুষের স্বার্থবাহী কাজে অনীহ কংগ্রেস সেই নিচুতলার মানুষেরই সমর্থনপুষ্ট হয়ে ভারতবর্ষে আজও গদীয়ান। রমেশচন্দ্র সেই সত্য তাঁর উপন্যাসের নাতিদীর্ঘ আয়তনের ভেতরেও স্পষ্ট করেন। সংস্কারমূলক নানারকম কাজে, শিক্ষাপ্রসারে বা বয়স্কশিক্ষায়, রমেশচন্দ্র কংগ্রেসী উদ্যোগের স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবাদের বা সংগ্রামের দলবদ্ধতায় কংগ্রেসী তৎপরতা অবান্তর হয়ে গেছে শেষাবধি। রমেশচন্দ্র তাঁর 'কুরপালা' উপন্যাসে কমিউনিস্ট চেতনার কথাও এনেছেন, তবে

তা শেষ পর্যন্ত সমষ্টিমাত্রার এই উপন্যাসে নতুন কোনও তাৎপর্য বা গুরুত্ব তৈরী করতে পারেনি, পারার কথাও নয়। যে সময়কাল 'কুরপালা'য় বিধৃত, তাতে কমিউনিস্ট চেতনা এদেশের বুকে তেমন তাৎপর্যে ছিল না, যেভাবে যেমন ছিল, রমেশচন্দ্র তাকে সেভাবেই এনেছেন। বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়ার মত সে-প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে তাই সঙ্গতভাবেই হারিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংহতিচেতনা-ই যে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাত থেকে কুরপালা তথা এই দেশকে বাঁচাতে পারে একমাত্র, রমেশচন্দ্র সেকথা উপন্যাসের ভেতরে বলে নিয়েছেন। তাঁর একটি অত্যন্ত বিখ্যাত ছোটগল্পেরও যা বিষয়বস্তু।

'কুরপালা'র সামাজিক সংহতি ও সনাতন গোষ্ঠীজীবনে যে ভাঙন অনিবার্য ও সর্বাত্মক, ইতিহাসের, বাস্তবের এক মগ্ন পর্যবেক্ষক হিসেবে রমেশচন্দ্র তাকে চমৎকার ডিটেলে এঁকেছেন। পুরনো ধ্যানধারণার মানুষের নতুনের, ভাঙনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেবার মর্মান্তিক প্রাথমিক বৃত্তান্ত, যাতে নতুন সম্পর্কে বিস্ময় ও বিরক্তিও অনুপস্থিত নয়, হিসেবে আমরা কুরপালার মত উপন্যাস পাই, বাংলাভাষায় উপন্যাসের দৈন্য সত্ত্বেও যে উপন্যাস প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাস পরিকল্পনায় যে রমেশচন্দ্র সিদ্ধি লাভ করেছেন, 'কুরপালা' প্রসঙ্গে সে কথা বলা যায় না। বরং সেখানে তিনি একটু দুর্বলতারই পরিচয় দিয়েছেন। কখনও কালাতিক্রমণ দোষ তাঁর উপন্যাসকে প্রত্যাশিত উচ্চতা থেকে নামিয়ে এনেছে। উপন্যাসে বিধৃত সময় সর্বত্র একই গতিতে এগোয়নি, কিন্তু তাতে, সেই গতিবিভ্রমে, নির্মাণের সেই অপূর্ণতা বা অনবধানতায়, উপন্যাসের কোনও ক্ষতি যে হয়নি, তা বিষয়বস্তুর কারণেই। আমাদের কালের এই প্রধান শিল্পমাধ্যমকে বাস্তবের, জীবনের কঠিন থেকেই রসদ সংগ্রহ করতে হয়। রমেশচন্দ্র সেন তাঁর 'কুরপালা' উপন্যাসে বিষয়বস্তুর সেই তাৎপর্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন জীবনের প্রতি নিষ্ঠায়, পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে। পদ্ম, হাস্য, অন্জুর মত চরিত্রকে মনে রাখার মত করে রমেশচন্দ্র তৈরী করেন, এত চরিত্রের ভীড়েও তাদের নিহিত প্রাণশক্তিতেই তাঁরা বিশিষ্ট। জীবনের সাথে এক সাবলীল আন্তরিক যোগাযোগ ছাড়া রমেশচন্দ্র এমন চরিত্র তৈরী করতে পারতেন না, কিন্তু শুধুই বিষয়বস্তু-র জীবনমুখীনতায় শিল্পকর্ম উত্তরে যেতে পারে না। লেখকের জীবন সম্পর্কে যে বোধ, বক্তব্য তা যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা বিষয়কে অবলম্বন করে ব্যক্তি ও সমষ্টি সম্পর্কের চলমানতাকে বিশেষত্ব দিতে পারে—যে বিশেষত্ব-ই আসলে উপন্যাসের বিষয়—ততক্ষণ

যে কোনও বিষয়ই নিরর্থক হয়ে পড়ে। রমেশচন্দ্রের 'কুরপালা'য় এমন নিরর্থকতা নেই। বরং জীবননিষ্ঠা ও উত্তরজিজ্ঞাসা, পরিণতি বিষয়ে প্রশ্নাতুর রমেশচন্দ্র সেন, তার জীবনবোধের বিশিষ্টতা দিয়েই 'কুরপালা'য় বিষয়বস্তুর তাৎপর্যকে সঠিক মাত্রায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

এই বিষয়জ্ঞানকে সময়, সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তিজ্ঞান থেকে বিযুক্ত করা যায় না। বরং এইসব জ্ঞানের এক জায়গায় সমবেত হয়ে ওঠাতেই বিষয়জ্ঞান তৈরী হয়। ফলে সমস্তরকম সম্পর্কের সূত্রকে পরিচ্ছন্ন করে দেওয়ার চেষ্টাও উপন্যাসের অন্যতম প্রয়াস। রমেশচন্দ্র 'কুরপালা'য় সেই প্রয়াসেও ব্রতী ছিলেন। ব্যক্তিসম্পর্ক ও সমাজসম্পর্ক, এই দুইয়ের ওতপ্রোতত য় 'কুরপালা' আমাদের দেয় পরিবর্তমান সমাজ ও সময়ের এক দায়িত্বশীল পর্যবেক্ষণ, যেখানে সেই পরিবর্তনে নিজেদের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে সকলেই কোনও না কোনও ভূমিকায় ব্যস্ত ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্কের দিকটাও এ উপন্যাসে বিশিষ্টতা পেয়ে যায়, উপন্যাসের স্বদেশজিজ্ঞাসাকে আরও একটু উসকে দিতে। যেমন ব্যক্তি, তেমনই সময় ও সমাজের যুগান্তর 'কুরপালা'য় স্পষ্ট, যাকে অস্বীকার করার কোনও উপায়ই আমাদের কাছে নেই।

উপন্যাসের যে ধরণে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি দিন দিন, তাতে ডিটেল-সমৃদ্ধ, নায়কনায়িকাহীন এমন উপন্যাসে গতিহীনতার বোধ স্বাভাবিক, যে গতি লেখকের জীবনবোধনিরপেক্ষ নয়। সেই দুর্বলতাটুকু ছাড়া, যা পরবর্তীতে রমেশচন্দ্র সেনের অন্যান্য উপন্যাসকেও আক্রমণ করেছে যথেষ্ট, কুরপালা'র বাস্তবতাচর্চা, ইতিহাসবোধহীন এক গ্রামের সমস্ত মানুষের ইতিহাসেরই অঙ্গ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার বাহুল্যহীন উপস্থাপন, রাজনীতির নানামুখীনতা, কংগ্রেসী রাজনীতির জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও অ-প্রোথিতমূল চরিত্র, মানুষের ভেতরকার প্রতিবাদমনস্কতা—রমেশচন্দ্র সেনকে বাংলা উপন্যাসের এক বিশেষ ধারায় বিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর প্রয়াসকে ছোট করে দেখলে ক্ষতি হবে আমাদের-ই। আবার, তাঁর সব কিছুকেই মহত্ব দিতে শুরু করলেও, ক্ষতি হবে আমাদের-ই, অন্য কারুর নয়। উত্তরাধিকার চিহ্নিত করে ওঠা, সেই চিহ্নিত উত্তরাধিকারের পিণ্ডিচটকানো দায় বয়ে বেড়ানো—আত্মপরিচয়ের সংকটদীর্ণ আমাদের কালের, এক অপূর্ব বিভ্রম। সেই বিভ্রান্তির মধ্যে আমরা যেন রমেশচন্দ্রকেও টেনে না আনি। সে বড় কঠিন কাজ, জেনেও। যে গ্রামের মানুষ চাষবাসে অভ্যস্ত, তারাও অনভ্যাসের তাড়নায় রাত জেগে কাটিয়ে দেয় কলের ভোঁ ঠিকঠাক শুনে, ঠিক সময়ে কাজে যেতে পারার জন্য। 'কুরপালা'র এই পরিবর্তন তো শুধুই একটা গ্রামের নয়, আরও বহুবিস্তৃত এক ক্ষেত্রের। আঞ্চলিকতাকেও রমেশচন্দ্র সেন এভাবেই ছাপিয়ে যেতে পারেন। কোনও সহজ সমাধানের চেয়ে, জিজ্ঞাসায় যিনি অনেক বেশি আস্থাবান, আশাশীল, তাকে প্রথম অথবা পুনর্পাঠে যেন কোনও সহজে আমরা মেনে না নিই। জিজ্ঞাসা-ই হোক, না-হয়, রমেশচন্দ্র সেনকে পড়ে ওঠার প্রেরণা ও পরিণতি।

কুরপালা। রমেশচন্দ্র সেন। নতুন সংস্করণ—অরুণা প্রকাশনী। পঁচিশ টাকা

সারাবাংলা সাময়িক পত্র-ও চিত্র-প্রদর্শনী

সম্প্রতি বিরাটী মহাজাতি বিদ্যামন্দিরে আনন্দ-ধারা সাংস্কৃতিক চক্রের উদ্যোগে এবং 'ভগ্নাংশ' ও 'অশ্বমেধ' পত্রিকার সহযোগিতায় সারা বাংলা সাময়িক পত্র-ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিলো। উদ্যোক্তারা ১৮১৮ সালের 'দিগদর্শন' থেকে এই আশির দশকের সাম্প্রতিকতম ক্ষুদ্র-পত্রিকার প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলা ক্ষুদ্র-পত্রপত্রিকার এই অভূতপূর্ব প্রদর্শনী সাম্প্রতিক কালে দেখা গিয়েছে বলে মনে হয় না। ৫ই নভেম্বর বিভিন্ন ক্ষুদ্র-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন 'পরিচয়' সম্পাদক বিশিষ্ট কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমিহির সেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। গদ্য, কবিতা, নাটক, চিত্রশিল্প এবং লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধিত হন সর্বশ্রী চন্দন ঘোষ, অসিত চক্রবর্তী, অমলেশ পাল, অপূর্ব কর, গৌতম সেনগুপ্ত, রথীন রায়, শংকর সরকার, বিশিষ্ট অভিনেতা পরলোকগত অপূর্ব রায়-কে মরণোত্তর সম্মানে ভূষিত করা হয়। দীপ্ত দাশগুপ্ত, সমীর ঘোষ, ভবশংকর সেনগুপ্ত প্রভৃতির চিত্রর সাথে বিমল কুণ্ডু, মদন দত্তর ভাস্কর্যও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্রুতি নাটক ইত্যাদির পাশাপাশি ছিল মাদল প্রযোজিত তৃতীয় ধারার নাটক 'পরিক্রমা'। ৮ নভেম্বর প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানের শেষ দিনে ছিলো কবিতা পাঠের আসর। প্রায় পঞ্চাশজন কবি এই আসরে কবিতা পাঠ করেন।

ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা প্রচার-প্রসারে উদ্যোক্তাদের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য।

প্রবীর ভৌমিক

চলচ্চিত্রে নারী-চিত্র

ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড ২৬ সেপ্টেম্বর নন্দনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল: 'ভারতীয় ছায়াছবিতে নারী-চিত্র।' সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় ফিল্ম্ সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান বিক্রম সিং। বক্তা ছিলেন ফিল্ম্ সার্টিফিকেশন বোর্ডের আঞ্চলিক অফিসার ডি. সেনগুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য, তপন ঘোষ, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্র পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য, ভূপেন হাজারিকা প্রমুখ ব্যক্তি। আলোচনা থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসে: ভারতীয় ছায়াছবিতে সেক্স্-অবজেক্ট বা যৌনবস্তু হিসেবে মেয়েদের ক্রমেই বেশি করে দেখানো হচ্ছে। শরীর প্রদর্শন, অশালীন নৃত্য বা অঙ্গভঙ্গি, ধর্ষণ প্রভৃতির সংখ্যা বাড়ছে। আদর্শের মোড়কে বা ভাল কিছুর আড়ালেও অনেক সময় অশালীনতা ঢোকানো হচ্ছে। কখনো মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে পজিটিভ কোন বিষয়ের সঙ্গে চাতুরী করে। ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে নারীর দাসত্বকে প্রশংসনীয় ও গৌরবময় করে দেখানোর প্রবণতা খুব বেশি। পারিবারিক স্নেহ ভালবাসা কর্তব্য বলতে সর্বদাই যেন বোঝায় নারীর নত হয়ে থাকা। পুরুষ ও নারীর সম-মর্যাদার কথা ভুলে মেয়েদের সম্পর্কে নানা হীন উক্তি বা ব্যবহার ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নানা ছবির দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তারা তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে ঐতিহ্যের নামে গোঁড়া মৌলবাদের পুনরুজ্জীবনও ঘটানো হচ্ছে অনেক ছবিতে। স্বামীর যে কোন কাজের বা মতের অনুগত থাকাই যেন শুধু ঐতিহ্য। স্বাধীন মত থাকলেই তা ঐতিহ্য-বিরুদ্ধ।

সংখ্যায় অল্প হলেও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাও কোন কোন ছবিতে বলবার চেষ্টা আছে। সেটা কখনো সোজা পথে কখনো বাঁকা পথে। একাধিক বক্তা ডঃ ভবেন সাইকিয়ার অসমীয়া ছবি 'অগ্নিস্নানে'র কথা উল্লেখ করেন। সেখানে স্ত্রী (মেনকা) বর্তমানে স্বামী মোহিনীকান্ত দ্বিতীয় বৌ ঘরে আনেন। প্রথমা স্ত্রী মেনকা রাগে-ক্ষোভে বা হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় একটি চোরকে শারীরিক ভাবে গ্রহণ করে ও অন্তঃসত্ত্বা হয়। স্বামী মোহিনীকান্ত কিন্তু একজন সীতার মতো স্ত্রী চায়। ছবির শেষ দিকে মেনকার

তীক্ষ্ণ প্রশ্ন উচ্চারিত হয় : 'আমি একজন সীতা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউ কি রাম হবে না?'

চলচ্চিত্রে নারীকে হীনভাবে চিত্রিত করার কু-অভ্যাস অনেক দিনের। তবে সেটা এখনো বাড়ছে। প্রসঙ্গটাও এই প্রথম আলোচিত হল তা নয়। এর আগেও হয়েছে। কয়েক বছর আগের কথা, আমরা তখন ফিল্ম্ সার্টিফিকেশন বোর্ডের সদস্য, সেই সময়েও কেন্দ্রীয় বোর্ডের তখনকার চেয়ারম্যান হৃষিকেশ মুখার্জির সভাপতিত্বে মিটিং হয়েছিল আকাশবাণী ভবনে। সেখানেও এসব কথা—অন্যান্য কথার মধ্যে—উঠেছিল। কিন্তু প্রতিবাদের কোন উপায় নির্ধারণ করা যায় নি। ২৬ সেপ্টেম্বরে নন্দনের সভাতেও গেল না। সাধারণ লোকের চেতনা বৃদ্ধি করা দরকার, তাহলে এটা ঠেকানো যাবে এই রকম সদিচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত হয়। কয়েকটি প্রবন্ধ এবং একটি রুদ্ধ-দ্বার সেমিনার যে সাধারণের কোন্ অংশে কতটা চেতনা বৃদ্ধি করবে তা সহজেই অনুমেয়। উলটো দিকের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা অনেক গুণে প্রবল, সুস্থ রুচির ছবির প্রযোজক দুর্লভ, পরিবেষক বিমুখ, প্রদর্শক (হল্-মালিক) রক্ষা-কবচ (প্রোটেকশন মানি) চায়। এমন কি কর্মচারীরাও অনেকে ব্যাজার। নন্দনে বাসু ভট্টাচার্য নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বললেন। উত্তর ভারতের একটি ছোট শহরে তিনি তাঁর ছবির পরিবেশকের ঘরে বসে ছিলেন। ছবি নিতে এলেন এক হল্ মালিক। প্রায় দু লাখ লোকের এই শহরে দুটি সিনেমা হল্, তার একটির মালিক এই ভদ্রলোক। পরিবেষক তাঁকে কয়েকটি ছবির নাম বললেন। তার মধ্যে বাসু ভট্টাচার্যের একটি সুস্থ রুচির ছবিরও নাম করলেন। হল্-মালিক রাজী হলেন না বাসু ভট্টাচার্যের ছবি নিতে। 'কেন নেবেন না?' উত্তর : 'ও ছবি চলবে না। হাউস ফুল পাবে না।' বাসু বললেন, 'হাউসফুলের থেকে যতটা কম পড়বে, সেই টাকা আমি দিয়ে দেব, আপনি নিন।' হল্-মালিক উত্তর দিলেন, 'তাও না;' প্রশ্ন : 'কেন?' হল্ মালিক বললেন, 'আমার প্রেষ্টিজ চলে যাবে। হলের সামনে হৈ-হল্লা করে টিকিট ব্ল্যাক হবে না।' অর্থাৎ দুলাখ লোকের রুচির জিম্মাদার দুটি হল্-মালিক। তারা দুজন যা দেখাবে তাই লোকজনকে দেখতে হবে। অন্য ছবি দেখার সুযোগ তার নেই। সেই সব ছবির নামও তারা জানতে পারবে না। ব্ল্যাক হলে সবার লাভ। চোরা-কারবারী, পুলিশ, হল্-মালিক, এমন কি কর্মচারীদের একাংশেরও।

এ জাতীয় ঘটনা সর্বত্র ঘটে। কলকাতাতেও ঘটে। কয়েক বছর আগে

কলকাতার একটি সিনেমা হলে কর্মচারীদের একাংশ ষ্ট্রাইক করেন। তাঁদের দাবী ছিল, সস্তা রুচির হিন্দী ছবি চালাতে হবে। তাতে হাউস ফুল পাওয়া যাবে, টিকিট ব্ল্যাক হবে, কর্মচারীদের একাংশ কালো টাকার ভাগ পাবেন।

অর্থাৎ সিনেমা একটা ইন্‌ডাস্ট্রি, নারী-চিত্র তাদের একটি পণ্য, লক্ষ্য মুনাফা। বেসরকারী প্রচার-মধ্যমগুলি তাদের কব্জায়, সরকারী প্রচার-মাধ্যমগুলিও অনেকটা তাই। হিন্দী চিত্রজগতের একজন প্রযোজক নির্দেশক-অভিনেতা সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন বেওসায়ী, সেক্সের সদাগর, নারীদেহকে পণ্য করে তোলবার চতুর কারিগর। কিন্তু তাঁর প্রয়াণকে জাতীয় শোক হিসেবে পালনের বিপুল আয়োজন করেছিল সরকারী দূরদর্শন। তাতে বোঝা গিয়েছিল যে আমাদের মূল্যবোধ কতটাই বিপর্যস্ত। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো কোন কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ সেদিনের বা আগের দিনের সভায় করা যায় নি। ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড কোন অংশ কাটলেও বেআইনীভাবে তা দেখাবার অনেক কৌশল আছে। সে-মত ঠেকানো যায় না, বা ঠেকানো হয় না। আর ব্লু ফিল্‌ম্‌ ও তো কার্যত খোলা বাজারেই বিক্রি হয়। জন চেতনাকে বিকৃত করবার উদ্যোগ সুবৃহৎ। এর বিরুদ্ধে সুস্থ চেতনাকে জাগ্রত করা খুবই দুরূহ। তবু সেই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করা ছাড়া সুস্থ রুচির মানুষের অন্য কোন উপায় নেই।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

নীরব সাহিত্যসাধক অমল দাশগুপ্ত স্মরণে

'পরিচয়'-এর দীর্ঘকালের সঙ্গী, বিশিষ্ট প্রগতিশীল লেখক অমল দাশগুপ্ত আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ৯ সেপ্টেম্বর ঈস্ট-এণ্ড নার্সিং হোমে মৃত্যুর কালো হাত তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

অমলবাবুকে প্রায় ৩০/৩৫ বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। এমন বলিষ্ঠদেহী, নীরোগ মানুষ আমাদের মধ্যে খুব কমই ছিলেন। ১৯১৯ সালে যে তাঁর জন্ম, তাঁকে দেখে তা মনেই হতো না। সেই মানুষ উনসত্তর বছরের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ এমন করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবেন, সত্যি ভাবতে খুবই কষ্ট হয়। জানি, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই অপেক্ষা করছে ঐ একই পরিণতি, তবু কেন জানি না আমার মতো জীবিত মানুষের পক্ষে মৃত্যুর বন্দনা কিছুতেই সম্ভব নয়।

অমল দাশগুপ্তকে যতটুকু জেনেছি এবং বুঝেছি তাতে মনে হয় আমৃত্যু তিনিও ছিলেন জীবনের জয়গানে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের ছাত্র অমলবাবু চল্লিশের দশকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতি এবং এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের হাতিয়ার হাতে এদেশের মুক্তিকামী নিপীড়িত মানুষের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন দ্বিধাহীনভাবে। অমলবাবুর সরকারী চাকুরী-জীবন তাই নির্বিঘ্নে কাটেনি। ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে প্রথমবার সরকারী চাকরী থেকে অপসারণের পর সম্ভবত তিনি দ্বিতীয়বার চাকরী গ্রহণ করেন চিত্তরঞ্জন লোকমোটিভ কারখানায় প্রযুক্তিগত কোনো কাজে। সেই সময় চিত্তরঞ্জন-এর সমগ্র উপনগরী জুড়ে বিরাজিত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের যে-অপশাসন, বৈষম্য ও ভেদনীতি, অমলবাবু তা মেনে নিতে পারেন নি। যেসব সচেতন কর্মচারী তৎকালে এইসব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে তুলছিলেন অমল দাশগুপ্ত তাঁদের সঙ্গে শামিল হন। এর ফলে, অমলবাবু পড়েন কর্তৃপক্ষের বিষ নজরে এবং ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে বিনাবিচারে বন্দী হয়ে নিক্ষিপ্ত হন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে।

কারামুক্তির পর দীর্ঘকাল আর কোনো চাকরী গ্রহণ করেননি অমলবাবু। এই সময় থেকে সর্বক্ষণের জন্য তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে। পাশাপাশি চলতে থাকে রুশ-সাহিত্যের কালজয়ী বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ।

চিত্তরঞ্জন লোকমোটিভ কারখানার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কারানগরী' প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই প্রথম উপন্যাসেই তিনি তৎকালীন সাহিত্যসমালোচক এবং পাঠকসমাজকে প্রচণ্ড নাড়া দিতে সক্ষম হন। এরপর 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় একে একে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর বহু ছোটগল্প এবং বেশ কয়েকখানি উপন্যাস। ছোটগল্পের সংকলন 'চেনা মানুষের নকশা' ও 'মর্ত্যের মৃত্তিকা' নামে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয় পঞ্চাশের দশকেই। এই নীরব, নিস্পৃহ মানুষটি তাঁর সৃষ্টিশীল ভূমিকার মধ্য দিয়েই সেদিন প্রগতি-সাহিত্য-শিবিরে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিলেন।

আমি পূর্বেই বলেছি, অমলবাবু ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। তাঁর বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু মন বাংলা ভাষায় সার্থক বিজ্ঞান গ্রন্থের অভাব দেখে বেদনা অনুভব করত। এই অভাব দূর করার জন্য তিনি লিখলেন, 'মহাকাশের ঠিকানা', 'পৃথিবীর ঠিকানা', 'মানুষের ঠিকানা' এবং মৃত্যুর মাত্র কিছুকাল পূর্বে নক্ষত্র-যুদ্ধের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। বিজ্ঞানের এই বইগুলি বাংলাভাষায় রচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে আজও শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তাঁর আর একটি স্মরণীয় গ্রন্থ কার্লমার্কস-এর জীবনী।

এইসব কাজের ফাঁকে অমলবাবু অনেকগুলি রুশ উপন্যাসের অনুবাদও করেছেন। গোর্কির স্মৃতিকথা 'মাই চাইল্ডহুড' বইখানি 'আমার ছেলেবেলা' নামে অমল দাশগুপ্ত অনুবাদ করেছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, ১৯৫৫ সালে।

সম্ভবত, ষাটের দশকের কোনো এক সময় অমলবাবু কলকাতায় অবস্থিত জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত একটি তথ্য-পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় এককভাবে এই তথ্য-পত্রিকা তিনি যেভাবে পরিচালনা করতেন সত্যিই তা উল্লেখযোগ্য। কলকাতা থেকে জি. ডি. আর-এর দূতবাসটি উঠে গেলে অমলবাবু সত্তরের দশকের কোনো এক সময়ে যোগ দেন সোভিয়েত দূতাবাসের কলকাতাস্থ তথ্য-দপ্তরে অনুবাদক রূপে। এখান থেকেই মৃত্যুর বছর খানেক আগে তিনি অবসর নিয়েছিলেন।

'পরিচয়' পত্রিকার তিনি ছিলেন কর্মী ও লেখক। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চীন-ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষ শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টির উপর যখন নেমে আসে দমননীতির স্টীম রোলার, যখন কোনো তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'ডাইনি খোঁজা'-র অভিযান শুরু করে 'শিল্পীর স্বাধীনতা-'র নামে সন্ত্রাসমূলক কাজে উস্‌কানী দিচ্ছে, সেই সময় 'পরিচয়'-পরিচালকদের অনেকে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন এবং একজন বিশিষ্ট তরুণ কর্মী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে যান। এই ভয়ঙ্কর সংকট মুহূর্তে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশনা যখন বন্ধ হতে চলেছে তখন ভীরুতার মুখে লাথি মেরে যে-নীরব কর্মী 'পরিচয়'-এর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন—তিনি আর কেউ নন, অমল দাশগুপ্ত। তাঁরই অনুরোধে আমি 'পরিচয়' প্রকাশনার কাজে সেই দুর্দিনে কিছুকাল সহযোগিতা করেছিলাম বলে কথাটা মনে এমন করে গেঁথে আছে মনে।

সত্যিই এমন নীরব কর্মী আমি আর দেখিনি। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল সহবাস করেছেন। কোনো সভা-সমিতিতে আজকের কোনো তরুণ লেখক শিল্পী কিংবা বুদ্ধিজীবী উপস্থিত থাকলে দেখেছি, তাঁদের অনেকেই মঞ্চে বসার জন্য প্রায় ঠেলাঠেলি করতে থাকেন, কিন্তু অমল দাশগুপ্তকে দেখেছি সব চেয়ে পিছনের সারিতে চুপচাপ বসে থাকতে। ব্যক্তিজীবনে তাঁর এই নির্লিপ্তি তাঁকে অন্য দশজন থেকে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব দান করেছিল।

অথচ দুঃখ ও ক্ষোভের কথা, এমন প্রতিভাবান ও গুণী মানুষটিকেও আমরা ইদানীং ভালোবেসে, যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে কাছে টেনে নিতে পারিনি। এসব কথা বলে আজ হয়তো আর কোনো লাভ নেই। অমল দাশগুপ্ত-র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সময় নতুন প্রজন্মের প্রগতিশীল বন্ধুরা ভবিষ্যতে এই বিস্মরণকে যেন আর ঘটতে না দেন, এটাই আমার আবেদন।

ধনঞ্জয় দাশ

রণধীর দাশগুপ্ত : পবিত্রতার যোদ্ধা

এই পৃথিবীতে খুব কম মানুষই সার্থকনামা হন, নাম তো কেউ নিজে বেছে নেয় না, পারতপক্ষে। রণধীর দাশগুপ্ত ছিলেন সেই কমসংখ্যক মানুষদের একজন। যুদ্ধে তাঁর অরুচি ছিল না, মানুষের সপক্ষে যুদ্ধে, নানা ক্ষেত্রে নানা চেহারার যুদ্ধে। এবং কোনো যুদ্ধের পরিস্থিতিই তাঁর স্থৈর্য এবং রসবোধকে পরাস্ত করতে পারত না, তাঁর মানসিক স্থিরতা, গভীর করে সমস্যাকে দেখার ও বিচার করার ক্ষমতায় কামড় বসাতে পারত না। রণে এবং জীবনে অবিচলিত এবং ধীরই থাকতেন তিনি এবং জীবনও তাঁর কাছে ছিল একরকমের যুদ্ধই। অথচ সব অবস্থাতেই মজা খোঁজার, মজা করার ও পাওয়ার ব্যাপারটা ছিল তাঁর চরিত্রে স্বতঃস্ফূর্ত। স্বভাবে এটা না থাকলে কেউ বোধহয় রণক্ষেত্রে এতো দীর্ঘকাল টিঁকে থাকতে পারে না। রণধীর প্রথম বন্দুক হাতে নিয়েছিলেন, আক্ষরিক অর্থেই, ১৯৩০ সালে, চট্টগ্রামের যুদ্ধে। সে বন্দুক কলম হয়ে তাঁর হাত থেকে নামল এই নভেম্বরের এক ভোরবেলা, কুড়ি তারিখে, প্রায় ছয় দশক পরে, তাঁর মৃত্যুতে। বোঝা গেল, তাঁকে হারাতে পারে এমন যোদ্ধা আর কেউ ছিল না, মৃত্যু ছাড়া।

আবার মৃত্যুও সহজে পায় নি তাঁকে, বারবার ফিরে যেতে হয়েছে তাকে, হার মেনে। সূর্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল করার সময় অথবা জালালাবাদের যুদ্ধেই মৃত্যু তাঁকে হারিয়ে দিতে পারত। কিংবা দেশভাগের পর আত্মগোপন করে পার্টির কাজ করার সময় চট্টগ্রামের সেই কুখ্যাত দাঙ্গাকারীর আঘাত তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারত জীবনের কাছ থেকে। অথবা তারও পরে খিদিরপুরে মালিকের গুণ্ডার আক্রমণ তাঁকে পাকাপাকিভাবে সরিয়ে দিতে পারত রণক্ষেত্র থেকে। পারে নি। নিয়েছিল মাত্রই দৃষ্টিশক্তির খানিকটা। তাঁর কাছে মাত্রই। এসব কথা তিনি খানিকটা মজা করেই বলতেন যেন, ভাবতে গিয়ে মজা পেতেনও হয়তো, কারণ তাঁর স্বভাবে ভান করার ব্যাপারটা, গৌরব অথবা বিনয়ের ভান, প্রায় ছিলই না, যা আমাদের সবারই থাকে, কমবেশি। বরং আত্মগৌরব প্রচার এবং অহমিকা বোধের মতো মাঝারি স্তরের ব্যাপারে তিনি যেন খানিকটা 'বোতাম খোলা'ই ছিলেন (ধুতি পরা কখনো দেখি নি তাঁকে)।

সামান্য কিছু করেই কতো ঢাক আমরা পেটাই সেই করার ইতিহাসটুকুকে আরো বড় করে তোলার জন্যে। সেই খেলায় ছিলেন না রণধীর দাশগুপ্ত। চাপা দুঃখ নিয়ে, এবং খানিকটা লজ্জাও, কতো স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দেখি সেদিনের কথার বাদাম ভেঙে যাচ্ছেন নিরলস। রণধীর দাশগুপ্ত সে দলেও

ছিলেন না। পেছনে তাকিয়ে হাঁটায় যেন রুচি ছিল না তাঁর। ছোট চেহারার মানুষটি ঘাড় টান করে সামনে তাকিয়ে চলতেই ভালোবাসতেন। সামনে কী আছে, কাল কী হবে, আগামী মাসে, আগামী বছর, আগামী যুগে, তাই ছিল তাঁর মগ্নতার বিষয়। এবং তা নিয়ে শুধু ভাবা এবং পড়া এবং বলা নয়, করাও, কিছু না কিছু করাও ছিল তাঁর ব্রত। অনেক পড়েছেন তিনি, লিখেছেনও কম নয়, কিন্তু প্রথাগত অর্থে তাঁকে ইনটেলেকচুয়াল বলে মনে হতো না কখনো। এর একটা কারণ ছিল তাঁর স্বভাবে, ভানহীন, কপট গাম্ভীর্যহীন, সহজ সরল আচরণে, যে আচরণ শিক্ষিত অশিক্ষিত সব সহযাত্রী এবং মানুষকেই সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব দিত। আর একটা কারণ ছিল তাঁর লেনিনীয় চেতনায়, শুধু ভাবা, পড়া, জানাতেই শেষ হতো না তাঁর কোনো প্রয়াস। সবকিছুর পর এবং সবার ওপরে কিছু করাতে বিশ্বাস ছিল তাঁর। জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ, কর্মের ভিত্তিতে জ্ঞান। এ নিয়েও বেশি কথা বলতেন না তিনি, যেন ধরেই নিতেন, এমনিই তো হওয়ার কথা, কমিউনিস্টরা তো এমনিই হয়।

অথচ গৌরব করার মতো ইতিহাস ছিল তাঁর। একদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল (মাত্র পনেরো বছরের কিশোর তিনি তখন), জালালাবাদের যুদ্ধ, আন্দামানে বন্দীদশায় বছরের পর বছর, (সেখানেই তাঁর কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষা), ১৯৩৯-এর বিখ্যাত ধাঙড় ধর্মঘটে নেতৃত্বদান, পূর্ব পাকিস্তানের পার্টিতে হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে কাজ করে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে পবিত্রতা রক্ষার লড়াই-এ অবিচল সংগ্রাম করে যাওয়া, পঁচিশ বছর ধরে, একনাগাড়ে, 'মূল্যায়নে'র অন্যতম প্রধান পরিচালক হিসাবে শুধু নয়, কমিউনিস্ট আন্দোলনের নানা প্রশ্নে ভেতরে-বাইরে ক্রমাগত বলা এবং লেখার কাজেও তিনি ছিলেন অক্লান্ত, এই বয়সেও। পার্টি ভেঙে যাওয়া, তারপর খানখান হয়ে যাওয়া শুধু তাঁর বুদ্ধিভিত্তিক চেতনায় কষ্টের বিচলন আনত না, খুব ব্যক্তিগতভাবেও যন্ত্রণা অনুভব করতেন তিনি। কমিউনিস্ট ঐক্য তাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঐকান্তিক সাধনা। তবে তিনি যাহোক করে ঐক্য চাইতেন না। এখানেই ছিল তাঁর সাধনার পবিত্রতা। মতাদর্শের প্রশ্নটি ছিল তাঁর কাছে মৌলিক, প্রায় আত্মার মতো। যে কোনো সাময়িক এবং ছোটখাট ব্যাপারও তিনি মতাদর্শের প্রেক্ষাপট ছাড়া ভাবতে, বিচার করতে রাজি হতেন না। জেটযুগের 'কমিউনিস্ট'দের কাছে তা হয়তো 'বোরিংলি ট্র্যাডিশনাল' বলে ঠেকত কখনো কখনো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনমনীয়। গত এক দশকের ওপর মতাদর্শের প্রশ্নেই মগ্ন ছিলেন তিনি, লেখায়, পড়ায় এবং আলোচনায়। তিনি এবং তাঁরই মতো কিছু সহযোদ্ধা গত দশ বছর ধরে যেসব প্রশ্ন নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামিয়েছেন, বলেছেন, লিখেছেন, তার কয়েকটি এবারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে আসবে বলে শোনা যায়। এটা কম কথা নয়, কম বড় জয় নয়। দুঃখ শুধু মতাদর্শের সেই রণে রণধীর থাকবেন না। তবু থাকবেন, কারণ এ তো তাঁর জয়ই।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

লেখকের নিবেদন

সম্পাদক, পরিচয়

সমীপেষু,

শারদীয় 'পরিচয়' (১৯৮৮)-এ "ব্রহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্ত" প্রবন্ধে কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন করার আছে।

১। পৃ. ১৮ ও ২৮-এ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র লেখা থেকে যে দুটি উদ্ধৃতি আছে তার উৎস হবে বলাই দেবশর্মার 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' (কলকাতা : প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ১৩৬৮) গ্রন্থের ভূপেন্দ্রনাথ-রচিত ভূমিকা। পৃ. ২৯ ও ৩১-এ টীকা ৫ ও ৪৪-এ ভুলক্রমে হরিদাস মুখোপাধ্যায়-উমা মুখোপাধ্যায়ের ব্রহ্মবান্ধব বিষয়ক বই-এর নাম দেওয়া আছে (এই বই-এরও ভূমিকা লিখেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ)।

২। ব্রহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। 'দ লাইট অফ দি ইস্ট' (বর্ষ ও সংখ্যা ১২, নভেম্বর ১৯২২)-এ ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ সামাধ্যায়ীকেই 'অফিসিয়েটিং পণ্ডিত' বলে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৩), যদিও 'স্বামী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' (কলকাতা, ১৯০৮) ও 'দ ব্লেড'-এ নামটি দেওয়া নেই। প্রসঙ্গত বলা যায়, ব্রহ্মবান্ধবের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়েছিল কালীঘাটে। সেই বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধেরও জোগাড় করেছিলেন মোক্ষদাচরণ।

৩। অধ্যক্ষ অহিভূষণ ভট্টাচার্য (বারাণসী) জানিয়েছেন, পঞ্চানন তর্করত্নের তিন পুত্র ছিলেন শ্রীজীব, সুজীব ও সঞ্জীব। সুতরাং পৃ. ২২ তৃতীয় অনুচ্ছেদে সুজীব দেবশর্মা নামটিতে কোন ভুল নেই।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আমাদের সদ্যপ্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই

দেশ কাল সমাজ

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে লেখক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গভীর সমস্যাসংকুল বর্তমান দেশ, কাল ও সমাজের মানুষকে সতর্ক করেছেন নির্ভীক কণ্ঠে — ২৫.০০

ইতিহাস অনুসন্ধান ৩—গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী) — ১১০.০০

উনিশশতক—ভাব-সংঘাত ও সমন্বয় রাখালচন্দ্র নাথ — ৩৬.০০

মধ্যযুগের ভারত—অনিরুদ্ধ রায় সম্পাদিত

লেখকগণ : সৈয়দ নুরুল হাসান, গৌতম ভদ্র, অমীন দাশগুপ্ত ও অনিরুদ্ধ রায় — ১৫.০০

বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)
—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় — ৪০.০০

ভারতের সামন্ততন্ত্র (চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)
—রামশরণ শর্মা — ৩৬.০০

আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ—বিপিন চন্দ্র — (যন্ত্রস্থ)

History of English Press in Bengal : 1780-1857
M. K. Chanda — 168.00

Three View of Europe from Nineteenth Century
Bengal—Tapan Raychaudhury — 15.00

The Mauryas Revisited—Romila Thapar — 25.00

An Indian Historiography of India : A Nineteenth
Century Agenda and its Implications
—Ranajit Guha — 30.00

The Indian Nation in 1942
Gyanendra Pandey (Editor) — 130.00

K. P. Bagchi & Company

286 B. B. Ganguli Street, Calcutta-700012

PARICHAYA NOVEMBER 1988 Reg. No 13732
WB/EC—265

মনীষার বই প্রসারিত করে জাতীয় আন্তর্জাতিক চেতনার দিগন্ত

২য় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত
মূল রুশ ভাষা থেকে অনূদিত
বিশ্বে সাড়া জাগানো বই
সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রধান
মিখাইল সের্গেইভিচ গোর্বাচেভের
পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন ভাবনা
আমাদের দেশ ও সমগ্র বিশ্ব

দাম : শোভন সংস্করণ ৫০·০০ টাকা
সুলভ সংস্করণ ৩০·০০ টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

15 DEC 1988

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : তিন টাকা

পরিচয়

পরিচয়

৫৮ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৮৮ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫

প্রচ্ছদ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক নবায়নের প্রতিশ্রুতি ও সমস্যা

রণজিৎ দাশগুপ্ত

১৯৮৫র মার্চে মিখাইল গোরবাচভ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। তার পরবর্তী স্বল্প সময়ে সোভিয়েত অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজে অতি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের এক প্রক্রিয়া প্রবলভাবে কাজ করছে। সারা দেশ জুড়ে একটা নতুন অনভ্যস্ত জীবনের স্বাদ নেওয়ার জন্য তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। সোভিয়েত পার্টির উনবিংশ সম্মেলনে গোরবাচভের ভাষণে এই প্রক্রিয়াকে "বৈপ্লবিক নবায়ন" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত সমাজে বর্তমানে কোনো বৈরীসম্পর্কবিশিষ্ট শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। ফলে এই রকম কোনো শ্রেণীর অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ধ্বংস সাধনের কথা আদপেই ওঠে না। তথাপি গোরবাচভের নানা উক্তিতে কিংবা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দলিল ইত্যাদিতে 'বিপ্লব' বা 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'-এর কথা বিশেষ জোর দিয়ে কেন বলা হচ্ছে? যে পরিবর্তন-প্রক্রিয়া চলছে তার তাৎপর্য কি? পেরেস্ত্রোইকা বা পুনর্গঠনের অন্তর্বস্তু কী? গ্লাসনস্ত বা খোলামেলার নীতি বলতে কী বোঝাচ্ছে? এসবের গতিমুখ কোন্ দিকে? সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরেও সমাজতন্ত্র ও মানব সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া কী অর্থ ও তাৎপর্য বহন করছে?

বলা বাহুল্য যে, এই প্রক্রিয়ার নানা দিক বা আয়তন। গোরবাচভ বলেছেন, পেরেস্ত্রোইকা শব্দটির "অনেক অর্থ" (পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন ভাবনা, মনীষা গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ, পৃঃ ২৯)। উনবিংশ সম্মেলনে বলা হয়েছে, এটি একটি "পরস্পরবিরোধী, জটিল ও কঠিন প্রক্রিয়া" (ডকুমেন্টস অ্যাণ্ড মেটিরিয়ালস, পৃঃ ১২০)। এই প্রক্রিয়ার অনেক দিকের বিষয়ে যথেষ্ট স্পষ্টতা নেই। অনেক কিছু আমাদের জানাও নেই। আবার, এই প্রক্রিয়ার বিকাশ পথে অনেক নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিচ্ছে। স্পষ্টতই পেরেস্ত্রোইকার সব দিক বা আয়তনের বিশদ ও উপযুক্ত আলোচনা এই লেখার পরিসরে সম্ভব

নয়। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, সে আলোচনা করার মত যোগ্যতাও বর্তমান লেখকের নেই।

এই লেখার উদ্দেশ্য সীমিত। যে প্রক্রিয়া নিয়ে সোভিয়েত সমাজ গভীর-ভাবে আলোড়িত এবং যে প্রক্রিয়া সম্পর্কে দেশে-বিদেশে অনেকে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়ার কয়েকটি দিক বোঝার প্রয়াস হিসেবে এই লেখার সূত্রপাত। স্বভাবতই এখানে যা বলা হচ্ছে তা বেশ কিছুটা প্রাথমিক প্রকৃতির, চূড়ান্ত কিছু নয়।

দুই

সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন প্রক্রিয়া চলেছে তার স্বতন্ত্র কিন্তু অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট দুটি প্রধান আয়তন হল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সংস্কার এবং রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস (অবশ্য বলে রাখা ভাল যে, এই দুটি ছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়তন রয়েছে।) কিন্তু কেন এই পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস? দীর্ঘকাল ধরে সোভিয়েতের শুভার্থী ও মার্কসবাদী মহলের ব্যাপক অংশের ধারণা ছিল যে, সমাজতন্ত্রের বিকাশ মসৃণ, ত্রুটিহীন, সমস্যামুক্ত বিরোধিতা-রহিত। সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে অসঙ্গতি, গুরুতর বিরোধ ও প্রায়-সংকট-এর পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে একথা মার্কসবাদীদের অনেকের কাছেই গ্রাহ্য ছিল না। ১৯৩৬-এ সমাজতন্ত্রের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে স্তালিন ঘোষণা করলেন। স্তালিনের জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ পার্টি কংগ্রেসে কিংবা স্তালিনের সর্বশেষ রচনা 'ইকনমিক প্রবলেমস অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ. এস. এস. আর'-এও সোভিয়েত সমাজে কোনো গুরুতর সমস্যা ও বিরোধের আভাস ছিল না। স্তালিনীয় ভাষ্য অনুসারে তিরিশ ও চল্লিশের দশক ছিল নিরবচ্ছিন্ন জয় ও অভ্রান্ত পার্টি সিদ্ধান্তের ইতিহাস। এই পর্বে যা কিছু সমস্যা ও ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে, তার মূলে থেকেছে 'লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্র-এর শত্রুদের' কার্যকলাপ।

১৯৫৩র মাঝামাঝি নাগাদ যৌথ খামারীকরণ পরবর্তী সোভিয়েত কৃষির গভীর সমস্যার কথা খ্রুশ্চভ প্রথম খোলাখুলিভাবে বললেন। বিংশ (১৯৫৬) ও দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসে (১৯৬১) সোভিয়েত দেশের রাজনৈতিক জীবনে স্তালিনীয় বিকারের কথা জানানো হল। কিন্তু ঐ দ্বাবিংশ কংগ্রেসেই ঘোষণা করা হল যে, সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় স্তর কমিউনিজম বা সাম্যবাদী সমাজ আগত

প্রায়। ব্রেঝনেভ-এর নেতৃত্বাধীন পর্বের গোড়ার দিকে কিছু ইতিবাচক ব্যবস্থা নিলেও পরে গ্রহণ করা হয় "আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব" (পেরেস্ত্রোইকা, পৃঃ ২৫)। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে কোন জটিল সমস্যা থাকতে পারে অথবা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে—এ রকম ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হল।

কিন্তু সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকেই এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, সোভিয়েত সমাজ ও অর্থনীতির নানা স্তরে বহুবিধ গুরুতর অসঙ্গতি ও সমস্যা ঘনীভূত হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিক বিকাশের একমুখী ধারা নিয়ে যাচ্ছিল অর্থনৈতিক "অচলাবস্থা ও আবদ্ধতার দিকে" (পেরেস্ত্রোইকা, পৃঃ ৯)। আশির দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত দেশের "একটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের দিকে অধোগতি" বা "slide down to an economic and socio-political crisis" (ডকুমেণ্টস, পৃঃ ১১৯) স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরিবেশ বা environment-এর অবগতি থেকে শুরু করে জাতি-সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা এই সংকটেরই ভুটি ভিন্ন লক্ষণ। 'সমস্যা-রহিত' ভাবে বাস্তবতাকে দেখানোর ফল হল বিপরীত—"কথা ও কাজের ফারাক" জনগণকে করে তুলল "উদাসীন ও ঘোষিত শ্লোগানে অবিশ্বাসী" (পেরেস্ত্রোইকা, পৃঃ ১০)। এইভাবে সোভিয়েত জনসাধারণের "মতাদর্শগত ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্রমক্ষয়" (ঐ, পৃঃ ১০) ঘটতে শুরু করেছিল। মদ্যপান, ড্রাগ-আসক্তি, অপরাধ-প্রবণতা, ভোগসর্বস্ব মনোভাব বা 'কনজিউমারিজম', ডলার বা 'হার্ড কারেন্সি'র জন্য লোভ ইত্যাদি হল নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের নানাবিধ প্রকাশ। জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে ধর্মভাবের যে প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তাও সম্ভবত এক মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক শূন্যতার অভিব্যক্তি। পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত হচ্ছে এই প্রাক-সংকট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা করার কর্মসূচী।

প্রাক্-সংকটের পরিস্থিতি কেন দেখা দিয়েছে? উনবিংশ সম্মেলনে গোরবাচভের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "First and foremost...it is a fact...that at a certain stage the political system established as a result of the October revolution underment serious deformations. This made possible the omnipotence of Stalin and his entourage, and the wave of represive

measures and lawnerness. The command methods of administration that arose in those years had a dire effect on various aspects of the development of our society. Rooted in that system are many of the difficulties that we experience today" (ডকুমেন্টস, পৃঃ ৩৮৯)। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই বিশ্লেষণে নজরটা স্তালিনের ব্যক্তিগত ত্রুটি ও দোষাবলীর ওপর নয়; নজরটা হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকার বা deformation এবং হুকুমভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর। এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে জমে উঠতে থাকা সমস্যাবলীর মূল সম্পর্কে এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও অতীতের মূল্যায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ আয়তন।

তিন

ওপরে যা বলা হল তার থেকে এরকম অর্থ করাটা গুরুতর ভ্রান্তি ও অসঙ্গত হবে যে, সোভিয়েত সমাজ ও অর্থনীতির এই সমস্যাবলী সমাজতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অথবা এগুলি প্রমাণ করছে যে, মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র কাজ করতে পারে না। মার্কসবাদের বিরোধীদের একাংশ এরকম কথা বলছেও। কিন্তু ১৯১৭র নভেম্বর বিপ্লবের পর সম্পত্তির মালিকানার ধনতান্ত্রিক ও শোষণভিত্তিক সম্পর্কের অবসান ঘটেছে। পরবর্তী দশকগুলিতে সোভিয়েত অর্থনীতির প্রচণ্ড বিকাশ ও গতিময়তা তর্কাতীতভাবে দেখিয়েছে যে, সমাজতন্ত্র—মার্কসীয় সমাজতন্ত্র—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী গভীর পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। দেখিয়েছে যে, মার্কসীয় সমাজতন্ত্র কাজ করে। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনেও সমাজতন্ত্রের কীর্তি তর্কাতীত। একথা ঠিক যে, সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার অর্থাৎ অপ্রাচুর্য ও সম্পদের যুক্তিসম্মত বরাদ্দ স্থিরীকরণ সমস্যার অবসান ঘটে নি। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অন্যতম মূলগত বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির মালিকানার এমন একটি বৈশিষ্ট্য যাতে সমগ্র সমাজ উৎপাদনের উপায়গুলি (means of production) প্রকৃতই নিয়ন্ত্রণ করে এবং এগুলির ব্যবহার থেকে উপকৃত হয়। আর একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য হল সমাজের এবং সামাজিক যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

সচেতন হস্তক্ষেপ। কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এই হস্তক্ষেপের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলি সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমান।

অবশ্য সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ধারাপথে অনেক রকমের নতুন নতুন সমস্যা উত্থিত হয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র কাজ করে কিনা—এটা এখনকার প্রশ্ন নয়। ইতিহাস যে প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর দিয়েছে। এখনকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—নতুন যে সব সমস্যা বা challenge দেখা দিয়েছে সমাজতন্ত্র সে সবের প্রাসঙ্গিক, অর্থবহ ও সুসঙ্গত সমাধানে সমর্থ কিনা। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সংস্কারের কর্মসূচী জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংস্কারসাধনের প্রয়াস অবশ্য নতুন নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সত্তর বছরে, পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ে এবং চীনেও সংস্কারের জন্য নানারকমের উদ্যোগ বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়েছে। এই সব সংস্কার প্রয়াসের মধ্যে বিশেষ, কারুর কারুর মতে সব থেকে, উল্লেখযোগ্য হল হাঙ্গেরির নিদর্শন। এখানে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে বাজারের শক্তির অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত এবং দাম ব্যবস্থাকে যুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ দেখা গিয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ায় পরিকল্পনা ও বাজারের মিশ্রণের সঙ্গে চালু করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের স্ব-ব্যবস্থাপনা। or workers' self-management। ১৯৭৮ সাল থেকে নানা টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে চীনেও চলেছে ব্যাপক সংস্কার প্রয়াস। সোভিয়েত ইউনিয়নে 'ওয়ার কমিউনিজম'-এর (১৯১৮-২০) পর লেনিনের উদ্যোগে যে নতুন অর্থনৈতিক নীতি বা 'নেপ' প্রবর্তন করা হয়েছিল সেটিও ছিল সুদূরপ্রসারী সংস্কার।

আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে যা বিশেষ লক্ষণীয় তা হল এই সব সংস্কার প্রয়াসকেই কম-বেশি খুব কঠোরভাবে গণ্ডিবদ্ধ রাখা হয়েছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় আলেকজাণ্ডার ডুবচেকের সংস্কার প্রয়াস ভিন্ন অন্য সব কয়টি ক্ষেত্রেই চেষ্টাটা হয়েছে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ও অক্ষুন্ন রেখে শুধুমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের। হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া বা হালে চীনের অভিজ্ঞতাতে দেখা যাচ্ছে যে, এ রকমের অ-রাজনৈতিক সংস্কার সম্ভব। (অবশ্য এ সব সংস্কার বা পুনর্গঠন স্থায়ী হবে কিনা—সে নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মনে জিজ্ঞাসা রয়েছে।) কিন্তু এ সবের তুলনায় বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে যা ঘটছে তার রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য। এই সংস্কার প্রয়াসের অনন্যতা ও মৌলিকত্ব হল একই সঙ্গে

রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও গণতন্ত্রীকরণ এবং ওপরতলা থেকে হুকুমভিত্তিক পরিকল্পনা ও 'কম্যাণ্ড ইকনমি'র পরিবর্তন করে অর্থ-পণ্যব্যবস্থার ওপরে গুরুত্ব আরোপ। এখানেই রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়াতে হালের সংস্কার কর্মপন্থার অন্যতম বৈপ্লবিক আয়তন ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য। অনেক আলোচনাতে কিন্তু এই দুটি দিকের অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের দ্বান্দ্বিক ও পারস্পরিক প্রভাববিস্তারকারী সম্পর্ককে উপেক্ষা করে একপেশেভাবে জোর দেয়া হচ্ছে কোনো একটি দিকের ওপর। তাতে বর্তমান সংস্কার প্রয়াসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, বিপুল সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি অনেকাংশে আড়ালে পরে যাচ্ছে বা এমন কি হারিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন যে বর্তমান সোভিয়েত সংস্কার প্রয়াসের অন্যতম প্রধান অঙ্গ তা ওপরে বলা হয়েছে। এর ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি কী? 'ওয়ার কমিউনিজম'-এর পর লেনিনের চেষ্টা ছিল জোরজবরদস্তি না করে কৃষকদের সমাজতন্ত্রের পক্ষে নিয়ে এসে সমবায় প্রথা ও শ্রমিক-কৃষকের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী বা 'স্মিচকা'র ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে ও দ্রুত শিল্পবিকাশ ঘটাতে। তাঁর সর্বশেষ লেখাগুলিতে, বিশেষত 'অন কো-অপারেশন' (On Co-operation) এবং 'বেটার ফিউয়ার, বাট বেটার' (Better Fewer, But Better) লেখাদুটিতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর কি ভাবে ঘটবে তার একটা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, আর এগুলিতে জোর দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক পদ্ধতির ওপর।

লেনিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে, বিশেষত ট্রটস্কি, প্রিয়োব্রাঝেনস্কি, স্তালিন ও বুখারিনের মধ্যে বিতর্ক চলছিল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পবিকাশ এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ ও পন্থা নিয়ে। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সালে স্তালিন কার্যত সমস্ত বিতর্ক বন্ধ করে দিয়ে কুলাক বা ধনী কৃষকদের প্রতিরোধ অতিক্রম করার নাম করে সমগ্র কৃষক সমাজকে পঙ্গু করে নির্মম জবরদস্তির ভিত্তিতে কৃষির যৌথায়ন বা collectivisation এবং সেই সঙ্গেই ভারী শিল্পভিত্তিক দ্রুত শিল্পায়ণের কার্যক্রম চালু করলেন। কৃষির থেকে সম্পদ সংগ্রহ ও শিল্প বিকাশের প্রশ্নে অবশ্য অনেক জটিলতা ছিল। যে কার্যক্রম স্তালিনের নেতৃত্বে গৃহীত ও অনুসৃত হল তা অনিবার্য ছিল কিনা—এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সোভিয়েতের সাম্প্রতিক আলোচনায় এ প্রশ্ন নতুন করে উঠেছে। নভেম্বর বিপ্লবের ৭০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে গত বছরের ২রা নভেম্বরে মস্কোয় অনুষ্ঠিত

উৎসব সভায় গোরবাচভ তাঁর 'অক্টোবর রেভল্যুশন অ্যাণ্ড পেরেস্ত্রোইকা : দি রেভল্যুশন কনটিনিউজ' শীর্ষক রিপোর্টে (সোভিয়েত রিভিউ নভেম্বর ৫, ১৯৮৭) যৌথায়ন ও শিল্পায়নের বিষয়ে ১৯২৯-এর সিদ্ধান্তগুলি ঠিক ছিল বলে জানিয়েছেন (ঐ, পৃঃ ১৫-১৯)। এই সঙ্গেই তিনি নেতিবাচক দিকগুলির কথা বলেছেন। যৌথায়নের প্রসঙ্গে ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, "there was a departure from Lenin's policy towards the peasantry" (ঐ, পৃঃ ১৯)। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, "This most important and very complex social process···was directed by predominantly administrative methods···Flagrant violations of the principle of collectivisation occurred everywhere" (পৃঃ ১৯)।

সন্দেহ নেই যে, ঐ রিপোর্টেই যৌথায়ন ও শিল্পায়ন প্রসঙ্গে সোভিয়েত নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত সব থেকে ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ রিপোর্টের মূল্যায়ন, বিশেষত যৌথায়নের সিদ্ধান্তের নির্ভুলতার বিষয়ে মূল্যায়ন কি সোভিয়েত নেতৃত্বের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন? এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করে এখানে যে কথাটা বলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ১৯২৯-এর পর কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলেছে ওপরতলা থেকে প্রশাসনিক হুকুমের ভিত্তিতে পরিচালিত 'কম্যাণ্ড ইকনমি'। সমগ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা হয়ে পড়েছিল অতিরিক্ত মাত্রায় কেন্দ্রীভূত (ঐ, পৃঃ ১৮)। পরিকল্পনা রূপায়ণে অগ্রগতির নির্দেশক ছিল ওপর থেকে নির্ধারিত পরিমাণগত লক্ষ্য পূরণ। একটা পর্যায় পর্যন্ত একটি পশ্চাৎপদ অর্থনীতির বিকাশ ও শিল্পায়নে প্রশাসনিক নির্দেশের ভিত্তিতে পরিচালনা উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দিয়েছিল। কিন্তু সমস্যা ও অসাফল্যও নেহাৎ কম ছিল না। এমন কি ঐ গোড়ার পর্বেই অর্থাৎ তিরিশের দশকে অর্থনীতির নানা শাখার মধ্যে এমন ভারসাম্যহীনতা (যেমন, ভারী শিল্প ও ভোগ্য পণ্যের শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা) দেখা দিয়েছিল যার জের এখনও পুরোপুরি মেটে নি।

পরবর্তীকালে অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, উৎপন্ন সামগ্রীর সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে, সোভিয়েত জনসাধারণের চাহিদার ধরনে পরিবর্তন এসেছে, উৎপন্ন সামগ্রীর বৈচিত্র্য ও গুণগত মানের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায়, আমলা-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও প্রশাসনিক নির্দেশ দিয়ে এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান

করা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ে। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শিল্পজাত সামগ্রীর সংখ্যা কয়েক লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। 'কম্যাণ্ড ইকনমি'র অর্থ হল এই কয়েক লক্ষ সামগ্রীর প্রত্যেকটি কি পরিমাণে, কোথায়, কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে উৎপন্ন হবে, প্রত্যেকটি সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ বা 'ইনপুট' কোন্ সংস্থার থেকে কি পরিমাণে ও কি দামে সংগ্রহ করতে হবে—এসব প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ওপর থেকে স্থির করে দেয়া হত। ফলত সমস্যাগুলি হয়ে পড়ে বিশাল ও দুঃসমাধেয়।

এই 'কম্যাণ্ড ইকনমি'র অন্য নেতিবাচক দিকও দেখা দেয়। যে কোনো স্তরেই সাফল্যের মাপকাঠি যেহেতু পারিমাণগত লক্ষ্য পূরণ করা, একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে শ্রমিক-কর্মচারী পর্যন্ত সকলেরই উদ্দেশ্য হল যে কোনো মূল্যে ঐ নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছানো। নির্ধারিত জোড়া জুতো উৎপাদন করতে হবে—সুতরাং জুতো পায়ে দিয়ে আরাম না হলেও বা ক্রেতাদের পছন্দসই না হলেও বা মজবুত না হলেও লক্ষ্য অনুসারে জুতো উৎপাদন করলেই পরিকল্পনার সাফল্য। আবার, এরকম ক্ষেত্রে উৎপাদন উপকরণের ব্যবহারে ঘটেছে বিপুল অপচয়। নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে নির্দিষ্ট স্কোয়ার মিটারের গৃহ নির্মাণ করতে হবে। সুতরাং সিমেণ্ট, লোহা-লক্কর, অন্যান্য মাল-মশলা যাই লাগুক না কেন—যথা সত্বর সম্ভব ঐ স্কোয়ার মিটারের লক্ষ্য পূরণ করাটাই নির্মাতাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। স্পষ্টতই কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও 'কম্যাণ্ড ইকনমি' সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের পথে গুরুতর অন্তরায় হিশেবে দেখা দেয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ কোসিগিনের উদ্যোগে চেষ্টা হয় পরিকল্পনা ব্যবস্থায় অন্তত কিছুটা নমনীয়তা নিয়ে আসার এবং প্রশাসনিক নির্দেশের বদলে সীমাবদ্ধভাবে হলে পরেও দাম ব্যবস্থার বা বাজরের শক্তির তৎপরতার ক্ষেত্রেকে কিছুটা প্রসারিত করার। কিন্তু কোসিগিনের সংস্কার প্রয়াস বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

জবরদস্তি করে কৃষকদের যৌথায়ন যে কৃষির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে—একথা আগে বলা হয়েছে। স্তালিনের মৃত্যুর পর ধীরে এবং কিছুটা খাপছাড়াভাবে হলে পরেও রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার-বহির্ভূত ক্ষেত্র অর্থাৎ যৌথ খামারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চাষকে প্রসারিত করার এবং নানা রূপে কৃষির পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা করা হয়। সে সব প্রয়াসের বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে এখানে এটুকু বলা যায় যে, কৃষি অর্থনীতির গুরুতর সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান হয় নি।

এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে এবং নানা নেতিবাচক উপাদান জমতে থাকে। তথাপি অনেক দিন পর্যন্ত এসব কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া চলতে থাকে। ফলস্বরূপ আশির দশকের গোড়ায় সোভিয়েত অর্থনীতি ও সমাজ প্রাক্-সংকটের স্তরে পৌঁছে যায়।

এই অংশটি শেষ করার আগে বিশেষ জরুরি হল একথাটা বলা যে, প্রশাসনিক-হুকুমভিত্তিক ব্যবস্থার গুরুতর পরিণাম শুধুমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এই ব্যবস্থা দেশের সমগ্র সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশকে ব্যাহত করে। গোরবাচভ তাঁর 'অক্টোবর রেভল্যুশন অ্যাণ্ড পেরেস্ত্রোইকা' রিপোর্টে এই দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

চার

ওপরে উল্লিখিত পটভূমিতে 'পেরেস্ত্রোইকা' বা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে কেন্দ্রীয় শ্লোগান হিশেবে উপস্থিত করা হয়। ১৯৮৫র মার্চে গোরবাচভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঐ বছরেরই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জমে ওঠা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি এবং করণীয় কাজ সম্পর্কে খোলাখুলি বিশদ আলোচনা হয় ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারপর 'পেরেস্ত্রোইকা'র ধারণাকে স্পষ্টতা দেওয়া হয়েছে, এই ধারণা ও প্রক্রিয়াকে আরও বিকশিত করা হয়েছে, অভিজ্ঞতার আলোয় 'পেরেস্ত্রোইকা'-র অর্থ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'পেরেস্ত্রোইকা'র গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিশেবে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভিত্তিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যয় কার্যকারিতা বা cost effectiveness এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ত্বরণের ওপর। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশ্নটি পরিকল্পনা ও বাজারের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই সোভিয়েত নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভূমিকার পুনর্বিবেচনায় ব্যাপৃত। বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রা এবং সম্পদের অপরিবর্তনীয় বরাদ্দকরণের (allocation) ভিত্তিতে ওপর থেকে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত মাত্রাতিরিক্ত রকমের কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ব্যবস্থার অবসান ঘটানো,

হচ্ছে। সংস্কার কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মযূথগুলি (work collective) পক্ষ থেকে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা রচনা করার এবং স্ব-শাসনের কাঠামোকে প্রসারিত করার কাজ চালু করা হচ্ছে। জোর দেওয়া হচ্ছে পরিমাণগত সূচকগুলির (indicator) পরিবর্তে গুণমান ও দক্ষতার ওপরে।

এই সংস্কার প্রয়াসের অন্যতম প্রধান উপাদান হল ওপর থেকে অর্থসংস্থানের পরিবর্তে কষ্ট অ্যাকাউন্টিং, স্বয়ম্ভরতা ও নিজেদের তহবিল থেকে নিজেদের কার্যকলাপের জন্য অর্থসংস্থান পদ্ধতির প্রবর্তন। দাম ব্যবস্থার সংস্কার এবং মজুরিকে 'মুনাফা' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য-অসাফল্যের (performance) সূচকের যুক্ত করাটা এই সংস্কার কার্যক্রমের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রচলিত বন্দোবস্তে প্রায় প্রতিটি সামগ্রী ও উপাদানের (input) দাম ছিল ওপর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে অপরিবর্তনীয়ভাবে নির্ধারিত। কোন্ সামগ্রী কতটা উৎপাদন করা হবে কিংবা কোন উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে তার সঙ্গে দামের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই ব্যবস্থায় দাম ছিল নিষ্ক্রিয়। সংস্কার অনুসারে দামের ভূমিকা হবে সক্রিয়। যে সব লেখা পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে মনে হচ্ছে দাম হবে বিভিন্ন রকমের। অনেকগুলি সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম হবে নমনীয়, পরিবর্তনীয়। চাহিদা ও যোগান অনুসারে এসব সামগ্রীর দাম ওঠা-নামা করবে, তবে একটি সর্বোচ্চ সীমা থাকবে। অন্য কতকগুলি সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম হবে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতা বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে। আবার, নির্দিষ্ট কিছু সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম হবে কেন্দ্রীয়ভাবে স্থিরীকৃত। এই বিভিন্ন রকমের দামসম্বলিত দাম ব্যবস্থা ঠিক কি ভাবে কাজ করবে, তার ফলাফল কি হবে কিংবা যে সব সমস্যা দেখা দেবে সে সবের সমাধান কি ভাবে হবে তা অবশ্য খুব পরিষ্কার নয়। এ সব বিষয় নিয়ে সোভিয়েত অর্থনীতিবিদরা আলোচনা করছেন; হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সংস্কার প্রয়াসের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্লেষণ করছেন। মজুরি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপক সংস্কার আনা হচ্ছে। ইতিপূর্বেকার নিম্নতম মূল (basic) মজুরি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থা অনুসারে মজুরি নির্ভর করবে একটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ফলাফলের ওপরে। এই সংস্কারের বিষয়েও বহু প্রশ্ন রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯২৯ থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত অর্থনৈতিক

পরিচালনার ক্ষেত্রে জোরটা ছিল অতিরিক্ত রকমের কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা এবং বাধ্যতামূলকভাবে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও বরাদ্দকরণ ব্যবস্থার ওপরে, প্রচলিত চিন্তাধারায় অর্থনৈতিক পরিচালনার এসব দিক আর সমাজতন্ত্র সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মার্কস ও লেনিনের লেখায় কোনো সমর্থন না থাকলেও এই চিন্তাধারায় বাজারের সক্রিয়তা ও প্রসার এবং উদ্যোগ ও সংস্থাগুলির স্বাধীনতাকে সমাজতন্ত্র ও পরিকল্পনার বিরোধী বলে গণ্য করা হত। এখন যে সব পরিবর্তন ঘটছে তাতে এই চিন্তাধারার থেকে radical departure ঘটছে।

'পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন ভাবনা' বইতে গোরবাচভ বলছেন, লেনিনের প্রবর্তিত 'নেপ'-এর পরে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিষয়ে বর্তমান কর্মসূচী হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপ্লবী অর্থনৈতিক কর্মসূচী। স্পষ্টতই এই কর্মসূচীকে তিনি যৌথায়ন ও শিল্পায়নের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই কর্মসূচীতে ঝোঁকটা হচ্ছে মুখ্যত প্রশাসনিক পদ্ধতি থেকে প্রতি স্তরে মুখ্যত অর্থনৈতিক পরিচালনা পদ্ধতির দিকে। এর ফল হবে পরিচালনার ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণ ও মানবিক উপাদানের অর্থাৎ সোভিয়েত জনসাধারণের সক্রিয়তা। এই সংস্কারের ভিত্তি হচ্ছে প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলির নাটকীয়ভাবে বর্ধিত স্বাধীনতা (পৃঃ ১৮)।

এসব অবশ্য খুবই জটিল বিষয়। এই সব পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কি হবে? যতটা বোঝা যাচ্ছে তাতে বর্তমান সংস্কার প্রয়াসের মানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অবসান নয়। তার মানে এটাও নয় যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকছে না। সে ভূমিকা থাকছে। কিন্তু এখনকার একটি প্রধান সমস্যা হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনা ও বাজার, সচেতন সামাজিক হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তাদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি ও উপযুক্ত অনুপাত বা proportion নির্ধারণ। এসব সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসার ওপরে 'পেরেস্ত্রোইকা'র সাফল্য নির্ভর করছে।

ওপরে যে সব পরিবর্তনের কথা বল হল সে সবের সঙ্গেই সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কের রূপ বা form-এর বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের একটি প্রধান দিক হল সমাজতান্ত্রিক ও সামাজিক মালিকানার মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার বহু রূপের বা plurality of forms-এর স্বীকৃতি। এ সবের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রশাসিত (administered) ও নিয়ন্ত্রিত সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং শ্রমিক ও উৎপাদকদের স্ব-শাসন ও

অধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত সংস্থা, সমবায়মূলক সংগঠন ও সমিতি, নির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান এবং লীজ চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা। কিন্তু সম্পত্তির এসব বিভিন্ন রূপের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক কী? এই সব রূপের বিবর্তন কী ভাবে ঘটবে? সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশের ওপরে এইসব বিভিন্ন রূপের কী প্রভাব পড়বে? এসব প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার নয়।

পাঁচ

সোভিয়েত দেশের বর্তমান পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে আটকে নেই, তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে—একথা আগেই বলা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এটাই এই প্রক্রিয়ার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অর্থনৈতিক পুনর্গঠন বা 'পেরেস্ত্রোইকা'র সঙ্গে রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কারের সম্পর্ক কী? রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্তর্বস্তুই বা কী? কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৮৫র এপ্রিল ও তারপর জুন অধিবেশন পর্যন্ত সংস্কার কর্মসূচীতে মুখ্য জোরটা ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক ত্বরণের (acceleration) ওপর। ঐ দুটি অধিবেশনে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্ন তেমনভাবে সামনে আনা হয় নি। কিন্তু অর্থনৈতিক ত্বরণ ও পুনর্গঠনের কর্মসূচী চালু করতে গিয়ে নানা রকমের সমস্যা, বাধা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকাংশে এইসব সমস্যা ও বাধার মোকাবিলা করার প্রয়াস থেকেই উত্থাপিত হয় রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন। উনবিংশ পার্টি সম্মেলনের তৃতীয় দিনে (৩০শে জুন) আলোচনায় অংশগ্রহণ করে গোরবাচভ বলেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়টি জরুরি কর্তব্য হিশেবে দেখা দিয়েছে 'পেরেস্ত্রোইকা'র বিকাশের আভ্যন্তরীণ যুক্তি বা 'লজিক' অনুসারে। তিনি বলেন, ১৯৫৩ সালে কৃষিতে ব্যাপক সংস্কারের কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজে হাত দেয়া হয়। কিন্তু কোনো প্রক্রিয়াই বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। কেন? অতীতের ঐ সব প্রয়াস সমাজ ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক পদ্ধতি-নির্ভর রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে আটকে যায় (ডকুমেন্টস, পৃঃ ৯৬)। এই অভিজ্ঞতার থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক ও গভীর রাজনৈতিক পরিবর্তনের কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে ও আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও কাঠামোতে। এই পরিবর্তনের অন্তর্বস্তু হল খোলামেলা পরিবেশ তৈরি এবং সমাজের সর্বস্তরে গণতন্ত্রের বিকাশ।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্তালিনের ক্ষমতা এমন তুঙ্গে ছিল তার

তুলনায় রাষ্ট্র ও সোভিয়েত নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সে সময়কার সন্ত্রাস ও বিভীষিকার তুলনায় ক্রুশ্চভ বা ব্রেজনেভের আমলে রাজনৈতিক পরিবেশ অনেক উদার ছিল, কিছু কিছু অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণও ঘটেছিল। কিন্তু স্তালিনের কাজ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কাঠামোর কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। পার্টি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করার কিংবা সরকারি মতের থেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করার কোনো অধিকার ছিল না। ভিন্ন মত প্রকাশের অপরাধে নিপীড়নের দৃষ্টান্তও রয়েছে অনেক। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষত ১৯৮৬ গোড়ার দিক থেকে যে প্রক্রিয়া কাজ করছে তা কোন আংশিক বা সাময়িক সংস্কার নয় কিংবা শুধু বিকেন্দ্রীকরণ বা উদারীকরণ নয়, তা হল সোভিয়েত জীবনের সর্বস্তরে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ গণতন্ত্রীকরণ। গোরবাচভ বলছেন, "পেরেস্ত্রোইকা সমাজবাদকে গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে···এর মধ্যেই আছে পেরেস্ত্রোইকার মূল উপাদান। [এই] মূল উপাদান এমনই যে তার মধ্যেই পাওয়া যায় [পেরেস্ত্রোইকার] প্রকৃত বিপ্লবী চরিত্র আর সর্বব্যাপ্ত পরিধি" (পেরেস্ত্রোইকা, পৃঃ ১৯)। সোভিয়েত জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে জনসাধারণকে একটি ইতিহাস ও সমাজ-সচেতন সক্রিয় ও সৃজনশীল ভূমিকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এই প্রক্রিয়ার প্রধান কথা। বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্বের বক্তৃতা, লেখা ও কাজে ক্রমাগতই জোর দেয়া হচ্ছে সচেতন গণ-উদ্যমের ওপরে। লেনিনের পর কোনো সময়েই সোভিয়েত জনসাধারণের উদ্যোগ ও ভূমিকার ওপরে এত জোর দেয়া হয় নি।

উনবিংশ পার্টি সম্মেলনে রাজনৈতিক সংস্কারের এই পরিপ্রেক্ষিতকে অনুমোদন জানানো হয়েছে। সম্মেলনে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল (১) লেনিনের চিন্তাধারা অনুসারে জনসাধারণের ক্ষমতার আধার হিশেবে এবং আইনপ্রণয়নকারী, প্রশাসনিক ও তদারকি সংস্থা হিশেবে সোভিয়েতগুলির পুনরুজ্জীবন, (২) পার্টি ও সোভিয়েতগুলির সম্পর্কের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং পলিট ব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির হাত থেকে সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক দেশের দৈনন্দিন শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ, (৩) পার্টির সাধারণ সম্পাদকসহ যে কোনো পদাধিকারীর কোনো পদে থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা দুই বছরে বেঁধে দেয়া, (৪) গোপন ব্যালটের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা, (৫) বিভিন্ন এবং এমন কি বিপরীত

মতের অবস্থানের স্বীকৃতি, (৬) সেন্সরশিপ প্রথার অবসান, (৭) প্রকাশ্য বিতর্কের অধিকার ও সুযোগদান এবং (৮) আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রয়াস। এই সব ও আরও অন্যান্য পরিবর্তন মিলিয়ে রাজনৈতিক সংস্কারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সমাজতন্ত্রের পরিধির মধ্যে রাজনৈতিক বহুত্ব বা pluralism-এর কার্যকর স্বীকৃতি। অবশ্য এখন পর্যন্ত এই বহুত্বের অর্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের বহুত্ব, এর মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দলের বহুত্ব স্বীকৃত নয়। সে দিকে যাওয়া হবে কি? প্রকাশ্য বিরোধিতাকে কি মেনে নেয়া হবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যৎ-ই দিতে পারে।

পশ্চিমী ভাষ্যকারেরা এই সব পরিবর্তনের মধ্যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেখতে পাচ্ছেন। বাপন্থীদের একাংশও বিভ্রান্ত বোধ করছেন। কিন্তু পশ্চিমী দাবি কিংবা বামপন্থী বিভ্রান্তির প্রকৃত কোনো কারণ আছে কি? ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিরোধীদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি ইত্যাদি তো বুর্জোয়াদের দান নয়—এসবই বহু সংগ্রামের অর্জিত ফল। তাছাড়া ইতিহাস বলে যে, লেনিনের জীবদ্দশায় গৃহযুদ্ধের ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অতি কঠিন ও সংকটময় দিনগুলিতেও 'প্রাভদা'র পাতায় ও অন্যত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে প্রকাশ্য তীব্র বিতর্ক হয়েছে। লেনিনের মৃত্যুর পরেও কিছু কাল পর্যন্ত মতভেদ প্রকাশের সুযোগ ছিল। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা মানে পাথুরে ঐক্য বা monolithic unity—এটা স্তালিনের অবদান।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে তাতে পশ্চিমী ধাঁচের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হচ্ছে—এ রকম মনে করার আদৌ কোনো কারণ নেই। যে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া কাজ করছে তাকে বলা যেতে পারে তৃণমূল (grassroots) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে পশ্চিমী গণতন্ত্রের অনেক দিক দিয়েই খুব বড় রকমের তফাত। এর প্রাতিষ্ঠানিক আধার হল তলা থেকে ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত সোভিয়েত ব্যবস্থা। কিন্তু কিছু দিন আগে পর্যন্ত সোভিয়েতগুলির জীবন ছিল নিষ্প্রাণ, আনুষ্ঠানিক। পার্টিই ছিল সর্বেসর্বা। এখন ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে সোভিয়েতগুলিকে, ঘটছে সোভিয়েতগুলির পুনরুজ্জীবন। আর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস ও আমূল সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান শক্তি হিশেবে দেখা হচ্ছে জনসাধারণকে। গোরবাচভ বলছেন, "জনগণের সৃজনশীলতাই হল পেরে-

স্ত্রোইকার আসল শক্তি।" সেই সঙ্গেই বলছেন, "যত বেশি সমাজবাদী গণতন্ত্র হবে ততই আমরা পাব আরও সমাজতন্ত্র" (পেরেস্ত্রোইকা, পৃঃ ৩৮)। কোনো বুর্জোয়া গণতন্ত্রেই জনসাধারণের এই ভূমিকার কথা কখনোই বলা হয় না।

ছয়

কিন্তু খোলামেলা আলোচনা ও গণতন্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে সব কথা বলা হচ্ছে সে সব শুধুই প্রতিশ্রুতি ও সঙ্কল্পঘোষণা নয় তো? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর একমাত্র ইতিহাসই দিতে পারে। তবে কতকগুলি বিষয় লক্ষণীয়। চেরনোবিলের দুর্ঘটনা চেপে রাখা হয়নি, আর তা নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে বর্তমানের সমালোচনাই রয়েছে। সমাজজীবনের নানা নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা ব্যাপকভাবে হচ্ছে। অতীত সম্পর্কে সম্প্রতি যে সব মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং দেশে যে পরিবর্তন ঘটছে সে সবের বিরোধিতা করে কিনা আন্দ্রেয়াভার চিঠি 'আমি আমার নীতি বিসর্জন দিতে পারি না' সোভিয়েত পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, ক্রুশ্চেভ স্তালিনের সমালোচনামূলক রিপোর্ট পেশ করেছিলেন পার্টি কংগ্রেসের গোপন অধিবেশন আর উনবিংশ সম্মেলনের আলোচনা ও বিতর্ক, তীব্র সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা ইত্যাদি সবই টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে। এটি একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার। স্পষ্টতই পার্টি ও সরকার এবং জনসারণ ও সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধরনের সম্পর্ক এতে সূচিত হচ্ছে। 'নিউ টাইমস' বা 'মস্কো নিউজ'-এর মত পত্রিকার পাতা ওল্টালে বোঝা যায় যে জনমত গড়ে উঠছে, নেতৃত্বকে সেই জনমতকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে।

এটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাম্প্রতিক বছরগুলির কাজকর্মের আলোচনা করতে গিয়ে শুধু যে সাফল্য ও অগ্রগতির কথা বলা হচ্ছে তা নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতার কথাও খোলাখুলি স্বীকার করা হচ্ছে। আর এসব ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য দিকের মধ্যে বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে মতান্ধ ছাঁচে-ঢালা মানসিকতা রক্ষণশীলতা অর্থনৈতিক পরিচালনার অচল পদ্ধতি ও আমলাতান্ত্রিক বাধার অর্থাৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগত অন্তরায়গুলির ওপরে। পার্টির নেতৃত্ব বলছেন, "নতুন কর্তব্যের মোকাবিলা করতে হবে, কিন্তু তা কোনো তৈরি উত্তরপত্রের ভিত্তিতে নয়। আজকের দিনে এমন কোনো উত্তর তৈরি নেই-ও" (পেরেস্ত্রোইকা, পৃঃ ২৮)। এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

এসবই অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন সূচিত করছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কতদূর যাবে? এই পরিবর্তন স্থায়ী হবে কি? সম্প্রতি যে ভাবে তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকা হল আর মাত্র এক ঘণ্টার অধিবেশন থেকে নেতৃত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল করা হল তার সঙ্গে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবর্তন ধারার সঙ্গতি আছে কি?

তবে পরিবর্তনের ও গণতন্ত্রীকরণের আরও অন্য আয়তন আছে। অতীতের মূল্যায়নের কথাই আবার ধরা যাক। এ প্রশ্ন অনেক সময়েই ওঠে যে, স্তালিনের গুরুতর ভ্রান্তি এবং পার্টি ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে সংঘটিত, গোরবাচভের ভাষায়, 'অমার্জনীয় অপরাধ সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের নির্মাণ, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে জয় কিংবা যুদ্ধশেষে বিধ্বস্ত অর্থনীতির দ্রুত পুনর্বাসন সম্ভব হল কি করে? অতীতে এসবের জন্য প্রশংসা মুখ্যত জানানো হয়েছে স্তালিন ও পার্টি নেতৃত্বের বিজ্ঞতাকে। কিন্তু বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকী উপলক্ষে গোরবাচভের পূর্বোল্লিখিত রিপোর্টে এসব কীর্তির জন্য বারে বারে সর্বোচ্চ প্রশংসা জানানো হয়েছে সোভিয়েত জনসাধারণের কঠোর শ্রম, অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও বীরত্ব এবং সক্রিয়তা ও সৃজনশীলতাকে। (এখানে একথা স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মস্কো অভিযানে নেপোলিয়নের পরাজয় সম্ভবপর হয়েছিল মুখ্যত রুশ জনসাধারণের শক্তির জোরে, এতে কোনো সেনাপতি বা নেতার কৃতিত্ব ছিল না, তবে 'জেনারেল উইণ্টার' ঐ পরাজয়কে বিপর্যয়ে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল।)

স্তালিন ব্যক্তিতন্ত্রের উদ্ভবের প্রসঙ্গেও গোরবাচভের বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রুশ্চভ স্তালিনীয় অনাচার ও ব্যক্তিতন্ত্রের কথা উদ্ঘাটন করে একটা ঐতিহাসিক কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রিপোর্টে কিংবা অন্য অনেক আলোচনায় জোরটা থেকেছে স্তালিনের ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সা, সন্দেহপরায়ণতা ইত্যাদির ওপরে। এসবকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু গোরবাচভ এই আলোচনায় গভীরতর মাত্রা নিয়ে এসেছেন। তিনি স্তালিন ব্যক্তিতন্ত্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যাকে যুক্ত করেছেন প্রশাসনিক হুকুমের ব্যবস্থাতে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করাই ভাল:

"...the dminstrative-command system, which had begun to take shape in the process of industrialisation and which had received a fresh impetus during collectivisation, had told on the whole socio-political life of the country. Once established in the economy it had spread to its superstructute,

restricting the development of the democratic potential of socialism and holding bade the progress of socialist democracy." (অক্টোবর রেভল্যুশন অ্যাণ্ড পেরেস্ত্রোইকা, পৃঃ ১৯)।

গোরবাচভের বিশ্লেষণ-অনুসারে মূল ভ্রান্তিটা ছিল সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ নির্মাণপর্বে গৃহযুদ্ধকালীন পদ্ধতির প্রয়োগ। গোরবাচভ বলছেন, "...methods dictated by the period of the struggle with the hostile resistance of the exploiter classes were being mechanically trans ferred to the period of peaceful socialist contructions...An atmosphere of intolerance, hostility, and suspicion was created in the created. As time went on, this political practice gained in scale, and was headed up by the erroneous 'theory' of an aggravation of the class struggle in the course of socialist construction," (ঐ, পৃঃ ২০)। এর পরিণাম হয়েছিল শোচনীয় ও মারাত্মক। সোভিয়েত সমাজে গণতন্ত্রের অভাব সম্ভব করে তুলেছিল ব্যক্তিতন্ত্র এবং ১৯৩০-এর দর্শকে আইনের গুরুতর লঙ্ঘন এবং নিষ্ঠুর নির্যাতন (ঐ, পৃঃ ২০)। অবশ্য স্তালিনের ব্যক্তিতন্ত্রের উদ্ভবের পিছনে আরও অনেক ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করছেন, সে সব নিয়ে আলোচনাও চলছে। গোরবাচভের বিশ্লেষণ ঐ আলোচনাকে উদ্দীপিত করবে, গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার পক্ষে সহায়ক হবে।

কুড়ির ও তিরিশের দশকের প্রসঙ্গে ট্রটস্কি ও বুখারিনের কথা বাদ দেওয়া যায় না। গোরবাচভ ট্রটস্কির অবস্থানকে মূলত লেনিনবাদ-বিরোধী ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী বলে চিহ্নিত করেছেন। বুখারিনের বক্তব্যের, বিশেষত কৃষি অর্থনীতির বিষয়ে বক্তব্যের তিনি সমালোচনা করেছেন, তবে তার তীব্রতা কম (ঐ, পৃঃ ১৪-১৬)। কিন্তু এই বিষয়ে গোরবাচভ যা বলেছেন তাকেই কি সোভিয়েত পার্টির চূড়ান্ত বক্তব্য বলে গ্রহণ করা যায়? অনেকে মনে করছেন যে, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বর্তমান কর্মসূচীর কোন কোন দিকের সঙ্গে বুখারিন যা বলেছিলেন তার বেশ কিছু মিল রয়েছে। কেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে সব কথা এখন বলা হচ্ছে সে সবের সঙ্গে ট্রটস্কির কিছু কিছু মতের সাদৃশ্যকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মোটের ওপরে অতীত ইতিহাসের পুনর্বিবেচনা এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী—এই দুই মিলিয়ে সোভিয়েত সমাজ এক গভীর আলোড়নের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

মার্কসবাদী মহলের একাংশ অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু অস্বস্তির কোন কারণ আছে কি? সোভিয়েত দেশে যা ঘটছে তাতে সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তর থেকেই পুনর্গঠন এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিকৃতির সংশোধন (correction) প্রক্রিয়ার কাজ করছে। এটা সমাজতন্ত্রের শক্তিরই পরিচায়ক। বস্তুতপক্ষে একইসঙ্গে সংশোধন ও সংস্কারের যে কার্যক্রম গ্রহণ ও চালু করা হয়েছে তার মূল উৎস মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিন্তাধারার মধ্যেই রয়েছে। মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজে বিচ্ছিন্নতার (alienation) সমস্যার মানবিক ও নৈতিক সমাধানের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। গোরবাচভের কিছু কিছু লেখাতে এই বিষয়ে ভাবনার আভাস রয়েছে (দ্রষ্টব্য, পেরেস্ত্রোইকা, পৃঃ ৬৬, ৬৭)। একথা মনে হওয়ার কারণ রয়েছে যে, যে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কাজ করছে তা সমাজতন্ত্রকে গভীরতর অর্থ, মানবিক ও নৈতিক অর্থ দিচ্ছে, তা সমাজতান্ত্রিক নবায়নের প্রতিশ্রুতি বহন করছে। অবশ্য এই প্রক্রিয়ার বিকাশের পক্ষে অনেক কঠিন বাধা ও জটিল সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সে সব অতিক্রম করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রমিথিউস

প্রদীপ দাশশর্মা

পৃথিবীবাসী জনগণ ঃ

আমরা পৃথিবীবাসী
অগ্নিকে জেনেছি দেবতা
আমরা নর ঃ আমরা নারী
অগ্নিকে জেনেছি দেবতা

সৌরচক্রে ঝরে অগ্নিকণা
প্রাকৃত অঞ্জলি পেতে
ভরে নিই অসীম করুণা
আহা, এ করুণা কার
প্রমিথিউস তোমার
তুমি আমাদের রাজা…

প্রমিথিউস ! আমরা তোমার কল্পনা
পৃথিবীর অরণ্যানী, জীবকুল, মানুষ-মানুষী
তোমারি জ্ঞানের ফল।
তুমিই দিয়েছো আমাদের সৌরজ্ঞান,
ঋতু-ভেদ, প্রকৃতিকে জানার অসংখ্য উপায়,
স্বাধীনতা। শিখিয়েছ বনজ-ঔষধ, কৃষিকাজ
বুঝিয়েছ রমণ-রণে শান্তি নেই, গৃহ চাই
বস্ত্র চাই, ভালবাসা, সম্পর্কের আলো
আঃ প্রমিথিউস ! এসো মানুষের মাঝে।

কতকাল আগুনের ধারে ঠায় বসে
ঝলসে নিয়েছি মেটে আলু ও মাংস—
মেষ বা ম্যামথের, তোমাকে পাইনি শুধু কাছে
অভিলাষে, অনভিলাষে…

যজ্ঞলব্ধ মাংসের ডালা আজ
আমরা কি পাব?

ঐ তো যজ্ঞাধিপতি প্রাজ্ঞ প্রমিথিউস
মঞ্চে দাঁড়িয়ে, ডাকবেন এক্ষুনি
আমাদের, নিতে মাংসের ভাগ
দেবতার সাথে উনিই দিয়েছেন
সমান মর্যাদা, প্রাজ্ঞ উনি—
পিতা তাঁর ইয়াপেতাস, মা ক্লাইমেনে

ঐ দেখুন, ঐ ঐ আসছেন উনি

উৎসব-মুখরিত নগরী মিকোজ
চন্দন-কেয়ূরে আমোদিত দশদিক
মহাযজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে কিছু আগে
বাতাসে ভাসছে মন্ত্রের রণন, ধূপগন্ধ
এসেছেন দেবরাজ জিউস, সঙ্গী তাঁর
হেপাস্টাস, ক্রীতোস, বীয়া ও অন্যান্য দেবগণ

এসেছে অকিঞ্চন মানুষের দল
অর্থাৎ আমরা এসেছি, আমাদের
আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্বয়ং প্রমিথিউস
দেবতার সমকক্ষ মানুষকেই ভেবেছেন তিনি।
ধন্যবাদ মহাপ্রমা প্রমিথিউস, ধন্যবাদ,
সামান্য মানুষের নমস্কার গ্রহণ করুন
অসামান্য পিতা

[প্রমিথিউস যজ্ঞ-মঞ্চে]

প্রমিথিউস ঃ

দেবগণ, এই মহাযজ্ঞে আপনারা যে এসেছেন

আমি সম্মানিত
বিশেষতঃ
এসেছেন
বীরশ্রেষ্ঠ ক্রোনসপুত্র জিউস
দেবরাজ জিউস! আপনাকে জানাই অভিবাদন।

এসেছেন অবশ্যই সুশীল মানব
মহাযজ্ঞের প্রসাদ পেতে, সৌভাগ্য আমার
আপনারা সবাই আমন্ত্রিত, আপনাদের
কী করে যে দেখাই সম্মান!

আপনারা দেখেছেন ক্ষণকাল আগে
যজ্ঞ করেছি শেষ, মহাবৃষ বলি
সমাপ্ত হয়েছে, শুধু বণ্টন বাকি
অলঙ্কৃত পট্টবস্ত্রে ঢাকা আছে মাংস-ভাণ্ড
বেছে নিতে হবে শ্রেষ্ঠ ভাগ…
দেবত্ব রয়েছে তাই দেবতারা পাবেন অগ্রাধিকার
দেবরাজ জিউস! আপনার বলীয়ান বাহু
তুলে নিক মাংস-ভাণ্ড, প্রীত হব, অনুগৃহীত
সকল দেবতার পক্ষে যদি বেছে নেন
দুই মহাভাণ্ডের একটি, বাকিটি তা যত
ন্যূন হোক, পাবেন মনুষ্যকুল, লোকনীতি বলে
সর্বাগ্রে দেবতার স্থান, তাই প্রিয় মানুষেরা
অপরাধ নেবেন না, আমি নীতি-বাধ্য, ডাকছি প্রথমে
দেবতাদের।

আমি বিশ্বাসী নই ভাগ্যে…
ভাগ্যে নয়, বুদ্ধির প্রয়োগ, জ্ঞান
এই আলো এনে দেবে সাফল্য, সম্মান…

আসুন দেবরাজ জিউস, যজ্ঞভূমে
আমি প্রমিথিউস, আপনাকে করছি আহ্বান।
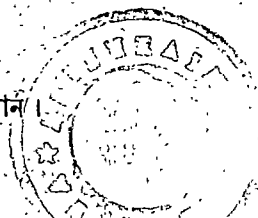
[স্বগতোক্তি]

এখন তুমি হিউস, হাঃ
কি—ং—ক-র্ত-ব্য-বিমূঢ় !
কিংবা বন্য শূয়োর
মারবে প্রবল ঢুঁ
করবে আঁকুপাঁকু
—একটু পরে।
কদ্দুর বা ওড়ে
পিঁপড়েরা, হাঃ

[প্রকাশ্যে]

আসুন, আসুন দেবরাজ···

[জিউস যজ্ঞ-মঞ্চে উপনীত হলেন]

জিউস ঃ

স্পর্ধা এক বিস্ফোরক সুতো, আগুন লাগলে
সর্বনাশের দিকে দ্রুত পৌছে দেবে
প্রমিথিউস ; মাটির পুত্তলিকে দিয়েছ
প্রাণ, ভাল কথা, কিন্তু কোন্ সাহসে
তাদের এখানে এনেছ ডেকে, একাসনে !
পাশাপাশি এ কোন্ শকটে বসে আছি
এ শকট কত দ্রুত নিয়ে যাবে গন্তব্যে !
শেষে নাকি মানুষের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা !
উচ্ছিষ্ট-ভোগী মানুষ ! প্রসাদ-ভিক্ষুক মানব !

তবু, প্রমিথিউস, তুমি যে দেবতা, টের পাই
কারণ আমাকেই দিয়েছ অগ্রাধিকার শ্রেষ্ঠ-ভাণ্ড
বেছে নিতে, তোমাকে তাই আমার প্রশ্রয়

হে দেবকুল ! আপনারা তো জানেন
যা কিছু শ্রেষ্ঠ; মন্থর-লব্ধ হেম, সব দেবতার
অপূর্ব-চিত্রিত ঐ মাংস-ভাণ্ড, রত্নখচিত
পট্টবস্ত্রে ঢাকা, ঐ পাত্র দেবতার
জ্ঞানী প্রমিথিউস, আমি ঐ পাত্র-প্রত্যাশী

সকল দেবতার পক্ষে স্পর্শ করি একে,
এ-পাত্র ক্ষুদ্র নরের নয়, দেবতার
[জিউস পাত্রের কাছে এগিয়ে গিয়ে উন্মোচন করলেন আবরণ ও চমকে উঠলেন]

জিউস :

একি ! শুধু অস্থি-চর্ম মেদে পরিপূর্ণ ভাণ্ড !
হায় ! একি কূটৈষণা প্রমিথিউস ?

প্রমি :

আপনি দেবতাদের পক্ষে বেছে নিয়েছেন
মন্দ-ভাগ্য, আমি দুঃখিত, তবু ভেবে হচ্ছি অবাক…
[স্বগতোক্তি]
না, না দুঃখের কী আছে
তোমার বুদ্ধির গাছে
মাকাল ফলেছে
আর এটাই তো ছিল স্বাভাবিক
[জিউসকে]
আপনি কি জানেন না অস্থি-মেদ-চর্ম
শরীরে ওগুলোই বেশি, সেরা মাংসের পরিমাণ
কতইবা, ক্ষুদ্র পাত্রে ধরে যায়…
আপনাকেই তো প্রথম সুযোগ দিয়েছি
তবে অভিযোগ কেন দেবরাজ।
আমি নিরপেক্ষ, আসুন মনুষ্যপুত্র
আপনারা নিয়ে যান শ্রেষ্ঠভাগ
[প্রমিথিউসের নামে জয়ধ্বনি]
ওকি ! জয়ধ্বনি, দিচ্ছেন কেন আমার নামে
জয়ধ্বনি দিন দেবতা জিউসের নামে
উনিইতো অনায়াসে তুলে দিয়েছেন আপনাদের
যা কিছু প্রার্থিত, জয়ধ্বনি দিন মহামান্য
জিউসের নামে…
[কিন্তু, জয়ধ্বনি শুধুমাত্র প্রমিথিউসের নামে ধ্বনিত হল]

হে মানব ! আপনারা সঠিক কাজ করলেন না.
মহাশক্তিমান জিউস আপনাদের এই স্পর্ধা
সহ্য করবেন না নিশ্চিত, তাই শঙ্কা, হয়তো তার
বজ্রমুষ্টি উত্তোলিত হবে আপনাদের চূর্ণ
করে দিতে, আপনারা এখনও যথেষ্ট দুর্বল, এখনও
প্রকৃতিকে সঠিক চিনে উঠতে পারেন নি
আপনারা সংঘবদ্ধ হোন, থাকুন সজাগ
গড়ে তুলুন দুর্গ, প্রাকার, পরিখা ; শিখুন
যা রয়েছে চারপাশে—জ্ঞানের ডালপালা
কারণ জেনে নিন জ্ঞানই তীক্ষ্ণতম প্রতিরক্ষা
যে কোন অস্ত্রের চেয়ে শেলতীব্র, লক্ষ্যভেদী

[স্বগতোক্তি]

ক্রোনসপুত্র জিউস করবেনটা কি
সবাই জেনেছে ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি !
তবু ভয় হয়, ঐ গোঁয়ার রগচটা
নড়েচড়ে যদি ওর মাথার পোকাটা…
বিপদ হতে পারে…।

আপনাদের থেকে আমি এবার বিদায় চাই
অপেক্ষা করে আছেন প্রিয়তমা ওসেনিয় কন্যা
পুত্র দিউকোলসন

স্বজন
আমার
দিন
বিদায় ।

জনগণ :

রি রি রি রি রি
পায়ের তলে
স্বর্গের সিঁড়ি।
… …
ওসব থাক

আগুন জ্বাল্
রা রা রা রা রা রা রা রা রা
তাজা লাল মাংসে ভরা
পাত্রটি আগুনে চাপা
হবে যে দেদার ভোজ
ভাগ্‌গে ছিলেন তিনি
প্র-মি-থি-উ-স
মোদের পিতা

নষ্ট জিউস
ছি-ছি-ছি ছি-ছি-ছি
ওকে ডাকিস নে
আগুন জ্বেলে নে
হবে দেদার ভোজ
কে রাখে কার খোঁজ
রারা রারা রারারা রারা
তাজা লাল মাংসে ভরা
পাত্রটি আগুনে চাপা…

[রাজসভায় জিউস]

জিউস ঃ

আমি দেবশ্রেষ্ঠ জিউস
আমাকেই ঘৃণা !
পিঞ্জরে ঢুকিয়ে পশ্চাতে
লেজ ধরে টানা !
প্রমিথিউস,
তুমিই বসিয়েছ সিংহাসনে
আমাকে, জানি মনে মনে
তাই তোমাকে ক্ষমা না হিংসা
কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না
শুধু জানি, রাজাকে শার্দুল-বিক্রম

পেতে হয়, চাই রাজকার্যে শৃগাল-ধূর্ততা
তাই অদৃশ্য-হাতে কালো-পাশা
ছুঁড়ে দেব, সামলাও দান, প্রমিথিউস
মানুষকে যে মৃত্তিকায় গড়েছ তুমি
তাকে আমি শৈলের হিম দেব
খাদ্যের বদলে দেব তুষারের রুটি
যে অগ্নি—সৃষ্টির আদি-কণা
কেড়ে নেব মর্ত থেকে, প্রমিথিউস
তোমার মানুষ হবে মৃত্তিকা-পুত্তলি
স্পর্শে কোন উষ্ণতা পাবে না
কারণ তাদের মধ্যে থাকবে না অগ্নি
তাদের ঝাঁকালে শব্দ পাবে বরফ-কুঁচির
হা-হা-হা বরফের দেশ কাকে বলে
জানো তুমি, দেখেছ কি রক্তহীন, রোমহীন
মেরুর তুষার !

অগ্নি তো শুধু উষ্ণতা নয়, আলো
অন্ধকারে মানুষ পাবে না তার মানুষীরে
ক্রুদ্ধ হবে, ছিঁড়ে খাবে ইহারে-উহারে
সব স্বপ্ন আমি ভেঙে দেব প্রমিথিউস
আমি জিউস
তোমার নফর নই, তোমার দেবতা
আমার অসির ক্ষুদ্রতম মণিকাও জানে
হিংসার চেয়ে প্রতিহিংসা গাঢ়তর, সূচিমুখ
তোমার ঐ হীরক-কঠিন অভিমানী বুক ভেঙে দেব

পুত্র হেপাস্টাস, ক্রাতোস, বীয়া

পুত্রেরা ঃ

আজ্ঞা করুন প্রভু

জিউস ঃ

যাও, ভূলোকে যাও, মন্ত্র দাও বৃক্ষ ও পাথরে

যেন ঘর্ষণে জ্বলে না তারা, যেন
প্রতিদিন শীতল হয়ে আসে মানুষের ব্যবহারে
যেন মানুষ একে চেনে না অপরে।

অগ্নি তো গোপন থাকে সম্পর্ক সিন্দুকে
তাতেই লাগিয়ে আসবে আমার কীলক
—যার চাবি থাকবে শুধু দেবতার হাতে
মানুষ যতই হবে আত্মমুখী, স্বার্থঘন,
ততই নিভু-নিভু হয়ে আসবে আগুন, কিছু পরে
নিভে যাবে, চকমকি পাথরে লাগবে নিষেধের
হিম; যজ্ঞের অরণি থেকে শমীবৃক্ষ অবধি
ঢেকে যাবে বিষাক্ত ছত্রাকে, আগুন
ঘুমিয়ে পড়বে বরফের দেশে—
কোনদিন জাগবে না আর।

[পুত্রদের দিকে]

যাও, তোমরা পৃথিবীর বনস্থলীতে দ্রুত
এ-খবর পৌঁছে দাও, উপদ্রুত
অঞ্চল বলে ঘোষণা কর পৃথিবীকে
কেড়ে নাও অধিকারের আগুন, যাও
দেবরাজ জিউসের আদেশ পালন করো
প্রিয় পুত্র আমার

[স্বগতোক্তি]

প্রমিথিউস! শুয়ার কি বাচ্চা!
খাচ্ছো-দাচ্ছো আমার রাজ্যে, আচ্ছা
আছো, ফের পোঁদে মারছ লাথি
তোমার ভিটেয় জ্বালাবো লাল-বাতি
বীরপুরুষ! দূরদ্রষ্টা! না, হাতি
খাতির তোমায় করিনি কম
ভাল বুঝি না রকম-সকম
এখন দেখবে আমার খেল্
ফেলবে কড়ি, মাখবে তেল

আগডুম-বাগডুম হুক্কা-হুয়া
আগডুম বাগডুম হুক্কা হুয়া ॥

প্রমিথিউস ঃ

কিসের শব্দ পাচ্ছি
একি অরণ্যের মর্মর না দূরাগত ক্রন্দন
আমার মা ক্লাইমেনে পর্যন্ত কেঁপে
উঠছেন, কেঁপে উঠছেন বৃদ্ধ ইয়াপেতাস
হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে
একটা অমঙ্গল টের পাচ্ছি যেন
দূরে উড়ে যাচ্ছে টমাহক
ঈগলেরা পৃথিবীর দিকে কেন
মৃত্যু-দূত কি তবে আগেই পৌঁছেচে !

জিউসের কথা স্মৃতি-পটে আসে, হীনবীর্য
কিন্তু কুটিল, দেবতাগণ কুটিলতর, কুমন্ত্রণা
যোগারেন তাঁরা যাতে থাকে রাজ্যপাট !

যে মানুষ পৃথিবীকে দিয়েছে গর্ভ অভিমান
শ্রমের বীর্যে তাকে করেছে প্লাবিত, সেই
শস্য চায় ওরা সর্বাংশ, পরিবর্তে
দেবে হীন বঞ্চনা
কখনও হবে না
এই ষড়যন্ত্রে আমি, প্রমিথিউস, দেব বাধা

তবু, আমি কে—
আমিও তো অদিতি-সন্তান
টাইটান
তবে কেন টানটান
হয়ে বলতে পারি না ঃ
'আমি জিউসের পক্ষে কারণ তিনি দেবতা ।'

পারি না, কারণ আমি শ্রেণীচ্যুত
মানুষের মধ্যে দ্রবীভূত
আরেক মানুষ
তাই টের পাই, যে দূরভিসন্ধি
কেড়ে নিয়েছে আগুন মানুষ থেকে
যে আগুন ছিল রোমে রোমে
সম্পর্কের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে
তাকে ফের জ্বালাতে হবে,
কিন্তু কীভাবে জ্বালাবো
ধূর্ত দেবতারা মানুষের হাতে
তুলে দিয়েছে ধর্মের বিশ্বাস
আলোহীন, অগ্নিহীন একাকীত্ব, তাই
আগুন আনতে হবে বঞ্চনার গর্ভ থেকে
আগুন আনতে হবে যা রজতমুদ্রার মত
অগ্নি হয়ে আছে দেবতার পেটিকায়।
বঞ্চনার পাথরে চেতনা ঘষলে
নিশ্চয়ই মিলবে আগুন, আর সেই অগ্নি-জ্ঞান
দেবতার গর্ভ-গৃহে আছে, শঙ্খে আছে
তাকে বয়ে আনতে হবে, বিপ্লবী সতর্কতায়, বীর্যে,
একে যদি দেবতারা চৌর্য-বৃত্তি বলে, বলুক
তবু মর্তে চাই বজ্র-কঠিন আগুন
চেতনার আলো।

ভালো,
পৃথিবীর পুত্রগণ
আগুন আনবো আমি ঠিক
আধার প্রস্তুত রেখো
নিজেরা প্রস্তুত থেকো
নিপুণ হও আত্মরক্ষায়
নতুবা বিপ্লব রঙ্গ নয়
কিছুই অর্পিত হয় না, কেড়ে

নিতে হয়, রক্ষা করতে হয়
বপণ করতে হয়, বৃদ্ধি
করতে হয়, বণ্টন করতে হয় আর
জেগে থাকতে হয়
সারারাত জাগতে হয় :
ভোরের জন্য, পাখির ডাকের
সঙ্গে মানুষের ডাক শোনার জন্য
ঘাসের ডগায় শিশির-বিন্দুর
জন্য, কৃষকের পদপাতের জন্য…
এভাবেই জেগে থাকতে হবে আমাদের ॥

[স্বগতোক্তি]

জিউস রে তুই শয়তান
এপারে আমি টাইটান
দড়ি টানাটানি হবে
বাপের সম্পত্তি
নয়তো আগুন
তোমাদের
চাই একরত্তি
মানুষের ।

দেখবি তোদের
সমুখ দিয়ে
আগুন আনব
লাফিয়ে লাফিয়ে
পারলে ধরিস
আমাকে তোরা
ধরিস ঘোড়া

পৃথিবী নয়তো
মহেঞ্জোদারো
মানুষ নাচবে
গারো

পাহাড়ের নিচে
পৃথিবীর ছাদে
পামীরে পামীরে
তারা
আগুনে গলাবে লৌহ
গড়ে তুলবে ইমারত, আর স্বর্গের সিঁড়ি
বেয়ে উঠে যাবে
নামিয়ে আনবে
জিউস তোমাকে
অতল গর্ভে
হিম জ্যোৎস্নায়
আমি নিরুপায় ॥

[রাজসভা]

জিউস ঃ

আজ এই জরুরী সভায়
আপনাদের হৈম আভায়
আলোকিত রাজসভা
তবু দূরের ঐ অগ্নিকোণ
বিদ্যুতে ঠাসা, মানুষের
দিন আসবে, যদি না
এখন থেকে কানে না
নেন আমার কথা
নিজেদের রাখেন শাণিত
বুদ্ধিতে···
ঘুঘু চরাতে হবেই ওদের ভিতে
আপনারা তো জানেন ঠিকই
তরোয়ালে মরচে ধরা
তাই খুলুন না বুদ্ধির খিল
মারুন না ঢিল
দুই পাখি মরে যাতে

সবটাই আপনাদের হাতে

সারাদিন শুধু তিনতাস
খেলে কত দিন কত মাস
নারী ও কোহলে কাটাবেন
পেটে নাদা ভুঁড়ি, চর্বির বল
লাথি মেরে ওরা খেলবে
তখন বুঝুন অবস্থাটা
কেউকেটা
দেবতারা গড়াগড়ি খাবে
ধুলোয়
প্রমিথিউস হাসবেন
তাই, এমন কিছু করুন আপনারা
চুল ছিঁড়ুন, গোল্লায় যান
তবুও কিছু করুন, নইলে ভরাডুবি

[দেবতারা গোল হয়ে মন্ত্রণায়—মাইম্-এর মধ্য দিয়ে রূপসী প্যাণ্ডোরার সৃষ্টি]

প্যাণ্ডোরা ঃ

সৃষ্টি করেছে আমাকে দেবতারা, রুপীটযোনী,
জ্বালামালিনী, আমি প্যাণ্ডোরা, ভুবনেশ্বরী
পৃথিবীকে দেব ফসলের ঘ্রাণ, নবান্নের ঋতু,
মধুক্ষরা ফল, আমাকে গ্রহণ কর, আমি
প্যাণ্ডোরা—কুললক্ষ্মী, কমলা, ঈষা

প্রমি ঃ

সাবধান হতে হবে, বড় রহস্যময়ী নারী প্যাণ্ডোরা
দেবতার গুণে গড়া, অপরূপা, রমণীর
এক চোখে নীড়, অন্য চোখ পিঙ্গল-পুঁতির
বাইরে যদিও যায় না ধরা, পেছনে
থমকে ঝড়, প্রলয়-সঙ্কেত, ইরম্মদ।

ওর হাতে আছে এক অদ্ভুত পেটিকা

সর্প ও লতাঙ্কিত ঐ খোলের মধ্যে
কি আছে অনুমান করতে পারি না
তবে জিউস পিনাকপানি, অস্ত্র তাঁর বহু...
সাবধান হতে হবে, বড় রহস্যময়ী নারী, প্যাণ্ডোরা।

একি, একি এপিমিথিউস, তুমি
কোন্ সম্মোহনে যাও প্যাণ্ডোরার কাছে
নিষেধ রইল টাইটান
রূপমুগ্ধ তুমি, মূর্খ, চিন্তাশক্তিহীন
অথবা পশ্চাদচিন্তক পস্তাবে পরে
নতুবা, নিষেধ সত্ত্বেও বাক্‌দান করলে তাকে
ইন্দ্রিয়সেবী, দাস্ত, শান্ত হও
যা তোমার গোচরীভূত নয়,
—অনুমানে আনো,
চুপিসারে যে সাপ প্রবেশ করে শয্যায়,
সে শয্যা গ্রহণ থেকে দূরে থাকো।

যা অমোঘ মনে হয়, স্বয়ংক্রিয়
সে-যে দেবতার ছক, দেবতার প্রিয়
খেলা, জানি, এই অনিবার্যতার
চারপাশে তুলতে হবে দেওয়াল,
পরিকল্পনার
আপাততঃ প্যাণ্ডোরার দিকে দৃষ্টি রাখা ছাড়া
কিছুই নেই করার।

এপিমিথিউস! ব্যক্তিস্বাধীনতায় দিচ্ছি না বাধা
মাটিতে কিভাবে নামবে না জেনে
ইচ্ছে হয়েছে ওড়ার, ওড়ো
পাখির মত উড়লে
বলার ছিলনা কিছু
লাটাইয়ে বদ্ধ
ঘুড়ির মত উড়ছো, ওড়ো...
অন্ধ।

তবু সন্দেহ জাগে আমি কি সঠিক প্রেক্ষক !
নাকি সবকিছু মরুমায়া, অপেরন !
মানুষের কাছে হায়, বৃথা অঙ্গীকরণ…

প্যাণ্ডোরা :

দৃষ্টি বিভ্রম নয়, আমি তোমার হলাম
এপিমিথিউস ! আমার রাজা
তোমাকে সুখ দেব, তোমাকে
আশা দেব, তবে শর্ত আছে তার
শুধু খুলো না ঐ পেটিকার ডালা
কী আছে জানা নেই, আমারও স্বামীন্
আমি তো পরাধীন,
থাকতেই চাই, অনুগত
প্রথম রিপু নয়, ভালবাসা দেব অন্তত
সুন্দর রমণ দেব, খুলো না পেটিকা

এপিমিথিউস :

আমি জানি তুমি রতিশক্তি প্যাণ্ডোরা
প্রথম দেখাতে ভালবেসেছি তোমাকে
চার-পা ঠুকছে তাই লাল ঘোড়া
তোমার সঙ্গে উড়ব আমি প্রিয়তমা
অগোচরীভূত ছিলে কেন এতদিন !
পেটিকা তুচ্ছ সাগরে ডোবাবো তাকে।

প্যাণ্ডোরা :

না-না-না তোমাকে হারাতে চাই না
দেবতাদের শর্ত তো একটাই
পেটিকা রাখতে হবে কাছে
নতুবা আমাকে যেতে হবে
অঙ্গীকার কর পেটিকা খুলবে না তুমি।

প্রমি :

নীরদে রয়েছে অগ্নি, অগ্নি রয়েছে চাকায়
দূর-দূরান্তে চলে যাব, চলে যাব হারাবলী
কোথায় লুকাবে, খুঁজে বার করবই হুতাশন
কোন্ ঘূর্ণনে লুকাবে অর্ক, লুকাবে ত্বিষাম্পাত
পরোয়া করি না জিউসের দ্বেষ কিংবা দুর্মতি
রোদসী পৃথ্বী বাঁচাতে উঠব চূড়ায়
নাবালে নামবো, তীক্ষ্ণ বাটালি হাতে
কেটে আনবো অগ্নি-জটার শেকড়

বড় সন্তাপে আছি…
শীতে কাঁপছে আমার স্বজন, শোকস্থ মানুষেরা
হ্লাদিত কে, অন্তত আমি নই, পৃথিবীতে
চিরনিশা, ব্রততী মরেছে, এমন কি অর্কিড
সব কি পর্ণমোচী, মঞ্জরী নেই, হাহাকার কুসুমিত

মানুষ, তোমরা সলতে পাকিয়ে রাখো
আগুন আমি আনবই ঠিক, সলতে পাকিয়ে রাখো
রাখো দীপ-শৃংখলা।

প্যাণ্ডোরা ঃ

প্রজনন নয় শয়নে রয়েছে দোলা
আমরা দুজনে ভাসায়েছি মান্দাস
উজানে-ভাটায় বিজড়িত আশ্লেষ
উড়ছে আকাশে হার্দ্য সুবাসনা
মুগ্ধতা নয় ভালবাসা মনোনীত।
মর্মে আজিকে হাজার বেহালা বাজে
বিলাস-সৌধ গড়েছি চিত্ত-গুহায়
তবুও আমি শরমিত ত্রপমান
আমরা কি তবে প্রেমের প্রতীক হব!
এপিমিথিউস, এখন বিদায় দাও…

[প্রস্থান]

এপিমিথিউস ঃ

প্রেমের প্রতীক! তবে অসূয়া আসছে কেন
হৃদয় আমার খিন্ন, বিচলিত
প্যাণ্ডোরা! তুমি পেটিকা দেবে না
অনুদার দুরবগাহ
হায়, তুমি কি সীমন্তিনী!
সপ্তপদী হয়েছে কিন্তু ব্যর্থ কড়ি-খেলা
বিনিময় ছাড়া ভালবাসা জেনো বৃথা

মোমের পেটিকা সর্প-খোলসে ঢাকা

ফণা তুলে আছে চক্রী অষ্টনাগ
ভেতরে কি আছে দীপ্র পক্ষী কোন
স্বাধীনতা চায়, তাই পাখসাট !

প্যাণ্ডোরা গেছে শঙ্খ কুড়াতে দূরে
এই অবসর, ভাঙবো পিঁজরাপোল
খুলবো পেটিকা আজ, আমাকে ঠেকাবে কে
দেখব ভেতরে আছে কি সোনার রেশম !

[এপিমিথিউসের পেটিকা-গ্রহণ ও উন্মোচন]
কে তোমরা বেরিয়ে এলে শ্লৈষ্মিক বিকলাঙ্গ
করছ' রক্তবমি, সূতিকাগারে মৃত্যু ছিল না
আজ্ঞাপালনকারী ?

[ঝড়ের শব্দ, শীৎকার, বাদুড়ের ডানার
শব্দ ও তীব্র শিস্]
শরীরে আমার জরা ছড়াচ্ছে স্তুতি
আ—আ—আ—আ···
অগম্যাগমন করিনি তাও
রক্তের বিষ বাড়ছে, বিষ বাড়ছে, বিষ বাড়ছে
দুহাতে কুঠ, দুপায়ে কুষ্ঠ, করতল অপহৃত
প্যাণ্ডোরা তুমি কোথা, তুমিও কি জরাবতী
দুঃখ তো জানি শুধুই গড়ায় নিচে
আজ তবে কেন উপরে আসছে উঠে
আ—আ—আ—আ···

প্যাণ্ডোরা ঃ

[ছুটে এসে]
একি, একি করলে এপিমিথিউস
তুমি কি জানো না দেবী নই আমি
সামান্যা মানুষী, তোমাকে দিয়েছি প্রেম
পেলাম চিত্তদাহ
অশ্রুমতি ! অনুকম্পা চেয়েছিল !

অদূরে পেটিকা ভাঙা
বিশ্বাস তবে পরী, উড়ে গেছে কোথা…
পেটিকা বন্ধ কর
পেটিকার নিচে আশা
এ-আশা তমোহর
দিও দুর্বল মানুষেরে
দিওনা আমার হা-হুতাশ, কাতরতা
জানিও তবু এই শোকগাথা
জানুক তাহারা কোথায় অপৌরুষ
এপিমিথিউস
ধিক্ তোমাকে

জরা ও মৃত্যু তেমন অসহ নয়
যেমন মনস্তাপ !

হাতের শঙ্খ হতেছে রক্তমুখী
শরীর আমার শাদা শঙ্খ যেন
মুছে গেছে রক্তিম
মৃত্যু কি তবে আসছেই
মৃত্যু তোমাকে সোহাগ জানাই আমি
স্থাপনা চাইনা হৃদয়ে অবিশ্বাস
এপিমিথিউস
অবিমৃষ্যকারী
মৃত্যু চাই, তোমাকে চাইনা আমি
মৃত্যু আসছে দেখ, ওপরে চাঁদ
নিচে মরু-ক্রমেলক
মৃত্যু-উট আমাকে শুঁকছে দেখ
মৃত্যুর কুঁজ আমার স্তনন পাবে
এপিমিথিউস রইল অপ্রসাদ
জরাকে পাইনে ভয়, মৃত্যু তো আসবেই
জরাকে পাইনে ভয়, মৃত্যু তো আসবেই
মৃত্যু আসছে তার ঐ নীল ঘোড়া
আমার শরীরে রাখে পা, আঃ

[প্যাণ্ডোরার মৃত্যু]

[পৃথিবীর মানুষেরা] ঃ

বাঁচাও বাঁচাও…
বিষ ধোঁয়া ওড়ে, বৃষ্টিতে ঝরে শিসে
অরণ্য মথিত, পৃথিবীতে বয় আঁধি
গৃধিনীর ডাকে গর্ভ উঠছে কেঁপে
সিঞ্চন নেই, ফাটছে ঊষর মাটি
তরুগুলি সব হারায়েছে তরুণিমা
জরতী পৃথ্বি কাঁপে, কাঁপে তার অঙ্গুলি
কোথায় জীয়ন-কাঠি, কেড়ে নাও জাড্য
বাঁচাও, বাঁচাও উঃ যন্ত্রণা কেন এত !

প্রমিথিউস ঃ

বৃদ্ধ ইয়াপেতাসকে যদি মানুষেরা
পিতা ভাবে, তবে আমিও মানুষ
আজ থেকে তোমরা দেবতা বলে ডেকোনা।
যে অত্যাশ্চর্য বিজ্ঞান শিখায়েছি দেবতায়
তা থেকে বিরত হব। দেবতারা আগুন
সঞ্চিত রেখেছে সূর্যে যা চৌম্বক-ক্ষেত্রে
পরিণত, চারপাশে সতর্ক প্রহরা…
অগ্নি সংরক্ষণের নিয়ম আমিই শিখিয়েছি
হায়, কে জানত দুর্ভাগ্য এভাবে গড়ায়
যেমন গড়িয়ে পড়ে লোষ্ট্র বা পাথর
পাহাড়-চুড়া থেকে

তবু অগ্নি বয়ে যায় উষ্ণ থেকে শীতলে—
যেমন জল গড়ায় আর কি—এসব এখনও
অপরিজ্ঞাত দেবতাদের, তাই এই গুপ্ত নলিকায়
ভরতে হবে আগুনের কণা
সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত কৌশল অজানা
দেবতার। জানেনা অনুবিভাজনে
যে শক্তি নিহিত মানুষের অধিগত হলে

দেবতার সর্বনাশ। সেই সর্বনাশ চাই
কিন্তু সাবধান হতে হবে, অন্তহীন
সন্দেহের বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে জিউস
সব কিছু করতে হবে সন্তর্পণে, গোপনে।

[প্রমিথিউস ও মিনার্ভা]

মিনার্ভা বাড়াও অদৃশ্য হাত
তোমার রথের চাকায় রয়েছে অগ্নি
বাড়াও আস্তে হাত
দেবতা অমর নয়ঃ তবু লোকগাথা ঃ
অগ্নি দিলে অমরতা পাওয়া যায়
বাড়াও তোমার হাত
চাতুরি নয়, চাই চুক্তির বিশ্বাস
প্রয়োজন অপরাজেয়
বাড়াও আস্তে হাত···

[জিউসের শয়নকক্ষে ঃ জিউস ও হেরা]

জিউস ঃ

হেরা, প্রিয়তমে
জলে কর্পূর দিওনা
আমি তো বৃদ্ধ নই, দাঁত নড়বড়ে
নয়, তবে কর্পূর কেন, লবঙ্গের জল কেন?
আয়ো থাকলে বলতুম চুল্লু নিয়ে এসো
তোমার কাছে চাইছি ধান্যেশ্বরী
এখন নিভাঁজ ঘুম দেব
ফিরিও না আমাকে পটেশ্বরী
যা কিছু সারাৎসার, মুঠোয়
গুননিধি প্রমিথিউসের ঢোলে মেরেছি ঘা
এখন একটু ঘুমুবো, ইয়া হো, হা—

হেরা ঃ

আয়ো, আয়ো, আয়ো
শয়ন ছাড়া কী জানে

ঘৃণ্য, নির্বাসনে
পাঠায়েছি দূরে
বুড়ো বাহাত্তুরে
তোমার বৈচিত্র্য
জানা নেই কার !
নাও, এখন কুলকুচি কর
হীরেমণ, বুড়ো দাঁড়কাক
ছিঃ পালকে ধরেছে প্যাক···

[ক্রাতোসের প্রবেশ]

ক্রাতোস ঃ

পিতা, পিতা, সর্বনাশ হয়েছে
পৃথিবীতে আগুন পৌঁছেছে
ঘরে ঘরে দীপাবলী
মানুষ নাচছে, হাসছে, জ্বালাচ্ছে মশাল
শুনতে পাচ্ছেন আনন্দ-লহরী,
বৃন্দগান ?
ঐ দেখুন,
জেলেদের নৌকায় নৌকায় ঘেরাটোপে
অগ্নি মালার মত ছড়িয়ে পড়ছে
নদীবক্ষে, জলের ওপরে আলোর মূর্ছনা
পৃথিবীতে সায়ন্তন নেই, নেই নিশি।

প্রদোষে অগ্নি নিয়ে গেছে প্রমিথিউস।

পিতা, ব্যঙ্গ করছে সবাই আপনাকে
জয়ধ্বনি দিচ্ছে প্রমিথিউসের নামে
দেবতারাও কেউ কেউ হয়তোবা তাঁর পক্ষে
আপনার সিংহাসন বিপন্ন···

[হেপাস্টাস ও বীয়ার প্রবেশ]

জিউস ঃ

পুত্র হেপাস্টাস, পুত্র বীয়া ! ভালই হল

তোমরা এসে গেছ, মনস্থির করেছি
(তোমরা ছাড়া আর কাকেইবা করি
বিশ্বাস, রক্তের অন্বয় কার সাথেই আছেবা)
তোমাদের ওপরে রইল সুকঠিন দায়িত্ব-ভার
ঃ যাও বন্দী কর প্রমিথিউসকে
নিয়ে যাও হিম ককেশাসে
এমনভাবে শৃংখলিত কর
যেন সে উর্দ্ধে তাকাতে না পারে
যেন তার চোখের জল সমুদ্র-লবণে
রূপান্তরিত হয়, ওসেনিয় কন্যার
স্তনের ওপরে পড়ে ঐ অশ্রুবিন্দু
মহানুভব, মহানুভব, প্রমিথিউস মহানুভব !

হেপাস্টাস ঃ

পিতা, মার্জনা করেন যদি, তবে বলি
একাজ সঠিক হচ্ছে না, প্রমিথিউস
দেবতা—আমাদের মত, সংবিধানে নেই
দেবতার নির্বাসন, দেবতা সর্বত্র স্বাধীন।

ক্রাতোস ঃ

মূর্খ হেপাস্টাস, চরাচরে একমাত্র স্বাধীন
জিউস। তাঁর কাছে প্রমিথিউস
ভোঁতা ছুরি…

হেপা ঃ

থুরি,
পিতা যে সার্বভৌম—অস্বীকার করি না
তবু…

জিউস ঃ

হেপাস্টাস ! দেশদ্রোহীর একমাত্র শাস্তি
মৃত্যু। তবু তাকে মৃত্যুদণ্ড দিইনি

এখানেই খুঁজে নাও মহানুভবতা
শুধু কেড়ে নেব তার দীপ্তির নির্যাস
তার প্রবণতা
আমার আদেশ, যাও বন্দী কর তাকে
এবং ঘোষণা কর 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' নিষিদ্ধ
[হেপাস্টাসের প্রস্থান]

[ককেশাসের শৈল-শিখরে প্রমিথিউস শৃংখলিত]

প্রমিথিউস ঃ

রাত্রি তোমাকে সুস্বাগতম
আঁধারে ঢাকবে আমার যন্ত্রণা
সূর্য তোমাকে সুস্বাগতম
তোমার নিকটে চাইবে মার্জনা
দুষ্ট তুষার, গলে হবে জল
পায়ের নখ ছুঁয়েছে প্রবল
শীত, শুধু শেকলের সফলতা
পেয়েছে বুক, হাত ও পা
আমার জন্য বুনেছে হিমের কাঁথা
আমার স্বজন
অগ্নি-অরণি মানুষের হাতে আজ
মালিন্য নেই, আগুনের রং শাদা

আসছে স্বর্ণ-ঈগল, হাওয়ায় উঠছে স্বনন
তীক্ষ্ণ চঞ্চু ওর—অন্ধ অগ্নিস্রাবী
আমার চেতনা খাবে, খাবে হৃদয়ের হরতন
জানেনা মূর্খ ও, খাওয়া যায় না উজ্জীবন
নোতুবা কি করে আছি বেঁচে, কোন্ আহরণ
হৃদয় রাখে যে অটুট, নাকি তা অ-হণনীয়
ঋদ্ধ মানুষ আসবে তোমরা কবে
মুক্তির পাশা তোমাদের হাতে আছে
'মিথ্যা-চেতনা'—সূক্ষ্ম পঙ্খ ওর
পারে তোমাদের চোখে পড়তে

দৃষ্টি হারাবে দেবতা তাহা চায়
সাবধানে থেকো, দুধে-ভাতে থাকো তোমরা
সুচেতনা পাক প্রশ্রয়।

... ...

ঈগল ঃ

নীতি-নির্ধারণ তাঁর ইচ্ছা, তিনি জিউস, তুঁতপোকা
আমরা বুনছি কাপড়, মজুরির দাস সবে
সুবিধেটা শুধু তীব্র চঞ্চু-খাস জিউসের ইচ্ছেয়,
ডানায় সাজানো সৈন্য-পুলিশ-আমলারা
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অস্থির করে তুলবে।
ঢালবো নয়নে বায়ুস্থলীর বিষ
প্রমিথিউস, আমার হননে তোমার হৃৎপিণ্ড-
দিনান্তে ফের যে—কি—সেই
উঃ এই জায়গাটাই
বুঝে উঠতে পারি নে
ঘেঁটে দেখলেম দলিল-দস্তাবেজ
পুরনো ফাইল। ঠুকরে কত খাবো
চঞ্চুতে মোর ব্যথা
[জিভ কেটে]
এই যাঃ, বলে ফেলেছি দুর্বলতা
জিউস শুনলে ঘটবে পদাবনতি!
তবু আর কত ঠোকরাবো
আমার কি বিরামবিহীন ওড়া?
সারাদিন ঠুকরে যাচ্ছি ভাই,
জিউসকে বলবো ভাতা বাড়াও
পোষাচ্ছে না মজুরী

যাই তবে
ফাইলে বন্দী স্ত্রী ও পুত্র
খুঁজে বার করতে হবে...

প্রমিথিউস ঃ

একটু পরে আসবে ওসেনিয়া
বড় আদরের মেয়ে এশিয়া তাঁর
যার স্তনে হাত রেখেছি কতবার
সেই হাতে আজ শেকলের কাঁটা
আহা সে দেখবে কেমন করে !
বশ্যতা দিলে গার্হস্থ্য সুখে ফিরব
ওসেনিয়া মাতা চেয়েছেন তা !

হা-হা-হা বশ্যতা দিলে
মরণ এড়ানো যায়, কিন্তু
জীবন কি তাতে মেলে
সরীসৃপের জীবন চাই না
হবনা নক্তচারী
স্বর্গে ফিরতে চাই
এ জীবন একাকী আমার নয়
এ জীবন তবে ভাগ-বাঁটোয়ারা !

ঈগলের ভারী ডানা
নখরে মৃত্যু আঁকা
ইতিহাস তবু চাকা
ঠেলছে মানুষ রোজ
ঠেলতে ঠেলতে চাকা
পৌঁছবে ককেশাসে
শেকল ভাঙতে হিংসা কিছুটা চাই
কিন্তু তা পরিকল্পিত
রক্ত-চক্ষু বুনো-মোষ নয়।
প্রতীক্ষা কি তবে দীর্ঘ মিছিল
যাবে না ওপারে যাওয়া
কিন্তু তা যত দীর্ঘ হোক
অপেক্ষায় আছি আমি

মানুষ তোমরা আসবে কবে বল
দীপ্র চেতনা নিয়ে
'অশ্বের মুখে ফেণা
বুক উঠছে নামছে উঠছে
পেছনে সূর্য তার'
—দেখব কবে বল
দাঁড়িয়ে থাকব হেথা
দাঁড়িয়ে থাকব হেথা
দাঁড়িয়ে থাকব···
দাঁড়িয়ে······

বেনী সংহার

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

দিঘিটা মজা। উঁচু পাড়ের ওপর তাল গাছের সারি। পাড়ের নীচে গড়ান। বর্ষার জল বয়ে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে গড়ানের ওপর বড় বড় নহর তৈরী হয়েছে। একটা মানুষ অনায়াসে সেঁধিয়ে যায় তার মধ্যে। কিংবা খাঁজের মধ্যে শরীরটা আটকে রেখে জিরিয়ে নিতে পারে। যদি সুয্যি তখন কোনাকুনি রোদ ছড়ায় তাহলে খানিক ছায়া পড়ে গায়ে। যখন মাথার ওপর, তখন রোদের তাতে শরীর জ্বলে পুড়ে খাক হয়। আবার সুয্যি যখন পশ্চিমে ঢলে তখন গড়ানের বিশাল ছায়া পড়ে ধান খেতে। এখন দিঘিতে জল নেই। কালো কালো শুকনো পাঁক। মাটির চাঙ্গড় ফেটে চৌচির। যেন কেউ ছুরি দিয়ে কেটে ফালাফালা করে দিয়েছে।

তামার বরণ আকাশ। সারাদিন ধরে সুয্যি ঠাকুর আগুন বর্ষায়। নিরনের দিনে ফাটল দিয়ে ভাপ ওঠে। পুকুরের গর্ভকোটর পর্যন্ত শুখো। ফাটা ফাটা। গর্ভমোচনের পর পেটের যা অবস্থা।

দিঘির পাড়ে কাঁদরের দিকে পা ছড়িয়ে বসে তাড়ি খাচ্ছিল বিশাই। উপস্থিত, তাড়িই ওর খাদ্য এবং পানীয়। বেশ কিছুদিন যাবৎ, দিনে ও রাতে। পাশিরা ওকে দিয়ে সাঁঝেরবেলায় গাছের মাথায় হাঁড়ি বাঁধায়। আবার ভোরবেলায় পাড়িয়ে নেয়। কুড়িতে এক। অর্থাৎ কুড়িটা হাঁড়ি বাঁধলে আর পাড়লে একহাঁড়ি বিশাইএর পাওনা। দিঘির পাড়ের সব তালগাছগুলো ইজারা নিয়েছে পাশিরা। গড়ে দুহাঁড়ি পায় বিশাই। হাঁড়ি পিছু পাঁচ টাকা দাম। বিশাই বেচে না। খায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলে থাকে। ভুলে থাকে আরও অনেক কিছু। বিশেষ করে বুকের মধ্যে যে দগদগে ঘাটা আছে তার যন্ত্রণা। নেশা টুটে গেলেই যন্ত্রণাটা টের পায়। শরীরটা বিবশ হয়ে আসতে থাকে। তখন আবার নেশা না করলে যন্ত্রণাটার হাত থেকে মুক্তি পায় না বিশাই।

আগে গাছে ওঠার সময় পায়ে তাগা পরত বিশাই। এখন খালি পায়েও কাঠবিড়ালির মত তরতর করে উঠে যায়। তবে যদি বল পা ফসকায় কি না, তা ফসকায়। কখনও কখনও পা ফসকে নীচের দিকে ঘসটে যায় খানিক,

কিন্তু যেহেতু নেশার ঘোরে থাকে বিশাই এজন্য বিশেষ টের পায় না। তবে অভ্যেসের দরুন মাটিতে পড়ে যায় না। কাটা-ছেঁড়াগুলো থেকে রক্ত ঝরে, সে রক্ত শুকিয়ে গিয়ে প্রবালের দানার মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শরীর থেকে ঝরে পড়ে, ঘা হয়, শরীরটাকে কিছুদিন কষ্ট দেয়। তারপর আবার সেরে যায়। গরীবের যা রিত। কষ্টগুলো প্রথম প্রথম কষ্ট দেয়, যেমন ক্ষুধার কষ্ট, ব্যারামের কষ্ট, খাটুনির কষ্ট, ইত্যাদি। পরে সে কষ্টগুলো গা সহা হয়ে যায়। যেমন, এই এখন, এখন আর কোন কষ্টই গায়ে লাগে না বিশাইএর। এমনকি ক্ষুধার কষ্টটাও জয় করেছে ও।

অবশ্য তাড়ি, পচাই এবং কখনও কখনও বাংলা মদ ওর সহনশীলতায় সহায়তা করেছে, সবটা নয় অবশ্যই, তবে এই ক্ষুধাজয়ের কৃতিত্ব সবটাই একা বিশাইএর। বিশাইএরই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কৃতিত্বের জন্য ওকে কি মূল্য দিতে হয়েছে, তাহলে বিশাই বলবে, ওর জীবনটাই ও কানাকড়িতে বিকিয়ে দিয়েছে। এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ কাম, ক্রোধ লোভ আদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে কব্জা করবার জন্য ন্যাংটা ফকির সাজতে হয়েছে বিশাইকে।

যদি বল কেন, তাহলে বিশাই বলবে, 'ঈশ্বর বাবু, তুমি আমাকে দিয়েছিলেটা কি, যে নেবার ভয় দেখাও। আমি তো শালা সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ল্যাংটা শিব হয়ে গেইছি হে। কোমরের একফালি ট্যানা ছাড়তে পারিনি, লোকে লজ্জা পাবে বলে। নইলে আমার আর বাটপাড়ের ভয় কি।'

তাড়ি খেলে এইসব দার্শনিক তত্ত্বগুলো ওর মাথার মধ্যে বিজবিজ করে। আসলে বিশাই তো জাত ল্যাংটা নয়। ওরও একসময় চারবিঘে কালা দোয়েস জমি ছিল। বাড়ি নামোয় সব্জির ক্ষেত। সেখানে ও ঝুমকো বেগুন ফলাতো। ঝিঙ্গে, শশা, বরবটি। ঘরের চালে লাউ কুমড়োর লতা। দাঁড়ের ওপর ময়না। সেটা আবার কৃষ্ণ নাম বলত। আর ছিল—

'আহারে, আহা, আহা—' তাড়ির ভাঁড়ের কানাটা একহাতে জড়িয়ে আরেক হাতে বুকটাকে চেপে কঁকিয়ে উঠল বিশাই।

ওর সহপায়ী মকর বাউরী ওকে এমনি আর্তনাদ করতে দেখে আধখোলা চোখে তাকিয়ে বলল, 'কি হল্য রে বিশাই, অমন গাঙ্গায় উঠলি কেনে?'

এবার তাড়ির ভাঁড়ের গলা জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল বিশাই। 'মকরারে, পুরানো দিন বেস্তরন (স্মরণ) হঞ্ছে আমার। বুকে আমার খরিশ সাপ দংশায় রে।'

পুরোন দিনের স্মৃতি বুকের মাঝে কেউটে সাপের মত দংশন করছে।

মকরা, পাছে নেশা কেটে যায়, এজন্য চোখ না খুলেই বলল 'দুখ-দরদ সব ফাবড়াঞ দে চ্যালা কাঠের মতন। ছেঁড়া ট্যানার মতন ফেলে দে।'

বিশাই আবার ককিয়ে উঠল 'কলজেটো কি করে ফাবড়াঞ বল্ ?'

হেন সময়ে দিঘির উত্তর দিকের পাড়ে দেখা গেল উদ্ধব হনহনিয়ে হেঁটে আসছে।

নেশা জমলেও জ্ঞান ঠিক টনটনে আছে, নইলে, গোলাপী চোখেও অতদূর থেকে উদ্ধবকে দেখে চিনল কি করে ?

উদ্ধবের কাঁধে একটা খেপলা জাল আর এক হাতে খালুই। উদ্ধব চলেছে মাছ ধরতে। হায় রে কপাল। এদিকে খাল বিল সব শুকিয়ে ফুটিফাটা। তখন নহরের খাঁজে শরীরটাকে আটকে রেখে মৌতাতটা আস্বাদন করছিল বিশাই। আজ পাঁচদিন পেটে দানা পড়েনি, কিন্তু তাড়ির দৌলতে ও এখন শায়েন শা'। ওর চুপসে যাওয়া পেটে খোঁচা মেরে মকরা বলল, 'এই বিশাই, তোর শউর।'

বিশাই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, 'কই কুথায় ?' তখন প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছিল উদ্ধব।

মকরা বলল 'ওই হোথায়।'

টলমলে পায়ে পাড়ের ওপর উঠে দাঁড়াল বিশাই। উদ্ধব তখন নিকটস্থ। পাড়ের ওপর ওর মুখোমুখি হতেই ওর পায়ে সটান গড়াগড়ি দিয়ে বিশাই বলল 'দণ্ডবত হই, শউরবাবা দণ্ডবত হই।'

মকরা গড়ানের ধারে দাঁড়িয়ে দুপায়ের ওপর দোল খাচ্ছিল, মানে এক পা ছেড়ে আরেক পায়ের ওপর ভার দিয়ে দাঁড়ানোর ফলে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছিল না।

বিশাই তেমনি টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'অ্যাই মকরা শউর-বাবাকে গড় কর।'

তৎক্ষণাৎ উদ্ধরের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করল মকরা।

উদ্ধব হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়েছিল। কারণ ওরা পথ না ছাড়লে পাড়ের সরু রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না।

অত্যন্ত, বিনয়ের সঙ্গে জড়ানো গলায় বিশাই বলল 'শউরবাবা, তুমি কুথাকে যেছেন ?'

উদ্ধব গম্ভীর গলায় বলল 'কাঁদনবালার বিলে, মাছ ধরতে।'

বিশাই আবার বলল 'শরীল-গতিক ভালো, শউরবাবা ?'

সংক্ষিপ্ত জবাব দিল উদ্ধব 'ভালো।' এদিকে পথ না ছাড়লে রোদ্দুরে মাথার চাঁদি ফাটে। ধরিত্রীর বুকে আগুন জলছে। গাছের পাতাগুলোও শুকিয়ে নেতিয়ে পড়ছে। উড়ন্ত পাখি ঝুপঝাপ মাটিতে পড়ছে। পুকুরের মাছ ঘরে গিয়ে ভেসে উঠছে। এই প্রচণ্ড খরায় মানুষই বাঁওড়ে যাচ্ছে, পশু-পাখি, বৃক্ষলতা তো কোন ছার। এর নাম খরা। জল, বায়ু ও খাদ্য জীবনধারনের এই তিনটি পদার্থকে নিংড়ে নেয়।

বিশাই আর মকরা দুজন দুদিকে সরে গিয়ে একটুখানি পথ দিল উদ্ধবকে। মকরা গেল পুকুরের দিকে, গড়ানের দিকে বিশাই। তারপর উদ্ধব চলে যেতেই মকরা পাড়ের রাস্তাটুকু পার হয়ে গড়ানের ধারে বিশাইএর পাশে এসে বসল। তাড়ির ভাঁড়ে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, ভাগ করে খেল দুজনে।

তখন মকরা বলল 'তোর শউরবাবা অন্তরে ভারী ব্যথা পেঞেছেন মনে হল্য।'

বিশাই বলল 'কেনে উনার ভালমন্দর খপর শুধাঞেছি, শরীল-গতিকের খপরও লিঞেছি, তবে ব্যথা পেঞেছেন কেনে ?'

'—না, সেকথা লয়' ইতস্তত করে মকরা বলল 'উঁয়ার বিটিটোকে তু ঘরে রাখতে নারলি, তাই শউরা বাবা ব্যথা পেঞেছেন বোধ করি।'

কথাটা শুনে গুম হয়ে গেল বিশাই। ওর গলার কাছে একটা কান্না দলা পাকিয়ে উঠছিল। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা। কাঠঠোকরার মত ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাচ্ছিল যেন।

মকরা বলল 'ভালই হঞেছে চলে গেইছে। বুইলি, নইলে ঘরেই অসৈরন কাণ্ড হত। যেমন আমার।'

—'তোর, কি -'

—'আমার তো ঘরেই অসৈরন। বউটা আর জুয়ান বিটি দুটো। মা, বিটি দুইয়ের লেগেই ঘরে লাগর আসে। আমার চোখের সামনে।'

—'তুই কি করিস ?'

—আমি কি করব, লিখাটু সোয়ামি, লিখাটু বাপ। আর খাটত কুথায় বল, দেশে কাজ আছে ?'

—'ইবার মরে যেতি পারিস মকরা। কেমন খরা এইচে দেশে।'

—'সে তো বছর-দিনই আসে, মরণ আসে কৈ ?'

—বছর বছরই তো মরিস। ইবার একেবারে মর‍্যে যাবি। শেষবারের

মতন। ইবার খরায় পশু-পক্ষীও মরছে। জলে মরে মাছ। আকাশে মরে পাখ-পাখালি। থলে মরে জীবজন্তু আর গাছ-গাছালি। আর আমরাও তো শালা জন্তুর সামিল। শ্যাল কুকুরের মতন।'

'হক কথা। জন্তুরও অধম। খরার সময় জন্তুর খাদ্য খাই। পাখির খাদ্যও খাই। তবু শালা বেঁচে থাকি। ইবার খরায় জন্তুরও মরণ। মানুষেরও।'

বিশাই বলল, 'সব মানুষের লয়। যেমন ধর কিরিটি গোলদার। উ শালা শত দুর্বিপাকেও মরবেক নাই। উয়ার ঘরের চোর-কুঠুরিতে চোরাই চালের আড়ত।'

'—কিংবা ধর, মদন মণ্ডল। উয়ার শালা র‍্যাশন দোকান। চিনি, কেরাচিন, জিয়ার, টিয়ার এর গম সব শালা হ্যাপিস করে দেয় কালা-বাজারে। আজব রাজার কল।'

অবনী সাহার নামটা ইচ্ছে করেই তুলল না মকরা। বিশাই ব্যথা পাবে। ঘড়ঘড় করে খানিক কেশে, নিকটেই গয়ার ফেলে গলাটা খানিক সাফ নিয়ে বিশাই বলল। ধুর শালা 'এখুন রাজা কুথায়। এখুন তো স্বাধীন দেশ। এখুন তো আমরাই রাজা।'

মকরার ধন্দ লাগে। স্বাধীন তো খেতে পাই না কেনে? শালা বলে কিনা আমরাই রাজা। কিসের রাজা? জমিদারীটা নামেই উঠেছে। এখনও শালা জোতদারের ঘরে ব্যাগার দিতে হয়। জমির নাকি সিলিং হয়েছে। তো শালা লাকড়ার দল নিজের নামে, বউএর নামে বাঁধা খানকির নামে জমি বেনামি করে রেখেছে। সরকারকে কলা দেখিয়ে। আগেও যেমন মানুষ মানুষদের ঠেঙ্গাত, এখনও তেমনি ঠেঙ্গায়। কিংবা আগে যেমন রাতের বেলায় বেয়াড়া ভাগচাষীর খড়ের চালায় লাল ঘোড়া চালিয়ে দিত, এখনও তেমনি দেয়। তবে রাজা কিসের? ভুখা পেটের রাজা।

ধুর শালা। এসব ভেবে কি হবে, তার চেয়ে তাড়ি খাই, এই ভেবে মকরা বলল 'বিশাই, আর একটা পাড়বি নাকি?'

বিশাই বলল 'না, আমার তাগত নাই। তাছাড়া আমার নেশা জমছে এখন মেলা বকর বকর করিস না।'

মকরা বিষণ্ন কণ্ঠে বলল 'তবে ঘর যাই। ঘর যেঞেই বা কি হবেক। দেখব দোর গোড়ায় বকুলতলায় একটা লাগর দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ের, না বউএর

কে জানে। এই পড়ন্ত বয়সেও বউটা বেশ ডাঁটো সাঁটো। চোখ টানে। আমি শালা ফালতু।

তারপর কথার পিঠে কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের পানে রওনা হয় মকরা। শেষ কথা, ও যা ভাবল, তা এই, খরায় যখন দেশ জলছে, তখনও গুটিকয় ভাগ্যবান মানুষের প্রাণে রসের বান ডাকে, কুকুর-কুকুরীর মত স্থান-অস্থান নেই, লোক লজ্জা নেই। একদিন একটা ছোকরাকে ভাদুরে-কুকুরের মত ওর মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিল মকরা। এমন কি মকরাকে দেখেও তোয়াক্কা করেনি। মকরা যেন পথের ধারে ফেলে দেওয়া ডাবের খোলা। ঘরে পৌঁছানোর আগের মুহূর্তে মকরা ভাবল, ঈশ্বর, ধন্যি তোমার সৃষ্টি। খরা, আকাল অবিষ্টি। যাঃ শালা, একটা পদ্য হয়ে গেল যে।

২

ওদিকে সাঁঝের বেলায় উদ্ধব শূন্য হাতে ঘরে ফিরল। খালুই-এর মধ্যে কটা গেঁড়ি গুগলি। জল মরে গেছে। বিলপুকুর সব শুকনো। পাঁকের মধ্যে গেঁড়ি গুগলি জলের অভাবে ধুঁকছে। তারই কটা তুলে এনেছে।

ওর বউ কৌশল্যাও একটোকা আগড়া-মোথড়া কয়া ধানের চাল জোগাড় করেছিল। তাই বাছছিল। ছোট মেয়েটা দাওয়ায় শুয়ে গোঙাচ্ছিল। উদ্ধব খালুইটা দাওয়ায় রেখে মেয়েটার পাশে এসে বসল। বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা।

কাল রাতে একটা দানাও ছিল না ঘরে। বহুদিনের পুরোন ক'মুঠো মহুল ছিল হাঁড়িতে। তাই সেদ্ধ করে বাপ মেয়েকে বেড়ে দিয়েছিল কৌশল্যা। মহুলগুলো বোধ করি পচে গিয়েছিল। কিংবা পোকা ধরেছিল। খেতেও বিস্বাদ ঠেকছিল। তথাপি খেয়েছিল উদ্ধব। মেয়েটা অতশত বোঝেনি। খিদের তাড়নায় গোগ্রাসে গিলেছিল। তারপর যা হবার তাই হয়েছে। বাড়ি আর মাঠ, মাঠ আর বাড়ি। উদ্ধবের পেটটাও মাঝে মাঝে খিমচে খিমচে উঠছিল, কিন্তু ও আমল দেয়নি। পেটে যদি বিষ-বায়ু জমে থাকে কিংবা যদি অম্বল হয়ে থাকে, তাহলে একদিক দিয়ে ভাল। খিদে পাবে না চেরখন। সেটা একটা বাঁচোয়া।

উদ্ধবের ফিরে আসাটা টের পায়নি কৌশল্যা। ধানগুলো কুলো থেকে টোকায় আজড়ে পিছু ফিরতেই উদ্ধবকে দেখতে পেয়ে বলল 'তুমি কখুন এলে?'

উদ্ধব বলল 'এই মাত্তর। তুই তেখন ধান পাছুড়তেছিলি। মানুষ কেমন আছে?'

'ভাল নাই। সকাল থেকে 'তাশির' (হুঁস) নাই। নেতায়ে পড়েছে। শরীলে ত' কিছু নাই। তুমি কিছু পেলে?'

উদ্ধব বলল 'কটা গেঁড়ি গুগলি। খালুই-এ আছে।'

ঘোরের মধ্যেই মেয়েটা উঁ আঁ করে উঠল। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোল উদ্ধব। মেয়েটা মরে যাবে নাকি? ওর বুকটা ধক করে উঠল একবার।

চিন্তাটা ভুলবার জন্যই বিশেষ করে উদ্ধব শুধোল, 'চাল কুথায় পেলি?'

—'জটা পাগলীর ভিটেয়। উই পথ দে আসতেছিলাম। দেখলাম ভিটেটা জঙ্গলে ভর্তি। কেউ তো যায় না উদিক পানে। খানিকটা ভুতের ভয়ে, খানিকটা সাপখোপের ভয়ে। দেখলাম একটা কেলে হাঁড়ি কেতরে পড়ে আছে। হাতড়ে দেখলাম কমুঠো আগড়া মোথড়া মিশোনো চাল।'

চাল চালই। কোথা থেকে পাওয়া গেছে, কি বৃত্তান্ত, জেনে লাভ কি? ক্ষণিক উল্লাসে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল উদ্ধবের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, শুধু আজ রাতটার জন্যই আহারের সংস্থান হল। কিন্তু কাল? পরশু? তারপর? প্রতিদিনকার বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন চিন্তা করতে হয়। হা ঈশ্বর, এই বাৎসরিক খরা-আকাল-দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জন্মভূমিতে প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার প্রাণপণ লড়াই যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

কৌশল্যা বলল, 'বাবু-ভেয়ারা মাছ দিয়ে ভাত খায়, তুমি আজ ভাত দিয়ে মাছ খাবে।'

উদ্ধব বলল 'মাছ কোথায়, গেঁড়ি-গুগলি'।

কৌশল্যা বলল 'ওই হল। আঁস তো বটে।'

উদ্ধব বলল আজ জামাইএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

কৌশল্যা, চাল ধুতে যাচ্ছিল, বলল, 'কে, বিশাই?'

উদ্ধব ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'একটা মেয়ের কটা জামাই হয়।' তারপরই ওর মনে হল, কৌশল্যা অবনীর কথা বলেনি তো?

কৌশল্যা আবার শুধোল 'কুথায়'?

—'বাবু বাঁধের পাড়ে। বসে বসে তাড়ি গিলছিল, উ আর মকরা।'

কৌশল্যা চুক চুক করে বলল 'আহা। বাউড়ে গেল বেচারী মানুষটা।'

কৌশল্যা বিশাইকে দোষারোপ করল না। কারণ ওর জীবনে যা ঘটেছে তাতে ওর বাঁউড়ে যাওয়া অর্থাৎ পাগল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু উদ্ধবের মত ভিন্ন। একটা মেয়েমানুষের জন্য বাঁউড়ে যাবি? তুই না পুরুষ মানুষ? একটা মেয়েমানুষ, না হয় ঘরের বউই হ'ল, তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দুঃখ বুকে নিয়ে চিরকাল হাহুতাশ করবি আর তাড়ি গিলবি।

'কি আর করা' বলল কৌশল্যা, 'কিন্তু রাজুরও তো দোষ দিতে পারি না। জুয়ান মেয়ে। গনগনে আঙারের মতন আঁচ শরীলে। তাছাড়া সখ আহ্লাদও তো আছে।'

তা আছে। সখ আছে, আহ্লাদ আছে। তার চেয়েও বড় যা আছে, বলতে গেলে দুনিয়াটা যার কাছে মাথা নোয়ায়, তার নাম ক্ষুধা।

খরার তরাসে মরার চেয়ে যে কোন উপায়ে বেঁচে থাকার নামই ধর্ম।

রাজেশ্বরী অর্থাৎ ওদের মেয়ে রাজুর প্রসঙ্গটা বড় তেতো লাগছিল কৌশল্যার কাছে। ও নিঃশব্দে কাঠ-কুটো জ্বেলে ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চাপিয়ে এল। সেই সময় ঝপ করে কি যেন পড়ল উঠোনে।

এই হয়েছে আর এক উপসর্গ। আকাশ থেকে পাখ-পাখালি ঝপঝপ মাটিতে পড়ছে। খানিক ডানা ঝাপটানি। ঠোঁটটা কেঁপে কেঁপে উঠছে থরথর করে। তারপর সব শেষ। রোদের যা তাত। ধরিত্রী ফেটে চৌচির। ঝাঁউরে যাচ্ছে মানুষ। পশুপাখি তো কোন ছার।

অত্যন্ত মমতার সঙ্গে আলগোছে ডানা ধরে পাখিটাকে তুলে আনল উদ্ধব। হরিয়াল। বড় ক্ষীণজীবী, কিন্তু বড় অহঙ্কারী। হরিয়াল কোনদিন মাটিতে পা রাখে না। শিকারিদের প্রিয় পাখি। মাটিতে পড়লে বুকের নরম অংশটুকু ফেটে যায়। হরিয়ালটার সবুজ পাখনা কেরোসিন কুপির মৃদু আলোকে ঝিকমিক করছিল।

কৌশল্যা বলল 'আহা গো, বুকখানি এখনও ধুকধুক করছে।'

তারপর ওরা পাখিটার মুখে দু ফোঁটা জল দিল। পাখিটার চোখ দুটো হঠাৎ কেমন উজ্জল হয়ে উঠল। সেই চোখে বেঁচে থাকার আশ্বাস খুঁজে পেল উদ্ধব। পাখিটাকে ঘরের কোনে শুইয়ে রেখে এল।

কৌশল্যা বলল, 'কাল রেতে মহীন খুড়োর বউটা গায়ে আগুন দিয়ে মরেছে। আহা, বড় কষ্ট পেয়েছে। ঘরে কেরাসিন ছিল না। লম্ফর মধ্যে যেটুকু ছিল, তাই দে কি তড়িঘড়ি মরা যায়।'

মহীন খুড়োর বউ অর্থে মহীনের ছেলের বউ। ছেলের নাম ভগীরথ। কি একটা অপকর্মের দায়ে আজ তিনমাস ধরে ফেরার। সম্পন্ন চাষীর ঘরে

বেশ ঘটা করে বিয়ে দিয়ে নোলক পরা ফুটফুটে বউ এনেছিল মহীন। তখন মহীনেরও বোলবোলাও অবস্থা। নিজজোতের জমি ছিল। অন্যের জমিও ভাগে চাষ করত। তখনই সরকার আইন করল বর্গাদাররের সত্ব রেকর্ড করতে হবে। সেই বছরই উচ্ছেদ হল মহীন। তারপর পার্টি ধরে। সমিতির কাছে ধর্ণা দিয়েও যখন কিছু হল না তখন ধীরে ধীরে নিজজোতের জমিগুলোও বেহাত হয়ে গেল।

কৌশল্যা বলল, 'বউটা আটমাসের পোয়াতি ছিল। থরে ছুটো লেণ্ডি গেণ্ডি আছে।'

অর্থাৎ আর একটি পরিবার হালভাঙা হয়ে সাগরে ভাসল। সে সাগরে শুধু উত্তাল ভয়ঙ্কর ঢেউ ছাড়া কিছু নেই।

উদ্ধব তখন ভাবছিল রাজেশ্বরীর কথা। রাজেশ্বরী কি বেঁচেছে?

কিছু মানুষ বাঁচে। বেঁচে থাকে। তারা বেঁচে থাকার কলাকৌশল রপ্ত করেছে। ওরাও বেঁচে আছে। ঘাস-পাতার ওপর আশ্রয় করে। কিন্তু পৃথিবী থেকে সবুজও ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

ছোট মেয়েটা তখনও ঘোরের মধ্যে ছিল। ওর নাম মানেশ্বরী। রাজেশ্বরীর বোন মানেশ্বরী। ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখল কৌশল্যা। ধুম জ্বর, তাই এমন ঝিমিয়ে আছে।

কৌশল্যা ভয় পেল এবং এই প্রথম নির্ভয়ে উদ্ধবকে বলল, 'একবার যাবে নাকি রাজুর কাছে?'

উদ্ধব কথাটার ধার দিয়েও গেল না। বলল, 'তবু কিছু মানুষ, বুইলি কৌশল্যা, বেশ সুখেই বেঁচে আছে।'

—'কেমন?'

—উয়ারা জিয়ার-টিয়ারের গম পায়। পে-মাষ্টারের কাছে কাজ পায়। অবিশ্যি তার লেগে বখরা দিতে হয়। ভেট দিতে হয়। বাবু-ভেয়ারা শুনেছি উপরওলাদের কাছে লিজদের বউদিগেও ভেট দেয়।'

—'হতি পারে। আমি জানি না। তা তুমি পাও না কেনে? জিয়ারের গম, টিয়ারের কাজ?'

'মর মাগী।' উদ্ধব বলল 'তার লেগে পার্টি ধরতি হয়।'

—'তা ধর না কেনে?'

এই অবুজ মেয়ে মানুষটাকে কি করে বোঝায় উদ্ধব, সে দেশে সরকার বদল হলেই সব কিছুরই বদল হয়ে যায়। পার্টি বদল হয়। পেমাষ্টার বাবুদের বদল

হয়। জিয়ার-টিয়ারের প্রাপক গরীব-গুরবো মানুষগুলোরও বদল হয়। আজ এক পার্টি ধরব, দুবছর পর সরকার বদল হলে কুন পার্টিতে থাকব? গরীব মানুষের অদৃষ্টের তো আর বদল হয় না। এ পার্টি যখন রাজ্য চালায় তখন ও পার্টি লোকজনরা জিয়ার-টিয়ার পায় না। আবার এ পার্টি যখন রাজ্য চালায় তখন ও পার্টির লোকজনরা প্যাঁদানি খায়। তাছাড়া আরও একটা কথা, বেঁচে থাকার যদি একটা পরিমান বরাদ্দ থাকত তাহলেও না হয় দেখা যেত। কিন্তু বেঁচে থাকাটা তো দু চার বছরের জন্য নয়। হায়রে কপাল, যেখানে একদিন বেঁচে থাকার জন্যও ভাবতে হয় সেখানে উদ্ধব ভাবছে দু-চার বছর—নাকি শতায়ু হওয়ার?

সব শুনে কৌশল্যা বল্‌ল, 'পার্টির আর কি দোষ। মানুষরাই দোষী। পাথরবাটিতে সঞ্জীবনী রাখলে মানুষকে জীবন দান করে। বিষ রাখলে মরণ। তা সেকি তোমার পাথরবাটির দোষ?'

হক কথা। কিন্তু উপস্থিত জীবনধারন অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ পাঁক খেয়ে জীবনধারন করা যায় না এবং পৃথিবীতে এখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাঁক ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট নেই।

উদ্ধব অনেকক্ষণ ধরে ভাত ফোটার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল না। কান পেতে ভাল করে শুনে যখন ও নিশ্চিত হল যে না, ভাত ফোটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, তখন কৌশল্যাকে বলল, 'বউ, তোর উনুনটা বোধ করি লিভে গেইছে।'

তড়িঘড়ি পাকশালে ঢুকেই আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল কৌশল্যা। ভাতের হাঁড়ি উল্টে একাকার। ভাতগুলো ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। ভুলো কুকুরটা তাই চেটে চেটে খাচ্ছে।

প্রচণ্ড রাগে একটা চ্যালা কাঠ ছুঁড়ে মারল ভুলোকে। ভুলো কাঁই কাঁই করতে করতে ছুটে পালাল। দুঃখে, বেদনায় কান্না পাচ্ছিল কৌশল্যার। তখনও ছড়িয়ে থাকা ভাতগুলো মাটির উতরালিতে তুলে রাখছিল।

উদ্ধব বলল 'থাক বউ, ও গুলো আর তুলে রাখতে হবেনি।'

কৌশল্যা বলল 'তাহলে আজ খাবেকি?'

উদ্ধব বলল 'গুগলি কটা সেদ্ধ করে দে। তাই খাই।'

উদ্ধব দাওয়ায় এসে বসল। ক'দানা ভাত পাখিটাকে দিতে গিয়ে কৌশল্যা দেখল পাখিটা বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে, কিন্তু মানেশ্বরী নির্জিত হয়ে পড়ে রয়েছে।

আকাশে কিন্তু চাঁদ উঠতে ভোলেনি। বোধহয় আজ পূর্ণিমা। উদ্ধবের ফুটোফাটা ঘরের চাল দিয়ে জ্যোৎস্না ঝুরঝুর করে ঝরছিল।

উদ্ধব বলল কৌশল্যাকে, কাল একবার যাব রাজুর কাছে। মানের চেয়ে জানই বড়। আমাদের বোধকরি শুওরের জান।

৩

রাজু, অর্থাৎ রাজেশ্বরী এখন কারো বউ নয়। কারো মেয়ে নয়। কারো মা বা বোনও নয়। রাজুর পরিচয় ও অবনী সাহার খাওয়াসিন, অর্থাৎ রক্ষিতা। কি লজ্জা, কি লজ্জা। তবু, বেঁচে থাকার জন্য কলঙ্ককেও মাথার ভূষণ করে রাখতে হয়। অবণী সাহা মানী লোক। জোতদার। আটহালের চাষ আছে। আধিয়ারদের জমিগুলোও এখন নিজ জোতে খাস করে নিয়েছে। বর্গা উচ্ছেদের আইন কাগজে কলমে। ফাঁকি দেওয়ার মত উল্টো প্যাঁচ মাথার মধ্যে গিজ গিজ করছে।

বিশাই ছিল অবনী সাহার ভাগীদার। তখন অল্প-সল্প নেশা ভাং করত। সেই অজুহাতে উচ্ছেদ হল। মামলা উঠল জে এল. আর. ওর এজলাসে। সেখানে প্রমানিত হ'ল বিশাই মন্তপ। অকর্মন্য। বর্গা জমি 'খিল' ফেলে রাখে অর্থাৎ অফলা বা পতিত। জোতদার ভাগের ধান পায় না। সুতরাং কলমের একখোঁচায় উচ্ছেদ হয়ে গেল বিশাই। শরীর দুর্বল হলে যেমন একের পর এক রোগ এসে বাসা বাঁধে, তেমনী গরীবদের আগে যায় জিরোত, তারপর জরু। বেহাত হয়ে যায়। তেমনী হাতফেরতা হয়ে রাজেশ্বরী আজ অবনীর নিজস্ব রমনী।

অবনী সুখেই রেখেছে রাজেশ্বরীকে। অবনীর এখন বোলবোলাও অবস্থা। ধানের আড়ত। এম আর শপ। টেষ্ট রিলিফের পে মাষ্টারী। আরও কত কি ধান্ধা।

রাজেশ্বরীর জন্য কোঠা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে ওর ধানের আড়তের লাগোয়া। গরাদ দেওয়া জানালা। সেই জানালায় মুখ রেখে রাজেশ্বরী খরার ছবি দেখে।

গত বছর ধানগুলো শুকিয়ে আগড়া হয়ে গিয়েছিল। এ বছর এখনও বৃষ্টি হয়নি। আকাশ যেন আগুনের তাতে লালবর্ণ। ক্ষেতগুলো ফুটিফাটা। পাতার রং মাকড়সার রঙের মত ফ্যাকাশে। ক্ষেতের পর ক্ষেত নিস্ফলা। গোচর মাঠে একগাছি ঘাসও নেই। গরু মহিষ ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি

তৃণভোজী প্রাণীদের চিহ্ন মাত্রও নেই। রাজেশ্বরীর বুকটা ধক করে উঠল, তাহলে কি বসুমতি বাঁজা হয়ে গেল চিরকালের মতন?

তৃষ্ণার জল আনতে কোশের পর কোশ রাস্তা ছুটে যাচ্ছে মানুষ। অনন্ত ধারা নদীর বুকে চুয়া কেটেও আজ জল পাওয়া যায় না আর।

রাজেশ্বরীর বেড়ের মধ্যেই একটা টিউবেল আছে। ওর কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু খানিক দূরের পুরোণ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সরকারী কুয়োতে ভোর রাত থেকে জল নেওয়ার জন্য ভীড় লেগে যায়। বেলা বাড়তেই সুরু হয় কলহ, কচকচি, মারামারি। ক্রমে বেলা বাড়তেই জল শেষ হয়ে যায়। তখন শুধু পাঁক ওঠে। তখন মানুষজন হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

রাজেশ্বরীর কোন কাজ নেই। সারাদিন ধরে ও এইসব দেখে। রাতের বেলায় ওর ফুরসুত নেই। ও যেন সেই দৈত্যের বাড়ির রাজকন্যা। সে দিনের বেলা ঘরে থাকে, রাতের বেলায় বাঁচে।

সবাই পরিত্যাগ করেছে রাজেশ্বরীকে। সোয়ামিকে ছেড়ে আসার জন্য ওর মা বাপও ওকে পর করে দিয়েছে। কিন্তু কিই বা করার ছিল ওর, যখন মরার মতন সাহস ছিল না, তখন বেঁচে মরে থাকা ছাড়া। আর মেয়েমানুষ তো পরগাছা। ল তার মতন গাছকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। যে গাছের নিজেরই ক্ষমতা নেই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে অপর সেই গাছকে আশ্রয় করে তো বেঁচে থাকা যায় না।' নাহলে স্বামী হিসেবে তো মন্দ ছিল না বিশাই।

কিন্তু এতদিন এতদিন বেঁচে থাকার সুখকে আস্বাদন করতে করতে আজ মরে যাওয়ার সাহস অর্জন করেছে রাজেশ্বরী। আজ ওর কাছে বেঁচে থাকা একটি অভ্যাসের নাম।

দুপুর বেলায় খাঁখাঁ রোদ্দর। সেই রোদ্দুর সহস্রখানা সাপ হয়ে দংশায় মানুষকে! অপদেবতার মত খলখলিয়ে হাসে। সেই দাবদাহের মধ্যেই ভুখা-কাঙাল মানুষগুলো দূরের মেঠো পথ দিয়ে কাজের সন্ধানে যায়। সন্ধ্যের গোড়ায় গোড়ায় ফিরে আসে ধুঁকতে ধুঁকতে। কেউ কেউ আবার ফেরেও না। রাস্তায় মরে পড়ে থাকে। তখন লোকালয়ের মধ্যে নির্ভয়ে শকুনি-গৃধিনীরা নেমে আসে। খেদালেও যায় না।

তারপর বেলা পড়ে আসে, কিন্তু রোদ্দুরের আঁচ মরে না। ধরিত্রী যেন তৃষ্ণার্ত গাভীর মত ধুঁকতে থাকে।

তখন রাধার মা পরিপাটি করে রাজেশ্বরীকে সাজাতে বসে। গা মেজে

দেয়। ফুল বেঁধে দেয়। টীপ, কাজল পরিয়ে দেয়। রাজেশ্বরী পাটরানী সেজে মিঠে পান মুখে দিয়ে ওর মালিকের জন্য প্রতীক্ষা করে। সেই লোকটা সারারাত ধরে ওর শরীরটাকে পরতে পরতে খুলবে, চাখবে, খুবলাবে, একটা রমনতৃষাতুর জন্তুর মত আঁচড়াবে। বেঁচে থাকার সব রসটুকু ও রাজেশ্বরীর শরীর থেকে আহরণ করে।

ভোরবেলায় ভয়ঙ্কর রকমের অশ্লীল আকাশ ও পৃথিবীটা জানালার চৌখুপিতে বাঁধা পড়ে। তখন অবনী সাহা পালঙ্কের ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আজ দুদিন অবনী ভারী ব্যস্ত। জিয়ার, টিয়ার আর র‍্যশনের অনেক চাল গম এসেছে।

মনটা হাল্কা ছিল রাজেশ্বরীর। জানালা দিয়ে দেখল উদ্ধব আসছে। দেখার পর থেকেই ওর মনের মধ্যে আনন্দ, বেদনা, দুঃখ ও উদ্বেগ উথলে উঠল। উদ্ধব কেমন যেন ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে। কদিন আগে রাধার মাকে দিয়ে কিছু চাল-গম পাঠিয়েছিল রাজেশ্বরী। উদ্ধব নেয়নি। তখন জানের চেয়ে মান বড় ছিল। এখন উদ্ধবকে দেখে আনন্দের শিহরণটা একটা দুর্নিবার ভয়ের শিরশিরানীতে পরিণত হল।

তাহলে কি বাড়িতে কারো বিপদ-আপদ হল? উদ্ধব প্রতিজ্ঞা করেছিল ওর স্বৈরিণী কন্যার মুখ দর্শন করবে না, অথচ আজ ও নিজে আসছে ওর বাড়িতে? ক্ষণিক আগের উথলে ওঠা উল্লাসটা এখন ক্ষোভে রূপান্তরিত হল। কেন আসছে উদ্ধব। না এলেই তো ছিল ভাল। অন্ততঃ বাপকে নিয়ে সামান্য অহঙ্কারের সম্পদ ও বুকের মধ্যে আগলে রাখতে পারত।

কিন্তু দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল উদ্ধব। রাধার মা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওকে ধীরে ধীরে নিয়ে এসে দাওয়ার ওপর বসাল। চোখে মুখে জলের ছিটে দিল। ততক্ষণে ঘর থেকে ছুটে এসে বাইরে থামের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী।

খানিক জিরিয়ে একটু চাঙ্গা হতেই রাধা জিগ্যেস করল উদ্ধবকে, 'মুরুব্বি, খবর-সবর ভালো ত?'

উদ্ধব ছেঁড়া গামছাটা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলল, 'ভালো আর কই। ছোট বিটিটা দুদিনের সন্নিপাত জ্বরে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে কাল।'

মানেশ্বরী মারা গেছে? থামের আড়াল থেকে সেকথা শুনে ডুকরে কেঁদে

উঠল রাজেশ্বরী। মানেশ্বরী বড় ন্যাওটা ছিল ওর। ছেলেবেলায় ওর আঁচল ধরে ঘুরঘুর করত।

রাধার মা শুধোল, 'আবার আর রাজুর মা ?'

উদ্ধব বলল, 'উ তো মেয়ে—জামাইএর শোকে পাগল হয়ে গেইছে।'

থামের আড়াল থেকেই আরেকবার চমকাল রাজেশ্বরী। মেয়ে-জামাই ? তাহলে কি মানেশ্বরীকেও বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল ওর বাপ ? ওকি একটা খবর পর্য্যন্ত দেয়নি ?

রাজেশ্বরী ঝটিতি থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কান্নাভেজা গলায় বলল 'বাপ মানুর বিয়ে দিয়েছিলে তোমরা, এই অভাগীকে একটা খবরও দাও নাই ?'

উদ্ধব বলল 'মানুর বিয়া ? কে বল-লেচে ?'

'তুমিই ত' বললে এখনি ?'

বুকটা হু হু করে উঠল উদ্ধবের। উদ্ধব বলল, 'ওরে অভাগী, আমি বিশাইএর কথা বলছিলাম। দুদিন আগে ভেদবমিতে মারা পড়েছে রানী সায়রের পাড়ে।'

হঠাৎ যেন সব চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল রাজেশ্বরীর। ওর সব স্মৃতি যেন চকিতে তলিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। ও মনে করবার চেষ্টা করছিল, কে বিশাই, কোথাকার বিশাই।

উদ্ধবের কথাগুলো ওর মগ্নচৈতন্যে কাঁসর ঘণ্টার শব্দের মতন বাজছিল। তারপর এক সময় ওর সম্বিত ফিরতেই মনে পড়ল, একদিন বিশাই ছিল ওর সব চেয়ে কাছের জন, যার সঙ্গে জীবনের সব সুখদুঃখ ভাগ করে নেবার শপথ নিয়েছিল দুজনে। একসঙ্গে দুঃখের অন্ন ভাগ করে খেয়েছে, একই শয্যায় পরস্পরের দেহের উষ্ণ আরামে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্বাদ খুঁজে পেয়েছে।

বাপ-মেয়েতে মিলে বুক চাপড়ে বিলাপ করল খানিকক্ষণ। তারপর একটা পুঁটুলিতে চাল, ডাল, সামান্য গম আর কিছু তরি-তরকারি বেঁধে দিল রাজেশ্বরী। বাঁচার তাগিদে উদ্ধবের সব প্রতিজ্ঞা বানের জলে ভেসে গেল।

তারপর কটা রুপোর গয়না উদ্ধবের হাতে তুলে দিয়ে রাজেশ্বরী বলল, 'বাপ, এগুলো বেচে বাঁচো যে কটা দিন পারো, তারপর আবার এসো যদি আমি বেঁচে থাকি।'

৪

সাঁঝের গোড়ায় অবনী এলো। বাইরে কাদের সঙ্গে কি যেন ফিসফাস কথাবার্তা হল। তারপর উৎফুল্ল মুখে ঘরে ঢুকে বলল, 'ইকি রাজু, এই ব্যাজার মুখে বসে আছিস কেনে? ফুর্ত্তি কর। তোকে সাতনরী হার গড়ায়ে দিব। আজ বড় সুখের দিন রে।'

কি কারণে সুখের দিন তা জিগ্যেস করতে প্রবৃত্তি হল না রাজেশ্বরীর।

ও লক্ষীর থানে প্রদীপ জ্বালল। তারপর লক্ষীর পটের পানে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রইল।

অবনী বলল, 'ভক্তি করে মা লক্ষীকে ডাক রাজু। বল, মা, বছর বছর খরা দাও, দূর্ভিক্ষ দাও। মহামারী দাও। যারা মরবার তারা মরবেই, যারা বেঁচে থাকার শুলুক সন্ধান জানে তাদের এক মুঠো বেশি সুখ পেতে দাও। তারা যেন চাল করে বেঁচে বর্তে থাকে। তোমাকে সোনার নথ গড়িয়ে দেব মা।'

রাজেশ্বরীর গা ঘিন ঘিন করছিল। ও জবাব দিল না। এক ঘটি জল আর গামছা দাওয়ায় রেখে বলল, 'হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

অবনী হাত-মুখ ধুয়ে বিছানার ওপর পরিপাটি করে বসল। তারপর বলল, 'আজ একটা বড় দাও পেয়েছি রাজু। মাঝ রেতে ট্রাক আসবে। হাজার মন চাল পাচার করব। কাক পক্ষীটিও টের পাবে না।

দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ হাজার মন র‍্যাশনের চাল। প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই, কারণ আর একটু পর, রাত গভীর হতেই এই লোকটার সর্বনেশে ক্ষুধার শিকার হতে হবে ওকে। এই দুর্বিপাক থেকে নিস্কৃতি নেই।

তারপর নিষ্প্রদীপ কুটিরের মধ্যে রাজেশ্বরীর শরীর থেকে সবটুকু প্রাণরস নিংড়ে নিয়ে ক্ষান্ত হল অবনী। খানিকক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থাকার পর ঘুমিয়ে পড়ল অবনী রমণক্লান্ত বৃষের মত।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেশ্বরীর মনে হল. এই লোকটাই খুন করেছে বিশাইকে, মানেশ্বরীকে, আরও হাজার হাজার মানুষকে। এই লোকটা খরা চায়, মড়ক প্রার্থনা করে, আকালকে আবাহন জানায়। এতদিন ধরে যে মর্মুকামিতা ওকে অস্থির করে তুলেছিল সেটা একনিমেষেই অন্তর্হিত হল।

ওরে মনে হল মরে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া। প্রতিবাদহীন মৃত্যুতে পৃথিবীর কারো কোন লাভ নেই। এক অলৌকিক সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করার সাধ্য ওর নেই। কিন্তু ওর তূণীরে অন্তত একটি বাণ আছে যা দিয়ে একজন দুঃশাসনকে নিধন করা যায়। এতএব পুরাতন সংকল্পকে পরিত্যাগ করে, নিজের জন্য সংগৃহীত সেঁকো বিষ দিয়ে পরিপাটি করে একটি পান সাজল রাজেশ্বরী। তারপর রেকাবিকে পানটি রেখে অবনীর শিয়রের কাছে কুলুঙ্গীর ওপর রেখে দিল।

মাঝরাতে চাল পাচারের ট্রাক আসবে। তখন ঘুম থেকে উঠে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গিয়ে স্বর্ণমৃগয়ায় বেরোবে অবনী।

বন্ধুবরেষু

[প্রয়াত কবি রবীন স্বরকে মনে রেখে]

শান্তনু দাস

কফি হাউস আছে
তুমি নেই—
এই ভেবে গুমরে ওঠে কয়েকটা চেয়ার।
রোদ্দুর পায়ে পিষে কথা দিয়ে আসবে বলে
উলুঝুলু ব্যাগ নিয়ে কোথায় লুকোলে
চিঠি দিলে কুশল সংবাদ কিছু পাবো ?

পাবো না বলেই দুঃখ
পাবো না বলেই ক্রোধ
পাবো না বলেই এক তীব্র অভিমানে
এসেছি এখানে।

এমন ছিলনা কথা ঋজুদৃপ্ত বন্ধু আজ ছবি হয়ে যাবে।
তুমি কি জেনেই ছিলে সবুজ সংকেত দিয়ে ট্রেন
স্টেশনে রয়েছে ?
তাই পৌঁছোনোর আগে তুমি নাড়ালে রুমাল,
তোমাকে সি অফ করা সহজে হ'ল না।

প্রথাসিদ্ধ কোনকালে নই,
আমাদের হৈ চৈ বুকের ভেতরে তবু ফল্গু-
ধারা হয়ে নামে—
এই মধ্য যামে।

প্রকৃতি ও আমি

শিশির সামন্ত

বিষণ্ণ অর্কিড, আমি ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরি,
সারাজীবনের মতো অপেক্ষা করেছি
তুমি যদি ফুটে ওঠো, যদি নাচো
তুমি যদি ফুটে ওঠো, একবার নাচো !

কাঁচপাতা টেবিলে সাজানো,
বিষন্ন অর্কিড টব জুড়ে,
তাৎক্ষণিক মুহূর্তের মনে হয়
পৌরাণিক লুসিফার আমি ।

প্রসন্ন না হয়ে এতোকাল
জীবিত রসে ও বশে বেঁচে আছো,
কঠিন কঠোর এক তপস্যায়, ঠিক
যেমন জীবন যায় আমারই !

সমস্ত ক্লান্তি নিয়ে টেবিলে বসেছি,
সমস্ত জীবনব্যাপী নেই কোন স্মরণীয় তিথি,
মুখ ছেঁচা ঘরে ছিলো মৃত যে মুষিক,

সব প্রসারতা ছোট ধবল দেওয়াল ঘরে আসে,
নেমে আসে কড়িকাঠ গিলোটিন বিচ্ছিন্নতা,
অচরিতার্থতায় সমস্ত জীবন ব্যাপী খুঁজি,

সফলতা, দীন অতি, বিষণ্ণ অর্কিড—
তোমার পায়ের নিচে অজস্র পাথর কুচি
সরিয়ে ফেলতে তুমি অপারগ হবে,
একই মুদ্রায় থাকি বিষন্নতা নিয়ে তুমি আর আমি ।

কেন যে…বুঝি না

মতি মুখোপাধ্যায়

ভাঙা ডালপালার মতো এখন ছত্রাকার
চড়কতলার রতন দাসের পরিবার
দক্ষিণ দুয়ারে গেছে রতন মেয়ের হাত ধরে
অসুস্থ বউ চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে
হাসপাতালের বিছানা
দেয়াল ধরে হাঁটতে চেষ্টা করছে
পঙ্গু, তাগড়া ছেলেটা
জিজ্ঞেস করছে ঘুরে ফিরে ; ডাক্তার বাবু
আবার আমি শিয়ালদার ট্রেনে
ধূপ বেচতে পারবো তো ?

বিষক্রিয়ায় টালমাটাল তিনশো পরিবার
যে শহরে তার
বর্ষণমুক্ত শরীরে এখন সোনামুগ রোদ
মাথার উপরে নীল বিশাল এক সার্কাসের তাঁবু
উড়ে যাচ্ছে কৈলাসের দুধ-শাদা হাঁস-মেঘ
মানুষের ভাঙাচোরা শরীর ও হৃদয়ের থেকে
অনেক অনেক উচ্চতায়।

এইসব দেখে শুনেও
কেন যে ক্রোধে ফেটে পড়ে না আমাদের কবিতা
কেন যে দুঃখে কাঁদে না রতনের বউয়ের মতো
কেন যে জীবনের চেয়ে
শিল্পকে মনে করে অনেক দামী
কেন যে…
বুঝিনা কিছুতেই।

কথা ছিল

গৌতম হাজরা

রওনা হওয়ার আগে কথা ছিল নৌকোতে পাল তুলবার
পুরোনো শেকল ছিঁড়ে নতুন দুন্দভি বাজাবার
জলেতে বৈঠার টান, ছপ্‌ছপ্‌ আওয়াজ তুলবার
পথ দীর্ঘ তবু পেশল দু'হাতে দাঁড় চেপে ধরবার

অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক রক্ত ঘাম ঝরেছে চৌদিকে
কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায়, মিছিলে পা মেলানো শিখে
দু'ধার গিয়েছে ক্ষয়ে খরশান বাতাসের চাপে
এখন যৌবনের ছুরিকা বৃথা, চুপচাপ শুয়ে থাকে খাপে

এমনি হল্লাগুল্লার দিন, ক্রমশঃ রং বদলায়
রক্তিম আবেগ খুলে বিষণ্ণ দিনের মতো হয়ে
চলে যায় বিস্বাদ মেখে ঝুলকালি অন্ধকারের বুকে
কারণ, এখানে প্রতিকূলতাই ঝরে পড়ে মানুষের মুখে

অথচ, কথা ছিল প্রবল দাপটে ফাটবে ফ্যাকাশে আকাশ
শেকল-ছেঁড়ার গানে ফুটে উঠবে মানুষের দৃপ্ত বিশ্বাস
কলজে ফাটিয়ে বলবে, হা-রে-রে-রে হা
প্রসন্ন সূর্যের কাছে অন্ধকার তফাৎ যা—!

মিথ্যেবাদী

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নদী কি মিথ্যে কথার খেলাতে ডাক দিয়েছে ?
তবু তার বালির শাপে আমি বেশ দেখতে পেলাম
নগরের হিরণদ্যুতি, নিরলস মাতৃভাষায়
ডাকে আয়, জঠরজ্বালার অভিমান কে নিবি আয়

আমি খুব আদর দিলাম আশরীর গরম ঠোঁটে
ঘুম ঘুম সুখের লালায় ভেসে যায় ভারতভূমি

মণিকর্ণিকার তাপে ডুবে যায় জন্ম, জীবন
যে শোকের দায় ছিল না, আমি তার ঋণ বুঝিনি

সকলেই পৌঁছাতে চায়—দস্যু বা কুষ্ঠরোগী
ভিখারী ধনিক বণিক, পারাপার যেমন বোঝে
তবু ওর লোভের ক্ষুধায় মিশিয়ে দিলাম ক্ষতি
যে ভোগের অবিশ্বাসে নদী, তুই মিথ্যেবাদী

ওপারে শুধুই বালি ভরে গেছে দীর্ঘশ্বাসে
নদী কি মিথ্যে ভাষায় আমাকে ডাক দিয়েছে?

প্রেরণা

স্বজিত সরকার

ইঁটের দেয়াল থেকে
ধীরে, খুব ধীরে
মুখ তোলে একদিন
নরম লাজুক কচিপাতা।

মিষ্টির দোকান
বিরাট উনুন থেকে ভোরবেলা
উগরে দেয় যত ছাই,
ঝুড়ি ভর্তি করে তাই নিয়ে যায় একজন লোক—
রাস্তার কলের জলে ধুয়ে
তখনও কয়লা কিছু বের করে আনে,
সেই কয়লায় জ্বালে নিজের উনুন।

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর
যাত্রীর আসনে ব'সে
রিকশাচালক বাঁশি বাজায়,
পাঁজরের অন্ধকার থেকে উঠে আসে স্বর

কাঠের পা নিয়ে নর্তকী সুধা চন্দ্রন ফের শুরু করে নাচ।

ইঁটের দেয়াল থেকে ক্রমশ আকাশে মাথা তোলে গাছ।

রক্তপাতহীন পুড়ে যায়

বিশ্বনাথ গরাই

একদিন প্রতিকূল শীত গায়ে মেখে উষাকালে
সঙ্ঘের উত্তাপ ছেড়ে অন্য এক সঙ্ঘের গহ্বরে
ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছিল অসামান্য ওদের জেহাদ।

ফেরেনি রাত্রির পাখি, তারপর শুন্‌সান্ বেলা—
নির্বাচিত সময়ের সফেন সমুদ্রে ডুব দিয়ে
কালের জাহাজ যায় পাহাড়ের গা ছুঁয়ে দক্ষিণে—
সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয়ে শুয়োরের খোঁয়াড়ে গর্জায়
মৈত্রীর অশোকস্তম্ভ—দারিদ্রের মতোন মহান
পণ্যের পতাকা বেচে ডড়ে যায় সাফল্যের বাণী!

একদিন ভোরবেলা ক্রীতদাস রৌদ্রে জ্বলেছিল
অজ্ঞাতবাসের শেষে মাঠজোড়া মুকুলিত দীন
ব্রীহির বিচ্ছিন্ন মুখ, সবুজের নিস্তব্ধ নিখিল—
অথচ এখন এই ওজস্বিনী লম্পট সময়
গ্রীবার উজ্জ্বল রঙ্গে পরিসংখ্যানের ঘেরাটোপে
মিথ্যা নিরাপত্তা গড়ে জরাসন্ধ গ্রামের চিতায়—
বিষণ্ণ রাত্রির সতী পরাঙ্মুখ চাঁদের আগুনে
জহরব্রতের পুণ্যে রক্তপাতহীন পুড়ে যায়!

শিকড়-বাকড়

প্রবীর ভৌমিক

ছিঁড়েছি দু-হাতে ভ্রূণের শিকড়—
শিরায় বদ্ধ রক্ত, কেটে দিই শিরা।
কাদায় রক্ত মিশে কীট তৈরী হয়।
ধানের, শস্যের মধ্যে রক্ত গন্ধ।
শিরায় বদ্ধ রক্ত কেটে দিই—
ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে
সাদা থানে রক্ত ছিটে লাগে।

এ ভাবে সামান্য কিছু কলঙ্ক
দিয়ে দেয়া গেল।
ভিতরে, ভিতরে ভয়ঙ্কর উন্মাদ মানুষ
যা কিছু রয়েছে নাড়ীতে
আলোয়, হাওয়ায় সব কিছু দিয়ে দিই।
আমার সত্তায় শুধু উন্মাদিনী একা থাকে।
নগ্ন হয়ে আসনে বসেন তিনি।
আর আমাকে নির্জনে নেন।

অস্থির ছিলাম খুব।
এখন প্রকৃত শান্ত
রক্তক্ষরণ হল, সমস্ত শরীর জুড়ে অবসাদ।
মৃত্যু নয় ঘুম—
জেগে উঠবার জন্য আর একবার
ঘুমিয়ে নিচ্ছি শুধু।

অন্যরকম

অজয় দাশগুপ্ত

প্রোগ্রামটা সপরিবারে দেখা হল না তৃণার। অথচ শুক্রবারও সে নিশ্চিত ছিল। সকলকে নিয়ে পর্দায় নিজের উদ্ভাসিত চেহারা দেখতে কার না ইচ্ছে হয়! কিন্তু ইচ্ছেটা মনের মধ্যেই চাপা থাকল।

বৃহস্পতিবার অফিসে ফোন পেল রমিতার। শনিবার ভোরের ফ্লাইটেই স্টেটসে যাচ্ছে। শুক্রবার বিকেলে যেন অবশ্যই তৃণা দেখা করে। রমিতা বলল, 'আবার কবে দেখা হবে কে জানে। দু বছরের আগে তো নয়ই। তুই আসবি তো?'

'কিন্তু কাল সাতটায়—'

তৃণার কথা শেষ করতে দিল না রমিতা। 'ওসব অজুহাত ছাড়—আমি একদম সময় করতে পারছি না। না হলে নিজেই যেতাম, এই তো আজ কোন্নগরে দিদির কাছে চলে যাব। ফিরব কাল।'

'ঠিক আছে দেখি।' তৃণা আলতো উত্তর দিল।

'দেখি নয়—অবশ্যই। তোকে কতদিন দেখি না।'

রমিতা তার কথা বলেই চলল, 'দিল্লি থেকে এসে পর্যন্ত সময় পাচ্ছি না। এত অল্প সময়ে বিদেশ যেতে গেলে বুঝিস তো কি প্রস্তুতির দরকার হয়।'

এরপর দুচারটে পারিবারিক কথা শেষ করে টেলিফোন রেখে দিল তৃণা। বাড়ি ফিরে মনটা ভারী হয়েই রইল। একটু গম্ভীর। মনমরা। খাবার টেবিলে কান্তিমানের দৃষ্টি এড়াল না। খেতে খেতে সে বলল, 'তোমার শরীর ভাল নেই?'

একটু চমকে উঠল তৃণা। 'না শরীর তো ভালই। হঠাৎ একথা কেন?'

'কেমন মনমরা লাগছে। একটু চিন্তিত।'

'ও কিছু না।' তৃণা স্বামীর প্লেটে মাছ তুলে দিল। 'একটা কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'কি কথা?' কান্তিমান তাকাল চোখে কোমল দৃষ্টি নিয়ে।

'ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।' তৃণা প্লেটে ভাত নাড়তে নাড়তে বলল, 'আজ অফিসে রমিতা ফোন করেছিল। শনিবার ভোরের ফ্লাইটে ও স্টেটসে যাচ্ছে।'

'এটা তো ভাল খবর।' কান্তিমান এক টুকরো মাছ ভেঙে মুখে দিল। 'বাঃ বেশ রেঁধেছ তো।' চোখের কোণে ভাল লাগার স্বাদ। 'রমিতা দিল্লি থেকে কবে এল?'

'তা বলল না।' তৃণা মুখ তুলে বলল, 'তবে মনে হয় দু-চার দিন। মুশকিল হল শুক্রবার, মানে কাল আমাকে বার বার করে যেতে বলেছে।'

'তা যাও।' কান্তিমান ঢেকুর তুলল। 'যাওয়া তো উচিত।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কিসের?' কান্তিমান তাকাল। 'অন্য কোনো অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আছে?'

'তা নেই।' তৃণা খুব আস্তে বলল, 'কাল আমার প্রোগ্রামটা একসঙ্গে দেখব ভেবেছিলাম।'

'ও তা বটে।' ঢকঢক করে জল খেল কান্তিমান। 'তাই তো, আমার একদম মনে ছিল না।' একটু থেমে বলল, 'তা আর কি করবে—প্রাণের সখী বলে কথা। প্রোগ্রাম আমরা ঠিক দেখে নেব। তুমি নয় রমিতাকে নিয়েই দেখবে। ওর কাছে একটা সারপ্রাইজ হবে।' কথা শেষ করে কান্তিমান উঠে গেল।

তৃণার তবু খচখচ ভাবটা গেল না। আনমনা হয়েই গেল। খেতেও ভাল লাগল না।

শুক্রবার সকালে বেরনোর সময় তৃণা কান্তিমানকে বলল, 'তোমার মনে আছে তো?'

'কী? ও তোমার প্রোগ্রাম!' হাসল কান্তিমান। স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসব।'

ছুটে এল টুংলা। স্কুলের পোশাকে তৈরি। তৃণাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মামণি তুমি আসছ তো? তোমার সঙ্গে বসে প্রোগ্রামটা দেখব।'

'আমার ফেরা হবে না টুংলা।' তৃণার গলায় বিষাদ। ছেলের মাথায় হাত রেখে সে বলল, 'তুমি বাবির সঙ্গে বসে দেখ।'

'তুমি কোথায় যাবে মামণি?'

'তোমার রমি মাসি এসেছে কলকাতায়। তার কাছে যাব।'

'কাল যেও না—কাল তো শনিবার—' টুংলা আবদারের সুরে বলল। তৃণাকে জড়িয়ে ধরল সে।

একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তৃণা বলল, 'তা হয় না। রমি মাসি, কাল সকালের ফ্লাইটেই বিদেশে চলে যাচ্ছে।'

টুংলার মুখে ছায়া ঘনাল। সে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তৃণা ওকে আদর করে বলল, 'আমি না থাকলে কি হয়েছে? বাবি তো তো থাকছে।' কান্তিমানের দিকে ফিরে তৃণা বলল, 'আমি বেরচ্ছি।' কথা শেষ করে তৃণা বেরিয়ে গেল।

অফিসে ভাল লাগল না। কেমন যেন একটা শূন্যতা মাঝে মাঝে গোল হয়ে তাকে ঘিরে ধরছিল। টুংলার টলটলে মুখখানা চোখের সামনে পদ্মের মতো ফুটে রইল।

ছটার মধ্যে রমিতার বাড়ি পৌঁছে গেল তৃণা। রমিতা কলকলিয়ে উঠল। একটার পর একটা কথার ফুলঝুরি ঝরতে লাগল। একটু থিতিয়ে বসতে বলল, 'কি ব্যাপার বল তো?' রমিতা তৃণার দিকে তাকাল। 'কাল আসতে চাইছিলি না কেন?'

'আজ টিভিতে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে। তাই—'

'তাই নাকি?' রমিতা লাফিয়ে উঠল, 'কাল একবারও বললি না তো?'

'তুই বলতে দিলি কই—' তৃণা হাসল, 'ভেবেছিলাম সবাই মিলে একসঙ্গে দেখব।'

'বাঃ আমি বুঝি দেখব না?' রমিতা ঝঙ্কার দিল। 'কটায় রে?'

'সাতটায়।'

ঘড়ি দেখল রমিতা। সাড়ে ছটা। 'এখনো দেরি আছে। কী আনন্দ হচ্ছে, তোর প্রোগ্রাম তোর সঙ্গে বসে দেখব।'

কাজের লোক চা-খাবার দিয়ে গেল। 'নে খা', রমিতা ওকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিল। তৃণার খিদে পেয়েছিল। একটা টোস্ট তুলে কামড় বসাল।

পুরো প্রোগ্রামটা তৃণা দেখল। কেমন হবে, উতরবে কিনা এই নিয়ে দ্বিধা ছিল। কিন্তু না, নিজের কাজ দেখে নিজেরই ভাল লাগল। সব মিলিয়ে প্রথম হিসাবে এতটা পারফেকশন সে ভাবতে পারেনি।

রমিতা বলল, 'তৃণা, ভারী সুন্দর হয়েছে রে! তুই এত ভাল করবি ভাবিইনি।'

'যা, বাড়িয়ে বলে আর ফোলাস না।' তৃণা আলতো থাপ্পড় মারল বন্ধুর পিঠে। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'যাই রে, রাত হল। তুই কিন্তু পৌঁছে চিঠি দিস।'

'নিশ্চয়ই। চিঠির উত্তর দিবি কিন্তু ওখানে বড় একা হয়ে যাব।'

'বাজে বকিস না।' তৃণা এগোতে এগোতে বলল, 'নতুন বন্ধু জুটলেই তো আমাদের কথা ভুলে যাবি?'

'আমাদের বয়স কত হল রে?'

'কেন?' তৃণা চোখ ফেরাল।

'এ বয়সে নতুন বন্ধু!'

'মেয়েদের আবার বয়স কি রে—আর তুই তো আমার মতো সংসারী নোস।'

'সংসারী হলে নতুন বন্ধু জোটে না ওকথা তোকে কে বলল। বরং তোর কত সুবিধে। কেউ সন্দেহ করবে না।'

'সুবিধেটা করতে তোমায় কে বারণ করেছিল।' তৃণা তির্যক হাসল। 'যাই রে! অত ভোরের ফ্লাইট, না হলে এয়ারপোর্টে যেতাম। তোর বিদেশ যাবার খবরে ও খুব খুশি হয়েছে।'

'কান্তিদা কেমন আছে রে? সেই আগের মতো?'

'হ্যাঁ একই রকম। স্বভাব যাবে কোথায়। একদিন তো গেলে পারতিস। চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যেত।'

'সময় করতে পারলাম না। স্টেট থেকে ফিরেই তোর বাড়িতে উঠব।'

'দেখা যাবে।'

'দেখিস।' রমিতা দৃঢ়ভাবে বলল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে নটা বেজে গেল। প্রোগ্রামটা দেখার পর আর সেই বিষাদ ভাবটা নেই। বরং মনে একটা চাঞ্চল্য কার কি রকম লাগল তা জানবার।

তৃণা বাড়িতে পা দিতেই টুংলা লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। সিঁড়ির মুখে তৃণাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মামণি, তোমাকে কী সুন্দর লাগছিল।'

'তোমার ভাল লেগেছে?'

'খুউব।' গদগদ গলায় টুংলা বলল, 'এত ভাল হয়েছে যে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

তৃণার বুকটা ভরে গেল। দক্ষিণের বাতাস যেন হঠাৎ বুকের ভেতর ঢুকে পড়েছে। একটা ভাল লাগার প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে তৃণা উঠতে উঠতে বলল, 'তোমার বাবি ঠিক সময়ে এসেছিল?'

'বাবি তো ছটার আগেই এসে পড়ল।' তৃণার হাত ধরে উঠতে উঠতে টুংলা বলল, 'বাবিরই তো উৎসাহ বেশি। ঠাম্মাকে এসেই বলল, জান তো

তোমার বউমার টিভি প্রোগ্রাম আছে। তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘরের কাজ সেরে এস। একসঙ্গে বসে দেখব।'

'ঠাম্মাও দেখেছেন?'

'দেখেনি আবার! ঠাম্মা একদম চুপ করে দেখেছে। একবারও একটা কথা বলেনি।'

তৃণা উপরে উঠে প্রথমেই শাশুড়ির ঘরে গেল। ঢুকেই বিছানার একপাশে বসে জিজ্ঞেস করল, 'মা আমার প্রোগ্রাম কেমন দেখলেন?'

'খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু একটা খুঁতখুঁত রয়ে গেল।'

তৃণা অবাক হল। 'খুঁতখুঁত কিসের?'

'তুমি ওটা কি একটা শাড়ি পরলে—তোমার কি আর কাপড় ছিল না? কেমন ম্যাড়মেড়ে।'

তৃণা হাসল। 'ওটা খারাপ কি। খুব ভাল শাড়ি পরলে লোকে ভাবত শাড়ি দেখাতেই গেছি আমি।'

'লোকের কথায় কান দিলে তো অনেক কিছুই করা যায় না। আর একটু ভাল শাড়ি পরলে কি দারুণ দেখাত। এরপর এরকম ভাবে যাবে না কিন্তু বলে দিলাম।

'ঠিক আছে।' তৃণা নিজের ঘরের দিকে গেল।

আবার সেই খাবারের টেবিলে মুখোমুখি। ভাত দিতে দিতে তৃণা বলল, 'কই তুমি তো এখনো কিছু বললে না?'

'আমার কথা শোনার ফুরসত কোথায় তোমার।' কান্তিমান বলে উঠল।

'কি বাজে কথা বলছ?' তৃণা তাকাল। 'তুমি কি বোঝ না, তোমার কথা শোনবার জন্যই আমি ছটফট করছি।'

'আমার কথা কি সবার সামনে বলা যেত?' অদ্ভুত এক দৃষ্টি নিয়ে কান্তিমান তাকাল। 'জান, ভালই হয়েছে প্রোগ্রামটা তোমার সঙ্গে দেখিনি।'

'কেন?' তৃণার চোখে কৌতূহল।

'কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল তোমার চেহারা। পুরনো। ব্যবহারে জীর্ণ।' কান্তিমান ভাত মাখতে মাখতে বলতে লাগল, 'চার্ম চলে গিয়েছিল। আজ তোমাকে অন্যরকম দেখলাম। অন্য চেহারা।'

'সত্যি?'

'সত্যি।' তৃণার চোখে চোখ রেখে কান্তিমান বলে উঠল। 'তোমাকে স্বপ্নে আমি যে চেহারায় দেখতে চেয়েছি। যেভাবে কাছে পেতে চেয়েছি।'

তৃণা কথা বলতে পারল না। সে বাক্যহারা হয়ে গেল। বুকের ভেতর একটা সমুদ্রের ঢেউ। একটা তোলপাড়। চোখে দূরের একটা স্বপ্ন।

কান্তিমানের কথায় স্বপ্ন ভাঙল, 'কি হল তোমার? খাচ্ছ না যে?'

'ও!' তৃণা তাড়াতাড়ি সামলে নিল, 'কিছু না এই যে খাচ্ছি। অন্য ধরনের একটা লজ্জায় সে মুখ নামিয়ে নিল।

একটি অভিনব প্রয়াস

বিক্রম শেঠ তাঁর 'দ্য গোল্‌ডেন গেট' বইয়ের জন্য আমেরিকা থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। পেয়েছেন এ-বছরের সাহিত্য অকাদমি পুরস্কারও। বিক্রম শেঠ আমেরিকান নন; জাতীতে ভারতীয়। এবং তাঁর ইংরেজিতে কাব্যোপন্যাস লেখার প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি।

দৈনন্দিন আমেরিকান জীবনের living accent তিনি ধরতে চেয়েছেন তাঁর এই উপন্যাসের মধ্যে। অনেকটা সফলও হয়েছেন। তবে অনেকটাই ওপর-ওপর, জীবনবোধের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নেই। সমস্ত বইটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে যা পাঠককে মুগ্ধ করে।

উপন্যাসটির নায়ক জনের হঠাৎ মনে হল: আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার জন্য কে ভাববে, কে চোখের জল ফেলবে, কে আনন্দিত হবে। সে ভাল চাকরি করে, সুন্দর দেখতে, ছাব্বিশ বছর বয়েস। জন্ চার্চেও যায় না, বেশি মদ্যপানও করে না; বাগান করতে আর বই পড়তে ভালবাসে। এহেন জনের জীবনে একাকিত্বের সঙ্কট দেখা দেয়।

এই নিঃসঙ্গতাবোধ আমরা ততটা অনুভব করি না যতটা পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা করে। ফলে জনের অনুভূতি আমাদের কাছে কিছুটা কৃত্রিম লাগতে পারে।

যাই হোক, জন একাকিত্বে ভোগে। তার এককালীন সহপাঠিনী জ্যানেট। এই সমস্যার সুরাহা করতে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জনের জন্য জনৈকা সুন্দরী মেয়ে লিজ-কে জোগাড় করে দেয়। তার সঙ্গে জন বেশ সহজভাবেই মেলামেশা করে। কিন্তু লিজ তার বেড়ালটাকে কিছুতেই ছাড়বে না বিড়ালটার নানান অপকীর্তি সত্ত্বেও। এর ফলে লিজ এবং জনের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে। লিজ জনের চেয়ে তার বেড়ালটাকে বেশি ভালবাসে এবং এই নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুতরাং লিজ জনকে ছেড়ে ফিলকে বিবাহ করে।

ফিল পরমাণু বোমাতঙ্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। মানুষকে সুন্দর, সুস্থ পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখায়। লিজের সঙ্গে বিবাহের আগে ফিল্

নিজের ভাই এড-এর সঙ্গে সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। এড বাইবেল্ পড়ে; সমকামিতায় মন থেকে সায় দিতে পারে না। ফিল্ বুঝিয়েছে: মানুষের শরীরে তো আনন্দ খুঁজতে হবে; সুতরাং সমকামিতায় দোষ কি? বইটির পাতার পর পাতা শুধু সমকামের সমর্থনে সনেট লেখা হয়েছে। এড একটা গোসাপ-জাতীয় সরীসৃপ প্রাণী পোষে, যার কার্যকলাপের দীর্ঘ বর্ণনাও এখানে আছে। সমকাম ও অহংপ্রকৃতি নিয়ে লেখা এই পরিচ্ছেদটির বিস্তৃতি বইটির রসাভাস ঘটিয়েছে।

মোট ৫৮৯টি সনেট আছে বইটিতে; লিখতে বিক্রমের সময় লেগেছে ১৩ মাস। উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা গিয়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ-নীতিতে পি. এইচ. ডি করছেন বিক্রম শেঠ। কিন্তু কাজ পড়ে রইল পিছনে; তাঁকে পেয়েছে সাহিত্যে। লেখক নিজেও একে বলেছেন "a novel...in verse..." (পৃ, ১০০)। কবিতার মাধ্যমে গল্প বলা নতুন কিছু নয়। মধ্যযুগীয় রোমান্সে এ বিষয়ে সবচেয়ে নামকরা লেখা হ'ল Sir Gawain and the Green knight; লেখক অজানা। এ ছাড়া ওয়াল্টার স্কট এবং লর্ড টেনিসনও কবিতার মাধ্যমে গল্প বলেছেন। আরও অনেকে কবিতাকে গল্প বলার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। তবে এগুলিকে আমরা কবিতা হিসাবেই দেখি; উপন্যাস হিসাবে নয়। উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্যার আইফর ইভান্স বলেছেন, উপন্যাসকে অবশ্যই "a narrative in prose..." হতে হবে। তবে তিনি 'গোল্ডেন গেট' বইটি সম্পর্কে কী বলবেন? অথচ গল্পটা উপন্যাসোপম; বেশ দাঁড়িয়েও গেছে; সনেটগুলো তরতর করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় একটা উপন্যাসোপম গল্পের পরিণতির দিকে। আধুনিক কালে এই প্রচেষ্টা কিছুটা অভিনব বললেও চলে। এটা একটা আধুনিক মার্কিনি জীবনের উপন্যাস। গভীরতার আস্বাদ এখানে খুব কমই পাওয়া যায়; তাহলেও স্থানে স্থানে আমাদের চমকে দেয় লেখকের বর্ণনা-শক্তির দ্যুতি। সনেটগুলো একটা স্বচ্ছন্দ গতি আছে। এর জন্যও লেখকের প্রশংসা প্রাপ্য বৈকি; বিশেষত ভাষাটা যখন বিদেশী, তাঁর নিজের মাতৃভাষা নয়।

Viram Seth, The Golden Gate, (Delhi) : Oxford University Press), Rs 55

সৌরীন গুহ

সামাজিক টানাপোড়েনে কলকাতা

প্রদীপ রায়ের আলোচ্য বইটিতে নতুন কোন তথ্য নেই, এমন কি ১৯৮২-র আগেই এ বইয়ের বিষয়ের পক্ষে প্রাসঙ্গিক যে সব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার সব উল্লেখও বইটিতে নেই। কিন্তু, এ সত্ত্বেও, বইটি তাৎপর্যপূর্ণ। তার প্রধান কারণ, বইটির দৃষ্টিকোণ ও একটি বিশেষ থিমগত বিশ্লেষণ। এককথায় প্রদীপ রায়ের সুসংহত ব্যাখ্যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার সমাজের দ্বন্দ্ব ও মিলনকে যুক্তিগ্রাহ্য করে হাজির করে হাজির করার চেষ্টা করেছে।

প্রদীপ রায় গোড়াতেই দেখিয়েছেন, কোম্পানীর সংস্কারের ফলে, শাসক কর্তৃপক্ষের সমর্থনে "ভারতীয় সমাজের ভক্তি-আন্দোলন" বিরোধী রক্ষণশীল অংশ সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করল। বৃটিশ শাসনাধীন বংগদেশে সামাজিক বর্ণভেদ অর্থনৈতিক বর্ণভেদ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, সামাজিক, বর্ণভেদের রূপকাঠামো প্রায় সম্পূর্ণ বজায় রেখে। সে কারণে জাতিভেদ প্রথা এ ব্যবস্থায় অধিকতর ব্যাপকতা ও দৃঢ়তা লাভ করেছে সন্দেহ নেই।" এই পটভূমিতেই কলকাতার সমাজের দ্বন্দ্বমিলনের চিত্রটি এঁকেছেন প্রদীপ রায় প্রায় দশক ধরে ধরে ১৮৫৯-৬০ পর্য্যন্ত।

কলকাতার দেশীয় সমাজে এই সময়ে তিনটি গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, রামমোহনের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী, যার সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রধানত ব্যবসায় স্বার্থযুক্ত নবোদ্ভূত জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। এঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়-এর বিরোধী ছিলেন এবং এঁদের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এঁদের অনেকেই বৃহৎ জমিদারী থাকা সত্ত্বেও ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ লগ্নীকরার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের বিরুদ্ধে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভের আন্দোলনে বৃটিশ বণিকেরা এই গোষ্ঠীকে সমর্থন করত। এই বৃটিশ বণিকদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত এই গোষ্ঠী উদার ও সংস্কার পন্থী বলে সাধারণ-ভাবে অভিহিত হয়েছে।

অন্যদিকে ছিল বহুসংখ্যক বৃহৎ জমিদারির স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি রাধাকান্ত-

গোষ্ঠী। এ-গোষ্ঠীর সম্পদ প্রধানত সংগৃহীত হত ভূমিস্বত্বকে কেন্দ্র করে। এই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাচ্যবিদের সঙ্গে। তাঁদের দ্বারাই এঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠী কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার সংরক্ষণে এবং ভাবতে ইয়োরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। বৃটিশ বণিকরা এঁদের রক্ষণশীল বলে অভিহিত করেছে। মনে রাখতে হবে, রামমোহন ও রাধাকান্ত নেতৃত্বাধীন উভয় গোষ্ঠীই কলকাতা সমাজের এদেশীয় অংশে তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মানসে ইয়োরোপীয় শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

এই দুই গোষ্ঠীর বাইরে আর একটি তৃতীয় গোষ্ঠী ছিল, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডিরোজিয়ো। এই গোষ্ঠী প্রধানত কলকাতা মধ্যবিত্ত সমাজের, হিউম বেন্থাম ইত্যাদির চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ, টমাস পেইন প্রমুখের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত। প্রথমদিকে, অন্য দুই গোষ্ঠীর সমালোচক এই গোষ্ঠী মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছিল। এরা উগ্রপরিবর্তনপন্থী বলে নিন্দিত হয়েছে। প্রদীপ রায় তাঁর বইটি জুড়ে দেখিয়েছেন, "উপরিউক্ত তিনগোষ্ঠী কলকাতা সমাজের রঙ্গমঞ্চে বারংবার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কখনও কখনও এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মিলনও হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব ও মিলনের প্রেক্ষাপটে কখনও নেপথ্য সেনানায়ক, কখনও বা প্রকাশ্য সেনানায়কের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে অবাধ বাণিজ্যের প্রসারে ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহী ইয়োরোপীয় বণিক, বিভিন্ন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক, ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুসৃত নীতি ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের সমর্থক ইয়োরোপীয় প্রাচ্যবিদ এবং শাসক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী।" আসলে প্রদীপ রায় কলকাতার সমাজের দ্বন্দ্বমিলনকে ইয়োরোপীয় শাসকবর্গের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই দেখেছেন।

প্রদীপ রায় এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব মিলনের প্রক্রিয়ায় দেখেছেন রামমোহন গোষ্ঠী ও রাধাকান্ত গোষ্ঠী সমভাবে জমিদারের স্বার্থরক্ষায় তৎপর। আর ডিরোজিয়ো গোষ্ঠী রায়তদের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর। এ গোষ্ঠী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে "ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন করার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।" অর্থাৎ তিন গোষ্ঠীই শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের সমর্থক। ১৮৩৩ পর্য্যন্ত রামমোহন গোষ্ঠী ও রাধাকান্ত গোষ্ঠী যথাক্রমে অবাধ বাণিজ্য ও ইয়োরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের আন্দোলনের ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমর্থক।

কিন্তু ১৮৩৩ এর পর এ দুই গোষ্ঠী ও ডিরোজিয়ো গোষ্ঠীর অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি পৃথক পৃথক ভাবে ইয়োরোপীয় বণিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথ উদ্যোগে নিযুক্ত। ১৮৪০-এর দশকে এই যৌথ উদ্যোগে ধাক্কা লাগে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের অসাধুতা ও স্বার্থপরতায়। ১৮৪৯-এর তথাকথিত 'কালাকানুন আরও প্রকটভাবে জাতি বৈরিতাকে দেখায়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে ওঠে। 'শাসক-শাসিতের মধ্যে এতাবৎকাল দৃষ্ট 'পিতা-পুত্রের যে সস্নেহ শাসন ও নির্ভরশীল আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল' তা কিছুটা, ব্যাহত হয়েছে এবং ভিন্নতর রূসে গ্রহণের পথে অনিবার্যভাবে অগ্রসর হয়েছে।"[১]

১৮৫০ দশকের শেষের দিকে ঘটে মহাবিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহ। প্রথমটিকে কলকাতার সব গোষ্ঠী, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রায় সকল ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে বৃটিশ আনুগত্য প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন। অথচ নীলবিদ্রোহে কলকাতা ও বৃহত্তর বঙ্গ সমাজের এদেশীয় জমিদার মহাজন বণিক মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী শ্রেণীভুক্ত প্রায় সকল ব্যক্তি এ বিদ্রোহের সমর্থক। এর কারণ প্রদীপ রায় ৯৭ পৃষ্ঠা থেকে ১০৯ পৃষ্ঠার মধ্যে বিশ্লেষণ করেছেন—দেখিয়েছেন কিভাবে নিজেদের স্বার্থেই এই গোষ্ঠীসমূহ বিরোধিতা ও সমর্থন করে। বস্তুত বৃটিশ শাসন অবসানপ্রয়াসী মহাবিদ্রোহের সমর্থন করা সে-সময় কলকাতা-সহ বঙ্গ সমাজের জমিদার মহাজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে ছিল আত্মঘাতী আর গ্রাম-বাংলা থেকে নীলকর সাহেবের উৎখাত-অভিলাষী নীলবিদ্রোহের সমর্থন করা ছিল আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা।"

প্রদীপ রায় নিজের ছকে কলকাতার গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও মিলনের সূত্রটিকে ধরার চেষ্টা করেছেন। দেখিয়েছেন পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও বৃটিশ শাসনের সমর্থনে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগে, এই গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে একটা মিলনের ভিত্তিও ছিল। প্রদীপ রায়ের বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮২তে। এর একদশকেরও বেশী আগে থেকে কলকাতার দলাদলি নিয়ে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ হয়েছে—যেমন এস এন মুখার্জীর একাধিক প্রবন্ধ। প্রদীপ রায় এ কাজ সম্পর্কে অবহিত থাকতে চাননি। অন্ততঃ তাঁর আলোচনায় অবহিতির কোন চিহ্ন নেই। দল ও দলপতির ধারণার ব্যবহারে মুখার্জী কলকাতার সমাজের দ্বন্দ্বটিকে দেখাতে চেয়েছেন। মুখার্জী তাঁর বিশ্লেষণে এলিটিস্ট ব্যাখ্যা ও মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে মেলাতে চেয়েছিলেন, যাতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সমাজের অর্থনৈতিক অন্তর্ভিত্তি একই সঙ্গে ধরা পড়ে। ইদানীং

তিনি "in terms of linkage"-এ শ্রেণী কাঠামো ঔপনিবেশিক শাসক ব্যবস্থা ও জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে বুঝতে চান। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত ও প্রদীপ রায়ের সিদ্ধান্তর মধ্যে সাদৃশ্যও লক্ষণীয়—ইয়োরোপীয়রাই কলকাতার সমাজের শীর্ষস্থানীয় এলিট, তারাই কলকাতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করত ; এ সিদ্ধান্ত উভয়েরই, তবে প্রদীপ রায় দেশী-বিদেশী সম্পর্কের অবনতিও লক্ষ্য করেছেন। এস, এন, মুখার্জী ও প্রদীপ রায় দুজনেই দেখিয়েছেন, তিক্ত দ্বন্দ্ব, দলাদলি সত্ত্বেও কেউই কাঠামোর পরিবর্তন চায় নি। এস, এন, মুখার্জী দেখান পরম্পরাগত দলব্যবস্থাই কেম্প প্রকাশিত হল কলকাতা উপনিবেশের সমাজে। রামমোহন রায় ভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে চাইলেও, তাঁকে দুজন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দলপতির সমর্থন পেতে হয়েছিল। মুখার্জীর দল ও দলাদলির ধারণায় শেষ পর্যন্ত শ্রেণীর ধারণা অপাংক্তেয় হয়ে যায় এলিট-ভিত্তিক পদ্ধতিতে শ্রেণীর ধারণাকে তিনি সমন্বিত করতে পারেন না। আর প্রদীপ রায় সর্বদাই "গোষ্ঠীর" কথা বলেন, কোন শ্রেণীর ধারণাই তিনি প্রয়োগ করেন না।

অথচ এই ধারণার প্রয়োগ করলেই উনিশ শতকের কলকাতার সমাজের দ্বন্দ্ব-মিলন যথার্থ বোঝা যায়। রামমোহন-রাধাকান্ত-ইয়ংবেঙ্গল—সকলেই মোটামুটিভাবে একই শ্রেণীর প্রতিনিধি, ঔপনিবেশিক শাসনেরই নানাবিধ উপহৃত। এঁদের কারুরই শিকড় দেশজ-গভীরে প্রোথিত নয় ঃ জমিদারীর সঙ্গে যেটুকু তাঁদের সংযোগ, তা কলকাতার জীবনেও অভিজ্ঞতায় ছিন্ন। অথচ ইংরাজদের নায়েব-বেনিয়া-গোমস্তা হয়ে যে শ্রেণীর ক্রমশ প্রতিপত্তি অর্জন, তা কোন সময়ই অর্গানিক কোন শ্রেণীইতিহাসের আভ্যন্তরীণ-প্রক্রিয়ায় হয়ে ওঠে না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ফ্রিটেডারদের দ্বন্দ্ব ও টানাটানির দড়ি ধরেই তাঁদেরও দ্বন্দ্ব-মিলন দেখা দেয়। ডিরোজিয়োর অগণ্য ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও ডিরোজিয়ানরা যে শেষ পর্যন্ত কেমন ভাবে এই সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, তার ব্যাখ্যা স্বমিত সরকার চমৎকারভাবে করেছেন। একই শ্রেণীর অন্তর্গত বলেই এঁরা সকলেই বৃটিশ সরকার ও শাসনকেই চরম ও পরম বলে মেনেছিলেন। আবার উপনিবেশিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চাপে ও প্রক্রিয়ার পঙ্গু সৃষ্টি হিসাবে কোন শ্রেণীগত হিতোসনি গঠন করবার শক্তি অর্জন করতে পারেননি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের কর্মকাণ্ড ও ব্যর্থতা প্রতীকী ; তাঁর কোন উত্তরসূরীও আর ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পের পথে যাননি। এস. এন. মুখার্জী যে দল ও দলাদলি দেখেন, প্রদীপ রায় যে বিরোধ ও বৈপরীত্য দেখেন, তাঁর মূলে

শ্রেণীর এই অপূর্ণ ও পঙ্গু বিকাশ। উৎপাদন-সম্পর্কহীন এই শ্রেণী কলকাতার সমাজেও তাই আধুনিক ইতিহাসের অভিঘাত নিয়ে আসার পরিবর্তে পরম্পরাগত সমাজের পিছুটানগুলিকেই হাজির করে। রামমোহন রায় যখন তাঁর ব্রাহ্ম আন্দোলনের আধুনিকতার প্রায় মধ্যগগনে, তখনই তিনি চলে গেলেন বিলেতে। রাধাকান্ত দেবরা ইংরাজী শিক্ষার প্রবক্তা, কিন্তু নানা সামাজিক-ধর্মীয় প্রশ্নে যুক্তিবাদী নন। আর ডিরোজিয়ানরা ক্রমশই বৃটিশ চাকুরে হিন্দু সমাজের প্রতি অনুগত, এমন কি তাঁদের কেউ কেউ ডিরোজিয়োকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের অন্যতম রামকমল সেনের জীবনীকার। দ্বন্দ্ব-মিলন, সবই একাকার হয়, শ্রেণীর পঙ্গু বিকাশে, অর্গানিক বুদ্ধিজীবী গঠিত না হওয়ায়। আর এই ইতিহাসেও সাধারণ মানুষের প্রাসঙ্গিকতা নেই। এ হচ্ছে বৃটিশ শাসক ও এলিট স্বপ্ন-বিভোর পরনির্ভর শ্রেণীর টানাটানি: বৃটিশ নামক সরকার ঈশ্বরকে সকলেই মেনে নিয়েছেন। শ্রেণীর পঙ্গু বিকাশ, অর্গানিক বুদ্ধিজীবীর গড়ে না ওঠা, উৎপাদন-সম্পর্ক রহিত এই শ্রেণীর নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ভূমিকা পালনের যথার্থ শ্রেণীর পরিবর্তের ভূমিকা পালনের প্রকাশ—এ সবই এই দ্বন্দ্ব-মিলনের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারে। প্রদীপ রায় তাঁর আলোচনায় এসব প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ায় উনিশ শতকের জটিল বাস্তব কিছুটা সরল হয়ে পড়েছে।

অবশ্য তা সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট সূত্রে আলোচনার ফলে, প্রদীপ রায় অন্ততঃ একরৈখিক ইতিহাসের পরিবর্তে নানামুখী প্রক্রিয়াটি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। এটাও কম কৃতিত্ব নয়।

কলকাতা সমাজ দ্বন্দ্ব ও মিলন। প্রদীপ রায়। বুক ট্রাস্ট। পনের টাকা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

সামাজিক বন্ধনে ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের ছবি

[৫ থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৮৮, চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত শিল্পীর একক প্রদর্শনী প্রসঙ্গে]

ভারতীয় চিত্র রীতির ঐতিহ্যানুসারে ফানটাসি, অতি কল্পলোকচারিতা, স্বপ্নের বিভ্রম ইত্যাদির সমন্বিত রূপাশ্রয়ে শিল্পী ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের সাম্প্রতিক ছবি ক্রমশ ভাবগম্ভীর হচ্ছে। শিল্পী শান্তিনিকেতনের ছাত্র, ফলতঃ তাঁর রক্তে দেশজ ঐতিহ্য, বিশেষ করে পাহাড়ি শিল্প রীতি ও কালীঘাট পট চিত্র-রীতি বর্তমান। ক্রমশঃ এক ধরণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি, বিশেষতঃ মার্ক শাগালীয় কল্পদৃশ্যরীতির সমন্বয়ে তাঁর বর্তমানের চিত্র পরিকল্পনা চিত্তাকর্ষক। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিষয়প্রতিমা, গঠনবিন্যাস ও রঙীন রমনীয়তার দুরূহ ও কষ্টসাধ্য প্রয়াস। একই সঙ্গে ছবির ভাবগত দিক ও করণকৌশলগত দিকের সমন্বিত রূপের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে (৫ থেকে ২০ নভেম্বর) পনেরটি টেম্পারা ও পাঁচটি গ্লাস পেন্টিং ছবির প্রদর্শনী দেখে মনে হয়েছে ধর্মনারায়ণ ক্রমশঃ নিজেকে আরো আত্মস্থ করছেন। ছবির প্রতি হয়ে উঠছেন বিশ্বস্ত।

ধর্মনারায়ণের ছবি মানুষপ্রধান। এবং বড় বেশী ঘরোয়া। বড় বেশী আত্মমগ্ন। বক্তব্যে তিনি কখনো ধারালো, কখনো কৌতুকপ্রিয়, কখনো স্বপ্নচারী। বাবু-বিবিদের প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক নারী-পুরুষের সমস্যা, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা বা সমস্যাও যুক্ত হয়েছে। ফলতঃ ছবিগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা অনস্বীকার্য। কাপড়ের ওপর টেম্পারায় করা পনেরটি ছবিতে বহুরূপে মানুষকে দেখারই চেষ্টা।

এই ছবিগুলির অঙ্কনগত পরিপাট্য বহুলাংশে বাহুল্য বলে মনে হয়েছে। বাহুল্য বলে মনে হয়েছে রঙ সম্পর্কে তাঁর অতি সচেতনতা। রঙ চয়নে তিনি দুঃসাহসী হবার চেষ্টা করেননি। বরং মোলায়েম ও মিষ্টি রঙের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন। ছবির তাৎক্ষণিক দৃষ্টিনন্দনীয়তা বাড়লেও এক ধরনের শূন্যতা থেকে গেছে। করণকৌশলের দিকেও তাঁর অতি পরিপাট্য ছবির রম্যতা বৃদ্ধি করলেও, একসময়ে তা ভাবলেশহীন হয়ে পড়েছে। শিল্পীর নিজস্ব স্টাইলাইজেশনের প্রতি আস্থা রাখার প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এক সময়ে তা

একঘেঁয়ে হয়ে যায়। হয়তো এমনও হতে পারে, শিল্পী ইচ্ছাকৃতভাবে অতি যত্নশীল হয়েছেন। অবশ্য প্রদর্শনীর সামগ্রিকতাটি একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়, এবং সেই দৃষ্টিকোণে বলা যায়, হয়তো তিনি সঠিক পন্থাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তথাপি পরিণত, প্রাজ্ঞ শিল্পীর কাছে আরো বেশি কিছু আশা থেকে যায়।

বরং শিল্পীর গ্লাস পেন্টিং ছবিগুলি আরো চিত্তাকর্ষক, আরো স্বকীয়। কাঁচের পেছনে সরাসরি অ্যাক্রিলিকে করা ছবিগুলি পরিশ্রমসাপেক্ষ। এ যেন পেছন থেকে সামনে দেখা। গভীর মাত্রাজ্ঞান না থাকলে ছবি বেসুরো হয়ে যেতে বাধ্য। সুহাস রায় এই পদ্ধতিতে এমন অনেক নিসর্গ চিত্র রচনা করেছেন, যা নান্দনিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিল্পী ধর্মনারায়ণ বহু রঙের সমাহারে, বিষয়বৈচিত্র্যে 'উওম্যান অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস্কেপ' ছবি দুটি করেছেন, তা এক কথায় অনন্য। যদিও বেশি ভালো লাগে 'ছাগল' সিরিজের ছবি দুটি। ছাগলের উল্টো উপস্থাপনায় এমন এক স্বতস্ফূর্ততা রয়েছে যা অধিকতর দৃষ্টিনন্দন। নেই রঙিন রমণীয়তা। শাদামাঠা, কিন্তু উজ্জ্বল। বক্তব্যে ধারালো এই সিরিজের 'নীল জলধারা' ছবিটি এ প্রদর্শনীর আর এক শ্রেষ্ঠ উপস্থাপন। এই একটি মাত্র ছবিতেই শিল্পী বিমূর্তাভাস দেখিয়েছেন।

টেম্পারা ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'হরস্কোপ', 'মধ্যরাতের ঘুড়ি', 'দ্য অ্যাটাক', 'পীপ শো', 'ইন এ পার্ক' ও 'টুইলাইট ড্রামা'। বক্তব্যে ছবিগুলি পরস্পরবিরোধী হলেও, গঠনশৈলী ভিন্নাত্মক হলেও সামগ্রিক স্টাইলাইজেশনের দিক দিয়ে এক সুতোয় বাঁধা। ছবিতে বক্তব্য থাকতেই হবে এমন শর্ত না থাকলেও থিম একটা থেকেই যায়। সে সূত্রে এই ছবিগুলির থিম ভিন্ন মাত্রার। একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, তা হল ধর্মনারায়ণের মূর্তিচেতনা ও বাঙালিয়ানা। প্রদর্শিত ছবির নারী-পুরুষদের বেশ-ভূষা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনবিন্যাসে পট আঙ্গিকই বলা যাক, জমিদারশ্রেণীর নতুন উপস্থাপনার কথা বলা যাক বা আধুনিক সুঠাম যুব চেহারার কথা বলা যাক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুপ্তভাবে হোক, প্রকাশ্যে হোক, মিশে আছে বাঙালি ধ্যান-ধারণা রীতি-নীতি। ধর্মনারায়ণ এক অর্থে প্রাচীন, অন্য অর্থে আধুনিক।

প্রদীপ পাল

পাঞ্জাব সংহতি উৎসব

'হম সব ভারতীয় হ্যায় / আপনি মঞ্জিল এক হ্যায় / কাশ্মীর কি ধরতি রাণী হ্যায় / যদিও সে হমনে, ইস্কো হমনে / খুন সে সিচা হ্যায়—' সমবেত গীত মিছিলের কণ্ঠে। এক কণ্ঠ থেকে অন্য কণ্ঠে ধ্বনিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরময়। অখণ্ড ভারতের ঐক্য রক্ষায় গত তেইশে ডিসেম্বর, শুক্রবার শহিদ মিনার ময়দান থেকে শুরু হয়েছিল সংহতি মিছিল। গন্তব্য নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম। মিছিলের উদ্যোক্তা পাঞ্জাব সংহতি উৎসব কমিটি।

এস এন ব্যানার্জি রোড, মতি শীল স্ট্রীট, লেনিন সরণী, ধর্মতলা হয়ে রাণী রাসমণি রোডে যখন মিছিল এগিয়ে চলল, দু পাশে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার জনতা। তাঁরা কৃতজ্ঞ, তাঁরা সশ্রদ্ধ দেশের ঐক্য রক্ষার ডাকে। বাঁধ ভাঙা ভিড়ে স্তব্ধ সমস্ত যানবাহন। মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রেসিডেন্সি মুসলিম হাই স্কুলের ছাত্ররা তখন উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চলেছে—'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা……' নবীন প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার, চলচ্চিত্রশিল্পী, ক্রীড়াবিদ, আইনজীবী মিছিলে হাঁটছিলেন। ক্লাব সংগঠনের শিশু-কিশোররা এই মিছিলে প্রাণসঞ্চার করেছিল।

মিছিল থেকে বারে বারেই আওয়াজ উঠছে—'না হিন্দু রাজ, না খালিস্তান, যুগ যুগ জিয়ে হিন্দুস্তান,' 'পাঞ্জাব সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই' ইত্যাদি। ছাত্র যুব-মহিলা গণ সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে প্রায় পঁয়ত্রিশটি সংগঠন শামিল হয়েছে মিছিলে। এ শহর প্রত্যক্ষ করল অনন্য এক সংহতি মিছিলের।

পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক উগ্রপন্থী ক্রিয়া-কলাপে নিহতদের পরিবার-বর্গকে, বিশেষ করে অনাথ ও অসহায় শিশু ও বিধবাদের সাহায্য কল্পে ৩-২৩ ডিসেম্বর আয়োজন করা হয়েছিল পাঞ্জাব সংহতি উৎসবের। পাঞ্জাব সংহতি কমিটির সভাপতি মৃণাল সেন।

উৎসবের প্রাথমিক পর্ব ছিল চলচ্চিত্র উৎসব। ৩ থেকে ৯ ডিসেম্বরের এই উৎসবের সূচনা মৃণাল সেনের 'জেনেসিস' দিয়ে। এদিনের দ্বিতীয় প্রদর্শনী 'পেস্তনজী'। নন্দন প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গিরিশ কারনাড। সভাপতি মৃণাল সেন। বাকি ক'দিনে প্রদর্শিত হয়েছে 'সিটি

লাইটস', 'ভুবন সোম', 'মির্চ মশালা', 'সুবর্ণরেখা', 'গরম হাওয়া', 'ভবানী ভবাই', 'নায়ক' ও ক্রফোর 'লাস্ট মেট্রো'। এ ছাড়াও প্রদর্শিত হয়েছে তুটিতথ্য চিত্র 'অ্যান ইণ্ডিয়ান স্টোরি', 'সুকুমার রায়।'

১০, ১১, ১২ ও শেষ দিন ২৩ ডিসেম্বর পরিবেশিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত উর্দু কবি কাইফি আজমী, এ. কে হাঙ্গল, শওকত আজমী, সতপাল ডাং, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, গুরুদাশ দাসগুপ্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই দেশের অখণ্ডতা ও সংহতির সপক্ষে বক্তব্য বলেন। মান্না দে, আই পি সি এ কেন্দ্রীয় শাখার শিল্পীবৃন্দ, সলিল চৌধুরী, সবিতা চৌধুরী, হৈমন্তী শুক্লা, উৎপলেন্দু চৌধুরী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জি, শান্তিদেব ঘোষ, নীলিমা সেন, মায়া সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, অন্তরা চৌধুরী, স্বপন গুপ্ত, ভূপেন হাজারিকা, রুমা গুহঠাকুরতার নেতৃত্বে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার, অজিত পাণ্ডে, দীপা মুখোপাধ্যায়, পূর্ণদাস বাউল, অংশুমান রায়, বাংলাদেশ যশোর শাখার 'উদীচী' শিল্পীগোষ্ঠি, ক্যালকাটা কয়ার, অমরজিৎ সিং, কাকলি রায়-সহ আরো অনেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আবৃত্তি করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, জগন্নাথ বসু, উর্মিমালা বসু, পরিচয় বসু প্রমুখ।

১৫ থেকে ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানিকভাবে নাট্যোৎসব হলেও ১১-১২ ডিসেম্বর গিরিশ মঞ্চে হাবিব তনবির নির্দেশিত নয়া থিয়েটারের 'চরণদাস চোর' পরিবেশিত হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদনে পরিবেশিত হয়েছে 'বহুরূপী'র কুমার রায় নির্দেশিত ও অভিনীত নাটক 'গ্যালিলেও'।

১৫ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী দীনা পাঠক। এদিন অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় থিয়েটার ওয়ার্কশপ পরিবেশন করে 'আলিবাবা'। নাটক শুরুর আগে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সবিতাব্রত দত্ত।

১৬ ডিসেম্বর তনবীর আখতারের নির্দেশনায় পাটনা আই পি টি এ পরিবেশন করে 'দূরদেশ কি কথা'। নাটকের আগে ছিল যোগেশ দত্ত সম্প্রদায়ের মূকাভিনয়।

১৭ ডিসেম্বর নাসিরুদ্দিন ইউসুফের নির্দেশনায় 'ঢাকা থিয়েটার' পরিবেশন করে—'কীর্তনখোলা'।

১৮ ডিসেম্বর দিল্লির 'প্রয়োগ' নাট্যদল এম কে রায়নার নির্দেশনায়

পরিবেশন করে 'কবীরা খাড়া হায় বাজার মে।' নাট্যকার-ভীষ্ম সাহনী। ১৯ ডিসেম্বর রাজস্থানের লোক-গল্পাশ্রয়ী নাটক 'বীরগতি' পরিবেশন করেন এঁরাই। নাটক শুরুর আগে মূকাভিনয় করেন শান্তিময় রায়। এদিন অন্য আকর্ষণ ছিল এম কে রায়না-সহ 'প্রয়োগ' দলের সঙ্গীতানুষ্ঠান।

২০ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ অসিত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'গান্ধার' পরিবেশন করে 'নীলাম নীলাম'। এদিনই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের নির্দেশনা ও অভিনয়ে পরিবেশিত হয় নান্দীকার-এর নতুন নাটক—'শেষ সাক্ষাৎকার'।

২১ ডিসেম্বর উষা গাঙ্গুলীর নির্দেশনায় 'রঙ্গকর্মীর' নতুন নাটক—'লোক কথা' পরিবেশিত হয়। পাঞ্জাবের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নাটক ছিল সংহতির উদ্দেশে নিবেদিত ললিত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় আই পি সি এ কেন্দ্রীয় শাখার 'পঞ্চনদের তীরে।'

২২ ডিসেম্বর বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অন্য থিয়েটার-এর নাটক—'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' পরিবেশিত হয়। নাটকের আগে পরিবেশিত হয় 'রাগিণী'র নৃত্য আলেখ্য 'ছড়িয়ে আছো কেন।'

২৩ ডিসেম্বর পরিবেশিত হয়েছে দুটি নাটক। মেঘনাদ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সায়ক-এর নাটক 'দুই হুজুরের গপ্পো' ও জোছন দস্তিদারের নির্দেশনায় চার্বাক-এর নাটক—'আসল জিনিশ'।

অনুষ্ঠানলিপির এই দীর্ঘ তালিকায় আরো একটি দিন স্মরণীয়। ১১ ডিসেম্বর নন্দন সেমিনার হলে 'ভারতে সংহতির সমস্যা' শীর্ষক আলোচনায় এদিন অংশ নেন পাঞ্জাবের অজাতশত্রু নেতা সতপাল ডাং, কাইফি আজমী, অভিনেতা এ কে হাঙ্গল, বিচারপতি এ মাসুদ, শরণ সিং, মণি সান্যাল, ভূপাল পাণ্ডা, অধ্যাপক হীরালাল চোপরা, অরুণ বোস, অরুণ ঘোষ প্রমুখ।

মিছিলের শেষে ২৩ ডিসেম্বর নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে 'পাঞ্জাব সংহতি কমিটি'র সম্পাদক রতন বসু মজুমদার, পাঞ্জাব স্ত্রী সভার সম্পাদক বিমলা ডাংকে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা তুলে দেন।

প্রিয়নাথ রায়

কবি শ্রীমান রবীন সুর-এর জন্য

লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি, এ-লেখা কত নিদ্বরুণ হ'য়ে উঠছে আমার পক্ষে।

আমার বয়ঃকনিষ্ঠ ও স্নেহভাজন কবিদের প্রথম সারিতে থাকতেন একজন রবীন—যিনি নেই।

জীবনযাপনে থাকা, অভ্যস্ত-হওয়া এবং একদিন আকস্মিকভাবে না-থাকার মধ্যে শোকের বেশি কিছু থাকতে পারে। সেটি নিশ্চিত একটি অনিবার্য অভাব, তার বোধ।

ঠিক এই নয় যে, মাঝে মধ্যে ছাড়া রবীন সুর-কে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব দেখতে পেতুম, কিন্তু যখনই পেতুম, দেখতুম এক দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান, মাথা উঁচু যুবা, কবিতার শিল্পে নিবেদিত প্রাণ, জিজ্ঞাসু ও বিনম্র, এমনকি অল্পস্বল্প চিঠিতে—আমার সঙ্গে কথাবার্তাতেও এই কাব্যনির্মিতির প্রশ্নটিই প্রাধান্য পেত, হয়তো তার মনে হত এ বিষয়ে আমার কিছু প্রসঙ্গ আছে।

আমি আনন্দিত হতুম দেখে—এবং বলেওছি কখনো—কোনো সংহত পঙ্‌ক্তি—ইদানীং যা বেশি করে চোখে পড়ছিল রবীনের কবিতায়—ইদানীং তো সে তার স্বরটিকে চিনিয়েই দিয়েছিল। মৃত্যু মানে এখন তা আর নতুন ক'রে লেখা হবে না, যা বলা হ'য়ে গিয়েছে সেই সঞ্চয় ছাড়া। তাকে দেখে কোনোদিনই আমার মনে হয়নি যে তার প্রাণশক্তিতে কোথাও ঘাটতির কোনও টান ইতোমধ্যে লেগেছে। কিন্তু তাকে তো চলে যেতে হল, এত অকালে আকস্মিক সে পরিণতি—রবীনের কাছ থেকে কারও যা প্রাপ্য ছিল না।

সেদিন 'পরিচয়'-এর দপ্তরে—শ্রীমান রবীন এর আসা-যাওয়া সেখানে ছিল সহজ ও সাদর, অমিতাভ দাশগুপ্ত সদ্য খাম খুলে একটি কবিতা পড়ে শোনান। কবিতাটি রবীন সুর-এর। তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই রবীন এটি ডাকে পাঠিয়েছিলেন। নাম "শূণ্য ঘর শূণ্য নয়" ছোট, এক স্তবকের কবিতা। শুনেই আমি বললুম, এতো এপিটাফ, তবে আত্ম ও পরিবেশ সচেতন রবীন কী তার স্মরণ আগেই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে, অজ্ঞাতে! কবিতাটিতে পুনরায় আমার কথা বলা "পুনরায় আসা যাবে যখন

সান্নিধ্যে সরস্বতী / শোনাবে বীণার সুর বহুমাত্রা নন্দিত গৌরবে"। কবিতাটি এই সংখ্যাতেই ছাপা হচ্ছে—কবি রবীন সুর-এর মরণোত্তর একটি প্রকাশ।

কবি রবীন সুর পুনর্জন্ম চেয়েছিলেন। এই নামের কবিতা থেকে একটি বইয়ের নামও তিনি তাই দেন "পুনর্জন্ম চাই।" পুনর্জন্মে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। কেননা, "পুনর্জন্ম নেই জেনে বারংবার জন্মাতে চেয়েছি।"

কবি রবীন সুরের পুনর্জন্ম এখন হতে পারে কবিতায়। নতুন করে রবীন তো আর লিখতে পারবে না। সে তো নেই। কিন্তু কবিতাগুলি রয়েছে নানান বইয়ে, বা বইয়ের বাইরে এখনও পত্র-পত্রিকার পাতায়, যে রবীন জেনে গিয়েছিল "এই চেষ্টা চেতনা জাগরণের জন্যই কবির যুদ্ধ।" রবীন সুর-এর বহু শুভার্থী, অনুরাগী ও তরুণ বন্ধুরা তার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচিত সংগ্রহ বার করতে পারেন। মনে হয়, এ ব্যাপারে উদ্যোগের ও উদ্যোগীর অভাব হবে না। অন্তত, তাই-ই যেন হয়।

সিদ্ধেশ্বর সেন

রবীন সুরের কবিতা

শূন্য ঘর শূন্য নয়

পুণ্যপ্রভা ঘরখানি শূন্য নয়, মজুত চায়ের
নান্দনিক তৃপ্তি পেয়ে চলে যাচ্ছি অধম রবীন,
পুনর্বার আসা যাবে যখন সান্নিধ্যে সরস্বতী
শোনাবে বীণার স্বর বহুমাত্রা নন্দিত গৌরবে,
শূন্য ঘর শূন্য নয়, কাটলেটের সুস্বাদু আহারে
ফিরে যাচ্ছি পুনর্বার, এখানে আসার অভিপ্রায়ে ।।

২৪ ১১. ৮৮

রবীন সুর—জন্ম ২, ১০, ৩৪
মৃত্যু ১৪, ১২, ৮৮

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসেবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য। এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৫৬৪৩/৮৮

PARICHAYA DECEMBER 1988 Reg. No. 13732
WB/EC—265

Just Out

Gandhi-Nehru Through Marxist Eyes

by

Narahari Kaviraj

An attempt at re-evalution of thoght of Gandhi and Nehru in the light of recent experience.

Price : Rs. 35·00

Manisha Granthalaya (P) Ltd

4/3B, Bankim Chatterjee Street,
Calcutta-73.

6 JUL 1989

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৭

দাম : তিন টাকা